শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
নানা রসের ৯টি উপন্যাস

নানা রসের ৯টি উপন্যাস

শী র্ষে ন্দু মু খো পা ধ্যা য়

নানা রসের ৯টি উপন্যাস

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

রাঃ স্বাঃ
বন্দে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম্

শ্রী প্রলয় কুমার মজুমদার
করকমলেষু

ভূমিকা

গত কয়েক দশকে উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচনা একইসঙ্গে হৃদয়স্পর্শী ও জটিল। মানুষের অস্তিত্বের সমস্যাকে তিনি নানাভাবে ঘুরিয়ে—ফিরিয়ে দেখতে চেয়েছেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তিনি যেন মানুষের আত্মার রহস্যকে উন্মোচন করে যান। বিচিত্র সব চরিত্র আসে তাঁর লেখায়। সমাজের নানা স্তর থেকে আসে। তারা মিলেমিশে এক বহুমাত্রিক জগৎ তৈরি করে তাঁর রচনায়। শ্লেষে ও তির্যকতায়, দার্শনিকতায় ও বিধুর রোমান্টিকতায় সিক্ত করে তিনি মানুষের মনস্তত্ত্বের অতলে ডুব দেন, তাদের ওপরের সাজপোশাক সরিয়ে ভেতরের খড়—মাটিকে চেখে দেখতে চান। শীর্ষেন্দু কোনও সহজ লেখক নন। তাঁর লেখায় জীবনের উপস্থিতি এত তীব্র বলেই, মানুষের মনে তার আবেদন এমন সার্বজনীন। জীবনের ওপরের স্বাভাবিকতাকে তিনি বারবার আক্রমণ করেন, এবং উন্মোচন করতে চান ভেতরে লুকিয়ে থাকা নানা উদ্ভট ও আশ্চর্য সম্ভাবনাগুলিকে। তীকষ্ন ও ক্ষুরধার, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ভাষায় ও কল্পনাশক্তির বলিষ্ঠ প্রয়োগে তাঁর রচনাগুলি জীবনের একের পর এক অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডকে উন্মোচন করে যেতে চায়। তাঁর রচনায় তাই সহজে প্রবেশ করা যায় না, তার জন্য ধৈর্য ও সংযম, প্রস্তুতি ও মেধার প্রয়োজন রয়েছে!

শীর্ষেন্দুর নটি উপন্যাসের এই সংকলন বাংলা সাহিত্যে তাই একটি বিশিষ্ট সংযোজন। এই উপন্যাসগুলি হল, 'আক্রান্ত', 'ছায়াময়ী', 'ফেরিঘাট', 'কাঁচের মানুষ', 'লাল নীল মানুষ', 'নয়নশ্যামা', 'রক্তের বিষ', 'রঙিন সাঁকো', 'শূন্যের উদ্যান'। 'আক্রান্ত' উপন্যাসটি সম্পর্কে শীর্ষেন্দু লিখেছেন, 'জীবনের নানা তিক্ত ও অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা, তীব্র অর্থসংকট এবং মানসিক বিপর্যস্ততার মধ্যে দিয়ে এক হেরো মানুষের জীবনযাপন। তিক্ততাই জন্ম দিয়েছিল এই উপন্যাসটির।...পৃথিবীতে আক্রমণাত্মক ও আক্রান্ত এই দুই জাতের মানুষ আছে। তৃতীয় জাত হচ্ছে প্যাসিভ বা প্রতিক্রিয়াহীন। এই উপন্যাসটির মধ্যে নানা বাস্তব ও অবাস্তব চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। আছে আক্রান্ত এবং আক্রমণাত্মক মানুষজনেরাও। আমার নানা পর্যায়ের জীবন নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছে। এইসব বিচিত্র মানুষজনকে আমি মাঝে মাঝেই আমার লেখায় তুলে আনি। এই উপন্যাসেও কয়েকজন আছে যাদের জীবনদর্শনের মধ্যে উদ্ভট আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার—স্যাপার আছে।'

'ছায়াময়ী' উপন্যাসে রয়েছে একজন বিখ্যাত জননেত্রীর প্রসঙ্গ, যা কাল্পনিক নয়। এ প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু লিখেছেন, 'এই গ্রন্থে প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ আছে। উপন্যাসের মধ্যে কল্পনার আশ্রয় থাকেই, কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের অংশটি গ্রন্থকারের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ১৯৭৬—এর একদিন রাজভবনে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছিলেন।...কাছ থেকে তাঁকে যেরকম দেখেছি বা যা মনে হয়েছে তারই খানিকটা এই কাহিনিতে রইল। এর মধ্যে যে কল্পনার মিশেল নেই এমন নয়। পাঠক—পাঠিকাকে গ্রন্থকারের নিবেদন এই যে, এটি উপন্যাসের অংশ হিসাবেই গ্রহণ করবেন, সংবাদ হিসেবে নয়।'

'ফেরিঘাট' উপন্যাসটি সম্পর্কে শীর্ষেন্দু লিখেছেন, 'আমার গোলমেলে কল্পনার জগতে অনেক অশৈলী কাণ্ড ঘটে যেসব লোককে বলার মতো নয়। জানলে লোকে পাগল বলে দোষ দেবে আমাকে। এক পাগলামির সঙ্গে আমার আবাল্য সহবাস। যে আমাকে জ্বালায়, পোড়ায়, কাঁদায়, আবার যে কখনও কখনও লেখায়ও। এই উপন্যাসে পাগলামি আছে, আর আছে আমার এক উদ্বাস্তু পিসি, নিজের দিকে না তাকিয়ে সংসারের জন্য রিক্ত হওয়া এক পিসতুতো দিদি, আছে আমার দুর্দিনের বড় বন্ধু কল্যাণ এবং আরও কয়েকজন প্রিয় মানুষ।'

'কাঁচের মানুষ' উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য, 'এটি লেখা হয়েছে আমার প্রিয় শহর শিলিগুড়ির প্রেক্ষাপটে। বাবার চাকরির সূত্রে একসময়ে আমরা শিলিগুড়িতে এসেছিলাম। তখন শহর এত বড় হয়নি। ছোট্ট একমুঠো, মিষ্টি একটা শহর। আমার ভাইবোনদের লেখাপড়ার সূত্রে আমরা শিলিগুড়িতেই স্থিতু হয়ে গেলাম।...প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার করে কোনওক্রমে আধখ্যাঁচড়া একটা বাড়িও খাড়া করা হল, যার অর্ধেকটার ছাদ ঢালাই করা যায়নি টাকার অভাবে। বাড়িটি শেষ করতে অনেক সময় লেগে গেল আমাদের। ওই বাড়ির সঙ্গে আমাদের পরিবারের সুখদুঃখের ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। এই উপন্যাসটি একটি সম্পন্ন পরিবারের নানা গল্প ও ঘটনা নিয়ে লেখা। চরিত্রের সংখ্যা বড় কম নয়।'

'লাল নীল মানুষ' প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু লিখেছেন, 'এটি আবার একটি জটিল রচনা, প্রয়াসটা কিন্তু মন্দ ছিল না। এক সময়ে বাগনান হয়ে হাওড়ার এক বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে আমি প্রবল পরিক্রমা করেছি। তখনই গ্রামাঞ্চলের নানা মানুষের সংস্পর্শে আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই উপন্যাসে তাদেরই কথা। গাঁয়ের গল্প বটে, কিন্তু সহজ সরল গল্প নয়, তাতে ঘাপলা আছে।'

'নয়নশ্যামা' উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য, 'এই উপন্যাসটি যখন লিখি তখন আমি মধ্য তিরিশ পেরিয়ে গেছি, এখানে প্রেমটি রাহুগ্রস্ত, একপেশে এবং মোটেই সুস্বাদু নয়। তা বলে নয়নকে ভিলেন ভাবিনি কখনও, বরং ওর বেদনার সঙ্গে আমার সংক্ষুব্ধ যৌবনের বেদনার একটা যোগ আছে।...গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়ানো আমার জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। সুন্দরবন থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই আঁদাড়—পাঁদাড় ভেঙে ঘুরেছি আর ঘুরেছি। এই পরিক্রমা আজও, এই পরিণত বয়সেও আমার অব্যাহত আছে। পাহাড়ে—সমুদ্রে বা বিদেশে যাওয়ার চেয়েও আমার কাছে ঢের বেশি প্রিয় বাংলার গ্রামগুলি। উত্তরবঙ্গ বা বাংলাদেশের গ্রামও বড় কম ঘোরা হয়নি। তাই গ্রামের কথা বা পটভূমি আমার গল্প বা উপন্যাসে বারবার চলে আসে। যেমন এসেছে এই উপন্যাসে।'

'রক্তের বিষ' প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দুর ভাষায়, 'এটি বোধহয় আমার থ্রিলার লেখার প্রথম কাঁচা প্রয়াস। শেষ পর্যন্ত থ্রিলার হয়ে ওঠেনি ঠিকই, নানা সম্পর্কের টানা—পোড়েন ও পুনর্বিন্যাসে ঘুরপাক খেয়েছে। তবে এর মধ্যে আমার একজন গেম টিচারের চরিত্র আছে।' 'রঙিন সাঁকো' উপন্যাসটি সম্পর্কে শীর্ষেন্দু লিখেছেন, 'আমার ছোটভাইয়ের জন্ম হয়েছিল আমার জন্মের দশ বছর পর। ভাই জন্মানোর খবরে আমার সে কী উল্লাস! ভাইকে আমি খুবই ভালোবাসি। আর সেই ভালোবাসারই সঞ্চার ঘটেছিল এই উপন্যাসটিতে। এটিও ওই বালিতেই লেখা। ভালোবাসার কথা লিখতে, বলতে বা ভাবতে গেলে আমি বড় দ্রবীভূত হয়ে যাই। আবেগ মথিত করে আমাকে।...দূরে দূরে থেকে আমার ভিতরে পরিবার পরিজনের প্রতি এক অবোধ প্রবল ভালোবাসার জন্ম হয়। এই আকুলতাকে আমি নানাভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি আমার লেখায়।'

'শূন্যের উদ্যান' লেখকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নিয়ে লেখা, পোলিও হয়ে যার হাত পা কমজোরি। এর ছত্রে ছত্রে মাঝেমাঝেই লাগামহীন পাগলাটে ব্যাপার আছে। বাস্তবতা ও যুক্তিসিদ্ধতার অভাবে এই উপন্যাসটি কিছু উন্মার্গগামিতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, পাঠ করা সুখকর হওয়ার কথা নয়।' স্বপ্ন ও বাস্তব মেশানো লেখকের এই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনার মুখ্য চরিত্র গৌরহরির সমস্ত জগৎটাই যেন অ্যাবসার্ড। অনন্তযাত্রায় ট্যাক্সি ছোটানোর আগে অবশ্য সে এটা অনুভব করেনি। তার স্বপ্নজগতের একটি ডেডবডি কিংবা মাতাল জাহাজি আসলে গৌরের অবচেতন জগতের প্রতীকী প্রকাশ। অর্থলোভী, স্বার্থপর, পচনশীল আধুনিক সমাজে শুদ্ধতম প্রেমের প্রতিমূর্তি স্যু—রা বেঁচে থাকতে পারে না। ক্ষয়া সমাজের মূর্ত প্রতীক হিসাবে এসেছে একটা পোড়ো বাড়ি। অন্তর্বাস্তবের অপরূপ সংকেতঋদ্ধ চিত্রময় এই আখ্যান।

এই বিপুলায়তন সংকলনটি প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রাপ্য দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শ্রী শংকর মণ্ডল, তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রী দীপ্তাংশু মণ্ডল এবং তাঁদের কর্মসহযোগী শ্রী আশিস চৌধুরীর। জাদু ও স্বপ্ন, পাগলামি ও উৎকেন্দ্রিকতা যার রচনায় অনায়াসে মিলেমিশে যায়, উদ্ভটত্বের আকস্মিতায় পাঠককে যিনি

চমকে দিতে থাকেন আর পরতে পরতে খুলে দিতে থাকেন জীবনের একেকটি জটিল ও দুর্বোধ্য স্তর, সেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে এরকম এক সংকলনে সম্পূর্ণ অভিনবভাবে ধরে রাখার কৃতিত্ব তাঁদেরই।

রাহুল দাশগুপ্ত

সূচিপত্র

আক্রান্ত

রবি লোকটা আসলে ডিফেনসের খেলোয়াড়। সর্বদাই নিজের দুর্গ সামলাচ্ছে, বিপক্ষের আক্রমণ রুখতে হিমশিম খাচ্ছে। কখন গোল খেয়ে যায় তার তো ঠিক নেই। কদাচিৎ অ্যাটাকে উঠে এসে সে যদি কখনও এক—আধটা গোল করেও ফেলে তবু ওকে ভয় খাওয়ার কিছু নেই। নিশ্চিতভাবেই ও নিজের এলাকায় পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। একদিন এইভাবেই হয়তো ও নিজের গোলে ঢুকে যাবে। তারপর জড়িয়ে পড়বে নিজেরই জালে।

অনেকের ডাক ও পোশাকি দুটো আলাদা নাম থাকে। রবির পোশাকি নাম হতে পারত রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তা হয়নি। রবির কোনও পোশাকি নাম নেই। তার নাম একটাই। রবি সর্বজ্ঞ। নামটা হালকা পলকা হলেও তার পদবিটি ভারিক্কি। পদবিতেই তার পুষিয়ে গেছে। রবির অল্পেই পুষিয়ে যায়।

যতদূর জানা যায়, মাত্র দশ মাস বয়েসে সে হাঁটতে শিখেছিল। এক বছর বয়েসে সে কথা বলত। ক্লাস থ্রিতে একবার সে অঙ্কে পেয়েছিল একশোয় একশো। অনেক ভেবেচিন্তেও রবি নিজের আর কোনও কৃতিত্বের কথা মনে রাখতে পারে না। তবে ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় ইস্কুলের স্পোর্টসে থ্রি লেগড রেস—এ সে সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছিল বটে। কিন্তু সেই দৌড়ে তার পার্টনার বিশুই তাকে শেষ গজ তিনেক ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পায়ে এত ব্যথা পেয়েছিল সে যে, চোখে লাল নীল তারা দেখেছিল কিছুক্ষণ। সেই প্রাইজ পাওয়ার ঘটনাটাকে কৃতিত্বের মধ্যে ধরবে কি না তা নিয়ে দীর্ঘকাল সে দ্বিধায় আছে। আর কেউ না জানুক, রবি নিজে জানে, বিশুর দুর্দান্ত গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে শেষ সীমার কাছাকাছি গিয়ে সে পড়ে যায়। বিশু তাকে ঝটকা মেরে তোলে এবং টানতে টানতে নিয়ে শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়। রবি সেই থেকেই জানে, ডিফেনসিভ লোকের কখনও কোনও অ্যাটাকিং লোকের সঙ্গে জোড় বাঁধা উচিত নয়।

ডিফেনসে খেলার নিয়মগুলি রবি শিখে গেছে এবং মোটামুটি মেনেও চলে। সে কদাচিৎ লোককে চটায়। পৃথিবীর কোনও বিষয় সম্পর্কে সে নিজস্ব কোনও মতামত পোষণ করে না। অধিকাংশ মানুষকেই সে নিজের চেয়ে উন্নততর জীব মনে করে।

দেবতারা গ্রহান্তরের মানুষ কি না তা রবি জানে না। তবে সে জানে এই গ্রহেই বহু দেবতার মতো মানুষ বাস করে। পৃথিবীটা তারাই চালাচ্ছে। তারাই দুনিয়ার মালিক। রবির মতো কিছু বহিরাগতকে এখানে খুব লজ্জার সঙ্গে অধোবদনে এবং প্রায় আত্মগোপন করে বসবাস করতে হয়।

রবি সেইভাবেই বসবাস করে। অনধিকারীর মতো।

আপনারা যাঁরা বাইরে থেকে রবি সর্বজ্ঞকে দেখেন তাঁরা তার ভিতরটা দেখতে পান না। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের হেল্প করতে পারি। রবিকে বাইরে থেকে যতটা অপদার্থ মনে হয় আসলে সে তার চেয়েও অনেক বেশি অপদার্থ। অনেক অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যালোচনার পর আমার মনে হয়েছে, রবির ভিতরটা অনেকটা চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো। একধারে গভীর অতল হতাশার খাদ, তার পাশেই আবার উত্তুঙ্গ উচ্চাশার পর্বত। তার মানসিকতা খুবই এবড়ো খেবড়ো সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে উজ্জ্বল আলোর বাড়াবাড়ি। আবার কোথাও ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

রবি সর্বজ্ঞকে যে এত ভালো চিনি তার কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমিই রবি সর্বজ্ঞ। রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে এই নিকটতম আত্মীয়তায় আমি মোটেই খুশি নই। লোকটাকে আমি সবসময়ে সহ্যও করতে পারি না। তবু শয়নে স্বপনে জাগরণে এবং আমৃত্যু রবির সঙ্গে আমার আর ছাড়ান কাটান হওয়ার উপায় নেই। কিন্তু মুশকিল হল,

আমার নাম রবি সর্বজ্ঞ হলেও আমি পুরোপুরি রবি সর্বজ্ঞ নেই। কোথায় যেন, কীভাবে যেন রবি সর্বজ্ঞ—র সঙ্গে আমার একটু পার্থক্য আছে। রবি যখন খুবই বোকার মতো অজায়গায় কোনও কথা বলে ফেলে তখন আমি লজ্জায় জিব কাটি। এমন মেরুদণ্ডহীন আচরণ সে মাঝে মাঝে করে যে, আমার তাকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। তার ব্যক্তিত্বহীন ডিফেনসের খেলা দেখে মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে আমি চোখ বুজে থাকি। আমার বিশ্বাস মাতৃগর্ভে রবি এবং আমি দুটি যমজ শিশু হিসেবে প্রবৃষ্ট হই। কিন্তু কোনও ঘটনাক্রমে সেই যমজ শিশুদুটি একাকার হয়ে গিয়ে একটি শিশু হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ফলে বাইরে থেকে রবিকে একজন বলে মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তা নয়। গবেষকরা কী বলবেন জানি না, কিন্তু এই বিশ্বাস আমার এতই দৃঢ় যে, আমি নিজের একটা আলাদা নাম রাখব কি না তা ভাবছি। কিন্তু সে নামের কথা থাক।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি, রবি সর্বজ্ঞ একটু অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। লাটুবাবুকে একটা জরুরি কথা জানাতে হবে। রবি তাই এক পাঞ্জাবি রেস্টুরেন্ট থেকে লাটুবাবুকে টেলিফোন করছিল। দিব্যি রিং—এর শব্দ শুনতে পেল রবি। লাটুবাবুও ফোন ধরতে দেরি করলেন না। বললেন, হ্যালো।

আজ্ঞে, আমি রবি বলছি।

সাগ্রহে লাটুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বলছ? বলো বলো!

এই অবধি হওয়ার পরই কাউন্টারের পাঞ্জাবি লোকটা খট করে রিসিভারের বোতাম চেপে লাইনটা কেটে দিল। এবং বিনা দ্বিধায় রবির হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিতে নিতে বলল, আরে ছোড়ো ছোড়ো। আভি কাম কা টাইম মে—

কথাটা শেষ না করেই পাঞ্জাবি লোকটা ডায়াল করতে শুরু করল। তার মুখটা খুবই রাগী রাগী, চোখদুটোয় সাংঘাতিক দৃষ্টি। সবুজ পাগড়ি থেকে চুমকির আলো ঠিকরে আসছে।

লোকটার নিশ্চয়ই ফোন করাটা জরুরি আছে। কিন্তু জরুরি দরকার রবিরও। লাটুবাবু সকাল থেকে বসে আছে।

পাঞ্জাবি লোকটা মেশিনগান চালানোর মতো হুড়োহুড়ি কথা বলছে টেলিফোনে। তারপর ঝড়াক করে লাইন কেটে দিয়ে আবার ডায়াল করতে শুরু করল।

রবি যথেষ্ট অপমান বোধ করছে। তার মনে হচ্ছে, এই অভদ্র ব্যবহারের জবাবে তার একটা কিছু করা উচিত। অন্তত ভদ্রভাবে একটা প্রতিবাদ। তাছাড়া সে লাটুবাবুর লাইন পেয়েছিল, সুতরাং পাঞ্জাবি লোকটা তার কাছে পয়সা চাইতেও পারে।

রবি ক্ষীণ স্বরে বলল, দেখিয়ে—

লোকটা শুনতে পেল না বা শুনল না ইচ্ছে করেই।

রবি এবার একটু উঁচু স্বরে বলল, দেখিয়ে পাঁয়জি—

এবার লোকটা রবিকে দেখল। কানে ফোন ধরা অন্যমনস্কতায় ডান হাতটা নেড়ে বলল, আভি যাও—যাও —

রবি স্পষ্টই বুঝতে পারল, লোকটা অ্যাটাকের খেলোয়াড়। তা ছাড়া পাঞ্জাবিরা বীরের জাত। টেলিফোনটাও তো ওরই। ও যদি তাকে ফোন করতে না দেয় তা হলে কী করার আছে তার? অর্থাৎ সোজা কথা, রবি প্রতিবাদ করতে ভয় পাচ্ছিল এবং এইসব নীতিকথা ভেবে নিজের কাপুরুষতাকে নিজের কাছে ঢাকবার চেষ্টা করছিল। তবে ভিতরে ভিতরে সে জানে, তেমন তেমন লোক হলে তার হাত থেকে পাঞ্জাবি লোকটা এত সহজে ফোন কেড়ে নিতে পারত না। নিলেও পার পেত না।

দোকান থেকে নেমে আসতে আসতে রবি প্রায় ফিসফিস করে বলল, দেখিয়ে পাঁয়জি, এ কাম ঠিক নেহি হ্যায়।

পাঞ্জাবিটা অবশ্য কথাটা শুনতে পেল না।

অথচ আমি জানি, রবির উচিত ছিল পাঞ্জাবিটা যখন ডায়াল করছিল তখন খুব সাহসের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বোতাম টিপে ওর লাইনটাও কেটে দেওয়া এবং খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলা, পাঁয়জি, কাজটা তুমি ঠিক করোনি।

কিন্তু রবির দ্বারা সে কাজ হওয়ার নয়। আর ঠিক এই কারণেই রবির সঙ্গে আমার বনিবনা হয় না।

লাটুবাবু বসে আছে। ভ্রূ কোঁচকানো। মুখটায় বিরক্তির তিতকুটে ভাব। বাঁ হাতের দু'আঙুলে বাঁ গালের একটা আঁচিলকে ডাইনে বাঁয়ে মোচড়াচ্ছে। দৃশ্যটা স্পষ্ট মনশ্চক্ষে দেখতে পায় রবি। ফোনটা তাড়াতাড়ি করা দরকার।

অবশেষে একটা ওষুধের দোকান থেকে লাটুবাবুকে ফোন করতে পারল রবি।

লাটুবাবু, আমি রবি।

লাটুবাবু খেঁকিয়ে ওঠে, আগের বারে লাইনটা কেটে গেল কেন বলো তো!

ফোনের কি কিছু ঠিক আছে লাটুবাবু?

লাটুবাবু তার পরেও গজগজ করে, সেই থেকে বসে আছি হাঁ করে! যাক গে তাড়াতাড়ি বলো, আবার না লাইন কেটে যায়। গিয়েছিলে?

হ্যাঁ। ছেলেটা ওই কোম্পানিতেই কাজ করে।

সে আমি জানি।

দু'হাজার টাকার মতো মাইনে পায়।

ঠিকমতো খোঁজ নিয়েছ তো?

নিয়েছি।

চরিত্র—টরিত্র কেমন?

যারা দু'হাজার টাকা মাইনে পায় তাদের অধিকাংশেরই চরিত্র ভালো হওয়ার কথা নয় লাটুবাবু।

তার মানে কী?

মানে চরিত্র তেমন সুবিধের নয়।

তুমি কার কাছে খোঁজ নিয়েছিলে?

একজন কেরানির কাছে।

কেন, কেরানির কাছে কেন? সোজা কোনও সাহেবের ঘরে ঢুকতে পারলে না?

সাহেবরা আমাকে ইনফরমেশন দেবে কেন?

আ মোলো। যাকগে, তা সেই কেরানি তোমাকে কী বলল?

বলল, রুদ্রাক্ষ সেন দেদার ঘুষ খায়।

আঃ আস্তে। ফোনে নামটামগুলো বলার দরকার নেই। শুধু 'ছেলেটা' বললেই হবে। ঘুষ খায় বলল?

হ্যাঁ।

সে না হয় হল। কিন্তু চরিত্র কেমন?

ঘুষ খেলে আর চরিত্রের থাকে কী?

ঘুষের সঙ্গে চরিত্রের কী সম্পর্ক? বলি মেয়েছেলের দোষ আছে কি না, মদ খায় কি না সে—সব খোঁজ নিয়েছিলে?

নিয়েছি। কিন্তু কেরানিটা আর কিছু বলতে পারেনি। শুধু বলল, মেয়েছেলের দোষ কি আর নেই মশাই, অত টাকা লুটছে, সেটা ওড়াচ্ছে কোথায়?

সঞ্চয়ও করতে পারে তো!

তা পারে।

খোঁজ নাও!

আরও খোঁজ নেব লাটুবাবু? তাতে যদি আরও খারাপ কিছু বেরোয়?

আরও খারাপের কথা উঠছে কেন? এখনও তো খারাপ কিছুই বেরোয়নি।

ঘুষটা তা হলে ধরছেন না?

ঘুষ? ওঃ, তোমার মাথাটাই গেছে। ঘুষ আবার কী? দুটো পয়সা রোজগার করছে, সেটাও ধরতে হবে না কি? চোর—ডাকাত তো আর নয়। ও ব্যাপার নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। শুধু খোঁজ নাও, চরিত্রটা কেমন।

রবির হঠাৎ মনে হল, ঘুষের কথায় লাটুবাবু রাগ করেছেন। সুতরাং একটু প্রলেপ দেওয়া দরকার। সে তাই বলল, আসলে কী জানেন লাটুবাবু, ঘুষ জিনিসটা যে দোষের নয় তা আমিও জানি। কিন্তু আমি ভাবলাম আপনি তো

মর‍্যালিস্ট মানুষ, হয়তো পছন্দ করবেন না।

পছন্দ করিও না। বুঝলে! যাকে সত্যিকারের ঘুষ বলে তাকে আমি পছন্দ করিও না। তবে লোকের উপরি কাজ করে দিয়ে উপরি কিছু পাওয়াটা তো আর তেমন দোষের নয়।

তা তো নিশ্চয়ই।

তা হলে আর সেটাকে ঘুষ বলছ কেন? ঘুষ নয়, দুটো পয়সা আসছে আর কী। দেখো গে, হয়তো সেই টাকায় সঞ্চয় করছে। তাতে সরকারের লাভ হচ্ছে, দেশের ডেভেলপমেন্টের কাজে লাগছে। টাকাটা যদি খারাপ টাকাই হত তা হলে সরকার বেয়ারার বন্ড বেচে সেই টাকা নিজের কাজে লাগানোর কথা ভাবত না। টাকার গায়ে ভালো বা খারাপ বলে কিছু থাকে না হে।

রবির কাছে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হয়ে যায়। ঘুষ বা কালো টাকা সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত না থাকায়, লাটুবাবুর কথায় সায় দিতে তার অসুবিধে হয় না তেমন। উপরন্তু লাটুবাবুর কথার প্রতিবাদ করা বা অন্য কোনওভাবে তাকে চটিয়ে দেওয়া বিপজ্জনক। তাই রবি খুব বিনীতভাবে বলল, সে তো ঠিকই লাটুবাবু।

তা হলে? বারবার ঘুষ ঘুষ করছ কেন? বরং একটু খোঁজ নাও, ছোকরার চরিত্র কেমন।

নেব। আপনি ভাববেন না।—বলে বিনীতভাবে টেলিফোনটা রেখে দেয় রবি।

আমার বাবা আশুতোষ সর্বজ্ঞ মদের ব্যবসা পছন্দ করতেন না। কিন্তু ব্যবসাটা ছিল আমাদের বংশগত। বাবা উত্তরাধিকারসূত্রে পান। কথায় বলে 'গয়লা মদ খায়, শুঁড়ি খায় দুধ।' আশুতোষ সর্বজ্ঞ অবশ্য যেমন দুধ খেতেন তেমনি আবার আফিংও খেতেন। তবে সে নেশা তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়। প্রৌঢ় বয়সে একবার তাঁর এমন পেট খারাপ হয়েছিল যে, কোনও ওষুধে, ডাক্তারেই তা ধরল না। ধাত ছাড়ার উপক্রম। সেই সময়ে আমাদের নিয়তিকাকা এসে পরামর্শ দেন, আফিং ধরো হে, আফিং ধরো। কাল দিয়ে কালরোগ ঠেকাও।

আশুতোষ সর্বজ্ঞ আফিং ধরতে রাজি ছিলেন না। জীবনে তিনি বিড়ি সিগারেটও খাননি। কিন্তু নিয়তিকাকা রোজ আসতেন এবং রোজই এক কথা আউড়ে যেতেন, কাল দিয়ে কালরোগ ঠেকাও হে। আগে তো জান বাঁচাও, পরে মান।

অবশেষে বাবা আফিং ধরেন এবং কী আশ্চর্য, তাঁর পেট ভালোও হয়ে যায়। সেই থেকে নিয়তিকাকা বাবার একজন প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন। যদিও এই লোকটা সম্পর্কে আমার মা'র কিছু সন্দেহ ছিল। নিয়তিকাকার নাম কস্মিনকালেও নিয়তি নয়। সবাই জানত, তিনি হলেন কালীবাবু। শোভাবাজারের বনেদি ক্ষয়িষ্ণু এক বেনে পরিবারের উত্তরপুরুষ। পরনে শীতে গ্রীষ্মে একটা গলাবন্ধ ধূসর রঙের সুতির কোট, তলার দিকে ধুতি মোজা ও পাম্প শু। মাথায় কাঁচাপাকা চুল মাঝখানে সিঁথি কেটে পাট করে আঁচড়ানো। একেবারে উনিশ শতকের চেহারা। কলকাতার প্রায় সব শুঁড়িকেই চিনতেন। বাবার সঙ্গে খাতির কিছু বেশি ছিল। একসময়ে বিলিতি হুইস্কি দিয়ে নেশা শুরু করেছিলেন, পয়সার অভাবে দেশি হুইস্কিতে নামেন, শেষ বয়সে বাংলাতেও অরুচি ছিল না। মা'র সন্দেহ ছিল, বড়লোকদের ডোবাতে যেমন প্রায় সময়েই একটি কুপরামর্শদাতা শনিঠাকুর এসে হাজির হয়, এই কালীবাবু লোকটিও তাই। আফিং ধরিয়েছে, এরপর চণ্ডু

ধরাবে। তাই কালীবাবুর কথা উঠলেই মা বলত, ও হচ্ছে ওঁর নিয়তি। সেই থেকে কালীবাবুকে আমরা নিয়তিকাকা বলেই উল্লেখ করতাম।

পুরোপুরি নিয়তি না হলেও কালীকাকা খানিকটা নিয়তির কাজ করেছিলেন সন্দেহ নেই। নানারকম ব্যবসায় মাথা এবং টাকা খাটিয়ে তিনি কখনও লাভ করতেন বা লোকসান দিতেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি লাভ বা লোকসান কোনওটাতেই থিতু হতে পারেননি। চুনের ব্যবসায়ে লাভ করে নুনের ব্যবসায় লোকসান দেওয়াটা ছিল তাঁর অবধারিত। কথা উঠলে বলতেন, ওঠাপড়াই ভালো, তাতে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যায় না। জ্যান্ত আছি যে, তা বেশ টের পাই।

আমাদের বাড়িতে মদ দূরের কথা, মদের খালি শিশিটাও কখনও ঢোকেনি। সেই বাড়ির বৈঠকখানা অবধি মদ ঢুকিয়ে ছেড়েছিলেন কালীকাকা। প্রথম প্রথম বাবা প্রবল আপত্তি করেছিলেন। তারপর কালীকাকা তাঁকে বোঝাতে থাকেন যে, বৈঠকখানা হল অন্দর ও বাহিরের মিলনস্থল। এটি কেবল গৃহস্বামীর একক অধিকারের জায়গা নয়, অতিথিদেরও কিছু অধিকার আছে। তবু বাবা প্রবল আপত্তি বহাল রাখায় একদিন কেঁদে ফেলে বললেন, তোর লক্ষ্মীমন্ত মুখখানা রোজ দেখতে আসি রে আশু। তাও কি তোর সহ্য হয় না? তিন পুরুষের অভ্যেস, সন্ধের পর এ না হলে শরীর এলিয়ে পড়ে, চোখের তারা শিবনেত্র হয়ে লাল নীল হলুদ ফুল দেখতে থাকি। এ তো আর নোংরা মাতালদের ন্যাস্টি নেশা নয়। এ হল বংশের ধারা। এসে কোণের দিকে বসব, আলোটা না হয় কমিয়ে রাখিস, একটু আড়াল হয়ে মাঝে মাঝে চুক করে একটা চুমুক মেরে নেব। এতে তোর সতীত্ব যায় কীসে?

বলতে বলতে কালীকাকা একদিন বাবার পারমিশন পেলেন। পকেটে জবাকুসুমের একটি শিশিতে ভরা জিনিসটি থাকত। আড়াল করেই খেতেন।

বলতে নেই মদের ব্যবসায় আমাদের কিছু বোলবোলাও ছিল। কিন্তু কালীকাকা বলতেন, এ হল বসা ব্যবসা। নড়াচড়া নেই, ওঠাপড়া নেই, উত্তেজনা নেই, হারজিত নেই, ছ্যাঃ ছ্যাঃ। একে কি ব্যবসা বলে না কি। এই বসা ব্যবসা করতে করতে তুইও শালগ্রামশিলা হয়ে যাচ্ছিস রে আশু। তুমি শালগ্রামশিলা, ওঠা—বসা যার সকলই সমান তারে লয়ে রাসলীলা।

বাবা রেগে গিয়ে বলতেন, তা কী করতে হবে? তোমার মতো পাথর ভাঙার কল করতে গিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি বাঁধা রাখব না কি?

বাস্তবিকই সেই বছর নলহাটিতে কালীকাকার পাথর ভাঙা কল লাটে উঠেছিল।

কালীকাকা সুর পালটে বললেন, তোকে অত অ্যাডভেনচারাস হতে বলিনি। কিন্তু এ তো চাকরির মতো বাঁধা আয়ে বাঁধা পড়ে গেছিস। ব্যবসা বাড়ছে না, ছড়াচ্ছে না, ফুলে ফেঁপে উঠছে না। মাড়োয়ারিদের দেখ, গুজরাটিদের দেখ, লাখ টাকার ব্যবসা দু'লাখে দাঁড়াচ্ছে। দু'লাখ থেকে চার লাখে উঠে যাচ্ছে। সবদিকে চোখ, সবদিকে হাত। ফিল্ম, স্মাগলিং, ড্রাগ কোনওটা বাদ দিচ্ছে না। এক ফ্যামিলিতে চার ভাই তো চারটে ব্যবসা। আর তোর কী হবে? একটা ব্যবসা টিক টিক করে চলছে। তুই ফৌত হলে ছেলেরা একটা মরা গোরুর ওপর চারটে শকুনের মতো হামলে এসে পড়বে। ছেঁড়াছেঁড়ি, ভাগাভাগি। যাও টিকে ছিল, ভাগাভাগির ঠেলায় লাটে উঠবে। তাই বলি ছেলেদের নামে নামে আরও তিনটে দিক খুলে দে। মদ ছাড়াও পয়সা কামাইয়ের পথ আছে।

কালীকাকার কথায় আমল দেওয়ার মানেই হয় না। বাবাও দিতেন না। কিন্তু কালীকাকার স্বভাব ছিল, একটা কথা রোজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন। নানান সুরে বলতে বলতে একসময়ে সেটা বিশ্বাসযোগ্যও হয়ে উঠত। ভেবে দেখলে, প্রস্তাবটা তেমন অন্যায্যও নয়। বাঙালির পারিবারিক ব্যবসা ভাগাভাগির ঠেলায় লাটে ওঠে, এ তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সুতরাং বাবাও ক্রমে ক্রমে প্রস্তাবটির সারবত্তা বুঝতে পারলেন।

অলক্ষে শয়তানের বাজনা বেজে উঠল। পিশাচ পেতনি উদ্বাহু নৃত্য করতে লাগল। নিয়তির মুখে ফুটল মুচকি হাসি। মায়ের লক্ষ্মীর পটে একটা কালো মাকড়সা হেঁটে গেল একদিন।

আশু সর্বজ্ঞের সব ছেলেই তখন ধরতে গেলে নাবালক। মদের ব্যবসার বাইরে অন্য কোনও ব্যবসা সম্পর্কে আশু সর্বজ্ঞেরও কোনও ধারণা ছিল না। কাজেই অভিজ্ঞ অংশীদার জুটিয়ে আনল কালীকাকা।

দু'বছরের মাথায় প্রথম চোট হল ট্রান্সপোর্ট বিজনেস। আমাদের দু'দুটো লরি যে এই বিশাল ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে কোন গহিন লরির অরণ্যে হারিয়ে গেল তা কে বলবে? যথেষ্ট তদ্বিরের অভাবে ইনসিয়োরেন্সের টাকাটা পর্যন্ত পাওয়া গেল না। বেলেঘাটায় ইলেকট্রিক বালব তৈরির কারখানাটায় রোজ হামলা করত স্থানীয় মস্তানরা। চাঁদা দাও, চাকরি দাও। শেষতক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় বাবার একটা স্ট্রোক হল। কারখানা জলের দরে কিনে নিল আর একজন। বাবা হয়তো সেই দরে বেচতেন না, কিন্তু মা তখন পারলে ঘরের টাকা দিয়ে অপয়া কারখানাটা অন্যকে গছান। ভিন্ন পন্থায় বেহাত হল বালিগঞ্জে বার কাম চিনে রেস্টুরেন্ট। সেটাকে সাজাতে গোছাতে বিস্তর টাকা ঢালতে হয়েছিল। চিনের রাঁধুনিকে ভালো মাইনেও দিতে হত। পরে জানা গিয়েছিল সে ব্যাটাচ্ছেলে জাতে চিনে হলেও পেশায় ছিল মুচি। রান্না জানত লবডঙ্কা। তবে সেই রেস্টুরেন্টে গায়িকা এবং নর্তকী ছিল। আমি দুজনকেই দেখেছি। নর্তকীটি বিশাল। তার সবই বিশাল। পশ্চাদ্দেশ, বক্ষদেশ, মুখমণ্ডল। রেস্টুরেন্টে যে কাঠের ড্যানসিং ফ্লোর তৈরি করা হয়েছিল তাতে মচাক মচাক শব্দ উঠত নাচের সময়। ক্যাবারে নাচের সেই প্রাণান্তকর প্রোটোটাইপ যথেষ্ট মাতাল না হলে উপভোগ করা অসম্ভব। কিন্তু মাতাল হওয়াও বড়ো সহজ ছিল না। সেই দোকানের পার্টনার বিশুবাবু তাড়াতাড়ি লাভের মুখ দেখতে মদের বোতলে প্রচুর জল মেশাতেন।

ফলে লোকের নেশা হত না। তবে যে মেয়েটি গান গাইত তার কিছু এলেম ছিল। গরিব ঘরের কলেজে পড়ুয়া মেয়েটির বিষণ্ণ গলায় গান একটা ব্যাপ্তি লাভ করত। কিন্তু রেস্টুরেন্টকে তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় করার জন্য দিশি বিলিতি নানারকম বাদ্যযন্ত্রের আমদানি হওয়ায় মেয়েটির গলা চাপা পড়ে যায়। এ সব সত্ত্বেও দোকানটা হয়তো চলত। মুশকিল হল লোকেশন নিয়ে। যে পাড়ায় দোকান সে পাড়াটা ভদ্রপল্লি। সুতরাং একদিন গণ দরখাস্ত গেল কর্তৃপক্ষের কাছে, অসহ্য গণ্ডগোল, অসভ্যতা, নোংরামি ভদ্রপল্লিকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে। দোকান অতএব উঠল। আমরা বসলাম। প্রায় পথেই।

লাটুবাবুর ব্যবসা ছিল ফিলম ডিসট্রিবিউটার। ব্যবসাটা টিম টিম করে চলছিল। দপ করে জ্বলে ওঠা দরকার। তার জন্য টাকা চাই। আমাদের মদের ব্যবসার কাঁচা টাকা পেয়ে ব্যবসাটা একটু বেশিই দপ করে থাকবে। অকস্মাৎ আমাদের অখ্যাত বাড়িতে ফিলমের বিখ্যাত কয়েকজন লোকের যাতায়াত দেখা গেল। একজন সহ—নায়ক এবং এক চরিত্রাভিনেত্রীও পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। আমরা জাতে উঠে গেলাম আর কী। স্টুডিয়ো পাড়ায় নিত্যি বারোমাস নানা ছবির মহরৎ হচ্ছে। তার কোনওটা সিকি ভাগ, কোনওটা অর্ধেক, কোনওটা বারো আনা উঠে বন্ধ হয়ে যায়। এরকম মরুপথে হারানো ধারার বিস্তর ফিলম এখনও হিমঘরে পচছে। লাটুবাবু এরকম দু'খানা অসমাপ্ত ছবি শেষ করে জনসমুদ্রে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। একটা ছবির নায়ক পরলোকে, ডামি দিয়ে কাজ চালানো হল। আর একটা ছবির কাহিনির শেষাংশটা লেখা ছিল না। সেটাও লাটুবাবু লিখলেন। দুটো ছবিই এক এক সপ্তাহের জন্য মুক্তি পেয়ে ফের হিমঘরে ফিরে গেল। লাগলে আমরা লাল হয়ে যেতাম। তবে লাগল না।

তবু লাটুবাবুই একমাত্র লোক যিনি ঋণটা স্বীকার করলেন। বাবাকে বললেন, চুক্তিমতো আপনারও যা গেছে, আমারও তা গেছে। কেউ কারওটা ধারি না। তবু চল্লিশ হাজার টাকার ধার আমি মেনে নিচ্ছি। টাকাটা দেব। তবে ধীরে ধীরে। খুব ধীরে ধীরে।

তিনি কথা রেখেছেন। ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে শোধ দিচ্ছেনও বটে। না দিলেও বলার কিছু ছিল না।

এই ফিলমের ব্যবসাটা ছিল আমার নামে। ফলে লাটুবাবুকে নিরন্তর তাগাদা দিয়ে আদায় উশুল করার অনন্ত দায়িত্বও আমার ওপর অর্শাল। বলতে নেই, এই যৌবন বয়সে এখন সেটাই আমার গ্রাসাচ্ছাদনের প্রধান মামলোত। একমাসে লাটুবাবু তিনশো টাকা যদি দেন তা হলে পরের ছ'মাস চুপ করে থাকেন। তারপর হয়তো পর পর তিন মাস একশো করে দিলেন। তার পরের দু'মাস চুপ। আবার দুম করে একদিন

হয়তো পঞ্চাশ টাকার বোমা ফাটান। কিন্তু অতি বৃহৎ বিস্ফোরণ কদাচ ঘটে না। ফলে চল্লিশ হাজার টাকা এখনও টেনেমেনেও পঁয়ত্রিশে নামেনি। তবু লাটুবাবুর কাছে আমাকে প্রায় রোজ যাতায়াত বজায় রাখতে হয়। টাকা দিচ্ছেন, সুতরাং তিনি আমার সঙ্গে উত্তমর্ণের মতোই ব্যবহার করেন। তাঁর বিস্তর ফাই—ফরমাশও আমাকে খেটে দিতে হয়। আমি খাটিও। না, কথাটা ভুল বলা হল। আমি খাটি না, খাটে রবি সর্বজ্ঞ। ওই ব্যক্তিত্বহীন, ঘিনঘিনে, অমেরুদণ্ডী রবি। তার ধারণা, এটা লাটুবাবুর ঋণ শোধ নয়, অহৈতুকী দয়া। এমনকী লাটুবাবুর যাতে উন্নতি হয়, লাটুবাবু যাতে ঠিকঠাক পাওনা গন্ডা আদায় করতে পারেন, তার জন্যও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে রবি। তার ধারণা, লাটুবাবুর হাতে প্রচুর টাকাকড়ি এলে তিনি আশু সর্বজ্ঞ—র ঋণ আরও বেশি বেশি এবং ঘন ঘন শোধ করবেন। তখন প্রতি মাসেই বড় বড় বিস্ফোরণ ঘটবে। হাজার—দু'হাজার করে।

আজকাল রবি টাকার ব্যাপারে লাটুবাবুর সঙ্গে সাংকেতিক ভাষাতেই কথা বলে। তার তাগাদা দেওয়ার ধরনটা হল, লাটুবাবু, এবার একটা ফাটান। অনেকদিন কোনও আওয়াজ নেই।

লাটুবাবুও ওই ভাষাতেই বললেন, বারুদ কোথায় হে যে ফাটাব? দু'দিন রোসো, ফাটবে। ভেবো না, আমি হচ্ছি এক কথার মানুষ। একবার যখন বলেছি যে শোধ দেব, তখন ঠিকই দেব। কড়ায় গন্ডায়। এখন বারুদ নেই।

রবি খুব লজ্জার সঙ্গে মাথা চুলকে বলে, সে তো ঠিকই। আজকাল কারুর কাছেই বারুদ নেই। তবে এখন একটা ছোটোখাটো ফাটলে আমার একটু সুবিধে হত।

লাটুবাবু সেদিন তাঁর বৈঠকখানায় নতুন ক্যালেন্ডার লাগাবেন বলে রবিকে দিয়ে পেরেক পোঁতাচ্ছিলেন দেওয়ালে। যে টুলটার ওপর দাঁড়িয়ে রবি পেরেক পুঁতছিল সেটা প্রচণ্ডরকমের নড়বড়ে। হাতুড়ির বদলে একটা ভাঙা নোড়ার আধখানা দিয়ে পেরেক ঠুকতে হচ্ছিল রবিকে। দেয়ালের চুনবালি খসে খসে পড়ছিল তার চোখে মুখে গায়ে। লাটুবাবু নীচে দাঁড়িয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, ফাটবে হে, ফাটবে। আগে সেজো মেয়ের বিয়েটা দিই। তারপর দেখো, ছোটোখাটো নয়, একদম অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে দেব।

একথা শুনে রবির হাত থেকে শিবের ছবিওলা ক্যালেন্ডারটা খসে মেঝেয় পড়ে গেল। লাটুবাবুর যে আরও বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে এটা তার জানা ছিল না। থাকলে তারই সমূহ বিপদ। মাত্র বছরখানেক আগে আর—এক মেয়ের বিয়ে দিলেন লাটুবাবু। সেই বিয়ের দোহাই দিয়ে মাস ছয় উপুড়হস্ত করেননি।

মুশকিল হল লাটুবাবুর এই দুর্গে বৈঠকখানায় বেশি অনুপ্রবেশ করতে পারেনি রবি। রবি কেন, কেউই পারেনি। বৈঠকখানার পিছনদিকে ভিতরবাড়িতে যাওয়ার যে দরজা আছে তাতে অত্যন্ত মোটা কাপড়ের রন্ধ্র বা ফাঁক—ফোকরহীন একটা পর্দা ঝোলে। অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য দরজার মজবুত কপাট প্রায় সবসময়েই ভেজানো থাকে। সেই রহস্যময় রূপকথার অন্দরমহলে লাটুবাবুর যেসব আত্মীয় পরিজন আছে তাদের কোনওদিন চোখে দেখেনি সে। এমনকী তাদের কণ্ঠস্বরও বৈঠকখানায় পৌঁছয় না কখনও। তবে খুব কদাচিৎ সেই কপাটে একটু—আধটু করাঘাত ও চুড়ির ঠিন ঠিন বেজে উঠতে শুনেছে রবি। সেই শব্দ শুনে লাটুবাবু উঠে পর্দার আড়ালে চলে যান। ফিসফিস একটু আধটু কথাবার্তা বলে আবার ফিরে আসেন। ব্যস, ওই পর্যন্ত।

শিবের ক্যালেন্ডারটা তুলে মাথায় ঠেকিয়ে লাটুবাবু আবার রবির হাতে দিলেন। বললেন, আবার ফেলো না কিন্তু। সময়টা আমার ভালো যাচ্ছে না। ঠাকুর দেবতার অপমান হলে ফের কুপিত হয়ে বসবেন।

রবি ক্যালেন্ডারটা পেরেকে ঝুলিয়ে নেমে পড়ল। লাটুবাবু আর—একটা পেরেক এগিয়ে দিলেন। বাঁ দিকের দেওয়ালে এবার কালীর ক্যালেন্ডারটা লাগাতে হবে।

রবি নড়বড়ে টুলটায় সাবধানে উঠে সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনার কয় ছেলেমেয়ে লাটুবাবু?

লাটুবাবু এই প্রশ্ন শুনে একটু বিরক্ত হন। অন্দরমহলের খবর বড় একটা শোনাতে চান না কাউকে। একটু বিরস গলায় বললেন, ছেলে আর হল কোথায়? মাগিটা অপয়া, বুঝলে! কেবল মেয়ে বিয়োলো সারা জন্ম।

অল লায়াবিলিটিজ, নো অ্যাসেট।

সন্দেহটা ক্ষুরধার হয়ে উঠছিল রবির। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম রেখে সে জিজ্ঞেস করল, তা হলে আপনার আর কয় মেয়ে বিয়ের বাকি?

রবির সমস্যাটা লাটুবাবু বোঝেন। তাই খানিকটা সান্ত্বনার গলায় বললেন, আর মোটে দু'জন। ভেবো না, চটপট হয়ে যাবে। সেজোজনের জন্য এক ভালো ছেলের খোঁজ পেয়েছি। কথাবার্তাও শুরু হয়েছে। এখন আর—একটু খোঁজখবর নেওয়া বাকি।

রবি কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ রেখে জিজ্ঞেস করে, পাত্রপক্ষের মেয়ে পছন্দ হয়েছে?

লাটুবাবু সান্ত্বনার গলায় বলেন, না, দেখাদেখির স্টেজ এখনও আসেনি। পাকা খোঁজখবর না নিয়ে দেখানোটা ঠিকও নয়। আমাদের পরিবারে বেশি দেখাদেখির নিয়মও নেই কিনা।

ও।—রবি খুব হতাশ হয়। মেয়েটার বিয়ের যত দেরি হবে তত তাকে লেজে খেলাবেন লাটুবাবু। কাজেই মেয়েটার যত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায় ততই ভালো। তাতে লাটুবাবুরও উপকার। রবিরও।

সবশেষে বুদ্ধদেবের ছবিওলা ক্যালেন্ডারটা ঝুলিয়ে দিয়ে রবি নিজের গরজেই বলল, ঠিক আছে। ছেলেটো সম্পর্কে কী খোঁজখবর করতে হবে বলুন। আমিই খোঁজ নেব।

একথা শুনে লাটুবাবু একটু উজ্জ্বল হলেন। বললেন, নেবে? বাঁচি তা হলে। বড় দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি। শুনেছি, ছেলেটা একসেপশনাল। শুধু চরিত্রটা যদি ভালো হয় তা হলে আর চিন্তার কিছু থাকে না।

রবির আজকাল বাস্তববোধ বেড়েছে। বিনীতভাবেই জিজ্ঞেস করল, ছেলে তো ভালো, কিন্তু আপনার মেয়ে কেমন?

এবার লাটুবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বলেন, বাপ হয়ে নিজের মুখে আর কী বলব। তবে আমার ছোট ভায়রা ওকে প্রথমে দেখেই বলেছিল, এ যে ঝিলিক! সেই থেকে আমার সেজোমেয়ের নামই হয়ে গেল ঝিলিক।

রবি একথাতেও খুব ভরসা পেল না। বাপেরা বাড়িয়ে বলেই। উপরন্তু এই কট্টর পর্দানশিন বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া হওয়ার কথা নয়। সে বলল, রূপটাই তো বড় কথা নয়। একসেপশনাল ছেলেরা পাত্রীর অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটাও চায়।

লাটুবাবু গদগদ হয়ে বললেন, ঝিলিকের তাও ফেলনা নয়। কলকাতার ছেলেরা সুন্দর মেয়ে দেখলেই পিছুতে লাগে বলে একটু ডাগরডোগর হয়ে উঠতেই আমি ওকে ওর পিসির বাড়ি নাগপুরে পাঠিয়ে দিই। সেখান থেকেই বি এ পাশ করে এসেছে। মেয়ে আমার সবদিক দিয়েই ভালো। কিন্তু ছেলেটি শুনেছি, বড় বেশি একসেপশনাল। যদি এ বিয়েটা দিতে পারো রবি, তা হলে এই বলে রাখলাম, তোমাকে আমি থোক হাজার টাকা দেব।

রবি খুবই চমকে উঠল। তার হৃৎপিণ্ড ধকধক করতে লাগল। মুখে দেখা দিল রক্তোচ্ছ্বাস। তবু নিজেকে সামাল রেখে সে এই পরিস্থিতিতে একটু ব্যবসা—বুদ্ধি খাটাল। বলল, মোটে!

এমন অভিমান ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল যে, লাটুবাবু ফের লজ্জা পেয়ে বললেন, আচ্ছা, দু'হাজার!

রাহাখরচ বাবদ লাটুবাবু নগদ দশটা টাকাও দিলেন।

।। **দুই** ।।

রবির সঙ্গে যে আমার নিরন্তর বনিবনার অভাব তার আর—একটা কারণ, রবির ওই ভেজা ন্যাতার মতো চরিত্র। সে কানে শুনল যে, ঝিলিক সুন্দরী এবং বি এ পাশ, তবু তার মনের মধ্যে কোনও ভুড়ভুড়ি কাটল না, দোলা লাগল না। পুরো ব্যাপারটাকেই সে একটি অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করতে লাগল। ঝিলিকের এই জায়গায় বিয়ে হলে সে লাটুবাবুর কাছ থেকে দু'হাজার টাকা পাবে। ফালতু টাকাও নয়, তার বাবার দেওয়া দাদনেরই খানিকটা। তবু তার চতুর্থ শ্রেণির মানসিকতা সেই সম্ভাব্য টাকার চারদিকেই চক্কর খেতে লাগল। যেন—বা সে লটারিই পাবে।

এমন নয় যে, রবি পুরুষত্বহীন। আবার এমনও নয় যে, সে সাধু চরিত্রের লোক। তবু এই ভরা যৌবনবয়সেও রবি যে যুবতীদের কথা ভাবে না, তার কারণ, ভাবার মতো জোর পায় না সে। রবি ধরেই নিয়েছে, তার চাকরি বাকরি ব্যবসা বা বিয়ে কিছু হবে না। বিশ্বভরা যুবতীদেরও সে তাই গ্রহান্তরের মানুষ বলে মনে করে। যে সমস্যাটা যখন রবির সামনে আসে তখন সে সেইটে নিয়েই এত বেশি ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে, জীবনের অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো তার মনে স্থান পায় না। তাই ঝিলিকের চেয়েও ঝিলিকের বিয়ে এবং লাটুবাবুর দু'হাজার টাকা তার কাছে এখন অনেক বেশি গুরুতর। সে তাই নিয়েই ভাবতে লাগল।

নিয়মিত দাড়ি কামালে এবং পরিষ্কার ইস্তিরি করা পোশাক পরলে রবিকে খারাপ দেখানোর কথা নয়। তাদের পরিবারের সুন্দর বলে খ্যাতি আছে। কিন্তু নিজের এই দিকটা সম্পর্কে সে কদাচিৎ সচেতন। সর্বদাই নানা রকম ভয় ভীতি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে থাকে সে। দাড়িটা কামানো বা ফরসা পোশাকটা পরার প্রয়োজনই সে অনুভব করে না। যৌবনবয়সেই জীবনের এইসব বাহুল্য সম্পর্কে সে অনুভব করে না। উত্তর কলকাতার একটি কো—এডুকেশন কলেজে পড়ার সময় তার ওই উলোঝুলো পোশাক, না—কামানো দাড়ি ও না—আঁচড়ানো চুলের জন্য সহপাঠী ও সহপাঠিনীরা তার নাম দিয়েছিল বোমভোলা। কলেজের ক্লাসে রবি বসত পিছনের বেঞ্চে। একটু জড়সড় থাকত। প্রত্যেকের প্রতিই শ্রদ্ধাভীতি প্রদর্শনের জন্য ছাত্র ও ছাত্রীমহলে তার জনপ্রিয়তা ছিল। সবাই রবিকে পছন্দ করত। কারও সঙ্গেই তার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা ছিল না। কী করে থাকবে? মেধাবী ছাত্র বা সুন্দরী ছাত্রীরা সবাই যে গ্রহান্তরের মানুষ। আর বেশিরভাগই অ্যাটাকের খেলোয়াড়।

তার ক্লাসে অন্তত পাঁচজন সুন্দরী মেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে জনা তিনেক দুর্দান্ত সুন্দরী। দুর্দান্তদের একজন রেশমী বসু। তার গায়ের চামড়ার নীচে কী কৌশলে যে ঈশ্বর ফ্লুরেসেন্ট আলো ফিট করেছিলেন তা কে জানে! কিন্তু সেই ল্যাম্প আলো দিত। আর ওই মুখখানা কুঁদে তৈরি করতে ব্রহ্মার বিস্তর মেহনত গেছে, সন্দেহ নেই। রেশমী গড়পড়তা বাঙালির সৌন্দর্যবোধের চরম সীমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সুন্দরী মেয়েরা বোকা হয় বলে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে। রেশমীর মধ্যে বোকামি, মেয়েলিপনা, সংকোচ বা জড়তার লেশমাত্র ছিল না। সব ছেলের সঙ্গেই সে হই—হুল্লোড় করত। এমনকী রবির সঙ্গেও। রবি তার দিকে তাকাত ঠিকই, কিন্তু তার বুকে কখনও সুড়সুড়ি উঠত না। মুখে দেখা দিত না রক্তোচ্ছ্বাস। আসলে সেই সময়েই কালীকাকার পরামর্শে চার রকম ব্যবসায় টাকা ঢেলে তাদের একের পর এক ভরাডুবি ঘটছে। তারা গরিব থেকে গরিবতর হয়ে যাচ্ছে। আশুতোষ সর্বজ্ঞর স্ট্রোক হল সেই সময়ে। আর ঠিক সেই সময়েই লাটুবাবু হিমঘর থেকে উদ্ধার করা অসমাপ্ত ফিলম 'প্রিয়ার মন' শেষ করে তিনটে হলে রিলিজ করলেন।

ঘটনাটি ঘটল এই 'প্রিয়ার মন' দেখতে গিয়েই। ফিলমের ব্যবসায় তার নামে টাকা ঢালা হয়েছে, সুতরাং রবির উদ্বেগ যথেষ্টই ছিল। কিন্তু 'প্রিয়ার মন'—এর পিছনে তাদের অবদান কতটা তা সে কাউকেই বলেনি।

সেদিন দারুণ বৃষ্টি। রবি ভিজে ভিজে একহাঁটু জল ভেঙে কলেজে গিয়ে দেখল, কলেজ প্রায় ভোঁ ভাঁ। প্রফেসরদের ঘর খাঁ খাঁ করছে। দু'—চারটি ভেজা ছেলেমেয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে হা হা হি হি করে যাচ্ছে। রবিকে দেখে তারা সোল্লাসে চেঁচাল, বোম ভোলানাথ আজ আসবেই আমরা জানতুম! ও তো টেরই পায় না কখন বৃষ্টি নামল বা রোদ উঠল।

রবি অর্থাৎ আমি একটু লজ্জা পেলাম। কথাটা মিথ্যেও নয়। 'প্রিয়ার মন' আমাকে এতই উদ্বিগ্ন রেখেছে যে, ছাতাটা পর্যন্ত নিয়ে বেরোতে মনে ছিল না। যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোড় অবধি এসেছি তখন বাড়ির ঠিকে ঝি ছুটে এসে ছাতা দিয়ে গেল।

দু'—চারটে ছেলেমেয়ের মধ্যে সেদিন রেশমীও ছিল। আর সেদিন রেশমী ঠিক অন্য দিনের মতো উচ্ছল ছিল না। কেমন যেন একটু উচাটন হাবভাব। আমাকে দেখে কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেল। আমার গালে সেদিন প্রায় দিন সাতেকের বাসি দাড়ি। গায়ে একটা আধময়লা আধভেজা বোতামহীন ডোরাকাটা শার্ট এবং মোটা ধুতি। পায়ে ঠনঠনের সস্তা চপ্পল। ভিজেটিজে সেদিন বোধহয় শ্রী আরও খোলতাই হয়েছিল।

কিছুক্ষণ আড্ডা মারার পরই একে একে সবাই কেটে পড়তে লাগল। বৃষ্টির তোড়ও কমে এল ধীরে ধীরে। শেষ অবধি রয়ে গেলাম আমি আর রেশমী। ঠিক রয়ে গেলাম নয়। রেশমী আমাকে চোখের ঠারে থেকে যেতে ইঙ্গিত করেছিল। কেন, কে জানে। হয়তো নোট—টোট টুকে দিতে বলতে বা রিকশা ডেকে দিতে ফরমাশ করবে। রেশমীর ছোটখাটো ফরমাশ আমি খেটেছিও।

সবাই চলে যাওয়ার পর রেশমী সেদিন বলল, চলো, বৃষ্টি থেমেছে। দুজনে আজ একটু ইচ্ছেমতো ঘুরি।

ঘুরবে? রাস্তায় যে হাঁটুজল!

রেশমী তার দিঘল চোখে ছদ্ম বিস্ময়ভরে তাকিয়ে বলল, তুমি বুঝি জল—কাদাকে ভয় পাও?

নাঃ। আসলে তোমার কথা ভেবে বলছিলাম আর কী! যা দামি শাড়ি পরেছ একখানা, নষ্ট করবে।

তোমার সঙ্গে আজ আমার সিরিয়াস একটা কথা আছে রবি। আজকের মতো দিন আর পাব না। চলো।

আমার সঙ্গে কারও সিরিয়াস কথা থাকতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। তবু বললাম, কোথায় যাবে?

সেটা বাইরে বেরিয়ে ঠিক করব। চলো, আজ অনেক কথা বলব তোমার সঙ্গে।

আমি অর্থাৎ রবির এইসব সাংকেতিক কথায় তেমন কিছু মনে হল না। একবারও সে ভাবল না, রেশমী হৃদয়ঘটিত কোনও বন্ধনে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চাইছে। বরং সে ভাবল, রেশমী আজ তাকে নিশ্চয়ই তার লেটেস্ট প্রেমের ঘটনাটা শোনাবে, যা রবিকে প্রায়ই অন্যান্য মেয়েদের কাছে শুনতে হয়।

দুজনে বেরোল এবং জলকাদা ভেঙে শ্যামবাজার মুখো হাঁটা দিল। হাঁটতে হাঁটতে বাস্তবিকই রেশমী গুনগুন করে মেলা কথা বলছিল। আবোল—তাবোল কথাই। রবিকে বার দুই জিজ্ঞেস করল, তার বাড়িতে কে কে আছে। তার ভাইবোনরা কীরকম। তারা কি খুব ধর্মভীরু? খুব রক্ষণশীল?

রাস্তায় সেদিন সারি সারি ট্রাম থেমে আছে। ট্রামের জটে থেমে আছে বাস ট্যাকসি ও প্রাইভেট কার। রাস্তায় তেমন লোক নেই।

আকাশে আরও ঘনঘোর মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। চড়বড় করে বৃষ্টিও শুরু হল হঠাৎ।

দুজনে দৌড়ে গিয়ে যে সিনেমাহলের লবিতে উঠল, আশ্চর্য! আশ্চর্য! সেইটেতেই চলছিল 'প্রিয়ার মন'।

লবি একদম ফাঁকা। রবি খুবই অবাক হয়ে দেখল, টিকিটের কাউন্টারে একটি লোকও নেই। একটা ভোমা মাছি এ কাউন্টার থেকে ও কাউন্টারে উড়ে উড়ে বসছে। বুকিং ক্লার্ক ঢুলছিল বসে বসে। রবি শুনেছিল, ছবিটা তেমন চলছে না। কিন্তু এতটাই যে চলছে না তা তার ধারণা ছিল না। প্রিয়ার মন তাকে এত উদ্বিগ্ন করে তুলল যে, লক্ষই করল না বৃষ্টির জন্য মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে যে ঘোমটাটি দিয়েছিল রেশমী, সেই ঘোমটা এখনও নামায়নি। এবং রেশমী রবির দিকে চেয়ে মৃদু ও ইঙ্গিতপূর্ণ একটা রহস্যময় হাসি হাসছিল।

রবিকে গাড়ল বললে প্রকৃত গাড়লদেরও অবমাননা হয় তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবু রবিকে আমি ততটা দোষ দিই না। রেশমী যে তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এটা মনে করার মতো কোনও কারণও তার ছিল না। গ্রহান্তরের মানুষেরা গ্রহান্তরের মানুষকেই প্রশ্রয় দেবে এটাই তো স্বাভাবিক। রবির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কীসের?

হঠাৎ রেশমীই বলল, ছবিটা দেখবে?

রবি 'প্রিয়ার মন' একবার দেখেছে। খুবই কষ্ট হয়েছে দেখতে। এক সময়ে তো তার মনে হচ্ছিল, সিটটা পর্যন্ত তাকে ঠেলা দিয়ে বলছে, বাড়ি যাও, বাড়ি যাও, খামোখা জগদ্দলের মতো বসে থেকো না। মানুষের অনেক কাজ থাকে।

রবি তাই নাকটা কুঁচকে বলল, ছবিটা বোধহয় ভালো নয়।

রেশমী হেসে ফেলে বলে, বোকা! ছবি আমরা দেখব না কি? আমরা তো বসে গল্প করব। খারাপ ছবি হলে হল ফাঁকা থাকবে, তাতে আমাদের আরও সুবিধে।

অগত্যা টিকিট কাটা হল। ভিতরে ঢুকে রবি আঁতকে উঠে দেখল, সারি সারি মুণ্ডহীন সিট। যেন একপাল কবন্ধ মরা চোখে চেয়ে আছে পর্দার দিকে। গা—টা একটু ছমছম করে উঠল তার। রেশমীর হাত চেপে ধরে

সভয়ে সে বলে উঠল, চলো চলে যাই।
রেশমী হাত ছাড়িয়ে নিল না। তার মুখে সুগন্ধী একটা শ্বাস ফেলে বলল, এরকমই তো চাইছিলাম। এসো বসি।
সিট দেখানোর লোককে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছিল রবি। অন্ধকার থেকে একটা গমগমে গলা ভেসে এল, যেখানে খুশি বসে যান। কোনও অসুবিধে নেই।
খুব পিছনের দিকে তারা বসল। না, হল একদম ফাঁকা নয়। বসার পর রবি দেখল, সামনের দিকে সস্তার সিটে কিছু লোক আছে। সংখ্যায় তারা নগণ্যই। তবু আছে।
রেশমীর হাত রবি ছেড়ে দিয়েছিল অনেক আগেই। বসবার পর রেশমী আবার রবির হাত ধরল। বলল, রবি, আমি কয়েকদিন ধরে একটা কথা ভাবছি।
নিউজরিল শেষ হয়ে ছবির টাইটেল পড়ছে পর্দায়। উদ্বিগ্ন রবি একটা ঢোঁক গিলে বলল, তাই না কি?
কী ভাবছি জানো?
কী বলো তো!
তোমাকে।
আমাকে!—বিস্মিত রবি হেসে ফেলে বলে, আমাকে নিয়ে আমিই ভাবি না।
কেন ভাবো না?
আমাকে নিয়ে ভাববার মতো যে কিছুই নেই। আমি মোস্ট আনইন্টারেস্টিং।
কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে রেশমী বলে, তোমাকে একথা কে বলেছে?
কেউ বলেনি। আমি জানি।
ছাই জানো।
চড়া মিউজিক দিয়ে টাইটেল শেষ হল। একটা ছাদের দৃশ্য। একটি মেয়ে এলোচুলে ছাদে ফুলের টবে জল দিচ্ছে। আলোর ব্যবহার দেখে মনে হয়, দিনের বেলাই হবে। মেয়েটা যথেষ্ট ভালো দেখতে। জল দিতে দিতে হঠাৎ সে কী ভেবে একটা সূর্যমুখীর টবের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ফুলের সঙ্গে গাল ছোঁয়াল। তারপরই তেড়েমেড়ে উঠে ঘুরে ঘুরে গান ধরল 'মোর হৃদয়ে লাগল দোলা, লাগল দোলা....।' দৃশ্যটা কেটে ক্যামেরা গিয়ে ধরল একটা মেসবাড়ির অভ্যন্তরকে। কয়েকজন যুবক জানালায় ভিড় করে কিছু একটা দেখছে। আসলে দেখছে মেয়েটাকেই। ঘরের অন্যধারে চৌকির ওপর বিছানায় বসে তরুণ নায়ক উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধনা করে যাচ্ছে চোখ বুজে 'রে গা সা..... রে গা সা.....' আর ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। জানালা থেকে একজন তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'সুবীর, কী জিনিস রে! দেখলি না তো! ওফ।' সুবীর একটু বিরক্তির ভাব ফোটাল মুখে, কিন্তু তার 'রে গা সা' অব্যাহত চলতে লাগল। আবার মেয়েটার দৃশ্য। চটুল সুরে মেয়েটা গেয়ে যাচ্ছে। 'এ মন ঝিনুক যদি হয়, আর প্রেম যদি মুক্তোর মতো, তা হলে কী হয়.... তা হলে কী হয়....সেই প্রেম কোনওদিন যায় না ভোলা, যায় না ভোলা....মোর হৃদয়ে লাগল দোলা...'। মাঝে মাঝে নায়কের 'রে গা সা' পাঞ্চ হয়ে যাচ্ছে। প্রথম দৃশ্যটায় অবিরল একবার ছাদ ও একবার মেসবাড়ি এবং দোলা ও রে—গা—সায় ঝুলতে লাগল। রবি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, ছবিটার দোষটা কোথায় হচ্ছে। কিন্তু দোষ যে একটা হচ্ছে তা টের পাচ্ছিল সে।
হঠাৎ সে হাতে চিমটি খেয়ে চমকে উঠে বলল, কিছু বলছ?
অনেকক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছি। কী দেখছ অমন হাঁ করে?
রবি বিরস মুখে বলে, ছবিটা জমছে না, না?
না জমুক, আমাদের তাতে কী? পাশে কোনও মহিলা থাকলে ওরকম অন্যমনস্ক হতে নেই, তাতে মহিলাটি জেলাসি ফিল করতে পারে।
ওঃ জেলাসি! জেলাসির কী আছে তোমার?

পর্দার মেয়েটা কি আমার চেয়ে সুন্দর?
মোটেই না।
তা হলে অমন হাঁ করে তাকিয়ো না।
কিন্তু না তাকিয়েই বা রবি থাকে কী করে? এই ছবিটা তাদের পয়মন্ত মদের ব্যবসার একটা মোটা টাকা টেনে নিয়েছে। ওই যে মেয়েটি নাচছে, ও হচ্ছে ছবির নায়িকা। এই দৃশ্যটা তোলা হয়েছে লাটুবাবুর আগের আমলে। যখন ছবিটা প্রথম তোলা হয়েছিল তখন নায়িকাটি ছিল তন্বী এবং যুবতী। লাটুবাবুর আমলে ছবির বাকি অংশ তোলার সময় নায়িকা আরও নামী, দামি ও মোটা হয়েছে। দেখতে খারাপ নয়, কিন্তু নাচটাই সব ঢিলে করে দিয়েছে। ওই শরীর নিয়ে কি নাচা যায়?
আবার চিমটি খেয়ে রবি চোখ বুজে বলল, দেখছি না।
দেখছ।
মাইরি না।
তবে আমার কথা কানে যাচ্ছে না কেন?
কী বলছিলে আর একবার বলো।
সব কথা কি দু'বার করে বলা যায়?
শুনব কী করে? দু'—দুটো গান চলছে সাইমালটেনাসলি।
তাতেই তো গোপন কথা বলে সুবিধে।
রবি অবাক হয়। গোপন কথা। রেশমীর গোপন কথা তাকে কেন?
রবি নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বলে, এবার বলো।
আমি জানতে চাই তুমি অমন চার্লি চ্যাপলিনের মতো ট্র্যাম্প সেজে থাকো কেন? লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য? তুমি তো আসলে ট্র্যাম্প নও!
রবি চট করে নিজের গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বোকার মতো একটু হেসে বলল, দাড়ির জন্য বলছ?
শুধু দাড়ি বা পোশাক নয়। তোমার কথাবার্তাতেও কনফিডেনসের অভাব। নিজেকে তুমি বড্ড আনইমপরট্যান্ট ভাবো।
রবি একথার জবাব খুঁজে পায় না। কারণ পর্দায় তখন নায়ক জানালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। একা। পিছন থেকে তার পাঞ্জাবিতে অনেকখানি ছেঁড়া জায়গা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ দারিদ্র্য। ক্যামেরা গলা বাড়িয়ে নায়িকার বাড়ির জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। নায়িকা ডিভানে বসে একটা ম্যাগাজিন দেখছে। উর্দিপর বেয়ারা চায়ের ট্রলি নিয়ে ঘরে এসে সেলাম দিল। নায়িকা চা খেতে খেতে মাঝে মাঝে কবজির ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। ঘরে পিয়ানো আছে, মস্ত রেডিয়োগ্রাম আছে। অর্থাৎ নায়িকা বড়লোকের মেয়ে। জিনিসগুলো রবির খুবই চেনা। আসলে তাদেরই বাড়ির জিনিস। শুটিং করতে নিয়ে গিয়েছিলেন লাটুবাবু। হঠাৎ একটা মোটরের হর্ন শোনা গেল বাইরে। নায়িকা চমকে হাতের ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে উঠে পড়ল।
পরের সিনটা জানে রবি। আনমনে বলে ফেলল, এবার ঝগড়া লাগবে।
ঝগড়া?— রেশমী অবাক হয়ে বলল, কীসের ঝগড়া? আমার কথায় তুমি কি রাগ করলে রবি?
রবি বলল, না তো! বাস্তবিকই আমি নিজেকে আনইমপরট্যান্ট ভাবি রেশমী।
তবে ঝগড়ার কথা বললে কেন? আমি কি ঝগড়াটি?
রবি মাথা নেড়ে বলল, মোটেই নয়।
তা হলে?

রবি কী করে বোঝাবে যে, সে রেশমীর কথা বলেনি, নায়ক—নায়িকার কথা বলেছে। বাস্তবিকই ঝগড়ার আয়োজন হচ্ছিল পর্দায়। নায়িকা একটি আধুনিক যুবকের সঙ্গে মস্ত একটা গাড়িতে করে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ দরিদ্র নায়ক মেসবাড়ি থেকে বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রাস্তা পার হওয়ার জন্য পা বাড়াতেই গাড়িটা ব্রেক কষে। এক ঝলক জল ছিটকে এসে লাগে নায়কের গায়ে। নায়িকা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, চোখে দেখতে পান না? আর একটু হলেই মরতেন যে। দরিদ্র নায়ক গম্ভীর মুখে বলল, আমাদের মতো লোকের মরাই ভালো। তিলে তিলে মরার চেয়ে আপনাদের দামি গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরলে বোধহয় তাড়াতাড়ি স্বর্গে পৌঁছোনো যেত। আচ্ছা, আপনারা খুব বড়লোক না? লাটুবাবুর নিজের লেখা সংলাপ। তাঁর ধারণা এই ডায়ালগে হাততালি পড়বেই। কিন্তু পড়ল না।

রবি হতাশ গলায় বলল, গরিব—বড়লোকের ক্ল্যাশটা আরও খেলিয়ে তুলতে পারলে হত।

বলেই খেয়াল হল, কাজটা ঠিক হয়নি। তাই তাড়াতাড়ি অন্য কথায় যাওয়ার জন্য বলল, বুঝলে? ব্যাপারটা কী জানো, তুমি একদম ঝগড়াটি নও। বড়লোকের মেয়েদের যেরকম চড়া মেজাজ থাকে তোমার সেরকম নেই।

রেশমী নূতনতর বিস্ময়ে বলে, তা হলে গরিব—বড়লোকের ক্ল্যাশের কথাই বা আসছে কেন? তুমি যতই ক্যামোফ্লেজ করে থাকো না কেন রবি, আমি জানি তুমিও ভীষণ রিচ ফ্যামিলির ছেলে।

কিন্তু ততক্ষণে উদ্বিগ্ন ও অন্যমনস্ক রবি চোরচোখে পর্দার দিকে তাকিয়েছে। পর্দায় নায়িকা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, অন্তত আপনার মতো ভ্যাগাবন্ড নই। নায়ক দৃঢ় গলায় বলে উঠল, ঐশ্বর্য আর সম্পদের পাহাড় আপনাদের দৃষ্টিশক্তিকে আড়াল করে রেখেছে। তাই রাস্তার ভ্যাগাবন্ডগুলোকে আপনারা দেখেও দেখেন না। ঠিক এই সময়ে স্টিয়ারিং হুইলে বসা নায়িকার প্রেমিক ও এই ছবির প্রতিনায়ক বলে উঠল, ওসব বাজে লোকের সঙ্গে কথা বলছ কেন রিনি? চলো, পার্টিতে দেরি হয়ে যাবে।

রিচ?— রবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমরা হয়তো একসময়ে রিচ ছিলাম রেশমী। এখন আর নই।

কেন, কী হয়েছে?

সে অনেক কথা।

রেশমী আবার হাত বাড়িয়ে তার হাত মুঠো করে ধরে বলে, রিচ নাই বা হলে। তুমি যেমনটি আছো চিরকাল তেমনটিই থাকো। তা হলেই হবে।

কী হবে রেশমী?

একটা কিছু হবে রবি। বড্ড বোকা—বোকা ভান করো তুমি। বুঝতে চাও না।

এতটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের পরও যে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না তাকে গাড়ল না বলে রবি সর্বজ্ঞ বলাই কি ভালো নয়! আমার তো মনে হয়, কাউকে খুব অপমান করতে হলে তাকে রবি সর্বজ্ঞ বলে অভিহিত করলেই যথেষ্ট অপমান করা হয়। পৃথিবীতে একটা নতুন গালাগাল চালু হোক, রবি সর্বজ্ঞ।

বাস্তবিকই রবি ইঙ্গিতটা ধরতে পারল না। তার অবশ্য আর—একটা কারণও আছে। কী কারণে জানি না, পর্দার নায়িকা হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে নায়কের গালে একটা চড় কষাল ঠিক সেই সময়ে, যখন রেশমী ওই অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ ও উত্তেজনাকর ইঙ্গিতটি করছিল। রবি মাথা নেড়ে বলল, এরকম থাপ্পড়ের কোনও মানে হয় না। বাড়াবাড়ি।

রেশমী হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খামচে ধরল বুকের জামা। ফোঁপানির মতো একটা শব্দ করে বলল, তুমি আমার কথা শুনছ না! শুনছ না! কেন? কেন? কেন ইমপরট্যান্স দিতে চাইছ না আমাকে? কেন তুমি এরকম?

রবির মাথাটা তখন টাল খাচ্ছিল। পর্দার ছবি ও রেশমীর মধ্যে সে কোনও ভারসাম্য আনতে পারছে না। কিন্তু সে হঠাৎ বুঝতে পারছে, রেশমী একটা গভীর কথা বলতে চায়। যে কথা উড়িয়ে দেওয়ার নয়, উপেক্ষা

করার নয়। কিন্তু তার মনের ওপর হীনমন্যতার যে পলিমাটির স্তর তা ভেদ করে রেশমীর পঞ্চশর কিছুতেই বিঁধতে চাইছিল না। তাই রেশমীর আক্রোশ ও আক্রমণে সে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

পর্দায় তখন পার্টির দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। নায়িকা পিয়ানোয় বসে গান গাইছে। দুঃখেরই গান। তবে মিউজিক বড্ড বেশি চড়া। নায়িকা গাইছে, এই দুনিয়ায় ধনী দরিদ্র বলে কিছু নেই, আছে শুধু মানুষ মানুষ মানুষ.....হৃদয়ের চেয়ে টাকা বড় নয়, প্রেম যে সোনার চেয়ে দামি...

রেশমী তার মুখে উপর্যুপরি সুগন্ধী শ্বাস ফেলে বলে, কেন তুমি আমাকে পাত্তা দাও না?.....আমি কি খারাপ? বলো.... বলো...

রবির মাথাটা তখনও চক্কর দিচ্ছিল। কোনও জবাব আসছিল না মুখে। রেশমীর আক্রমণের ঝাঁঝ একটু কমে এলে সে আস্তে করে বলল, আমি খুব গরিব রেশমী, খুব সামান্য। আমাদের পরিবারের একটা বিরাট অধঃপতন ঘটে যাচ্ছে।......ওই যে দেখো, ওই যে পিয়ানোটা। ওটা আমাদের। লাটুবাবু শুটিং করতে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেননি। যা কিছু আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তা আর ফিরে আসছে না। এই গল্পের শেষটা আমি জানি। ওই পিয়ানোটা বাজিয়েই নায়ক—নায়িকা শেষ দৃশ্যে ডুয়েট গাইবে। কিন্তু আমাদের পিয়ানোটা.....

বদ্ধ উন্মাদের দিকে মানুষ যেরকম আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তেমনি হলঘরের প্রায়ান্ধকারে তার দিকে চেয়ে ছিল রেশমী। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলল, তুমি ওই ছবিটা দেখছিলে? আর আমি.....আর আমি যে এতক্ষণ কত আশা নিয়ে.....ছিঃ রবি, ছিঃ.....

রেশমী ঝাঁ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘূর্ণিঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল হল থেকে।

আহাম্মক রবি তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল ঠিকই, কিন্তু রিফ্লেকস কম বলে বাইরের ভিড়ে আর রেশমীকে খুঁজে পায়নি। কিন্তু তারপর অনেকদিন ধরে ব্যাপারটা ভেবে দেখেছে সে। কী একটা যেন ঘটতে যাচ্ছিল। হায়, সেটা ঘটল না। রেশমীকেও পরে বহুবার জিজ্ঞেস করেছে রবি। রেশমী মৃদু হেসে বলেছে, ও কথা থাক। হিপনোটিজমটা কেটে গেছে।

ঘটনার মাত্র আট—ন'মাস বাদে, বি এ পরীক্ষার পরই রেশমীর বিয়ে হয়ে যায়। তারও প্রায় মাসখানেক বাদে একদিন রবি বুঝতে পারে, খুবই প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পারে যে, রেশমী একদা তার প্রেমে পড়েছিল। অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটার আর কোনও মানে হয় না।

তাই একদিন রবি ব্যস্তসমস্ত হয়ে রেশমীর শ্বশুরবাড়িতে হানা দিল।

রেশমী, তুমি কি আমাকে—মানে আমার প্রেমে পড়েছিলে?

হ্যাঁ গো বুদ্ধ! বুঝতে এতদিন লাগল?

ইস! সেদিন কেন স্পষ্ট করে বলোনি?

যথেষ্ট স্পষ্ট করে বলেছিলাম, যতদূর বেহায়া আর নির্লজ্জ হতে হয় ততদূর হয়েছিলাম। তুমি তবু বুঝলে না। 'প্রিয়ার মন' তোমার মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছিল সেদিন।

রবি ধপাস করে একটা সোফায় বসে নিজের মাথা চেপে ধরল এবং অনেকক্ষণ দুঃখে ও শোকে ''উঃ উঃ'' করল।

রেশমী নরম গলায় বলল, দুঃখ কোরো না। ঠিক এই জন্যই বোধহয় তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তুমি তো ঠিক নরম্যাল ট্র্যাকে চলো না। বলতে নেই, তোমার প্রতি আমার এখনও বড় মায়া। মাঝে মাঝে ভাবি, আহা রবিটার কী হবে! কে ওকে দেখবে। পৃথিবীতে ওরকম বোকার যে গতি হয় না!

ভাবো! সত্যি ভাবো, না বানিয়ে বলছ!

সত্যিই ভাবি। আমার মতো তোমাকে নিয়ে আর কেউ এত ভাবে না।

সিঁদুর পরা রেশমীর দিকে চেয়ে রবি বলল, তবে কি আজও—?

রেশমী মৃদু একটু হেসে বলল, খুব সিয়োর নই। হয়তো—

সেই 'হয়তো' আজও ঝুলছে।

।। তিন ।।

রবি সর্বজ্ঞর সমগ্র জীবনটাই, অর্থাৎ এই যৌবন বয়স পর্যন্ত, ওই 'হয়তো' কথাটার ওপর নির্ভরশীল। সে নিজে কিছুই গড়ে তোলে না, কিছুই ঘটায় না। ঘটনার মাঝখানে মাঝে মাঝে পড়ে যায়। তখন খুবই ঘুরপাক খেতে হয় তাকে। তার বুঝতে দেরি হয়, সিদ্ধান্ত নিতে আরও দেরি হয়।

রুদ্রাক্ষ সেন সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পর সাতদিন বাদে লাটুবাবু একদিন বললেন, খবর ভালো নয় হে!

কেন লাটুবাবু?

ছোকরার পরিবার তেমন গা করছে না।

কেন গা করছে না?

ছোকরার জন্য মোট বারোটা মেয়ে বাছাই করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন কেমিক্যাল বায়োলজিস্ট মেয়েও আছে। কানাডায় থাকে।

বলেন কী?—রবি যথেষ্ট অবাক হওয়ার চেষ্টা করে।

আর বলি কী? মেয়েরা যে কেন এত বেশি লেখাপড়া শিখতে যায়!

সে তো বটেই।—ব্যক্তিত্বহীন রবি অতঃপর বঙ্কিমের একটা কোটেশন হুবহু মুখস্থ বলে লাটুবাবুকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, স্ত্রীলোকের বিদ্যা নারিকেলের মালার মতো। কখনও আধখানা বই পুরা দেখিলাম না।

কিন্তু লাটুবাবু সে কথায় কান না দিয়ে বিষণ্ণ গলায় বলেন, আমার ঝিলিক আছে বারো নম্বরে। কিন্তু অতদূর কি আর গড়াবে?

অন্য পাত্র দেখব?

আরে দূর! সে তো উপায় না থাকলে দেখতেই হবে। কিন্তু এ ছোকরা ছিল সত্যিকারের ব্রিলিয়ান্ট। বিয়েটা লাগাতে পারলে জাতে উঠে যেতাম।

রবি একটু ভেবেচিন্তে বলে, সে অবশ্য ঠিক কথা।

লাটুবাবু আরও বিষণ্ণ হয়ে বলেন, ওদের খাঁইটাও একটু বেশি। নগদই দশ—পনেরো হাজার চায়। তার ওপর সোনা এবং অন্যান্য।

দশ—পনেরো! বলেন কী!

তাতেও আমি রাজি। ঝিলিকের জন্য লাখ টাকার রিস্কও নেব। কিন্তু বারো নম্বর পর্যন্ত কি গড়াবে? তোমার কী মনে হয়?

নগদ দশ—পনেরো হাজার শুনে রবি সেই ছোকরার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে। লাখ টাকার কথা শুনে লাটুবাবুর প্রতিও তার শ্রদ্ধা হতে থাকে। রবি ভেবেচিন্তে বলল, গড়াবে না এমন কথাও বলা যায় না। ওরা হয়তো বারোজনকেই দেখে তারপর সিলেক্ট করবে।

চিন্তিত লাটুবাবু বললেন, সে তো বুঝলাম। কিন্তু এই বারোজনের কেউ তো ফ্যালনা নয়। সারা দেশ ঢুঁড়ে ছাঁকা ছাঁকা সব মেয়ে বেছেছে। লেখাপড়ায় যেমন, দেখতে শুনতেও তেমন। জনা দুই রেডিয়োতেও গান—টান গায় শুনেছি। ঝিলিক কি ওদের সঙ্গে পারবে? তোমার কী মনে হয়?

রবির নাকের ডগায় ঝোলানো দু'হাজার টাকার বান্ডিলটা দুলতে দুলতে দূরে সরে যেতে থাকে। সে বিরসবদনে বলে, এত কমপিটিটার তা আগে বলতে হয়। আপনার মেয়ে আর সকলের সঙ্গে পারবে কিনা তাই বা বলি কী করে? আপনার মেয়েকে তো এখনও আমি চোখে দেখিনি।

আহা, একটা আন্দাজ তো করতে পারো, তোমার সিক্সথ সেন্স কাজ করে না?

রবি একটু রেগে গিয়েই বলে, আমার সিক্সথ সেন্স দু'তরফেই মাথা নাড়ে। হ্যাঁ—ও বলে, না—ও বলে।

তার মানে?

বলছি তো, আমার সিক্সথ সেন্সকে বিশ্বাস নেই। আগে বলুন আপনি ম্যাকসিমাম কত টাকা ঢালতে রাজি?

বললাম তো লাখ টাকাতেও পিছোব না। কিন্তু তাতে কী! আজকাল লাখ—দু'লাখ বহু লোকের হাতের ময়লা। ওই বারোজনের বারোটা বাবাই হয়তো বারোজন কোটিপতি।

বাঙালি কোটিপতির সংখ্যা অত হবে না।

তোমাকে বলেছে!— লাটুবাবু একটা ধমক দেন, কোটিপতি আজকাল ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসেও পাওয়া যায়। ওটা কোনও ভরসার কথা নয়। ভরসা পাই এমন কথা বলো।

লাখ থেকে কোটির সংখ্যায় পৌঁছে রবির মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করছিল। সে নেশাগ্রস্তের মতো মদির চোখে চেয়ে বলল, আপনি তিন হাজারে উঠুন।

তিন হাজার কী বলছ? বললাম যে লাখেও রাজি! শুধু লাগিয়ে দাও।

না, না। আমি আমার শেয়ারটার কথা বলছিলাম। যদি লাগাতে পারি তা হলে।

ওঃ, তোমার শেয়ার!— লাটুবাবু বিস্ময়ভরা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, সেটা কোনও প্রবলেম নয়। আগে লাগাও, তিন কেন পাঁচ দেব।

দেবেন? আপন গড?—রবি উত্তেজনায় প্রায় লাটুবাবুর হাত চেপে ধরেছিল আর কী!

লাটুবাবু চট করে হাত দু'খানা সরিয়ে নিয়ে বললেন, আহা অত ইমোশন্যাল হও কেন? তোমার তো হক্কের টাকা।

কিন্তু সে কথা ভাবছিল না রবি। সে ভাবছিল দেশটার কথা। লাখ বা কোটি যখন আর অনেকের কাছেই কোনও সমস্যা নয় তখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে একটা বিপুল উন্নতি ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অঘটন কবে এবং কখন এবং কীভাবে তার অগোচরে ঘটে গেল তাই সে অবাক হয়ে চিন্তা করছিল। নিজের জীবনে অর্থনৈতিক গতিটা নিম্নগামী হওয়ার দরুন কি সে সমাজের দেহে এই উন্নতির লক্ষণগুলি ভালো করে লক্ষ করেনি?

তাই হবে। আশু সর্বজ্ঞ তাঁর চারটে ব্যবসা চার ছেলের নামে আলাদা করে দিয়ে যান। মরার আগে আর সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ফুরসৎ পাননি। একমাত্র বড় ছেলে মহীতোষ সর্বজ্ঞ লায়েক হয়েছে তখন। তার বিয়েও দিয়েছে। মহীতোষের শ্বশুর বিষয়বুদ্ধিতে পাকা মাথার লোক। নিউ ভেঞ্চার পছন্দ করেন না। তাঁর পরামর্শে মহীতোষ মদের ব্যবসাটা নিজের নামে নিয়েছিল। মদের ব্যবসাটা পুরোপুরি একজনকে দেওয়ার ইচ্ছেও আশুতোষের ছিল না। কিন্তু তাঁর পড়ন্ত সময়ে ওই বেহাই—অর্থাৎ মহীতোষের শ্বশুর তাঁকে বিস্তর সাহায্য করেছিলেন। সেই সুবাদে তাঁর পরামর্শের দাম বেড়েছে তখন। তবে মহীতোষকে হাতে ধরে আশুতোষ অনুরোধ করেছিলেন, তোমার ভাইদের যেন ভাত কাপড়ের অভাবটা না হয়। ব্যবসা তোমার নামে আছে থাক, কিন্তু ওদেরও বঞ্চিত কোরো না।

মহীতোষ বাপের কথাটা রাখেনি। এ ব্যাপারে তার যুক্তি খুব সাদামাটা এবং জোরালো। আশুতোষের মৃত্যুর পর সে তার ভাইদের পরিষ্কার বলে দিল, বাবা তাঁর সব ক্যাপিট্যাল চারভাগে ভাগ করে চারটে ব্যবসাতে লাগিয়েছিলেন। তোমাদের ব্যবসা ফেল করেছে তার জন্য আমি দায়ী নই!

এর ওপর আর কথা চলে না। ঝগড়াঝাটি অবশ্য বিস্তর হয়েছিল। কিন্তু পৈতৃক এবং বংশগত মদের ব্যবসা মহীতোষের হাতেই চলে গেল। তবু কিছুদিন মহীতোষের সঙ্গে পৈতৃক বাড়িতে একান্নবর্তী থাকতে পেরেছিল তারা। তখনও ভাত কাপড়ের অভাব তেমন দেখা দেয়নি। কিন্তু সে মাত্র বছর দুইয়ের জন্য। তারপরই মহীতোষ পৈতৃক বাড়ি ভাগাভাগির প্রস্তাব দিল এবং সেই প্রস্তাব কার্যকরও হল। নিজের অংশটা দেয়াল তুলে একদম আলাদা করে নিল মহীতোষ এবং সেই অংশকে ঘষে মেজে সংস্কার করে নিল। চরম উদারতার পরিচয় দিয়ে নিজের মাকেও আশ্রয় দিতে চেয়েছিল সে। তবে সেই প্রস্তাবে মা রাজি হননি। বেঁচেও ছিলেন না বেশি দিন। তখন থেকে যে অর্থনৈতিক অবনতি আরম্ভ হল তার পাল্লায় পড়ে আর রবি

চারদিককার সমাজব্যবস্থার এই দ্রুত উন্নতি লক্ষ করার অবকাশ পায়নি। মেজদা সর্বতোষ কিছুকাল বেকার ও উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করার পর হঠাৎ মধ্যপ্রদেশের এক খনিতে চাকরি পেয়ে চলে যায়। পরের জন অর্থাৎ ছোড়দা যিশুতোষ ভাগ্যদোষে কিছু দুর্বল প্রকৃতির লোক হওয়ায় পরিবারের এই হঠাৎ পতনের ঘটনাটি সহ্য করতে পারেনি। প্রথমদিকে বিড়বিড় করত। তারপর কিছুদিন চুপচাপ থাকতে লাগল। মা মরে যাওয়ার মাস ছয়েক বাদে একদিন ভোরে গঙ্গাস্নানে গিয়ে আর ফিরল না। মাইলখানেক ভাঁটিতে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। মহীতোষ খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে সর্বতোষের বাড়ির অংশ কিনে নিয়েছিল। যিশুতোষের ওয়ারিশান বলতে তারা তিন ভাই। কিন্তু মহীতোষ রবির দাবির কথা ভুলে গিয়ে যিশুতোষের অংশটাও নিয়ে নিল। রবি এখন সেই বাড়ির পিছনের দিককার দু'খানা খুপরি নিয়ে আছে। ঘরগুলো হয়েছিল চাকর—বাকরদের থাকার জন্য। বাড়ি ভাগাভাগির সময় মহীতোষ সেই ঘরগুলোর হিসেব ধরে।

বলা বাহুল্য মহীতোষ অ্যাটাকের খেলোয়াড়। এখন সে নানাভাবে চেষ্টা করছে যাতে রবি বাড়িটা ছেড়ে দেয়। বছরখানেক আগে থেকেই চেষ্টা শুরু হয়েছে। একদিন মহীতোষ হুট করে এসে ঘরে ঢুকে চারদিক দেখে টেখে নাক কুঁচকে বলল, এঃ এ যে একেবারে চাকর—বাকরদের ঘর করে তুলেছিস। তা এই এঁদো ঘরে তোর পড়ে থাকার দরকার কী?

রবি সঙ্গে সঙ্গে ডিফেনস নিয়ে বলল, কোথায় যাব?

মহীতোষ খুব সমবেদনার সঙ্গে বলে, তুই তো আর আমার ফ্যালনা নয়। সামনের দিকে গ্যারেজের ওপরে যে ঘরখানা করেছি সেখানে গিয়ে থাক না। আলো হাওয়া আছে। এ ঘরে বেশিদিন থাকলে যে যক্ষ্মা হয়ে যাবে। বরং এখানে একটা সেলার মতো করা যায়।

সেলার অর্থাৎ মদের গো—ডাউন হোক তাতে রবির আপত্তি নেই। কিন্তু মহীতোষের ওপেনিং গ্যামবিটটা বুঝতে পারছিল না সে। মিনমিন করে সে বলল, এটা তো আমার অংশ, এখানে সেলার হবে কী করে?

মহীতোষ খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, তোর অংশ তো কী হয়েছে? বরং কয়েক হাজার টাকা দিচ্ছি, লিখে দে। টাকাটা নিয়ে ব্যবসা—ট্যাবসা করতে পারবি। বসেই তো আছিস।

রবি কথাটায় সায় দেয়নি। না দিয়ে ভালোও করেনি খুব একটা।

কয়েকদিনের মধ্যেই মহীতোষ স্ট্র্যাটেজি বদলাল। হঠাৎ একদিন মহীতোষের চাকর এসে ট্রেতে করে কিছু সুস্বাদু খাবার পৌঁছে দিয়ে গেল রবিকে। বলল, বউদিমণি পাঠিয়েছে।

রবির সন্দেহপ্রবণ মন। মাংসের বাটি থেকে একটুকরো মাংস এবং একমুঠো ফ্রায়েড রাইস নিয়ে সে আগে একটা কাককে খাওয়াল। দেখল, কাকটা মরে কিনা। মরল না দেখে খেল। তারপর থেকে প্রায়ই বউদি এটা ওটা পাঠাতে লাগল। ব্যবস্থাটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ভেবে রবি পাড়া থেকে একটা বেড়ালের বাচ্চা জোগাড় করে আনে। আগে তাকে খাওয়ায়, প্রতিক্রিয়া দেখে, তারপর নিজে খায়।

ক'দিন পর মহীতোষ নিজে এসে বলে, তুই তো একা লোক, দুটো ঘর দিয়ে তোর কী হয়? ও ঘরটা আমি নিচ্ছি। কিছু ভাড়া পাবি।

রবি অ্যাটাকের খেলোয়াড়দের ভয় পায়। প্রথমটায় গাঁইগুঁই করলেও শেষ অবধি রাজি হতে হল। মহীতোষ সে ঘরটার আলমারি—টালমারি বসিয়ে দিব্যি মদের গো—ডাউন বানিয়ে ফেলল। ভাড়ার অঙ্ক কিছু ঠিক হয়নি। তবে মহীতোষ ত্রিশটা করে টাকা দিয়েছিল প্রথম কয়েক মাস। তারপর আর উচ্চবাচ্য করে না।

একদিন রবি মিনমিন করে ভাড়ার কথা তোলায় মহীতোষ বলল, ক'টাকাই বা ভাড়া হয়! তার চেয়ে কিছু থোক টাকা নিয়ে ছেড়ে দে।

রবি জানে, ছেড়ে দিলে সে পথে দাঁড়াবে। সুতরাং ভয়ে সে আর ভাড়ার কথা তোলে না। এখন মদের গো—ডাউন নাকের ডগায় নিয়ে সে থাকে। কিন্তু জানে, বেশিদিন নয়। মদের গো—ডাউন সম্প্রসারিত হয়ে

একদিন আগ্রাসী হাত বাড়িয়ে তার বসবাসের ঘরখানাও কেড়ে নেবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন উঠি—উঠি একটা মানসিকতা নিয়ে সে ঘরখানা আঁকড়ে আছে মাত্র।

নিজের অস্তিত্বের এই সংকটই সম্ভবত তাকে এতদিন সমাজ দেশ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে অন্ধ করে রেখেছিল। লাটুবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে এক নতুন চোখে চারদিকটাকে দেখার চেষ্টা করল। তার মনে হচ্ছিল চারদিকটাই লাখোপতি কোটিপতি লোকে গিজগিজ করছে। বাইরে থেকে অতটা বোঝা যায় না বটে।

।। চার ।।

আমার হীনমন্য স্বভাবের দরুন ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমি সহজে মিশতে না পারলেও নিম্নশ্রেণির লোকদের সঙ্গে আমার চট করে ভাব হয়ে যায়। নিম্নশ্রেণির অধিকাংশ মানুষই আমার মতো ডিফেনসের খেলোয়াড়। কোনও অফিসে ঢুকে আমি সাহেব বা বড়বাবুদের কাছে যেতে ভরসা পাই না। আরদালি, পিয়োন বা বড়জোর কেরানির দ্বারস্থ হই। আমার এই স্বভাবের ফলেই বড়দার চাকর রাখালের সঙ্গে আমার চট করে ভাব হয়ে গিয়েছিল।

বলতে দ্বিধা নেই তার মালিকের ভাই হওয়া সত্ত্বেও আমাকে রাখাল তার চেয়ে উঁচু শ্রেণির মানুষ বলে মনে করে না। বোধ করি সেইজন্যই আমার প্রতি সে একটু অনুকম্পাও বোধ করে।

বউদি এখনও খাবার পাঠায়। রোজ না হলেও সপ্তাহে দিন দুই—তিন তো বটেই।

সেই খাবার পৌঁছে দিতে আসে রাখাল। বড়দা মহীতোষ যে আমার শত্রুপক্ষ সেটা রাখাল চট করে বুঝে ফেলেছে। খাবার পৌঁছোতে এসে সে তাই দু'দণ্ড বসে কথাবার্তা কয়। তার একটা পেটেন্ট কথা হল, দাদাবাবু, এই শত্রুপুরী ছেড়ে কেটে পড়ো। দুনিয়ায় কি পুরুষমানুষের জায়গার অভাব?

কোনও কোনও পুরুষমানুষের যে দুনিয়ায় সত্যিই জায়গার অভাব এটা আমি তাকে বোঝাতে পারি না।

রাখাল আমার সামনেই বিড়ি ধরায়। তারপর বলে, এমনিতে যদি না যাও তবে অন্যভাবে তোমাকে তাড়াবেই। তোড়জোড় চলছে।

শঙ্কিত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, কীসের তোড়জোড়?

রাখাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বউদি প্রায়ই তারাপীঠে যাচ্ছে। সেখানে এক তান্ত্রিককে ধরেছে। শুনেছি, শবসিদ্ধ তান্ত্রিক। মারণ উচাটন বশীকরণ সব জানে।

অজানা আশঙ্কায় আমার বুকটা গুড়গুড় করে ওঠে। মারণ উচাটন বা মন্ত্রশক্তি আমি মানি বা না মানি, ও ব্যাপারগুলো আমার কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করি, তার কাছে যাচ্ছে কেন?

মনে হয় তোমার জন্যই একটা ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই তান্ত্রিক গতকালও এসেছিল। খুব একটা ধুমধাড়াক্কা যজ্ঞ হবে শিগগিরই। আর সেই যজ্ঞে....

সেই যজ্ঞে?—আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি।

রাখাল মাথা নেড়ে বলে, সে আমি অত জানি না। তাই বলছিলাম, নিজের প্রাণটি নিয়ে পালাও। তন্ত্রমন্ত্র বড় সাংঘাতিক জিনিস। আমাদের গাঁয়ের গোবিন্দ তার সৎ ভাই ষষ্ঠীপদকে মারতে এক তান্ত্রিককে লাগিয়েছিল। যজ্ঞের তিনদিনের মধ্যে রক্তবমি করতে করতে ষষ্ঠীপদ পটল তুলল।

বলো কী?

বলে আমি অবসন্ন হয়ে নেতিয়ে পড়তে থাকি। আমার মনের একটা দিকে লজিকের বাস। সে মাথা নেড়ে বলে, ওসব গুল গপ্পো গাঁজা। মারণ উচাটনে যদি মানুষ মারা যেত তা হলে এত ছোরাছুরি বোমা বন্দুকের দরকারই হত না। আমার মনের আর একদিকে বাস করে বুড়ি সংস্কার। সে খোলা গলায় বলে, না বাবা, দুনিয়ায় কত কী হয়! কে অত জেনে বসে আছে? মন্ত্রতন্ত্রের যে শক্তি নেই তাও তো প্রমাণ হয়নি।

রাখাল ভাবিত মুখে বলে, তান্ত্রিকটাকে দেখলে বাপু ভয় করে। চেহারায় খুব তেজ।

কোনওদিনই আমি মনের ভাব লুকোতে পারি না। কে যেন বলেছে, মুখ হল মনের আয়না। সে হিসেবে আমার মুখ খুবই উঁচু জাতের আয়না। তাতে আমার মনে ভয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, এমনকী পেটের ব্যথা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বেগেরও প্রতিক্রিয়া খুবই স্পষ্ট ফুটে ওঠে। আমার মা বরাবরই আমার মুখ দেখে টের পেত, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে না খিদে পেয়েছে। অভিনেতা বা জুয়াড়ি হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকারময়। রাখাল আমার মুখের দিকে চেয়ে উৎসুকভাবে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। আমিও বুঝতে পারছি, আমার অভ্যন্তরীণ আতঙ্ক, উদ্বেগ ও দিশাহারাভাব আমার মুখে রামধনুর রং ধরাচ্ছে। যখন মুখ খুললাম তখন আমার কণ্ঠস্বরও চিঁ চিঁ করতে লাগল। বললাম, কিন্তু আমাকে মেরে কী হবে?

রাখাল বিজ্ঞজনের মতো হেসে বলল, তুমি বিদেয় হলেই এই বাড়িখানা পুরোপুরি বাবুর হয়।

আমি চিঁ চিঁ করে বলি, এখনও পুরোপুরিই বাবুর। আমি তো মোটে একখানা ঘরে কোনওরকমে—

একখানা ঘর নিয়ে আছো তো কী? চন্দ্রে গেরোন সূর্যের গেরোন দেখোনি? রাহু একটুখানি লেগে থাকলেও আমরা জলটল খেতে পারি না। তা তুমি হচ্ছ সেই রাহু। ছাড়ব ছাড়ব করেও একটুখানি লেগে আছ। কিন্তু বড়বাবু বউঠানকে বলেছে, এ বাড়ি গেরোনমুক্ত করে তবে গঙ্গাস্নান করবে।

আমি অবসাদ ও হতাশায় চোখ বুজে ফেলি। তান্ত্রিকের বাণ কতদূর কার্যকর তা আমি জানি না। তবে এটা জানি, বাণে কাজ না হলে অন্য পন্থারও অভাব হবে না। লড়াইটা বড্ডই অসম। আমি বললাম, তান্ত্রিকের বাণের পাল্লা কতদূর জানো? যদি আমি ক'দিন পুরী বা দিঘায় গিয়ে বসে থাকি?

রাখাল হেসে উঠে বলে, সে তুমি বিলেত গিয়ে বসে থাকো না! এ তো আর গুলতির গুড়ুল নেয় যে, একটুখানি গিয়েই পড়ে যাবে। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সব জায়গায় ধাওয়া করবে তোমাকে। তবে ঘাবড়িও না, উপায় আছে।

আমি কোনও আশার আলো না দেখেই হতাশ গলায় বললাম, কী উপায়?

যদি চাও তো পালটা বাণ মারবার জন্য আমার গাঁয়ের সেই তান্ত্রিককে আনাতে পারি। তবে দু'—চারশো টাকা খরচ আছে।

ও বাবা!— আমি চোখ বুজে মাথা নেড়ে বলি, আমার অত টাকা নেই।

তুমি বড্ড কিপটে আছ ছোটবাবু। খামোখা খাবি খেয়ে মরার চেয়ে দু'—চারশো টাকাই কি বড় হল? আমি বলি কী, তান্ত্রিকে তান্ত্রিকে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে গোঁফে তা দিতে থাকো। বাণে বাণে কাটাকাটি হতে থাকবে, তোমার গায়ে আঁচটিও লাগবে না। চাও তো তোমার তান্ত্রিক উলটো বাণ মেরে বড়বাবুকেই ঘায়েল করে দেবে।

দু'—চারশো টাকা আমি কোথায় পাব?

কিছু কম করে দেব'খন।— এদিক ওদিক চেয়ে রাখাল হঠাৎ গলাটা নামিয়ে ফেলল খাদে। বলল, তোমার মাথায় ভগবান ঘিলুর বদলে কি গোবরজল পুরে দিয়েছে? টাকার ভাবনা কী গো তোমার? ঘরের লাগোয়া অমন সোনার খনি থাকতে।

আমি ভয় খেয়ে বলি, সোনার খনি! বলো কী?

রাখাল পাশের ঘরটা চোখের ঠারে দেখিয়ে দিয়ে বলল, সোনা নয় তো কী? বোতল বোতল সোনা। তুমি শুঁড়ির ছেলে, তোমাকে মদের দাম শেখাবে কোন শেয়াল? এক—আধটা বোতল যদি রোজ হাতিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাও তো বেচলে নগদ বিশ—পঞ্চাশটা করে টাকা। দু'পাঁচশো রোজগার করতে ক'দিন লাগবে?

এই প্রস্তাবে আমার বুক কাঁপতে থাকে এবং জলতেষ্টা পেয়ে যায়। এরকম অসীম দুঃসাহসিক কাজ আমি জীবনে কখনও করিনি। বিস্ফারিত চোখে রাখালের মধ্যে এক নররাক্ষসকে দেখতে দেখতে আমি প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলি, না না না।

রাখাল আমাকে গ্রাহ্য করল না। নিজেই উঠে গিয়ে দু'ঘরের মাঝখানকার পলকা দরজাটা একটু ঠেলেঠুলে দেখে নিয়ে বলল, এ তো ব্যাঙের লাথিও সইতে পারবে না। তোমার ভাগ্য ভালো ছোটবাবু, পাল্লাটা খোলে

তোমার ঘরের দিকেই। ওদিকে খুললে মুশকিল ছিল, দরজার গায়েই মদের পেটি গাদি করে রাখা। খুব ঠেলে খুলতে হত, শব্দ উঠত। এ একেবারে জলের মতো সোজা কাজ। দেখবে? একটা ইস্ক্রু ড্রাইভার বা তারের টুকরো যা হোক কিছু দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমি তখনও বিকারগ্রস্তের মতো 'না না না না' করে যাচ্ছি। কিন্তু রাখাল লোক চেনে। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। নিজেই খুঁজে পেতে একটা ঝাঁটার কাঠি জোগাড় করে নিয়ে সে দরজার দুই পাল্লা একটু ফাঁক করে নিঃশব্দে কাজ করল কিছুক্ষণ। দু'মিনিটের মাথায় দরজা খুলে এল। ওপাশে একটার ওপর একটা প্যাকিং বাক্সের থাক।

রাখাল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলল, দেখলে?

আমি ভয়ে বাক্যহারা হয়ে যাই।

রাখাল একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ভেড়ুয়া হলে মরতে হয়। অত ভাবছ কেন? এ তোমারও বাবাকেলে ব্যবসা। ইতিবৃত্তান্ত আমি সব জানি। এখান থেকে মাল সরালে তোমার একরত্তি পাপের ভয় নেই। শুধু বেশি লোভ করতে যেয়ো না। একটা—দুটোর বেশি বোতল কখনও একবারে বের কোরো না।

আমার রুদ্ধ কণ্ঠে সামান্য একটু স্বর ফুটল, আমি পারব না।

রাখাল মৃদু ধমকের সুরে বলে, খুব পারবে। বেশি কিছু করতে হবে না। শুধু বের করে আমার হাতে দিয়ো। আমি তোমাকে বিশ—পঞ্চাশ করে এনে দেব'খন। আর দরজাটা এদিক থেকে আঁট করে বন্ধ রেখো।

আমি বললাম, পেটির বোতল গোনা গাঁথা থাকে। সরালে ধরতে সময় লাগবে না।

রাখাল মাথা নেড়ে বলল, ওসব ভেবে রেখেছি আমি। গোনা যেমন থাকে তেমনি আবার ভাঙাও যায়। ফাঁকা বোতল আমি ফেরত দিয়ে যাব। সেগুলো একটু ভেঙে আবার পেটিতে রেখে দিয়ো। পেটির খড়ে একটু মাল ঢেলে দিলেই হবে। গুনতিতেও ঠিক থাকবে, তোমার কাজও হাসিল হবে। বড়বাবুর লোকেরা ভাববে, বোতল ভেঙে মাল সব পড়ে গেছে।

আমি ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে চোখ বুঝলাম। হঠাৎ খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

রাখাল বলল, প্রথম—প্রথম ওরকম লাগে। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে ছোটবাবু। আমি যখন তেঘড়ের উপেন সামন্তকে হেঁসো দিয়ে কাটলাম প্রথমটায় আমারও ওরকম হয়েছিল। সেই প্রথম কিনা। তার পরে আর মানুষ মারতে বুক কাঁপত না। এই তো বছর দুই আগে রসিয়ার চরে গদাইকে বল্লমে গেঁথে এসেই একথালা পান্তা তেঁতুলগোলা দিয়ে মেরে ঢেঁকুর তুলে মাদুরে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি।

এই সংবাদে আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। বাস্তবিকই আমার হৃৎস্পন্দন এক—আধবার থেমেও গেল। তবু আত্মরক্ষার এক প্রবল তাগিদ অনুভব করে আমি বুক চেপে ধরে উঠে বসলাম। মুখে কথা সরছিল না। হাঁ করে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইলাম রাখালের দিকে।

রাখাল স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উদাস হয়ে পড়েছিল। চোখে স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। বলল, প্রথমটাতেই যত বাধো—বাধো ঠেকে।

আমি তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি খুন করেছ?

মেলা। হিসেব নেই। বড়বাবু সেইজন্যই চাকরি দিয়ে নিয়ে এল। দেশে খুনি হিসেবে ভাড়া খেটেছি। প্রতি খুন পাঁচশো এক টাকা। বাঁধা রেট। কাজের আগে অর্ধেক আগাম, কাজের পর বাকিটা।

বড়দা তোমাকে এনেছিল কেন?— আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করি।

কানে হাত ঠেকিয়ে হাতজোড় করে রাখাল বলল, মিছে কথা বলব না ছোটবাবু। বড়বাবু আমাকে এনেছিল তোমাদের তিন ভাইয়ের জন্যই। তো এক ভাই পটল তুলল, আর—এক ভাই ভেগে পড়ল। তুমি পুঁটিমাছের পরানটি পড়ে রইলে। নিকেশ অনেক আগেই করতুম, কিন্তু বড়বাবু হিসেবি লোক। আমাকে একদিন বলল, শহুরে খুন একরকম, গেঁয়ো খুন আর—এক রকম। তোর তো আবার চাঁড়ালে হাত। এমন মোটা দাগের কাজ করে বসবি যে পরে সব দোষ আমার ঘাড়ে এসে চাপবে। এ কাজে সূক্ষ্ম মাথা আর

পরিষ্কার হাত চাই, তা তোর নেই। তুই বরং ক্ষ্যামা দে, আমি অন্য ব্যবস্থা দেখছি। তা তোমাকে গোপনে গোপনে বলেই রাখি ছোটবাবু। বড়বাবুর হয়ে তোমাকে খুনটা শেষ পর্যন্ত আমি করতাম না। কারণ এর মধ্যে আমি সেই তান্ত্রিকবাবার কাছে মন্ত্র নিয়ে ফেলেছি। খুন একেবারে বারণ।

আমি কাঁপতে কাঁপতে বলি, ঠিক বলছ?

ঠিকই বলছি। এখন মশাটা পর্যন্ত মারতে তিনবার ভাবতে হয়, কাজটা পাপ হবে না ন্যায্য হবে।

আমি সন্দিহান হয়ে বলি, খুন বারণ তো তোমার তান্ত্রিক বাণ মারে কেন?

সে হল মন্ত্র—তন্ত্রের ব্যাপার। সরাসরি খুন তো আর নয়। মন্ত্রে যদি মানুষ মরে তবে আমাদের কী করার আছে বলো?

ঠিক কথাই, আমার আর কিছু বলার রইল না।

রাখাল বলল, তা হলে ওই কথাই রইল।

কী কথা রইল তা আর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম না।

।। পাঁচ ।।

লাটুবাবুর মুখ থেকে একদিন দৈববাণী বেরিয়ে এল, ওহে রবি, ইমিডিয়েটলি রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে ভাব জমাও। দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওরা পাঁচ নম্বর পর্যন্ত অলরেডি দেখে ফেলেছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ভাব জমিয়ে কী করব?

আগে তো জমাও। তারপর তোমার থ্রুতে রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ঝিলিকের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করা যায় কিনা দেখতে হবে। যা মনে হচ্ছে, ওপেন কমপিটিশনে ঝিলিকের চান্স খুব কম। কিন্তু আমি হাল ছাড়ছি না।

রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়ে হওয়াটা আমারও ব্যক্তিগত স্বার্থের পক্ষে লাভজনক। কিন্তু রুদ্রাক্ষের মতো উঁচু জাতের লোকের সঙ্গে ভাব জমানো যে কী শক্ত তা আমিই জানি। কিন্তু লাটুবাবুর যা মানসিক অবস্থা তাতে এসব অসুবিধের কথা বলতে সাহস হল না। উনি প্রচণ্ড টেনশনে আছেন। টেনশন আরও বাড়লে স্ট্রোক—ফ্রোক হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর সেরকম কিছু হয়ে লাটুবাবু যদি দুনিয়া থেকে হড়কে যান তবে আমার পাওনাগন্ডা আদায়ের ক্ষীণতম আশার প্রদীপটিও এক ফুৎকারে নিভে যাবে। আমি লাটুবাবুর টেনশন কমানোর জন্য মোলায়েম করে বললাম, ওঃ, এ তো ভালো আইডিয়া।

দশটা টাকা রাহা খরচ নিয়ে আমি হারা—উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

আমার দাড়ি কামানো নেই। জামাকাপড় ময়লা। আর আমার চোখে—মুখে চিরস্থায়ী চোর—চোর জলে—পড়া অসহায় ভাবটি তো আছেই। এ নিয়ে রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ভাব জমানো যে কী মুশকিল! এক গ্রহের লোকের সঙ্গে অন্য গ্রহের লোকের যেমন অপরিচয়ের দূরত্ব এও তো তাই।

রুদ্রাক্ষের প্রকাণ্ড অফিস—বাড়িটিতে যখন ঢুকলাম তখন বুকটা ধুকধুক করছে। সঙ্গে শ্বাসকষ্ট আর তেষ্টা। লোকটাকে আমি চিনি না। কী বলব তাও জানি না। লোকটা রাগী হলে আমাকে বের করে দেবে। খচ্চর হলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। গম্ভীর প্রকৃতির হলে কথার জবাব দেবে না। কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে।

রুদ্রাক্ষের অফিসে দুটি মহল। একটা দিকে কেরানি—টেরানি, অন্য দিকটায় বড় বড় চাকুরেরা। এই দ্বিতীয় মহলটা খুব বেশি চকচকে। কেমন গা ছমছম করে। প্লাইউড আর কাচের তৈরি ঘর। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ঢুকবার মুখেই মেয়ে রিসেপশনিস্ট। আমার মতো লোকের গা ছমছম করারই কথা।

একবার মনে হল, ফিরে যাই। বুকটা বড় বেশি ধুকপুক করছে। পর মুহূর্তেই লাটুবাবুর মুখটা মনে পড়ল। খুব টেনশনে আছে। এই বয়সে এত টেনশন ভালো নয়। লাটুবাবুর দীর্ঘজীবনই আমার কাম্য। আর তা ছাড়া অত ভয়ই বা আমার কীসের? বড়দা মহীতোষের তান্ত্রিক যদি বাণ মেরে আমাকে ফিনিশ করেই দেয় তা হলে দুনিয়ায় আমার ভয় খাওয়ার আর কিছুই থাকতে পারে না। এইসব ভেবে আমি সাহস সঞ্চয় করে রিসেপশনিস্ট—এর কাছে এগিয়ে যাই এবং তার কূট পর্যবেক্ষণের সামনে নিজেকে সংকুচিতভাবে দাঁড় করাই। মেয়েটা আমাকে দেখে তেমন খুশি হয় না। কেমন যেন গড়িমসি করতে থাকে, হাই তোলে একটা,

নিজের পালিশ করা নখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। আমার অবশ্য অবহেলা পেয়ে অভ্যেস আছে, তাই তেমন অস্বাভাবিক কিছু লাগে না। এরা অন্য পৃথিবীর লোক। আমি অন্য পৃথিবীর।

অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটি চূড়ান্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল এবং সঙ্গত কারণেই ইংরিজিতে কথা বলার প্রয়োজন বোধ না করে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল, কাকে চান?

রুদ্রাক্ষ সেন।

বিজনেস?

এই একটু আলাপ করব আর কী!

আপনার নাম?

রবি সর্বজ্ঞ।

উনি খুব বিজি লোক কিন্তু!

বলে মেয়েটা আমাকে একটু সাবধান করে দিয়ে ফোন তুলে নেয় এবং রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলে। ফোন নামিয়ে রেখে বলে, ভিতরের দিকে চলে যান। করিডরে ঢুকে বাঁ দিকের তিন নম্বর ঘর।

করিডরে পা দিয়ে আর—একবার আমার মনে হল ফিরে যাই। রুদ্রাক্ষ সেনের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফের ইচ্ছেটা হয়েছিল। কিন্তু টুল থেকে একটা বেয়ারা উঠে পট করে দরজাটা খুলে দেওয়ায় আমাকে প্রায় হুমড়ি খেয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে হল। ফিরে গেলে বাস্তবিকই ভুল করতাম। কারণ রুদ্রাক্ষ সেনকে দেখলে কিছুতেই রুদ্রাক্ষ সেন বলে মনে হয় না। মনে হয়, লোকটা আমার মতোই একজন ডিফেনসের খেলোয়াড়।

প্রথমে ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ আমি লোকটাকে খুঁজেই পেলাম না। মেঝে জোড়া নরম সবুজ রঙের একটা গালিচা। মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিল। মস্ত ঘুরন্ত চেয়ার। বড় বড় দেয়ালজোড়া ক্যাবিনেট। তিনটি তিন রঙের টেলিফোন। এসবের মধ্যে জাঁদরেল রুদ্রাক্ষ সেন কোথায়? আমি অন্তত ছ' ফুট উঁচু, পেল্লায়, বৃষস্কন্ধ এক দুর্দান্ত যুবককে আশা করেছিলাম। কিন্তু যে উচ্চতায় রুদ্রাক্ষ সেনের মুখ বা কাঁধ থাকার কথা সেখানে কিছু নেই। আমি আস্তে আস্তে নিচুর দিকে খুঁজতে খুঁজতে অনেকক্ষণ বাদে টেবিল থেকে মাত্র ফুটখানেক উঁচুতে রুদ্রাক্ষ সেনের মুখখানা দেখতে পেলাম। এত নিখুঁত গোলাকার মুখ এবং এত নিখুঁত গোল ফ্রেমের চশমা কদাচিৎ দেখা যায়। সেই চশমার ভিতরে দু'খানা গোল গোল চোখ আমার দিকে খুবই অসহায়ভাবে চেয়ে আছে। আরও তদন্তে প্রকাশ পেল, রুদ্রাক্ষ সেনের সমস্ত আকৃতির মধ্যেই গোলাকার ব্যাপারটার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। তার আঙুলগুলো গোল গোল, কান দুটোও বৃত্তাকার। ভুঁড়ির কথা ছেড়েই দিচ্ছি। বেশ বেঁটে খাটো, মোটাসোটা ও নিরীহদর্শন এই লোকটাকে রুদ্রাক্ষ সেন বললে রুদ্রাক্ষ সেনের অপমান হওয়ার কথা। এর জন্যই নাকি প্রায় ডজনখানেক বাছাই মেয়ের বাপ বা অভিভাবক হাঁ করে বসে আছে! বিশ্বাস হয় না! বিশ্বাস হয় না!

রুদ্রাক্ষ সেনের চেহারাটা দেখে আমি এতই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই যে অত্যন্ত লঘু গলায় বলে উঠি, হেল্লো মিস্টার সেন।

রুদ্রাক্ষ সেন আমার হাবভাবে নিতান্তই ভয় খেয়ে সিঁটিয়ে যায় যেন। তাকে আরও ছোট দেখাতে থাকে। চোখগুলো আরও গোল গোল হয়ে ওঠে। মেয়েলি গলায় রুদ্রাক্ষ সেন বলে ওঠে, আপনি কী চান?

বিনা অনুমতিতে আমি তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ি এবং অম্লানবদনে তার মুখের দিকে চেয়ে একটু একটু হাসতে থাকি। হাসির কারণ আর কিছুই নয়, রুদ্রাক্ষ সেনকে দেখে আমার মনে হতে লাগল, এই তা হলে রুদ্রাক্ষ সেন! অ্যাঁ! এত ছোটখাটো! এত সামান্য! একে তো আমিও কুস্তি বা দৌড়ে হারিয়ে দিতে পারি! পাঞ্জা লড়লেও এ কিছুতেই আমার সঙ্গে পারবে না! আমার চেয়ে কত বেঁটে! শুধু রংটাই যা দারুণ ফরসা।

এইসব ভাবছি আর ফুড়ুক ফুড়ুক করে আমার হাসি লিক করছে। এতটা অ্যান্টি ক্লাইমেক্সের জন্য তো তৈরি ছিলাম না। লোকটা যে দেখতেই শুধু ছোটখাটো এবং নিরীহ তাই নয়, আমাকে দেখে লোকটা ঘাবড়েও গেছে। আমাকে দেখে ঘাবড়ে যায় এমন লোক আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি। তাই যত হাসছি ততই লোকটাকে আমার ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে।

রুদ্র সেন যেন একটু হতাশ হয়েই সামনের কাগজপত্রগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনার কি কিছু বলার আছে?

আমি মাথা নাড়লাম এবং বললাম, আছে।

তা হলে বলে ফেলুন। আমার বেশি সময় নেই। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বোর্ডের মিটিং অ্যাটেনড করতে আমাকে চলে যেতে হবে।— এই বলে রুদ্রাক্ষ সেন তার হাতের ঘড়িটা দেখল।

আমি লক্ষ করলাম রুদ্রাক্ষের ঘড়িটা খুবই দামি চেহারার। বলতে কী, রুদ্রাক্ষের পোশাক—আশাকও খুবই ভালো। কিন্তু তাতে তার পুতুল—পুতুল ভাবটা ঢাকা পড়েনি।

আমি এবার একটু মুশকিলে পড়লাম। রুদ্রাক্ষের সঙ্গে কী কথা বলে ভাব জমাব তা আমি ভেবে আসিনি। মাথাটা তাই গুলিয়ে যাচ্ছে। কথাও আসছে না মুখে। সুতরাং অগত্যা আমি তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হেসেই যেতে থাকি। আমার আর কিছুই করার থাকে না।

রুদ্রাক্ষ হতাশভঙ্গিতে আমার দিকে চেয়ে বলে, আপনি ওরকমভাবে হাসছেন কেন? আপনি কি আমাকে চেনেন?

রুদ্রাক্ষ সেনের হাবভাব দেখে আমার এতই আহ্লাদ হতে থাকে যে নিজেকে সামলাতে না পেরে আমি বেফাঁস বলেই ফেলি, আপনি তো ডিফেনসের খেলোয়াড়।

রুদ্রাক্ষ খুবই অবাক হয়ে যায় এবং অবাক অবস্থাতেই ভ্রূ তুলে হেসে বলে, হ্যাঁ, রাইট ব্যাক। আপনি কী করে জানলেন?

আমি বিজ্ঞের মতো বলি, জানি।

রুদ্রাক্ষ টেবিলের ওপর ঝুঁকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দেন ইউ মাস্ট হ্যাভ নোন মি। আপনাকে দেখে আমারও চেনা চেনা লাগছিল। ঠিক প্লেস করতে পারছিলাম না।

আমি রুদ্রাক্ষের নরম হাতটা ধরে চাপ দিতে দিতেই হঠাৎ টের পাই, এক দুর্লভ দরজা হঠাৎ আমার সামনে খুলে গেছে। আমি যে অর্থে তাকে ডিফেনসের খেলোয়াড় বলেছি সেই অর্থে ধরেনি। লোকটা ফুটবল খেলত। এবং সম্ভবত ফুটবলই তাঁর সবচেয়ে বড় রন্ধ্র। সেই গর্ত দিয়ে আমি এখন ঢুকে যাচ্ছি।

আমি গলায় যথেষ্ট পালিশ এনে বললাম, আপনি চমৎকার খেলতেন। এ রাফ টাফ অ্যান্ড অ্যারোগেন্ট ডিফেনডার।

রুদ্রাক্ষ বিগলিত হয়ে বলে, নট রিয়েলি। তবে আমার সাইড দিয়ে গোল কমই হত। বাই দি বাই আপনিও কি ওই কলেজেই....?

কলেজের নামটা উচ্চারণ করার আগেই আমি সবেগে মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, একই কলেজ।

তা হলে আমারই কনটেমপোরারি! ভেরি গুড।— বলতে বলতে এক প্যাকেট দামি সিগারেট ও লাইটার এগিয়ে দেয় রুদ্রাক্ষ, স্মোক?

আমি সিগারেট খাই না। তবু বন্ধুত্ব জমিয়ে তোলার পক্ষে সুবিধে হতে পারে ভেবে অনভ্যস্ত হাতে একটা ধরিয়ে ফেলি।

রুদ্রাক্ষ বলে, ক্লাবেও আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছিল। দেয়ার ওয়ার বিগ অফারস। কিন্তু বাবা ডেড এগেনস্টে ছিলেন। বললেন, কেরিয়ার আগে, তারপর খেলা। কলেজের পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে হল বিদেশে। কার্টেন অন ফুটবল। তবে আই স্টিল ফিল ফর দি গেম ভেরি মাচ। বাই দি ওয়ে, আপনার নামটা?

রবি সর্বজ্ঞ।

রুদ্রাক্ষ ভ্রূ কুঁচকে বলে, এ কুয়্যার সারনেম! সর্বজ্ঞ! তার মানে দি ফেলো হু নোজ এভরিথিং?

আমি খুব অকপট হওয়ার চেষ্টা করে বলি, অনেকেই আমাদের পণ্ডিত বংশ বলে ভাবে। কিন্তু তা নয়। আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস হল মদের।

গুড! ভেরি গুড।— রুদ্রাক্ষ মদের ব্যবসা শুনে রীতিমতো খুশি হয়ে বলে, এ গুড বিজনেস। বিদেশে আমি অনেকগুলো ব্রিউয়ারি ভিজিট করেছি। ওঃ, সে যে কী প্রসেস, দেখে মনে হয় এ তো ইন্ডাস্ট্রি নয়, আর্ট। আপনাদের কি ব্রিউয়ারি আছে?

না, না। স্রেফ কেনাবেচার ব্যবসা।

তা হোক। ইটস এ নাইস থিং টু বি অলওয়েজ নিয়ার এ সেলার।

আমি সামান্য নাক সিঁটকোই। তার মানে এ লোকটা হয়তো মদও খায়। মদ যে খায় সে লাটুবাবুর চোখে চরিত্রবান পাত্র কি না তা কে জানে! আমি একটু দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নেশা আছে নাকি?

নেশা!— বলে আবার মাছের মতো চোখ গোল করে ফেলে রুদ্রাক্ষ! তারপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির সঙ্গে বলে, না, না, নেশাফেশা আমার নেই। নেশা তো করে বারবারিয়ানরা। আমার ওসব হয় না। আই ক্যান ড্রিংক অ্যান্ড ড্রিংক অ্যান্ড নাথিং উইল হ্যাপেন। কালই তো ছ' পেগ উড়িয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরেছি।

এবার আমি চোখ গোল করে ফেলি। ছ' পেগ ওড়াবার পর কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালানোর এলেম পুরনো মাতাল কালীকাকারও ছিল না। রুদ্রাক্ষের শরীরের বাড়তি মেদ কোথা থেকে এসেছে তা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি না চাপতে পেরে বলেই ফেললাম, উরেব্বাস!

বিশ্বাস হচ্ছে না?— বলে আহত এক দৃষ্টিতে রুদ্রাক্ষ আমার দিকে চেয়ে বলে, দেখবেন?

আমি ভয় খেয়ে বললাম, না, না তার কোনও দরকার নেই।

রুদ্রাক্ষ টপ করে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি বিশ্বাস করছেন না। ঠিক আছে, লেট আস কল ইট এ ডে অ্যান্ড স্টার্ট ড্রিংকিং। চলুন।

আমি খুবই বিপাকে পড়ে যাই। মদ খাওয়ার কোনও অভ্যাস আমার নেই। মদ আমরা বেচি বটে, কিন্তু কদাচ খাই না। তাই খুবই অসহায়ভাবে বললাম, আমি আপনার কথা যথেষ্ট বিশ্বাস করেছি। প্রমাণের দরকার নেই।

রুদ্রাক্ষ গম্ভীর হয়ে বলে, আই অ্যাম এ স্পোর্টসম্যান মিস্টার সর্বজ্ঞ। মদ খাওয়াটাও আমার কাছে একটা স্পোর্টস। গোটা জীবনটাই আমার কাছে স্পোর্টস। লেট আস স্টার্ট এ স্পোর্টিং ফ্রেন্ডশিপ উইথ ড্রিংকস।

আমি ক্ষীণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে বললাম, কিন্তু আপনার মিটিং?

হ্যাং ইট। এইসব বোর্ড মিটিং—এ কতগুলো বুড়ো শকুন বসে থাকে। রোজই ওদের ইনহিউম্যান মুখ দেখতে দেখতে ঘেন্না ধরে গেল। আপনাকে তো আর রোজ পাব না। চলুন।

অগত্যা বেজার মুখে আমাকে উঠতে হল। রুদ্রাক্ষ শিস দিতে দিতে বেশ চটপট পায়ে করিডর পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে ঝট করে একটা ঝকঝকে নীল রঙের ওপেল গাড়ির দরজা খুলে বলল, উঠে পড়ুন।

রুদ্রাক্ষ গাড়িটা প্রায় উড়িয়ে এনে ফেলল পার্ক স্ট্রিটে। গাড়িতে চাবি দিতেও যেন তর সয় না। তাড়াতাড়ি নেমে আমার নড়া ধরে টানতে টানতে নিয়ে প্রায় লাফিয়ে ঢুকল ভিতরে। আমি টের পাচ্ছিলাম, বেঁটেখাটো এবং মেদবহুল চেহারা হলেও রুদ্রাক্ষের গায়ে যথেষ্ট জোর। এমন জোরে আমার কবজি চেপে ধরে আছে যে, বার দুয়েকের চেষ্টাতেও আমি ছাড়াতে পারলাম না।

একটা টেবিল দখল করে বসেই রুদ্রাক্ষ মরুভূমির পথহারা পথিকের মতো তৃষ্ণার্ত গলায় ডাকতে লাগল, ব্যেরা। ব্যোয়! জলদি! হুইস্কি! হুইস্কি! জলদি! দো বড়া পেগ। জলদি! জলদি! কুইক ম্যান।

বেয়ারা এসে দুজনের সামনেই হুইস্কি নামিয়ে দিয়ে গেল। আমি গেলাসটা ছোঁয়ার আগেই রুদ্রাক্ষ দু'টি পেগ নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলল, আমার ভেতরটা একদম খটখটে হয়ে শুকিয়ে ছিল।

আমি কিছু বলার না পেয়ে দেঁতো একটু হাসলাম। মদ না খেলেও মাতালদের সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকেই ওঠাবসা। মৃদু স্বরে বললাম, হুইস্কি ইজ এ স্লো ড্রিংক। সাহেবদেরও দেখবেন, অত তাড়াতাড়ি খায় না।

সাহেব?— বলে রুদ্রাক্ষ আবার ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে বলে, শালা সাহেবদের কথা বাদ দিন। ও শালারা জানে কী? ব্যেরা, আউর এক বড়া পেগ।

আমি তখনও গেলাসটা ছুঁইনি। রুদ্রাক্ষের শুষ্ক অভ্যন্তরে আরও দু'পেগ নেমে গেল। আমি চোখ গোল করে চেয়ে রইলাম।

তৃতীয় বড়া পেগের গতিও একই। কিন্তু রুদ্রাক্ষ তিন বড় পেগের পর সেই যে চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল আর চোখ খুললই না। আমি সন্তর্পণে উঠে চোরের মতো চারদিকে চেয়ে সুট করে বেরিয়ে পড়ি। বড় পেগের হুইস্কিটি অস্পৃষ্ট অবস্থায় টেবিলেই পড়ে থাকে। বেরিয়ে এসে একটা ওষুধের দোকান থেকে আমি লাটুবাবুকে খবরটা দিই।

লাটুবাবু, রুদ্রাক্ষের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

বাঃ।— বলে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন লাটুবাবু, কী আলাপ হল?

সে অনেক কথা। তবে খুব তাড়াতাড়িই আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

বলো কী? তুমি তো সাংঘাতিক ছেলে হে!

আমি আমতা আমতা করে বলি, রুদ্রাক্ষ কিন্তু বেঁটে।

বেঁটে! ওঃ, সে আমি জানি। বেঁটে কথাটা ঠিক নয়। অ্যাভারেজ বাঙালির যা হাইট, তাই। খুব বেশি ঢ্যাঙা হওয়াটাও তো কাজের কথা নয়।

তা বটে।

বটেই তো। হাইট যাই হোক অন্য সব দিকেই মাপে বেশ বড়ো। ওসব তোমাকে দেখতে হবে না। শুধু দেখবে চরিত্রটা কেমন।

আমি ফের আমতা আমতা করে বলি, চরিত্র খারাপ কিছু নয়। তবে একটু—আধটু মদ খায় আর কী! ইন ফ্যাকট এইমাত্র ওকে মাতাল অবস্থায় একটা রেস্টুরেন্টে ফেলে রেখে আমি উঠে এসেছি।

লাটুবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, ফেলে রেখে এসেছ মানে? ফেলে এলে কেন? ওই অবস্থায় ওর যে— কোনওরকম বিপদ—আপদও তো হতে পারে। ধরো, পকেটের টাকাগুলোই কেউ তুলে নিল—

আমি মৃদুস্বরে বললাম, আপনি কি মদ খাওয়াকে সাপোর্ট করেন?

লাটুবাবু উদার গলায় বলেন, আরে মদ খাওয়া কাকে বলো তুমি? একটা টনিক খেলেও তো তার সঙ্গে খানিকটা মদ পেটে যায়। তা ছাড়া রুদ্রাক্ষ কাজের লোক, দারুণ মাথার খাটুনি, একটু—আধটু ওদের খেতেই হয়।

আমি তবু বিষয়টা বিশদ করে বলি, একটু—আধটু নয়, রুদ্রাক্ষ আমার চোখের সামনে বিশ মিনিটের মধ্যে ছ'পেগ—।

আঃ, বড্ড বকো তুমি। ওটাও একটা কোয়ালিফিকেশন, বুঝলে! খায় তো পুরুষের মতোই খায়। তুমি আর দেরি কোরো না, হুটোপাটি করে এক্ষুনি যাও। গিয়ে দেখো ছোকরার কোনও বিপদ হল কি না। ওকে বরং বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। যাও।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা রেখে দিই এবং আবার সেই রেস্টুরেন্টে ফিরে আসি।

রুদ্রাক্ষ ঠিক একই রকমভাবে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। তার সামনে এবং উলটো দিকে টেবিলের ওপর দুটি হুইস্কির গেলাস স্থির দাঁড়িয়ে। গোটা তিনেক বিল অ্যাসট্রের তলায় আধচাপা হয়ে পড়ে আছে। উঁকি

মেরে দেখি, বেশ লম্বা টাকার বিল। আট পেগ হুইস্কি তো কম নয়। বিলটা রুদ্রাক্ষরই মেটানোর কথা। কিন্তু সে যেমন তুরীয় রাজ্যে বিরাজ করছে সেখানে তার নাগাল পাওয়া বড়ই কঠিন।

তবু আমি তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলাম, রুদ্রাক্ষবাবু, ও রুদ্রাক্ষবাবু!

জড়ানো গলায় রুদ্রাক্ষ জিজ্ঞেস করল, কোন শালা রে?

আমি। আমি রবি সর্বজ্ঞ।

কী অজ্ঞ?

আমি রবি।

ওঃ।—বলে রুদ্রাক্ষ চোখ মেলে চেয়ে এবং নিজের গেলাসটা দেখতে পেয়ে স্বয়ংক্রিয় হাতে সেটা তুলে নেয়। আমার দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে বলে, মুখটা চেনা চেনা লাগছে। কে তুমি চাঁদু?

আমি ভড়কে গিয়ে বলি, এইমাত্র তো আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল।

আরে! তাই তো আপনিই তো সেই আমার ফ্যান। হোয়েন আই ওয়াজ এ ফুটবলার আপনি তখন—।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ খুব ভালো। কী নামটা যেন!

রবি সর্বজ্ঞ।

ইয়েস, আই রিমেমবার। আপনি তো ওয়াইন মারচেন্ট।

আমি বিগলিত হয়ে বলি, বাঁচা গেল। মনে রেখেছেন।

রাখব না মানে! আমি কি শালা মাতাল যে, একটু আগের কথা মনে থাকবে না!

তা অবশ্য নন। কিন্তু বিলটা এইবেলা মিটিয়ে দেওয়াই ভালো।

কীসের বিল?

এই যে, বেয়ারা রেখে গেছে।—বলে আমি বিলগুলো তার হাতে দেওয়ার চেষ্টা করি।

কিন্তু ততক্ষণে তৃতীয় বড় পেগ তার ভিতরে নেমে গেছে। গেলাসটা রেখে রুদ্রাক্ষ আবার পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ফেলে।

দ্বিতীয় দফা বিপদে পড়ে এবার আর আমি বুদ্ধি হারাই না। রুদ্রাক্ষর মতো স্বল্পদৈর্ঘ্যের, মোটামুটি ভালোমানুষও আমারই মতো একজন ডিফেনসের খেলোয়াড়কে কীভাবে চালনা করতে হয় তার একটা আন্দাজ আমার আছে। আমি হাত বাড়িয়ে রুদ্রাক্ষর পকেট থেকে তার লম্বা এবং বড়োসড়ো পার্সটি বের করে বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিই। তারপর রুদ্রাক্ষকে নাড়া দিয়ে জাগাই।

সে ঘোর ঘোর গলায় বলে, কোন শালা রে?

আমি তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, তোমার বাবা। ওঠো তো চাঁদ, ওঠো!

আশ্চর্য এতে কাজ হয়। ঝাঁকুনির চোটে তার চোখ থেকে গোল চশমাটা পিছলে গিয়েছিল। আমি সেটা তুলে আমার জামার বুকপকেটে রাখি। রুদ্রাক্ষ চোখ খোলে এবং আমাকে দেখে কেমন যেন বিহ্বল ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে বলে, বাবা! মাই গুডনেস! কিন্তু আমি উঠতে পারছি না বাবা।

ওঠো। সবাই দেখছে। ডোন্ট ক্রিয়েট এ সিন!

আচ্ছা বাবা, উঠছি।

বলে রুদ্রাক্ষ উঠতে গিয়ে টাল খেতে থাকে। আমি শক্ত করে তাকে ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে দরজার দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে থাকি।

রুদ্রাক্ষ কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, আমি কি খুব বেশি খেয়েছি বাবা? তুমি কি বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাকে বকবে?

খুব বকব। ছিঃ ছিঃ, এভাবে কেউ খায়?

আমি তার বাবার গলার স্বর না জেনেও বাবার ভূমিকায় ভালো পার্ট করতে থাকি।

রুদ্রাক্ষ ব্যথিত গলায় বলে, আমি যে খাই না তা তো তুমি জানো বাবা! জানো না? আই অ্যাম এ গুড ম্যান। আজ শালা বোর্ড মিটিং—এর পর ডিরেক্টর আমাকে এমন একটা প্রোপোজাল দিল যে, মাল না খেয়ে উপায় ছিল না।

আমি বুঝতে পারলাম, রুদ্রাক্ষ চোখেমুখে মিথ্যে কথাও বলে। কারণ আজ সে বোর্ড মিটিং—এই যায়নি এবং সম্ভবত ডিরেক্টরের সঙ্গে তার দেখাও হয়নি। পাত্র হিসেবে লাটুবাবু বা অন্যান্য পাত্রীর বাবা একে যা—ই ভেবে থাকুক, আমি রুদ্রাক্ষকে একটা সাদামাটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দিতেও এখন দ্বিধা করব। তবু গলাটা যথাসম্ভব দৃঢ় ও শান্ত রেখে আমি প্রশ্ন করি, কী প্রস্তাব?

সে তুমি ভাবতে পারবে না। আই হ্যাভ টু ম্যারি হিজ ডটার।

ডটার?

হ্যাঁ, ডটার। তিনবার ডিভোর্স করে এখন স্বামীহারা অবস্থায় বাপের ঘাড়ে চেপেছে। অ্যান্ড আই হ্যাভ টু স্যালভেজ দ্যাট লেডি।

আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। রুদ্রাক্ষ হাতছাড়া হলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমি তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে ধমকে উঠি, খবরদার রুদ্রাক্ষ, ও কাজও কোরো না।

রুদ্রাক্ষ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অতি অভিমানের স্বরে বলে, রেগে গেলেই তুমি আমাকে কেন রুদ্রাক্ষ বলে ডাকো বাবা? আমার দুষ্টু নামটা কি তোমার মনে পড়ে না তখন?

আমি উদ্বেগে শ্বাস বন্ধ করে বলি, পড়ে। তবে তখন ও নামে ডাকতে ইচ্ছে করে না।

রুদ্রাক্ষ চোখের জল মুছে বলে, আমি তোমার খারাপ ছেলে বাবা।

আমি তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সামলে দিই এবং রেস্টুরেন্টের বাইরে এনে গাড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে দাঁতে দাঁত চেপে বলি, ডিরেক্টর কবে তোমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছে?

আই ডোন্ট রিমেমবার। মে বি ইয়েসটারডে। আঃ অত জোরে আমার হাত চেপে ধোরো না। লাগছে।

আমি মুঠোটা একটু আলগা করি। লাগারই কথা। যা জোরে চেপে ধরেছিলাম। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বলি, চাবিটা দাও, গাড়িটা খুলি।

রুদ্রাক্ষ ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, ডোন্ট বদার। পকেট থেকে বের করে নাও। একটু আগে আমার পার্সটাও তুমি বের করে নিয়েছ।

ঠিক কথা। আমি দ্বিরুক্তি না করে তার প্যান্টের ডান পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে দিয়ে বলি, ওঠো।

সে উঠে ড্রাইভিং সিটে বসে বলে, আমি চালাতে পারব না।

আমি প্রমাদ গুনে বলি, সে কী?

সে অম্লান বদনে বলে, তুমি চালাও বাবা। আই সারেনডার।—বলে সে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের সিটে গিয়ে বসে।

রুদ্রাক্ষের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি যা করেছি তা আমার জীবনের দুঃসাহসিকতম অ্যাডভেনচার। সেই ধকলে আমার শরীর কাহিল লাগছিল, মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। যে—কোনও সময়ে আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলতে পারি। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারি। অথবা হঠাৎ চোঁ চোঁ দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারি। তবু লাটুবাবুর প্রতিশ্রুত পাঁচ হাজার এই বিপদের মধ্যেও একটা সুবাতাসের মতো বয়ে আসে। বলে, ভয় কী? আমি তো আছি।

আমাদের একটা পুরনো ডজ গাড়ি ছিল। এখন তা আমার বড়দা মহীতোষের দখলে। তবে একদা আমি সেটা দাবড়েছি। মোটরগাড়ি চালানোর সেই অভিজ্ঞতা আজ এতকাল পরে ফের কাজে লাগল। আমি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে খুব বিরক্তির গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবে?

বলেই বুঝলাম, ভুল হয়েছে। একথা বাবার ছেলেকে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। তবে ভুল হলেও ভয়ের কিছু ছিল না। গাড়ির নরম গদিতে আধশোয়া হয়ে ঘাড় লটকে ইতিমধ্যে রুদ্রাক্ষ গভীর আচ্ছন্নতায় ডুবে গেছে।

গাড়িটা কিছুদূর নিয়ে গিয়ে আমি থামাই এবং ফের সেই ওষুধের দোকান থেকে লাটুবাবুকে ফোন করি।

লাটুবাবু।

উত্তেজিত লাটুবাবু বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী ব্যাপার?

রুদ্রাক্ষের ঠিকানা কী?

কেন বলো তো?

সেখানে ওকে পৌঁছে দিতে হবে। জ্ঞান নেই।

একেবারেই নেই?

নাঃ।

ভালো করে নেড়ে নেড়ে দেখেছ?

দেখেছি। আধ ঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে যে ছ'পেগ হুইস্কি ওড়ায় তার পক্ষে সচেতন থাকা মুশকিল। আর একটা কথা লাটুবাবু।

বলো।

রুদ্রাক্ষ কিন্তু যখন—তখন মিথ্যে কথা বলে।

বলে নাকি?

আপনি ভেবে দেখবেন মিথ্যে কথা বলা ভালো না মন্দ।

লাটুবাবু বিরক্ত হন। বলেন, মিথ্যে কথা আমিও বলি। নিজের প্রাণ মান বাঁচাতে মাঝে মাঝে সব মানুষকেই বলতে হয়। যুধিষ্ঠিরের মতো লোককেও বলতে হয়েছিল। কথা হল, কোন সিচুয়েশনে বলে সেটা দেখতে হবে।

তা অবশ্য ঠিক।

লাটুবাবু আমার জবাবে একটু খুশি হন। সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, দেশের মান্যগণ্য নেতারাও তো ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলছে রোজ। ও হল ডিপ্লোম্যাসি। মুখ যা—ই বলুক মন তো আর বলছে না। তুমি শুধু লক্ষ করবে, ছোকরার চরিত্রটা কেমন।

আচ্ছা, তাই হবে।

আর একটা কথাও শুনে রাখো। ঝিলিকের সঙ্গে বিয়েটা কিন্তু লাগাতেই হবে। ব্যাপারটা এখন আমার প্রেস্টিজের ইস্যুতে দাঁড়িয়ে গেছে।

চেষ্টা করছি। তবে আর—একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে।

সেটা কী?

রুদ্রাক্ষর কোম্পানির ডিরেক্টর চান তাঁর মেয়েকে রুদ্রাক্ষ বিয়ে করুক।

বলো কী?—লাটুবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, সর্বনাশ।

আমি কণ্ঠস্বর নরম করে বলি, এখনই হাল ছাড়বেন না। সেই মেয়েটা তিনবার ডিভোর্স করেছে। রুদ্রাক্ষরও তাকে পছন্দ নয়।

কক্ষনো পছন্দ হওয়া উচিত নয়।

আমি শান্ত গলায় বললাম, এবার রুদ্রাক্ষর ঠিকানাটা বলুন।

লাটুবাবু ঠিকানাটা দিয়ে বললেন, সাবধানে পৌঁছে দিয়ো। কোনওরকমে পড়ে—টড়ে গিয়ে চোট—টোট যেন না লাগে।

আমি সেই ঠিকানায় অর্থাৎ মেরলিন পার্ক পর্যন্ত খুবই সাবধানে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গেলাম। তবে সেই সাবধানতা রুদ্রাক্ষর জন্য নয়। আমার নিজের জন্যই। গাড়ি চালানোর অভ্যাস বহুকাল নেই। ড্রাইভিং লাইসেনস কবে হারিয়ে গেছে। কোনওরকম ট্রাফিকের ঝামেলায় পড়লে কপালে কষ্ট আছে।

আমাকে যতটা বোকা বলে মনে হয় আমি হয়তো ততটাই বোকা। কিন্তু রুদ্রাক্ষর বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে যাওয়াটা যে চূড়ান্ত বোকামি এবং বিপজ্জনক কাজ হবে সেটা না বোঝার মতো বোকা আমি নই। তাই চমৎকার একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে, রুদ্রাক্ষর বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে আমি গাড়িটা দাঁড় করাই।

ইচ্ছে ছিল, সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে গাড়ি সমেত ঘুমন্ত রুদ্রাক্ষকে রেখে আমি কেটে পড়ব। মাতালদের ভাগ্যই তাদের দেখে। আজ পর্যন্ত আমি কোনও খাঁটি মাতালকে সত্যিকারের কোনও বিপদে পড়তে দেখিনি। সুতরাং রুদ্রাক্ষও যে পড়বে না সে বিশ্বাস আমার ছিল।

কিন্তু সে দূরদৃষ্টির অভাবে আমার জীবনে কোনও উন্নতি হল না তার ফলেই ফাঁড়াটা কেটেও কাটল না। নামতে যাচ্ছি, পিছন থেকে অত্যন্ত অভিমানের গলায় রুদ্রাক্ষ বলল, বাবা, আমাকে ফেলে কোথায় যাচ্ছ?

রুদ্রাক্ষর পান—ক্ষমতা সম্পর্কে আমার ধারণা এতই সীমাবদ্ধ ছিল যে, আমি ভূত মনে করে চমকে উঠলাম। বাস্তবিক ওরকমভাবে ঝড়ের গতিতে ওই পরিমাণ মদ্যপানের পরও সে যে চেতনায় আছে তা শুঁড়ির ছেলে হয়েও আমি আন্দাজ করতে পারিনি। তার ক্ষমতা সম্পর্কে আমার ধারণা সীমা ছেড়ে অসীমের দিকে ধাবিত হতে লাগল।

হতাশভাবে আবার হুইলের পিছনে বসে পড়ে বললাম, বাড়ি এসে গেছে রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ একটা হাই তুলল। গাড়ির ছোট্ট পরিসরে যতখানি সম্ভব হাত পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর হঠাৎ নেশাটা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসে আমার দিকে চেয়ে বলল, আরে? তুমি কে বলো তো! মুখটা চেনা চেনা লাগছে।

একটু ভীত গলায় আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমি রবি সর্বজ্ঞ।

ওঃ হোঃ। উই ওয়্যার ইন দি সেম কলেজ। কিন্তু আমি এখানে কেন?

এটাই তো তোমার বাড়ির রাস্তা রুদ্রাক্ষ?

তা জানি। কিন্তু এ সময়ে বাড়িতে ঢুকলে আমার বাবাই আমাকে বের করে দেবে। বলবে, রুদ্রাক্ষ, গো অ্যান্ড সি দি লাইফ। ডোন্ট বি এ সিলি হোম—সিক কিচেন—ক্যাট।

বিপন্ন গলায় আমি বলি, তা হলে?

রুদ্রাক্ষ হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে বলল, আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও আছে। চলো সর্বজ্ঞ, লেট আস কিপ ইট।

কিন্তু আমার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই রুদ্রাক্ষ।

তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি আমার বন্ধু, বুজম ফ্রেন্ড। তোমাকে নিয়ে গেলে কেউ কিছু মনে করবে না, বরং খুশিই হবে। লীনার হবিই হল মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস।

লীনা কে?

আমার বসের মেয়ে। জেম অফ এ গার্ল।

আমি গোয়েন্দার মতো মাথা খাটিয়ে প্রশ্ন করি, তার সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?

রুদ্রাক্ষ আবার একটা হাই তুলল। নিষ্কম্প হাতে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর একটু ভাবালু গলায় বলল, তুমি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের নাম শুনেছ?

আমি অপমান বোধ করে আহত গলায় বললাম, না শোনার কী? ইন ফ্যাকট আমাকে ইস্কুলে লেডি উইথ দা ল্যাম্প কবিতাটা পড়তে হয়েছিল।

রুদ্রাক্ষ খুশি হয়ে বলল, লীনা হচ্ছে একজ্যাক্টলি সেইরকম। চোখ বুজে একটু ইম্যাজিনেশনকে খুঁচিয়ে তোলো। আহাঃ, চোখটা বোজোই না।

আমি বুজলাম।

রুদ্রাক্ষ বলল, কল্পনা করো, যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ও আহত সৈনিকরা পড়ে আছে। সন্ধে হয়ে এসেছে। কেউ কোথাও নেই। আহত সৈনিকরা কেউ বলছে, 'জল! জল!'। কেউ কাতরাচ্ছে, 'ওরে বাবা! মরে গেলুম!' কেউ মৃত্যুযন্ত্রণায় নীল হয়ে খাবি খাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছো সর্বজ্ঞ?

পাচ্ছি। তবে ফোকাসিংটা ঠিক হচ্ছে না। একটু আবছা।

তাতেই হবে। এবার কল্পনা করতে থাকো, একজন মহিলা একটা ছোট্ট লণ্ঠন হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকছেন করুণায় দুটো চোখ ভরা। আহত সৈনিকদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন, অ্যান্টিসেপটিক লাগাচ্ছেন, দিচ্ছেন টেট ভ্যাক অ্যান্ড ফার্স্ট এইড—

সে আমলে ওসব ছিল না রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমার ইমাজিনেশন খুব পুয়োর সর্বজ্ঞ। ছিল না আমিও জানি। তা বলে কল্পনা করতে দোষ কী? জাস্ট দৃশ্যটা কল্পনা করে যাও। একটা যুদ্ধক্ষেত্র, আহত সৈনিক ও করুণাময় একটি মেয়ে। কনসেনট্রেট অন দা গার্ল। করেছ?

চোখ বুজে আমি প্রাণপণে দৃশ্যটা কল্পনা করতে করতে বলি, করেছি। কিন্তু সময়টা সন্ধ্যা বলে মুখটা ভালো দেখতে পাচ্ছি না।

ডোন্ট বি সিলি। মুখটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল হৃদয়।

তা বটে।

লীনা অবিকল ওই রকম। এই জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে চারদিকেই পড়ে আছে মার—খাওয়া, আহত, পরাজিত সব সৈনিক। তার মধ্যে লীনা একটা লণ্ঠন হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিচ্ছে প্রলেপ, মুখে তুলে দিচ্ছে তৃষ্ণার জল। দেখতে পাচ্ছো?

আমি চোখ বোজা রেখেই বললাম, খানিকটা। তবে লীনার হাতে লণ্ঠনটা কীসের?

বিরক্ত রুদ্রাক্ষ বলে, সর্বজ্ঞ, আমি জানি প্রপার নেমস আর ননকনোটেটিভ। অর্থাৎ নামের সঙ্গে লোকটার প্রায়ই মেলে না। কিন্তু তোমার সর্বজ্ঞ পদবিটার সঙ্গে তোমার অ্যাকচুয়াল নলেজের হেভেন অ্যান্ড হেল ডিফারেন্স। লণ্ঠনটা তো আর সত্যিকারের লণ্ঠন নয়। রবীন্দ্রনাথের গান শোনোনি? কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো...।

গুন গুন করে একটু গাইলও রুদ্রাক্ষ। বেশ সুরেলা গলা।

শুনেছি।—আমি বললাম।

লীনার লণ্ঠনটাও আসলে ওই প্রাণের প্রদীপ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললাম, এবার বুঝতে পেরেছি। জলের মতো পরিষ্কার। ফর ইয়োর ইনফরমেশন রুদ্রাক্ষ, ওই রবীন্দ্রসংগীতটা আমি বহুবার শুনেছি।

কিন্তু লীনাকে দেখোনি। তার দেখা পাওয়া অবশ্য খুবই শক্ত। শি ইজ এ ভেরি বিজি সোশ্যাল ওয়ারকার। এই কুষ্ঠরোগীর সেবা করতে চলে যাচ্ছে বাঁকুড়া, আবার আদিবাসী গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের মাদুর বোনা শেখাচ্ছে, বন্যার সময় রিলিফ টিম নিয়ে চলে যাচ্ছে মেদিনীপুর। অলওয়েজ মুভিং। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এটাও বড় কথা নয়? এর চেয়েও বড় কথা আছে নাকি?

আছে। লীনা হ্যাজ হার ওন ফিলজফি অফ লাইফ।

এবার আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না। উষ্মার সঙ্গে বলেই ফেলি, কিন্তু রুদ্রাক্ষ, একটু আগেই তুমি মাতাল অবস্থায় বলেছ, মেয়েটা তিনবার ডিভোর্স করেছে এবং তোমার বস চায় তুমি ওকে বিয়ে করো এবং তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও না।

রুদ্রাক্ষ প্রায় দশ সেকেন্ড স্তম্ভিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, বলেছি, কিন্তু মাতাল অবস্থায় নয়। জীবনে আমি কখনও মাতাল হইনি সর্বজ্ঞ।

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, অফিসের ঘরে যে রুদ্রাক্ষকে আবিষ্কার করে আমি উল্লসিত হয়েছিলাম সে আর এ এক নয়। পেটে মদ না থাকলে রুদ্রাক্ষ অতি সাধারণ ডিফেনসের খেলোয়াড়। তখন তার ওপর ছড়ি ঘোরানো আমার মতো লোকের পক্ষেও সম্ভব। কিন্তু ছ'পেগ হজম করার পর খোলস ছেড়ে যে রুদ্রাক্ষ বেরিয়ে এসেছে সে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, সাহসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। একে আর—একটু সাবধানে ট্যাকল করা উচিত মনে হওয়ায় আমি স্ট্র্যাটেজি পালটে তার পিঠ চাপড়ে বললাম, ফরগেট ইট। মাতাল শব্দটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু লীনার তিনটে বিয়ে এবং ডিভোর্স ইত্যাদির ব্যাপারটা কি ভালো? অবশ্য তোমার যদি কোনও সফট কর্নার থেকে থাকে তা হলে কিপ ইট এ সেক্রেট, আমি শুনতে চাই না।

রুদ্রাক্ষ মাথা নেড়ে বলল, আরে না। লীনার কোনও সেক্রেট নেই। তার তিনবার বিয়ের কথা সবাই জানে। আর ওই বিয়েগুলোও আসলে তার পরোপকারী স্বভাবেরই একটা দিক। যাকে বলা যায় বেনিভোলেন্ট ম্যারেজ।

তার মানে কী রুদ্রাক্ষ?

লীনার হবি হচ্ছে খুঁজে খুঁজে হতাশাগ্রস্ত, ভেঙে পড়া, বিধ্বস্ত কোনও মানুষকে বের করে তাকে বিয়ে করা। তারপর আস্তে আস্তে আশা, ভরসা, ভালোবাসা ও সাহচর্য দিয়ে লোকটাকে আবার গড়ে তোলে সে। যখন লোকটা বেশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় এবং নিজের শক্তিতে চলতে শুরু করে তখন লীনা তাকে ডিভোর্স করে আবার নতুন কোনও বিধ্বস্তকে খুঁজতে থাকে।

আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি না। এবার আমার স্তম্ভিত হওয়ার পালা।

রুদ্রাক্ষ আমার দিকে চেয়ে একটা চোখ টিপে বলে, লেট আস গো সর্বজ্ঞ। লীনা ইজ ইন্টারেস্টিং।

আমি অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিই।

।। ছয় ।।

আমি অকপটে বলতে চাই, লীনা যে ইন্টারেস্টিং সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আগেকার দিনে নিষ্ঠাবতী বিধবারা যেভাবে চুল ছেঁটে ফেলত তার চুল তেমনই ছাঁটা। খদ্দরের একটা নামাবলি শাড়ি তার পরনে। গায়ের ব্লাউজটিও নামাবলির। ডান হাতে অত্যন্ত দামি একটি ক্যালকুলেটর কাম ডিজিটাল রিস্টওয়াচ ছাড়া আর কোনও আভরণ নেই। গলায় একটা ঝুটো বা আসল মুক্তোর মালা অবশ্য আছে, কানে দুটো রিং এবং সে দুটিও সোনার হওয়াই সম্ভব। মুখখানা একটু ভোঁতা হলেও আহ্লাদ এবং লাবণ্যে ভরা। চোখ দুটি বেশ টানা টানা। ঠোঁট পুরন্ত ও সর্বদাই হাস্যময়। লীনা খুব ছিপছিপে নয় বটে তবে আঁটো গড়ন। রং ফরসাই তবে রোদে ঘোরার ফলে কিছু তাম্রাভ। বয়স ত্রিশের আশেপাশে। গ্র্যান্ড হোটেলের কুচবিহার স্যুইটে লীনা হাতে একটা কোমল পানীয়ের গেলাস নিয়ে বসে ছিল। তাকে ঘিরে বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার অন্তত জনা দশেক ভদ্রলোক। রুদ্রাক্ষ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর আমি রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। কারণ এই দশজনের কয়েকজন বেশ বড় বড় শিল্পপতি, কয়েকজন মস্ত মস্ত মালটিন্যাশনালের বিগ একজিকিউটিভ, একজন প্রাক্তন এম পি এবং একজন ফিল্মস্টার। আশ্চর্যের বিষয় সকলেই লীনাকে তেল দিচ্ছে, খুশি করার চেষ্টা করছে। আমি গাড়ল হলেও জানি, লীনা একটা মালটিন্যাশনালের বড় কর্তার মেয়ে বলেই তার এত খাতির নয়। অন্য কিছু আছে।

রুদ্রাক্ষ প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের জন্য একটু সময় ফাঁক দিয়েই কাজে লেগে পড়ল। টকাটক দুটো হুইস্কি নামিয়ে ধাতস্থ হল সে। আমি তাকে কানে কানে জিজ্ঞেস করলাম, লীনাকে এই সব বড় বড় লোক তেল দিচ্ছে কেন রুদ্রাক্ষ?

রুদ্রাক্ষ আমার কানে কানে বলল, তুমি গাড়ল না হলে বুঝতে আজকাল সোশ্যাল ওয়ারকারদের প্রতিপত্তি কী প্রচণ্ড! মিনিস্টার থেকে ফিল্মস্টার, ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট থেকে বস্তিবাসী, ধর্মপ্রতিষ্ঠান থেকে নকশাল সব

জায়গাতেই সোশ্যাল ওয়ারকারদের অবাধ এবং অনায়াস যাতায়াত। এঁরা দুই বিরুদ্ধ শিবিরের মধ্যে চমৎকার লিয়াজোঁ বা যোগাযোগকারী হিসেবেও কাজ করেন। ধরো, কোনও বিগ ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট কোনও মিনিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় পেরে উঠছে না, তখন সে এই লীনার মতো কোনও সোশ্যাল ওয়ারকারকে ধরে। যেমন—তেমন সোশ্যাল ওয়ারকারকে দিয়ে অবশ্য এ কাজ হয় না। আপার ক্লাস, গুড ব্যাকগ্রাউন্ড, সঠিক ফ্যামিলি কানেকশন ছাড়া লীনার দরের সোশ্যাল ওয়ারকার হওয়া অসম্ভব।

তা হলে সোশ্যাল ওয়ার্কও কি একটা কেরিয়ার?

এ ভেরি লুক্রেটিভ কেরিয়ার। একটা নন—পলিটিক্যাল মুখোশ থাকলে তো কথাই নেই। গ্রান্ড হোটেলের এই পার্টির পরই হয়তো লীনাকে দেখা যাবে জগদ্দলের কুলি ধাওড়ায়। তখনও দেখবে মুখে কোনও বিরক্তি নেই, হাসিটিও অমলিন। সোশ্যাল ওয়ারকার হতে গেলে এসব বেসিক গুণ চাই।

লীনার সবই আছে, না?

সবই আছে। কিন্তু এখন লীনা ইজ লুকিং অ্যাট ইউ উইথ সাম ইন্টারেস্ট সর্বজ্ঞ। গুড লাক টু ইউ।

লীনার দিকে চেয়ে আমি একটু লজ্জায় পড়লাম। বাস্তবিকই লীনা আমার দিকে খুবই কৌতূহলভরে চেয়ে আছে। শরীর শ্লথ, চোখের দৃষ্টি কোমল ও গভীর।

লীনা খুবই স্নেহের সঙ্গে বলল, আপনি কিছু নিচ্ছেন না? হুইস্কি বা অন্য কিছু?

আমি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বললাম, আমি খাই না।

তা হলে নরম কিছু খান। আসুন, আমার পাশে এসে বসুন।

আমি একটু ভয়ে ভয়েই আদেশ পালন করি।

লীনা একটা নরম পানীয় আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, আপনি যে রুদ্রাক্ষর পুরনো বন্ধু নন তা বুঝতে পারছি। আমি ওর পুরনো বন্ধুদের চিনি। আপনি ওর কীরকম বন্ধু?

খুব।—আমি সংক্ষেপে বলি ও সত্য গোপন রাখি।

লীনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ওকে যে কীভাবে উদ্ধার করা যাবে তাই আজকাল আমার ভাবনা। একদম অ্যালকোহোলিক হয়ে গেছে। ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কাজে মন নেই, কেরিয়ারে মন নেই। ওকে নিয়েই আমার এখন সবচেয়ে বেশি জ্বালা।

আমি লীনার বাড়িয়ে দেওয়া প্লেট থেকে একটা চিজ পকোড়া তুলে চিবোতে চিবোতে বলি, ওর সম্পর্কে আপনার কোনও প্ল্যান আছে?

লীনা আমার মুখের দিকে আনমনে চেয়ে বলে, একজনকে নিয়ে কি আমার কাজ? হাজার জনার প্রবলেম সামলে আবার আর—একজনকে আলাদা করে সামলানো কতকাল আর সম্ভব?

আমি নাক সিঁটকে বললাম, রুদ্রাক্ষ এক নম্বরের মাতাল আর মিথ্যেবাদী। ঘুষও খায়। ইন ফ্যাক্ট ওর অনেক গার্লফ্রেন্ডও আছে।

লীনা মাথাটি একদিকে কাত করে সায় দিয়ে বলল, সব জানি। আর তাই তো ওর জন্য এত ফিল করি। ভীষণ আত্মবিশ্বাসের অভাব ওর। অত কোয়ালিফিকেশন, সামনে দুর্দান্ত কেরিয়ার, তবু কেমন বেচারা—বেচারা ভাব, লক্ষ করেছেন?

হ্যাঁ। ওকে কোনও মেয়ের বিয়ে করা উচিত নয়।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, না না, একথাটা আপনি ঠিক বললেন না মিস্টার সর্বজ্ঞ। আমার প্রথম হাজব্যান্ডটিকে যখন আমি বিয়ে করি তখন সে এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় ছিল।

এর চেয়েও খারাপ?—আমি অবাক হওয়ার চেষ্টা করি।

অনেক খারাপ। একটাও সত্যি কথা বলত না। মানে, বলতে পারত না আর কী। এমনকী আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সাতদিনে ও নিজের সাতটা নাম আমাকে বলেছে। কোথা থেকে সব ফলস বিলিতি ডিগ্রির সার্টিফিকেট জোগাড় করে বড় বড় কোম্পানিতে চাকরি নিত। দু'চার মাসের বেশি কোথাও রাখত না।

পরপর দুজন বউ ওকে ছেড়ে চলে গেছে। সকাল থেকে রাত অবধি মদ খেত, তবু নেশা হত না। সব সময়ে বিড়বিড় করে কী সব বকত। অসভ্য সব স্ল্যাং ব্যবহার করত কথায় কথায়। একবার শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পথে গাড়িতে আলাপ হয়ে যায়। সেও এক ঘটনা। বিনা টিকিটে দিব্যি ফিটফাট সাহেব সেজে ফার্স্ট ক্লাসে বসে একটা অবজারভার কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে পাইপ টানছিল। সাধারণ চেকার হলে ওর ওই কেতা দেখে কাছে ঘেঁষতেই সাহস পেত না। তবে সেদিন ছিল স্পেশাল চেকিং। বর্ধমান স্টেশনে ওকে পুলিশ ধরে নেয় আর কী। ও বারবার বোঝাচ্ছিল যে ওর পিকপকেট হয়েছে। কিন্তু ওর মুখ দেখেই আমার মনে হচ্ছিল, মিথ্যে কথা বলছে। যাকগে, আমি ইন্টারভেন করি এবং টিকিটের দাম দিয়ে দিই। পরে যখন বুঝলাম লোকটা টোটাল ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছে তখনই ডিসিশন নিলাম, এই লোকটার স্যালভেশন দরকার। বছর তিনেক লেগেছিল ওকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনতে।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি, এখন সে কী করছে?

এখন আমেরিকায়। ভালো চাকরি করছে, একজন আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে।

আর মিথ্যে কথা বলে না?

এই প্রশ্নে লীনা অস্বস্তি বোধ করে বলে, ঠিক তা নয়। তবে অকারণে বলে না। এখন তার সমস্ত মিথ্যে কথাগুলোই মোটিভেটেড অ্যান্ড প্রফিটেবল।

আর সেইসব ফলস ডিগ্রি?

সেগুলো আমি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তবে দু'—একটা আমি কাজে লাগবে ভেবে পোড়াইনি। শেষ পর্যন্ত সেইসব ভুয়ো বিদেশি ডিগ্রির জোরেই ওকে আমেরিকা পাঠাতে পেরেছিলাম।

মদ খাওয়া কি ছেড়ে দিয়েছে?

না, তবে আগের মতো বেহেড হয় না। আমেরিকার অ্যালকোহলও খুব ভালো। আমি ওকে ড্রিংক করার সময় মাখন খেয়ে নিতে শিখিয়ে দিয়েছি। তাতে লিভারটার ওপর একটা প্রলেপ থাকে। ও সেটা এখনও মেনে চলে।

আপনি ওকে ডিভোর্স করলেন কেন?

ডিভোর্স না করে কী করব? আমার তো বিয়ের দরকার ছিল না। আমি তো চিরকুমারী থাকব বলে স্থির করে নিয়েছি। বিয়ে করেছিলাম জাস্ট একটা সাফারিং সোলকে বাঁচার পথ দেখাতে। সে কাজটা যখন শেষ হল তখন আবার কুমারী জীবনে ফিরে এলাম।

আর আপনার সেকেন্ড হাজব্যান্ড?

ওঃ, সে ছিল একজন পলিটিক্যাল লিডার। খুব অ্যাম্বিশাস। কিন্তু মুশকিল হল, কোনও দূরদৃষ্টি ছিল না। দলের মধ্যে কোন গ্রুপটা বেশি পাওয়ারফুল বা কাকে হাতে রাখতে হবে তা বুঝতে পারত না বলে কিছুতেই ওপরে উঠতে পারছিল না। শেষ অবধি রাগ করে দল ছেড়ে অন্য দলে গেল। তারপর নিজেই একটা দল তৈরি করল। তারপর সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবত। অ্যাকচুয়ালি তার সঙ্গে আমার আলাপ কালীঘাটে। সে একটা কমণ্ডলু দরাদরি করছিল। তার সঙ্গে আগে আমার একটু আলাপ ছিল। তাই কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কমণ্ডলু কিনছেন কেন? সে বলল, সাধু হয়ে যাচ্ছি যে। বড় মায়া হল তাকে দেখে। কয়েকদিন তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে রুদ্রাক্ষের মালা, কম্বল, চিমটে, গাঁজার কলকে এইসব কিনতে লাগলাম। হি ফেল ইন লাভ উইথ মি। আমাদের বিয়েটা অবশ্য খুব আইনসম্মতভাবে হয়নি। কারণ তার আগের স্ত্রী ছিলেন। ফলে আমরা দুজন সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী হয়ে হরিদ্বারে চলে যাই। সেখান থেকেই আমরা কলকাঠি নাড়তে থাকি। একজন প্রাক্তন নেতা সাধু হয়ে গেছে এই ঘটনার কিছু পাবলিসিটি দরকার ছিল।

পলিটিক্সের সঙ্গে সাধু—সন্ন্যাসী ও জ্যোতিষীদের যোগাযোগ অনেকদিনের। সন্ন্যাস নেওয়ার পর আমরা দুজনেই একটা মোটিভেটেড পাবলিসিটির শিকার হয়ে পড়ি। পত্র—পত্রিকায় আমাদের নিয়ে দারুণ লেখালেখি হতে লাগল। ও অবশ্য তাতে খুব রেগে যেত। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, ফিলম ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন, পলিটিক্সেও তেমনই গুড বয় বা গুড গার্লদের কোনও স্থান নেই। আমার সেকেন্ড উনির এই একটা ব্যাপারে কিছু ডেফিসিয়েন্সি ছিল। ওই মোটিভেটেড পাবলিসিটি সেই অভাবটা পূরণ করে দেয়। লোকে ওর সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। চায়ের দোকানে, পাড়ার আড্ডায়, অফিস—কাছারিতে ওকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটা হয়েওছিল দারুণ। একজন নেতা শুধু সন্ন্যাসীই হয়ে যায়নি, একজন সমাজসেবিকাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়েও গেছে। লোকে নিন্দেও করতে লাগল, প্রশংসাও করতে লাগল। ছ'মাসের মধ্যেই দেখলাম, ওর কাছে হিল্লি—দিল্লি থেকে রিপোর্টার আসছে, ছোট বড় নেতারা আসছে। প্রভাব—প্রতিপত্তি ও খাতির দারুণভাবে বেড়ে গেছে ওর। এক বছরের মধ্যেই দিল্লিতে আশ্রম করে দিল কয়েকজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। বহু জায়গা থেকে ডাক আসতে লাগল। অবশ্য ওর পক্ষে ডাইরেক্টলি আর পলিটিক্সে ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে রাজনৈতিক জগতে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা নিতে শুরু করল। এখন যে—কোনও ক্যাবিনেট মিনিস্টারের চেয়েও ওর ক্ষমতা বেশি। আফটার হিজ সামথিং সাকসেস আই লেফট হিম।

আমি অতিশয় উত্তেজনায় আরও তিনটে চিজ পকোড়া খেয়ে ফেলি। সঙ্গে দু বোতল কোমল ঠান্ডা পানীয়। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে আমি কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে নরম গলায় জানতে চাই, আর তৃতীয় জন?

আমাদের নিবিষ্টভাবে কথা বলতে দেখে অন্যান্য অতিথিরা একটু সশ্রদ্ধ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বলছেন। কেউ আমাদের কথায় বাধা দিচ্ছেন না।

লীনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, থার্ড কেসটা কিছুটা ট্র্যাজিক। আমার থার্ড হাজব্যান্ড ছিল একজন বেকার। ভারী একগুঁয়ে রকমের বেকার। চাকরি না পাওয়ার এরকম কপাল বড় একটা দেখা যায় না। যেখানে চারজন লোক নেবে সেখানে সে হত পঞ্চম। যেখানে দুশো লোককে চাকরি দেওয়া হবে সেখানে তার স্থান বাঁধা ছিল দুশো এক নম্বর জায়গায়। সারাদিন সে কলকাতার পথেঘাটে ঘুরে ঘুরে দোকানের জিনিসপত্র দেখত আর ভেবে রাখত, চাকরি পেলে কোন কোন জিনিস কিনবে। বিয়ে করারও একটা লোভ ছিল তার। সেই কারণে রাস্তায় ঘাটে সুন্দরী মেয়েদেরও লক্ষ করত সে। আমার সঙ্গে আলাপ একটা রি—ইউনিয়নে। সিঙাড়া খেতে খেতে সে তার গল্প শোনাচ্ছিল আমাকে। আমার মনে হল, এরকম কেস তো কখনও হাতে নিইনি! দেখিই না নিয়ে। আলাপের দু'মাসের মধ্যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমার প্রভাব—প্রতিপত্তি যথেষ্ট এবং অনেক বিগ কানেকশনসও আছে। একজন বেকারকে চাকরি দেওয়া কোনও প্রবলেম নয়। কিন্তু আগেই বলেছি, লোকটা ছিল একগুঁয়ে। স্ত্রীর তদবিরে চাকরি নিতে কিছুতেই রাজি নয়। এমনকী ব্যবসা করার জন্য একটা ব্যাঙ্কের লোন পাইয়ে দিলাম, সেটাও নিল না। আলটিমেটলি সে একটা দোকান খুলল। সেটা ফেল পড়ায় রিকশা চালাতে শুরু করল। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় রিকশা ছেড়ে বাড়ির দালালি ধরল। শেষ অবধি বি এ পাশ সেই ছেলেটি আবার বেকার হয়ে পড়ল। আমি তাকে উদ্ধারের অনেক পন্থা ভেবে দেখেছি। কিন্তু এ যুগে ওরকম অনেস্ট, বোকা এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোক অচল। কিন্তু আমার কাজ তো আমাকে করতেই হবে। সুতরাং আমি তাকে শেষ পথটা দেখিয়ে দিলাম। ওয়ান ফাইন মর্নিং হি কমিটেড সুইসাইড।

আমার ঠান্ডা পানীয় অনেকটা চলকে গিয়ে লীনার হাঁটু ও মেঝের কার্পেট ভিজে গেল। চোখ কপালে তুলে বললাম, বলেন কী?

লীনা দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, দি ওনলি ওয়ে আউট ফর এ কনফার্মড আনএমপ্লয়েড।

ধাতস্থ হতে আমার অনেকটা সময় লাগল। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, একে তা হলে ডিভোর্স করেননি?

লীনা চোখ কপালে তুলে বলল, ওঃ সিয়োর। ডিভোর্স করলে আইনের চোখে আমি আবার কুমারী। কিন্তু বাইচান্স ম্যারেড অবস্থায় হাজব্যান্ড মারা গেলে আমার গায়ে যে বিধবার স্ট্যাম্প মারা হয়ে যাবে। তাই আমি তাকে স্যালভেশনের উপায়টি বলার আগেই ডিভোর্সের স্যুট ফাইল করে দিই। ডিক্রিটি হাতে পাওয়ার মুখে তাকে স্যালভেশনের পথটি বলি। সে যখন মারা যায় তখন আমি সম্পূর্ণ কুমারী।

আমার বিনা মদেই কেমন একটু বেসামাল লাগছিল। লীনা আমার হাতের ওপর হাত রেখে সামান্য চাপ দিয়ে বলল, সেই তুলনায় রুদ্রাক্ষের কেসটা তেমন শক্ত নয়। বুঝলেন?

আমি বুরবকের মতো তার দিকে চেয়ে থেকে বলি, রুদ্রাক্ষকে কি আপনি উদ্ধার করবেনই?

করাটা দরকার।

আপনি ওর প্রেমে পড়েননি তো?

লীনা অত্যন্ত নির্লিপ্ত একটু হেসে মাথা নেড়ে বলে, আমি জীবনে কারও প্রেমে পড়িনি। আমার একমাত্র প্রেম হল কাজের সঙ্গে।

আমি মোটামুটি একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লাম। অদূরে রুদ্রাক্ষ অবশ্য পাঁইটের পর পাঁইট মদ উড়িয়ে দিয়েছিল। লীনা সস্নেহে ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আমাকে বলল, ওর জীবনে সবচেয়ে বড় দুঃখ কী জানেন?

আমি সাগ্রহে লীনার মুখের কাছে কান এগিয়ে দিয়ে বলি, কী?

মদ না খেলে ওর ব্যক্তিত্ব জাগে না। অত ব্রিলিয়ান্ট হওয়া সত্ত্বেও রুদ্রাক্ষ ভারী মিনমিনে, মেয়েলি স্বভাবের মানুষ। ওর ধারণা কেউ ওকে সঠিক মূল্য দেয় না। এই কমপ্লেক্স ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি ওর ভিতরে সেই দৈত্যটাকে জাগিয়ে তুলতে চাই, যার নাম পুরুষকার। সেটা জেগে উঠলেই আমি ওকে ছেড়ে দেব, টু হুম হি মে কনসার্ন।

আমি আর—একটা কোল্ড ড্রিংক খাই এবং সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে পড়ি।

।। **সাত** ।।

পরদিন সকালেই লাটুবাবু আমার ঘরে হানা দিলেন। মুখে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার ছাপ। চারদিকে চেয়ে বললেন, এঃ, তোমাকে যে একেবারে একঘরে করে ফেলেছে হে!

একঘরে কথাটার যে আর—একটা অর্থ হয় তা দেখে আমি তাঁর খুব তারিফ করলাম।

লাটুবাবু আমার বিছানায় বসে কপালের দুশ্চিন্তাজনিত স্বেদ রুমালে মুছে বললেন, বাপের সম্পত্তি তা হলে কিছুই প্রায় হাতাতে পারোনি।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে মৌন থাকি। লাটুবাবু আমার দুর্দশাটা ভালো করে দেখুন এবং হৃদয়ঙ্গম করুন। তাতে যদি তাঁর হৃদয় একটু গলে।

লাটুবাবুর হৃদয়টা ইদানীং একটু নরমই যাচ্ছে। হঠাৎ বলে ফেললেন, আচ্ছা, রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়েটা লাগাও তো, আমি না হয় তোমার বকেয়া টাকার দশ হাজারই এক থোকে দিয়ে দেব।

আমার হার্টের ব্যামো নেই, তবু বাঁদিকের পাঁজরের পিঁজরাপোলে হৃদযন্ত্র জবাই করা মুরগির মতো ডানা ঝাপটাতে লাগল। ঠিক শুনেছি কি না সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পাচ্ছিলাম না।

লাটুবাবু কাজের কথায় এসে বললেন, এবার বলো কাল কী কী হল।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, বিয়েটা যত কঠিন হবে ভেবেছিলাম তার চেয়েও কঠিন লাটুবাবু। রুদ্রাক্ষ এক জাঁহাবাজ মহিলার পাল্লায় পড়েছে।

আবার মহিলা কে? একটা তো বলছিলে বসের মেয়ে।

সেই।

আটকাচ্ছে কোথায়?—বলে লাটুবাবু পা তুলে বসলেন এবং সবটা খুব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, তোমার ঋণটা অনেকদিন পড়ে আছে আমার কাছে। ভাবছি, দশ নয়, বিয়েটা

যদি লাগাতে পারো তা হলে পনেরোই দিয়ে দেব।

আমি ব্যথিত মুখে বলি, আপনি আর বলবেন না। আমার স্ট্রোক হতে পারে।

লাটুবাবু সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, নিজের চোখেই তোমার অবস্থাটা দেখে গেলাম। বলতে কী, খুবই খারাপ অবস্থায় আছ তুমি। তোমার জন্য এটুকু করা তো কর্তব্যই।

লাটুবাবুর এই কথায় আমার কান্না পেয়ে যায়। ধরা গলায় আমি বলি, আপনার জন্য আমি অনেক কিছু করব লাটুবাবু। ঝিলিকের ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।

লাটুবাবু একটা বড় শ্বাস ফেলে বলেন, তোমার হাতেই দিয়েছি। ছেলেটা খুব গাড্ডায় পড়েছে, ওকে তুলে আনতেই হবে। ওরকম ব্রিলিয়ান্ট একটা ছেলেকে এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

নিশ্চয়ই না লাটুবাবু।—আমি পোঁ ধরলাম।

লীনা না কী নাম যেন বললে মেয়েটার!

লীনাই।

তা তার যদি অত পতিত উদ্ধারের নেশা থেকে থাকে তবে রুদ্রাক্ষ কেন, তুমিই তো আছ।

কথাটা আমার মাথায় খেলেনি। আমি একটু থতমত খেয়ে গাড়লের মতো চেয়ে রইলাম।

লাটুবাবু বললেন, তোমার চেয়ে বিধ্বস্ত, অসহায়, আত্মবিশ্বাসহীন লোক সে আর কোথায় পাবে? শোনো রবি?

আজ্ঞে, শুনছি। বলুন।

লীনার কাছে গিয়ে এবার থেকে বরং নিজের কাঁদুনি একটু গেয়ো। ঠিকমতো যদি কেসটা পুট আপ করতে পারো তবে লীনা তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবেই। তাতে তোমারও হিল্লে হবে, ঝিলিকেরও হিল্লে হবে।

যে আজ্ঞে। তা হলে ওই পনেরো হাজার না কত যেন বললেন—

হ্যাঁ হ্যাঁ, পাক্কা পনেরো হাজার। হার্ড ক্যাশ। ও নিয়ে ভেবো না। আমার কথার খেলাপ কখনও হয় না। আর শোনো, পরশু রুদ্রাক্ষের বাড়ি থেকে ঝিলিককে দেখতে আসবে। তুমিও একটু থেকো।

আমি চোখের আনন্দাশ্রু গোপনে মুছে ফেলে বললাম, যে আজ্ঞে।

লাটুবাবু বিদায় নিয়ে যাওয়ার পরও আমি বহুক্ষণ সেই মহামানুষের গমনপথটির দিকে কৃতজ্ঞচিত্তে চেয়ে রইলাম।

আমাকে চমকে দিয়ে দরজায় একটা মুশকোমতো লোক এসে দাঁড়ায়। আনমনা ছিলাম বলে, নইলে রাখালকে দেখে আমার চমকানোর তেমন কিছু নেই। রাখাল তো আজকাল খুন—টুন করে না।

রাখাল গম্ভীরমুখে জিজ্ঞেস করে, ও লোকটা কে এসেছিল বলো তো?

একজন মহাপুরুষ।

রাখাল অবাক হয়ে বলে, কেমন চামার—চামার চেহারা।

ও কথা বলতে নেই রাখাল।—আমি অর্থাৎ রবি সর্বজ্ঞ বিগলিত হয়ে বলে।

বউদি ডেকে বলল, দেখে আয় তো রবির ঘরে কে এসেছে। তাই এলুম। লোকটার তা হলে কোনও মতলব নেই বলছ?

আমি সম্মোহিতের মতো বলি, আছে। তবে তা মহৎ মতলব।

রাখাল বিরক্ত হয়ে বলে, তোমার কথাগুলো আজ যেন কেমনধারা। তা শোনো, তোমাকে বলতে এলুম, ওদিকে কাজ কিন্তু ফতে হয়ে এসেছে। তান্ত্রিক কাল এসেছিল। আয়োজন—টায়োজন সব শেষ। কাল রাত বারোটায় সে এ বাড়ির ছাদে পুজোয় বসবে। পরশু শুরু হবে কাজ।

আমি আতঙ্কিত হয়ে বলি, কী কাজ?

ন্যাকা সেজো না দাদাবাবু। সময় থাকতে তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। শুনলে না। এখন আর কারও কিছু করার নেই। এখন তান্ত্রিক বুঝবে আর তুমি বুঝবে।

বাণ কি খুব লাগে রাখাল?

লাগবে না? ভীষণ লাগে! লোকে ধড়ফড় করতে থাকে, মুখ দিকে ভলকে ভলকে রক্ত বেরোয়, চোখের তারা উলটে যায়। সে এক ভীষণ অবস্থা।

ওরে বাবা!—বলে আমি ককিয়ে উঠি। একটা সুন্দর সকাল হঠাৎ যেন মেঘলা হয়ে যায়।

রাখাল হঠাৎ একটু সান্ত্বনার সুরে বলে, তবে তুমি একেবারে মরবে না দাদাবাবু। তোমাকে অন্যভাবে বাঁচিয়ে রাখারও একটা ব্যবস্থা হচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, সে আবার কীরকম?

রাখাল একগাল হেসে বলে, আসলে বউদির এক মামার খুব অসুখ। এখন—তখন অবস্থা। সামনের অমাবস্যা কাটবে না বলে তান্ত্রিক গুনে বলে দিয়েছে।

তাই নাকি?

তবে আর বলছি কী? কিন্তু যদি আত্মা বদলে দেওয়া যায় তবে লোকটা আরও কিছুদিন টিকে যাবে। তাই ঠিক হয়েছে তান্ত্রিক তোমার আত্মাটাকে নিয়ে সেই মামার শরীরে ভরে দেবে। পুরনো ভাড়াটেকে তুলে নতুন ভাড়াটে বসানোর মতো ব্যাপার আর কী।

বলো কী?—আমার চোখ কপালে ওঠে।

তবে খারাপ হবে না। মামার বয়সটাই যা একটু বেশি। সত্তর—টত্তর হবে। তবে টাকাপয়সা জোতজমি মেলা। অন্যের শরীরে ঢুকতে যদি ঘেন্না না করো তবে শেষ জীবনটা সুখেই কাটাতে পারবে। তা ছাড়া নিজের দাদার মামাশ্বশুর হওয়াটাই বা কম কী? ক'টা লোক হতে পেরেছে আজ অবধি?

কী করে আমি রাখালকে বোঝাব যে, বড়দা মহীতোষের মামাশ্বশুর হওয়ার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই? সেই বৃথা চেষ্টা না করে আমি অন্য একটি জটিল প্রশ্ন তুললাম, বুড়ো মানুষটাকে জোর করে বাঁচিয়ে রেখে লাভটা কী বলো তো রাখাল?

সে হল আপন মামা, আর তুমি হলে গিয়ে পরস্য পর নামমাত্র দেওর।

আমি মিন মিন করে বলি, তা বটে। কিন্তু প্রাণ বিনিময় হলে আমিই তো বউদির মামা হচ্ছি। আর মামা হবে গিয়ে দেওর।

রাখাল মাথা নেড়ে বলে, সেরকম বন্দোবস্ত হয়নি। তোমার প্রাণটা মামার শরীরে সেঁধোবে বটে, কিন্তু মামারটা আর তোমার শরীরে ঢুকবে না।

আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বলি, তা কেন? এক যাত্রায় পৃথক ফল কি ভালো?

রাখাল হিসেবি হাসি হেসে বলে, পৃথক ফল কি আর সাধে হয়? খরচ আছে না? মামার আত্মা তোমার শরীরে ঢোকাতে গেলে খরচ প্রায় ডবল দাঁড়াবে যে। বড়দাদাবাবুর তবু ইচ্ছে ছিল। বউদিই বেঁকে দাঁড়ালেন।

রাখাল চলে যাওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ হতাশ হয়ে বসে থাকি। মাত্র পরশুদিন পর্যন্ত যার আয়ু, এই পৃথিবীতে তার আর কী করার থাকতে পারে তা আমি বুঝতে পারছি না। যে—কোনও মহৎ কাজ করার পক্ষে সময়টা বড়ই কম। তা ছাড়া মরতে আমার তেমন ইচ্ছেও করছে না।

তবে একটা কথা ভেবে আমার একটু ভালোই লাগছিল। এই কাপুরুষ মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্ববর্জিত রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে আমার নিরন্তর সহবাস শেষ হতে চলেছে। সে মরলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সহমরণে যেতে হবে বটে, তবু সে যে মরছে এটা বোধহয় পৃথিবীর পক্ষে একটা সুখবর।

আমার বেড়াল শহিদ সম্ভবত আমার শোকাহত অবস্থাটা টের পেয়ে কোলে উঠে বসে রইল। আমি আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত বোলাতে লাগলাম।

সর্বহারাদের যেমন শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারানোর ভয় নেই, আমারও সেরকমই অবস্থা। এই ঘরখানার আশ্রয় ছাড়া আমারও আর বেশি কিছু হারানোর ছিল না। পৈতৃক বাড়ির এই ঘরখানাই যা আমার শৃঙ্খল বা বন্ধন ছিল। লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেও হত। কিন্তু মুশকিল হল, ওই লোটা কম্বলের

কথায় সেই সাধুর বিখ্যাত গল্পটা এসে পড়ে। তার কৌপীন ইঁদুরে কাটত বলে লোকটা একটা বেড়াল পুষেছিল। তারপর সেই বেড়ালের দুধ জোগান দিতে এল গোরু। গোরু এল তো জরুই বা বাকি থাকে কেন। এইভাবে সাধুর বৈরাগ্যের বারোটা বেজেছিল। অবিকল একই অবস্থা আমারও। বড়দা মহীতোষ এবং বউদি খাবারে বিষ দিয়ে আমাকে মারবার চেষ্টা করছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য আমি মতিবাবুদের বাড়ির সামনেকার খাটাল থেকে একটা বেড়ালের বাচ্চাকে কুড়িয়ে আনি। বলতে কী, বেড়ালটা ছিল আমার গিনিপিগ। সেইজন্য আমি তার নাম রেখেছি শহিদ। আমার প্রাণ বাঁচাতে হয়তো বা তাকে প্রাণ দিতে হবে।

সেই শহিদ এখন আর কচি খোকা বা খুকুটি নেই। দিব্যি ডাগরডোগর প্রাপ্তবয়স্ক বা বয়স্কা হয়ে উঠেছে। বেড়ালদের সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণার দরুন আমি আজও জানি না সে মাদি না হুলো। তার নামটি আমি পুংলিঙ্গাত্মক রাখলেও আমার প্রতি তার আচরণ অনেকটাই পুরুষের প্রতি নারীর মতো। সারাদিন উঞ্ছবৃত্তি করে ঘরে ফেরার পর আমাকে দেখলে শহিদের চোখে সবুজ দ্যুতি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লেজটি শূন্যে নানান বিভঙ্গে ঢেউ ভাঙতে থাকে। তার মিহি ও মোলায়েম মিয়াঁও আওয়াজে সুরেলা ধা নি ধা নি এসে লাগে। আমার কোলে পিঠে উঠে নানাভাবে তার হর্ষ ও রোমাঞ্চ প্রকাশ করতে থাকে।

বেড়ালমাত্রই চোর, বিশ্বাসঘাতক ও নিমকহারাম বলে আমি শুনেছি। তবে তাদের কিছু সদগুণও আছে। তারা একবার যার বশ্যতা মেনে নেয় তাকে সহজে ছেড়ে যায় না। আমার অনুপস্থিতিতে সে সারাদিনই ঘর পাহারা দেয়। আমার ফিরতে দেরি হলে জানালায় বসে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় সে অবিরল করুণ থেকে করুণতর মিয়াঁও ডাকে বাতাস ভারী করে তোলে।

হায়, শহিদ জানে না, স্বীয় মৃত্যুভয়ে ভীত এই মেরুদণ্ডহীন আমি তাকে অগ্রদানীর মতোই ব্যবহার করেছি মাত্র। কিন্তু মুশকিল তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অত সাদামাটা ও ব্যবহারিক থাকেনি। আস্তে আস্তে সম্পর্কের বদল ঘটেছে। ভীষণ বদল ঘটেছে।

আজকাল মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি কি শহিদকে ভালোবাসি? সঠিক বুঝতে পারি না। তবে বাড়ি ফেরার সময় তার জন্য আজকাল আমি একটা অহেতুক আকর্ষণ বোধ করতে থাকি।

পরশুদিন আমার মৃত্যু ঘটবে অথবা আমি হয়ে যাব আমার বড়দা মহীতোষের মামাশ্বশুর। রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদ ঘটে যাবে। আর সেইদিন থেকেই শহিদ আবার রাস্তার বেড়াল হয়ে যাবে। নোংরা ঘাঁটবে, খেতে পাবে না, অন্য বেড়ালদের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হবে, গাড়ি চাপা পড়াও বিচিত্র নয়, দুষ্টু ছেলেরা ঢিল মারবে হয়তো। ভাবতে ভাবতে আমার চোখে জল আসার উপক্রম হল। আমিই যে তাকে একদিন মৃত্যুর দোরগোড়ায় বসিয়ে রাখতাম তা ভুলে গিয়ে আমি শহিদের জন্য আজ একটু কাঁদলাম।

আরও অনেক কিছুর জন্য আমার কান্না পেতে লাগল। থোড়ঘণ্ট আমি বড় ভালোবাসতাম। মরে গেলে আর থোড়ঘণ্ট খাওয়ার উপায় থাকবে না। একটা ডিজিটাল ঘড়ির বড় শখ ছিল। লাটুবাবু টাকা দিলে বাগড়ি মার্কেট থেকে একদিন কিনে ফেলতাম ঠিক। কিন্তু মহাকালে যে লয় হতে চলেছে, তার আর পার্থিব সময় কিংবা ঘড়ি দিয়ে কী হবে? রবি সর্বজ্ঞর খোলসের মধ্যে থেকে এতকাল আমি একটা তুচ্ছ জীবন যাপন করেছি বটে, কিন্তু আজ সেই তুচ্ছ জীবনটার জন্য প্রাণ আনচান করতে লাগল। বউদির মামা কি থোড়ঘণ্ট ভালোবাসে? ডিজিটাল ঘড়ির কি কোনও শখ আছে তার? কালই যদি রাখালের হাত দিয়ে শহিদকে তার বাড়িতে চালান করে দিই তা হলে লোকটা কী মনে করবে?

কাঁদার উপকারিতা অনেক। মনের ভাব লাঘব হয়, চিন্তায় ভারসাম্য আসে, চোখের জলের সঙ্গে অনেক বীজাণুও বেরিয়ে যায়।

দুপুরে আমি লাটুবাবুর বাড়িতে হানা দিলাম।

লাটুবাবু, টাকাটা আপনি কবে দেবেন?

কেন বলো তো! বিয়েটা লাগলেই দিয়ে দেব।

ততদিন আমি তো বাঁচব না।

বাঁচবে না?—লাটুবাবু চোখ কপালে তুলে বলেন, বাঁচবে না মানে?

যদি নাই বাঁচি তা হলে টাকাটার কী হবে?

লাটুবাবু ভারী অবাক হয়ে বলেন, তোমার মরার কী হল বলো তো? সুইসাইডের কথা ভাবছ নাকি?

না, আমার অত সাহস নেই।

তা হলে কি কোনও জ্যোতিষী কিছু বলেছে?

না। তবে খুব শিগগির আমার মৃত্যু হতে পারে। মানে, হবেই।

লাটুবাবু উদ্বেগ ও অস্বস্তির সঙ্গে বলেন, বলো কী? তা হলে যে ঝিলিকের বিয়েটাই কেঁচে যাবে! পাত্রটিকে বেশ খেলিয়ে তুলেছিলে, হঠাৎ তোমার হল কী বলো তো? দর বাড়াচ্ছ নাকি!

আমি ম্লান একটু হেসে মাথা নেড়ে বলি, দর বাড়িয়ে লাভ নেই লাটুবাবু। আমি দরাদরির অনেক ঊর্ধ্বে চলে যাচ্ছি।

লাটুবাবু খপ করে আমার হাত দু'খানা ধরে বলেন, দোহাই তোমার। মরতে হয় তো ঝিলিককে সাত পাক ঘুরিয়ে দিয়ে তারপর মোরো। আমার যদিও কষ্ট হবে, তবু তোমাকে না হয় আমি আরও পাঁচ হাজার বেশি দেব। আর চাপাচাপি কোরো না। বিশ হাজারের বেশি আর এখন উঠতে পারব না। মেয়ের বিয়ের খরচটাও তো জানো।

আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, আমার পক্ষে এই অল্প সময়ে যতটুকু সম্ভব তার সবই আমি করব লাটুবাবু। তবে বিশ হাজার টাকা বোধহয় আর দিতে হবে না আপনাকে। আপাতত পাঁচশো টাকা দিন।

কেন, পাঁচশো টাকা কেন?

দরকার আছে।

আমি বেশ হিসেব করে দেখেছি, পরশুদিনের মধ্যে ফেলে ছড়িয়ে খরচ করেও পাঁচশো টাকার বেশি আমি ওড়াতে পারব না।

লাটুবাবু ঝপ করে পাঁচশো টাকা দিয়ে ফেললেন। বললেন, জানি, খরচাপাতি আছে। এ টাকা ঝিলিকের বিয়ের অ্যাকাউন্টেই ধরে নিয়ো। তোমার হিসেব আলাদা রইল।

অত হিসেব করতে আমার মন চাইছিল না। কী হবে হিসেব করে? আমার হিসেব—নিকেশ শেষ হয়ে গেছে।

লাটুবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি ট্যাকসি ধরে সোজা চলে আসি রুদ্রাক্ষের অফিসে।

এই যে রুদ্রাক্ষ!

হ্যালো সর্বজ্ঞ। বোসো। লীনাকে কেমন লাগল?

দুর্দান্ত। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

আচমকা এরকম দুঃসাহসিক ঘোষণায় রুদ্রাক্ষ একেবারে বজ্রাহত হয়ে গেল। বিনা ভূমিকায়, প্রস্তুতি ছাড়া এরকম একটা প্রস্তাব করার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু হাতে সময় বড় কম। মাত্র পরশুদিন পর্যন্ত আমার আয়ু। আমার কি ভূমিকা—টুমিকা করা সাজে? রুদ্রাক্ষর দুই চোখ দুটি রসগোল্লার মতো গোল দেখাতে লাগল। তারপর চোখ পিটপিট করে সে আমাকে আরও কিছুক্ষণ লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল, আর ইউ সিরিয়াস?

ভীষণ। একটুও দেরি করতে আমি রাজি নই।

রুদ্রাক্ষ হঠাৎ চেয়ারটা ঠেলে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে রুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, হিয়ার ইজ এ হিরো! হিয়ার ইজ এ সেলফ—স্যাক্রিফাইসিং ম্যান! হিয়ার ইজ এ ম্যান উইথ ম্যাগনিফিসেন্ট কারেজ। কংগ্র্যাচুলেশনস সর্বজ্ঞ। ইন ফ্যাক্ট নিজে মরে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ।

তার মানে?

আগে বোসো। কফি খাও।—বলে নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে একটু ভেবে রুদ্রাক্ষ বলে, কফি? না কি বিয়ার! না থাক, তোমার আবার মদে অ্যালার্জি, তবে ঘটনাটা এতই মহৎ যে, মদ ছাড়া সেলিব্রেট করা উচিত নয়।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, কফি।

আচ্ছা কফি।—বলে বেয়ারাকে ডেকে কফি আনার কথা বলে রুদ্রাক্ষ একটা সিগারেট ধরায়। তাকে ভারী খুশি ও ভারমুক্ত দেখাতে থাকে। খুশিয়াল গলায় সে বলে, গ্র্যান্ড হোটেলে তোমার আর লীনার ঘনিষ্ঠতা দেখে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। সেই সন্দেহটা আরও স্ট্রং হল যখন বাড়ি ফেরার সময় লীনা তোমার খোঁজখবর নিচ্ছিল। তুমি ওকে দারুণ ইমপ্রেস করেছ। লীনা বলছিল, সর্বজ্ঞের মতো এরকম অসহায় সর্বহারার মতো মুখ আমি আর দেখিনি। পৃথিবীতে যেন ওর কেউ নেই, কিছু নেই।

বলছিল?—আমি নড়েচড়ে বসি।

হ্যাঁ, সারাক্ষণই তোমার কথা। শুনতে শুনতে আমার একসময়ে মনে হচ্ছিল, লীনা যেন আমার চেয়েও তোমাকে বেশি প্রেফার করছে।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি, তার মানে কি আমিই বেশি বিধ্বস্ত?

তাই তো মনে হচ্ছে। যাক বাবা, ইট ইজ এ গ্রেট রিলিফ। এ ভেরি গ্রেট রিলিফ।

আমি আস্তে করে দাবার ছকে আর—একটা কুট চাল দিয়ে বলি, শোনো রুদ্রাক্ষ, আমি যে লীনাকে বিয়ে করতে চাইছি তা কেন জানো?

সে তো জানা খুব সোজা। ইউ আর বোথ ইন লাভ।

আমি মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলি, না রুদ্রাক্ষ, সেটা যে সত্যি কথা নয় তা তুমিও জানো। লীনার মতো হার্ড হেডেড সোশ্যাল ওয়ারকারকে ভালোবাসা খুব সোজা কাজ নয়। বিশেষ করে তিনবারের ডিভোর্সিকে।

রুদ্রাক্ষের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, তা হলে কেন?

আমি গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলি, স্রেফ তোমার জন্য রুদ্রাক্ষ। আমি তোমাকে বাঁচানোর জন্যই এই ডিসিশন নিয়েছি। কিন্তু একটি শর্ত আছে।

রুদ্রাক্ষ সতর্ক গলায় বলল, শর্ত! শর্ত কীসের?

আমার একটি চেনা মেয়ে আছে। দারুণ সুন্দরী। গ্র্যাজুয়েট। তাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। অনেক দেবে থোবে তারা। নগদ, জিনিসপত্র।

রুদ্রাক্ষ একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, বাঁচালে। এ তো খুব সোজা কাজ। তোমার বান্ধবীটিকে বিয়ে করা একটা কর্তব্যও বটে। একজন সেলফ—স্যাক্রিফাইসিং লোকের জন্য এটুকু করা কিছুই না সর্বজ্ঞ। কিন্তু এখন প্রচুর মদ না খেলে আমি কিছুতেই বুঝতে পারব না আমার জন্য তোমার এই আত্মত্যাগ কেন।

মদ খেলেও বুঝতে পারবে না রুদ্রাক্ষ। কারণটা অনেক জটিল ও গভীর। এনি ওয়ে, তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ?

দিচ্ছি। কী দেবে কিছু জানো? ধরো ক্যাশটা কত!

ত্রিশ হাজার।

সোনা?

তাও প্রায় চল্লিশ ভরি! লাখ টাকার কিছু বেশিই খরচ করবে।

কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে রুদ্রাক্ষ বলে, ডাওরি সিস্টেমটা আমি খুব অপছন্দ করি। তবু কথাটা তুলতে হল বাবার জন্য। হি ইজ অ্যান ওল্ড টাইমার। দানসামগ্রীর ব্যাপারটা নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামায়। অবশ্য দোষও নেই। আমাকে মানুষ করতে বাবার অনেক খরচ হয়েছে।

আমি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে একটা হাত নেড়ে বলি, ওটা কোনও ব্যাপার নয়।

নগদটা কত বললে?

ত্রিশ হাজার।
ওটা পঞ্চাশে তোলা যায় না?
যায়।
দেন ইট ইজ এ প্রমিস।
থ্যাঙ্ক ইউ। মেয়েটি সম্পর্কে আর কিছু জানতে চাও?
কফি এসে গেছে। কাপে একটা চুমুক দিয়ে রুদ্রাক্ষ বলল, আর জানার কী আছে? ইফ শি ইজ প্রেজেন্টেবল টু দি হাই সোসাইটি দেন ইট ইজ অলরাইট। আমি যে জীবন যাপন করি সর্বজ্ঞ, তাতে বউ—টউয়ের তো কোনও ভূমিকা নেই। সারাদিনে এক—আধবার দেখা হবে হয়তো। কিংবা তাও হবে না। আফটার এ হার্ড ডেজ ওয়ার্ক আমি সন্ধেটা কাটাব কোনও বার—এ কিংবা পার্টিতে। আমার বউ যাবে তার ক্লাবে বা সোসাইটিতে। উই উইল লিড সেপারেট লাইভস। কেউ কারও ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করব না। সুতরাং বেশি বাছাবাছি করে লাভ কী? হয়তো বনবেও না বেশিদিন। মেয়েটা কে?
আমার চেনা।
বোন—টোন নয়তো?
না, ঠিক তা নয়?
রুদ্রাক্ষ খুব নরম গলায় বলে, বোন—টোন হলে বলব, ইট ইজ নট এ ওয়াইজ ডিসিশন। আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াটা এক ধরনের হঠকারিতাই হবে সর্বজ্ঞ।
সেটা আমি কতকটা টের পাচ্ছি রুদ্রাক্ষ। তবু পাত্রীর বাবারা তোমার জন্য পাগল।
রুদ্রাক্ষ চোখ পিটপিট করে বলে, কথাটা ঠিক। কিন্তু হঠাৎ পাত্রীর বাবাদের মধ্যে রিসেন্টলি একটা পাগলামির ছোঁয়াচ লাগল কেন বলো তো! সর্বত্রই আমি দেখতে পাই পাত্রীর বাবারা খুব অদ্ভুত ধরনের বিহেব করছে?
আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বলি, সে কী!
বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে রুদ্রাক্ষ বলে, সকাল থেকেই আমাদের বৈঠকখানায় তারা জড়ো হতে থাকে। আমি অফিসে বেরোনোর সময়েও দু'—চার জনকে গেটের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখি। অফিসে ঢুকবার মুখেও কয়েকজনকে দেখা যায়। অফিস থেকে যখন বেরোই তখনও দেখতে পাই, রিসেপশনে বা দারোয়ানের টুলে চোর—চোর মুখ করে বসে আছে সব। টেলিফোনে সারাদিন তারা আমাকে জ্বালাতন করে। টাকা সাধে, গাড়ি বাড়ি সাধে।
সাধে?
খুব সাধে। আই গট বিগ অফারস ফ্রম দেম।
কত বড় অফার?
রুদ্রাক্ষ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তুমি ওটা নিয়ে ভেবো না। আমি তোমার সেই চেনা মেয়েটিকেই বিয়ে করব। ক্যাশটা কত বলেছিলে?
ত্রিশ ছিল, পঞ্চাশে তুমিই তুলেছ।
ওটা যেতে দাও। পঞ্চাশই থাক। পাত্রীর বাড়িটাড়ি নেই?
তার বাবার আছে। বোধহয় তাও দেবে।
দেবে? আর ইউ সিয়োর? আমি চাইছি না। কিন্তু যদি দেয়ই তাহলে ইট শুড প্রেফারেবলি বি ইন সাম পশ এরিয়া। ধরো লাউডন বা ক্যামাক স্ট্রিট। বালিগঞ্জেও আপত্তি নেই। ওনারশিপ ফ্ল্যাট হলেও হয়।
হয়ে যাবে রুদ্রাক্ষ।
ফ্ল্যাট হলে একটু বড় হওয়াই ভালো। মিনিমাম বারো শ' স্কোয়ার ফুট।
সেটাও বাধা হবে না।

লীনার ভার তাহলে তুমিই নিচ্ছ?

যদি লীনা আমার ভার নিতে চায় রুদ্রাক্ষ।

হাঃ হাঃ করে ঘর ফাটিয়ে হাসল রুদ্রাক্ষ। মাথা নেড়ে বলল, নেবে না? বলো কী? লীনা দু'হাত বাড়িয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ইন ফ্যাক্ট কাল তোমাকে যতটা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল আজ তার চেয়েও বেশি দেখাচ্ছে। একস্ট্রিমলি ক্রেস্টফলন। তোমার শরীর—টরীর ভালো তো সর্বজ্ঞ?

ভালো, খুব ভালো।

ফ্যামিলিতে কোনও ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটেনি তো?

না। আমার ফ্যামিলি বলতে কিছু নেই।

বাঃ। লীনার পক্ষে এর চেয়ে ভালো পাত্র আর কে হতে পারে? দাঁড়াও, ওকে একটা টেলিফোন করি।

আমি এ প্রস্তাবে বাধা দিই না।

রুদ্রাক্ষ টেলিফোনে কথা বলতে থাকে, হ্যালো লীনা! আরে কী খবর? কাল ঠিকমতো বাড়ি ফিরতে পেরেছিলে তো? কোনও অসুবিধে হয় নি?...আমি? না, আমি এক্সট্রিমলি ড্রাঙ্ক অবস্থাতেও রোজ ঠিক ফিরে যাই। ইট ইজ এ হ্যাবিট।... আরে শোনো, সর্বজ্ঞকে নিশ্চয়ই তুমি এক রাত্রে ভুলে যাওনি?...হাঃ হাঃ, সারা রাত ওর কথা ভেবেছ! স্ট্রেঞ্জ!...ভুলতে পারছ না! তাতে কী? সর্বজ্ঞও তোমাকে ভুলতে পারছে না। আর পারছে না বলেই আমার অফিসে এসে হাজির হয়েছে। কথা বলবে একটু? ভারী খুশি হবে ছেলেটা।

রুদ্রাক্ষ রিসিভারটা এগিয়ে দেয়। আমি নিস্তেজ হাতে সেটা নিই এবং কানে ঠেকাই।

লীনার মোহময় স্বর আমাকে আক্রমণ করে, সর্বজ্ঞ?

বলছি লীনা।

তুমি কেমন আছ?

আমি ভালো নেই লীনা।

তোমাকে তুমি বলে ফেললাম, কিছু মনে করলে না তো!

না, বরং আশায় আনন্দে মনটা নেচে উঠল।

ওঃ, ইউ নটি বয়। তুমি কেন ভালো নেই বলো তো! কী হয়েছে?

আমার ভালো থাকার যে কথাই নয় লীনা। আমার বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, চাকরি নেই, সম্পত্তি বেহাত। আজ বেঁচে আছি, কালই হয়তো থাকব না। কে জানে।

ছিঃ, ওরকম বলতে নেই।

আমার কোনও আপনজনও নেই লীনা। একে কি বেঁচে থাকা বলে?

যার কেউ নেই তার আমি আছি।

তুমি আছো?

আছি।

তাহলে রুদ্রাক্ষর কী হবে?

রুদ্রাক্ষর চেয়েও তুমি অনেক বেশি বিধ্বস্ত, অনেক বেশি অসহায়। তোমার মতো এমন অভিভাবকহীন, অরক্ষিত, উদ্দেশ্যহীন মানুষ তো রুদ্রাক্ষ নয়। কাল সারা রাত আমি শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। কতবার যে কান্না পেয়েছে ভাবতে ভাবতে।

তাহলে আমরা এখন কী করব লীনা?

কেন? বিয়ে করব। সারা রাত ধরে ভেবে আমি আজ ভোরবেলায় ডিসিশন নিয়েছি। একজন শক্তসমর্থ, প্রাণবন্ত, হৃদয়বতী মহিলার আশ্রয় ছাড়া তোমার চলবে না। মুশকিল হচ্ছে বাবাকে নিয়ে।

কেন, মুশকিল কীসের?

এই বারবার বিয়ে এবং ডিভোর্স বাবা একদম পছন্দ করছে না। বাবা চায়, চতুর্থ বিয়েটা যাতে আমি না ভাঙি। হি ওয়ান্টস এ পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট। জানো তো, আমার বাবা রুদ্রাক্ষর সুপ্রিম বস!

জানি।

আর এও তো জানো, রুদ্রাক্ষ দারুণ ব্রিলিয়ান্ট!

জানি।

তাই বাবা চাইছে আমি রুদ্রাক্ষকে বিয়ে করে সারা জীবন তার বউ হয়ে থাকি।

কিন্তু তোমার মহৎ উদ্দেশ্যটার কথা কি উনি জানেন?

জানে। তবে বলেছে, মহৎ উদ্দেশ্যে গুলি মারো। ভ্যাগাবন্ডদের আর বিয়ে করা চলবে না।

উনি কি জানেন যে, রুদ্রাক্ষ মদ খায়?

ওমা! জানবে না কেন? বাবার সঙ্গে বসেও তো খায়!

উনি কি জানেন যে, রুদ্রাক্ষ ঘুষও খায়?

না জানার কথা নয়।

রুদ্রাক্ষ যে মিথ্যে কথা বলে তাও কি জানেন?

খিলখিল করে হেসে লীনা বলে, রুদ্রাক্ষ তো ছেলেমানুষ, আমার বাবা নিজেই সারাদিনে একটাও সত্যি কথা বলে না। ওভাবে বাবাকে ঠেকানো যাবে না সর্বজ্ঞ।

আমি অসহায়ভাবে বলি, তাহলে উপায়?

আমি অবশ্য বাবাকে বলেছি, আর—একটা বিয়ের চান্স দাও। এই শেষ বিধ্বস্ত লোকটাকে উদ্ধার করার পরই তাকে ডিভোর্স করে রুদ্রাক্ষকে বিয়ে করব।

আমি আতঙ্কিত হয়ে বলি, না!

মিহি গলায় একটু বিস্ময় ফোটে লীনার, না কেন সর্বজ্ঞ? আর ইউ জেলাস?

ঠিক তা নয় লীনা। আমি জানি রুদ্রাক্ষ পাত্র হিসেবে ভালো নয়।

সেটা আমিও জানি। কিন্তু উপায় কী সর্বজ্ঞ?

তোমার বাবা কি তোমাকে চান্স দিতে রাজি হয়েছেন লীনা?

না। বাবা তো কখনও সমাজসেবা করেনি। এইসব সৎ কাজের অর্থ তার বোঝার কথা নয়। বাবার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গিরও অনেক তফাত। যে—রুদ্রাক্ষকে বিধ্বস্ত বলে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম বাবা অতি সুপাত্র ভেবে তারই সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইছে।

তাহলে কী হবে লীনা?

বাবার কথা আমি কখনও শুনি না সর্বজ্ঞ। তুমি ভেবো না।

আমি নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলে বলি, তাহলে ওই কথাই রইল লীনা।

ওই কথাই রইল সর্বজ্ঞ।

টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার পর তাকিয়ে দেখলাম রুদ্রাক্ষ আমার দিকে অতিশয় গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে যেন বা ভূত দেখছে। ভূত দেখতে দেখতে সে অবিশ্বাসের গলায় বলল, টেলিফোনে তুমি লীনাকে কী বললে যেন! পাত্র হিসেবে আমি খুব খারাপ না কী যেন!

আমি ময়লা রুমালে মুখটা একটু মুছে নিয়ে বললাম, একথায় তোমার রাগ করা উচিত নয় রুদ্রাক্ষ। ও কথাটা আসলে ডিপ্লোম্যাসি। যাতে লীনা তোমার প্রতি খুব বেশি ঝুঁকে না পড়ে।

রুদ্রাক্ষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু কথাটা আমি বিশ্বাস করতে চাই সর্বজ্ঞ।

তার মানে?

রুদ্রাক্ষ মুখখানা কাঁদো কাঁদো করে বলল, আমি মদ খাই, ঘুষ খাই, মিথ্যে কথা বলি। লোক হিসেবে আমি খুবই খারাপ। তোমার কোনও চেনা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ো না সর্বজ্ঞ।

আমি বিপাকে পড়ে বলি, তাহলে লীনাকেও আমি বিয়ে করতে পারব না রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ বিষণ্ণ মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ঠিক আছে, তোমার সেই চেনা মেয়েটিকেই বিয়ে করব না হয়। তবে ক্যাশটা আরও দশ হাজার বাড়িয়ে দাও।

আমি কয়েক সেকেন্ড বিস্ময়ে কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে তুমি ত্রিশকে ষাটে তুলেছ রুদ্রাক্ষ। আলটিমেটলি সেটা কোথায় উঠবে বলো তো? কোনও সিলিং নেই।

রুদ্রাক্ষ একটু লজ্জার হাসি হেসে বলে, দেয়ার ইজ হট বিডিং ইন দি মার্কেট। গতকালও আমার দর উঠেছিল এক লাখ। তবে মেয়েটা কালো এবং ট্যারা। তোমার কেসটা অবশ্য আলাদা। ইউ আর এ গ্রেট ফ্রেন্ড। তাই তোমার ক্ষেত্রে আমি বেশি চাপাচাপি করছি না।

আমি উদাস গলায় বলি, টাকা আমি দেব না রুদ্রাক্ষ। দেবে পাত্রীর বাবা। তবু বলি, একটা সিলিং থাকা ভালো।

রুদ্রাক্ষ হাতটা নেড়ে বলল, ঠিক আছে সর্বজ্ঞ। মেক ইট সেভেনটি থাউজ্যান্ড, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফাইন্যাল। সাত সংখ্যাটাও খুব পয়া। আমার নামের বাংলা অক্ষরের সংখ্যা সাত। রুদ্রাক্ষ সেনগুপ্ত। কত হয়? সাত না।

সাত।—আমি কর গুনে বলি।

দেন সেভেনটি থাউজ্যান্ড ইজ ফাইন্যাল। তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো সর্বজ্ঞ।

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বলি, কী কথা?

মেয়েটির যদি কোনও ডিফেক্ট থাকে তাহলে কিন্তু সিলিং আমার বাবা মানবে না।

কী ডিফেক্ট থাকবে?

ধরো রং তত ফরসা নয় বা নাকটা একটু চেপ্টা বা হাইট খুব বেশি বা কম কিংবা গলার স্বর তত মোলায়েম নয়, এইসব আর কী। সেসব ক্ষেত্রে আমার বাবা প্রতিটি ডিফেক্টের জন্য আলাদা আলাদা কমপেনসেশন চাইতে পারে। ওই পুরুতরা যেটাকে 'মূল্য ধরে দেওয়া' বলে আর কী।

আমি বুঝলাম। মাথা নেড়ে বললাম, ঠিক আছে রুদ্রাক্ষ, তাই হবে।

কিছু মনে কোরো না সর্বজ্ঞ। বাবা একটু সেকেলে।

আমি লাটুবাবুর জন্য একটু ভাবিত হয়ে পড়ি। ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে তাতে লাটুবাবু ঝিলিকের বিয়ে দিতে কোমরভাঙা দ না হয়ে যান। রুদ্রাক্ষ যাতে আর দর না বাড়াতে পারে তার জন্য আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলি, আজ চলি রুদ্রাক্ষ।

এসো সর্বজ্ঞ। থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভরিথিং।

বাইরে বেরিয়ে আমি লাটুবাবুকে ফোন করলাম।

লাটুবাবু!

বলো রবি।

বিয়ে পাকা।

বলো কী? অ্যাঁ। তুমি তো দুর্দান্ত ছেলে দেখছি।

আমি একটা শ্বাস ফেলে বললাম, হ্যাঁ, আমি যে এতটা দুর্দান্ত তা আমিও জানতাম না। তবে বিয়েতে আপনার কিছু খরচ আছে।

কিছু শুনলে—টুনলে?

শুনলাম। নগদ সত্তর হাজার।

কত বললে? আবার বলো।

সত্তর হাজার।

দাঁড়াও। টেলিফোনটা বোধহয় গড়বড় করছে। ভালো বুঝতে পারছি না।

টেলিফোন ঠিকই আছে লাটুবাবু।

তবু একটু ধরো। বাঁ দিকের বুকটা একটা চিড়িক দিয়ে উঠল যেন।

এখনই ঘাবড়াবেন না। আরও আছে। কলকাতার ভালো পাড়ায় একটা বাড়ি বা বড় ফ্ল্যাট দিতে হবে। দু'—আড়াই লাখ ধরে রাখুন।

নাঃ। বুকটা বাস্তবিকই চিড়িক দিচ্ছে। হার্টটা ঠিক কোথায় থাকে বলো তো! বাঁদিকে না!

বাঁ দিকে। বোঁটার দু' ইঞ্চি নীচে।

এখানেই চিড়িকটা দিচ্ছে। খুব জোর চিড়িক হে।

তবে একটা ভালো খবরও আছে। সোনার পরিমাণটা বাড়ায়নি, গাড়ি বা এরোপ্লেনও চায়নি। আপনি কি তবু রাজি আছেন লাটুবাবু?

লাটুবাবু একটা শ্বাস ফেলে বলেন, এই পাত্র ছাড়া চলবে না।

তাহলে জোগাড়যন্ত্র করতে থাকুন।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে আমি পয়সা দিয়ে দিই এবং রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।

বিশাল এই শহরটা আজ আমার চোখে খুবই ফাঁকা ও অর্থহীন লাগছিল। পরশুদিন যার মৃত্যু অবধারিত তার চোখে অবশ্য ফাঁকা লাগারই কথা।

।। আট ।।

রাত্রিবেলা চুপি চুপি রাখাল এসে হাজির। চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। হেসে বলল, কী ছোটবাবু কেমন বুঝছ?

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, ভালো বুঝছি না।

ভালো বুঝবার কথাও নয়। দু'—পাঁচশো টাকা খরচ করলে এই দুর্গতি হত না। তা দুর্গতি যতই হোক এই দুটো দিন খুব ভালো খাবারদাবার হবে তোমার জন্য। আজ রাতে বউদি নিজে তোমার জন্য বিরিয়ানি রাঁধছেন। বারবার বলছেন, ছেলেটা বড় গোবেচারা ছিল, কারও সাতে—পাঁচে থাকত না।

বলছে?

তা একটু মন খারাপ সকলেরই হয় বইকি।

আমারও হচ্ছে রাখাল। আমার মরতে ইচ্ছে করছে না।

কারই বা করে বলো ছোটবাবু? তবে মরতে তো সকলকেই হয়। দু'দিন আগে বা পরে।

আমি ক্ষীণ স্বরে বলি, আমি না হয় দু'দিন পরেই মরতাম।

আহা, ভাবছ কেন? একেবারে তো আর মরছ না। বউদির মামা হয়ে দিব্যি থাকবে। বরং আসল মরা তো মরছে বউদির মামা। সে কথাটাও একটু ভাবো। তার কষ্ট তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

আমি একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করি, বউদির মামা কি থোড়ঘণ্ট খেতে ভালোবাসে রাখাল?

রাখাল চোখ বড় বড় করে বলে, কেন বলো তো?

আমি থোড়ঘণ্ট খুব ভালোবাসি। আর শোনো রাখাল, বউদিকে বোলো যেন তার মামাকে একটা ভালো ডিজিটাল ঘড়ি কিনে দেয়।

কী ঘড়ি বললে?

ডিজিটাল ঘড়ি। তুমি বুঝবে না, শুধু নামটা মনে রেখো। আমার বড় শখের জিনিস।

আর কিছু?

আর আমার এই বেড়ালটাকে ওই মামার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ো। আমি মরলে তো ওকে কেউ দেখার থাকবে না।

রাখাল মুখে একটু চুকচুক শব্দ করে বলল, এঃ, তুমি বড্ড লাতন হয়ে পড়েছ দেখছি। উলটো—পালটা বকতে লেগেছ। এক কাজ করো, একটা পাঁইট চাপান দিয়ে নাও, অনেক ভালো লাগবে।

আমি মাথা নেড়ে বলি, না রাখাল, আমি কখনও মদ খাইনি। আমার বংশে কেউ ওসব খায় না।

ওসব কথা রাখো তো।—বলে নিজেই উঠে রাখাল গিয়ে আগের দিনের মতোই কী একটু কলকাঠি নেড়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা আস্ত বোতল আমার সামনে এনে রেখে বলল, চালিয়ে দাও।

মদ খেলে নেশা হয় রাখাল।

এখন নেশাই তো চাই। দেখবে ভয়ডর সব কেটে যাবে।

বলে রাখাল বোতলটা খুলে গেলাসে খানিক ঢেলে জলটল মিশিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, মদ নয়, ওষুধ বলে খাও। মানুষ যখন নির্জীব হয়ে পড়ে তখন ডাক্তাররা ব্র্যান্ডি খাওয়ায়, জানো না? খাও। খেলে দেখবে বিরিয়ানির স্বাদটাও জিবে খোলতাই হবে।

আমি একটু খাই। বিদঘুটে গন্ধ আর ঝাঁঝালো স্বাদটা আমি তেমন টের পাই না। বরং জলের মতোই নির্দোষ লাগে। আমি ঢক ঢক করে অনেকটা খেয়ে ফেলি। আমার বংশে এই বোধহয় প্রথম কেউ মদ খেল। কিন্তু মদ খাওয়া কি একে বলে? আমি সাঁ করে গেলাস শেষ করে রাখালের হাত থেকে বোতলটা প্রায় কেড়েই নিয়ে বলি, না হে, জল মেশালে চলবে না।

রাখাল আমার এই কাণ্ড দেখে হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, ওরে বাবা, তুমি যে এ লাইনে একেবারে অগস্ত্যমুনি। ছোটবাবু, মাইরি তোমার এত এলেম।

আমি বোতলটা শেষ করে গম্ভীর হয়ে বলি, আর—একটা বোতল আনো।

রাখালের চোখে পলক পড়ছিল না। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে রুদ্ধ আবেগে। হাতের পিঠে চোখের জল মুছে ধরা গলায় বলল, এমন ক্ষণজন্মা মানুষকে বাণ মারতে আছে! ছিঃ ছিঃ।

আমি তাড়া দিয়ে বললাম, কী হল? আনো।

আনছি ছোটবাবু, আনছি। তুমি তো মানুষ নও, মহাপুরুষ।—বলতে বলতে গিয়ে রাখাল আর—একটা বোতল নিয়ে এল।

আমি সেটাকেও উড়িয়ে দিলাম। নেশা হোক চাই না হোক, পেটটা ভরে ঢোল হয়ে গেল। আমি বালিশে মাথা রেখে আধাঘুমন্ত গলায় বললাম, দরজাটা ভেজিয়ে চলে যাও।

রাখাল বিড় বিড় করে কী যেন বলছিল। ভালো শুনতে পেলাম না। গভীর এক ঘুম এসে কোলে তুলে নিল আমাকে।

রাত্রিবেলা আমার ছোড়দা যীশুতোষ এসে হাজির। সারা গা ভিজে সপ সপ করছে। লম্বা চুল বেয়ে জলের ফোঁটা পড়ছে টপ টপ করে।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, দড়িতে গামছা আছে, ভালো করে গা মোছো। নইলে মেঝে ভিজে কাদা—কাদা হবে। আমার তো ঘরদোর নিকোনোর ঝি নেই।

যীশুতোষ কথাটাকে আমল না দিয়ে বলল, মরতে চলেছিস তবু এসব জাগতিক চিন্তা কেন রে? এ ঘর আর ক'দিন ভোগ করবি?

তা বটে, তবু ভেজা আমি একদম সইতে পারি না।

দুনিয়ায় যে কিছুই তোর নয়, কারও নয়, এই শিক্ষাটা আমার খুব তাড়াতাড়ি হয়েছিল।

আমি ঠোঁট উলটে বললাম, হয়ে লাভটা কী হল বলো? খামোখা গঙ্গায় ডুবে একপেট জল খেয়ে দমবন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে মরলে। শিক্ষাটা দেরিতে হলে আরও ক'দিন বাঁচতে।

যীশুতোষ আমার কাঠের চেয়ারখানায় বসে দুটো হাঁচি দিয়ে বলল, মৃত্যুটা কিছুই নয়, অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। আমি তোকে সেই কথাই বোঝাতে এসেছি।

আমি উদাস গলায় বললাম, শুধু শুধু কষ্ট করা। এসব কথা তো পুঁথিপত্রেও লেখা আছে। কাঠের চেয়ারটা কিন্তু ভিজে যাচ্ছে ছোড়দা। পালিশ উঠে গেলে আবার পালিশ করানোর পয়সা আমার নেই।

যীশুতোষ বাস্তবিকই আমার কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। আরও দুটো হাঁচি দিয়ে মেঝেয় শিকনি ঝেড়ে বলল, তোর এখনও মায়া কাটেনি। আজ বাদে কাল যাকে আদরের শরীরটাই ছাড়তে হবে তার অত মায়া কেন রে?

আরও দুটো হাঁচির বাধা পার হয়ে যীশুতোষ বলল, তোর কাছে কোল্ডারিন ট্যাবলেট নেই? সর্দিটা বড় জ্বালাচ্ছে।

ভেজা গায়ে থাকলে সর্দি লাগবেই। তখন থেকে বলছি গা—টা ভালো করে মোছো। শুনছ না।

দূর বোকা! এ জল কি মুছলেই যায়? মোছার অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, যতই মুছি না কেন, গা ভেজাই থাকে। জলে ডুবে মরেছিলাম তো, সেই শেষ অবস্থাটাই কনটিনিউ করছে। সর্দিটাও সেই থেকে।

আমার একটু মায়া হল। বললাম ব্র্যান্ডি খাবে? অনেক আছে।

যীশুতোষ মাথা নেড়ে বলল, না। জীবনে কখনও মদ খাইনি, মরার পর খাওয়ার কোনও মানে হয় না। তারপর, তোর কী খবর বল! পরশু তোর ভবলীলা সাঙ্গ হচ্ছে তাহলে!

আমি বিরস মুখে বললাম, তাই বা হচ্ছে কোথায়? আমার আত্মাটাকে নাকি বউদির এক বুড়ো মামার শরীরে চালান দেওয়া হবে।

হাঃ হাঃ করে খুব হাসল যীশুতোষ।

হাসছ কেন ছোড়দা?

খুব মুশকিলে পড়বি। লোকটাকে আমি চিনতাম। এক নম্বরের কেপ্পন। ভালো করে খায় না, পোশাক পরে না। অথচ টাকার আন্ডিল। ওর শরীরে ঢুকে খুব কষ্টে কাটবে তোর।

আমি একটু আশান্বিত হয়ে বলি, আমি কেপ্পন হব না। টাকা ওড়াব।

সে এখন বলছিস। বউদির মামা হলে তখন আর বলবি না। আত্মার বদল ঘটলে কী হয়, স্বভাব তো আর পালটায় না। কাঁচা মুগ সেদ্ধ আর ফ্যানসা ভাত ছাড়া লোকটা আর কিছু খায় না।

বলো কী?—আমি চিন্তিত হয়ে বলি।

জীবনে হেঁটো ধুতি ছাড়া আর কিছু পরেনি।

ও বাবা!

উনিশশো উনিশ সালে একজোড়া কাঠের খড়ম কিনেছিল, সেইটে এখন ক্ষয় হয়ে কাগজের মতো পাতলা হয়ে এসেছে। সেইটে ছাড়া বুড়োটার আর কোনও জুতোও নেই।

আমি কখনও খড়ম পরিনি। শুনেছি ভারী শক্ত জিনিস।

এবার পরবি। তবে জীবনধারণটাই তোর এত শক্ত হয়ে দাঁড়াবে যে খড়মটার শক্ত ভাবটা আর টের পাবি না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। যীশুতোষ ফের কয়েকটা হাঁচি দিয়ে মেঝেয় শিকনি ফেলল।

দৃশ্যটা দেখব না বলে চোখ বুজে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাণ মারলে কি খুব লাগে ছোড়দা?

যীশুতোষ বলল, তা আমি কী করে বলব? লাগারই কথা! তবে আমার অভিজ্ঞতা নেই। জলে ডুবে মরতে কেমন লাগে তা যদি জানতে চাস তাহলে বলতে পারি।

নাঃ, তা জেনে কী হবে বলো? আমি তো মরব বাণে।

যীশুতোষ একটু সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মরা নিয়ে কথা, তা যাতেই হোক, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? মরার সময় একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তারপর আর খারাপ লাগে না। কোনও প্রবলেম নেই, কাজকর্ম নেই, বেশ লাগে।

তুমি তা হলে ভালোই আছ?

খুব ভালো। জ্যান্ত অবস্থায় এত ভালো কোনওদিন ছিলাম না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, তোমার মতো যদি আমারও হত। গণ্ডগোল পাকাল বড়দার ওই মামাশ্বশুরটা। মরেও শান্তি নেই। বেগার খাটতে অন্যের হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। কাঁচা মুগের ডাল বা খড়ম কোনওটাই আমার পছন্দ নয়।

যীশুতোষ দমাস করে আর একবার হেঁচে নিয়ে বলে, বলতে ভুলে গেছি, লোকটার ভগন্দর আর হাঁফানি আছে। সেই কষ্টটাও ভোগ করতে হবে রে।

সর্বনাশ!

পিঠে একটা একজিমার কথাও শুনেছিলাম যেন।

ওরে বাবা!

সবই সয়ে যাবে। লোকটার অ্যাডভানটেজগুলোও তো দেখবি। ব্যাঙ্কে অত টাকা।

কিন্তু কৃপণ যে।

তা হোক, টাকা ব্যাঙ্কে থাকলেও অনেকটা জোর হয়।

আমি টাকা চাই না।

যীশুতোষ আমার দিকে কঠিন এক দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, রবি, আমি যতদূর জানি, তুই রবি সর্বজ্ঞ হয়েও থাকতে পছন্দ করিস না।

আমি মাথা চুলকে আমতা আমতা করে বলি, সে অবশ্য ঠিক।

তুই রবি সর্বজ্ঞকে ঘেন্না করিস, তাই না?

তা করি বটে।

তাহলে রবি সর্বজ্ঞ হয়ে বেঁচে থাকতে চাস কেন?

একথার জবাব হয় না। তবু মরিয়া হয়ে বলি, কিন্তু রবি সর্বজ্ঞরও কিছু অ্যাডভানটেজ আছে। রবির বয়স সত্তর নয়। মাত্র আটাশ। তার অর্শ, ভগন্দর বা একজিমা নেই। সে খড়ম পরে না বা কাঁচামুগের ডালও তাকে খেতে হয় না।

আর ডিস—অ্যাডভানটেজগুলোর কী হবে? তোর টাকা নেই, বাড়ি হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। তোর আত্মবিশ্বাস নেই। তুই ভিতু, আহাম্মক, বোকা। বেঁচে যদি থাকতেই হয় তবে রবি সর্বজ্ঞ হয়ে বেঁচে থাকার মানেই হয় না।

আমি ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে বলি, ছোড়দা, তুমি বড়দার মামাশ্বশুরের হয়ে নির্লজ্জ দালালি করতে এসেছ। বোধহয় কমিশনও পাবে। তবে জেনো রবি সর্বজ্ঞর সমালোচনা করার অধিকার একমাত্র রবি সর্বজ্ঞরই আছে। তুমি আমার সম্পর্কে ওসব বলার কে?

যীশুতোষ খুব হাসছিল। ধীরে ধীরে হাসির বেগটা কমে এলে বলল, কমিশন একটা আছে ঠিকই। লোকটা বেঁচে থাকলে রুপুর মনটা ভালো থাকবে।

রুপুটা আবার কে?

ওই লোকটার ছোট মেয়ে।

তার মন ভালো থাকলে তোমার কী?

রুপুর মন ভালো থাকলে আমি খুশি থাকি।

তার সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?

যীশুতোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোর তো হৃদয় নেই রবি, শুধু পেট আছে। হৃদয় থাকলে বুঝতিস।

তুমি কি রুপুকে ভালোবাসতে?

বাসতাম। আমার মৃত্যুর অন্যতম কারণও ওই রুপু।

কেন? সে কি তোমাকে রিফিউজ করেছিল?

ঠিক তা নয়। রুপুর বাবা করেছিল।

তবু সেই লোকটাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে চাও?

আমার জন্য তো নয়, রুপুর জন্য। রুপু ওর বাবাকে বড় ভালোবাসে।

আমি ভীষণ রেগে গিয়ে বলি, আর তোমার নিজের মায়ের পেটের ভাই যে কী ভালোবাসে তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা নেই, না ছোড়দা।

রাগছিস কেন? আমি তোকে বড়দার মামাশ্বশুরের শরীরে ট্রান্সফার করার ষড়যন্ত্র করিনি।

কিন্তু সমর্থন করছ। সেটাও যথেষ্ট খারাপ। ভাইয়ের চেয়ে কি প্রেমিকা বড়?

যীশুতোষ আবার গা—জ্বালানো হাসি হাসছিল। হাসিটি সামলে নিয়ে বলল, তোর কাছে অবশ্য প্রেমিকার চেয়েও কমার্স বড়। মনে নেই, সেই যে 'প্রিয়ার মন' ছবি দেখতে গিয়েছিলি তুই আর রেশমী! রেশমী যখন তোকে ভালোবাসার কথা বলছে তখন তুই ছবিটা কেন ফ্লপ হল তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলি। রেশমীর একটা ডায়ালগেরও অর্থ তুই ধরতে পারিসনি।

আমি একটু লাল হয়ে বললাম, তাতেই বোঝা যায় প্রেম আমার বিবেক ও বুদ্ধিকে গুলিয়ে দেয়নি।

তুই একটি নিরেট গাড়ল। সত্যিকারের প্রেমে পড়লে বুঝতিস, প্রেমিকার কাছে মা—বাবা ভাই—বোন সব তুচ্ছ। তখন প্রেমিকার বেড়ালটাকে পর্যন্ত ভালো লাগতে থাকে। এই আমার কথাই ধর না, আমি কোনওদিন বেড়াল দু'চোক্ষে দেখতে পারি না। সেই আমিই রুপুর বেড়ালের জন্য কতদিন পকেটে করে মাছ নিয়ে গেছি। প্রেমে পড়লে সব করা যায়।

ছিঃ ছিঃ ছোড়দা, তোমার লজ্জা করে না?

এখন আমি লজ্জা—টজ্জার অনেক ঊর্ধ্বে। তাই বলতে লজ্জা নেই, রুপুকে একটু খুশি রাখতে তুই যদি ওর বাবা হয়ে বেঁচে থাকিস তবে আমি খুশিই হব।

ছেলেবেলায় যীশুতোষ খুব রোগাভোগা ছিল। পিঠোপিঠি বলে আমার সঙ্গে ওর প্রায়ই ঝগড়া ও মারপিট লেগে যেত। যীশুতোষই আমার হাতে মার খেত বেশি। সেই হারানো আক্রোশটা আমি আবার হঠাৎ ফিরে পেলাম। কিন্তু যীশুতোষকে মারার চেষ্টা করে লাভ নেই। বায়ুভূতকে কে মারতে পারে। আমি দাঁত কিড়মিড় করে বললাম, ভেজা গা আর সর্দি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ একটা ঠুনকো প্রেমের জন্য ছোড়দা? তোমার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

হাঃ হাঃ করে হাসল যীশুতোষ।

আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে তেড়ে গেলাম ওর দিকে। কিন্তু কপাল খারাপ। যীশুতোষের গায়ের জলে ঘরের মেঝে ভিজে একশা। তাইতে পা হড়কে পড়ে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। গলা দিয়ে একটা গোঁ গোঁ শব্দ হতে লাগল।

চোখের অন্ধকার কেটে যখন আলো ফুটল তখন যীশুতোষ ঘরে নেই। কে একজন যেন আমার মাথার কাছে বসে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে আর বলছে, ভর হয়েছে গো! ভর হয়েছে! এ তো যে সে লোক নয়, সাক্ষাৎ মহাদেব। ভাং গাঁজা চরস মদ এনার কাছে নস্যি। নিজের চোখে যা দেখলুম! ওঃ।

আমি জানি আমি মহাপুরুষ নই। আমি রবি সর্বজ্ঞ। একজন অত্যন্ত অসফল ব্যর্থ ডিফেনসের খেলোয়াড়। আমার আশপাশ দিয়ে সর্বদাই বিপক্ষের খেলোয়াড়রা বল গোলে নিয়ে যায়। বস্তুত খেলা থেকে আমি বাদও হয়ে যাচ্ছি। আর মোটে একটা রাত্রি মাঝখানে। তারপর অন্য এক নাটক শুরু হবে। ভগন্দর, হাঁপানি, কাঁচা মুগ এবং খড়মের অরণ্যে কোথায় হারিয়ে যাবে রবি সর্বজ্ঞ।

তবু আমি রাখালের দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। মাথাটা বিশমনি পাথরের মতো ভার হয়ে আছে, জিব থেকে গলা অবধি শুকনো, চোখে আলো লাগতেই জ্বালা করছে, মন অবসন্ন, চিন্তাশক্তি স্তিমিত, শরীরে একরত্তি জোর নেই। একেই হ্যাংওভার বলে বোধহয়। আমি শুঁড়ির ছেলে, খোঁয়ারি ভাঙা কাকে বলে তা জানি। রাখালকে বললাম, আর—একটু গলায় ঢেলে দাও।

আরও?—রাখালের হাঁ আর বন্ধ হয় না।

আমি বললাম, একটুখানি।

রাখাল তটস্থ হয়ে একটুখানি গেলাসে ঢেলে এনে দিল। বলল, সাধনা করলে তুমি খুব উঁচু থাকে উঠে যাবে ছোটবাবু।

আমি দিনের আলোয় হাসিমুখে মদটা গলায় ঢেলে দিই এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালো বোধ করতে থাকি। শুঁড়ির ছেলে হিসেবেই জানি, পেট পুরে ঠেসে খেয়ে নিলে হ্যাংওভার টপ করে কেটে যায়। রাখালকে হুকুম করি, রাতের খাবারগুলো গরম করে আনো।

হুকুমমাত্রই রাখাল ছোটাছুটি লাগিয়ে দেয়। খাবার গরম হয়ে আসে এবং আমি গোগ্রাসে গিলতে থাকি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আবার রোজকার নিরীহ ও গোবেচারা রবি সর্বজ্ঞে ফিরে আসি।

রাখাল আগাগোড়া সামনে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ করে আমাকে দেখে আর মাঝে মাঝে বলে, কাল যে স্বরূপ দেখলাম তোমার তাতেই চোখ খুলে গেছে। তোমাকে আমি আর ছাড়ছি না। উরেব্বাস এরকম মাল কোনও মানুষ টানতে পারে!

এ কথা ঠিকই যে, রবি সর্বজ্ঞর সবটুকু আমি এখনও জানি না। তার মধ্যে কিছু রহস্য হয়তো বা এখনও রয়ে গেছে। কাল রাতে আমি কতটা মদ খেয়েছিলাম তা আমি জানি না। তবে শুঁড়ির ছেলে বলেই বোধহয় আমার রক্ত বহুকালের অবরুদ্ধ একটা শোধ তুলে নিয়েছে। আমার বংশে কেউ কখনও মদ খায়নি। সেটা মদের পক্ষে অপমানকর আচরণ। মদ তাই ওত পেতে ছিল। প্রথম সুযোগেই বংশের যত লোকের যতটা বকেয়া ছিল তা মেটাতে আমার ভিতরে সেঁদিয়ে গিয়েছিল। কিংবা আসন্ন মৃত্যুর ভয় আমার নেশা কাটিয়ে দিয়েছিল। কিংবা ঠিক কী হয়েছিল তা ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন এখন নেই। রাখাল যে আমাকে শ্রদ্ধা করছে সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার।

বেলা দশটা নাগাদ শুকনো মুখে লাটুবাবু এসে হাজির। স্বর খোনা হয়ে গেছে। বাঁদিকের পাঁজর চেপে ধরে আমার বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে বললেন, কাল রাতে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল প্রায়।

আমি শশব্যস্তে বলি, তাই নাকি? তা হলে এই অবস্থায় আপনার বেরোনো ঠিক হয়নি।

সে তুমি ভালোমানুষের ছেলে বলে বলছ। কিন্তু মেয়ের মা তো ভালোমানুষের বেটি নয়। সে বিধবা হতে রাজি, কিন্তু অমন সুপাত্র হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

আমি বললাম, হাতছাড়া তো হয়নি।

হয়নি বটে, কিন্তু যা চাইছে তা দিতে না পারলে হবে।

আমি মাথা চুলকে বলি, সে অবশ্য ঠিক।

লাটুবাবু আমার হাত ধরে বললেন, তুমি একটু দরাদরি করে দেখবে? কিছু যদি কমানো যায় তা হলে সেটাই লাভ। গয়না বেচে দিয়েছি, বাড়িও বেচে দিচ্ছি, কারবারও ছেড়ে দিচ্ছি পার্টনারকে। তবু বোধহয় কুলিয়ে উঠতে পারব না, কিছু ধার হয়ে যাবে।

আমি মাথা নেড়ে বলি, ঠিক আছে। দেখব।

এবং আমি দেখলামও।

দুপুরেই রুদ্রাক্ষর ঘরে হানা দিয়ে বললাম, শোনো রুদ্রাক্ষ, লীনাকে বিয়ে করার ব্যাপারে কিছু বাধা দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়তো হবে না।

রুদ্রাক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, সে কি সর্বজ্ঞ? তুমি কি আমাকে ডোবাতে চাও?

আমি স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেই এসেছি। পা নাচাতে নাচাতে বলি, হয়েছে কী জানো, সেই আমার চেনা মেয়েটির বাবা তোমার ডিম্যান্ড ফুলফিল করতে পারছেন না। তিনি এখন চাইছেন, আমিই মেয়েটিকে বিয়ে করি।

না, না—বলে আর্তনাদ করে ওঠে রুদ্রাক্ষ, তা হয় না সর্বজ্ঞ। আমি যে মনে মনে সেই মেয়েটিকে নিজের স্ত্রী বলে ভাবতে শুরু করেছি। আচ্ছা, আমি কত ডিম্যান্ড করেছিলাম বলো তো?

নগদ সত্তর হাজার।

দেন, মেক ইট ফিফটি।

আমি নির্লিপ্ত মুখে বলি, ওর চেয়ে অনেক কমে আমি রাজি হয়েছি রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ তাড়াতাড়ি বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকে এবং কফির অর্ডার দেয়। তারপর নিজের মনে কী একটু হিসেবনিকেশ করে বলে, ফিফটি থাউজ্যান্ড ইজ ভেরি চিপ। তবে আমি বাবাকে বলে আরও কিছু কমাতে চেষ্টা করব। ধরো চল্লিশ—টল্লিশ।

টু মাচ।—আমি জুয়াড়ির মতো মুখ করে বলি, তার ওপর বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ডিম্যান্ডও আছে রুদ্রাক্ষ।

আছে নাকি? ঠিক আছে, ওটা কারটেল করছি। তা হলে হবে?

হতে পারে।

হতেই হবে ভাই। লীনাকে তুমিই বিয়ে করো।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, কিন্তু লীনার বাবা তো আমাকে পণ দেবেন না রুদ্রাক্ষ।

ওর বাবা না দিক আমি দেব সর্বজ্ঞ। তোমার ডিম্যান্ড কত?

বিশ হাজার। হার্ড ক্যাশ।

অ্যাগ্রিড।—বলে সে হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে।

আমি হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলি, আমি অবশ্য বাড়ি বা ফ্ল্যাট চাই না। তবে সেদিন দেখছিলাম, লীনার গায়ে কোনও গয়না নেই। অথচ শাস্ত্রে সালংকারা কন্যার কথাই আছে। গয়না ছাড়া কি বিয়ে হয়?

গয়না দিয়েই হবে সর্বজ্ঞ। কত ভরি হলে তোমার হয় বলো তো।

বিশ ভরির নীচে তো খারাপই দেখাবে। লীনা একজন বিগ বস—এর মেয়ে তো।

তা হলে বিশ ভরিরই ব্যবস্থা হবে সর্বজ্ঞ। জাস্ট কিপ হার আউট অফ মাই হেয়ার।

ঠিক আছে রুদ্রাক্ষ, তাই হবে। কিন্তু দেরি করা চলবে না।

তুমি কবে চাও?

কাল।

বলো কী? এত শিগগির!

আমার সময় নেই রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ একটু ভেবে নিয়ে বলে, ইট মে বি অ্যারেনজড।

আমি মাথা নেড়ে বলি, একটা নয় রুদ্রাক্ষ। দুটো। তোমারটাও অ্যারেনজ করো। কালই।

সর্বনাশ সর্বজ্ঞ। আমি এত তাড়াতাড়ি পারব না।

পারবে। শুধু রেজিস্ট্রি, সামাজিক বিয়ে দু'দিন পরে হলেও ক্ষতি নেই।

রুদ্রাক্ষ মাথা নিচু করে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বিষণ্ণ মুখখানা তুলে বলে, তুমি প্রকৃত গাড়ল নও। শুধু সেজে থাকো। ঠিক আছে, তোমার মুখ চেয়ে আমি তাতেই রাজি। কাল বিকেল ছ'টায় এই অফিসঘরেই রেজিস্ট্রার হাজির থাকবে। তুমি মেয়েটিকে নিয়ে এসো।

কফি খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি এবং টেলিফোনে লাটুবাবুকে খবরটা দিই।

লাটুবাবু ফোনেই চেঁচিয়ে ওঠেন, কী বললে? এই রে, ফোনটা বোধহয় আজও গড়বড় করছে।

লাটুবাবু এত জোরে চেঁচিয়েছিলেন যে ফোনটা আমি কান থেকে অনেকটা দূরে ধরে রেখে বলি, ফোন ঠিক আছে লাটুবাবু। রুদ্রাক্ষ চল্লিশে রাজি, তবে ওটা ত্রিশে নামবে। বাড়িও বাদ গেছে। রেজিস্ট্রি কাল।

তুমি কি পি সি সরকার? কী করে করলে?

সে কথা থাক লাটুবাবু। আপনি গয়না বিক্রি করবেন না। ব্যবসাও ছেড়ে দেবেন না।

আমার বুকে যে এখন আবার নতুন করে চিড়িক শুরু হল রবি।
কমে যাবে।
খারাপ খবরেও স্ট্রোক হয়, আবার ভালো খবরেও স্ট্রোক হয়। কী যে করি!
স্ট্রোক হবে না লাটুবাবু। ভাববেন না। কালই রেজিস্ট্রি মনে রাখবেন।

।। নয় ।।

রবি সর্বজ্ঞর জন্য মনটা আমার খারাপই লাগছিল। লোকটাকে আমি পছন্দ করি না বটে, তবে তার এই পরিণতিও আমি চাইনি। তার সঙ্গে এই চিরবিচ্ছেদের প্রাক্কালে আমার মনে হচ্ছিল, লোকটা বোধহয় সর্বাংশেই খারাপ ছিল না। লোকটার ব্যক্তিত্ব নেই বটে, কিন্তু সে নিরীহ ও নিরাপদ। এও সত্য যে, রবি সর্বজ্ঞকে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যেই ফেলা যায়, তবু লোকটা নিতান্ত প্রয়োজন না হলে মিথ্যেকথা বলতে চায় না। সে যে প্রগাঢ় গাড়ল তাতেও কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদিকে দেখতে গেলে দেখা যায়, সে চুরি চামারি বা অন্যান্য অসৎ কাজ কমই করেছে। ঘুষ খাওয়ার সুযোগ পেলে সে ঘুষ খাবে কি না তা এখনই বলা যায় না বটে, তবে সে আজ অবধি যে ঘুষ খায়নি সেটাও তো কম কথা নয়। এই পৃথিবীতে সে বহিরাগতের মতো ভয়ে ভয়ে বাস করে, পাত্রের বাজারে তার তেমন কোনও দাম নেই, মনুষ্যসমাজেও সে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তবু এ কথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়, বড়দা মহীতোষের মামাশ্বশুর হওয়ার মতো তেমন বড় অপরাধও সে করেনি।

আজ জীবনের এই শেষ রাত্রে রবি সর্বজ্ঞর জন্য দুঃখে আমার চোখে জল এল। অবশ্য চোখে জল আসার আর—একটা কারণও আছে। সেটা হল ধোঁয়া। ভিতরের উঠোনে কিছুক্ষণ আগেই যজ্ঞ শুরু হয়েছে। পোড়া ঘি এবং কাঠের ধোঁয়ায় ভরে গেছে সারা বাড়ি। সেই মারণযজ্ঞের ধোঁয়ায় শহিদেরও চোখে জল এসে গেছে। আমার পাশটিতে শুয়ে সে করুণ মিঁয়াও মিঁয়াও আওয়াজে নালিশ জানিয়ে যাচ্ছে।

উঠোনের দিকে একটা দরজা আছে এ ঘরে। বড়দা মহীতোষ অবশ্য কাঠের তক্তা মেরে দরজাটা পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দিয়েছে অনেকদিন আগেই। তবু পুরনো দরজার ফাঁক—ফোকর দিয়ে উঠোনটার অংশ বিশেষ নজরে পড়ে। আমি সেই ফাঁক—ফোকরে চোখ পেতে তান্ত্রিককে ভালো করে দেখে নিয়েছি। বাস্তবিকই অভিভূত হওয়ার মতো চেহারা। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। পরনে টকটকে রক্তাম্বর এবং প্রচুর দাড়ি গোঁফ ও লম্বা চুল। কপালে সিঁদুরের টিপ সার্চলাইটের মতো জ্বলছে। একটা মড়ার খুলিতে চুমুক দিয়ে মাঝে মাঝে কারণ পান করে হুঙ্কার দিচ্ছে, জয় মা! জয় মা!

শুদ্ধ বস্ত্রে সেজে বড়দা মহীতোষ ও বউদি যজ্ঞে কাঠ ও ঘি জোগান দিয়ে যাচ্ছে। তাদের মুখেচোখে একটা তদগত ভাব।

বলতে নেই আয়োজন চমৎকার। রবি সর্বজ্ঞর মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোককে এরা যথেষ্টই গুরুত্ব দিচ্ছে। খাঁটি ঘি আনানো হয়েছে বিহার থেকে, কাঠ আনতে সুন্দরবনে লোক পাঠানো হয়েছিল, হাই গ্রেড এই তান্ত্রিকের ভিজিটও নিশ্চয়ই কম নয়। এই আয়োজন দেখে রবি সর্বজ্ঞর খুশিই হওয়ার কথা।

আজও বউদি বিরিয়ানি ও চমৎকার সব খাবার পাঠিয়েছিল। আগামীকাল থেকে শুধু কাঁচা মুগের ডাল দিয়ে ভাত মারতে হবে ভেবে আমার পেটটায় গোঁতলান দিচ্ছিল খিদেয়। আমি তাই আষ্টেপৃষ্ঠে খেয়ে নিয়েছি। রবি সর্বজ্ঞ হিসেবে এই তো আমার শেষ ভালো খাওয়া—দাওয়া।

সারা রাত যজ্ঞ চলবে। বাণ মারা হবে কাল। মাঝখানে একটা রাত্রি মাত্র। এই রাত্রিটা সৌজন্যবশে রবি সর্বজ্ঞর জেগেই কাটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওই প্রচুর সুখাদ্য পেটে যাওয়ায় কিছুতেই সে জেগে থাকতে পারছিল না। চোখের জল মুছতে মুছতে একধারে শহিদ ও অন্যধারে একটা ময়লা তেলচিটে পাশবালিশ নিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। শিয়রে শমন কিংকর পরোয়ানা হাতে দাঁড়িয়ে, তবু যে রবি সর্বজ্ঞ ঘুমোতে পারল তাতেই প্রমাণ হয় সে কত বড় আহাম্মক।

সকালে ঘুম ভাঙতেই সে টের পেল, তীব্র এক বৈরাগ্যে তার মন ছেয়ে গেছে। এমনকী পৃথিবীর উপরিভাগটি কেউ যেন রাতারাতি গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে দিয়ে গেছে বলে তার মনে হতে লাগল।

রাখাল চমৎকার জলখাবার এনেছে সকালে। ডবল ডিমের পোচ, পুরু করে মাখন লাগানো রুটি, এক গেলাস ঘন দুধ। সেসব খাওয়ার সময় রবি সর্বজ্ঞের মনে হচ্ছিল, কাঁচা মুগের ডালও কিছু খারাপ লাগবে না তার কাছে। সম্ভবত একইরকম লাগবে।

রাখাল চুপি চুপি বলল, সারা রাত যজ্ঞ করে তান্ত্রিকবাবা এখন একটু জিরোচ্ছে। জিরিয়ে উঠে সন্ধেবেলা বাণ মারতে শুরু করবে। বউদির মামাও এসে গেছে। ওপরের দক্ষিণমুখো ঘরটায় শুয়ে কাশছে খুব।

অতিশয় নিরাসক্ত গলায় রবি বলল, তাই নাকি?

আসলে বেঁচে থাকা এবং মরে যাওয়ার পার্থক্যটুকু আজ ঘুচে গেছে রবির কাছে। রাস্তায় বেরিয়ে আজ সে সুন্দরী ও অসুন্দরী মহিলাদের পার্থক্য বুঝতে পারছিল না। শীত—গ্রীষ্মের তফাত ধরতে পারছিল না। তবে পথে চাঁদসির ক্ষত চিকিৎসালয়ের একটা দোকান দেখে সে ভিতরে ঢুকে বুড়োমতো একটা লোকের কাছে ভগন্দর ও হাঁপানির চিকিৎসা আছে কি না জেনে নিল। জানা গেল, আছে। হোমিয়োপ্যাথের কাছেও গেল সে। অ্যালোপ্যাথের দোকানেও হানা দিল, বিস্তর ওষুধ কিনে ফেলল। চিৎপুরে গিয়ে সে নতুন খড়মেরও দর জেনে নিল। বেছেগুছে দামি দেখে একজোড়া খড়ম কিনল সে। তারপর ফিরে এল।

দুপুরে আবার এলাহি খাওয়ার আয়োজন। নির্বিকারভাবেই খেয়ে নিল রবি। তারপর বহুকাল বাদে বাড়ির নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকল সে। তবে আজ তার ভয় বলে কিছু নেই। সমুদ্রে শয়ন যার শিশিরে কি ভয় তার! অবশ্য এমনিতেও ভয়ের কিছু ছিল না। বাড়িসুদ্ধ লোক আজ ঘুমোচ্ছে। নিঃশব্দে ওপরে উঠে দক্ষিণের ঘরে গিয়ে ঢুকল রবি। নির্ভয়ে।

মস্ত খাটে কাকলাসের মতো এক বুড়ো শুয়ে আছে। গায়ের রং ঘোর কালো, হাড় জিরজিরে চেহারা, গাল তোবড়ানো, চক্ষু কোটরগত, মাথায় টাক। এমনিতে লোকটাকে পছন্দ হওয়ার কথা নয় রবির। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্যের স্টিম রোলার এসে সব সমান করে দিয়ে গেছে। আজ তার চোখে বুড়োও যা, যুবও তাই। ফরসাও যা, কালোও তাই। মোটাও যা, রোগাও তাই।

বউদির মামা ঘুমোচ্ছিল। রবি নিঃশব্দে তার কাগজের মতো পাতলা খড়মজোড়া তুলে নিয়ে নতুন খড়মজোড়া স্থাপন করল সেখানে। টেবিলের ওপর ভগন্দরের ওষুধগুলোও সাজিয়ে রাখল সে। একটা শিশির নীচে চাপা দিয়ে রাখল লাটুবাবুর দেওয়া পাঁচশো টাকার শেষ চারশো। এসবই কাজে লাগবে। লাটুবাবুকেও বলে দেবে সে, তার পাওনা টাকাগুলো যেন রুপুর বাবাকেই শোধ দিয়ে দেয়।

লোকটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল রবি। আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে লোকটাকে ধীরে ধীরে বেশ ভালোই লাগতে লাগল তার। রংটা কালো, তাতে কী হয়েছে? কৃষ্ণাঙ্গরা তো দাপটের সঙ্গেই বেঁচে আছে পৃথিবীতে। রোগা? তাতে কী? বেশি চর্বি কি ভালো? বয়স? বেঁচে থাকলে কার না বয়স বাড়ে!

এসব ভেবে রবি লোকটাকে মনে মনে বাস্তবিকই ভালোবেসে ফেলল। আজ জলদাপাড়ার অদেখা একটা গন্ডারকেও ভালোবাসা তার পক্ষে সম্ভব।

ধীরে ধীরে নেমে এল রবি। শহিদকে শেষবারের মতো একটু আদর করল সে। তিন দিন বাদে আজ দাড়ি কামাল। ভালো একটু সাজগোজ করল। বহুকাল আগে রেশমী বলেছিল, সে নাকি দেখতে খারাপ নয়। নিজের চেহারা কেমন তা নিয়ে রবি গভীরভাবে ভেবে দেখেনি কখনও। ভাবার অবকাশ পায়নি। এত উদ্বেগ, সমস্যা, এত ছোটবড় সংকট তাকে সবসময়ে আচ্ছন্ন করে রাখে যে চেহারার কথা তার মনেই পড়ে না। তবে আজ আয়নায় নিজের চেহারাটা ভালো করে দেখল রবি এবং মনে মনে বউদির মামার সঙ্গে মিলিয়ে নিল। সে ফরসা, স্বাস্থ্য মজবুত, মুখখানা পুরন্ত। তবু বউদির মামার সঙ্গে নিজের খুব একটা পার্থক্য আছে বলে মনে হল না তার।

জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনটি নাকি খুবই অনিশ্চিত ব্যাপার। তাই হবে। রবির বিয়ে আজ, মৃত্যুও আজ। কোনওটাই ভালো ঘটনা নয়। তবে সব ঘটনার একটা ভালো এবং একটা খারাপ দিক থাকে। লীনাকে বিয়ে করার পরই আজ রবির মৃত্যু। জীবনে এই প্রথম বিধবা হবে লীনা। এটা কি ঘটনার ভালো দিক নয়?

হাতে বেশি সময় নেই। রবি বেরিয়ে একটা ট্যাকসি ধরল।

লাটুবাবু সামনের ঘরে অতি বিরসমুখে বসে ছিলেন। আমাকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠলেন, খুব বিয়ে ঠিক করেছ। ওদিকে রুদ্রাক্ষ তার বাবা—মাকে বলে দিয়েছে তার কোন পছন্দের মেয়ে আছে, তাকেই বিয়ে করবে। এইমাত্র টেলিফোন করে ওঁরা জানালেন, মেয়ে দেখতে আসবেন না। এ নিশ্চয়ই সেই রাক্ষুসিটা, লীলা না কী যেন নাম! ভিতরে গিয়ে দেখো, কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

আমি প্রসন্ন হেসে বলি, ঘটনার দ্রুত গতি আপনার মাথা গুলিয়ে দিয়েছে লাটুবাবু।

তার মানে?

রুদ্রাক্ষর তো জানার কথা নয় যে, যাকে তার বাপ—মা আজ দেখতে আসবে তার সঙ্গেই আজ তার বিয়ে। সে ঝিলিককে অন্য মেয়ে বলে জানে। তার দিক থেকে সে ঠিক কাজই করেছে। পুরুষোচিত কাজ।

লাটুবাবু একটু থতমত খেয়ে যান। হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সেই হাঁ—টা না বুজিয়েই হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলেন, তাই তো! আমার মাথায় ওটা একদম খেলেনি। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

আলবাত। ঝিলিক কি তৈরি আছে লাটুবাবু?

খুব তৈরি। একেবারে কনের সাজে। চোখের জলে খানিকটা মেক—আপ ধুয়ে গেছে বোধহয়। পাউডারটুকু লাগাতে যা সময় লাগে। তুমি বরং মিষ্টিটিষ্টি খাও বসে। আমি দেখছি।

লাটুবাবু ভিতরবাড়িতে ঢুকলেন। একটু বাদে ঘোমটা দেওয়া ঝি এসে রুপোর থালায় দেদার মিষ্টি দিয়ে গেল। রুপোর গেলাসে সরবতও।

লাটুবাবু ফিরে এসে বললেন, আর পাঁচ মিনিট।

আপনিও সঙ্গে চলুন লাটুবাবু।

আমি!—লাটুবাবু আকাশ থেকে পড়ে বলেন, আমি কেন এর মধ্যে? ছেলে—ছোকরাদের সব ব্যাপার। আমরা সাবেকি মানুষ। ওসব রেজিস্ট্রি—ফেজিস্ট্রির মধ্যে আবার আমাকে টানছ কেন?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলভরা তালশাঁস সন্দেশটা শেষ করে বললাম, ঝিলিককে ফেরত আনবে কে?

কেন তুমি!

আমি যে ফিরব না লাটুবাবু। অন্য একটা প্রোগ্রাম আছে।

কীসের প্রোগ্রাম?

নিমতলা শ্মশানঘাটে গিয়ে বসে থাকব।

বলো কী অলক্ষুণে কথা! ওসব জায়গায় যাবে কেন?

একটু এগিয়ে থাকার জন্য লাটুবাবু।

কী যে সব বলো না! তোমার মাথাটাই ইদানীং গেছে। শ্মশান—মশান কি তোমার জায়গা?

আমি আর—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা ম্যাগনান সাইজের ক্ষীর চমচম শেষ করে ফেলি। সব কিছুতেই আমি আজ কাঁচা মুগডালের এক অবিনশ্বর স্বাদ পাচ্ছি। চমচমের পর রাবড়ির বাটিতে চুমুক দিয়ে দেখি, অবিকল সেই স্বাদ। মুখ নিচু করে খেতে খেতে ঝকঝকে রুপোর থালায় আমি নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। অবিকল মহীতোষের মামাশ্বশুরের মুখ।

হঠাৎ কেমনধারা ঘরের আলোটা বদলে গেল। রোদের একটা ক্ষীণ আভা ছিল ঘরে। সেটা কেমন গোলাপি রং ধরল। ঘরের গন্ধটাও হঠাৎ পাগল হয়ে উঠল যেন; ঠিক বটে আজ রজনীগন্ধা এবং গোলাপজলে ঘরের

চেহারা এবং আবহ ফেরানো হয়েছে। তবু এ গন্ধ তো রজনীগন্ধা বা গোলাপজল থেকে আসছে না! কেমন যেন একটু মৃদু সংগীত বেজে উঠল না নেপথ্যে?

ধীরে ধীরে আমি মুখ তুললাম। আমার চোখ আর—এক জোড়া বিশাল চোখের জালে আটকে গেল।

আর ঠিক সেই সময়েই রাসকেল তান্ত্রিকটা বোধহয় প্রথম বাণটা ছুঁড়ল।

থালাটা ঝনঝন করে পড়ে গেল হাত থেকে। দু'হাতে আমি আমার ব্যথিয়ে ওঠা বাঁ বুক চেপে ধরে ককিয়ে উঠলাম। তারপর আমার শরীরটা অবশ হয়ে ঢলে পড়তে লাগল সোফার ওপর।

কী হল? কী হল?—বলে দৌড়ে এসে লাটুবাবু আমাকে ধরলেন, ও রবি, কী হল তোমার?

আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, বাণ। তান্ত্রিকের বাণ লাটুবাবু।

কিন্তু বলতে বলতেও আমি বুঝতে পারছিলাম, হয়তো ভুল করছি। এটা হয়তো তান্ত্রিকের বাণ নয়।

লাটুবাবু চেঁচিয়ে বললেন, ওরে ঝিলিক! হাঁ করে দেখছিস কী? শিগগির বাতাস কর। জলের ঝাপটা দে।

চোখটা আমি ভয়ে—ভয়ে বুজেই রাখলাম। ওই রূপ আবার দেখলে হয়তো আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছে হবে, বৈরাগ্যটা পালিয়ে যাবে ফুরুৎ করে, এবং মহীতোষের মামাশ্বশুর হতে আবার অনিচ্ছেটা চাগাড় দিয়ে উঠবে। তবে চোখ বুজেই আমি টের পাচ্ছিলাম, ঝিলিক খুব নরম করে একটু জলের ছিটে দিল আমার চোখে। একটু হাওয়া করল। তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বলল, আপনার কিছু হয়নি। এবার উঠে পড়ুন তো! বাবা কিন্তু ডাক্তার আনতে গেছে।

কী অদ্ভুত গাঢ় স্বর।

ধীরে ধীরে আমি চোখ মেলে চাই।

ঝিলিক মৃদু একটু হেসে বলে, আর ঢং করতে হবে না।

আমি তার অপরূপ মুখখানার দিকে, কাক যেমন পাকা বেলের দিকে চায়, ঠিক তেমনিভাবে চেয়ে থেকে ক্যাবলার মতো জিজ্ঞেস করি, তার মানে?

আপনার কিছু হয়নি।

কী করে বুঝলেন?

আপনি ইচ্ছে করে ওরকম করেছেন।

মোটেই নয়।

কলকাতার ছেলেরা ভীষণ ফাজিল হয়।

আমি ফাজিল নই।

আপনি ভীষণ ফাজিল।

কী করে বুঝলেন?

আমি আর মা পরদার আড়াল থেকে রোজ আপনার সঙ্গে বাবার কথাবার্তা শুনি। মাও বলে, রবি ভীষণ ফাজিল।

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন আমি তো লাটুবাবুর সঙ্গে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলি।

সেইটেই তো ফাজিলের লক্ষণ। আসলে বাবাকে আপনি মোটেই শ্রদ্ধা করেন না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আর কথাটাও তো মিথ্যে নয়। হয়তো বাস্তবিকই লাটুবাবুকে যতটা শ্রদ্ধা করা উচিত ততটা আমি এতদিন করিনি। কিন্তু ঝিলিককে দেখার পর থেকে তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা আসছে। যিনি এরকম একজন সুন্দরী মেয়ের জনক তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র।

ভিতর দিককার দরজার ভারী পরদাটা সরিয়ে বয়স্কা এক মহিলা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন। ধরা গলায় বললেন, তোমার বড় কষ্ট বাবা। আমরা সবই জানি। কত বড়লোকের ছেলে তুমি। আজ পথের ভিখিরি হয়ে গেছ। ওঁকে কত বলি, ওগো, রবির টাকাটা দিয়ে দাও, আমরা নয় শাকভাত

নুনভাত খাব। কিন্তু উনি ওইরকম। চোর ছ্যাঁচড় নন, কিন্তু সবকিছুই করবেন রয়ে বসে। আর এদিকে এই হিরের টুকরো ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে। আহা বাবা, আজ বুঝি কিছু খাওনি! কেমন গোগ্রাসে মিষ্টিগুলো খাচ্ছিলে!

আমি এই সামান্য আদরের কথায় কাঁদো কাঁদো হয়ে ভেজা গলায় বললাম, না মাসিমা, আজ আমি শেষ খাওয়া খেয়ে নিচ্ছি।

ছিঃ বাবা, ও কী কথা? ও মোক্ষদা, রবিকে আর—একটা মিষ্টির থালা এনে দে।

কিন্তু চোখের সামনে যে লক্ষ ভোলটের বিদ্যুৎশিখা দাঁড়িয়ে আছে তাকে কয়েক পলক দেখেই আমার ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। সকালে আমার দৃষ্টিতে যে সাম্যভাবটি এসেছিল সেটি উবে গেছে। আশ্চর্যের কথা, আমার আর মহীতোষের মামাশ্বশুর হতেও ইচ্ছে করছে না। তড়িৎস্পৃষ্ট আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, আমি আর খেতে পারব না।

ও কী কথা! না খেলেই আমি ছাড়ব নাকি? সেদিন উনি এসে বলেছিলেন, তোমার বড় ভাই নাকি ষড়যন্ত্র করে বাড়ির ভাগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করেছে। তারপর নাকি কোন জ্যোতিষ তোমাকে বলেছে, আয়ু নেই। এইসব কথা আমি আর ঝিলিক রোজ বলাবলি করি। তোমার জন্য বড় কষ্ট হয়। পরদার আড়াল থেকে রোজ তোমার গোপাল—গোপাল মুখখানা দেখে যাই আর ভাবি, কেন ভগবান এই সুন্দর ছেলেটাকে এত কষ্ট দিচ্ছে।

আমি আরও ভেজা গলায় বলি, কষ্ট কীসের মাসিমা। আরও কত লোক আমার চেয়েও কষ্টে বেঁচে আছে।

উনি বললেন, তাদের কথা ছাড়ো। আমি তোমার কথা নিয়েই ভাবি। শুনলুম তুমি নাকি ঝিলিকের বিয়ে দিতে গিয়ে নিজে একটা গেছো মেয়েছেলেকে বিয়ে করছ।

আমি অধোবদনে বলি, হ্যাঁ মাসিমা। এ ছাড়া রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়ে দেওয়ার উপায় নেই।

ঝিলিকের রিনরিনে গলায় একটা ঝংকার দেয়, তা বলে যাকে—তাকে বিয়ে করবেন? সে তো শুনেছি তিনবার ডিভোর্স করেছে।

আমাকেও করবে। কথা হয়ে আছে।

এমা! ছিঃ ছিঃ। আমরা তো একবারের কথাও ভাবতে পারি না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আর কেউ না জানুক আমি জানি, লীনাকে একটিমাত্র দিনের জন্যও বিয়ের করার কোনও আগ্রহ আমার নেই। জীবনটা যাদের আত্মরক্ষার কাজেই কেটে যায় তারা পৃথিবীতে কোনও ঘটনাই ঘটাতে পারে না, তারা কেবল নানা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে মাত্র। লীনার সঙ্গে আমার আশু বিয়েটাও তাই।

ঝিলিক সমবেদনার সঙ্গে বলল, বাবা আসুক। আজ আমি বাবাকে খুব বকে দেব।

লাটুবাবুর দোষ নেই।

লাটুবাবুর স্ত্রী বললেন, ওঁরই দোষ। কী এমন পাত্র যে, তার জন্য হামলে পড়তে হবে? ওসব বড় চাকরিওলা বড়লোকের ছেলেদের অনেক দোষও থাকে।

আছেও।—আমি উৎসাহ পেয়ে বলে ফেলি।

মিসেস লাটু সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে তুলে বলেন, ওই দ্যাখ ঝিলু, রবি কী বলছে! আছে। আমি তোকে আগেই বলেছিলুম না! তা বাবা, কী দোষ বলো তো।

আমি স্বীকারোক্তিটা প্রত্যাহার করার জন্য বারকয়েক ঢোঁক গিলে বললাম, সে সকলেরই থাকে। ও কিছু নয়।

নিশ্চয়ই মদ—মেয়েমানুষের দোষ। আসুন উনি, মজাটা দেখাব। সব বুঝেশুনেও কেউ এমন পাত্রের হাতে মেয়ে দেয়? আমি তো বাবা, পই পই করে ওঁকে বলেছি, আর কিছু নয়, চরিত্রটা কেমন সেটা দেখো। আমি

বড় ঘর, বড় চাকরির ছেলে চাই না। তা উনি এই ছেলের জন্যই পাগল। এর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে নাকি সমাজের ওপরতলায় ওঠা যাবে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, পাত্র হিসেবে রুদ্রাক্ষ ভালোই মাসিমা। আজ ঝিলিকের বিয়ের দিন। এই দিনে পাত্র সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন না তোলাই ভালো।

শ্রীযুক্তা লাটু উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, কী জানি বাবা, আমি তেমন ভালো বুঝছি না। আমি তো অন্য একটা কথা ভেবে রেখেছিলুম। ও ঝিলু, সেই কথাটা রবিকে বলব?

ঝিলিক ঈষৎ রক্তিম হল। মৃদু স্বরে বলল, থাক মা। বলে তো লাভ নেই।

কিন্তু মিসেস লাটু সরল সোজা মানুষ অকপটে চেয়ে অকপট গলায় বললেন, আমরা ভেবেছিলুম কী জানো? এই তোমার মতো গোপাল—গোপাল চেহারার ভালোমানুষ একটি ছেলে যদি পাই তবে তার সঙ্গেই—

সেই রাসকেল বেরসিক তান্ত্রিক বোধহয় দ্বিতীয় বাণটা মারল এ সময়ে। মোক্ষদা দ্বিতীয় রুপোর থালা আমার হাতে সদ্য ধরিয়ে দিয়েছে। থালাভরা মিষ্টির দিকে চেয়ে আমার চোখে জল আসছিল। ঠিক এই অসময়ে বাণটা লাগল এসে বাঁ বুকে। ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম আমি। থালাটা পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি সেটা রেখে দু'হাতে বুক চেপে ধরে আমি ককিয়ে উঠলাম। একটা আর্তনাদ আমার গলা থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল, তা হয় না মাসিমা! তা হয় না। রুদ্রাক্ষ অপেক্ষা করছে।

ঝিলিক আর—একটা ঝংকার দিল। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের এক ওলটপালট ঘটিয়ে, পৃথিবীর রং বদলে, ঝড় তুলে সে ছোট্ট করে বলল, করুক গে।

ছায়াময়ী

ধৃতির রিভলভার নেই কিন্তু হননেচ্ছা আছে। এই ত্রিশের কাছাকাছি বয়সে তার জীবনে তেমন কোনও মহিলার আগমন ঘটল না, তা বলে কি তার হৃদয়ে নারীপ্রেম নেই? ঈশ্বর বা ধর্মে তার কোনও বিশ্বাসই নেই, তবু সে জানে যে পঞ্চাশ বছর বয়সের পর সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। একজন বা একাধিক জ্যোতিষী তাকে ওই সতর্কবাণী শুনিয়েছে।

রাত দুটো। তবু এখন টেলিপ্রিন্টার চলছে ঝড়ের বেগে। চিফ সাব—এডিটর উমেশ সিংহ প্রেসে নেমে গেছেন খবরের কাগজের পাতা সাজাতে। দেওয়ার মতো নতুন খবর কিছু নেই আজ। বাকি তিনজন সাব—এডিটরের একজন বাড়ি চলে গেছে, দু'জন ঘুমোচ্ছে। ধৃতি একা বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। তার গায়ে গেঞ্জি, পরনে পায়জামা। টেলিপ্রিন্টারের খবর সে অনেকক্ষণ দেখছে না। কাগজ লম্বা হয়ে মেশিন থেকে বেরিয়ে মেঝেয় গড়াচ্ছে। এবার একটু দেখতে হয়।

ধৃতি উঠে জল দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি একসঙ্গে খেয়ে নেয়। তারপর মেশিনের কাছে আসে। মাদ্রাজে আমের ফলন কম হল এবার, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন, যুগোশ্লাভিয়া ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রশংসা করেছে, ইজরায়েলের নিন্দা করছে আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র। কোনও খবরই যাওয়ার নয়। একটা ছোট্ট খবর কাগজের লেজের দিকে আটকে আছে। প্লেন ক্র্যাশে ব্যাঙ্গালোরে দু'জন শিক্ষার্থী পাইলট নিহত। যাবে কি খবরটা? ইন্টারকম টেলিফোন তুলে বলল, উমেশদা, একটা ছোট প্লেন ক্র্যাশের খবর আছে। দেব?

কোথায়?

ব্যাঙ্গালোর।

ক'জন মারা গেছে?

দু'জন।

রেখে দাও। আজ আর জায়গা নেই। এমনিতেই বহু খবর বাদ গেল। ত্রিশ কলম বিজ্ঞাপন।

আচ্ছা।

ধৃতি বসে থাকে চুপ করে। অনুভব করে তার ভিতর হননেচ্ছা আছে, প্রেম আছে, আর আছে সুপ্ত সন্ন্যাস। বয়স হয়ে গেল ত্রিশের কাছাকাছি। ত্রিশ কি খুব বেশি বয়স?

টেলিফোন বেজে ওঠে। এত রাতে সাধারণত প্রেস থেকেই ফোন আসে। উমেশদা হয়তো কোনও হেডিং পালটে দিতে বলবে বা কোনও খবর ছাঁট—কাট করতে ডেকে পাঠাবে। তাই ধৃতি গিয়ে ইন্টারকম রিসিভারটা তুলে নেয়। তখনই ভুল বুঝতে পারে। এটা নয়, অন্য টেলিফোনটা বাজছে। বাইরের কল।

দ্বিতীয় রিসিভারটা তুলেই সে বলে, নিউজ।

ওপাশে অপারেটারের গলা পাওয়া যায়, এলাহাবাদ থেকে পি পি ট্রাঙ্ককল। ধৃতি রায়কে চাইছে।

রাত দুটোর সময় মাথা খুব ভালো কাজ করার কথা নয়। তাই এলাহাবাদ থেকে তার ট্রাঙ্ককল শুনেও সে তেমন চমকায় না। একটু উৎকর্ণ হয় মাত্র। তার তেমন কোনও নিকট আত্মীয়স্বজন নেই, স্ত্রী বা পুত্রকন্যা নেই, তেমন কোনও প্রিয়জন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই। কাজেই দুঃসংবাদ পাওয়ার কোনও ভয়ও নেই তার।

এলাহাবাদি কণ্ঠটি খুবই ক্ষীণ শোনা গেল, হ্যালো! আমি ধৃতি রায়ের সঙ্গে—

ধৃতি রায় বলছি।

মাত্র তিন মিনিট সময়, কিন্তু আমার যে অনেক কথা বলার আছে।

বলে ফেলুন।

বলা যাবে না। শুধু বলে রাখি, আমি টুপুর মা। টুপুকে ওরা মেরে ফেলেছে, বুঝলেন? খবরটা আপনার কাগজে ছাপবেন কিন্তু! শুনুন, সবাই এটাকে আত্মহত্যা বলে ধরে নিচ্ছে। প্লিজ, বিশ্বাস করবেন না। আপনি লিখবেন টুপু খুন হয়েছে।

অধৈর্য ধৃতি বলে, কিন্তু টুপু কে?

আমার মেয়ে।

আপনি কে?

আমি টুপুর মা।

আপনি আমাকে চেনেন?

চিনি। আপনি খবরের কাগজে কাজ করেন। মাঝে মাঝে আপনার নামে লেখা বেরোয় কাগজে। নামে চিনি।

আমি যে নাইট শিফটে আছি তা জানলেন কী করে?

আজ বিকেলে আপনার অফিসে আর একবার ট্রাঙ্ককল করি, তখন অফিস থেকে বলেছে।

শুনুন, আপনার মুখের খবর তো আমরা ছাপতে পারি না, আপনি বরং ওখানে আমাদের যে করেসপন্ডেন্ট আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

না, না। ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না। টুপুকে মেরে ফেলা হয়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন।

ধৃতি বুঝতে পারে এলাহাবাদি পুরো পাগল। সে তাই গলার স্বর মোলায়েম করে বলল, তা হলে বরং ঘটনাটা আদ্যোপান্ত লিখে ডাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

ছাপবেন তো?

দেখা যাক।

না, দেখা যাক নয়। ছাপতেই হবে। টুপু যে খুন হয়েছে সেটা সকলের জানা দরকার। খবরের সঙ্গে ওর একটা ছবিও পাঠাব। দেখবেন টুপু কী সুন্দর ছিল। অদ্ভুত সুন্দর। ওর নামই ছিল মিস এলাহাবাদ।

তাই নাকি?

পড়াশুনোতেও ভালো ছিল।

অপারেটর তিন মিনিটের ওয়ার্নিং দিতেই ধৃতি বলল, আচ্ছা ছাড়ছি।

ছাপবেন কিন্তু।

ধৃতির কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। ফোন ছেড়ে সে উঠে মেশিন দেখতে থাকে। বাণিজ্য—মন্ত্রীর বিশাল এক বিবৃতি আসছে পার্টের পর পার্ট। এরা যে কী সাংঘাতিক বেশি কথা বলতে পারে! আর কখনও নতুন কথা বলে না।

টেবিলের ওপর বিছানা পাতা রয়েছে। ধৃতি আর মেশিন পাহারা না দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। নতুন সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। সিগারেট শেষ হলেই চোখ বুজবে।

চোখের দুটো পাতা চুম্বকের টানে জুড়ে আসছে ক্রমে। মাথার দিকে অল্প দূরেই টেলিপ্রিন্টার ঝোড়ো শব্দ তুলে যাচ্ছে। রিপোর্টারদের ঘরে নিষ্ফল টেলিফোন বেজে বেজে এক সময়ে থেমে গেল। মাথার ওপরকার বাতিগুলো নিভিয়ে দিচ্ছে সহদেব বেয়ারা। আবছা অন্ধকারে হলঘর ভরে গেল।

সিগারেট ফেলে ফিরে শুল ধৃতি। উমেশদা প্রেস থেকে কাগজ ছেড়ে উঠে এল, আধো ঘুমের মধ্যেও টের পেল সে।

অনেকদিন আগে স্টেট ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়েছিল ধৃতি। তখন ব্যাঙ্কের অল্পবয়সি কর্মীদের কয়েকজন তাকে ধরল, আপনি ধৃতি রায়? খবরের কাগজে ফিচার লেখেন আপনিই তো?

সেই থেকে তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। স্টেট ব্যাঙ্কের ওপরতলায় কমন রুম আছে। সেখানে আজকাল বিকেলের দিকে অবসর পেলে এসে টেবিল টেনিস খেলে।

আজও খেলছিল। টেবিল টেনিস সে ভালোই খেলে। ইদানীং সে জাপানি কায়দায় পেন হোল্ড গ্রিপে খেলার অভ্যাস করছে। এতে একটা অসুবিধে যে ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না। বাঁ দিকে বল পড়লে হয় কোনওক্রমে ফিরিয়ে দিতে হয়, নয়তো বাঁ দিকে সরে গিয়ে বলটাকে ডানদিকে নিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হয়। তবে এই কলম ধরার কায়দায় ব্যাট ধরলে মারগুলো হয় ছিটেগুলির মতো জোরালো। সে চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য খেলে না, এমনিতেই খেলে। কিন্তু ধৃতি যা—ই করে তাতেই তার অখণ্ড মনোযোগ।

আর এই মনোযোগের গুণেই সে যখনই যা করে তার মধ্যে ফাঁকি থাকে না। পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছেয় সে যে কয়েকটা ফিচার লিখেছে তার সবগুলোই ভালোভাবে উতরে যায়। তার ফলে বাজারে সে সাংবাদিক হিসেবে মোটামুটি পরিচিত। নাম বলতেই অনেকে চিনে ফেলে। অবশ্য এর এক জ্বালাও আছে।

যেমন স্টেট ব্যাঙ্কে যে নতুন এক টেকো ভদ্রলোক এসেছেন সেই ভদ্রলোকটি তাকে আজকাল ভারী জ্বালায়। নাম অভয় মিত্র, খুবই রোগা, ছোট্ট, ক্ষয়া একটি মানুষ। গায়ের রং ময়লা। বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশ, কিন্তু এর মধ্যেই অসম্ভব বুড়িয়ে রসকষহীন হয়ে গেছে চেহারা। চোখদুটোতে একটা জুলজুলে সন্দিহান দৃষ্টি। অভয় মিত্র তার নাম শুনেই প্রথম দিনই গম্ভীর হয়ে বলেছিল, দেশে যত অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে তার বিহিত করুন। আপনারাই পারেন।

কে না জানে যে এ দেশে প্রচুর অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে! আর এও সকলেরই জানা কথা যে কিছু করার নেই।

কিন্তু অভয় মিত্র ধৃতিকে ছাড়েন না। দেখা হলেই ঘ্যানঘ্যান করতে থাকেন, আপনারা কী করছেন বলুন তো? দেশটা যে গেল!

ধৃতি খুবই ধৈর্যশীল, সহজে রাগে না। কিন্তু বিরক্ত হয়। বিরক্তি চেপে রেখে ধৃতি বলে, আমার কাগজ আমাকে মাইনে দেয় বটে, কিন্তু দেশকে দেখার দায়িত্ব দেয়নি অভয়বাবু। দিলেও কিছু তেমন করার ছিল না। খবরের কাগজ আর কতটুকু করতে পারে?

অভয় হাল ছাড়েন না। বলেন, মানুষের দুঃখ—দুর্দশার কথা লিখুন। শয়তানদের মুখোশ খুলে দিন।

অভয় মিত্রের ধারণা খুবই সহজ ও সরল। তিনি জানেন কিছু মুখোশ—পরা লোক আড়াল থেকে দেশটার সর্বনাশ করছে। শোষণ করছে, অত্যাচার করছে, ডাকাতি, নারীধর্ষণ, কালো টাকা জমানো থেকে সব রকম দুষ্কর্মই করছে একদল লোক।

তারা কারা?—একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ধৃতি।

তারাই দেশের শত্রু। আমি আপনাকে অনেকগুলো কেস বলতে পারি।

শুনব'খন একদিন।

এইভাবে এড়িয়েছে ধৃতি।

আজও টেবিল টেনিস খেলার দর্শকের আসনে অভয় মিত্র বসা। তিনি কোনওদিনই খেলেন না। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ নিয়ে বসে থাকেন। ধৃতি স্টেট ব্যাঙ্কের সবচেয়ে মারকুটে খেলোয়াড় সুব্রতকে এক গেমে হারিয়ে এসে চেয়ারে বসে দম নিচ্ছিল।

অভয় মিত্র বললেন, আমি আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি ইন্টেলেকচুয়ালরা সি আই এ—র টাকা খায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে নির্বিকারভাবে বলল, খায়।

সে কথা আপনারা কাগজে লেখেন না কেন?

আমিও খাই যে। —বলে ধৃতি হাসল।

না না, ইয়ারকির কথা নয়। আমি আপনাকে একটা ঘটনার কথা বলি। ময়নাগুড়িতে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার গেল একবার। অতি সৎ লোক। কিন্তু কন্ট্রাক্টররা তাকে কিছুতেই ঘুষ না দিয়ে ছাড়বে না। তাদের

ধারণা ঘুষ না নিলে ছোকরা সব ফাঁস করে দেবে। যখন কিছুতেই নিল না তখন একদিন দুম করে ছেলেটাকে অন্য জায়গায় বদলি করে দেওয়া হল। এ ব্যাপারটাকে আপনি কী মনে করেন?

খুব খারাপ।

ভীষণ খারাপ ব্যাপার নয় কি?

ভীষণ।

এইসব চক্রান্তের পিছনে কারা আছে সে তো আপনি ভালোই জানেন।

এইসব চক্রান্ত ফাঁস করে দিন।

দেব। সময় আসুক।

সময় এসেছে, বুঝলেন। সময় এসে গেছে। ইন্ডিয়া আর চায়নার বর্ডারে এখন প্রচণ্ড মবিলাইজেশন শুরু হয়ে গেছে।

বটে? খবর পাইনি তো!

খবর আপনারা ঠিকই পান, কিন্তু সেগুলো চেপে দেন। আপনাকে আরও জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে নেতাজির রেগুলার টেলিফোনে কথাবার্তা হয়। নেতাজি সন্ন্যাস ছেড়ে আসতে চাইছেন না। কিন্তু হয়তো তাঁকে আসতেই হবে শেষপর্যন্ত। আপনারাও জানেন যে নেতাজি বেঁচে আছেন, কিন্তু খবরটা ছাপেন না।

ধৃতি বিরক্ত হয় না। মুখ গম্ভীর করে বলে, তা অবশ্য ঠিক। সব খবর কি ছাপা যায়?

কিন্তু মুখোশ একদিন খুলে যাবেই। সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবে।

ধৃতির সময় নেই। আবার নাইট শিফট। ঘড়ি দেখে সে উঠে পড়ে। ধৃতি আগে থাকত একটা মেসে। তার বন্ধু জয় নতুন একটা ফ্ল্যাট কিনল বিস্তর টাকার ঝুঁকি নিয়ে। প্রথমেই থোক ত্রিশ হাজার দিতে হয়েছিল, তারপর মাসে মাসে সাড়ে চারশো করে গুনে যেতে হচ্ছে। চাকরিটা জয় কিছু খারাপ করে না। সে বিলেতফেরত এঞ্জিনিয়ার, কলকাতার একটা এ—গ্রেড ফার্মে আছে। হাজার তিনেক টাকা পায়। কাট—ছাঁট করে আরও কিছু কম হাতে আসে।

জয়ের বয়স ধৃতির মতোই। বন্ধুত্বও খুব বেশি দিনের নয়। তৃতীয় এক বন্ধুর সূত্রে ওলিম্পিয়া রেস্টুরেন্টে ভাব হয়ে গিয়েছিল। পরে খুব জমে যায়।

জয় একদিন এসে বলল, একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। একটা ঘর আছে, তুমি থাকবে?

একটু দোনা—মোনা করেছিল ধৃতি। মেসের মতো অগাধ স্বাধীনতা তো বাড়িতে পাবে না।

দ্বিধাটা বুঝে নিয়ে জয় বলল, আরে আমার হাউসহোল্ড কি আর পাঁচজনের মতো নাকি! ইউ উইল বি ফ্রি অ্যাজ লাইট অ্যান্ড এয়ার। মান্থলি ইনস্টলমেন্টটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে ভাই, একা বিয়ার করতে পারছি না। তুমি যদি শেয়ার করো তা হলে আমি বেঁচে যাই।

ওরা ব্যাচেলর সাবটেনান্ট খুঁজছে। ধৃতির চেয়ে ভালো লোক আর কাকে পাবে? ধৃতির আত্মীয়স্বজন নেই, বন্ধু—বান্ধবী নেই। ফলে হুটহাট লোকজন আসবে না।

ধৃতি রাজি হয়ে গেল। সেই থেকে সে জয়ের একডালিয়ার ফ্ল্যাটবাড়িতে আছে। দু'তলায় দক্ষিণ—পূর্বমুখী চমৎকার আস্তানা। সামনের দিকের বেডরুমটা ধৃতি নিয়েছে। ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে থাকে। খাওয়া—দাওয়া থাকলে ধৃতির বাঁধা নেমন্তন্ন থাকে। ধৃতি প্রতি মাসে দু'শো টাকা করে দেয়।

ধৃতি যখন ফিরল তখন প্রায় সাতটা বাজে। নাইট শিফট শুরু হবে ন'টায়। সময় আছে।

কলিং—বেল টিপতে হল না। দরজা খোলাই ছিল। সামনের সিটিং—কাম—ডাইনিং হলের মাঝখানের বিশাল টানা পরদাটা সরানো। খাওয়ার টেবিলের ওপর প্লেটে পেঁয়াজ কুচি করছিল পরমা। আর আঁচলে চোখ মুছছিল।

পরমা দারুণ সুন্দরী। ইদানীং সামান্য কিছু বেশি মেদ জমে গেছে, নইলে সচরাচর এত সুন্দরী দেখাই যায় না। নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে পরমা অত্যন্ত সচেতন। কখনও তাকে না—সাজা অবস্থায় ঘরেও দেখেনি ধৃতি। যখনই দেখে তখনই পরমার মুখে মৃদু বা অতিরিক্ত প্রসাধন, চোখে কাজল, ঠোঁটে কখনও হালকা কখনও গাঢ় লিপস্টিক, পরনে সব সময়ে ঝলমলে শাড়ি। তেইশ—চব্বিশের বেশি বয়স নয়।

ধৃতি শিস দিতে দিতে দরজা দিয়ে ঢুকেই বলল, পরমা, কাঁদছ?

কাঁদব না? পেঁয়াজ কাটতে গেলে সবারই কান্না আসে।

আমার চিঠি—ফিটি কিছু এল শেষ ডাকে?

কে চিঠি দেবে বাবা! রোজ কেবল চিঠি!

চিঠি দেওয়ার লোক আছে।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, সে সব তো আজে—বাজে লোকের চিঠি। কে লেখা ছাপাতে চায়, কে খবর ছাপাতে চায়, কে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। ওসব কি চিঠি নাকি? আপনি প্রেমপত্র পান না কেন বলুন তো?

ধৃতি নিজের ঘরে ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে বলে, দেখো ভাই বন্ধুপত্নী, যাদের পারসোনালিটি থাকে তাদের সকলেই ভয় পায়। আমাকে প্রেমপত্র দিতে কোনও মেয়ে সাহস পায় না।

ইস! বেশি বকবেন না। নিজে একটি ভিতুর ডিম। মেয়ে দেখলে তো খাটের তলায় লুকোন।

কবে লুকিয়েছি?

জানা আছে।

ঠোঁট ওলটালে পরমাকে বড় সুন্দর লাগে। এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। ধৃতি তাই স্থির চেয়ে থাকে একটু। মৃদু একটু মুগ্ধতার হাসি তার মুখে।

কোন মেয়ে না পুরুষের দৃষ্টির সরলার্থ করতে পারে! পরমা বরং তা আরও বেশি পারে। কেন না সুন্দরী বলে সে ছেলেবেলা থেকেই বহু পুরুষের নজর পেয়ে আসছে।

ধৃতি বলল, পরমা তোমার কেন একটা ছোট বোন নেই বলো তো?

থাকলে বিয়ে করতেন?

আহা, বিয়ের কথাটা ফস করে তোলা কেন? অন্তত প্রেমটা তো করা যেত।

প্রেম করতে কলজের জোর চাই সাংবাদিক মশাই। যত সস্তা ভাবছেন অত নয়।

বিয়ের আগে তুমি ক'টা প্রেম করেছ? কমিয়ে বোলো না, ঠিককরে বলো তো!

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, অনেক। কতবার তো বলেছি।

কোনওবারই সঠিক সংখ্যাটা বলোনি।

হিসেব নেই যে।

সেই সব রোমিওদের সঙ্গে এখন আর দেখা হয় না?

একেবারে হয় না তা নয়।—বলে পরমা একটু চোখ পাকিয়ে মৃদু হাসে।

তাদের এখন অবস্থা কী?

প্রথম—প্রথম অক্সিজেন কোরামিন দিতে হত, এখন সব উঠছে।

ধৃতি খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, বাস্তবিক, একজন সুন্দরী মেয়ে যে কত পুরুষের সর্বনাশ করতে পারে।

পুরুষরা তো সর্বনাশই ভালোবাসে।

শিস দিতে দিতে ধৃতি ঘরে ঢোকে। পরমা বাইরে থেকে বলে, চা চাই নাকি?

দেবে?

খেলে দেব না কেন? আহা, কী কথা!

দাও তা হলে। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট—ফিস্কুট দিয়ো না আবার! আমি নেকেড চা ভালোবাসি।

পরমা অত্যন্ত দুষ্টু একটা জবাব দিল, অত নেকেড ভালোবাসতে হবে না।

ঘরে একা ধৃতি একটু হাসল।

তার ঘরটা অগোছালো বটে কিন্তু দামি জিনিসের অভাব নেই। একটা স্টিলের হাফ—সেকরেটারিয়েট টেবিল জানলার পাশে, টেবিলের সামনে রিভলভিং চেয়ার, তার সিঙ্গল খাটে ফোম রাবারের তোষক। মহার্ঘ্য বুককেস। একটা চারহাজারি স্টিরিয়ো গ্রামোফোন, একটা ছোট্ট জাপানি রেডিয়ো। যা রোজগার তার সবটাই কেবলমাত্র নিজের জন্য খরচ করতে পারে সে।

নিকট—আত্মীয় বলতে এক দাদা আর দিদি আছে তার। দাদা বেনারসে রেলের বুকিং ক্লার্ক। দিদি স্বামী—পুত্র নিয়ে দিল্লি প্রবাসিনী। সারা বছর ভাই—বোনে কোনও যোগাযোগ নেই। বিজয়া বা নববর্ষে বড়জোর একটা পোস্টকার্ড আসে, একটা যায়। তাও সব বছর নয়। আত্মীয়তার বন্ধন বা দায় নেই বলে ধৃতির খারাপ লাগে না। বেশ আছে। দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে, যেবার সে অফিসের কাজে দিল্লি যায়। দিদির বাড়িতে ওঠেনি, অফিস হোটেল—খরচ দিয়েছিল। দেখা হয়েছিল এক বেলার জন্য। ধৃতি দেখেছিল দিদি নিজের সংসারের সঙ্গে কী গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। ভাই বলে ধৃতিকে আদরের ত্রুটি করেনি, তবু ধৃতির নিজেকে পর মনে হয়েছিল। দাদা অবশ্য সে তুলনায় আরও পর। দিদি সেবার একটা দামি প্যান্ট করিয়ে নেওয়ার জন্য টাকা দেয়, ভাইয়ের হাত ধরে বিদায়ের সময়ে কেঁদেও ফেলে। কিন্তু দাদা সেরকম নয়। বছরখানেক আগে বেনারসে দাদার ছেলের পৈতে উপলক্ষ্যে গিয়ে ধৃতি প্রথম বুঝতে পারে যে না এলেই ভালো হত। দাদা তার সঙ্গে তেমন করে কথাই বলেনি, আর বউদি নানাভাবে তাকে শুনিয়েছে তোমার দাদার একার হাতে সংসার, কেউ তো আর সাহায্য করার নেই। খোঁজই নেয় না কেউ। এসব খোঁটা দেওয়া ধৃতির ভালো লাগে না। সে নিজে একসময়ে দাদার পয়সায় খেয়েছে পরেছে ঠিকই, কিন্তু বউদি যখন বলল, তোমার দাদা তো সকলের জন্যই করেছে, এখন তার জন্য কেউ যদি না করে তবে তো বলতেই হয় মানুষ অকৃতজ্ঞ, তখন ধৃতির ভারী ঘেন্না ধরে ভিখিরিপনা দেখে। কলকাতায় এসে সে দু'মাসে হাজারখানেক টাকা মানি—অর্ডার করে পাঠিয়ে দেয়।

পরমা নিজেই চা নিয়ে আসে। ধৃতি লক্ষ করে অল্প সময়ের মধ্যেই পরমা শাড়ি পালটেছে। কতবার যে দিনের মধ্যে শাড়ি পালটায় পরমা।

ধৃতি বিছানায় চিতপাত হয়ে পড়েছিল। পরমা বিছানার ওপর এক টুকরো পিসবোর্ডে চায়ের কাপ রেখে রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে বলল, আজ নাইট শোতে সিনেমায় যাচ্ছি।

জয়কে খুব ধসাচ্ছ ভাই বন্ধুপত্নী।

আহা, সিনেমায় গেলে বুঝি ধসানো হয়?

শুধু সিনেমা? ফি হপ্তায় যে শাড়ি কিনছ। টি ভি কেনার বায়না ধরেছ। সব জানি। পার্ক স্ট্রিটের হোটেলেও খাওয়া—দাওয়া হচ্ছে প্রায়ই। পরমা তার প্রিয় মুদ্রাদোষে ঠোঁট উলটে বলে, আমরা তো আর আপনার মতো রসকষহীন হাড়কঞ্জুস নই।

আমি কঞ্জুস?

নয় তো কী? খরচের ভয়ে তো বিয়েই করছেন না। পাছে প্রেমিকাকে সিনেমা দেখাতে কি হোটেলে খাওয়াতে হয় সেই ভয়েই বোধহয় প্রেমেও অরুচি হচ্ছে।

উপুড় হয়ে বুকে বালিশ দিয়ে চায়ে চুমুক মেরে ধৃতি বলল, তোমাদের বিবাহিতদের যা কাণ্ডকারখানা দেখছি এরপর আহাম্মক ছাড়া কে বিয়ে করতে যায়?

মারব থাপ্পড়, কী কাণ্ড দেখলেন শুনি?

রোজ তো তোমাদের দু'জনে খটামটি লেগে যায়।

আহা, সে হাঁড়ি—কলসি এক জায়গায় থাকলে ঠোকাঠুকি হয়ই। তা ছাড়া ওসব ছাড়া প্রেম জমে নাকি? একঘেয়ে হয়ে যায়।

যা—ই বলো ভাই, জয়টার জন্য আমার কষ্ট হয়।

পরমা থমথমে মুখ করে বলে, বললেন তো? আচ্ছা আমিও দেখাচ্ছি। একটা চিঠি এসেছে আপনার। নীল খামে। কিছুতেই সেটা দেব না।

মাইরি?—বলে ধৃতি উঠতে চেষ্টা করে।

পরমা লঘু পায়ে দরজা পেরিয়ে ছুটে চলে যায়। ধৃতি একটু উঠতে চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত ওঠে না। চা খেতে থাকে আস্তে আস্তে।

হলঘরে জয়ের গলা পাওয়া যায়, ওঃ, যা একখানা কাণ্ড হয়ে গেল আজ! এই পরমা, শোনো না!

পরমা কোনওদিনই জয়ের ডাকে সাড়া দেয় না। স্বামীরা আজকালকার মেয়েদের কাছে সেকেন্ড গ্রেড সিটিজেন। পরমা কোনও জবাব দিল না।

এই পরমা!—জয় ডাকে।

ভারী বিরক্তির গলায় পরমা বলে, অত চেঁচাচ্ছ কেন বলো তো! এখন যেতে পারছি না।

ডোন্ট শো মি বিজিনেস। কাম হিয়ার। গিভ মি এ—

আঃ! কী যে কোরো। দাঁড়াও, ধৃতিকে ডাকছি, এসে দেখে যাক।

ওঃ, ধৃতি দেখে কী করবে? হি ইজ ভারচুয়ালি সেক্সলেস। ওর কোনও রি—অ্যাকশন নেই।

পরমা চেঁচিয়ে ডাকল, ধৃতিবাবু! এই ধৃতি রায়!

ধৃতি শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুচ্চ স্বরে ঘর থেকেই জবাব দেয়, ভাই, তোমাদের বসন্ত—উৎসবে আমাকে ডেকো না। আমি কোকিল নই, কাক।

পরমা পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়ে বলে, একজন বিপন্ন মহিলাকে উদ্ধার করা পুরুষের কর্তব্য। আপনাদের শিভালরি কোথায় গেল বলুন তো?

অগাধ জলে। পরমা, আমাদের সব ভেসে গেছে। নারী প্রগতির এই যুগে পুরুষ নাসবন্দি অপদার্থ মাত্র।

পরদার ওপাশে ঝটাপটির শব্দ হয়। আসলে ওটা জয়ের প্রেম নয়, টিকলিং। ধৃতি নির্বিকারভাবে ধোঁয়ার রিং করার চেষ্টা করতে থাকে শুয়ে শুয়ে। সে জানে জয় সুব্রতর বোনের সঙ্গে একটা রিলেশন তৈরি করেছে সম্প্রতি। জানে বলে ধৃতির এক ধরনের নির্বিকার ভাব আসে। একটু বাদে জয় ঘরে এল। তার পরনে পাজামা, কাঁধে তোয়ালে। হাতে এক গ্লাস ফ্রিজের ঠান্ডা জল। এসে চেয়ারে বসে বলল, দিন দিন ডামি হয়ে যাচ্ছি মাইরি।

মানে?

মানে আর কী? কোথাও আমার কোনও ওপিনিয়ন অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে না। না ঘরে, না বাইরে। কোম্পানি আগ্রার কাছে তাদের প্রোডাকশন তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। আমাকে যেতে হবে সাইট আর আদার ফেসিলিটিজ দেখতে। এ নিয়ে আজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে দু' ঘণ্টা মুখের ফেকো তুলে বকলাম। কী মাল মাইরি! আসানসোলে কারখানা খোলবার লেটার অফ ইনডেন্ট পেয়ে গেছে, তবু সেখানে করবে না, আগ্রায় যাবে। হেডস্ট্রং যাকে বলে!

কবে যাচ্ছিস?

ঠিক নেই এখনও। মে বি নেক্সট মান্থ, মে বি নেক্সট উইক, ইভন টুমোরো।

ঘুরে আয়। সেকেন্ড হানিমুন হয়ে যাবে।

আর হানিমুন! ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে লালবাতি জ্বলছে। এই ফ্ল্যাটটা না বেচে দিতে হয়। আজকাল যে যত বড় চাকরি করে তার তত মানিটারি ওবলিগেশন। হ্যাঁ রে, তোরা ট্যাকসেশন নিয়ে কি কিছুই লিখবি না? খোদ আমেরিকায় চল্লিশ—পঁয়তাল্লিশ পারসেন্টের বেশি ট্যাকসেশন নেই। আর এই ভুখা দেশে কেন এরকম আনহাইজনিক ট্যাকসেশন।

কে জানে!

এটা নিয়ে কিন্তু লেখা দরকার। একটা তিন হাজারি মাস মাইনের লোক আজকাল পুরো প্রলেটারিয়েট। আর ওদিকে যত ট্যাক্স রেট বাড়ছে তত বাড়ছে ট্যাক্স ক্রাইম আর হ্যাজার্ডস।

ধৃতি চিত থেকে উপুড় হয়ে বলল, তুই তো এই ফ্ল্যাটটা তোর কোম্পানিকে লিজ দিয়েছিস। তারাই তো ভাড়া গুনছে।

না করে কী করব? টাকা আসবে কোত্থেকে? আমার একমাত্র ট্যাক্স—ফ্রি ইনকাম কোনটা জানিস? তোর দেওয়া মাসে মাসে দুশো টাকা।

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে। বাস্তবিকই বড় চাকুরেরা আজকাল সুখে নেই।

জয় কিছুক্ষণ চুপচাপ, ঠান্ডা জল খেল।

ধৃতি বলল, তোর বউ আমার একটা চিঠি চুরি করেছে। মেয়েদের নিন্দে করেছিলাম বলে পানিশমেন্ট।

নিন্দে করেছিস? সর্বনাশ! সে তো সাপের লেজে পা।

ওপাশের হলঘর থেকে পরমা চেঁচিয়ে বলে, খবরদার সাপের সঙ্গে তুলনা দেবে না বলে দিচ্ছি। আমরা কি সাপ?

সাপ কি খারাপ?—জয় প্রশ্ন করে উঁচু স্বরে।

পরমা ঘরে ঢুকে আসে। হাতে এক কোষ জল। সেটা সজোরে জয়ের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, সাপ ভালো কি না নিজে জানো না?

ধৃতি বালিশে মুখ গুঁজে বলে, আচ্ছা বাবা, আমিই না হয় সাপ। জয় ভেড়া, আর পরমা সিংহী।

সিংহী না হাতি। পরমার সরোষ উত্তর।

তবে হাতিই। দ্যাট ইজ ফাইনাল। —ধৃতি বলে।

জয় হেসে বলে, হাতি বলছে কেন জানো তো! তোমার যে একটু ফ্যাট হয়েছে তাইতেই ওর চোখ টাটায়। ওর গায়ে এক মগ ঢেলে দাও।

পরমা 'ঠিক বলেছ' বলে দৌড়ে গেল জল আনতে।

জয় এক প্যাকেট আবদাল্লা সিগারেট ধৃতির বিছানায় ছুড়ে দিয়ে বলল, এটা তোর জন্য। রাখ।

ধৃতি পরম আলস্যে পাশ ফিরে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে বলে, কোথায় পেলি? ফরেনের মাল দেখছি।

অফিসে একজন ক্লায়েন্ট চার প্যাকেট প্রেজেন্ট করে গেল। সদ্য ফরেন থেকে এসেছে।

ধৃতি একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানে।

জয় বলে, একটু গার্ড নে, পরমা বোধহয় সত্যিই জল আনছে।

মাইরি!—বলে ধৃতি লাফিয়ে ওঠে।

পরমা একটা লাল প্লাস্টিকের মগ হাতে ঘরে ঢুকেই ছুটে আসে। ধৃতি জাপানি ছাতাটা খুলে সামনে ধরতেই পরমা হেসে উঠে বলে, আহা, কী বুদ্ধি!

বলতে বলতে পরমা মগ থেকে জল হাতের আঁজলায় তুলে ওপর বাগে ছিটিয়ে দেয়, নানা কায়দায় ধৃতি ছাতা এদিক ওদিক করে জল আটকাতে আটকাতে বলে, আমি কী করেছি বলো তো?

হাতি বললেন কেন?

মোটেই বলিনি। তুমি বলেছ।

ইস! আপনিই বলেছেন।

মাপ চাইছি।

কান ধরুন।

ধৃতি ছাতা ফেলে কান ধরে দাঁড়ায়।

পরমা মগ রেখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, মেয়েদের সম্মান করতে কবে যে শিখবেন আপনারা!

কেন, খুব সম্মান করি তো।

করলে জাতটা উদ্ধার পেয়ে যেত।

জয় মৃদু হাসছিল। বলল, ওর কথা বিশ্বাস কোরো না পরমা। ধৃতি এক নম্বরের—উওম্যান—হেটার! নারী প্রগতির বিরোধী। আড়ালে ও মেয়েদের নামে যা তা বলে। ও যদি কখনও প্রাইম মিনিস্টার হয় তবে নাকি স্লোগান দেবে, মেয়েরা রান্নাঘরে ফিরে যাও।

বটে?—পরমা চোখ বড় করে তাকায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, মাইরি না। আমি মেয়েদের ক্রিকেট খেলা দেখতেও যাই।

পরমা শ্বাস ফেলে বলে, আমি অবশ্য মেয়েদের ক্রিকেট খেলা পছন্দ করি না। কিন্তু মেয়েদের লিবার্টিকে সাপোর্ট করি।

তোমরা তো ভাই লিবারেটেড। কেউ আজকাল মেয়েদের বাঁধে না। ছাড়া মেয়েরা কেমন চারদিকে পাখি প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ফের? ছাড়া মেয়ে মানে?

মানে যারা লিবারেটেড।

সন্দেহের চোখে চেয়ে পরমা বলে, ব্যাড সেনসে বলছেন না তো?

আরে না।

জয় বলে, ব্যাড সেনসেই বলছে। ওকে ছেড়ো না।

পরমা জয়ের দিকে চেয়ে বলে, তুমি ফুট কাটছ কেন বলো তো?

আমাকে খেপিয়ে দিয়ে বিনি পয়সায় মজা দেখতে চাইছ?

ধৃতি কথাটা লুফে নিয়ে বলে, একজ্যাক্টলি। এবার জয়কেও একটু শাসন করো পরমা, বর বলে অতটা খাতির কোরো না।

কে খাতির করছে? —বলে ধৃতিকে একটা ধমক দিয়ে পরমা জয়কে বলে, আমি জোকার নাকি?

জয় খুব বিষণ্ণ হয়ে বলে, যার জন্য করি ভালো সে—ই বলে চোর!

থাক, আর সাধু সাজতে হবে না।

তুমি নারীরত্ন।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, ডিকশনারি কিংবা বঙ্কিমের বই খুললেই ওসব শব্দ জানা যায়। কমপ্লিমেন্ট দিতেও পারো না বুদ্ধু কোথাকার!

তোমার দিকে চাইলে আমার যে কথা হারিয়ে যায়। আত্মহারা হয়ে পড়ি।

খুব সন্তর্পণে ধৃতি বলল, পরমা সুন্দরী।

পরমা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, এটা আবার কবে থেকে?

এইমাত্র মনে এল। ভালো না?

ভেবে দেখি।

বলছিলাম পরমা সুন্দরী, আজকের ডাকে আমার কি কোনও চিঠি এসেছে?

এসেছে, কিন্তু দেব না।

না না, চাইছি না, এলেই হল। আমার যে চিঠি আসছে তার মানে হল এখনও লোকে আমাকে ভুলে যাচ্ছে না, আমি যে বেঁচে আছি তা এখনও কিছু লোক জানে, আর কষ্ট করে যে চিঠি লিখছে তার অর্থ হল আমার মতো অপদার্থকেও লোকের কিছু জানানোর আছে, বুঝলে? চিঠি আসাটাই ইমপর্ট্যান্ট। চিঠিটা নয়।

ওঃ, খুব ফিলজফার! আচ্ছা দেব না চিঠি।

চাইনি তো। চাইছিও না।—ধৃতি বলে।

চাইছে না আবার! ভিতরে ভিতরে ছটফটাচ্ছে! কে চিঠি দিয়েছে বলুন তো? মেয়েলি হাতের লেখা আমি ঠিক চিনি।

হয়তো দিদি।—ধৃতি বলে।

না, দিদি নয়, খামের বাঁ দিকে চিঠি যে দিয়েছে তার নাম—ঠিকানা আছে।

তাই বলো!—ধৃতি একগাল হেসে বলে, আমি ভাবছি, পরমার এত বুদ্ধি কবে থেকে হল যে হাতের লেখা দেখে মেয়ে না ছেলে বুঝে ফেলবে!

শুনলে পরমা?—জয় ফের খোঁচায়।

পরমা বলে, আমি কালা নই।

তোমাকে বোকা বলছে।

বোকা নয়।—ধৃতি বলে, আমি বলতে চাইছি পরমা কুটিল নয়, পরমা সরল ও নিষ্পাপ।

হয়েছে! এই নিন চিঠি। আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।

বিছানার ওপর একটা খাম ফেলে দিয়ে পরমা চলে যায়।

ধৃতি ঘড়ি দেখে। সময় আছে। চিঠিটা নিয়ে বিছানায় ফের চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়ে।

খামের ওপর বাঁ—ধারে লেখা, টুম্পা চৌধুরী। নামের নীচে মধ্য কলকাতার ঠিকানা।

ধৃতি টুম্পা নামে কাউকে মনে করতে পারল না। চিঠি বেশি বড়ও নয়। খুলে দেখল কয়েক ছত্র লেখা—শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার দাদা আপনার সঙ্গে পড়ত। দাদার নাম অশোক চৌধুরী। মনে আছে? একটা দরকারে এই চিঠি লিখছি। আমি একটা ডেফিসিট গ্র্যান্টের স্কুলে কাজ করি। আমাদের বিল্ডিং—এর জন্য একটা গ্র্যান্ট দরকার। আমরা দরখাস্ত করেছি, কিন্তু ধরা—করা ছাড়া তো এসব হয় না। আপনার সঙ্গে তো মিনিস্টারের জানাশোনা আছে। আমি সামনের সপ্তাহে আপনার অফিসে বা বাসায় গিয়ে দেখা করব। প্রণাম জানবেন।—টুম্পা চৌধুরী।

টুম্পা মেয়েটা দেখতে কেমন হবে তা ভাবতে ভাবতে ধৃতি উঠে পোশাক পরতে থাকে। জয় চেয়ারে বসে থেকে ঘাড় কাত করে ঘুমোচ্ছে।

ধৃতি মেয়েদের অপছন্দ করে না। তবে কিনা তার কিছু বাছাবাছি আছে। মেয়ে মাত্রই তাকে আকর্ষণ করে না। এই যেমন পরমা। এত অসহনীয় সুন্দরী, এত সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব—সাব তবু পরমার প্রতি কখনও দুর্বলতা বোধ করে না ধৃতি। অর্থাৎ পরমার চেহারা বা স্বভাবে এমন একটা কিছুর অভাব আছে যা ধৃতির কাছে ওকে কাম্য করে তোলেনি।

এসব বলার মতো কথা নয়। শুধু মনের মধ্যেই এসব কথা চিরকাল থেকে যায়। পরমা বন্ধুপত্নী এবং পরস্ত্রী। কাজেই কোনও রকমেই কাম্য নয়। কিন্তু সে হল বাইরের সামাজিক ব্যাপার। মানুষের মনের মধ্যে তো সমাজ নেই। সেখানে যে রাষ্ট্রের শাসন সেখানে নীতি নিয়ম নেই, অনুশাসন নেই, আছে কেবল মোটা দাগের কামনা, বাসনা, লোভ, ভয়।

২

টুপুর ছবি দেখলেন? কেমন? সুন্দরী নয়? টুপু ছিল মিস এলাহাবাদ। টুপুর কথা আপনাকে কিন্তু লিখতেই হবে।

বিশাল চিঠি। তাতে টুপুর খুন হওয়ার নানা সম্ভব ও অসম্ভব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। টুপু ছিল নিষ্পাপ, পবিত্র, স্বর্গীয় একটি মেয়ে।

চিঠিটা রেখে ধৃতি বরং ফোটোটাই দেখে। মিথ্যে নয় যে মেয়েটি সুন্দরী। এবং মিস এলাহাবাদ হলেও কোনও আপত্তির কারণ নেই। লম্বাটে ছাঁদের মুখ, বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে কথা ফুটে আছে। কী অসম্ভব সুন্দর টসটসে ঠোঁট দু'খানা! অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

পাশ থেকে অমিত উঁকি দিয়ে বলে, আরে! কার ছবি দেখছেন? দেখি দেখি!

ধৃতি ছবিটা অমিতের হাতে দিয়ে বলে, পাত্রীর মা ছবিটা পাঠিয়েছে।

বেশ দেখতে। একে বিয়ে করুন।

ধৃতি হেসে চলে, বিয়ে করা শক্ত।

কেন?

মেয়েটা এখন অনেক দূরে। সেখানে জ্যান্ত যাওয়া যায় না।

মরে গেছে?

তাই তো জানিয়েছে।

তবে যে বললেন পাত্রী!

পাত্রী মানে কি বিয়ের পাত্রী? পাত্রীর অর্থ এখানে একটি ঘটনার পাত্রী। মেয়েটা খুন হয়েছে।

ওঃ! দেখতে ভারী ভালো ছিল মেয়েটা!

ধৃতি গম্ভীর হয়ে বলে, হ্যাঁ, কিন্তু পাস্ট টেনস।

আপনাকে ছবি পাঠিয়েছে কেন?

কত পাগল আছে।

নিউজ এডিটর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যস্ত পায়ে চলে যেতে যেতেও হঠাৎ থমকে ধৃতির সামনে ঘুরে এসে বললেন, এ সপ্তাহে আপনার ইভনিং শিফট চলছে তো?

হ্যাঁ।

কালকের মধ্যে একটা ফিচার লিখে দিতে পারবেন?

কী নিয়ে?

ম্যারেজ ল অ্যামেন্ডমেন্ট।

লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে?

আরে না, না। তাহলে আপনাকে বলা হত না। আপনি শুধু সোস্যাল ইমপ্যাক্টটার ওপর লিখবেন। কিন্তু কাল চাই।

ধৃতি মাথা নাড়ল।

এখন ইমারজেনসি চলছে। খবরের ওপর কড়া সেনসর। বস্তুত দেওয়ার মতো কোনও খবর নেই। তাই এত ফিচারের তাগিদ। টেলিপ্রিন্টারে যাও বা খবর আসে তার অর্ধেক যায় সেনসরে। ট্রেনে ডাকাতি হওয়ার খবরটাও নিজের ইচ্ছেয় ছাপা যায় না।

ধৃতি উঠে লাইব্রেরিতে চলে আসে। লাইব্রেরিয়ান অতি সুপুরুষ জয়ন্ত সেন। বয়স চল্লিশের কিছু ওপরে, দেখলে ত্রিশও মনে হয় না। চমৎকার গোছানো মানুষ। লাইব্রেরিটা ঝকঝক তকতক করছে।

জয়ন্ত গম্ভীর মানুষ, চট করে কথা বলেন না, একবার তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে একটা মস্ত পুরনো বই দেখতে থাকেন।

ধৃতি উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলে, দাদা, ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট ল নিয়ে লিখতে হবে।

জয়ন্ত এবার মৃদু একটু হাসলেন। বই থেকে মুখ তুলে বললেন, ফিচার?

হ্যাঁ।

জয়ন্ত মস্ত টেবিলের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বলেন, হাতটা দেখি।

জয়ন্তর ওই এক বাতিক। হাত দেখা আর কোষ্ঠী বিচার। গত শীতে কলকাতা আর ব্যাঙ্গালোর টেস্ট ম্যাচের ফলাফল আশ্চর্যজনক নিখুঁত বলে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে এক—আধটা দারুণ কথা বলে দেন। রিপোর্টার সুশীল সান্যালকে গত বছর জুন মাসে হঠাৎ একদিন ডেকে বললেন, কিছু টাকাপয়সা হাতে রাখো। তোমার দরকার হবে। আর এই হিল্লি—দিল্লি করে বেড়াচ্ছ, ফুর্তি লুটছ, তাও কিছুদিন বন্ধ। চুপটি করে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে।

ঠিক তাই হয়েছিল। সুশীলবাবুর পেটে টিউমার ধরা পড়ল পরের মাসে। অপারেশনের পর পাক্কা তিন মাস বিছানায় শোওয়া। টাকা গেল জলের মতো। জয়ন্ত সেনকে তাই সবাই কিছু খাতির করে। এমনিতে মানুষটি

বেশি কথা বলেন না বটে কিন্তু বাতিক চাড়া দিলে অ্যাসট্রোলজি নিয়ে অনেক কথা বলতে পারেন।

ধৃতির হাতটা দেখে তিনি ভ্রু কুঁচকে বললেন, কোষ্ঠী আছে?

ছিল। এখন নেই।

হারিয়ে ফেলেছেন?

আমার কিছু থাকে না। আমি হলাম নাগা সাধু। ভূত—ভবিষ্যৎও নেই।

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বললেন, হাতের রেখা তো তা বলছে না।

কী বলছে তবে?

ভূত ছিল, ভবিষ্যৎও আছে।

ধৃতি একটু নড়ে বসে বলে, কী রকম?

জয়ন্ত হাতটা ছেড়ে নির্বিকারভাবে বললেন, দুম করে কি বলা যায়! তবে খুব ইন্টারেস্টিং হাত।

ধৃতি কায়দাটা বুঝতে পারে। খুব আগ্রহ নিয়ে হাতটা দেখে একটু রহস্য জাগানো কথা বলেই যে নির্বিকার নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন ওর পিছনে ছোট একটি মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা আছে। ধৃতি যে হাত দেখায় বিশ্বাসী নয় তা বুঝে তিনি ওই চাল দিলেন। দেখতে চাইছেন এবার ধৃতি নিজেই আগ্রহ দেখায় কি না।

ধৃতি আগ্রহ দেখায় না। আবার বলে, কিন্তু আমার ল—এর কী হবে?

হবে। আমার কাছে কাটিং আছে।—বলে জয়ন্ত আবার মৃদু হেসে যোগ করলেন, কেবল আমার কাছেই সব থাকে।

সেটা জানি বলেই তো আসা।

কলিং—বেলে বেয়ারা ডেকে কাটিং বের করে দিতে বললেন জয়ন্ত।

রিডিং—এর ফাঁকা টেবিলে বসে বিভিন্ন খবরের কাগজের কাটিং থেকে ধৃতি অ্যামেন্ডমেন্ট ল সম্পর্কে তথ্য টুকে নিচ্ছিল প্যাডে। এসব অবশ্য খুব কাজে লাগবে না। তাকে ঘুরে ঘুরে কিছু মতামত নিতে হবে। সাক্ষাৎকার না হলে ব্যাপারটা সুপাঠ্য হবে না। আইন শুকনো জিনিস, কিন্তু মানুষ কেবল আইন মানা জীব নয়।

নতুন সংশোধিত আইনে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে ভারী সহজলভ্য। মামলা করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেপারেশন পাওয়া যাবে। আগে আইন ছিল, ডিভোর্সের পর কেউ এক বছর বিয়ে করতে পারবে না, নতুন আইনে সে সময় কমিয়ে অর্ধেক করে দেওয়া হচ্ছে। এসব ভালো না মন্দ তা ধৃতি জানে না। ডিভোর্স সহজলভ্য হলে কী হয় তা সে বোঝে না। তবে এটা বোঝে যে ডিভোর্সের কথা মনে রেখে কেউ বিয়ে করে না।

জয়ন্ত উঠে বাইরে যাচ্ছিলেন। টেবিলের সামনে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে বললেন, পেয়েছেন সবকিছু?

ধৃতি মুখ তুলে হেসে বললে, এভরিথিং।

চলুন চা খেয়ে আসি। ফিরে এসে লিখবেন।

ধৃতি উঠে পড়ে। শিফটে এখনও কাজ তেমন শুরু হয়নি। সন্ধের আগে বড় খবর তেমন কিছু আসে না। তাছাড়া খবরও নেই। প্রতিদিনই ব্যানার করবার মতো খবরের অভাবে সমস্যা দেখা দেয়। আজ কোনটা লিড হেডিং হবে সেটা প্রতিদিন মাথা ঘামিয়ে বের করতে হয়। সারাদিন টেলিপ্রিন্টার আর টেলেক্স বর্ণহীন গন্ধহীন জোলো খবরের রাশি উগরে দিচ্ছে। কাজেই খবর লিখবার জন্য এক্ষুনি তাকে ডেস্কে যেতে হবে না।

ধৃতি ক্যান্টিনের দিকে জয়ন্ত সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলে, আপনি মানুষের মুখ দেখে কিছু বলতে পারেন?

জয়ন্ত বলেন, মুখ দেখে অনেকে বলে শুনেছি। আমি তেমন কিছু পারি না। তবে ভূত—ভবিষ্যৎ বলতে না পারলেও ক্যারেক্টারিস্টিক কিছু বলা যায়।

ফোটো দেখে বলতে পারেন?

ফোটো প্রাণহীন বস্তু, তবু তা থেকেও আন্দাজ করা সম্ভব। কেন বলুন তো?

ক্যান্টিনে চা নিয়ে মুখোমুখি বসার পর ধৃতি হঠাৎ খুব কিছু না ভেবে—চিন্তে টুপুর ফোটোটা বের করে জয়ন্তকে দেখিয়ে বলে, বলুন তো কেমন মেয়ে?

জয়ন্ত চায়ে চুমুক দিয়ে ফোটোটা হাতে নিয়ে বলেন, তাই বলুন। এতদিনে তাহলে বিয়ের ফুল ফুটতে যাচ্ছে! তবে ম্যাট্রিমোনিয়াল ব্যাপার হলে ফোটোর চেয়ে কোষ্ঠী অনেক সেফ। মেয়েটার কোষ্ঠী নেই?

ধৃতি ঠোঁট উলটে বলে, মেয়েটিই নেই।

সে কী!—বলে জয়ন্ত ছবিটা আর একবার দেখে ধৃতির দিকে তাকিয়ে বলেন, তাহলে এর ক্যারেক্টারিস্টিক জেনে কী হবে? মারা গেছে কবে?

তা জানি না। তবে বলতে পারি খুন হয়েছে।

খুন! ও বাবাঃ, পুলিশ কেস তাহলে!—বলে জয়ন্ত ছবিটা ফেরত দিতে হাত বাড়িয়ে বললেন, তাহলে আর কিছু বলার নেই।

আছে।—ধৃতি বলে, ধরুন, মেয়েটার চরিত্রে এমন কী আছে যাতে খুন হতে পারে, তা ছবি থেকে আন্দাজ করা যায় না?

জয়ন্ত গম্ভীর চোখে চেয়ে বলেন, মেয়েটি আপনার কে হয়?

কেউ না।

পরিচিতা তো। প্রেম—ট্রেম ছিল নাকি?

আরে না দাদা, চিনতামই না।

তবে অত ইন্টারেস্ট কেন? পুলিশ যা করবার করবে।

পুলিশ তার কাজ করবে। আমার ইন্টারেস্ট মেয়েটির জন্য নয়।

তবে?

অ্যাসট্রোলজির জন্য।

ছবিটা আবার নিয়ে জয়ন্ত তাঁর প্লাস পাওয়ারের চশমাটা পকেট থেকে বের করে চোখে আঁটলেন। তাতেও হল না। একটা খুদে আতস কাচ বের করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন ছবিটা। চা ঠান্ডা হয়ে গেল। প্রায় আট—দশ মিনিট বাদে জয়ন্ত আতস কাচ আর চশমা রেখে ছবিটা দু'আঙুলে ধরে নাড়তে নাড়তে চিন্তিত মুখে প্রশ্নটা করলেন, মেয়েটা খুন হয়েছে কে বলল?

ওর মা।

তিনি আপনার কে হন?

কেউ না। চিনিই না। একটা ফোন—কলে প্রথম খবর পাই। আজ একটা চিঠিও এসেছে। দেখুন না।—বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দেয়।

জয়ন্ত খুব আলগাভাবে চিঠিটা পড়লেন না। পড়লেন খুব মন দিয়ে। অনেক সময় নিয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট চলে গেল।

তারপর মুখ তুলে বললেন, আমি মুখ দেখে তেমন কিছু বলতে পারি না বটে, কিন্তু আমার একটা ফিলিং হচ্ছে যে মেয়েটা মরেনি।

বলেন কী?

জয়ন্ত আবার চা আনালেন। গম্ভীর মুখে বসে চা খেতে খেতে চিন্তা করে বললেন, আপনি জ্যোতিষবিদ্যা মানেন না?

না। মানে, তেমন মানি না।

বুঝেছি। কিন্তু মানেন না কেন? যেহেতু সেকেন্ডহ্যান্ড নলেজ তাই না?

তাই।

তবে আপনাকে যুক্তিবাদী বলতে হয়। না?

হ্যাঁ।
কিন্তু আসলে আপনি যুক্তিবাদী নন, আপনার মনন বৈজ্ঞানিক সুলভ নয়।
কেন?
একটা ফোন—কল, একটা চিঠি আর একটা ফোটো—মাত্র এই জিনিসগুলোর ভিত্তিতে আপনি কী করে বিশ্বাস করছেন যে মেয়েটা খুন হয়েছে?
তবে কি হয়নি?
না। আমার মন বলছে শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ।
কী করে বললেন?
বলছি তো আমার ধারণা।
কোনও লজিক্যাল বেস নেই ধারণাটার?
জয়ন্ত মৃদু হেসে বললেন, আপনি আচ্ছা লোক মশাই। মেয়েটা যে মরে গেছে, আপনার সে ধারণাটারও তো কোনও লজিক্যাল বেস নেই। আপনাকে একজন জানিয়েছে যে টুপু মারা গেছে বা খুন হয়েছে। আপনি সেটাই ধ্রুব বলে বিশ্বাস করছেন।
জয়ন্ত সেন ছবিটার দিকে আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আপন মনে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, খুব সেনসিটিভ, অসম্ভব সেন্টিমেন্টাল, মনের শক্তি বেশ কম, অন্যের দ্বারা চালিত হতে ভালোবাসে।
কে?—ধৃতি চমকে প্রশ্ন করে।
জয়ন্ত ছবিটার দিকে চেয়ে থেকেই বলে, আপনার টুপু সুন্দরী।
আমার হতে যাবে কেন?
দেখি আপনার হাতটা আর একটু!—বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে ধৃতির ডান হাতটা টেনে নিলেন।
ফোটোগ্রাফার সৌরীন এক প্লেট মাংস আর চার পিস রুটি খেয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে টেবিলের ধারে এসে বলে, আমার হাতটা দেখবেন না জয়ন্তদা?
পরে।—জয়ন্তর গম্ভীর উত্তর।
অনেকদিন ধরে ঝোলাচ্ছেন। ধৃতিবাবু, কী খবর?
ভালো।
সৌরীন হঠাৎ ঝুঁকে ছবিটা দেখে বলে, বাঃ, দারুণ ছবিটা তুলেছে তো! ফোটোগ্রাফার কে?
ধৃতি হাসল। সৌরীন পেশাদার ফোটোগ্রাফার, তাই মেয়েটার চেয়ে ফোটোর সৌন্দর্যই তার কাছে বেশি গুরুতর।
ধৃতি বলে, মেয়েটা কেমন?
ভালো। —সৌরীন বলে, তবে ফ্রন্ট ফেস যতটা ভালো প্রোফাইল ততটা ভালো কি না কে জানে। মেয়েটা কে?
চিনবেন না। —ধৃতি বলল।
সৌরীন চলে গেলে জয়ন্ত ধৃতির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, হুঁ।
হুঁ মানে?
মানে অনেক ব্যাপার আছে। আপনার বয়স এখন কত?
উনত্রিশ বোধহয়। কম বেশি হতে পারে।
একটা ট্রানজিশন আসছে।
কী রকম?
তা হুট করে বলি কেমন করে?

কবে?

শিগগিরই।

ধৃতি অবশ্য এসব কথার গুরুত্ব দেয় না। সারা জীবনে সে কখনও ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। যা কিছু হয়েছে বা করেছে সে, তা সবই নিজের চেষ্টায়, পরিশ্রমে।

ধৃতি বলল, খারাপ নয় তো?

হয়তো খারাপ। হয়তো ভালো।

ধৃতি হাসল। বলল, এবার আসুন ডিম খাই। আমি খাওয়াচ্ছি।

দু'জনে ওমলেট খেতে লাগল। খেতে খেতে ধৃতি বলে, জয়ন্তদা, আপনি টুপুর কেসটা যত সিরিয়াসলি দেখছেন ততটা কিছু নয়।

তাই নাকি? —নিস্পৃহ জবাব জয়ন্তর।

ওর মা চাইছে খবরটা কাগজে বেরোক।

খবরদার বের করবেন না।

আরে মশাই, আমি ইচ্ছে করলেই কি বের করতে পারব নাকি? কাগজ তো আমার ইচ্ছেয় হাবিজাবি খবর ছাপাবে না।

তা হলেও আপনি কোনও ইনিশিয়েটিভ নেবেন না। মেয়েটার মা ফোনে আপনাকে কী বলেছিল?

এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ককল করেছিল। রাত তখন দুটো—আড়াইটে। শুধু বলছিল টুপুকে খুন করা হয়েছে, আপনি খবরটা ছাপবেন।

চিঠিটা কবে এল?

আজ।

দেখি। —বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর চিঠি ফেরত দিয়ে জয়ন্ত হেসে বললেন, আপনি মশাই দিনকানা লোক।

কেন?

চিঠিটা ভালো করে দেখেছেন?

দেখেছি তো।

কিছুই দেখেননি। চিঠির ওপর এলাহাবাদের ডেটলাইন। কিন্তু খামের ওপর কলকাতা উনত্রিশ ডাকঘরের শিলমোহর, সেটা লক্ষ করেছেন?

ধৃতি একটা চমক খেয়ে তাড়াতাড়ি খামটা দেখে। খুবই স্পষ্ট ছাপ। ভুল নেই।

ধৃতি বলে, তাই তো!

জয়ন্ত বলেন, এবার টেলিফোনটার কথা বলুন তো।

সেটা এলাহাবাদের ট্রাঙ্ককলই ছিল।

কী করে বুঝলেন?

অপারেটার বলল যে।

অপারেটারের গলা আপনি চেনেন?

না।

তবে?

তবে কী?

অপারেটার সেজে যে—কেউ ফোনে বলতে পারে এলাহবাদ থেকে ট্রাঙ্ককলে আপনাকে ডাকা হচ্ছে। অফিসের অপারেটারও সেটা ধরতে পারবে না।

সেটা ঠিক।

আমার সন্দেহ সেই ফোন—কলটা কলকাতা থেকেই এসেছিল।

ধৃতি হঠাৎ হেসে উঠে বলে, কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছিল বলছেন?

জোক কি না জানি না, তবে প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড এফেক্টিভ। আপনি তো ভোঁতা মানুষ নন, তবে মিসলেড হলেন কী করে? এবার থেকে একটু চোখ—কান খোলা রেখে চলবেন।

ধৃতি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল ফের।

৩

ধৃতি মদের ভক্ত নয়। কোনও গোঁড়ামি নেই, কিন্তু মদ খেলেই তার নানারকম শারীরিক অসুবিধে হতে থাকে। কখনও আধকপালে মাথা ধরা, কখনও পেটে প্রচণ্ড গ্যাস জমে, কখনও দমফোট হয়ে হাঁসফাঁস লাগে। কাজেই পারতপক্ষে সে মদ ছোঁয় না।

অফিস থেকে আজ একটু আগে কেটে পড়ার তালে ছিল সে। ছ'টায় ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে গ্যারি কুপারের একটা ফিল্ম দেখাবে। ধৃতি কার্ড পায়। প্রায়ই ছবি দেখা তার হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ ছবিটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল তার।

আজ চিফ সাব—এডিটর তারাপদবাবু কাজে বসেছেন। বয়স্ক লোক এবং প্রচণ্ড কাজপাগল। কোন খবরের কতটা ওজন তা তাঁর মতো কেউ বোঝে না।

ধৃতি গিয়ে বলল, তারাপদদা, আজ একটু আগে আগে চলে যাব।

যাবে? —বলে তারাপদবাবু মুখ তুলে একটু হেসে ফের বললেন, তোমার আর কী? কর্তারা ফিচার লেখাচ্ছেন তোমাকে দিয়ে। তুমি হলে যাকে বলে ইমপর্ট্যান্ট লোক।

এটা অবশ্য ঠেস—দেওয়া কথা। কিন্তু তারাপদবাবুর মধ্যে হিংসা—দ্বেষ বড় একটা নেই। ভালোমানুষ রসিক লোক। তাই কথাটার মধ্যে বিষ নেই।

ধৃতি হেসে বলে, ইমপর্ট্যান্ট নয় তারাদা, আমি হচ্ছি আসলে ইম্পোটেন্ট।

তারাপদবাবু মুখখানা খুব কেজো মানুষের মতো গম্ভীর করে পিন আঁটা একটা মোটাসোটা খবরের কপি ধৃতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এ খবরটা করে দিয়ে চলে যাও। এটা কাল লিড হতে পারে। বেশি বড় কোরো না।

ঘড়িতে চারটে বাজে। কপি লিখতে ধৃতির আধঘণ্টার বেশি লাগবে না। তাই তাড়াহুড়ো না করে ধৃতি নিজের টেবিলে কপিটা চাপা দিয়ে রেখে সিনেমার ডিপার্টমেন্টে আড্ডা মারতে গেল।

কালীবাবু চুলে কলপ দিয়ে থাকেন। চেহারাখানা জমিদার—জমিদার ধরনের। ভারী শৌখিন লোক। এক সময়ে সিনেমায় নেমেছিলেন, পরে কিছুদিন ডিরেকশন দিলেন। তিন—চারটে ছবি ফ্লপ করার পর হলেন সিনেমার সাংবাদিক। এখন এ পত্রিকার সিনেমার পাতা এডিট করেন।

ধৃতিকে দেখে বলেন, কী ভায়া, হাতে নাকি একটা ভালো মেয়েছেলে আছে! থাকলে দাও না, সিনেমায় নামিয়ে দিই। বাংলা ছবিতে নায়িকার দুর্ভিক্ষ চলছে দেখছ তো!

ধৃতি অবাক হয়ে বলে, ভালো মেয়ে! আমার হাতে কোত্থেকে মেয়ে থাকবে কালীদা?

কেন, এই তো সৌরীন বলছিল তুমি নাকি একটা ঘ্যাম মেয়েছেলের ছবি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে!

ওঃ!—বলে ধৃতি বসে।

দাও না মেয়েটার ঠিকানা। তোমার রিলেটিভ হলেও ক্ষতি নেই। আজকাল লাইন অনেক পরিষ্কার, কারও চরিত্র নষ্ট হয় না।

সেজন্য নয়। অন্য অসুবিধে আছে।

কেন লেজে খেলাচ্ছ ভাই?

সৌরীন কিছু জানে না। শুধু ছবিটা দেখেই উত্তেজিত হয়ে এসে আপনাকে বলেছে।

অসুবিধেটা কী?

যতদূর শুনছি মেয়েটা বেঁচে নেই।

ধৃতি দ্বিধায় পড়ে যায়। জয়ন্ত সেন বার বার বলেছিলেন, শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ। সে কথাটা মনে পড়ে যায়।

ধৃতি বলল, ঠিক চিনি না। তবে জানি। মরার খবরটা অবশ্য উড়ো খবর।

কালীবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, সুন্দরী মেয়েরা মরবে কেন?

সেটাই তো প্রবলেম।

মোটেই কাজটা ভালো নয়। সুন্দরী মেয়েদের মরা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

ধৃতি একটু মৃদু হেসে বলে, এ মেয়েটাকে নিয়ে একটি মিস্ট্রি দেখা দিয়েছে। জয়ন্তদা ছবিটা দেখে বললেন, মেয়েটা নাকি মরেনি। অথচ আমার কাছে খবর আছে—

দেখি ছবিটা। আছে?—বলে হাত বাড়ায় কালীবাবু।

ছবিটা আজকাল ধৃতির সঙ্গেই থাকে। কেন থাকে তা বলা মুশকিল। কিন্তু এ কথা অতি সত্য যে ধৃতি এই ছবিটার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সব সময়ে তার মনে হয় এ ছবিটা খুব মারাত্মক একটা দলিল। কালীবাবু ছবিটা নিয়ে দেখলেন। সিনেমা লাইনের অভ্যস্ত প্রবীণ চোখ। উলটে—পালটে দেখে ছবিটা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে সিগারেট ধরিয়ে বলেন, মেয়েটার নাম—ঠিকানা দিতে পারো?

নাম টুপু। ঠিকানা মুখস্থ নেই, তবে আছে বাড়িতে। এলাহাবাদের মেয়ে।

ও। একটু দূর হয়ে গেল, নইলে আজই বাড়িতে হানা দিতাম গিয়ে।

কেমন বুঝছেন ছবিটা?

খুব ভালো। তবে সিঙ্গল ফোটোগ্রাফ নয়।

তার মানে?

মানে এটা একটি জোড়ার ছবি। এর পাশে আর কেউ ছিল। কিন্তু নেগেটিভ থেকে আলাদা করে শুধু মেয়েটার ছবি প্রিন্ট করা হয়েছে।

ধৃতি অবাক হয়ে বলে, কী করে বুঝলেন?

কালীবাবু হেসে বলেন, যা বলছি তা হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট বলে ধরে নিতে পারো। ছবিটা আবার ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবে।

ধৃতি ছবিটা ফের নেয়। এ পর্যন্ত অসংখ্য বার দেখেছে তবু বুঝতে পারেনি তো!

কালীবাবু বুঝিয়ে দেন, এই ডান পাশে মেয়েটার হাত ঘেঁষে একটু সাদা জমি দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ। ওটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড।

তোমার মাথা।

তবে কী ওটা?

ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে লাইট অ্যাশ কালার, এই সাদাটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা। ভালো করে দ্যাখো, দেখছ?

হ্যাঁ।

মানুষের কাঁধের ঢালু বুঝতে পারো না? সাদার ওপর অংশটা একটু বেঁকে গেছে দেখছ?

হ্যাঁ।

অর্থাৎ মেয়েটির পাশে সাদা বা লাইট রঙের কোনও জামা পরা এক রোমিও ছিল। এ ছবিটায় তাকে বাদ রাখা হয়েছে। মেয়েটাকে তুমি একদম চেনো না?

না।

তবে এ ছবিটা এল কোথা থেকে?

এল।

খোঁজ নাও। এ মেয়েটা ফিল্মে এলে হইচই পড়ে যাবে।

খোঁজ নিতে তো এলাহাবাদ যেতে হয়!

যাবে। আমি ফিনান্স করব।

ধৃতির ফের মনে পড়ে, চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসেনি, এসেছে কলকাতা থেকে। মনে পড়ে, জয়ন্ত সেন বলেছিলেন, ট্রাঙ্ককলটা স্রেফ ধোঁকাবাজি হতে পারে।

ধৃতি নড়ে চড়ে বসে বলে, আচ্ছা কালীদা, আপনার কি মনে হয় মেয়েটা বেঁচে আছে?

কালীবাবু ছবিটা ফের দেখছিলেন হাতে নিয়ে। পুরু চশমার কাচের ভিতর দিয়ে চেয়ে বললেন, থাকাই উচিত। মরবে কেন হে?

ছবিটা দেখে কিছু বুঝতে পারেন? মানে কোনও ফিলিং হয়?

খুব হয়? একটাই ফিলিং হয়। —বলে কালীবাবু বদমাশের মতো হেসে বলেন, সেক্স জেগে ওঠে।

দূর! কোনও আনক্যানি ফিলিং হয় না?

তুমি একটা বুদ্ধু। সুন্দরী মেয়েছেলে দেখে আনক্যানি ফিলিং হতে যাবে কোন দুঃখে?

যাই, কপি পড়ে আছে।—বলে ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল।

আরে বসো বসো। চা খাও। রাগ করলে নাকি? আমি আবার একটু পষ্ট কথা বলি তো?—বলে কালীবাবু ধৃতিকে বসিয়ে টেলিফোনে ক্যান্টিনকে চা পাঠাতে বলেন।

ধৃতি সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে বলে, আপনারা আমাকে ভারী মুশকিলে ফেললেন দেখছি।

কী রকম?

আমাকে মেয়েটার মা জানিয়েছিল যে, টুপু মরে গেছে। আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম।

তারপর?

তারপর জয়ন্তবাবু ছবিটা দেখে বললেন তাঁর মনে হচ্ছে যে মেয়েটা বেঁচে আছে।

বটে!

তাঁর কথা উড়িয়েও দিতে পারছি না। তার কারণ হল চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসার কথা, কিন্তু এসেছে কলকাতা থেকে।

ভারী রহস্যময় ব্যাপার তো।

আরও রহস্য হল যে আপনি আবার মেয়েটার পাশে এক অদৃশ্য রোমিওকে আবিষ্কার করলেন। তার মানে আরও জট পাকাল। মেয়েটার মা চেয়েছিল আমি মৃত্যু—সংবাদটা কাগজে বের করে দিই।

খবরদার ওসব কোরো না।

কেন?

সুন্দরীরা মরে না। তারা অমর। স্ত্রীলিঙ্গে বোধহয় অমরা বা অমরী কিছু একটা হবে।

সে যাই হোক, খবর বের করার এক্তিয়ার আমার নেই। এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু আমি বেশ ফাঁপড়ে পড়ে যাচ্ছি ক্রমে।

ফাঁপরের কী আছে? খোঁজ নাও। তবে পুলিশ কেস হলে গা বাঁচিয়ে সরে এসো। ছবিটার মধ্যে একটু বদ গন্ধ আছে।

তার অর্থ?

অর্থাৎ মেয়েটা খুব ইনোসেন্ট নয়। চোখ—মুখ যত সুন্দরই হোক, এর মধ্যে একটা ইনহেরেন্ট দুষ্টুমি আছে। অ্যাডভেনচারাস টাইপ। পাশের ছোকরাটিকে দেখতে পেলে হত। যাক গে, তুমি গা বাঁচিয়ে চলবে।

ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল। কালীবাবু হাত তুলে থামিয়ে ফের বললেন, সিনেমায় নামাটা তেমন কোনও ব্যাপার নয়। ভেবো না যে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আমি তাকে সিনেমায় নামাবার জন্য পাগল হই।

বুঝলাম।

কালীবাবু একটু হেসে বলেন, আসলে জয়ন্তই আমাকে ব্যাপারটা বলছিল গতকাল। তখন থেকেই ভাবছিলাম তোমাকে ডেকে একটু ওয়ার্নিং দিই।

ওয়ার্নিং কেন?

তুমি কাঁচা বয়সের ছেলে, কোথায় কোন ঘুণচক্করে পড়ে যাবে। মেয়েছেলে জাতটা ভালো থাকে ভালো, যখন খারাপ হয় তখন হাড়বজ্জাত।

তাই বলুন! জানতেন।

জানতাম। আর এও বলি যে টুপুর মা ফের তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

তা করবে।

তুমি একটু রসের কথা—টথা বোলো। সিমপ্যাথি দেখাবে খুব। যদি দেখা করতে চায় তো রাজি হয়ে যেয়ো।

আচ্ছা!

ধৃতি উঠল।

৪

বুধবার জয় গেল দিল্লি। স্বভাবতই একা বাড়িতে ধৃতি আর পরমার থাকা সম্ভব নয়। ধৃতির যাওয়ার জায়গা নেই তেমন। পরমার আছে। তাই পরমা গেল বাপের বাড়ি। সেই সঙ্গে ছুঁড়ি ঝিটাকেও নিয়ে গেল। গোটা ফ্ল্যাটে ধৃতি একা।

অবশ্য ধৃতি আর কতটুকুই বা ফ্ল্যাটে থাকে! তার আছে অফিস, আড্ডা, ফিচার লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে ঘুরে বেড়ানো। রাতে নাইট ডিউটি নেই বলে শুধু সেই সময়টুকু সে ফ্ল্যাটে থাকে।

রাত ন'টা নাগাদ ধৃতি অফিসে একটা বড় পলিটিক্যাল কপি লেখা শেষ করল। খুব পরিশ্রম গেছে। এইবার ছুটি। চলে যাওয়ার আগে সে এর ওর তার সঙ্গে কিছু খুনসুটি করে রোজই। আজ বুড়ো ডেপুটি নিউজ এডিটার মদনবাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি করছিল।

ঠিক এইসময়ে চিফ সাব—এডিটার ডেকে বললেন, তোমার ফোন হে!

ধৃতি 'হ্যালো' শুনেই কেঁপে ওঠে একটু। টুপুর মা।

বলুন।—ধৃতি বলে।

চিঠি তো পেয়েছেন!

পেয়েছি!

ছবিটা দেখলেন?

হুঁ।

কেমন?

টুপু খুবই সুন্দরী।

আপনাকে তো বলেইছিলাম যে টুপুকে সবাই মিস এলাহাবাদ বলত। আমার টুপু ছিল সাংঘাতিক সুন্দরী।

হুঁ।

খবরটা কবে ছাপা হবে?

ধৃতি একটু ইতস্তত করে বলে, দেখুন এসব খবর ছাপার এক্তিয়ার তো আমাদের নেই।

আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন।

না পারি না।

দোহাই! প্লিজ! আমার টুপু আপনাদের কাছে কিছুই না জানি। কিন্তু ওর খবরটা ছাপা হলে আমি বড় শান্তি পাব। মায়ের ব্যথা তো বোঝেন না আপনারা!

শুনুন। প্রথম কথা, টুপু যদি নামকরা কেউ হত তবে খবরটা ছাপা সহজ হয়ে যেত। যদি খুনের কেস আদালতে উঠত তাও অসুবিধে হত না। কিন্তু শুধু অ্যাসাম্পশনের ওপর তো আমরা কিছু করতে পারি না।

দু'—চার লাইনও নয়?

না। তবে আপনি ইচ্ছে করলে বিজ্ঞাপন দিয়ে খবরটা ছাপতে পারেন। কিন্তু তাতে খুনের উল্লেখ থাকলে চলবে না।

কিন্তু আমি যে সবাইকে টুপুর খুনের খবরটাই জানাতে চাই।

তাহলে আপনি পুলিশের থ্রুতে প্রসিড করুন। যদি মামলা হয় তাহলে আমি খবরটা ছেপে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। আর নইলে খুনের যথেষ্ট এভিডেনস চাই। এলাহাবাদের লোকাল কাগজে কি খবরটা বেরিয়েছিল?

না।

তবে আমাদের কিছু করার নেই। আপনি পুলিশকে কিছু জানাননি?

জানিয়েছি, কিন্তু তারা কোনও গা করছে না।

কেন?

তারা এটাকে খুন বলে মনে করছে না যে! তারা লাশ চায়।

লাশ! কেন, লাশ পাওয়া যায়নি?

না। কী করে যাবে? টুপুকে যে একটা পাহাড়ি নদীতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

কোথায়?

টুপুর মা একটু চুপ করে থাকেন। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলেন, কোথায় তা আমি ঠিক জানি না।

তাহলে খুন বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? সাক্ষী আছে?

ন ন নাঃ।

তবে কী করে জানলেন?

ওরা কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে যায় আরও অনেক জায়গায়। সবশেষে ঘটনাটা ঘটে মাইথনে।

মাইথনে?

খুব নির্জন জায়গা। ওরা ফরেস্ট বাংলোতে থাকত।

কারা? টুপু আর কে?

ওঃ, সে ঠিক জানি না।

না জানলে কী করে হবে? টুপু কার সঙ্গে গিয়েছিল তা আপনার খোঁজ নেওয়া উচিত।

কী করে নেব? আমি অনাথা বিধবা। টুপুর তো বাবা নেই, ভাইবোন নেই। টুপু একটিমাত্র। তবে আমাদের টাকা আছে। অনেক টাকা। খবরটা ছাপানোর জন্য যদি টাকা খরচ করতে হয় তো আমি পিছুপা হব না। বুঝলেন? টুপুই যখন নেই তখন এত টাকা আমার কোন কাজে লাগবে? আমি আপনাকে খবরটা ছাপানোর জন্য হাজার টাকা দিতে পারি। রাজি?

না।—ধৃতি গম্ভীর হয়ে বলে, টাকা থাকলে আপনি বরং তা সৎ কাজেই ব্যয় করুন, খবরটা ছাপা গেলে আমি এমনিতেই ছাপতাম।

কিছুতেই ছাপা যাবে না?

ধৃতি হঠাৎ প্রশ্ন করে, আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

টুপুর মা খানিক নিস্তব্ধ থেকে বললেন, কেন বলুন তো?

এলাহাবাদ থেকে কি?

আবার খানিক চুপচাপ থাকার পর টুপুর মা বলেন, না।

তবে কি কলকাতা থেকে?

হ্যাঁ। আমি কাল কলকাতায় এসেছি।

ধৃতি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আপনার চিঠিটাও কিন্তু কলকাতা থেকে ডাকে দেওয়া হয়েছিল। যদিও চিঠিতে ডেটলাইন ছিল এলাহাবাদের।

টুপুর মা লজ্জার স্বরে বলেন, সে একটা কাণ্ড। আমার একজন চেনা লোককে চিঠিটা ডাকে দিতে দিই। সে সেইদিনই কলকাতা যাচ্ছিল। তাই একেবারে কলকাতায় গিয়ে ডাকে দিয়েছে। কিছু মনে করেছিলেন বোধহয়!

না, মনে কী করব? এরকম হতেই পারে।

আপনি হয়তো কিছু সন্দেহ করেছিলেন?

বিব্রত ধৃতি বলে, না না।

আমি কলকাতায় এসেছিলাম টুপুর ব্যাপারেই। টুপু কলকাতায় কোথায় ছিল তা আমি জানি না। কিন্তু সম্ভব—অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ নিচ্ছি। কেউ কিছু বলতে পারছে না।

টুপু কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল?

কেন, বলিনি আপনাকে সে কথা?

না।

টুপুর মা একটু হেসে বললেন, ওমা! আমারই ভুল তবে। যা হোক, আজকাল আমার মেমরিটা একদম গেছে। হ্যাঁ, টুপু তো পালিয়েই এসেছিল। টুপু যত সুন্দরী ছিল ততটা শান্ত বা বাধ্য ছিল না। খুব অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপ।

ও। তা পালাল কেন?

আমি যা বারণ করতাম তাই করব এই ছিল স্বভাব টুপুর। ও খানিকটা ছেলের মতো মানুষ হয়েছিল তো। সাইকেল, সাঁতার, গাড়ি চালানো, বন্দুক ছোঁড়া সব জানত।

খুব চৌখস মেয়ে তো!

খুব। একস্ট্রা—অর্ডিনারি যাকে বলা যায়।

পালাল কেন তা তো বললেন না।

টুপুর যে বিয়ের ঠিক হয়েছিল!

টুপু বিয়েতে রাজি ছিল না বুঝি?

না। ও বলত আর একটু বয়স হলে সে মাদার টেরেসার আশ্রমে বা সৎসঙ্গ কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যাবে। সারা জীবন সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে।

কেন?

ও পুরুষদের পছন্দ করত না। না, কথাটা ভুল বলা হল। আসলে ও কখনও তেমন পুরুষ দেখেনি যাকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করা যায়। সব পুরুষমানুষকেই ও খুব তুচ্ছ—তাচ্ছিল্য করত। বলত, এদের কাউকে বিয়ে করা যায় না।

কিন্তু পালানোর ব্যাপারটা তো বললেন না?

বলছি। আমরা ওর বিয়ে ঠিক করি একজন ব্রিলিয়ান্ট অ্যামেরিকা ফেরত মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। দারুণ ছেলে। টুপুর আপত্তি আমরা শুনিনি।

কেন?

শুনিনি তার কারণ চট করে এরকম ভালো পাত্র কি পাওয়া যায়, বলুন? যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব, দেদার টাকা রোজগার করে, হাই পোজিশনে চাকরি করছে।

তারপর?

আশীর্বাদের আগের দিন টুপু একটা চিঠি লিখে রেখে চলে গেল। কাউকে, এমনকী আমাকে পর্যন্ত জানিয়ে যায়নি।
সঙ্গে কেউ যায়নি?
কী করে বলব?
কলকাতায় গিয়েছিল কী করে জানলেন?
সেখান থেকে আর একটা চিঠি দেয়। তাতে লেখে, আমি খুব ফুর্তিতে আছি। এবার বেড়াতে যাব দার্জিলিং, নেতারহাট, মাইথন, আরও কয়েকটা জায়গার নাম লেখে। সব মনে নেই।
কিন্তু মারা যাওয়ার ব্যাপারটা?
ওঃ হ্যাঁ। মাইথন থেকে ওর শেষ চিঠি। তাতে ও খুব মন খারাপের কথা লিখেছিল। জানিয়েছিল যে কে বা কারা ওর পিছু নিয়েছে। তারা ওর ভালো করতে চায় না, ক্ষতি করতে চায়।
তারপর?
তারপর আর কোনও খবর নেই। তবে আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখি যে টুপু উঁচু থেকে জলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। আপনি কখনও মাইথনে গেছেন?
গেছি।
আমি যাইনি। জায়গাটা কেমন?
সুন্দর।
সেখানে পাহাড় আছে?
আছে। তবে ছোট পাহাড়।
টুপুও তাই লিখেছিল। সেখানে কী একটা বিখ্যাত মন্দির আছে না?
আছে। কল্যাণেশ্বরী মন্দির।
সেখানে সেই মন্দিরে ঢোকবার গলিতে নাকি কারা টুপুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে শাসিয়েছিল যে মেরে ফেলবে।
কিন্তু কেন?
সে তো জানি না। টুপুর মতো মেয়ের কি শত্রু থাকতে পারে? তবু ছিল, জানেন। আর টুপু যে খুব অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপের ছিল!
বুঝলাম। কিন্তু টুপুর সঙ্গে কেউ ছিল না?
হয়তো ছিল। তাদের কথা টুপু লিখত না।
কলকাতায় আপনাদের আত্মীয়স্বজন নেই?
আমার শ্বশুরবাড়ি এখানে। তবে আমার দিককার কোনও আত্মীয় এদিকে থাকে না। আমার বাপের বাড়ি গোরক্ষপুরে, তিন পুরুষের বাস।
টুপু কি তার বাপের বাড়িতে উঠেছিল?
টুপুর মা হেসে বললেন, টুপুর বাপের বাড়ি বলতে অবশ্য এলাহাবাদের বাড়িই বোঝায়। তবে এখানে আমার স্বামীর খুড়তুতো ভাই—টাই আছেন। বাড়ির একটা অংশ অবশ্য আমাদের। সে অংশ তালা দেওয়া থাকে, আমরা কলকাতায় এলে সেখানেই উঠি। কিন্তু টুপু এ বাড়িতে আসেনি।
ধৃতি এতক্ষণ পরে টের পেল যে, সে খামোখা এত কথা বলছে বা শুনছে। শুনে তার কোনও লাভ নেই। টুপুর ব্যাপারে তার করারও কিছু নেই।
ধৃতি বলল, সবই বুঝলাম। কিন্তু সিমপ্যাথি জানানো ছাড়া আর কী করতে পারি বলুন?
শুনুন। দয়া করে আপনার বাসার ঠিকানাটা দেবেন?
কেন?

বিরক্ত হবেন না। ঠিকানাটা থাকলে আমি যদি দরকারে পড়ি তাহলে কন্ট্যাক্ট করতে পারব। আমি কলকাতার কিছুই চিনি না। আমার দেওররাও খুব সিমপ্যাথেটিক নয়। আমি আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান লোকের সাহায্য পেলে খুব উপকৃত হব। অবশ্য যদি কখনও দরকার হয়। নইলে এমনিতে বিরক্ত করব না।

একটু দ্বিধা করেও ধৃতি ঠিকানা বলল।

আপনার বাসায় ফোন নেই?

না।

আচ্ছা, ছাড়ছি।

ভদ্রমহিলা ফোন রাখলেন। ধৃতি হাঁফ ছাড়ল।

৫

পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় রেস্টুরেন্টে দামি ডিনার খেল ধৃতি। মাঝে মাঝে খায়। বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। যতদিন এরকম একা আছে ততদিন আমিরি করে নিতে পারবে।

বিয়ে ধৃতি করতে চায় না। কিন্তু বউয়ের কথা ভাবতে তার খারাপ লাগে না। কিন্তু ভয় পায়। সে একটু প্রাচীনপন্থী। আজকালকার মেয়েদের হাব—ভাব আর চলাফেরা দেখে তার ভয় লাগে। এরা তো ঠিক বউ হতে পারবে না। বড়জোর কম্প্যানিয়ন হতে পারে, আর বেড—ফ্রেন্ড।

ট্যাক্সি ছেড়ে ধৃতি ফ্ল্যাটে উঠে এল। দরজা ভালো করে বন্ধ করল। নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে টেবিলের সামনে বসে সিগারেট ধরাল। এখন রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকবে। কয়েকটা থ্রিলার কেনা আছে। পড়বে। তার আগে একটু কিছু লিখবে। এই একা নিশুত রাতে জেগে থাকা তার বড় প্রিয়। এইটুকু একেবারে তার নিজস্ব সময়।

শৌখিন রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ে চিঠির বাক্সটা দেখে আসেনি।

আবার উঠে নীচে এল ধৃতি। চিঠি পেতে সে ভীষণ ভালোবাসে। রোজ চিঠি এলে কত ভালো হয়।

চিঠি ছিল। দুটো। দুটোই খাম। একটার ওপর দিদির হাতের লেখা ঠিকানা। বোধহয় দীর্ঘকাল পর মনে পড়েছে ভাইকে। আর একটা খামে কোনও ডাকটিকিট নেই, হাতের লেখা অচেনা।

নিজের ঘরে এসে ধৃতি দিদির চিঠিটা প্রথমে খুলল। ভাইয়ের জন্য দিদি একটি পাত্রী দেখেছে। চিঠির সঙ্গে পাত্রীর পাসপোর্ট সাইজের ফোটোও আছে। দেখল ধৃতি। মন্দ নয়। তবে একটু আপস্টার্ট চেহারা। দিল্লিতে বি এ পড়ে। বাবা সরকারি অফিসার।

ধৃতি অন্য চিঠিটা খুলল। সাদা কাগজে লেখা—একা বাসায় ভূতের ভয় পাচ্ছেন না তো! ভূত না হলেও পেতনিরা কিন্তু আছে। সাবধান! আপনার ঘর গুছিয়ে রেখে গেছি। যা অন্যমনস্ক আপনি, হয়তো, লক্ষই করেননি। ফ্রিজে একটা চমৎকার খাবার রেখে যাচ্ছি! মেয়েরা কিন্তু খারাপ হয় না, পুরুষগুলোই খারাপ। চিঠিটা লেটারবক্সে রেখে যাচ্ছি যাতে চট করে নজরে পড়ে।—পরমা। পুঃ পরশু হয়তো আবার আসব। দুপুরে। ঘরদোর পরিষ্কার করতে।

ধৃতি উঠে গিয়ে ডাইনিং হলে ফ্রিজ খুলল।

কথা ছিল এ ক'দিন ফ্রিজ বন্ধ থাকবে। ছিলও তাই। পরমা আজ চালিয়ে রেখে গেছে। একটা কাচের বাটিতে ক্ষীরের মতো কী একটা জিনিস। ঠান্ডা বস্তুটা মুখে ঠেকিয়ে ধৃতি দেখে পায়েস। তাতে কমলালেবুর গন্ধ। কাল খাবে।

ফ্রিজ বন্ধ করে ধৃতি হলঘর যখন পার হচ্ছিল তখন হঠাৎ খেয়াল হল বাইরের দরজাটি কি সে বন্ধ করেছে? এগিয়ে গিয়ে দরজার নব ঘোরাতেই বেকুব হয়ে বুঝল, সত্যিই বন্ধ ছিল না দরজাটা।

সকালে উঠে ধৃতি টের পায় সারা রাত ঘুমের মধ্যে সে কেবলই টুপুর কথা ভেবেছে। খুবই আশ্চর্য কথা।

টুপুর কথা সে ভাববে কেন? টুপু কে! টুপুকে সে তো চোখেও দেখেনি। মনটা বড় ভার হয়ে আছে। নিজের কোনও দুর্বলতা বা মানসিক শ্লথভার ধরা পড়লে ধৃতি খুশি হয় না।

টুপু বা টুপুর মা'র সমস্যা নিয়ে তার ভাববার কিছু নেই। ঘটনাটার মধ্যে হয়তো কিছু রহস্য আছে। তা থাক। সে রহস্য না জানলেও তার চলবে। টুপুর মা কি পাগল? হলেই বা তার তাতে কী?

টুপু কি বেঁচে আছে? টুপু কি সত্যিই বেঁচে নেই? এসব জানবার বা এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। ধৃতি স্বপ্ন—দেখা মানুষ নয়, কল্পনার ঘোড়া ছাড়তেও সে পটু নয় তেমন।

তবু কাল সারা রাত, ঘুমের মধ্যে সে কেন টুপুর কথা ভেবেছে?

দাঁত মেজে ধৃতি নিজেই চা তৈরি করে খেল। পত্রিকাটা বারান্দা থেকে এনে খুলে বসল। খবর কিছুই নেই। তবু যথাসম্ভব সে যখন খবরগুলো পড়ে দেখছে তখনও টের পেল বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। লাইনের ফাঁকে ফাঁকে তার নানা চিন্তাভাবনা ঢুকে যাচ্ছে।

এবং ফের টুপুর কথাই ভাবছে সে। জ্বালাতন।

পত্রিকা ফেলে রেখে সিগারেট ধরিয়ে নিজের এই অদ্ভুত মানসিক অবস্থাটা বিশ্লেষণ করতে থাকে ধৃতি। কিন্তু বিশ্লেষণ করে কিছুই পায় না। টুপুর সঙ্গে তার সম্পর্ক মাত্র একটি ফোটোর ভিতর দিয়ে। সে ফোটোটাও খুব নির্দোষ নয়। আর টুপুর মা টেলিফোনে এবং চিঠিতে টুপুর সম্বন্ধে যা লিখেছে সেইটুকু মাত্র তার জানা। অবশ্য এগুলো যোগ—বিয়োগ করে নিয়ে একটা রক্তমাংসের মেয়েকে কল্পনা করা যায় না এমন নয়। কিন্তু ততদূর কল্পনাপ্রবণ তো ধৃতি এতকাল ছিল না।

অন্যমনস্কতার মধ্যে সে কখন প্রাতঃকৃত্য সেরেছে, ফ্রিজ থেকে পরমার রেখে যাওয়া পায়েস বের করে খেয়েছে, আবার চা করেছে। ফের সিগারেটও ধরিয়েছে।

বিকেলের শিফটে ডিউটি। সারাটা দিনের অবকাশ পড়ে আছে। কাজ নেই বলে ধৃতি বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসল। চমৎকার বারান্দাটা। নীচে রাস্তা। সারাদিন বসে বসে লোক চলাচল দেখা যায়।

দেখছিল ধৃতি। কিন্তু আবার দেখছিলও না। তার কেবলই মনে হয়, টুপুর মা যা বলছে তার সবটা সত্যি নয়। টুপু যে মারা গেছেই তার কোনও প্রমাণ নেই। সেটা হয়তো কল্পনা বা গুজব। টুপু বেঁচে আছে ঠিকই। একটা কথা কাল টুপুর মাকে জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেছে, টুপুর ফোটোতে তার পাশে কে ছিল, যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে?

ধৃতির অবকাশ যে অখণ্ড তা নয়। সেই ফিচারটা সে এখনও লিখে উঠতে পারেনি। প্রায় দু' সপ্তাহ আগে অ্যাসোসিয়েটেড এডিটর তাকে ডেকে পণপ্রথা নিয়ে আর একটা ফিচার লিখতে বলেছেন। দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া ছিল। বিভিন্ন বাড়ির গিন্নি, কলেজ—ইউনিভার্সিটির ছাত্র—ছাত্রী, সমাজের নানা স্তরের মানুষজনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। সে কাজ পড়ে আছে ধৃতির। এক অবান্তর চিন্তা তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতদিন তেমন প্রকট ছিল না, কিন্তু কাল বহুক্ষণ টুপুর মা—র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর থেকেই তার মাথাটা অশরীরী বা নিরুদ্দেশ টুপুর হেপাজতে চলে গেছে।

আজ সময় আছে। ধৃতি টুপুর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সাজপোশাক করে বেরিয়ে পড়ল।

প্রফেসরদের ঘরে একটা ইজিচেয়ারে পুলক নিমীলিত চোখে আধশোয়া হয়ে চুরুট টানছে, এমন দৃশ্যই দেখবে বলে আশা করেছিল ধৃতি। হুবহু মিলে গেল। প্রফেসরদের চাকরিটা আলসেমিতে ভরা। সপ্তাহে তিন—চারদিন ক্লাস থাকে, বছরে লম্বা লম্বা গোটা দুই—তিন ছুটি, আলসে না হয়ে উপায় কী? এই পুলক যে একসময়ে ফুটবলের ভালো লেফট আউট ছিল তা আজকের মোটাসোটা চেহারাটা দেখে মালুম হয় না। মুখে সর্বদা স্নিগ্ধ হাসি, নিরুদ্বেগ প্রশান্ত চাউনি, হাঁটাচলায় আয়েসি মন্থরতা।

ধৃতিকে দেখে সোজা হওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বলল, আরে! আজই কি তোমার আসবার কথা ছিল নাকি? স্টুডেন্টরা তো বোধহয় কী একটা সেমিনারে গেল!

ধৃতি একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, আজই আসবার কথা ছিল না ঠিকই। তবে এসে যখন গেছি তখন দু'—চারজনকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো। ইন্টারভিউটা আজ না নিলেই নয়।

দেখছি, তুমি বোসো। —বলে পুলক দু' মনি শরীর টেনে তুলল। রমেশ নামক কোনও বেয়ারাকে ডাকতে ডাকতে করিডোরে বেরিয়ে গেল।

পুলকদের কমপারেটিভ লিটারেচারে ছাত্র নগণ্য, ছাত্রীই বেশি। এসব ছাত্রীরাও আবার অধিকাংশই বড়লোকের মেয়ে। পণপ্রথাকে এরা কোন দৃষ্টিতে দেখে তা ধৃতির অজানা নয়। চোখা চালাক আলট্রা স্মার্ট এসব মেয়েদের পেট থেকে কথা বের করাও মুশকিল। কিছুতেই সহজ সরলভাবে অকপট সত্যকে স্বীকার করবে না। ধৃতি তাই মনে মনে তৈরি হচ্ছিল।

মিনিট কুড়ি—পঁচিশের চেষ্টায় পুলক একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে জনা ছয়েক মেয়ে ও একটি ছেলেকে জুটিয়ে দিল। ছটির মধ্যে চারটি মেয়েই দারুণ সুন্দরী। বাকি দু'জনের একজন একটু বয়স্কা এবং বিবাহিতা, অন্যটি সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু কালো আভরণহীন রূপটানহীন চেহারাটায় এক ধরনের ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি আছে।

ধৃতি আজকাল মেয়েদের লজ্জা পায় না, আগে পেত। সুন্দরীদের ছেড়ে সে কালো মেয়েটিকেই প্রথম প্রশ্ন করে, আপনার বিয়েতে যদি পাত্রপক্ষ পণ চান তাহলে আপনার রিঅ্যাকশন কী হবে?

আমি কালো বলে বলছেন?

তা নয়, বরং আপনাকেই সবার আগে নজরে পড়ল বলে।

মেয়েটি কাঁধটা একটু বাঁকিয়ে বলে, প্রথমত আমার বিয়ে নেগোশিয়েট করে হবে না, আমি নিজেই আমার মেট বেছে নেব, পণের প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্নটাকে অত পারসোনেলি নেবেন না। আমি পণপ্রথা সম্পর্কে আপনার মত জানতে চাইছি।

ছেলেরা পণ চাইলে মেয়েদেরও কিছু কন্ডিশন থাকবে।

কী রকম কন্ডিশন?

বাবা—মা'র সঙ্গে থাকা চলবে না, সন্ধে ছ'টার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে, ঘরের কাজে হেলপ করতে হবে, উইক এন্ডে বাইরে নিয়ে যেতে হবে, রান্না এবং ঘরের সব কাজের জন্য লোক রাখতে হবে, স্বামীর পুরো রোজগারের ওপর স্ত্রীর কন্ট্রোল থাকবে.....এরকম অনেক কিছু।

সুন্দরীদের মধ্যে একজন ভারী সুরেলা গলায় বলে ওঠে, অলকা আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে।

ধৃতি লিখতে লিখতে মুখ তুলে হেসে বলে, তাহলে আপনিই বলুন।

আমি! ওঃ, পণপ্রথা শুনলে এমন হাসি পায় না!—বলে মেয়েটি বাস্তবিকই হাত মুখ ঢেকে হেসে ওঠে। সঙ্গে অন্যরাও।

ধৃতি একটু অপেক্ষা করে। হাসি থামলে মৃদু স্বরে বলে, ব্যাপারটা অবশ্য হাসির নয়।

মেয়েটি একটু গলা তুলে বলে, সিস্টেমটা ভীষণ প্রিমিটিভ।

আধুনিক সমাজেও বিস্তর প্রিমিটিভনেস রয়ে গেছে যে!

তা জানি। সেই জন্যই তো হাসি পায়।

এই সিস্টেমটার বিরুদ্ধে আপনি কী করতে চান?

কেউ পণ—টন চাইলে আমি তাকে বলব, আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে।

বিবাহিতা মহিলাটি উসখুস করছিলেন। এবার বললেন, না না, শুনুন। আমি বিবাহিতা এবং একটি মেয়ের মা। আমি জানি সিস্টেমটা প্রিমিটিড এবং হাস্যকর। তবু বলি, এই ইভিলটাকে ওভাবে ট্যাকল করা যাবে না। আমার মেয়েটার কথাই ধরুন। ভীষণ সিরিয়াস টাইপের, খুব একটা স্মার্টও নয়। নিজের বর নিজে জোগাড় করতে পারবে না। এখন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে যদি আমি একটা ভালো পাত্র পাই এবং সেক্ষেত্রে যদি কিছু পণের দাবি থাকেও তবে সেটা অন্যায় জেনেই মেয়ের স্বার্থে হয়তো আমি মেনে নেব।

সুন্দরী মেয়েটা বলল, তুমি শুধু নিজের মেয়ের কথা ভাবছ নীতাদি!

মেয়ের মা হ' আগে, তুইও বুঝবি।

ধৃতি প্রসঙ্গ পালটে আর একজন সুন্দরীর দিকে চেয়ে বলে, পণপ্রথা ভীষণ খারাপ তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা টিফলিশ প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা আপনাকে করব?

খুব শক্ত প্রশ্ন নয় তো?

পুলক পাশেই একটা চেয়ারে বসে নীরবে চুরুট টেনে যাচ্ছিল। এবার মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, তুমি একটি আস্ত বিচ্ছু ইন্দ্রাণী। কিন্তু আমার এই বন্ধুটি তোমার চেয়েও বিচ্ছু। ওয়াচ ইয়োর স্টেপ।

ইন্দ্রাণী উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলে, কংগ্র্যাটস মিস্টার বিচ্ছু। বলুন প্রশ্নটা কী।

ধৃতি খুব অকপটে মেয়েটির দিকে চেয়ে ছিল। এতক্ষণ ভালো করে লক্ষ করেনি। লক্ষ করে এখন হাঁ হওয়ার জোগাড়। ছবির টুপুর সঙ্গে আশ্চর্য মিল। কিন্তু গল্পে যা ঘটে, জীবনে তা ঘটে খুবই কদাচিৎ। এ মেয়েটির আসল টুপু হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই, ধৃতি তাও জানে। সে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমরা লক্ষ করেছি পাত্রপক্ষ আজকাল যতটা দাবিদাওয়া করে তার চেয়ে অনেক বেশি দাবি থাকে স্বয়ং পাত্রীর।

তাই নাকি?

মেয়েরা আজকাল বাবা—মায়ের কাছ থেকে নানা কৌশলে অনেক কিছু আদায় করে নেয়। পণপ্রথার চেয়ে সেটা কি ভালো?

ইন্দ্রাণীর মুখ হঠাৎ ভীষণরকম গম্ভীর ও রক্তাভ হয়ে উঠল। মাথায় একটা ঝাপটা খেলিয়ে বলল, কে বলেছে ওকথা? মোটেই মেয়েরা বাপের কাছ থেকে আদায় করে না। মিথ্যে কথা।

ধৃতি নরম গলায় বলে, রাগ করবেন না। এগুলো সবই জরুরি প্রশ্ন, আপনাকে অপ্রতিভ করার জন্য প্রশ্নটা করিনি।

বিবাহিতা মহিলাটি আগাগোড়া উসখুস করছিলেন, এখন হঠাৎ বলে উঠলেন, ইন্দ্রাণী যাই বলুক আমি জানি কথাটা মিথ্যে নয়। মেয়েরা আজকাল বড্ড ওরকম হয়েছে।

একথায় ইন্দ্রাণী চটল। বলল, মোটেই না নীতাদি। তোমার এক্সপেরিয়েন্স অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু আমরা এই জেনারেশনের মেয়েরা মোটেই ওরকম নই। বরং আমরা মেয়েরা যতটা মা—বাবার দুঃখ বুঝি ততটা এ যুগের ছেলেরা বোঝে না।

নীতা বললেন, সেকথাও অস্বীকার করছি না।

তাহলে? আজকালকার ছেলেরা তো বিয়ে করেই বাবা—মাকে আলাদা করে দেয়। দেয় না বলো?

নীতা হেসে বললেন, সে তো ঠিকই, কিন্তু এ যুগের ছেলেরা বিয়ে করে কাকে সেটা আগে বল, তোর মতো একালের মেয়েদেরই তো।

তা তো করেই।

সেই মেয়েরাই তো বউ হয়ে শ্বশুর—শাশুড়ির সঙ্গে আলাদা হওয়ার পরামর্শ দেয়।

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে বলে, ওটা একপেশে কথা হল। সবসময়ে বউরাই পরামর্শ দেয় না, ছেলেরা নিজেরাই ডিসিশন নেয়। তোমার ডিফেক্ট কী জানো? ওভার সিমপ্লিফিকেশন।

ধৃতি বিপদে পড়ে চুপ করে ছিল। এবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমরা প্রসঙ্গ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছি। পণপ্রথা নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল।

ইন্দ্রাণী তার উজ্জ্বল ও সুন্দর মুখখানা হঠাৎ ধৃতির দিকে ফিরিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলল, এবার বলুন তো রিপোর্টারমশাই, নিজের বিয়ের সময় আপনি কী করবেন?

আমি!—ধৃতি একটু অবাক হল। তারপর এক গাল হেসে বলল, আমার বিয়ে তো কবে হয়ে গেছে। আমি ইনসিডেন্টালি তিন ছেলেমেয়ের বাপ।

ইন্দ্রাণীর চোখে আচমকাই একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। কিন্তু টক করে মাথাটা নুইয়ে নিল সে। তারপর ফের নিপাট ভালোমানুষের মতো মুখটা তুলে বলল, আপনি পণ নেননি?

ধৃতি খুব লাজুকভাবে চোখ নামিয়ে বলল, সামান্য চাকরি, তাই পণও সামান্যই নিয়েছিলাম, হাজার পাঁচেক।

এই স্বীকারোক্তিতে সকলে একটু চুপ মেরে গেল। কিন্তু একটা নিঃশব্দ ছিছিক্কার স্পষ্ট টের পাচ্ছিল ধৃতি।

হঠাৎ পুলক হেসে ওঠায় অ্যাটমসফিয়ারটা মার খেয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী বলল, ইয়ারকি মারছেন, না?

কেন?

আপনি মোটেই বিয়ে করেননি।

আমার বিয়েটা ফ্যাক্টর নয়। আপনি এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।

ইন্দ্রাণী বলল, জবাব দিইনি কে বলল? আমরা মোটেই ওরকম নই।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করল ধৃতি কিন্তু তেমন কোনও লাভ হল না। বারবার তর্ক লেগে যেতে লাগল। শেষে ঝগড়ার উপক্রম।

অবশেষে ইন্টারভিউ শেষ করে ধৃতি উঠে পড়ল। যেটুকু জানা গেছে তাই যথেষ্ট।

পুলক নিয়ে গিয়ে কফি খাওয়াল। নিজে থেকে যেচে বলল, ইন্দ্রাণী মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগল?

খারাপ কী?

শি ইজ ইন্টারেস্টিং। পরে ওর কথা তোমাকে বলব। শি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং।

ধৃতি ফিরে এল বাসায়।

৬

টুপুর খোঁজ যদি ধৃতিকে করতেই হয় তবে তার কিছু সহায়—সম্বল দরকার। তামাম কলকাতা, মাইথন, এলাহাবাদ বা ভারতবর্ষের সমগ্র জনবসতির মধ্যে কোথায় টুপু লুকিয়ে আছে তা একা খুঁজে দেখা ধৃতির পক্ষে অসম্ভব। টুপু মরে গেছে কি না তাও বোধহয় সঠিক জানা যাবে না। মাইথনের পুলিশের কাছে কোনও রেকর্ড না থাকারই সম্ভাবনা।

এক দুপুরে ধৃতি টুপু সংক্রান্ত চিঠি ও ফোটো বের করে সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে বসল। টেলিফোনে টুপুর মা'র সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে লিখল ডায়েরিতে। জয়ন্ত সেন আর কালীবাবুর সঙ্গে যা সব কথাবার্তা হয়েছে তাও বাদ দিল না। পুরো একখানা কেস হিস্ট্রি তৈরি করছিল সে। মাঝপথে কলিংবেল বাজল এবং রসভঙ্গ করে উদয় হলেন পরমা। সঙ্গে বাচ্চা ঝি।

ইস! কতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছি! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কানটাও গেছে দেখছি।

ধৃতি বিরস মুখে বলে, কতক্ষণ জ্বালাবে বলো তো! ঘরের কাজ কিছু থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে কেটে পড়ো। আমার জরুরি লেখা আছে।

পরমা কোমরে হাত দিয়ে চোখ গোল করে বলে, বলি এ ফ্ল্যাটটা আমার না আর কারও? আমারই ফ্ল্যাট থেকে আমাকেই কিনা সরে পড়তে বলা হচ্ছে! মগের রাজত্ব নাকি?

ফ্ল্যাট তোমার হতে পারে কিন্তু আমারও প্রাইভেসি বলে একটা জিনিস আছে।

ইঃ প্রাইভেসি! ব্যাচেলারদের আবার প্রাইভেসি কী? তারা হবে সরল, দরজা জানালা খোলা ঘরের মতো, আকাশের মতো, শিশুর মতো।

থাক থাক। তুমি যে কবিতা লিখতে তা জানি।

খারাপও লিখতাম না। বিয়ে হয়েই সর্বনাশ হয়ে গেল। কবিতা উবে গেল, প্রেম উবে গেল।

ধৃতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানও।

তার মানে?

কিছু বলিনি।

পরমা চোখ এড়িয়ে বলল, আমার অ্যাবসেনসে ঘরে কাউকে ঢোকাননি তো! ছেলেরা চরিত্রহীন হয়!

বলতে বলতে পরমা ধৃতিকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে তার ঘরের পর্দা সরাল। পরমুহূর্তেই 'ওম্মা।' বলে ভিতরে ঢুকে গেল।

ধৃতি বুঝল সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন টুপুর ফোটো লুকোনোর চেষ্টা বৃথা। তাই সে মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর ও ভ্রুকুটিকুটিল করে নিজের ঘরে এল।

পরমা খাটের ওপর সাজানো কাগজপত্র আর ফোটো আঠামাখানো মনোযোগ দিয়ে দেখছে। শ্বাস ফেলে বলল, চরিত্রহীন! আগাপাশতলা চরিত্রহীন!

কে?

পরমা ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, ছিঃ ছিঃ, প্রায় আমার মতোই সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন, আর সে খবরটা একবার জানাননি পর্যন্ত!

তোমার চেয়ে ঢের সুন্দরী।

ইস। আসুক না একবার কাছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি। সাহস আছে?

আস্তে পরমা, কেউ শুনলে হাসবে।

কে আছে এখানে শুনি! আর হাসবারই বা কী আছে?

উদাসভাবে ধৃতি বলে, পাখি—টাখিও তো আসে জানালায়, বাতাসও তো আসে, তারাই শুনে হাসবে।

চোখ পাকিয়ে পরমা বলে, হাসবে কেন?

তোমার চ্যালেঞ্জ—এর কথা শুনে। মেয়েটা কে জানো?

কে? সেটাই তো জানতে চাইছি।

মিস ক্যালকাটা ছিল, এখন মিস ইন্ডিয়া। হয়তো মিস ইউনিভার্স হয়ে যাবে।

ইল্লি। অত সোজা নয়। এবারের মিস ক্যালকাটা রুমা চ্যাটার্জি আমার বান্ধবীর বোন।

তুমি একজন সাংবাদিককে সংবাদ দিচ্ছ?

পরমা হেসে ফেলে বলে, আচ্ছা হার মাললাম। রুমা গতবার হয়েছিল।

এ এবার হয়েছে।

সত্যি?

সত্যি।

নাম কী?

টুপু।

যাঃ, টুপু একটা নাম নাকি? ডাকনাম হতে পারে। পোশাকি নাম কী?

তোমার বয়স কত হল পরমা?

আহা, বয়সের কথা ওঠে কীসে?

ওঠে হে ওঠে, ইউ আর নট কিপিং উইথ দা টাইম। তোমার আমলে পোশাকি নাম আর ডাকনাম আলাদা ছিল। আজকাল ও সিস্টেম নেই। এখন ছেলেমেয়েদের একটাই নাম থাকে। পল্টু, ঝন্টু, পুসি, টুপু, রুণু, নিনা.....

থাক থাক, নামের লিস্টি শুনতে চাই না। মেয়েটার সঙ্গে আপনার রিলেশন কী?

পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরীর সঙ্গে আমার একটা রিলেশন। দাতা এবং গ্রহীতার।

তার মানে?

অর্থাৎ তারা সৌন্দর্য বিতরণ করে এবং আমি তা আকণ্ঠ পান করি।

আর কিছু না?

ধৃতি মাথা নেড়ে করুণ মুখ করে বলে, তোমার চেহারাখানা একেবারে ফেলনা নয় বটে, কেউ কেউ সুন্দরী বলে তোমাকে ভুলও করে মানছি, কিন্তু আজ অবধি বোধহয় ভুল করেও তোমাকে কেউ বুদ্ধিমতী বলেনি!

পরমা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, এ মা, কী সব অপমান করছে রে মুখের ওপর!

ভাই বন্ধুপত্নী, দুঃখ কোরো না, সুন্দরীদের বুদ্ধিমতী না হলেও চলে। কিন্তু এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, একজন যৎসামান্য বেতনের সাব—এডিটরের সঙ্গে মিস ক্যালকাটার দেবী ও ভক্ত ছাড়া আর কোনও রিলেশন হতে পারে না!

খুব পারে। নইলে ফোটোটা আপনার কাছে এল কী করে?

সে অনেক কথা। আগে তোমার ওই বাহনটিকে এক কাপ জমাটি কফি বানাতে বলো।

বলছি। আগে একটু শুনি।

আগে নয়, পরে। যাও।

উঃ!—বলে পরমা গেল।

পরমুহূর্তেই ফিরে এসে বলল, কফি আসছে, বলুন।

মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগছে?

মন্দ কী?

না না, ওরকম ভাসা—ভাসা করে নয়। বেশ ফিল করে বলো। ছবিটার দিকে তাকাও, অনুভব করো, তারপর বলো।

নাকটা কি একটু চাপা?

তাই মনে হচ্ছে?

ফোটোতে বোঝা যায় না অবশ্য। ঠোঁটদুটো কিন্তু বাপু, বেশ পুরু।

আগে কহো আর।

আর মোটামুটি চলে।

হেসে ফেলে বলে, বাস্তবিক মেয়েরা পারেও।

তার মানে?

এত সুন্দর একটা মেয়ের এতগুলো খুঁত বের করতে কোনও পুরুষ পারত না।

পরমা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, ইঃ পুরুষ! পুরুষদের আবার চোখ আছে নাকি? মেয়ে দেখলেই হ্যাংলার মতো হামলে পড়ে।

সব পুরুষই হ্যাংলা নয় হে বন্ধুপত্নী। এত পুরুষের মাথা খেয়েছ তবু পুরুষদের এখনও ঠিকমতো চেনোনি।

চেনার দরকার নেই। এবার বলুন তো ফোটোটা সত্যিই কার?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, আগে আমার কথা একটু—আধটু বিশ্বাস করতে, আজকাল বিশ্বাস করাটা একদম ছেড়ে দিয়েছ।

আপনাকে বিশ্বাস! ও বাবা, তার চেয়ে কেউটে সাপ বেশি বিশ্বাসী। যা পাজি হয়েছেন আজকাল।

তা বলে সাপখোপের সঙ্গে তুলনা দেবে?

দেবই তো। সব সময় আমাকে টিজ করেন কেন?

মুখ দেখে তো মনে হয় টিজিংটা তোমার কিছু খারাপ লাগে না।

লাগে না ঠিকই, তা বলে সবসময়ে নিশ্চয়ই পছন্দ করি না। যেমন এখন করছি না। একটা সিরিয়াস প্রশ্ন কেবলই ইয়ারকি মেরে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বলে পরমা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা কটাক্ষ করল।

ধৃতি নিজের বুকে দু'হাত চেপে ধরে বলল, মর গয়া। ওরকম করে কটাক্ষ কোরো না মাইরি। আমার এখনও বিয়ে হয়নি, মেয়েদের কটাক্ষ সামাল দেওয়ার মতো ইমিউনিটি নেই আমার।

খুব আছে। কটাক্ষ কিছু কম পড়ছে বলে মনে তো হয় না। আগে মেয়েদের ছবি ঘরে আসত না, আজকাল আসছে।

আরে ভাই, মেয়েটার ফোটো নয়। মিস ক্যালকাটা অ্যান্ড মিস ইন্ডিয়া। এর ওপর একটা ফিচার হচ্ছে আমাদের কাগজে। আমাকেই এর ইন্টারভিউ নিতে হবে। তাই.....

পরমা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এ যদি মিস ইন্ডিয়া হয়ে থাকে তবে তো খেঁদি—পেঁচিদের যুগ এল।

কফি এসে যেতে দু'জনেই একটু ক্ষান্ত দিল কিছুক্ষণ। কিন্তু পরমা চেয়ারে বসে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে খুব দুষ্টু চোখে লক্ষ করছিল ধৃতিকে। ধৃতি বলল, তুমি কফি খেলে না?

আমি তো আপনার আর আপনার বন্ধুর মতো নেশাখোর নই।

উদাস ধৃতি বলল, খেলে পারতে। কফিতে বুদ্ধি খোলে। বিরহের জ্বালাও কমে যায়।

আপনার মাথা। যাই বাবা, ঘরদোর সেরে আবার ফিরে যেতে হবে।

পরমা উঠল এবং দরজার কাছ বরাবর গিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, আচ্ছা, একটা কথা বলব?

বলে ফেলো।

এই যে আমার স্বামী দিল্লি গেছে বলে আমাকে ফ্ল্যাট ছেড়ে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে, এটার কোনও অর্থ হয়?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

পরমা বেশ তেজের গলায় বলে, থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না। সব বুঝেও অমন না বোঝার ভান করেন কেন বলুন তো! আমি বলছি, রজত এখানে নেই বলে আমার এই ফ্ল্যাটে থাকা চলছে না কেন?

ধৃতি অকপট চোখে পরমার দিকে চেয়ে বোকা সেজে বলে, আমি আছি বলে।

আপনি থাকলেই বা কী? আমরা দু'জনেই থাকতে পারতাম। দিব্যি আড্ডা দিতাম, রান্না করতাম, বেড়াতাম।

ও বাবা, তুমি যে ভারী সাহসিনী হয়ে উঠেছ।

না না, ইয়ারকি নয়। আজকাল খুব নারীমুক্তি আন্দোলন—টন হচ্ছে শুনি, কিন্তু মেয়েদের এত শুচিবায়ু থাকলে সেটা হবে কী করে? পুরুষ মানেই ভক্ষক আর মেয়ে মানেই ভক্ষ্য বস্তু, এরকম ধারণাটা পালটানো যায় না?

ধৃতি পরমার সামনে এই বোধহয় প্রথম সত্যিকারের অস্বস্তি আর অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। মেয়েদের নিয়ে তার ভাবনা চিন্তা খুব বেশি গভীর নয়। ভাববার দরকারও পড়েনি। কিন্তু পরমার প্রশ্নটি ভীষণ জরুরি বলেই তার মনে হচ্ছে। মেয়েদের বিয়ে দিতে পণ লাগে, মেয়েরা একা সর্বত্র যেতে পারে না, মেয়েদের জীবনে অনেক বারণ।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, পুরুষরা এখনও পুরোপুরি পশুত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি পরমা। যেদিন পারবে সেদিন তোমরা অনেক বেশি ফ্রিডম পাবে।

পরমা মাথা নেড়ে বলল, পুরুষদের খামোখা পশু ভাবতে যাব কেন? বড়জোর তারা ডমিন্যান্ট, কিন্তু পশু নয়। আমার বাবা পুরুষ, আমার ভাই পুরুষ, আমার স্বামী পুরুষ। আমার পুরুষ ওয়েল উইশারেরও অভাব নেই। তাদের আমি পশুর দলে ভাবতে পারি না।

আলোচনাটা বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে পরমা।

পরমা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক পর্দা নিচু গলায় বলল, আমি সত্যিই বাপের বাড়িতে থাকতে ভালোবাসি না। আপনার সঙ্গে আড্ডা মারাটাও আমার বেশ প্রিয়। কিন্তু তবু দেখুন, আপনার মতো

একজন নিরীহ পুরুষের সঙ্গ বর্জন করার জন্য আমাকে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। এটা মেয়েদের পক্ষে অপমান নয়?

ধৃতি হেসে বলল, পুরুষদের পক্ষেও। আমার ভয়ে যে তুমি পালিয়ে আছ এটা তো আমার পক্ষে সম্মানের নয়।

পরমা হঠাৎ ধৃতিকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করল, আমি ভাবছি আজ আর বাপের বাড়ি যাব না। এখানেই থাকব। রাজি?

ধৃতি একটু হাসল। হাত দুটো উলটে দিয়ে বলল, আপকো মর্জি। আমি বারণ করার কে পরমা? এ তো তোমারই ফ্ল্যাট।

ওসব বলে দায়িত্ব এড়াবেন না। এটা কার ফ্ল্যাট সেটা এ প্রসঙ্গে বড় কথা নয়। আসল কথা হল আমি একজন যুবতী, আপনি একজন পুরুষ। আমরা এই ফ্ল্যাটে থাকলে আপনি কী মনে করবেন?

ধৃতি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, কিছু মনে করব না। কলকাতায় এরকম কতজনকে থাকতে হচ্ছে। কেউ মাথা ঘামায় না। তুমি অত ভাবছ কেন?

ভাবছি আপনার জন্যই। রজত দিল্লি যাওয়ার আগে এই ব্যবস্থাটা করে গেছে। বিলেতে আমেরিকায় ঘুরে এসেও কেন যে ওর শুচিবায়ু কাটেনি তা কে বলবে? অথচ এতে করে খামোখা আপনাকে অপমান করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। অপমান আমারও।

ধৃতি স্মিতমুখে বলল, রজতটা একটু সেকেলে। কিন্তু আমার মনে হয় ও বিশেষ তলিয়ে ভাবেনি।

ভাবা উচিত ছিল।

সকলেরই কি অত ভাবাভাবি আসে?

আপনার বন্ধুর না এলেও আমার আসে। তাই ঠিক করেছি থাকব।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, থেকে যাও তা হলে।

খুশি মনে মত দিলেন তো!

দিচ্ছি। শুধু একটু কম টিকটিক করবে।

আমি কি বেশি টিকটিক করি?

না, না, তা বলছি না, তোমার টিকটিক করাটাও শুনতে ভারী ভালো। তবে কিনা—

বুঝেছি।—বলে পরমা রাগ করে বা রাগের ভান করে চলে গেল।

ধৃতি তাকে বেশি ঘাঁটাল না, বরং পণপ্রথা বিষয়ক সাক্ষাৎকারগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে রাখতে লাগল। তার ভাগ্য ভালো যে, প্রথম শ্রেণির একটি দৈনিক পত্রিকায় সে চাকরি করে এবং সাব—এডিটর হয়েও স্বনামে নানারকম ফিচার লেখার সুযোগ পায়। প্রাপ্ত এইসব সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ওপরে ওঠার পথ খোলা। সে লেখে ভালো, নামও আছে। কিন্তু দৈনিক পত্রিকার পাঠকদের স্মৃতি খুবই কম। বারবার নামটা তাদের চোখে না পড়লে তারা তাকে মনেও রাখবে না। তবে ধৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে লেখে এবং মোটামুটি সত্য ও তথ্যের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করে।

পরমা রাত্তিরে চমৎকার ডিনার খাওয়াল। আলুর দম, ডাল, পাঁপড় ভাজা আর স্যালাড। টুকটাক কথা হল। তবে ধৃতি অন্যমনস্ক ছিল, পরমাও।

রাত্রিবেলা ধৃতি একটা বই নিয়ে কাত হল বিছানায়। রোজকার অভ্যাস, কিছু না পড়লে ঘুম আসতে চায় না, ফাঁকা ফাঁকা লাগে। পড়তে পড়তেই শুনতে পেল, পরমা তার ঘরের দরজা সন্তর্পণে ভেজাল এবং আরও সন্তর্পণে ছিটকিনি দিল। একটু হাসল ধৃতি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পরমা জানতে পারলে কি দুঃখিত হবে যে ধৃতি কখনওই পরমার প্রতি কোনও দৈহিক বা মানসিক আকর্ষণ বোধ করে না? পরমা খুব সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু ধৃতি সবসময়ে সবরকম সুন্দরী মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় না। তার একটু বাছাবাছি আছে। অনেক সময় আবার কালো কুচ্ছিত মেয়ের প্রতিও তীব্র আকর্ষণ বোধ করে।

সকালে পুলিশ এল।

আতঙ্কিত পরমা দৌড়ে এসে ঢুকল ধৃতির ঘরে। বিস্ফারিত চোখ, চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, কোথায় কী করে এসেছেন বলুন তো! এত সকালে পুলিশ কেন?

ধৃতি খুব নিবিষ্টমনে খবরের কাগজ পড়ছিল। চোখ তুলে বলল, গত সাত দিনে মোটে তিনটে খুন আর চারটে ডাকাতি করাতে পেরেছি। এত কম অপরাধে তো পুলিশের টনক নড়ার কথা নয়। যাক গে, আমি পাইপ বেয়ে নেমে যাচ্ছি।

বলে ধৃতি উঠল।

পরমা কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, সবসময়ে ইয়ার্কি একদিন আপনার বেরোবে।

হ্যাঁ, যেদিন পালে বাঘ পড়বে।

বলে ধৃতি একটু হাসল। পুলিশ কেন এসেছে তা ধৃতি জানে। প্রধানমন্ত্রীর চা—চক্রে আজ তার নিমন্ত্রণ। অল্প সময়ে সঠিক ঠিকানায় আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য লালবাজারের পুলিশকে সেই ভার দেওয়া হয়।

ধৃতি পিয়োন বুক—এ সই করে আমন্ত্রণপত্রটি নিয়ে ডাইনিং টেবিলে ফেলে রাখল। একটু অবহেলার ভঙ্গি। একটা চেয়ার টেনে বসে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আর একবার একটু গরম জল খাওয়াও পরমা। আগের বারেরটা জমেনি।

দিচ্ছি।—বলে পরমা কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখল। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ।

ধৃতি আড়চোখে লক্ষ করছিল পরমাকে। বলল, ওটা আসলে ওয়ারেন্ট।

পরমা উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলল, ইস, কী লাকি আপনি! প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে চায়ের নেমন্তন্ন! ভাবতেই পারছি না।

ধৃতি উদাস মুখে বলল, অত উচ্ছ্বাসের কিছু নেই। ভি আই পি—দের সঙ্গ খুব সুখপ্রদ নয়, অনেক বায়নাক্কা আছে।

পরমা বলল, তবু তো কাছ থেকে দেখতে পাবেন, কথাও বলবেন! আচ্ছা, আমি যদি সঙ্গে যাই?

কী পরিচয়ে যাবে?

পরমা চোখ পাকিয়ে বলে, পরিচয় আবার কী? এমনি যাব।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঢুকতে দেবে কেন? বউ হলেও না হয় কথা ছিল।

পরমা মুখ টিপে হেসে বলল, যদি তাই সেজেই যাই?

তোমার মুখ উন্নতি হয়েছে পরমা।

তার মানে?

তুমি আর আগের মতো সেকেলে নেই। বেশ আধুনিক হয়েছ। আমার বউ সেজে রাজভবনে অবধি যেতে চাইছ।

আহা, তাতে দোষ কী?

রজত শুনলে মূর্ছা যাবে।

পরমা মুখোমুখি বসে বলল, কোন ড্রেসটা পরে যাবেন?

ড্রেস? ও একটা পরলেই হল।

মাথা নেড়ে পরমা বলে, না, যা খুশি পরে গেলেই চলবে নাকি? চকোলেট রঙের সেই বুশ শার্ট আর সাদা প্যান্ট—বুঝলেন?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, ও বাবা, তুমি আমার পোশাকেরও খবর রাখো দেখছি।

রাখব না কেন? ছোট ভাইয়ের মতোই দেখি, তাই খবর রাখতে হয়।

ধৃতি খুব হোঃ হোঃ করে হেসে ফেলে বলল, আজ তুমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছ না যে, আমাকে কোন প্লেসটা দিলে ভালো হয়। একটু আগে আমার বউ সাজতে চাইছিলে, এখন আবার বলছ ছোট ভাই। এরপর কি ভাসুর না মামাশ্বশুর?

পরমা লজ্জা পেয়ে বলে, যা বলেছি মনে থাকে যেন। সাদা প্যান্ট আর চকোলেট বুশ শার্ট।

ঠিক আছে।

প্রাইম মিনিস্টারকে কী জিজ্ঞেস করবেন?

করব কিছু একটা।

এখনও ঠিক করেননি?

প্রশ্ন করার স্কোপ কতটা পাওয়া যাবে তা বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় উনি বলবেন, আমাদের শুনে যেতে হবে।

তবু কিছু প্রশ্ন ঠিক করে রাখা ভালো।

ধৃতি কফি খেয়ে চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়ি কামাল, স্নান করল, খেল। তারপর পরমার কথামতো পোশাক পরে বাইরের ঘরে এল। বলল, এই যে পরমা, দেখো।

পরমা খাচ্ছিল, মুখ তুলে দেখে বলল, বাঃ, এই তো স্মার্ট দেখাচ্ছে।

এমনিতে দেখায় না?

যা ক্যাবলা আপনি!

আমি ক্যাবলা?

তাছাড়া কী?—বলে পরমা হাসল। তারপর প্রসঙ্গ পালটে বলল, আজ আর বাইরে খেয়ে আসবেন না। আমি রেঁধে রাখব।

রোজ খাওয়ালে যে রজতটা ফতুর হয়ে যাবে।

যতদিন ও না আসছে ততদিন ওর বরাদ্দ খাবারটাই আপনাকে খাওয়াচ্ছি।

ধৃতি হাসল। বলল, ভাগ্যিস রজতের আর সব শূন্যস্থানও আমাকে পূরণ করতে হচ্ছে না।

বলেই টুক করে বেরিয়ে দরজা টেনে দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দুদ্দাড় করে নেমে গেল সে।

৭

ধৃতি অফিসে এসেই শুনল, ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের চা—চক্রের রিপোর্টিং তাকেই করতে হবে। সে নিজেও যে আমন্ত্রিত এ কথাটা জেনে চিফ সাব এডিটর বঙ্কুবাবু বিশেষ খুশি হলেন না। বললেন, সবই কপাল রে ভাই। আমি পঁচিশ বছর এ চেয়ারে পশ্চাদ্দেশ ঘষে যাচ্ছি, কিছুই হয়নি।

ধৃতি জবাব দিল না। মনে মনে একটু দুঃখ রইল, কপাল যে তার ভালো এ কথা সে নিজেও অস্বীকার করে না। মাত্র কিছুদিন হল সে এ চাকরি পেয়েছে। সাব এডিটর হিসেবেই। তবু তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফিচার লিখতে দেওয়া হয় এবং গুরুতর ঘটনার রিপোর্টিং—এ পাঠানো হয়। ধৃতিকে যে একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে অফিস তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ এ অফিসে ভালো ফিচার—লেখক এবং ঝানু রিপোর্টারের অভাব নেই।

প্রধানমন্ত্রী ময়দানে মিটিং সেরে রাজভবনে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বসবেন সন্ধে সাড়ে—ছ'টায়। এখনও তিনটে বাজেনি। ধৃতি সুতরাং আড্ডা মারতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সম্প্রতি কয়েকজন ট্রেনি জার্নালিস্ট নেওয়া হয়েছে অফিসে। মোট চারজন। তারা প্রত্যেকেই স্কুল কলেজে দুর্দান্ত ছাত্র ছিল। বুধাদিত্য হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হয়েছিল হিউম্যানিটিজে। নকশাল আন্দোলনে নেমে পড়ায় পরবর্তী রেজাল্ট তেমন ভালো নয়। রমেন স্টার পাওয়া ছেলে। এম এ—তে ইকনমিকস—এ প্রথম শ্রেণি। তুষার হায়ার সেকেন্ডারির সায়েন্স স্ট্রিমে শতকরা আটাত্তর নম্বর পেয়ে স্ট্যান্ড করেছিল। বি এসসি ফিজিক্স অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস। এম এসসি করছে। দেবাশিস দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষায় শতকরা একাশি পেয়ে

পাশ করেছিল। বি এ এম এ—তে তেমন কিছু করতে পারেনি। চারজনের গায়েই স্কুল কলেজের গন্ধ, কারও ভালো করে দাড়ি গোঁফ পোক্ত হয়নি।

এদের মধ্যে রমেনকে একটু বেশি পছন্দ করে ধৃতি। ছেলেটি যেমন চালাক তেমনি গভীর। কথা কম বলে এবং সবসময়ে ওর মুখে একটা আনন্দময় উজ্জ্বলতা থাকে।

ধৃতি আজ রমেনকে একা টেবিলে কাজ করতে দেখে সামনে গিয়ে বসল।

কী হে ব্রাদার, কী হচ্ছে?

একটা রিপোর্ট লিখছি। কৃষিমন্ত্রীর ব্রিফিং।

ও বাবা, অতটা লিখছ কেন? অত বড় রিপোর্ট যাবে নাকি? ডেসকে গেলেই হয় ফেলে রাখবে, না হলে কেটে ছেঁটে সাত লাইন ছাপবে।

রমেন করুণ মুখে বলে, তা হলে না লিখলেই তো ভালো হত।

মন্ত্রীদের ব্রিফিং মানেই তো কিছু খোঁড়া অজুহাত। ওসব ছেপে আজকাল কেউ কাগজের মূল্যবান স্পেস নষ্ট করে না। খুব ছোট করে লেখো, নইলে বাদ চলে যাবে।

এই অবধি আমার মোটে চারটে খবর বেরিয়েছে। অথচ পঞ্চাশ—ষাটটা লিখতে হয়েছে।

এরকমই হয়। তবু তো তোমরা ফুল টাইম রিপোর্টার। যারা মফস্‌সলের নিজস্ব সংবাদদাতা তাদের অবস্থা কত করুণ ভেবে দেখো। কুচবিহার বা জলপাইগুড়ির থেকে কত খবর লিখে পাঠাচ্ছে, বছরে বেরোয় একটা কি দুটো।

তা হলে আমাদের কভারেজে পাঠানোই বা কেন?

নেট প্র্যাকটিসটা হয়ে যাচ্ছে। এর পরে যখন পাকাপোক্ত হবে, স্কুপ করতে শিখবে তখন তোমাকে নিয়েই হবে টানাটানি। যদি মানসিকতা তৈরি করে নিতে পারো তা হলে জার্নালিজম দারুণ কেরিয়ার।

তা জানি। আর সেইজন্যই লেগে আছি। আপনি কি আজ পি এম—এর রাজভবনের মিটিং কভার করছেন?

হুঁ। আমি অবশ্য আলাদা ইনভিটেশনও পেয়েছি।

রমেন একটু হেসে বলে, আশ্চর্যের বিষয় হল, আমিও পেয়েছি।

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তুমিও পেয়েছ! বলোনি তো!

চান্স পাইনি। আজ সকালেই লালবাজার থেকে বাড়িতে এসে দিয়ে গেল। আসলে কী জানেন, আমি একসময়ে একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করতাম, কবিতাও লিখতাম, সেই সূত্র ধরে আমাকেও ডেকেছে।

এখন লেখো না?

লিখি। অল্প স্বল্প। গত মাসেই দেশ—এ আমার কবিতা ছিল।

বটে।—ধৃতি খুশি হয়ে বলে, মনে পড়েছে। আমি দেশ খুলেই আগে কবিতার পাতা পড়ে ফেলি। রমেন সেই তুমিই তা হলে!

অত অবাক হবেন না। আমার মতো কবি বাংলাদেশে কয়েক হাজার আছে।

তা থাক না। কবি কয়েক হাজার আছে বলেই কি তোমার দাম কমে যাবে?

ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই—এর নিয়ম তো তাই বলে। কবিতার ডিমান্ড নেই, কিন্তু সাপ্লাই অঢেল। প্রাইস ফল করতে বাধ্য।

ইকনমিকসের নিয়ম কি আর্টে প্রযোজ্য?

খানিকটা তো বটেই। কবিতা লিখি বলে ক'জন আমাকে চেনে?

ধৃতি একটু হেসে বলে, একটা মনের মতো কবিতা লিখে তুমি যে আনন্দ পাও তা অকবিরা ক'জন পায়?

রমেনের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হল। উষ্ণ কণ্ঠে বলল, কবিতা লিখে আমি সত্যিই আনন্দ পাই। এত আনন্দ বুঝি আর কিছুতে নেই।

তবে! দামটা সেইদিক দিয়ে বিচার কোরো। খ্যাতি বা অর্থ দিয়ে তা মাপাই যায় না। যাক গে, যাচ্ছ তো রাজভবনে?

যাব। বড্ড ভয় করে। কী হবে গিয়ে?

চলোই না। আর কিছু না হোক, রাজভবনের ইন্টিরিয়রটা তো দেখা হবে।

তা বটে। ঠিক আছে, যাব।

কাগজ কলম নিয়ে যেয়ো। যা দেখবে বা শুনবে তার নোট নিয়ো।

আমি নোট নেব কেন? কী হবে? রিপোর্ট তো করবেন আপনি।

তাতে কী? আমি যা মিস করব তুমি হয়তো তা করবে না। দু'জনের রিপোর্ট মিলিয়ে নিয়ে করলে জিনিসটা ভালো দাঁড়াবে।

মাথা নেড়ে রমেন বলল, ঠিক আছে।

ডেসক থেকে বিমান হাত উঁচু করে ডাকল, ধৃতি! এই ধৃতি! তোর টেলিফোন।

ধৃতি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফোন ধরল, ধৃতি বলছি।

আমি বলছি।

কে বলছেন?

গলা শুনে চিনতে পারছেন না? আমি টুপুর মা।

ধৃতি একটু স্তব্ধ থেকে বলল, আপনি এখনও কলকাতায় আছেন?

মাইথন থেকে ঘুরে এলাম।

সেখানে কোনও খবর পেলেন?

না। কেউ কিছু বলতে চায় না। তবে আমার মনে হয় ওরা সবাই জানে যে টুপু খুন হয়েছিল!

ওরা মানে কারা?

ওখানকার লোকেরা।

কী বলছে তারা?

কিছুই বলছে না, আমি অনেককে টুপুর কথা জিজ্ঞেস করেছি।

শুনুন, আপনি এলাহাবাদে ফিরে যান। এভাবে ঘুরে ঘুরে আপনি কিছুই করতে পারবেন না।

একেবারে যে পারিনি তা নয়। একজন বুড়ো লোক স্বীকার করেছে যে সে টুপুকে বা টুপুর মতো একটি মেয়েকে দেখেছে।

টুপুর মতো মেয়ে কি আর নেই? ভুলও তো হতে পারে!

পারেই তো। সেইজন্য আমি ফিফটি পারসেন্ট ধরছি। টুপুর ঘাড়ের দিকে বাঁ ধারে একটা জরুল আছে। সেটাই ওর আইডেনটিটি মার্ক। বুড়োটাকে সেই জরুলের কথা বলেছিলাম। সে বলল, হ্যাঁ, ওরকম জরুল সেও মেয়েটির ঘাড়ে দেখেছে। এতটা মিলে যাওয়ার পরও ব্যাপারটা উড়িয়ে দিই কী করে বলুন!

তা বটে।

টুপুর সঙ্গে একজন লোককেও দেখেছে বুড়োটা। খুব দশাসই চেহারা। বিশাল লম্বা। লোকটা নাকি টুপুর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলছিল।

বুড়োটা কে?

একজন ফুলওয়ালা। টুপু লোকটার কাছ থেকে ফুল কিনেছিল।

ধৃতি একটু ঘামছিল। উত্তেজনায়, ভয়ে। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নির্বিকার রেখে সে বলল, ঠিক আছে, শুনে রাখলাম। কিন্তু আমি একজন সামান্য সাব—এডিটর। টুপুর ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনও সাহায্যই করতে পারছি না। যা করার পুলিশই করবে।

টেলিফোনে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল। টুপুর মা বলল, এখন তো ইমার্জেন্সি চলছে, তাই পুলিশ খুব এলার্ট। কিন্তু কেন যেন টুপুর ব্যাপারে তারা তেমন ইন্টারেস্ট নিচ্ছে না। এমনকী খুনটা পর্যন্ত বিশ্বাস করছে না।

বিশ্বাস করাটা নির্ভর করে এভিডেন্সের ওপর। আপনি আপনার মেয়ের খুনের কোনও এভিডেন্সই যে দিতে পারছেন না।

মায়ের মন সব টের পায়।

কিন্তু পুলিশ তো আর মা নয়?

ঠিক আছে, আপনাকে আজ আর বিরক্ত করব না। কিন্তু কখনও—সখনও দরকার হলে ফোন করব। বিরক্ত হবেন না তো!

না, বিরক্ত হব কেন?

আমি খবরের কাগজের অফিস কখনও দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। একদিন যদি আপনার অফিসে গিয়ে হাজির হই তো দেখাবেন? যদি অসুবিধে না থাকে?

নিশ্চয়ই। কবে আসবেন?

এ যাত্রায় হবে না। এলাহাবাদে আমার অনেক সম্পত্তি। সব পরের ভরসায় ফেলে এসেছি। শিগগিরই ফিরতে হচ্ছে। তবে আমি প্রায়ই কলকাতায় আসি।

বেশ তো, যখন সুবিধে হবে আসবেন।

বিরক্ত হবেন না তো!

না, এতে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। আজ ছাড়ি তা হলে?

আপনার বুঝি খুব কাজ অফিসে?

কাজ না করলে মাইনে দেবে কেন বলুন?

আজ আপনার কী কাজ?

আজ প্রাইম মিনিস্টারের একটা মিটিং কভার করতে হবে।

ওমা! প্রাইম মিনিস্টার? আপনারা কত ভাগ্যবান! কোথায় মিটিং বলুন তো।

রাজভবনে।

ইস কী দারুণ! আপনি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলবেন?

বলব হয়তো।

ভয় করবে না?

ভয় কীসের? পি এম নিজেই তো মিটিং ডেকেছেন। আমাদের কথা শুনবার জন্যই।

কী বলবেন?

ঠিক করিনি। কথা জুগিয়ে যাবে।

একটা কথা পি এমকে বলবেন?

কী কথা?

বলবেন এ দেশে মেয়েদের বড় কষ্ট।

উনি নিজেও তো মেয়ে। উনি কি আর ভারতবর্ষের মেয়েদের কথা জানেন না?

জানেন। উনি সব জানেন। এ দেশের মেয়েরা ওঁর মুখ চেয়েই তো বেঁচে আছে। তবু আপনি তো পুরুষ মানুষ, আপনার মুখ থেকে মেয়েদের কষ্টের কথা শুনলে উনি খুশি হবেন।

ওঁকে খুশি করা তো আমার উদ্দেশ্য নয়।

টুপুর মা একটু চুপ করে থেকে বলে, তা ঠিক। তবে কী জানেন, ওঁকে খুশি করতে কেউ চায় না, সবাই শুধু ওঁর দোষটাই দেখে। পি এম একজন মহিলা বলেই কি আপনারা পুরুষেরা ওঁকে সহ্য করতে পারেন

না?

তা কেন? পি এম মহিলা না পুরুষ সেটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়। আমরা দেখব ওঁর কাজ।

আমার মনে হয় পুরুষেরা ওঁকে হিংসে করে।

তা হলে পি এম পুরুষদের ভোটই পেতেন না। আপনি ভুল করছেন। এ দেশের লোকেরা ইন্দিরা গাঁধীকে মায়ের মতোই দেখে।

বলছেন! কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।

অবিশ্বাসের কিছু নেই। দেশটা একটু ঘুরে এলেই বুঝতে পারবেন।

তা অবশ্য ঠিক। আমি দেশের কতটুকুই বা দেখেছি! কলকাতা আর এলাহাবাদ। আপনি খুব ঘুরে বেড়ান, না?

খুব না হলেও কিছু ঘুরেছি, আর লোকের সঙ্গেও মিশি। আমি তাদের মনোভাব বুঝতে পারি।

জানেন আমাদের এলাহাবাদের হাইকোর্টেই ওঁর মামলাটা হচ্ছিল, আমরা তখন প্রায়ই কোর্টে যেতাম। কী থ্রিলিং! তারপর উনি যখন হেরে গেলেন, কী মন খারাপ!

হতেই পারে। আপনি খুব ইন্দিরা—ভক্ত।

তা বলতে পারেন। আমি ওঁর ভীষণ ভক্ত। আপনি নন?

আমি! আমার কারও ভক্ত হলে চলে না।

ইন্দিরা এলাহাবাদের মেয়ে জানেন তো! আমাদের বাড়ি থেকে ওঁদের আনন্দ ভবন বেশি দূরেও নয়। ছাদে উঠলে দেখা যায়। আপনি তো গেছেন এলাহাবাদে, তাই না?

হ্যাঁ, তবে খুব ভালো করে শহরটা দেখিনি।

এবার গেলে দেখে আসবেন। খুব সুন্দর শহর।

আচ্ছা দেখব।

আর একটা কথা।

বলুন।

আপনার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে কাজের।

তেমন কিছু নয়।

বলছিলাম কী, আমাকে দয়া করে পাগল ভাববেন না।

ভেবেছি নাকি?

হয়তো ভেবেছেন। ভাবলেও দোষ দেওয়া যায় না। সেই এলাহাবাদ থেকে মাঝরাতে ট্রাঙ্ককল করা, তারপর মাঝে মাঝেই এইভাবে টেলিফোনে উত্ত্যক্ত করা, তার ওপর টুপুর ঘটনা নিয়ে উটকো দায় চাপানো, আমি জানি আমার আচরণ খুব অদ্ভুত হচ্ছে। তবু আমি কিন্তু পাগল নই।

আপনি যা করছেন তা স্বাভাবিক অবস্থায় তো করেননি।

ঠিক তাই। শোকে তাপে অস্থির হয়ে কী করব তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না।

আমি আপনাকে পাগল ভাবিনি। কিন্তু আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। টুপুর বাবা কোথায়?

ওমা! বলিনি আপনাকে?

বলেছিলেন! তবে বোধহয় ভুলে গেছি।

আমার স্বামী বেঁচে থেকেও নেই।

তার মানে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপুর মা বলে, মানে বুঝে আর কাজ নেই। আমার স্বামী ভালো লোক নন। তবে বড়লোকের ছেলে, তাই তাঁকে সবই মানিয়ে যায়।

তিনি এখন কোথায়?

যতদূর জানি বম্বেতে। একটি কচি মেয়ের সঙ্গে থাকেন।

তিনি বেঁচে থাকতে আপনি তাঁর সম্পত্তি পেলেন কী করে?

তাঁর সম্পত্তি পেলাম শাশুড়ি সেইরকম বন্দোবস্ত করে রেখে গিয়েছিলেন বলেই। তাছাড়া আমার বাপের বাড়িও খুব ফেলনা ছিল না। সেদিক থেকেও কিছু পেয়েছি।

মাপ করবেন, এসব প্রশ্ন করা বোধহয় ঠিক হল না।

টুপুর মা একটু হাসলেন, আমাকে যে—কোনও প্রশ্নই করতে পারেন। আমার আর অপ্রস্তুত হওয়ার কিছু নেই। শোকে তাপে জ্বালায় আমি এখন কেমন একরকম হয়ে গেছি। আচ্ছা, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না। ছাড়ছি।

আচ্ছা।

ধৃতি টেলিফোন রেখে দিল। তার ভ্রু একটু কোঁচকানো। মুখ চিন্তান্বিত।

নিউজ এডিটর ডেসকের সামনে দিয়ে একপাক ঘুরে যাওয়ায় সময় সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ধৃতি, আজ তো তুমি পি এম—এর রাজভবন মিটিং কভার করবে।

হ্যাঁ।

কোনও পলিটিক্যাল ইস্যু তুলো না কিন্তু। মোটামুটি ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রবলেমের ওপর প্রশ্ন করতে পারো। ইমার্জেন্সি নিয়েও কিছু বলতে যেয়ো না।

না, ওসব বলব না।

আমাদের কাগজের ওপর রুলিং পার্টি খুব সন্তুষ্ট নয়। টেক—ওভারের কথাও উঠেছিল। সাবধানে এগিয়ো।

ঠিক আছে।

ইয়ং রাইটারদের কাকে কাকে চেনো?

কয়েকজনকে চিনি।

তা হলে তো ভালোই। পি এমকে কী জিজ্ঞেস করবে বলে ঠিক করেছ?

ধৃতি মৃদু হেসে বলে, দেখি।

প্রধানমন্ত্রীকে ধৃতির অনেক কথা জিজ্ঞেস করার আছে। যেমন, আপনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে ভালোই করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সেটা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচনী মামলায় হেরে যাওয়ার পর করলেন কেন? এতে আপনার ইমেজ নষ্ট হল না? কিংবা বিরোধীরা কোনও রাজ্যে সরকার গড়লেই কেন্দ্র তার পিছনে লাগে কেন? কেনই বা নানা উপায়ে সেই সরকারকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে? আপনার কি মনে হয় না যে এতে সেই রাজ্যের ভোটাররা অপমানিত বোধ করতে থাকে এবং ফলে দ্বিগুণ সম্ভাবনা থেকে যায় ফের ওই রাজ্যে বিরোধীদের ক্ষমতায় ফিরে আসার? কিংবা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর যখন আপনার ভাবমূর্তি অতি উজ্জ্বল, যখন স্বতঃস্ফূর্ত ভোটের বন্যায় আপনি অনায়াসে ভেসে যেতে পারতেন তখন বাহাত্তরের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক রিগিং হয় তার কোনও দরকার ছিল কি? আপনি এমনিতেই বিপুল ভোট পেতেন, তবু রিগিং করে এখানকার ভোটারদের অকারণে চটিয়ে দেওয়া কি অদূরদর্শিতার পরিচয় নয়? কিংবা আপনি যেমন ব্যক্তিত্বে, ক্ষমতায়, বুদ্ধিতে অতীব উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত মানুষ, আপনার আশেপাশে বা কাছাকাছি তেমন একজনও নেই কেন? আপনার দলের সকলেই কেন আপনারই মুখাপেক্ষী, আপনারই করুণাভিক্ষু? কেন আপনার দলে তৈরি হচ্ছে না পরবর্তী নেতৃবৃন্দের সেকেন্ড লাইন অফ লিডারশিপ?

কিন্তু এসব প্রশ্ন করা যাবে না। ধৃতি জানে, এই জরুরি অবস্থায় এসব প্রশ্ন করা বিপজ্জনক। তাছাড়া এই চা—চক্রটি নিতান্তই বুদ্ধিজীবীদের। এখানে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক কথাই উঠতে পারে।

নিউজ এডিটর বললেন, একটু সাবধানে প্রশ্ন—টশ্ন কোরো। আর ওয়াচ কোরো কোন কবি সাহিত্যিক কী জিজ্ঞেস করেন।

ধৃতি একটু হেসে বলে, কবি সাহিত্যিকদের আমি জানি। তারা খুব সেয়ানা লোক। কোনও বিপজ্জনক প্রশ্ন তারা করবে না।

সে তো জানি। তবু ওয়াচ কোরো। আর দরকার হলে গাড়ি নিয়ে যেয়ো। মোটর ভেহিকেলসে তোমার নামে গাড়ি বুক করা আছে।

দরকার নেই।

নেই? তা হলে ঠিক আছে।

মোটর ভেহিকেলসের গাড়ি নেওয়ার ঝক্কি অনেক। এই অফিসের সবচেয়ে কুখ্যাত বিভাগ হচ্ছে ওই মোটর ভেহিকেলস, গাড়ি মানেই চুরি। পার্টস, পেট্রল, টায়ার। এই কারণে দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলি তিতিবিরক্ত হয়ে নিজস্ব মোটর ভেহিকেলস ডিপার্টমেন্ট তুলেই দিচ্ছি। দিয়ে বাইরের গাড়ি ভাড়া করে দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ধৃতি কয়েকবারই অফিসের কাজে গাড়ি নিয়েছে। নিতে গিয়ে দেখেছে গাড়ির ইনচার্জ অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে, দয়া করার মতো গাড়ি দেয়, গাড়ির ড্রাইভারও ভদ্র ব্যবহার করে না, সব জায়গায় যেতে চায় না। বলতে গেলে মহাভারত। তাই ধৃতি অফিসের গাড়ি পারতপক্ষে নেয় না। আজও নেবে না।

পাঁচটার পর ধৃতি আর রমেন বেরোল।

রাজভবনের ফটকে কড়া পাহারা। পুলিশে ছয়লাপ। কার্ড দেখাতেই ফটকের পুলিশ অফিসার উলটেপালটে দেখে বলল, যান।

দু'জনে ভিতরে ঢুকতেই আবার পুলিশ ধরল এবং আবার কার্ড দেখাতে হল। এবং আবার এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ মিলল।

রমেন নিচুস্বরে বলল, ধৃতিদা!

বলো।

বেশ ভয় ভয় করছে।

কেন বলো তো!

আপনার করছে না?

নাঃ। এক গণতান্ত্রিক দেশের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, ভয় কীসের? আমিও গণ তিনিও গণ।

রমেন একটু হেসে বলে, পুলিশ তা মনে করে না।

তা অবশ্য ঠিক। তবে সিকিউরিটির ব্যবস্থা স্টেট গভর্নমেন্টই করেছে। পি এম—এর কিছু হলে সরকারের বদনাম।

রমেন মাথা নাড়াল। তারপর হঠাৎ বলল, আচ্ছা, রাজভবনের ভিতরের এই রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন তা জানেন?

এমনি। পেবলের রাস্তা আরও কত জায়গায় আছে। বেশ লাগে।

রমেন মাথা নেড়ে বলল, না। এর একটা অন্য কারণও আছে।

তাই নাকি?

আমার কাকা পুলিশে চাকরি করতেন। বিগ অফিসার ছিলেন। নাম বললেই হয়তো চিনে ফেলবেন, তাই আপাতত নাম বলছি না। যখন চৌ এন লাই কলকাতায় এসে রাজভবনে ছিলেন তখন কাকা ছিলেন তাঁর সিকিউরিটি ইনচার্জ। তিনিই কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের রাজভবনের রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন?

তোমার কাকা কী বলেছিলেন?

আপনার মতোই সৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন। চৌ এন লাই খুব মজার হাসি হেসে বলেছিলেন, মোটেই তা নয়। নুড়িপাথরের ওপর গাড়ি চললে শব্দ হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে লাটসাহেবদের সিকিউরিটির জন্যই ওই ব্যবস্থা। তারপর চৌন এন লাই কাকাকে একটা গাড়ির শব্দ শোনালেন। শুনিয়ে বললেন, নাউ ইউ সি দ্যাট অন এ পেবল রোড দি সাউন্ড অফ এ কার কামিং অর গোয়িং ক্যানট বি সাপ্রেসড!

ধৃতি হেসে বলল, তাই হবে। সাহেবদের খুব বুদ্ধি ছিল।

চৌ এন লাইয়েরও কম ছিল না। আমার কাকা পুলিশ হয়েও যেটা বুঝতে পারেননি উনি ঠিক পেরেছিলেন।

সিঁড়ির মুখে আর এক দফা বাধা ডিঙিয়ে যখন লাউঞ্জে ঢুকল তারা, তখন সেখানে ভীরু ও সংকুচিত মুখে এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বেশ কয়েকজন কবি সাহিত্যিক ও আর্টিস্ট জড়ো হয়েছে। রাজভবনের কালো প্রাচীন লিফটের সামনে বেশ একখানা ছোটখাটো ভিড়। এদের অনেককেই ধৃতি চেনে, রমেনও।

কয়েক ব্যাচ লিফট—বাহিত হয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার পরই ধৃতি আর রমেনের পালা এল। লিফটম্যান সাফ জানিয়ে দিল, দোতলায় মিটিং বটে কিন্তু লিফট খারাপ বলে দোতলায় থামছে না। তিনতলায় উঠে দোতলায় নামতে হবে।

ধৃতি লিফটের ব্যাপারটা মনে মনে নোট করল। খরচের ওপর এখন কড়া সেনসর। কাজেই রাজভবনের লিফট ত্রুটিযুক্ত এ খবরটা লেখা হলেও ছাপা যাবে কি না এতে ঘোর সন্দেহ।

তিনতলা থেকে দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে দু'জনে কিছু আতান্তরে পড়ে গেল। লিফটের সামনে সংকীর্ণ করিডোরে নেমে কোনদিকে যেতে হবে বুঝতে না পেরে সকলেই গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট খেতেও কেউ সাহস করছে না। ফিসফাস কথা বলছে শুধু।

সেই ভিড়ে ধৃতি আর রমেনও দাঁড়িয়ে রইল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন সকলেই খানিকটা উসখুস করছে তখনই অত্যন্ত সুপুরুষ এবং তরুণ এক মিলিটারি অফিসার করিডোর ঢুকেই হাত নেড়ে সবাইকে প্রায় গোরু তাড়ানোর মতো করে নিয়ে তুলল দক্ষিণের প্রকাণ্ড বারান্দায়।

বারান্দার পরেই একখানা হলঘর। তাতে মস্ত মস্ত টেবিলে পাতা। টেবিলে খাবার সাজানো থরে থরে। উর্দিপরা বেয়ারা ছাড়া সে ঘরে কেউ নেই। বোঝা গেল এই ঘরেই ইন্দিরার সঙ্গে তারা সবাই চা খাবে। তবে আপাতত প্রবেশাধিকার নেই। দরজায় গার্ড দাঁড়িয়ে।

বারান্দায় কয়েকজন সিগারেট ধরাল। কে এসে চুপি চুপি খবর দিল। ময়দানের মিটিং শেষ হয়েছে। ইন্দিরা রাজভবনে রওনা হয়েছেন। সকলেই কেমন যেন উদ্বিগ্ন, অসহজ, অপ্রতিভ। যারা জড়ো হয়েছে তারা সবাই কবি সাহিত্যিক শিল্প সাংবাদিক বটে, কিন্তু সকলেই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের। রাজভবনে আসা বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাদের জীবনে খুব একটা সাধারণ ঘটনা নয়। তার ওপর জরুরি অবস্থায় একটা গা ছমছমে ব্যাপার তো আছেই।

খুবই আকস্মিকভাবে একটা চঞ্চলতা বয়ে গেল ভিড়ের ভিতর দিয়ে।

এলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। স্মার্ট চেহারা, মুখে সপ্রতিভ হাসি, হাতজোড়। বললেন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন তো! আসুন আসুন, এ ঘরে আসুন।

আবহাওয়াটা কিছু সহজ হয়ে গেল। হাত পায়ে সাড় এল যেন সকলের।

হলঘরে ঢুকে ভালো করে থিতু হওয়ার আগেই ধৃতি অবিশ্বাসের চোখে দেখল, ইন্দিরা ঘরে ঢুকছেন।

সে কখনও ইন্দিরা গাঁধীকে এত কাছ থেকে দেখেনি। দেখে সে বেশ অবাক হয়ে গেল। ছবিতে যেরকম দেখায় মোটেই সেরকম নন ইন্দিরা। ছোটখাটো ছিপছিপে কিশোরীপ্রতিম তাঁর শরীরের গঠন। গায়ের রং বিশুদ্ধ গোলাপি। মুখে সামান্য পথশ্রমের ছাপ আছে। কিন্তু হাসিটি অমলিন।

ইন্দিরা ঘরে ঢুকেই আবহাওয়াটা আরও সহজ করে দিলেন। ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গে কথা বললেন। সঙ্গে ঘুরছেন রাজ্যপাল ডায়াসের পত্নী।

ধৃতি প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ ইন্দিরা তার মুখোমুখি এসে গেলেন।

ধৃতি চিন্তা না করেই হঠাৎ ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করল, ম্যাডাম, আপনি কবিতা গল্প উপন্যাস পড়েন?

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ইন্দিরা বললেন, সময় তো আমার খুব কমই হাতে থাকে। তবু পড়ি। আমি পড়তে ভালোবাসি।

কীরকম লেখা আপনার ভালো লাগে?

একটু ভ্রু কুঁচকে বললেন, হতাশাব্যঞ্জক কিছুই আমার পছন্দ নয়, জীবনের অস্তিবাচক দিক নিয়ে লেখা আমি পছন্দ করি।

মহান ট্র্যাজেডিগুলো আপনার কেমন লাগে?

যা মহান তা তো ভালো বলেই মহান।

আর সুযোগ হল না। আর একজন এসে মৃদু ঠেলায় সরিয়ে দিল ধৃতিকে।

ধৃতি সরে এল।

ইন্দিরা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। থাক করা প্লেট থেকে একটা—দুটো তুলে দিলেন অভ্যাগতদের হাতে। ধৃতি সেই বিরল ভাগ্যবানদের একজন যে ইন্দিরার হাত থেকে প্লেট নিতে পারল। প্লেটটা নিয়েই সে মৃদু স্বরে বলল, ধন্যবাদ ম্যাডাম, আমি আপনার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুন্দরী মহিলা জীবনে দেখিনি। সুন্দরীরা সাধারণত বোকা হয়।

ইন্দিরা তার এই দুঃসাহসিক মন্তব্যে রাগ করলেন না। শুধু মৃদু হেসে বললেন, জীবনে কোনও লক্ষ্য না থাকলে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না।

চমৎকার কথা। ধৃতি মনে মনে মনে কথাটা টুকে রাখল।

রাজভবনের জলখাবার কেমন তা সাংবাদিক হিসেবেই লক্ষ করছিল ধৃতি। খুব যে উঁচুমানের তা নয়। মোটামুটি খেয়ে নেওয়া যায়। খারাপ নয়, এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না। তবে ইন্দিরা গাঁধীও এই খাবার মুখে দিচ্ছেন, এইটুকুই যা বলার কথা।

রমেন একটা প্যাস্ট্রি কামড়ে ধৃতিকে নিচু স্বরে বলল, পি এম—কে আমার হয়ে একটা প্রশ্ন করবেন?

কী প্রশ্ন?

উনি কবিতা পড়েন কি না।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমি অলরেডি অনেক বাচালতা করে ফেলেছি। এবার তুমি করো।

ও বাবা, আমার ভয় করে।

ভয়! ইন্দিরাজিকে ভয়ের কী?

আপনার গাটস আছে, আমার নেই।

গাটস নয়। আমি জানি ইন্দিরাজি সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে। ওঁর একটা দারুণ কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যা পলিটিক্যাল দলবাজিতে মার খায়নি। উনি হিউমার বোঝেন, আর্ট ভালোবাসেন, সৌন্দর্যবোধ আছে, যা পলিটিক্সওয়ালাদের অধিকাংশেরই নেই। এই মানুষকে যদি ভয় পেতে হয় তো পাবে ওঁর প্রতিপক্ষরা, আমরা পাব কেন?

আপনি কি একটু ইন্দিরা—ভক্ত, ধৃতিদা?

আমি তো পলিটিক্স বুঝি না, কিন্তু মানুষ হিসেবে এই মহিলাকে আমার দারুণ ভালো লাগে। তবে তোমার প্রশ্নের জবাবে আমিই বলে দিতে পারি, ইন্দিরাজি কবিতা না ভালোবেসেই পারেন না। ওঁকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পড়ে গেল দুজন। মুখ্যমন্ত্রী রায় সকলকেই বদান্যভাবে স্মিতহাসি বিতরণ করছিলেন। ধৃতির দিকে চেয়ে সেই হাসিমাখা মুখেই বললেন, চা খেয়েই হলঘরে চলে যাবেন, কেমন?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

হলঘরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি গ্যালারির মতো। ডায়াসে পাঁচখানা চেয়ারে উপবিষ্ট ইন্দিরা, রাজ্যপাল ডায়াস ও তাঁর স্ত্রী, সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী।

বুদ্ধিজীবীরা একে একে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। নাম, কী লেখেন বা আঁকেন ইত্যাদি। ইংরিজি বা হিন্দিতে। ধৃতি দ্রুত নোট নিতে নিতেই নিজের পালা এলে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে নিল।

ধৃতি স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। প্রত্যেকেই আড়ষ্ট, নিজেকে আড়াল করতে ব্যস্ত এবং কেউই আজকের আলোচনায় প্রাধান্য চায় না। সবকিছুরই মূলে রয়েছে ইমার্জেন্সি, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যা একটি অভূতপূর্ব জুজুর ভয়। ইউ পি—তে নাসবন্দির কথা শোনা যাচ্ছে, দিল্লিতে বস্তি এবং বসত উচ্ছেদের কথা কানাকানি হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে সংবিধান—বহির্ভূত ক্ষমতার উৎস সঞ্জয় গাঁধী ও তাঁর অত্যুৎসাহী সাঙ্গোপাঙ্গদের কথা। প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীরাও ভীত, বিরক্ত বা উদ্বিগ্ন। সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা ততোধিক। বিরোধী নেতাদের অনেকেই কারাগারে, ঠোঁটকাটা কতিপয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরাও অনুরূপ রাজরোষের শিকার। আর সবকিছুর মূলে যিনি, সেই অখণ্ড কর্তৃত্বময়ী নারী এখন ধৃতির চোখের সামনে ওই বসে আছেন। কিন্তু ধৃতি কিছুতেই মহিলাকে অপছন্দ করতে পারছিল না। একটু অস্বস্তি তারও আছে ঠিকই, কিন্তু এই মহিলার মানবিক আকর্ষণটাও তো কম নয়। এঁকে সে ডাইনি ভাববে কী করে?

প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ হওয়ার পর দু'—চারজন উঠে একে একে ভয়ে ভয়ে দু'—চার কথা বলল। তেমন কোনও প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নয়। কেউ বলল, লেখক ও কবিদের জন্য একটা স্টুডিয়ো করে দেওয়া হোক। কারও প্রস্তাব, সরকার তাদের গ্রন্থ প্রকাশে কিছু সাহায্য করুক। এইরকম সব এলেবেলে কথা।

ইন্দিরা সাধ্যমতো জবাব দিলেন। কিছু জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রীও। তবে কেউ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছল না।

সবশেষে ইন্দিরা দু'—চারটে কথা খুব শান্ত গলায় বললেন। প্রধান কথাটা হল, এখন নিরাশার সময় নয়। নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। শিল্পে বা সাহিত্যেও কিছু দায়বদ্ধতা থাকা উচিত এবং কিছু স্বতঃপ্রণোদিত দায়িত্ববোধও।

সবাই খুশি। তেমন কোনও ওপর—চাপান দেননি ইন্দিরা, শাসন করেননি, ভয় দেখাননি। স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল সবাই। জরুরি অবস্থায় শুধু একটু সামলে লিখতে বা আঁকতে হবে।

ধৃতি জানে, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশেরই কোনও রাজনৈতিক বোধ বা দলগত পক্ষপাতিত্ব নেই। রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতার চাষ তাঁরা বেশিরভাগই করেন না। একমাত্র বামপন্থী লেখক কবি বা শিল্পীরা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় তেমন বেশি নন।

তাছাড়া বামপন্থী বা মার্কসীয় সাহিত্য বাংলায় তেমন সফলও হয়নি। সুতরাং তাঁদের কথা না ধরলেও হয়। বাদবাকিরা রাজনীতিমুক্ত বুদ্ধিজীবী। রাজনীতির দলীয় কোন্দল থেকে তাঁদের বাস বহুদূরে। সেটা ভালো না মন্দ সে বিচার ভিন্ন। তবে এই জরুরি অবস্থার দরুন তাঁরা কেউ আতঙ্কিত নন। কিন্তু অস্বস্তি একটা থাকেই। সেই অস্বস্তি ইন্দিরা আজ কাটিয়ে দিলেন।

অফিসে এসে রিপোর্ট লিখতে ধৃতির ন'টা বেজে গেল। কপিটা নিউজ এডিটরের টেবিলে গিয়ে রেখে সে বলল, শরীরটা ভালো লাগছে না। যাচ্ছি।

শরীর ভালো নেই তো অফিসের গাড়ি নিয়ে যাও। বলে দিচ্ছি।
না, চলে যেতে পারব।
তা হলে সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।
দেখছি। রিপোর্টটা আপনি যতক্ষণ পড়বেন ততক্ষণ অপেক্ষা করব কি?
না, তার দরকার নেই। কিছু অদলবদল দরকার হলে আমিই করে নিতে পারব। সেনসর থেকে আগে ঘুরে আসুক তো।
ধৃতি বেরিয়ে এল। কাউকে সঙ্গে নিল না। রাস্তায় একটা ট্যাকসি পেয়ে গেল ভাগ্যক্রমে। আর ট্যাকসিতে বসেই বুঝতে পারল তার প্রবল জ্বর আসছে। জ্বরের এই লক্ষণ ধৃতি খুব ভালো চেনে। ছাত্রাবস্থা থেকেই হোটেলে মেসে এবং রেস্তোরাঁয় আজেবাজে খেয়ে তার পেটে একটা বায়ুর উপসর্গ দেখা দিয়েছে। যখনই উপসর্গটা দেখা দেয় তখনই তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠে যায় একশো তিন চার ডিগ্রি। এক ডাক্তার বন্ধু একবার বলেছিল, তোর জ্বর হলে পেটের চিকিৎসা করাবি, জ্বর সেরে যাবে।
এ জ্বরটা সেই জ্বর কি না বুঝতে পারছিল না সে। তবে যখন বাসার সামনে এসে নামল তখন সে টলছে এবং চোখে ঘোর দেখছে।
নিতান্তই ইচ্ছাশক্তির জোরে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যেতে চেষ্টা করল। থেমে থেমে, দম নিয়ে নিয়ে। পরমা বাসায় আছে তো! যদি না থাকে তবে একটু বিপাকে পড়তে হবে তাকে।
দোতলা অবধি উঠে তিনতলার সিঁড়িতে পা রেখে রেলিং—এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধৃতি। মাথাটা বড্ড টলমল করছে।
কী হয়েছে আপনার?
ধৃতি আবছা দেখল, একটা মেয়ে, চেনা মুখ। এই ফ্ল্যাটবাড়িরই কোনও ফ্ল্যাটে থাকে। বেশ চেহারাখানা, বুদ্ধির ছাপ আছে।
ধৃতি ঘন এবং গাঢ় শ্বাস ফেলছিল, শরীরটা বাস্তবিকই যে কতটা খারাপ তা এতক্ষণ সে টের পায়নি, এবার পাচ্ছে, তবু মর্যাদা বজায় রাখতে বলল, আমি পারব।
আপনার যে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।
পারব। ও কিছু নয়।
সত্যিই পারবেন? আমার দাদা আর বাবা ঘরে আছে, তাদের ডাকি? ধরে নিয়ে ওপরে দিয়ে আসবে।
ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, পারব, একটু রেস্ট নিয়ে নিই তা হলেই হবে।
তবে আমাদের ফ্ল্যাটে বসে রেস্ট নিন। আমি পরমাদিকে খবর পাঠাচ্ছি।
সহৃদয় পুরুষ এবং সহৃদয়া মহিলার সংখ্যা আজকাল খুব কমে গেছে। আজকাল ফুটপাথে পড়ে—থাকা মানুষের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। দায়িত্ব নিতে সকলেই ভয় পায়। মেয়েটির আন্তরিকতা তাই বেশ লাগছিল ধৃতির। সে রাজি হয়ে গেল।
কিন্তু দু'ধাপ সিঁড়ি নামতে গিয়েই মাথাটা একটা চক্কর দিয়ে ভোম হয়ে গেল। তারপরই চোখের সামনে হলুদ আলোর ফুলঝুরি। ধৃতি একবার হাত বাড়াল শেষ চেষ্টায় কিছু ধরে পতনটা সামলানোর জন্য। কিন্তু বৃথাই। নিজের শরীরের ধমাস করে শানে আছড়ে পড়ার শব্দটা শুনতে পেল ধৃতি। তারপর আর জ্ঞান রইল না।
যখন চোখ চাইল তখন পরমা তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। মুখে উদ্বেগ।
ধৃতি চোখ মেলতেই পরমা মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে? একটু ভালো?
ধৃতি পূর্বাপর ঘটনাটা মনে করতে পারল না। শুধু মনে পড়ল, সিঁড়ির ধাপে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। শরীরটা আগে থেকেই দুর্বল লাগছিল তার। শরীরে জ্বর। কিন্তু এই জ্বর তার হয় পেটের গোলমাল থেকে। দীর্ঘকাল মেসে হোটেলে খেয়ে তার একটা বিশ্রী রকমের অম্বলের অসুখ হয়। এখনও পুরোপুরি সারেনি।

সেই চোরা অম্বল থেকে পেটে গ্যাস জমে মাঝে মাঝে জ্বর হয় তার। আর এই অবস্থায় শরীর তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে।

ধৃতি পরমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, খুব ভয় পেয়ে গেছ, না?

ভয় হবে না! কীভাবে পড়ে গিয়েছিলেন! ওরা সব ধরাধরি করে যখন নিয়ে এল তখন তো আমি সেই দৃশ্য দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার এসে বলে গেল, তেমন ভয়ের কিছু নেই।

ধৃতি একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, ভয় পেয়ো না। এরকম জ্বর আমার মাঝে মাঝে হয়।

জ্বর হতেই পারে। কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন কেন?

ধৃতি ফের একটু মুখ টিপে হেসে বলল, ওই মেয়েটাকে দেখেই বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

যাঃ! ইয়ারকি হচ্ছে?

কেন, মেয়েটা সুন্দর নয়?

সুন্দর নয় তো বলিনি। তবে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো নয় মোটেই। পৃথাকে আপনি বহুবার দেখেছেন।

ধৃতির আর ইয়ারকি দেওয়ার মতো অবস্থা নয়। সে ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

শুনছেন? ডাক্তার আপনাকে গরম দুধ—বার্লি খাইয়ে দিতে বলে গেছেন।

দুধ—বার্লি আমি জীবনে খাইনি। ওয়াক।

অসুখ হলে লোকে তবে কী খায়?

ও আমি পারব না।

না খেলে দুর্বল লাগবে না?

পি এম—এর পার্টিতে খেয়েছি। খিদে নেই।

কী খাওয়াল ওখানে?

অনেক কিছু।

পি এম—কে দেখলেন?

দেখলাম।

আপনি ভাগ্যবান। আমাকে দেখালেন না তো? আচ্ছা আপনি ঘুমোন। একটু বাদে তুলে খাওয়াব।

ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে আর ডেকো না পরমা। একটানা কিছুক্ষণ ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাই কি হয়? খেতে হবে।

হবেই?

না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বেন।

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, ওরা আমাকে চ্যাংদোলা করে ওপরে এনেছিল, না?

প্রায় সেইরকম? কেন বলুন তো!

আমিও বুঝতে পারছি না হঠাৎ একটা সুন্দর মেয়ের সামনে গাড়লের মতো আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম কেন। বিশেষ করে মেয়েটা যখন ওদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে।

পরমা সামান্য হেসে বলে, অজ্ঞান কি কেউ ইচ্ছে করে হয়?

ইচ্ছাশক্তিও এক মস্ত শক্তি। ইচ্ছাশক্তি খাটাতে পারলে আমি কিছুতেই অজ্ঞান হতাম না।

এটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন? কেউ তো আর কিছু বলেনি!

বলার দরকারও নেই। আমি শুধু ভাবছি আমার ইচ্ছাশক্তি এত কম কেন।

মোটেই কম নয়। আজ আপনার খুব ধকল গেছে। সেইজন্য।

ধৃতি একটু গুম হয়ে থেকে বলে, আচ্ছা কী খাওয়াবে খাইয়ে দাও। শোনো তোমাদের রাত্রে রুটি হয়নি?

হচ্ছে।

তাই দু'খানা নিয়ে এসো। সঙ্গে ডাল—ফাল যা হোক কিছু।

শঙ্কিত গলায় পরমা বলে, রুটি খেলে খারাপ হবে না তো?
আরে না। বার্লি—ফার্লি আমি কখনও খাই না। দুধও চুমুক দিয়ে খেতে পারি না। রুটিই আনো।
পরমা উঠে গেল।
ধৃতি চেয়ে রইল সিলিং—এর দিকে। বড় আলো নেভানো। ঘরে একটা কমজোরি বালবের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে মাত্র। ধৃতি চেয়ে রইল। স্মরণকালের মধ্যে সে কখনও অজ্ঞান হয়নি। শরীর শত খারাপ হলেও না। তবে আজ তার এটা কী হল? ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হচ্ছে না তো তার? জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে না তো?
নিজেকে নিয়ে ধৃতির চিন্তার শেষ নেই।
পরমা রুটি নিয়ে এল। দু'খানার বদলে ছ'খানা। ডাল, তরকারি, আলুভাজা, মাংস অবধি।
ও বাবা, এ যে ভোজের আয়োজন।
রুটিতে ঘি মাখিয়ে দিয়েছি।
বেশ করেছ। আমার বারোটা তুমিই বাজাবে।
ওমা, আমি বারোটা বাজাব কী করে?
জ্বোরো রুগিকে কেউ ঘি খাওয়ায়?
রুটি শুকনো কেউ খায়?
ধৃতি একটু হাসল। পরমাকে বুঝিয়ে কিছু লাভ নেই। গ্রে ম্যাটার ওর মাথায় খুবই কম। তবে পরমা মেয়েটা বড় ভালো মানুষ। ধৃতি তাই খেতে শুরু করে দিল। কিন্তু বিস্বাদ মুখে তেমন কিছুই খেয়ে উঠতে পারল না। পরমার অনেক তাগিদ সত্ত্বেও না।
ওষুধ খেয়ে সে ক্লান্তিতে চোখ বুজল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু জ্বর—যন্ত্রণায় কাতর শরীরে নিপাট নিশ্ছিদ্র ঘুম হয় না। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘুমের চটকা ভেঙে চোখ চেয়েই সে পিপাসায় 'ওঃ' বলে শব্দ করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন কাছে এল। একটা সুন্দর গন্ধ পেল ধৃতি। ঘুমজড়ানো চোখে অবাক হয়ে দেখল, পরমা।
তুমি! তুমি জেগে আছ কেন?
ওমা! আপনার এত জ্বর আর আমি পড়ে পড়ে ঘুমোব?
ধৃতি ম্লান একটু হেসে বলে, বন্ধুপত্নী, তুমি বড়ই সরলা।
সরলা! হোয়াট ডু ইউ মিন? বোকা নয় তো!
বোকা ছাড়া আর কী বলা যায় বলো তো তোমাকে! একেই তো পর—পুরুষের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে বসবাস করছ। তার ওপর আবার এক ঘরে এবং এত রাতে!
তাতে কী হয়েছে বলুন তো!
এখনও কিছু হয়নি বটে, তবে হতে কতক্ষণ! কথাটা বাইরে জানাজানি হলে যা একখানা নিন্দে হবে দেখো।
ঠোঁট উলটে পরমা বলে, হোক গে। তা বলে একশো চার জ্বরের একজন রুগিকে একা ঘরে ফেলে রাখতে পারব না।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, একটু জল দাও।
পরমা জল দেয় এবং ধৃতি শোয়ার পর তার কপালে জলে ভেজা ঠান্ডা করতলটি রেখে নরম স্বরে বলে, ঘুমোন, আমি আরও কিছুক্ষণ আপনার কাছে থাকব।
থাকার দরকার নেই। এবার গিয়ে ঘুমোও।
জ্বরটা আর একটু কমুক। তারপর যাব।
এত ভাবছ কেন বলো তো!
কী জানি কেন, তবে কারও অসুখ করলে আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। আপনাকে তো দেখার কেউ নেই।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ক্বচিৎ কদাচিৎ তারও এ কথাটা মনে হয়। তার বাস্তবিকই কেউ নেই। দাদা দিদি এরা থেকেও অনাত্মীয়। তবে বয়সের গুণে এবং কাজকর্মের মধ্যে থাকার দরুন আত্মীয়হীনতা তাকে তেমন উদ্বিগ্ন করে না। বরং কেউ না থাকায় সে অনেকটাই স্বাধীন। তবু এইরকম অসুখ—বিসুখের সময় বা হঠাৎ ডিপ্রেশন এলে একাকিত্বটা সে বড় টের পায়।

পরমা কপালে একটা জলপটি লাগাল। বলল, মাথাটা একটু ধুয়ে দিতে পারলে হত।

এত রাতে আর ঝামেলায় যেয়ো না। আমি অনেকটা ভালো ফিল করছি।

একশো চার জ্বরে কেমন ভালো ফিল করে লোকে তা জানি।

তুমি সত্যিই জেগে থাকবে নাকি?

থাকব তো বলেছি।

ধৃতি পরমার দিকে তাকাল। আবছা আলোয় এক অদ্ভুত রহস্যময় সৌন্দর্য ভর করেছে পরমার শরীরে। এলো চুলে ঘেরা মুখখানা যে কী অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু ধৃতি পরমার প্রতি কখনওই কোনও শারীরিক আকর্ষণ বোধ করেনি। আজও করল না। কিন্তু মেয়েটার প্রতি সে এক অদ্ভুত ব্যাখ্যাতীত মায়া আর ভালোবাসা টের পাচ্ছিল। জ্বরতপ্ত দু'খানা হাতে পরমার হাতখানা নিজের কপালে চেপে ধরে ধৃতি বলল, তোমার মনটা যেন চিরকাল এরকমই থাকে পরমা। তুমি বড় ভালো।

হঠাৎ পরমার মুখখানা তার মুখের খুব কাছাকাছি সরে এল।

গাঢ়স্বরে পরমা বলল, আর কমপ্লিমেন্ট দিতে হবে না। এখন ঘুমোন।

ধৃতি ঘুমোল। এক ঘুমে ভোর।

জ্বরটা ছাড়লেও দিন দুই বেরোতে পারেনি ধৃতি। তিনদিনের দিন অফিসে গেল।

ফোনটা এল চারটে নাগাদ।

এ ক'দিন অফিসে আসেননি কেন? আমি রোজ আপনাকে ফোন করেছি।

ধৃতি একটু শিহরিত হল গলাটা শুনে। বলল, আমার জ্বর ছিল।

আপনার গলার স্বরটা একটু উইক শোনাচ্ছে বটে। যাই হোক, সেদিন পি এম—এর সঙ্গে আপনার ইন্টারভিউয়ের রিপোর্ট কাগজে পড়েছি। বেশ লিখেছেন। কিন্তু আপনারা কেউই পি এম—কে তেমন অস্বস্তিতে ফেলতে পারেননি।

পি এম অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাঁকে রংফুটে ফেলা কি সহজ?

তা বটে।

আপনি এখনও এলাহাবাদে ফিরে যাননি?

না। রোজই যাব যাব করি। কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে যায়। আবার ভাবি, গিয়েই বা কী হবে। টুপু নেই, ফাঁকা বাড়িতে একা একা সময়ও কাটে না ওখানে।

এখানে কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন?

এখানে! ও বাবাঃ, কলকাতায় কি সময় কাটানোর অসুবিধে? ছবির একজিবিশনে যাই, ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনি, থিয়েটার দেখি, মাঝে মাঝে সিনেমাতেও যাই, আর ঘুরে বেড়ানো বা মার্কেটিং তো আছেই।

হ্যাঁ, কলকাতা বেশ ইন্টারেস্টিং শহর।

আপনারও কি কলকাতা ভালো লাগে?

লাগে বোধহয়, ঠিক বুঝতে পারি না।

বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

আমার! আমার প্রায় কেউই নেই। এক বন্ধুর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট থাকি।

ওমা। বলেননি তো কখনও?

এটা বলার মতো কোনও খবর তো নয়।

আপনার মা বাবা নেই?
না।
ভাই বোন?
আছে, তবে না থাকার মতোই।
আপনি তা হলে খুব একা?
হ্যাঁ।
ঠিক আমার মতোই।
আপনার একাকিত্ব অন্যরকম। আমার অন্যরকম।
আচ্ছা, একটা প্রস্তাব দিলে কি রাগ করবেন?
রাগ করব কেন?
আমাদের বাড়িতে আজ বা কাল একবার আসুন না!
কী হবে এসে? টুপুর ব্যাপারে আমি তো কিছু করতে পারিনি।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা বললেন, কারওরই কিছু করার নেই বোধহয়। কিন্তু তাতে কী? আমি আপনার একটু সঙ্গ চাই। রাজি হবেন না?
না, রাজি হতে বাধা নেই। আচ্ছা যাব'খন।
ওরকম ভাসা—ভাসা বলা মানেই এড়িয়ে যাওয়া। আপনি কাল বিকেলে আসুন। আমি অপেক্ষা করব।
কখন?
চারটে।
বিকেলে যে আমার অফিস।
কখন ছুটি হয় আপনার?
রাত ন'টা।
তা হলে সকালে আসুন। এখানেই দুপুরে খেয়ে অফিসে যাবেন।
ধৃতি হেসে ফেলে বলে, চাক্ষুষ পরিচয়ের আগেই একেবারে ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করে ফেলছেন! আমি কেমন লোক তাও তো জানেন না।
ওপাশে একটু হাসি শোনা গেল। টুপুর মা একটা বেশ তরল স্বরেই বলল, বরং বলুন না যে, আমি আপনার অচেনা বলেই ভয়টা বরং আপনার।
ধৃতি বলে, আমি ভবঘুরে লোক, আত্মীয়হীন, আমার বিশেষ ভয়ের কিছু নেই। পুরুষদের বেলায় বিপদ কম। মহিলাদের কথা আলাদা।
আপনার কিছুই তেমন জানি না বটে, চাক্ষুষও দেখিনি, কিন্তু পত্র—পত্রিকায় আপনার ফিচার পড়ে জানি যে আপনি খুব সৎ মানুষ।
ফিচার পড়ে? বাঃ, ফিচার থেকে কিছু বুঝি বোঝা যায়?
যায়। আপনি না বুঝলেও আমি বুঝি। ভুল আমার কমই হয়। আরও একটা কথা বলি। আপনার মতোই আমিও কিন্তু একা। আমার কেউ নেই বলতে গেলে। একা থাকি বলেই আমার নিরাপত্তার ভার আমাকেই নিতে হয়েছে। সামান্য কারণে অহেতুক ভয় বা সংকোচ করলে আমার চলে না। এবার বলুন আসবেন?
ঠিক আছে, যাব।
সকালেই তো?
খুব সকালে নয়। এগারোটা নাগাদ।
ঠিক আছে। ঠিকানাটা বলছি, টুকে নিন।

ঠিকানা নিয়ে ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পর ধৃতি ভাবতে লাগল কাজটা ঠিক হল কি না, না, ঠিক হল না। তবে এই ভদ্রমহিলা আড়াল থেকে তাকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে আসছেন কিছুদিন হল। টুপু নামে এক ছায়াময়ীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক পরোক্ষ রহস্য। হয়তো মুখোমুখি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হলে সেই রহস্যের কুয়াশা খানিকটা কাটবে। তাই ধৃতি এই ঝুঁকিটুকু নিল। বিপদে যদি বা পড়ে তার তেমন ভয়ের কিছু নেই। বিপদ তেমন আছে বলেও মনে হচ্ছে না তার।

একটু অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়ে দিনটা কাটল ধৃতির। পত্রিকায় ফিচার লিখলে প্রচুর চিঠি আসে। ধৃতিরও এসেছে। মোট সাতখানা। সেগুলো অন্যদিন যেমন আগ্রহ নিয়ে পড়ে ধৃতি, আজ সেরকম আগ্রহ ছিল না। কয়েকটা খবর লিখল, আড্ডা মারল, চা খেল বারকয়েক, সবই অন্যমনস্কতার মধ্যে। শরীরটাও দুর্বল।

একটু আগেভাগেই অফিস থেকে বেরিয়ে এল ধৃতি। সাড়ে আটটায় ঘরে ফিরে এসে দেখে, পরমা দারুণ সেজে ডাইনিং টেবিলে খাবার গোছাচ্ছে।

কী পরমা? তোমার পতিদেবটি ফিরেছে নাকি?

না তো! হঠাৎ কী দেখে মনে হল?

তোমার সাজ আর ব্যস্ততা দেখে।

খুব ডিটেকশন শিখেছেন।

তবে আজ এত সাজের কী হল?

বাঃ, সাজটাই বা কী করেছি! মুগার শাড়িটা অনেককাল পরি না, একটু পরেছি, তাই আবার একজনের চোখ কটকট করছে।

আহা, অত ঝলমলে জিনিস চোখে একটু লাগবেই। ব্যাপারটা একটু খুলে বললেই তো হয়। কেসটা কী?

পরমা খোঁপার মাথাটা ঠিক করতে করতে বলল, ফ্ল্যাটবাড়ি হল একটা কমিউনিটি, জানেন তো!

জানব না কেন, বুদ্ধু নাকি? ছ'মাস আগেই কলকাতার এই ফ্ল্যাটবাড়ির নিয়ো কমিউনিটি নিয়ে ফিচার লিখেছিলাম।

জানি। পড়েওছি। ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতে গেলে সকলের সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে চলতে হয়। আজ দোতলায় দোলাদের ফ্ল্যাটে চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। ওদের মেয়ের জন্মদিন।

খুব খাওয়াল?

প্রচুর। মুরগি, গলদা, ভেটকি ফ্রাই, ফিশ রোল, লুচি, ফ্রায়েড রাইস, পায়েস.....

রোখকে ভাই। তুমি ক্যালোরি হিসেব করে খাও না নাকি?

তার মানে?

ওরকম গান্ডেপিন্ডে খেলে যে দু'দিনেই হাতির মতো হয়ে যাবে।

আহা, আমার ফিগার নিয়ে ভেবে ভেবে তো চোখে ঘুম নেই! আমি অত বোকা নই মশাই, একখানা মুরগির ঠ্যাং দু'ঘণ্টা ধরে চিবিয়ে এসেছি মাত্র।

রোল খাওনি?

আধখানা।

গলদা ছেড়ে দিলে? চল্লিশ টাকা কিলো যাচ্ছে।

ওই একটু।

দইটা কেমন ছিল?

দই! না, দই করেনি তো। আইসক্রিম।

কেমন ছিল?

বাঃ, আইসক্রিম আবার কেমন হবে? ভালোই।

মিষ্টির আইটেম করেনি তা হলে! ছ্যাঁচড়া আছে।

মোটেই না। তিনরকম সন্দেশ ছিল মশাই।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, না! তোমার ফিগার কিছুতেই রাখতে পারবে না পরমা। এত যে কেন খাও!

নজর দেবেন না বলছি।

দিচ্ছি না। কেউ আর দেবেও না।

খুব হয়েছে। দোলা আপনার জন্যও চর্বচোষ্য পাঠিয়েছে। এতক্ষণ ঘরে সেগুলো নিচু আঁচে রেখে বসে আছি। দয়া করে এবার গিলুন।

আমার জন্য! আমার জন্য পাঠাবে কেন? তারা কি আমাকে চেনে?

এমনিতে চেনে না। তবে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দহরম—মহরম আছে মনে করে হঠাৎ চিনতে শুরু করেছে। যান তো, তাড়াতাড়ি হাত—মুখ ধুয়ে আসুন।

ধৃতি হাত—মুখ ধুয়ে এল বটে, কিন্তু মুখে এক বিচ্ছিরি অরুচি জ্বরের পর থেকেই তার খাওয়ার আনন্দকে মাটি করে দিয়েছে। টেবিলে বসে বিপুল আয়োজনের দিকে চেয়ে সে শিউরে উঠে বলল, এক কাজ করো পরমা, মুরগি আর লুচি বাদে সব সরিয়ে নাও। ফ্রিজে রেখে দাও, পরে খাওয়া যাবে।

অরুচি হচ্ছে, না?

ভীষণ। খাবার দেখলেই এলার্জি হয় যেন।

কী করি বলুন তো আপনাকে নিয়ে!

আমাকে নিয়ে তোমার অনেক জ্বালা আছে ভবিষ্যতে। বুঝবে।

এখনই কি বুঝছি না নাকি?

বলে পরমা সযত্নে তাকে খাবার বেড়ে দিল। একটা বাটিতে খানিকটা চাটনি দিয়ে বলল, এটা মুখে দিয়ে দিয়ে খাবেন, রুচি হবে।

খেতে খেতে ধৃতি বলল, একটা মুশকিল হয়েছে পরমা।

কী মুশকিল?

টুপুর মা নেমন্তন্ন করেছে কাল।

কে টুপুর মা?

ওই যে সেদিন সুন্দর মেয়েটার ফোটো দেখলে, মনে নেই?

ওঃ, তা সে তো মরে গেছে।

বটেই তো, কিন্তু তার মা তো মরেনি!

নেমন্তন্নটা কীসের?

বোধহয় একটু আলাপ করতে চান।

আলাপও নেই?

নাঃ, শুধু ফোনে কথা হত।

কী বলতে চায় মহিলা?

তা কী করে বলব? হয়তো টুপুর কথা।

বেচারা।

যাব কি না ভাবছি।

যাবেন না কেন?

একটু ভয়—ভয় করছে। অচেনা বাড়ি, অচেনা ফ্যামিলি...

তাতে কী, আলাপ হলেই অচেনা কেটে গিয়ে চেনা হয়ে যাবে। আপনি অত ভিতু কেন?

আমি খুব ভিতু বুঝি?

ভিতু নন? আমার সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকতে হচ্ছে বলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন।

ধৃতি চোখদুটো একটু বুজে রেখে খুব নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, তোমার কোচটি কে বলো তো!

কোচ! কীসের কোচ?

তোমাকে এইসব আধুনিক কথাবার্তার ট্রেনিং দিচ্ছে কে?

কেন? আমার বুঝি কথা আসে না?

খুব আসে, হাড়ে—হাড়ে আসে, কিন্তু ভাই বন্ধুপত্নী, তুমি তো এত প্রগতিশীলা ছিলে না এতদিন!

হচ্ছি। আপনার পাল্লায় পড়ে। সে যাক গে, সব সময়ে অত ইয়ারকি ভালো নয়। ভদ্রমহিলা ডাকল কেন সেটা ভেবে দেখা ভালো।

আমি বলি কী পরমা, মেয়েছেলের কেস যখন তুমিও সঙ্গে চলো।

আমি! ওমা, আমাকে তো নেমন্তন্ন করেনি!

গুলি মারো নেমন্তন্ন।

তা হলে কী বলে গিয়ে দাঁড়াব? একটা কিছু পরিচয় তো চাই।

বউ বলেই চালিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি যে ব্যাচেলার তা ভদ্রমহিলা জানেন।

ইস, ওঁর বউ সাজতে বয়ে গেছে!

একটা কাজ করা যাক পরমা, গিয়ে দুজনে আগে হাজির হই। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

পরমা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, ইচ্ছে করছে না এমন নয়। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এত উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। গিয়ে দেখেই আসুন না।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, তাই হবে। বোধহয় তুমি ঠিকই বলছ।

পরমা কিছুক্ষণ ধৃতির দিকে চেয়ে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, রাত হয়েছে। রোগা শরীরে আর জেগে থাকতে হবে না। শুয়ে পড়ুন গে। শুয়ে শুয়ে ভাবুন।

ধৃতি উঠল।

৮

এত নিরস্ত্র এবং এত অসহায় ধৃতি এর আগে কদাচিৎ বোধ করেছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার কোনও অকারণ দুর্বলতা বা ভয়—ভীতি নেই। কিন্তু এই এলাহাবাদি ভদ্রমহিলা সম্পর্কে একটা রহস্যময়তার বোধ জমেছে ধৃতির। মহিলার কথাবার্তায় উলটোপালটা ব্যাপার আছে, মানসিক ভারসাম্যও হয়তো নেই। একটু যেন বেশি গায়ে—পড়া। তাছাড়া এলাহাবাদের ট্রাঙ্ককল, চিঠিতে পোস্ট অফিসের ছাপ এবং টুপুর ছবি এর সব ক'টাই সন্দেহজনক। কাজেই ভদ্রমহিলার মুখোমুখি হতে আজ ধৃতির খুব কিন্তু—কিন্তু লাগছিল।

সকালে ধৃতি চা খেল তিন কাপ।

পরমা বলল, চায়ের কেজি কত তা মশাইয়ের জানা আছে?

কেন, চা—টা তো সেদিন আমিই কিনে আনলাম। লপচুর হাফ কেজি।

ও, আপনার পয়সায় কেনাটা বুঝি কেনা নয়?

মাইরি, তুমি জ্বালাতেও পারো।

আর শুধু চা কিনলেই তো হবে না। দুধ চিনি এসবও লাগে।

পরেরবার চিনি দুধ ছাড়াই দিয়ো।

আর দিচ্ছিই না। চিনি দুধ লিকার কোনওটাই পাচ্ছেন না আপনি।

আজ নার্ভ শক্ত রাখতে হবে পরমা। আজ এক রহস্যময়ীর সঙ্গে রহস্যময় সাক্ষাৎকার।

আহা, রহস্যের রস তো খুব। মাঝবয়সি আধপাগল এক মহিলা, তার আবার রহস্য কীসের? খুব যে রহস্যের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে।

স্বপ্ন নয় হে, স্বপ্ন হলে তো বাঁচতাম। কী কুক্ষণেই যে নেমন্তন্নটা অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম!

আবার ফোন করন না, নেমন্তন্ন ক্যানসেল করে দিন। ভিতুর ডিমদের এইসব কাজ করতে যাওয়াই ঠিক নয়। এখন দয়া করে আসুন, রোগা শরীরে খালিপেটে চা না গিলে একটু খাবার খেয়ে উদ্ধার করুন।

তোমার ব্রেকফাস্টের মেনু কী?

লুচি আর আলুভাজা।

কুকিং মিডিয়াম কি বনস্পতি নাকি?

কেন? গাওয়া ঘি চাই নাকি? গরিবের বাড়ি এটা, মনে থাকে না কেন? এখনও ফ্ল্যাটের দাম শোধ হয়নি।

ধৃতি ওঠার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ছেলেবেলায় কখনও এই অখাদ্যটা কারও বাড়িতে তেমন ঢুকতে দেখিনি। বনস্পতি হল পোস্ট—পার্টিশন বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সিনেমা। কে ওটা আবিষ্কার করেছে জানো?

না। গরিবের কোনও বন্ধু হবে।

তার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।

আর বনস্পতির নিন্দে করতে হবে না। আমাদের পেটে সব সয়।

ছাই সয়। সাক্ষাৎ বিষ।

আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। রুগি মানুষকে বনস্পতি খাওয়াব আমি তেমন আহাম্মক নই। ময়দায় ঘিয়ের ময়েন দিয়ে বাদাম তেলে ভাজা হচ্ছে। ভয় নেই, আসুন।

ধৃতি বিরস মুখে বলে, এর চেয়ে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট ভালো ছিল পরমা। টোস্ট, ডিম, কফি।

কাল থেকে তাই হবে। খাটুনিও কম।

ধৃতি উঠল, খেল। তারপর দাড়ি—টাড়ি কামিয়ে স্নান করে প্রস্তুত হতে লাগল।

পরমা হঠাৎ উড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, কী ড্রেস পরে যাচ্ছেন দেখি! এ মা! ওই সাদা শার্ট আর ভুসকো প্যান্ট! আপনার রুচি—টুচি সব যাচ্ছে কোথায় বলুন তো!

কেন, এই তো বেশ। তা হলে কী পরব?

সেই নেভি ব্লু প্যান্টটা কোথায়?

আছে।

আর মাল্টি কালার স্ট্রাইপ শার্ট?

আছে বোধহয়।

ওই দুটো পরে যান।

অগত্যা ধৃতি তাই পরল। পরমা দেখে—টেখে বলল, মন্দ দেখাচ্ছে না। রুগণ ভাবটা আর চোখে পড়বে না বোধহয়।

ধৃতির পোশাকের দিকে মন ছিল না। মনে উদবেগ, অস্বস্তি। রওনা হওয়ার সময় পরমা দরজার কাছে এসে বলল, অফিসে গিয়ে একবার ফোন করবেন। লালিদের ফ্ল্যাটে আমি ফোনের জন্য অপেক্ষা করব।

কেন পরমা, ফোন করব কেন?

একটু অ্যাংজাইটি হচ্ছে।

এই যে এতক্ষণ আমাকে সাহস দিচ্ছিলে!

ভয়ের কিছু নেই জানি, কিন্তু আপনার ভয় দেখে ভয় হচ্ছে। করবেন তো ফোন? তিনটে পনেরো মিনিটে।

আচ্ছা। তা হলে আমার জন্য তুমি ভাবো?

যা নাবালক! ভাবতে হয়।

ধৃতি একটু হালকা মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

টুপুর মায়ের ঠিকানা খুব জটিল নয়। বড়লোকদের পাড়ায় বাস। সুতরাং খুঁজতে অসুবিধে হল না।

ট্যাকসি থেকে নেমে ধৃতি কিছুক্ষণ হাঁ করে বাড়িটা দেখল। বিশাল এবং পুরনো বাড়ি। জরার চিহ্ন থাকলেও জীর্ণ নয় মোটেই। সামনেই বিশাল ফটক। ফটকের ওপাশ থেকেই অন্তত দশ গজ চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে উঁচু প্রকাণ্ড বারান্দায়। বারান্দায় মস্ত গোলাকার থামের বাহার। তিনতলা বাড়ি, কিন্তু এখনকার পাঁচতলাকেও উচ্চতায় ছাড়িয়ে বসে আছে।

ফটকে প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা এক দারোয়ান মোতায়েন দেখে ধৃতি আরও ঘাবড়ে গেল।

দারোয়ান ধৃতিকে ট্যাকসি থেকে নামতে দেখেছে। উপরন্তু ওর পোশাক—আশাক এবং চেহারাটা বোধহয় দারোয়ানের খুব খারাপ লাগল না। ধৃতি সামনে যেতেই টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম গোছের ভঙ্গি করে ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করল, কাকে চাইছেন?

টুপুর মা। মানে—

দারোয়ান গেটটা হড়াস করে খুলে দিয়ে বলল, যান।

ধৃতি অবাক হল। যাবে, কিন্তু কোথায় যাবে? বাড়িটা দেখে তো মনে হচ্ছে সাতমহলা। এর কোন মহল্লায় কে থাকে তা কে জানে?

ধৃতি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। তার কেমন যেন এই দুপুরেও গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে খুব তীক্ষ্ন নজরে কেউ তাকে লক্ষ করছে।

বারান্দায় পা দিয়ে ধৃতি দেখল, একখানা হলঘরের মতো প্রকাণ্ড জায়গা। সবটাই মার্বেলের মেঝে। বারান্দার তিনদিকেই প্রকাণ্ড তিনটে কাঠের ভারী পাল্লার দরজা। দু'পাশের দরজা বন্ধ, শুধু সামনেরটা খোলা।

ধৃতি পায়ে পায়ে এগোল।

দরজার মুখে দ্বিধান্বিত ধৃতি দাঁড়িয়ে পড়ল। এরকম পুরনো জমিদারি কায়দার বাড়ি ধৃতি দূর থেকে দেখেছে অনেক, তবে কখনও ভিতরে ঢোকার সুযোগ হয়নি। এইসব বাড়িতেই কি একদা ঝাড়—লণ্ঠনের নীচে বাইজি নাচত আর উঠত ঝনাঝন মোহরের প্যালা ফেলার শব্দ? এইসব বাড়িরই অন্দরমহলে কি গভীর রাত অবধি স্বামীর প্রতীক্ষায় জেগে থেকে অবিরল অশ্রুমোচন করত অন্তঃপুরিকারা? চাষির গ্রাস কেড়ে নিয়েই কি একদা গড়ে ওঠেনি এইসব ইমারত? এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি ঢুকে আছে পাপ আর অভিশাপ?

বাইরের ঘরটা বিশাল। এতই বিশাল যে তাতে একটা বাস্কেটবলের কোর্ট বসানো যায়। সিলিং প্রায় দোতলার সমান উঁচুতে। কিন্তু আসবাব তেমন কিছু নেই। কয়েকটা পুরনো প্রকাণ্ড কাঠের আলমারি দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো। ঘরের মাঝখানে একটা নিচু তক্তপোশে সাদা চাদর পাতা, কয়েকটা কাঠের চেয়ার, মেঝেয় ফাটল, দাগ। দেয়ালে অনেক জায়গায় মেরামতির তাপ্পি। তবু বোঝা যায়, এ বাড়ির সুদিন অতীত হলেও একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়নি।

ধৃতি কড়া নাড়ল না বা কাউকে ডাকার চেষ্টা করল না। কারণ ধারে—কাছে কেউ নেই। ঘরটা ফাঁকা। ছাদের কাছ বরাবর কড়ি—বরগায় পায়রারা বকবক করছে। কিন্তু ধৃতির মনে হচ্ছিল, ঘর ফাঁকা হলেও কেউ কোনও এক রন্ধ্র—পথে বা ঘুলঘুলি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাকে ঠিকই লক্ষ করছে। এমন মনে করার কারণ নেই, অনুভূতি বলে একটা জিনিস তো আছেই।

ধৃতি সাহসী নয়, আবার খুব ভিতুও নয়। মাঝামাঝি। তার বুক একটু দুরুদুরু করছিল ঠিকই, তবে সেটা অনিশ্চিত এবং অপরিচিত পরিবেশ বলে। কয়েক বছর আগে এক বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বের করতে গিয়ে সে একটা ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। সেই বাড়ির এক সন্দিগ্ধ ও খিটকেলে বুড়ো তাকে বাইরের ঘরে ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রেখে বিস্তর জেরা করে এবং নানাবিধ প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়। ধৃতি সেই থেকে অচেনা বাড়িতে ঢুকতে একটু অস্তস্তি বোধ করে আসছে।

প্রায় মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। যাতায়াতকারী কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায়। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। কিন্তু ধৃতি একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ক্ষীণ হলেও নির্ভুল শব্দ।

কাছেপিঠে কোথাও, হলঘরের আশেপাশের কোনও ঘরে কারা যেন টেবিল টেনিস খেলছে।

বুকপকেটের আইডেনটিটি কার্ডখানা বের করে একবার দেখে নেয় ধৃতি। সে এক মস্ত খবরের কাগজের সাব—এডিটর। এই পরিচয়—পত্রখানা যে কোনও প্রতিকূল পরিবেশে কাজে লাগে। রেলের রিজার্ভেশনে, থানায়, বাইরের রিপোর্টিং—এ। এ বাড়িতে কেউ তার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ তুললে কাজে লাগাতে পারে।

ধৃতি ভিতরে ঢুকল এবং শব্দটির অনুসরণ করে বাঁদিকে এগোল। হলঘরের পাশের ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং লম্বাটে। সবুজ বোর্ডের দু'পাশে একটি কিশোর ও একটি কিশোরী অখণ্ড মনোযোগে টেবিল—টেনিস খেলছে। মেয়েটির পরনে লাল শার্ট এবং জিনসের শর্টস। ছেলেটির পরনেও জিনসের শর্টস, গায়ে হলুদ টি—শার্ট। দুজনেরই নীল কেডস। মেয়েটির চুল স্টেপিং করে কাটা। ছেলেটির চুল লম্বা। দুজনের বয়সই পনেরো—ষোলোর মধ্যে।

ধৃতি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল।

তাকে প্রথম লক্ষ করল মেয়েটিই। একটা মারের পর বল কুড়িয়ে সোজা হয়েই থমকে গেল। তারপর রিনরিনে মিষ্টি গলায় বলল, হুম ডু—ইয়া ওয়ান্ট?

কলকাতার ইংলিশ মিডিয়ামে শেখা হেঁচকি তোলা ইংরিজি নয়। রীতিমতো মার্কিন অ্যাকসেন্ট।

ধৃতি একটু মৃদু হেসে পরীক্ষামূলকভাবে বাংলায় বলল, টুপুর মা আছেন?

মেয়েটা ছেলেটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঠোঁট উলটে বলল, আছে বোধহয়। দোতলায়। পিছন দিকে সিঁড়ি আছে। গিয়ে দেখুন।

ধৃতি তবু দ্বিধার সঙ্গে বলল, ভিতরে কি খবর না দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে?

মেয়েটি সার্ভ করার জন্য হাতের স্থির তোলায় বলটা রেখে বাঘিনীর মতো খাপ পেতে শরীরটাকে ছিলা—ছেঁড়া ধনুকের মতো ছেড়ে দেওয়ার জন্য তৈরি ছিল। সেই অবস্থাতেই ধৃতির দিকে একঝলক দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল, উড শি মাইন্ড? নো প্রবলেম। শি ইজ আ বিট গা—গা। গো অ্যাহেড। আপস্টেয়ার্স, ফাস্ট রাইট হ্যান্ড রুম। নোবডি উইল মাইন্ড। নান মাইন্ডস হিয়ার। নান হ্যাজ এনিথিং লাইক মাইন্ড।

ধৃতি একসঙ্গে মেয়েটির মুখে এত কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। এত কথার মানেই হয় না। তার মনে হল, এরা দুটি ভাইবোন কোনও সমৃদ্ধ দেশে, হয়তো আমেরিকায় থাকে। এ দেশে এসেছে ছুটি কাটাতে এবং সময়টা খুব ভালো কাটাচ্ছে না। নিজেদের বাড়ি কি এটা ওদের? হলে বলতে হবে, নিজেদের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে ওরা মোটেই খুশি নয়। সেই বিরক্তিটাই তার কাছে প্রকাশ করল।

বেশ খোলা হাতে টপ স্পিন সার্ভ করল মেয়েটি। ছেলেটি পেন হোল্ড গ্রিপ—এ খেলছে। পিছনে দু'পা সরে গিয়ে সপাটে স্ম্যাশ করল। মেয়েটি টেবিল থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়ে স্ম্যাশটা তুলে দিল টেবিলে.....

ধৃতির হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল এদের এলেম দেখে। তবে সে র‍্যালিটা দাঁড়িয়ে দেখল। মেয়েটাই তুখোড়। বারবার ছেলেটার ব্যাক হ্যান্ডে ফেলছে বল। পেন হোল্ড গ্রিপ—এ ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না বলে ছেলেটিকে হাত ঘুরিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হচ্ছিল। মেয়েটা পয়েন্ট নিয়ে নিল।

ধৃতি এটুকু দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পিছনে সিঁড়ি আছে। কিন্তু কোনদিক দিয়ে যেতে হবে তা মেয়েটা বলে দেয়নি। ধৃতি হলঘরটা পার হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে উঁকি মারতেই পুরনো চওড়া পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি দেখতে পায়। বাড়িটা খুবই নির্জন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

একটু সাহস সঞ্চয় করতেই হবে। নইলে এতটা এসে ফিরে গেলে সে নিজের কাছেই নিজে কাপুরুষ থেকে যাবে চিরকাল।

সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল ধৃতি। এবং ওপরে উঠে মুখোমুখি হঠাৎ একজন দাসী গোছের মহিলাকে দেখতে পেল সে। হাতে একটা জলের বালতি।

ধৃতি খুব নরম গলায় বলল, টুপুর মা আছেন?

ঝি খুব যেন অবাক হয়েছে এমন মুখ করে বলল, কার মা?

টুপুর মা। আমাকে আসতে বলেছিলেন।

ঝি—টার অবাক ভাব গেল না। বলল, আসতে বলেছিলেন? ওমা! সে কী গো?

এই উক্তির পর কী বলা যায় তা ধৃতির মাথায় এল না। সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

ঝি—টা একটু হেসে বলল, আসতে বলবে কী? সে তো পাগল।

গা—গা বলতে নীচের মেয়েটা তা হলে বাড়াবাড়ি করেনি। কিন্তু পাগল কেন হবে টুপুর মা? একটু ছিটগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু খুব পাগল কি?

কোন ঘরটা বলুন তো?—ধৃতি জিজ্ঞেস করে।

ওই তো দরজা। ঠেলে ঢুকে যান।

ধৃতির হাত—পা ঠান্ডা আর অবশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, গোটা ব্যাপারটাই একটা সাজানো ফাঁদ নয় তো? কিন্তু সামান্য একটু রোখও আছে ধৃতির। যে কোনও ঘটনারই শেষ দেখতে ভালোবাসে।

দ্বিধা ঝেড়ে সে ডান দিকের দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

প্রকাণ্ড ঘর। খুব উঁচু সিলিং। মেঝে থেকে জানালা। ঘরের মধ্যে এক বিশাল পালঙ্ক, কয়েকটা পুরনো আমলের আসবাব, অর্গান, ডেস্ক, চেয়ার, বুকশেলফ, আলনা, থ্রি পিস আয়নার ড্রেসিং টেবিল, আরও কত কী।

খাটের বিছানায় এক প্রৌঢ়া রোগা—ভোগা চেহারার মহিলা শুয়ে আছেন। চোখ বোজা। গলা পর্যন্ত টানা লেপ। বালিশে কাঁচা—পাকা চুলের ঢল। একসময়ে সুন্দরী ছিলেন, এখনও বোঝা যায়।

ধৃতি শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করল যাতে উনি চোখ মেলেন।

মেললেন এবং ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, কে?

আমি ধৃতি। ধৃতি রায়।

ধৃতি রায়! কে বলো তো তুমি?

আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

না তো! হ্যারিকেনটা উসকে দাও তো। তোমাকে দেখি।

এখন তো দিনের আলো।

কোথায় আলো? আলো আবার কবে ছিল? তোমার সাঁইথিয়ায় বাড়ি ছিল না?

না।

টুপুর মা উঠে বসেছেন। চোখে খর অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

কার খোঁজে এসেছেন?

আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন ফোনে। মনে নেই?

ও তাই বলো। তা বোসো বোসো। আমি খুব ফোনের শব্দ পাই, বুঝলে! কেন পাই বলো তো! এত ফোন কে কাকে করে জানো?

না।

টুপুর মা'র পরনে থান, গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে প্রাচীন সব আঁকিবুকি। টুপুর মা'র যে গলা ধৃতি টেলিফোনে শুনেছে এঁর গলা মোটেই তেমন নয়।

তুমি কে বললে?

ধৃতি রায়। আমি খবরের কাগজে লিখি।

খবরের কাগজ! এখন পুরনো খবরের কাগজ কত করে কিলো যাচ্ছে বলো তো! আমাকে সেদিন একটা কাগজওয়ালা খুব ঠকিয়ে গেছে।

জানি না।

তোমার দাঁড়িপাল্লা কোথায়? বস্তা কোথায়?

আমি কাগজওয়ালা নই।

শিশি—বোতল নেবে? অনেক আছে।

ধৃতি ফাঁপড়ে পড়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। সন্দেহের লেশ নেই, সে ভুল জায়গায় এসেছে, ভুলে পা দিয়েছে। তবু মরিয়া হয়ে সে বলল, আপনি আমাকে ফোন করে টুপুর খবর দিয়েছিলেন, মনে নেই? এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ককল!

টুপুর মা অন্যদিকে চেয়ে বললেন, সে কথাই তো বলছি তোমাকে বাগদি বউ, অত ঘ্যানাতে নেই। পুরুষমানুষ কি ঘ্যানানি ভালোবাসে?

ধৃতি একটু একটু ঘামছে।

আচমকাই সে আয়নায় দেখল, দরজাটা সাবধানে ফাঁক করে ঝি—টা উঁকি দিল।

শুনছেন?

ধৃতি ফিরে চেয়ে বলল, কী?

উনি কি আপনার কেউ হন?

না। চেনাও নয়। ফোন পেয়ে এসেছি।

আপনি একটু বাইরে আসুন। মেজ গিন্নিমা ডাকছেন।

ধৃতি হাঁফ ছেড়ে উঠে পড়ল। টুপুর মা তাকে আর আমল না দিয়ে ফের গায়ে লেপ টেনে শুয়ে পড়ল।

সাবধানে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঝি বলল, ওই ঘর, চলে যান।

মেজ গিন্নিমা কে?

উনিই কর্ত্রী। যান না।

ধৃতি এগোল। এ ঘরের দরজা খোলা এবং সে ঘরে ঢোকার আগেই পর্দা সরিয়ে একজন অত্যন্ত ফরসা ও মোটাসোটা মহিলা বেরিয়ে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, আসুন ভাই, ভিতরে আসুন।

ঘরটা বেশ আধুনিক কায়দায় সাজানো। যদিও প্রকাণ্ড, সোফা সেট আছে, দেয়ালে যামিনী রায় আছে।

তাকে বসিয়ে ভদ্রমহিলা মুখোমুখি একটা মোড়া টেনে বসে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো! টুপুর মা নাকি আপনাকে ডেকে এনেছে? কী কাণ্ড।

ধৃতি থমথমে মুখ করে বলল, কোথাও একটা বিরাট ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে। তবে আপনি শুনতে চাইলে ব্যাপারটা ডিটেলসে বলতে পারি।

বলুন না। আগে একটু চা খেয়ে নিন, কেমন?

ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন। একটু বাদে চা এল, একটু সন্দেশের জলখাবারও।

ধৃতি শুধু চা নিল, তারপর মিনিট পনেরো ধরে আদ্যোপান্ত বলে গেল ঘটনাটা।

ভদ্রমহিলা স্থিরভাবে বসে শুনলেন। কোনও উঃ, আঃ, আহা, তাই নাকি, ওমা এসব বললেন না। সব শোনার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার আশ্চর্য লাগছে কী জানেন?

কী বলুন তো?

টুপুর ঘটনাটা মোটেই মিথ্যে নয়। এরকমই ঘটেছিল। তবে তা ঘটেছিল বছর সাতেক আগে। সেই থেকে টুপুর মা কেমন যেন হয়ে গেলেন। এখন আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছি। যতদিন বাঁচবেন ওরকমই থাকবেন। তবে গল্পটার শেষটাই রহস্য। আপনাকে যে ফোন করত সে আর যেই হোক টুপুর মা নয়।

তা হলে কে?

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন, উনি ঘর থেকেই বেরোন না। ফোন করতে জানেনও না বোধহয়। তবে যেই করুক সে আমাদের অনেক খবর রাখে।

টুপু কি সত্যিই মারা গেছে?

মাথা নেড়ে ভদ্রমহিলা বললেন, বলা অসম্ভব। পুলিশও কোনও হদিশ পায়নি। কোথায় যে গেল মেয়েটা!

কিছু মাইন্ড করবেন না, উনি মানে টুপুর মা আপনার কে হন?

আমার বড় জা। ওঁরা তিন ভাই। বড় জন নেই, ছোট অর্থাৎ আমার দেওর আমেরিকায় থাকে। ওখানকারই সিটিজেন। ছুটি কাটাতে এসেছে। দু'ভাই মিলে আজ মাছ ধরতে গেছে ব্যান্ডেলে।

নীচের তলায় যে দুটি ছেলেমেয়েকে টেবিল টেনিস খেলতে দেখলাম ওরা কারা? আপনার দেওরের ছেলেমেয়ে?

হ্যাঁ।—বলে মেজগিন্নি একটু তেড়চা হেসে বললেন, একেবারে সাহেব—মেম। এ দেশের কিছুই পছন্দ নয়। কেবল নাক সিঁটকে থাকে সবসময়।

আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায়?

মেয়ে শান্তিনিকেতনে। ছেলে দুটি। দুজনেই বাঙ্গালোরে ডাক্তারি পড়ে।

বাঙ্গালোরে কেন?

আমরা ওখানেই থাকতাম। আমার হাজব্যান্ডের তখন ওখানে একটা পার্টনারশিপের ব্যাবসা ছিল। উনি একটু খেয়ালি। হঠাৎ 'ভালো লাগছে না' বলে নিজের শেয়ার বেচে চলে এলেন। ছেলেরা হস্টেলে থাকে।

আর কেউ নেই এ বাড়িতে?

মেজগিন্নি খুব অর্থপূর্ণ হেসে বললেন, টুপুর মা সেজে ফোন করার মতো কেউ তো এ বাড়িতে আছে বলে মনে হয় না!

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, না, ঠিক তা বলিনি। আমি ব্যাপারটায় নিজেকে জড়াতেও চাইছিলাম না। বুঝতে পারছি না ঘটনার মানে কী?

হয়তো কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করার চেষ্টা করেছিল। হয়তো আপনার পরিচিতা কেউ। তবে আশ্চর্যের কথা হল, টুপু সম্পর্কে সে কিছু জানে। যাক গে, আপনি তো নিজের চোখেই দেখে গেলেন, এখন ঘটনাটা ভুলে যেতে চেষ্টা করুন।

মেজগিন্নিকে ধৃতি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। গোলগাল ফরসা, জমিদারগিন্নি ধরনের চেহারা। বয়স খুব বেশি হলে চল্লিশ—পঁয়তাল্লিশ। চোখে মুখে বেশ তীকষ্ন বুদ্ধির ছাপ আছে।

ধৃতি খুব হতাশা বোধ করে উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ গলায় বলল, আচ্ছা, আজ চলি।

আসুন ভাই। আপনার খবরের কাগজের লেখা আমিও কিন্তু পড়েছি। আপনি তো ফেমাস লোক।

ধৃতি ক্লিষ্ট একটু হাসল।

ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তার রিপোর্টটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আবার কখনও ইচ্ছে হলে আসবেন।

আচ্ছা।

ধৃতি একা ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ক্লান্ত লাগছে। হতাশ লাগছে। সে একটা প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল। সেটা যে কী তা স্পষ্ট নয়। তার বদলে যা দেখল তা বিকট।

ধৃতি যখন মাঝ—সিঁড়িতে তখন তলা থেকে দুদ্দাড় করে সেই কিশোরী মেয়েটি উঠে আসছিল, পথ দিতে একটু সরে দাঁড়াল ধৃতি। মেয়েটা উঠতে উঠতে তাকে দেখে থমকে গেল। মুখে জবজব করছে ঘাম। একটু লালচে মুখ।

ডিড ইয়া মিট হার?

হ্যাঁ।

মেয়েটা হঠাৎ একটু হাসল। সুন্দর মুখশ্রী যেন আরও ফুটফুটে হয়ে উঠল।

পাগলি নয়?

ধৃতিও একটু হাসল। বলল, তাই তো মনে হল।

আপনি কি কোনও রিলেটিভ?

না! পরিচিত।

টেক হার সামহোয়ার। নার্সিংহোম বা মেন্টাল হোম কোথাও নিয়ে গেলেই তো হয়। জেঠু কিছুতেই বুঝতে চায় না।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, তাই দেওয়া উচিত। আচ্ছা, এ বাড়ির ফোনটা কোন ঘরে?

জেঠুর ঘরে। ফোন করবেন? আসুন না আমার সঙ্গে।

না। তার দরকার নেই। ভাবছিলাম ফোন করলে টুপুর মাকে পাওয়া যাবে কি না। আচ্ছা নম্বরটা কত?

মেয়েটা নম্বর বলল। ধৃতি মনে মনে দু'—একবার আউড়ে মুখস্থ করে নিল।

মেয়েটা বলল, বাই।

তারপর উঠে গেল দ্রুত পায়ে।

বাই।—বলে ধৃতি নেমে এল নীচে। মনটা বিস্বাদে ভরে গেছে। হতাশা এবং গ্লানি বোধ করছে সে। কেন যে কে জানে! এতটা আশাহত হওয়ার মতো কিছু নয়। ঘটনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেই হয়। পারছে না। তার মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল জোক নয়, ভিতরে আর একটা কিছু আছে। সেটা সে ধরতে পারল না।

মোটামুটিভাবে ব্যর্থ হয়েই ধৃতি যখন বেরোতে যাচ্ছিল তখন দেখল, হলঘরে সেই ঝি—টা মেঝে মুছছে উবু হয়ে বসে। তাকে দেখে কৌতূহলভাবে একটু চেয়ে রইল।

ধৃতি তাকে উপেক্ষা করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সে হঠাৎ চাপা গলায় বলল, একজন যে বসে আছে আপনার জন্য।

ধৃতি চমকে উঠে বলল, কে?

ঝি ফিক করে হেসে বলল, বাঃ বুড়োকর্তা আছে না?

সে আবার কে?

সে—ই তো সব। দেখা করবেন না?

বুড়ো মানুষ, খিটখিটে নন তো?

না গো, তবে খুব বকবক করেন। নতুন মানুষ পেলে তো কথাই নেই। ওইদিকে ঘর। চলে যান।

হলঘরের ডানপ্রান্তে একটা ভেজানো কপাট দেখা যাচ্ছিল। মরিয়া ধৃতি পায়ে পায়ে গিয়ে দরজায় শব্দ করল।

এসো, চলে এসো। এভরিবডি অলওয়েজ ওয়েলকম।

ধৃতি দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। লম্বাটে এবং বেশ বড়সড় ঘরখানা। দক্ষিণের জানালা দরজা খোলা বলে ধপ ধপ করছে আলো। একখানা মজবুত ও ভারী চৌকির ওপর সাদা বিছানা পাতা। দরজার পাশেই একখানা ডেক চেয়ার। তাতে সাদা দাড়িওয়ালা এবং অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো চেহারার মানুষ বসে আছেন। পরনে ঢোলা পায়জামা, গায়ে একটা সুতির গেঞ্জির ওপর একটা উলের গেঞ্জি। শরীরের কাঠামোটা প্রকাণ্ড। বোঝা যায় একসময়ে খুব শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। এখনও শরীরে মেদের সঞ্চার নেই। বয়স আশি বা তার ওপর। কিন্তু চোখে গোল রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমার ভিতরে দুটি চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ন এবং কৌতুকে ভরা।

মুখোমুখি একটা খালি চেয়ার পাতা। সেটা দেখিয়ে বললেন, বোসো। এ বাড়িতে নতুন কেউ এলেই আমি তাকে ডেকে পাঠাই। কিছু মনে করোনি তো?

ধৃতি বসল এবং মাথা নেড়ে বলল, না।

কার কাছে এসেছিলে?

ধৃতি হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আমি একটা ভুল খবর পেয়ে এসেছিলাম। যার কাছে এসেছিলাম আসলে তার সঙ্গে আমার কোনও দরকার নেই।

একটু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন! কার কাছে এসেছিলে বলো তো?

টুপুর মা। ওই নাম নিয়ে কে যেন আমাকে অফিসে প্রায়ই টেলিফোন করত। কালও টেলিফোনে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেই জন্যই আসা।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম হয়ে গেলেন। সামনের শূন্যে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। চোখ স্বপ্নাতুর ও ভাসা—ভাসা হয়ে গেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমাকে কি সে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল?

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, সেইরকমই। তবে সেটা বড় কথা নয়।

বুড়োকর্তা তার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই দুপুরের খাওয়া খেয়ে আসোনি?

আপনি খাওয়ার ব্যাপারটা বড় করে দেখছেন কেন? ওটা কোনও ব্যাপার নয়।

বুড়োকর্তা মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে একটু বুঝতে দাও। বুড়ো হলে মগজে ধোঁয়া জমে যায় বটে, তবু অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে। তোমার নাম কী? কী করো?

ধৃতি বলল।

বুড়োকর্তা মাথা ওপর নীচে দুলিয়ে বললেন, জানি। তোমার লেখা আমি পড়েছি। খবরের কাগজটা আদ্যোপান্ত পড়া আমার রোজকার কাজ।

ধৃতি বিনয়ে একটু মাথা নোয়াল। তারপর বলল, আপনি অযথা এই ঘটনাটা নিয়ে উদবিগ্ন হবেন না। কেউ একটু আমার সঙ্গে রসিকতা করতে চেয়েছিল।

রসিকতা!—বলে বুড়োকর্তা একটু অবাক হলেন যেন। তারপর মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বললেন, এমনও হতে পারে যে সে কোনও একটি সত্যের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। নইলে একটি মেয়ে তোমাকে বারবার ফোন করবে কেন?

সেটার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

তাছাড়া সে সবটাই কিন্তু মিথ্যে বলেনি। আমার নাতনি টুপুর সত্যিই কোনও ট্রেস নেই কয়েক বছর। আমরা ধরে নিয়েছি যে সে মারা গেছে। সম্ভবত খুন হয়েছে। এগুলো তো মিথ্যে নয়।

সম্ভবত সে ঘটনাটা জানে।

তা তো জানেই। কিন্তু কে হতে পারে সেটাই ভাবছি।

হয়তো আপনাদের চেনা কেউ।

তোমার কি আজ কোনও জরুরি কাজ আছে?

কেন বলুন তো?

যদি সংকোচ বোধ না করো তবে আমার সঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নাও। যে—ই তোমাকে নিমন্ত্রণ করুক সে এ বাড়িকে জড়িয়েই তো করেছে। নিমন্ত্রণটা অন্তত সত্যিকারের হোক। আমার রান্না আলাদা হয়, আলাদা ব্রাহ্মণ পাচক রাঁধে, আমি ওদের সঙ্গে খাই না। এ ঘরেই সব ব্যবস্থা হবে।

আমার একদম খিদে নেই।

তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ এবং এ বাড়ি ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাইছ বলে খিদে টের পাচ্ছ না। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমার মনে হয়, তোমাকে এতদূর টেনে এনেছে তার কোনও পজিটিভ উদ্দেশ্য আছে। হয়তো আমি তোমাকে কিছু সাহায্যও করতে পারব, যদি অবশ্য টুপুর রহস্য ভেদ করতে আগ্রহ বোধ করো।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমার আগ্রহ নেই। টুপুর কেসটা মনে হয় ক্লোজড চ্যাপ্টার। আর পুলিশই যখন কিছু পারেনি তখন আমার কিছু করার প্রশ্ন ওঠে না। আমি ডিটেকটিভ নই।

বুড়োকর্তা খুব সমঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, ঠিক কথা। অর্বাচীনের মতো দুম করে অন্য কারও ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা ভালো নয়। তবে এই বুড়ো মানুষটার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে দুপুরবেলা তোমার সঙ্গে বসে দু'টি খেতে, তা হলে তোমার আপত্তি হবে কেন?

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, একটিমাত্র কারণে। যে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল সে একটা ফ্রড। আমি সেই নিমন্ত্রণ মানতে পারি না।

ফ্রড!—বুড়োকর্তা আবার অন্যমনস্ক হলেন। তারপর বললেন, হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ঘটনাটা আমাকে আর একটু ডিটেলসে বলতে পারো? যদি বিব্রত বোধ না করো?

ধৃতি আবার একটু দম নিল। তারপর সেই নাইট ডিউটির রাত থেকে শুরু করে সব ঘটনাই বলে গেল। বুড়োকর্তা চুপ করে শুনলেন। সবটা শুনে তারপর মুখ খুললেন।

ফোটোটা তোমার কাছে আছে?

আছে।

দেখাতে পারো?

ধৃতির ব্যাগে ফোটোটা প্রায় সবসময়েই থাকে। সে বের করে বুড়োকর্তার হাতে দিল।

উনি একপলক তাকিয়েই বললেন, টুপুই। কোনও সন্দেহ নেই।

ফোটোটা ফেরত নিয়ে ধৃতি বলে, এই ফোটো কার হাতে যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

বুড়োকর্তা হাত উলটে অসহায় ভাব করে বললেন, কে বলতে পারে তা? চিঠিটা দেখাতে পারো?

পারি।—বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দিল।

বুড়োকর্তা চিঠিটা দেখলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তারপর পড়লেন। ফের মাথা নেড়ে বললেন, হাতের লেখা কার কেমন তা আমি জানি না। সুতরাং এ বাড়ির কেউ লিখে থাকলেও আমার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।

ধৃতি মৃদু হেসে বলল, চিনেই বা লাভ কী? ব্যাপারটা সিরিয়াসলি না ধরলেই হয়।

তা বটে। তবে তুমি যত সহজে উড়িয়ে দিতে পারছ আমার পক্ষে তা অত সহজ নয়। ঘটনাটা তো এই বংশেরই। টুপুর সমস্যার কোনও সমাধানও তো হয়নি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এই চিঠি আর ফোটো আপনিই রেখে দিন বরং।

লাভ কী? আমি বুড়ো, অক্ষম। আমার পক্ষে কি কিছু করা সম্ভব? বরং তোমার কাছেই থাক। তুমি হয়তো বা কোনওদিন কোনও সূত্র পেয়ে যেতে পারো।

বলছেন যখন থাক। কিন্তু আমার মনে হয় এ সমস্যার কোনও সমাধান নেই।

এবার খেতে দিতে বলি?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, না। আমি খাব না। প্লিজ, আমাকে আপনি জোর করবেন না।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম রয়ে রইলেন ফের। তারপর দাড়ি গোঁফের ফাঁকে চমৎকার একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে। শুধু একটা অনুরোধ, যদি কখনও ইচ্ছে হয় তো বুড়োর কাছে এসো। তোমাকে আমার বেশ লাগল।

৯

অফিসে এসে ধৃতি আজ বহুক্ষণ আনমনা রইল। কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বেড়াল। তারপর ফের এসে বসে রইল টেলিফোনটার কাছে।

উমেশবাবু টেলিপ্রিন্টারের কপি কাটতে কাটতে তলচোখে একবার তাকে দেখে নিয়ে বললেন, আজ যেন একটা বিরহী—বিরহী দেখাচ্ছে। ব্যাপারখানা কী?

বিরহই। বউ বাপের বাড়ি গেছে।

হুঁ। বাপের বাড়ি থেকে টোপর পরে গিয়ে নিজে টেনে আনো গে না! বিয়ে করতে মুরোদ লাগে বুঝলে! এত টাকা মাইনে পাও তবু বিয়ে করার সাহস হয় না কেন? পণপ্রথার ওপর খুব তো গরম গরম ফিচার ছাড়ছ, নিজে একটা অবলা জীবকে উদ্ধার করে দেখাও না! আমি যখন বিয়ে করি তখন চাকরি ছিল না, বাপের হোটেলে খেতাম। প্রথম চাকরি হল আটাশ টাকা মাইনেয়, বুঝলে......

কথার মাঝখানেই ফোন বাজল।

উমেশবাবু 'হ্যালো' বলেই ফোনটা ধৃতির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, নাও, বাপের বাড়ি থেকেই বোধহয় করছে ফোন।

ধৃতি একটু কেঁপে উঠল। বুকটা দুরুদুরু করল। ফোনটা কানে চেপে ধরে বলল, হ্যালো।

ওপাশে সেই কণ্ঠস্বর। একটু কোমল। একটু বিষণ্ণতর।

আপনি না খেয়েই চলে গেলেন!

আপনার লজ্জা করে না?

শুনুন, প্লিজ। রাগ করবেন না।

রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

জানি। আমার চেয়ে বেশি সে কথা আর কে জানে? তবু পায়ে পড়ি। রাগ করবেন না।

তা হলে আপনার পরিচয় দিন।

সেটা এখনই সম্ভব নয়। তবে আমি টুপুর মা নই।

তবে কি আপনি টুপু?

উঃ, কী যে সব বলছেন না! আপনার টেবিলের লোক নিশ্চয়ই শুনছে আর হাঁ করে চেয়ে আছে!

উমেশবাবু ঠিক হাঁ করে চেয়ে ছিলেন না। তবে স্বভাবসিদ্ধ তলচোখের চাউনিটা ধৃতির দিকেই নিবদ্ধ রেখেছেন। ধৃতি গলা আরও নামিয়ে বলল, পরিচয় না দিলে আর কোনও কথা নেই।

আপনি সবই জানতে পারবেন। শুধু একটু যদি সময় দেন।

ধৃতি দৃঢ় গলায় বলে, আর নয়। সময় এবং প্রশ্রয় আমি অনেক দিয়েছি আপনাকে। আজ রীতিমতো অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। আপনি এতটা কেন করলেন? আমি তো কোনও ক্ষতি করিনি আপনার!

না। আপনার মতো ভদ্রলোক হয় না। আমি কাণ্ডটা করেছি শুধু টুপুর মায়ের অবস্থাটা আপনি নিজের চোখে দেখবেন বলে।

তাতে কী লাভ? আমি তো কিছু করতে পারব না।

আপনি কি জানেন যে টুপুর মায়ের অনেক সম্পত্তি?

না। আপনার মুখে শুনেছি মাত্র।

বিশ্বাস করুন, সম্পত্তি জিনিসটা খুবই খারাপ। টুপু ছিল সেই সম্পত্তির ওয়ারিশান।

তা হবে। শুনে আমার লাভ কী?

আপনার লাভ না হলেই কি কিছু নয়? ধৈর্য ধরে একটু শুনবেন তো!

শুনছি।

টুপুর মৃত্যুসংবাদ আমি রটাতে চেয়েছিলাম টুপুর জন্যেই। আমার বিশ্বাস টুপু বেঁচে আছে। কিন্তু ওর আত্মীয়রা ওকে বেঁচে থাকতে দিতে চায় না। মৃত্যুসংবাদ রটে গেলে ও নিরাপদ। কেউ আর ওকে মারতে চাইবে না।

কেন? টুপুর মৃত্যুতে তাদের কী লাভ?

টুপু বেঁচে থাকলে ওদের চলবে কী করে? অত বড় বাড়ি দেখলেন, কিন্তু ফোঁপড়া। কিছু নেই ওদের। পুরো সংসার চলছে টুপুদের টাকায়।

এত কথা আমাকে বলছেন কেন?

তা জানি না। বোধহয় কাউকে জানানো দরকার বলে জানাচ্ছি।

তা হলে আইনের আশ্রয় নিন, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করুন। পুলিশেও যেতে পারেন।

আমি কে যে সেসব করতে যাব?

তবে আমিই বা কে?

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল, তা অবিশ্যি সত্যি। আপনাকে আজ হয়রান করা আমার হয়তো উচিত হয়নি, আপনি রেগে আছেন।

তা আছি।

আপনার অফিসে টেলিফোনের ডাইরেক্ট লাইন নেই? থাকলে দিন না। পি বি এক্স লাইনে তো কোনও কথাই গোপন থাকে না।

আর কী বলার আছে আপনার?

প্লিজ, দিন। আর টেলিফোনের কাছে থাকুন দয়া করে। আমি এক্ষুনি রিং করব।

ধৃতি রিপোর্টিং—এর একটা নম্বর দিল এবং ফোনটা রেখে রাগে ভিতরে ভিতরে গজরাতে গজরাতে টেলিফোনটার কাছে গিয়ে বসল। এখন রিপোর্টিং ফাঁকা। প্রায় সবাই বেরিয়ে গেছে।

ফোনটা বাজতেই লাইন ধরল ধৃতি, হ্যাঁ বলুন।

আপনিই তো?

তবে আর কে হবে?

একটু হাসি শোনা গেল, না মানে ভীষণ ভয় করে। কী করছি কে জানে!

মজা করছেন। আর কী?

মোটেই না। রেগে আছেন বলে আপনি আমার সমস্যা বুঝতে চাইছেন না।

আপনি কে আগে বলুন। তারপর অন্য কথা।

বলব। একটু ধৈর্য ধরুন। আগে আর দু'—একটা কথা বলার আছে।

বলে ফেলুন, কিন্তু প্লিজ আর গল্প ফেঁদে বসবেন না।

টুপু একটু অন্যরকম ছিল। খুব ভালো মেয়ে নয়। অনেক অ্যাফেয়ার ছিল তার।

বিরক্ত হয়ে ধৃতি বলে, এরকম কথা আগেও শুনেছি।

আর একটু শুনুন। প্লিজ।

সংক্ষেপে বলুন।

টুপু অবশেষে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। ছেলেটা বাজে। কিন্তু টুপুও ভালো নয়। ছেলেটার রোজগারপাতি কিছু ছিল না। তবে খুব হ্যান্ডসাম ছিল, আর সেইটেই একমাত্র তার প্লাস পয়েন্ট। রূপনারায়ণপুরে তারা কিছুদিন ঘরভাড়া করেছিল। তারপর ছেলেটা পালায়। টুপুর তাতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। চেহারা সুন্দর বলে আবার একজন জুটে যায়। এ বড় কন্ট্রাক্টর। বিবাহিত। ক্রমে টুপু গাঁজা, মদ, ড্রাগের নেশা করতে থাকে। একসময়ে তার জীবনে একটা গভীর জটিল অন্ধকার নেমে আসে। সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল একবার। পারেনি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে এখনও বেঁচে আছে জানলেন কী করে?

জানি না। অনুমান করি।

অনুমানের কোনও বেস নেই?

আছে। টুপু এখনও রূপনারায়ণপুরে আছে বলে খবর পেয়েছি।

আপনি কি তাকে উদ্ধার করতে চান?

যদি চাই, তা হলে সেটা খুব অসম্ভব কিছু মনে হচ্ছে কি?

হচ্ছে। কারণ এসব মেয়েরা বড় একটা ফেরে না। মূল উপড়ে ফেললে কি গাছ বাঁচে?

যদি টুপুর অনুশোচনা এসে থাকে?

ধৃতি একটু হাসল, অনুশোচনা জিনিসটা ভালো। কিন্তু ফেরার পথটাও যে বন্ধ। সংসার তো তার জন্য কোল পেতে বসে নেই। সে এখন কীরকম জীবন কাটাচ্ছে তার খবর রাখেন?

খুব লোনলি।

পুরুষ সঙ্গী কেউ নেই?

না। টুপুকে এখন সবাই ভয় পায়। তার রূপ গেছে, টাকা নেই, নেশা করে করে কেমন যেন বেকুবের মতোও হয়ে গেছে।

তার চলে কী করে?

যেভাবে চলে তাকে ঠিক চলা বলে না বোধহয়। ধরুন একরকম ভিক্ষে করেই চলে।

ভিক্ষে?

শুনেছি সে একটা নাচগানের স্কুল করছে।

কীরকম স্কুল? চালু?

সে সেই স্কুলের চাকরি করে। নাচ গান শেখায়, সামান্য মাইনে।

তবে তো সে ভালোই আছে।

না, মোটেই ভালো নেই। সে ফিরতে চায়।

ফিরতে বাধা কী?

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কোথায় সে ফিরবে?

কেন? নিজেদের এলাহাবাদের বাড়িতে?

সে বাড়ি আর ওদের দখলে নেই। বিক্রি হয়ে গেছে। কলকাতার বাড়িতে আত্মীয়রা তাকে ঢুকতেই দেবে না। তার বিয়ে করারও আর চান্স নেই। তবু সে মাঝে মাঝে ফিরতে চায়। কোথায় তা বুঝতে পারে না।

আমি কী করতে পারি বলুন?

আমার অনুরোধ আপনি একবার ওকে দেখে আসুন।

আপনি কি পাগল? টুপুকে দেখতে যাব কেন?

আপনি তো হিউম্যান স্টোরি খুঁজে বেড়ান। টুপুর ঘটনা কি হিউম্যান স্টোরি নয়?

মোটেই নয়। একটা বেহেড বেলেল্লা মেয়ের অধঃপাতে যাওয়ার গপ্পো, তাও যদি সত্যি হয়ে থাকে। আমি এখনও টুপুর গল্প বিশ্বাস করি না। করলেও ইন্টারেস্টেড নই।

আমি যদি সঙ্গে যাই?

আপনি কে?

সেইটেই তো বলতে চাইছি না। তবে কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

কাল কেন? আজই নয় কেন?

প্লিজ, কাল। আমি অফিসেই আসব। তিনটেয়। কাল দেরি করবেন না, লক্ষ্মীটি।

ফোন কেটে গেল।

টেবিলে ফিরে আসতেই উমেশবাবু একটু গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, কেসটা কী হে?

আছে একটা কেস। তবে প্রেমঘটিত নয়।

মেয়েছেলের ব্যাপারে বেশি থেকো না। বরং একটা দেখেশুনে ঝুলে পড়ো। ল্যাঠা চুকে যাক। বাঙালির শেষ সম্বল বউয়ের আঁচল।

ধৃতি খুব কষ্টে মুখে হাসি আনল। মনটা একদম হাসছে না।

রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখল, পরমা বাপের বাড়ি গেছে। ডাইনিং টেবিলে একটা চিরকুট: ফোন করে করে অফিসের লাইন পেলাম না। চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। বাবার শরীর ভীষণ খারাপ। প্রেশার হাই। ফ্রিজে রান্নাবান্না আছে, গরম করে খেয়ে নেবেন। পরমা। পুঃ বাবার প্রেশারটা ডিপ্লোম্যাটিকও হতে পারে। জামাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে মেয়ে এক ফ্ল্যাটে আছে, এটা বোধহয় পছন্দ নয়। আপনি যে ভেজিটেবল তা তো আর সবাই জানে না! ওখানে কী হল? টুপুর মা কী বলল জানতে খুব ইচ্ছে করছে।

রাতটা কোনওক্রমে কাটাল ধৃতি। কিছুক্ষণ হাক্সলি পড়ল, কিছুক্ষণ গীতা। ঘুমিয়ে অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে ভারী ভ্যাবলা লাগল নিজেকে।

যখন মুখ ধুচ্ছে তখন কলিংবেল। তোয়ালের মুখ মুছতে মুছতে গিয়ে দরজা খুলে দেখে ফুটফুটে এক যুবতী দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের কাপ।

মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, আমি নন্দিনী। পরমা বউদি আপনাকে সকালের চা—টা দিতে বলে গেছে।

আপনি কোন ফ্ল্যাটে থাকেন?

ওই তো উলটোদিকে। একদিন আসবেন।

আচ্ছা।

কাপটা থাক। পরে আমাদের কাজের মেয়ে নিয়ে যাবে।

ধৃতি সকালবেলাটা খবরের কাগজ পড়ে কাটাল। তারপর সাজগোজ করে হাতে সময় থাকতেই বেরিয়ে পড়ল। অফিসের ক্যান্টিনে খেয়ে নেবে।

অফিসেও সময় বড় একটা কাটছিল না। তিনটেয় মেয়েটা আসবে। অন্তত আসার কথা। একটু ভয়—ভয় করছে ধৃতির। সে বুঝতে পারছে একটা জালে জড়িয়ে যাচ্ছে সে।

তিনটের সময় রিসেপশনে নেমে এল ধৃতি। অপেক্ষা করতে লাগল।

কেউ এল না। ঘড়ির কাঁটা তিনটে পেরিয়ে সোয়া তিন, সাড়ে তিন ছুঁই—ছুঁই। ধৃতি যখন হাল ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল তখনই আচমকা রিসেপশন কাউন্টারে একটি মেয়ের গলা বলে উঠল, ধৃতি রায় কি আছেন?

মেয়েটা লম্বাটে, রোগাটে, এক বেণীতে বাঁধা চুল। ফরসা? হ্যাঁ, বেশ ফরসা। মুখশ্রী এক কথায় চমৎকার। তবে না, এ আর যেই হোক, টুপু নয়।

রিসেপশনিস্ট কিছু বলার আগেই ধৃতি এগিয়ে গিয়ে বলল, আমিই ধৃতি রায়।

মেয়েটি ধৃতির দিকে চাইল। চমকাল না, বিস্মিত হল না, কোনও রি—অ্যাকশন দেখা গেল না চোখে। তবে একটু ক্ষীণ হাসল।

ধৃতি কাউন্টার পেরিয়ে কাছে গিয়ে বলল, এখানে বসে কথা বলবেন, না বাইরে কোথাও?

মেয়েটা অবাক হয়ে বলল, আপনি আমাকে আপনি—আজ্ঞে করছেন কেন? আমি তো অণিমা।

অণিমা?

চিনতে পারছেন না? লক্ষ্মণ কুণ্ডু আমার দাদা। আপনার বন্ধু লক্ষ্মণ।

ধৃতি দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তাই তো! এ তো অণিমা। উত্তেজনায় সে চিনতেই পারেনি।

কী চাস তুই?

আমি স্বদেশি আমলের একটা পিরিয়ডের ওপর রিসার্চ করছি। লাইব্রেরিতে পুরনো খবরের কাগজের ফাইল দেখব। একটু বলে দেবেন?

ধৃতি বিরক্তি চেপে ফোন তুলে লাইব্রেরিয়ানকে বলে দিল। অণিমা চলে গেলে আরও কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর রাগে হতাশায় প্রায় ফেটে পড়তে পড়তে উঠে এল নিউজ রুমে। কে তার সঙ্গে এই লাগাতার রসিকতা করে যাচ্ছে? কেনই বা? সে কি খেলার পুতুল?

গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর নিজেকে ডুবিয়ে দিল কাজে। কপির পর কপি লিখতে লাগল। সঙ্গে চা আর সিগারেট। রাগে মাথা গরম, গায়ে জ্বালা।

কিন্তু সারাক্ষণ রূপনারায়ণপুর নামটা ঘোরাফেরা করছে মনের মধ্যে। গুনগুন করে উঠছে।

ধৃতি রূপনারায়ণপুর গিয়েছিল একবার মাত্র। একজন পলাতক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক নেতা ধরা পড়েছিল রূপনারায়ণপুরে। সেটা কভার করতে। তখন অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছিল তার। কারও কথা বিশেষ করে মনে নেই। কিন্তু নামটা গুনগুন করছে। রূপনারায়ণপুর! রূপনারায়ণপুর।

তিনদিন বাদে ইনল্যান্ডে চিঠিটা পেল ধৃতি।

"খুব রাগ করে আছেন তো! থাকুন গে। রাগটুকু আমার কথা সারা জীবন আপনাকে বারবার মনে পড়িয়ে দেবে। আপাতত এটুকুই যা আমার লাভ।

"টুপুর কথা বলে বলে কান ঝালাপালা করেছি। আসলে তা নিজেরই কথা। আমিই টুপু। যা বলেছি তার একবিন্দু মিথ্যে নয়। দেখা করার কথা ছিল। পারলাম না। আপনি ঠিকই বলেছিলেন।

একবার শিকড় উপড়ে ফেললে গাছ কি বাঁচে? বাঁচলেও আগের মতো আর হয় না।

"রূপনারায়ণপুরে আপনাকে যখন দেখেছিলাম তখন ভীষণ ভালো লেগেছিল। কৌতূহলী, উদ্যমী, সত্যানুসন্ধানী এক সাংবাদিক। উজ্জ্বল, ধারালো, স্ট্রেটকাট। তখন থেকেই আপনার কথা খুব মনে হয়। ভেবেছিলাম, আপনার কাছে একবার এসে সব বলব।

"এলামও, কিন্তু সোজা গিয়ে হাজির হতে পারলাম না। কেমন বুক কাঁপছিল, ভয় করছিল। জীবনে কখনও তো সত্যিকারের প্রেমে পড়িনি। এই বোধহয় প্রথম। কিংবা অন্য এক আকর্ষণ। নানারকম ছলছুতো করলাম। কিন্তু তাতে আড়াল বাড়ল, ব্যবধান হয়ে উঠল দুস্তর।

"মরেই গেছি যখন আর বেঁচে উঠবার আকাঙ্ক্ষা কেন? এর কোনও মানে হয় না। নিজে নষ্ট হয়েছি, আপনাকেও নষ্ট করে দেব হয়তো। সুন্দর মুখের অসাধ্যি কী আছে?

"নেশার কথা যা বলেছি তার সবটা সত্যি নয়। হ্যাস খেয়েছি, মদও। নেশা করিনি। কিন্তু অভ্যাস আছে। আর বিয়ের ব্যাপারটা সত্যি। কিন্তু কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে তা অত ব্যাখ্যা করে হবেই বা কী?

"সেদিন তিনটের সময় গিয়েছিলাম কিন্তু। রিসেপশনের এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম। খুব ভিড় ছিল। আপনি আমাকে লক্ষ করেননি। চিনতেও পারতেন না। আমি কিন্তু অনেকক্ষণ চোখ ভরে আপনাকে দেখলাম। খুব উদবিগ্ন, রাগী, উত্তেজিত। মনে মনে হাসছিলাম। আর বুকের মধ্যে সে কী দপদপানি!

"পায়ে পড়ি, মাঝে মাঝে আমাকে একটু মনে করবেন। আর কিছু চাই না।

"কাছে আসতে পারলাম না, সে আমারই ক্ষতি। আপনার কিছুই হারায়নি। এ দুঃসহ জীবন বহন করে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতে হলে একটা স্বপ্ন অন্তত চাই। মিথ্যে হোক, তবু চাই। আপনাকে স্বপ্ন করে নিলাম।

"রাগিয়েছি, ভাবিয়েছি, হয়রান করেছি বলে একটুও দুঃখিত নই। বেশ করেছি। আবার যে হাত গুটিয়ে নিলাম, নিজেকে সরিয়ে নিলাম সেইটেই কি কম?

"ভালো থাকবেন।

"কী জানাব আপনাকে বলুন তো? ভালোবাসা? প্রণাম? শুভেচ্ছা? যাঃ সবটাই ভারী কৃত্রিম। তার চেয়ে কিছু জানালাম না। জানানোর কী আছে?

"আসি।"

ধৃতি একবার পড়ল। দু'বার। চিঠিটা সে ফেলে দিতে পারত দুমড়ে মুচড়ে। পারল না।

তবে দিনটা তার আজ ভালো গেল না। বারবার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। চিঠিটা তাকে আরও বহুবার পড়তে হবে সে জানে। গভীর রাত্রে, শীতে বা বৃষ্টিতে, দুঃখে বা আনন্দে, একটা মানুষ যে কত সাবলীলভাবে চিঠি হয়ে যায়!

ফেরিঘাট

সিঁড়ির তলা থেকে স্কুটারটা টেনে নিয়ে রাস্তার পাশে ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড় করাল মধু, তার হাতে পালকের ঝাড়ন। মুছবে। মুছলেও খুব একটা চকচকে হয় না আজকাল। রংটা জ্বলে গেছে, এখানে—ওখানে চটা উঠে গেছে। বেশ পুরনো হয়ে গেল স্কুটারটা।

জানালা দিয়ে নীচের রাস্তায় স্কুটারটা একটুক্ষণ অন্যমনে দেখল অমিয়। বহুকালের সঙ্গী। মায়া পড়ে গেছে। কল্যাণ তিন হাজার টাকা দর দিতে চেয়েছিল। জিনিসটা ইটালিয়ান বলে নয়, মায়া পড়ে গেছে বলেই বেচেনি অমিয়। তা ছাড়া একবার বেচে দিলে নতুন আর কেনা হবে না। অমিয়র দিন চলে গেছে।

মুখ ফিরিয়ে অমিয় টেবিলে সাজানো এক প্লেট টোস্ট, একটা আধসেদ্ধ ডিম, এক গ্লাস দুধ, নুন—মরিচের কৌটো, চামচ—এ—সব আবার দেখে। সকাল আটটা কি সোয়া আটটা এখন। সাড়ে আটটায় সে রোজ বেরোয়। বেরোবার আগে সে রোজ টোস্ট ডিম নুন—মরিচ দিয়ে খায়। দুধ পান করে। আজ কিন্তু খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতেও তার অনিচ্ছা হচ্ছিল। খিদে নেই। বমি—বমি ভাব। রাতে ভালো ঘুম হয়নি, বারবার উঠে সিগারেট খেয়েছে। সকালে অনেকক্ষণ স্নান করেছে চৌবাচ্চা খালি করে। তবু শরীর ঠিকমতো ঠান্ডা হয়নি। খাওয়ার কথা এখন ভাবাই যাচ্ছে না।

টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি রোজকার মতো হাসি বসে নেই। শোয়ার ঘরের দরজায় হাসি দাঁড়িয়ে আছে। কাল রাতে হাসিও বোধহয় ঘুমোয়নি। ঘুমোলে যে ছোট ছোট অবিরল শ্বাস পড়ে ওর, সেই শব্দ তো কই শোনেনি অমিয়। বেত আর বাঁশ দিয়ে তৈরি ভারী সুন্দর একটা খাট শখ করে কিনেছিল হাসি, যখন অমিয়র সুদিন ছিল। পুরনো বড় খাটটা বেচে দিয়ে অমিয় কিনে নিল একটা সোফা—কাম—বেড। সেই থেকে দুজনের বিছানা আলাদা। বেতের খাটে হাসি, সোফা—কাম—বেডে অমিয়। সেইটাই কি মারাত্মক ভুল হয়েছিল?

বস্তুত তো ছোটবেলা থেকেই অমিয় যৌথ পরিবারে মানুষ। সেখানে বড় খাটের সঙ্গে আর একখানা বড় খাট জোড়া দেওয়া। বিশাল মাঠের মতো বিছানা, শামিয়ানার মতো বড় মশারি। দাদু—ঠাকুমা শুত, আর সেই সঙ্গে তারা রাজ্যের ছেলেপুলে। পরিবারের অর্ধেক এক বিছানায়। যারা সেই বিছানায় শুয়ে বড় হয়েছে তারা আজও কেউ একে অন্যের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়নি, যে যার কাজের ধান্দায় আলাদা হয়ে ভিন্ন সংসার করেছে, দাদু—ঠাকুমা মরে গেছে কবে। তবু সেই প্রকাণ্ড বিছানার স্মৃতি আজও অমিয়র পিসতুতো, জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাই আর বোনদের কাছ থেকে খুব দূরে সরাতে পারেনি। দেখা হলে সবাই অকৃত্রিম খুশি হয়, এক—আধবেলা জোর করে ধরে রাখে, প্রাণপণে খাওয়ায়, কত পুরনো দিনের গল্প হয়।

অমিয় খেতে পারছে না। একদম না। একটা টোস্ট মুখে তুলে দেখল। ভালো টোস্ট হয়েছে, মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছে দাঁতের চাপে। তবু অমিয়র কাছে কাঠের গুঁড়োর মতো বিস্বাদ লাগে। ডিমটা থেকে আঁশটে গন্ধ আসে। দুধটাকে খড়িগোলা মনে হয়। অমিয় টোস্ট হাতে ধরে রেখে এক বার চেষ্টা করে হাসির দিকে তাকায়। আসলে তাকাতে তার ভয় করছিল।

চোখে চোখ পড়ে। হাসির কোনও দ্বিধা নেই, ভয় নেই। এমন নিষ্ঠুর মেয়ে অমিয় খুব কমই দেখেছে। অমিয়কে কখনও হাসি সমীহ করেনি। আজ পর্যন্ত বলতে গেলে হাসি সঠিক বউ হয়নি অমিয়র। ইচ্ছে হয়নি বলে হাসি সন্তান—ধারণ করল না আজ পর্যন্ত। না করে ভালোই করেছে। তা হলে এখন অসুবিধে হত। হাসি তাই অমিয়র চোখে সোজা চোখ রাখতে পারে। ভয় পায় না। অমিয়র কাছে তার কোনও দায় নেই।

আমি কিন্তু কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। হাসি সকালে এই প্রথম কথা বলে।

অমিয় ভ্রূ তুলে বলে, কী বললে?

হাসি বলে, আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। এখানে তো আমার নিজস্ব কিছু নেই।

কী নেবে?

এই কয়েকটা শাড়ি—ব্লাউজ, সাজগোজের জিনিস, একটা সুটকেস, কয়েকটা টাকা...

অমিয় শান্ত গলায় বলে, নিয়ো। বলার দরকার ছিল না।

বলেই নেওয়া ভালো। দরকারে নিয়ে যাচ্ছি। দরকার ফুরোলে ফিরিয়ে দেব।

শরীরের ভিতরটা তিড়বিড় করে অমিয়র। কিন্তু কিছু বলে না। বলা মানেই আবার অশান্তি। ছোট কথার ঢিল ছুড়ে হাসি দেখতে চায় মজা পুকুরটায় কীরকম ঢেউ ওঠে। মজা পুকুর ছাড়া অমিয় নিজেকে আর কিছু ভাবতে পারে না।

হাসি আবার বলে, এ সংসারে আমি তো কিছু নিয়ে আসিনি, কাজেই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

অমিয় উঠল। টেবিলে তার টোস্ট ডিম আর দুধের ওপর মাছি উড়তে লাগল, বসতে লাগল।

স্কুটারটা রোদে দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় জানালা দিয়ে এক বার দেখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নেয়। দরজার উপর একটা ছবি টাঙানো আছে। ছবির চারধারে একটা মালা কবে টাঙানো হয়েছিল, মালাটা গত বছরখানেক ধরে শুকিয়ে এখন রুদ্রাক্ষের মালার মতো দেখায়। ছবিতে ধুলো পড়েছে। বেরোবার সময় রোজই এক বার ছবিটার দিকে অভ্যাসবশত তাকিয়ে বেরোয় সে। এক বার হাতজোড় করার ভঙ্গি করে বেরিয়ে যায়।

আজও তাকাল।

বেরোবার মুখে দরজা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, যা খুশি নিয়ে যেয়ো।

হাসি বলল, যা খুশি নেব কেন? যা না হলে চলবে না সে—রকম দু'—একটা জিনিস ধার নেব। আবার ফিরিয়ে দেব।

অমিয় বলল, আচ্ছা।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আর হাসির কথা মনে থাকে না। দু'চার দিন বৃষ্টির পর গরম কমে গেছে। আকাশ গভীর নীল। বাতাস পরিষ্কার। স্কুটারটা মৃদু গোঙানির শব্দ করে ছুটছে। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে যত অপ্রীতিকর কথা ভুলিয়ে দিয়ে মাথা পরিষ্কার করে দেয়। পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে কালো রাস্তা। কলকাতার এক রকম সুন্দর গন্ধ আছে। বর্ষার পর রোদ উঠলে প্রায়ই গন্ধটা পায় সে। রাস্তার পর রাস্তা পার হয় অন্যমনে।

ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায় তার অফিস। ফুটপাথ থেকে সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে খাড়া। সিঁড়ির পাশেই ফুটপাথে একটা গেঞ্জি, ব্রেসিয়ার, রুমাল, আন্ডারওয়্যারের স্টল চালায় আহমদ। অমিয়র স্কুটারটা সারা দিন সে—ই পাহারা দেয়। রুমালটা আন্ডারওয়্যারটা আহমদের কাছ থেকেই নেয় অমিয়। বদলে আহমদ স্কুটারটা নজরে রাখে। দরকারে অল্প—স্বল্প টাকা ধার দেয়। অমিয়র দু'—চারজন পাওনাদারকেও সে চিনে রেখেছে। নীচের তলা থেকেই তাদের তাড়ায়, বলে, তিনতলার সিঁড়ি খামোখা ভাঙবেন কেন, একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন।

সিঁড়িটা সত্যিই খাড়া। উঠতে জান বেরিয়ে যায়। সিঁড়ির আট ধাপে একটা ছোট্ট চাতাল। সেই চাতালটা আহমদের একটা সংসার। দুপুরে তার ভাত আসে, কাছেই কোনও স্কুলে পড়ে তার দুই ছেলে, টিফিনে তারাও এসে হাজির হয়। চাতালে বসে অন্ধকারে বাপ—ব্যাটারা ভাত খায়। গা ঘেঁষে লোকজন ওঠানামা করে, ধুলো ওড়ে, কাঠের সিঁড়ি কাঁপে, তবু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। চাতালের এক দিকে আহমদের পোঁটলা—পুঁটলি, দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো জামা—কাপড়, জুতো।

তিনতলায় উঠতে আজ বেশ কষ্ট হল। অফিস বলতে যা বোঝায় তা তো নয়। ঘরটা বড়ই, তার তিন অংশীদার। আসলে ঘরটার মূল ভাড়াটে কল্যাণ। দশ—বারো বছর আগে এই ঘর ভাড়া নিয়ে তৃষ্ণা অ্যান্ড

কোং খুলেছিল। আজও কোম্পানি আছে, কল্যাণও আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, সেই ঘরে পাশাপাশি টেবিলে আরও দুটো কোম্পানি চালু হয়েছে। একটা রজতের, একটা অমিয়র। তারা দুজন কল্যাণের সাবলেটের ভাড়াটে। একই ঘরে এ রকম চার—পাঁচটা কোম্পানিও চলে। একটা টেলিফোন আর একটা ঠিকানা থাকলেই কলকাতায় ব্যবসায় নামা যায়।

মিশ্রিলাল বসে আছে। একমাত্র মিশ্রিলালকেই আহমদ কখনও ঠেকাতে পারেনি। ধৈর্যশীল মিশ্রিলাল ঠিক তিনতলা পর্যন্ত উঠবেই, উঠে অমিয়কে না দেখলে বসে থাকে, বসে থাকতে থাকতে ঝিমোয়। বিকেল পর্যন্তও বসে থাকে সে। অমিয়কে দেখে মিশ্রি এক বার চোখ তুলে নামিয়ে নিল। হাতে একটা টেন্ডারের চিঠি।

রাজেন গ্লাসে ঢেকে জল রেখে গেছে। টেবিলে কাগজপত্র প্রায় কিছুই নেই। দুটো চিঠি। টেন্ডার। চিঠি দুটো দেখে রেখে দিল সে। চেয়ার টেনে বসল। রাস্তার ওপারে গভর্নমেন্টের একটা স্টোর। লরি থেকে মাল খালাস করছে। রাস্তায় ট্রামের শব্দ হচ্ছে, বাস যাচ্ছে। কাচের পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে শব্দ আটকাল অমিয়।

মিশ্রি বলল, কিছু দেবেন নাকি?

ও—সপ্তাহে।

ও বাবাঃ, তিন মাস হয়ে গেল। আমিও মাল তুলতে পারছি না, একজনকে নিয়ে তো আমার কারবার নয়!

ও—সপ্তাহে এসো।

পুরো চাইছি না, কিছু দিন।

কোত্থেকে দেব? পেমেন্ট চার মাস আটকে আছে।

কেন?

সেনগুপ্ত চারটে এয়ারকন্ডিশনিং মেশিন কিনেছিল, চারটে স্ক্র্যাপ। মেশিন আমার অর্ডারে খাইয়ে ঝগড়া করে ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল! তখনও জানতাম না যে স্ক্র্যাপ মেশিন খাইয়ে গেছে প্যাটারসনে। প্যাটারসন থেকে সেদিন চিঠি এসেছে, মেসিন স্ক্র্যাপ, পেমেন্ট হবে না। সব বিল আটকে রেখেছে। সাত হাজার টাকার।

চুক চুক করে জিভে একটা ক্ষোভের শব্দ করে মিশ্রিলাল।

সেনগুপ্ত ডুবিয়ে গেল একেবারে!

অমিয় একটু হাসে। বলে, ডুবিয়ে যাবে কোথায়? ঠিক পেয়ে যাব।

বিলটার জন্য কবে আসব? আমার তো বেশি নয়, মোটে ন'শো টাকা। আমি গরিব মানুষ।

মিশ্রি, বিলের আশা ছাড়ো। বরং আমাকে আরও কিছু ধার দাও। নগদ না দিলে মাল দাও। আমার হাতে তিনটে টেন্ডার। দুটো লোয়েস্ট হয়েছে, আর একটাও পেয়ে যাবে। এখন সেনগুপ্ত নেই, আমি একা। টাকা মার যাবে না।

মিশ্রি গলা চুলকোয়। বলে, তিন মাসে পেমেন্ট পাচ্ছি না। কী যে বলেন। পুরনো লোক বলে ছাড়ছি না আপনাকে। কিন্তু কম্প্রেসারের পার্টসের জন্য লোকে ছিঁড়ে ফেলছে আমাকে। নগদ টাকার ছড়াছড়ি। এ—সব মাল এখন ক্রেডিটে দেয় কোন বুদ্ধু?

অমিয় জলটা একটু একটু করে খায়। স্বাদটা ভালো লাগে। তেষ্টা পেয়েছে খুব। গ্লাসটা আবার ঢেকে রেখে বলে, এবার কাটো তা হলে।

সামনের সপ্তাহে আবার আসব।

রোজ আসতে পারো। কিন্তু লাভ নেই।

বললেন যে আসতে। কিছু দেবেন। মোটে তো ন'শো টাকা।

ধৈর্যশীল মিশ্রিলাল ঝগড়া করে না। করলে করতে পারত। কিন্তু শান্ত মুখেই উঠে যায়। আবার ঠিক আসবে।

অমিয় নতুন টেন্ডারের চিঠি দুটো টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে অন্যমনস্কভাবে; ছেঁড়া টুকরোগুলো টেবিলের ওপর সাজায় তাসের মতো। চেয়ে থাকে। সেনগুপ্ত কোথাও না কোথাও আছে ঠিক। কলকাতা হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়, তাতে ডুবসাঁতার কাটা যায়। কিন্তু একদিন না একদিন দেখা হবেই।

আজ—কালের মধ্যেই হাসি চলে যাবে। আজ বিকেলে বাসায় ফিরবার ইচ্ছে নেই অমিয়র। ফিরে খুব খারাপ লাগবে। হাসি যে কোথায় যাচ্ছে তা অমিয় জানে না। বোধহয় প্রথমে বাপের বাড়ি যাবে আসামে। তারপর বাগনানের কাছে এক গ্রামে, যেখানে ও চাকরি পেয়েছে, আগামী মাস থেকে চাকরি শুরু করবে। তারপর কী করবে হাসি? চাকরি করবে? তারপর? চাকরিই করবে! চাকরিই করে যাবে বরাবর! কিছু মনে পড়বে না! একা লাগবে না! খারাপ লাগবে না!

কল্যাণ টেবিলের ওপর পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে! তৃষ্ণা কোম্পানি দাঁড়িয়ে গেছে। দুজন কর্মচারী আউটডোরে ঘুরে বেড়ায়, কল্যাণকে কেবল অফিসটা দেখতে হয় আর ইনকাম—ট্যাক্স। কোম্পানি দাঁড়িয়ে গেলে আর তেমন ভাবনা নেই। রজতের টেবিল খালি। বড় একটা থাকে না রজত, প্রচণ্ড খাটে আর ঘোরে। দাঁড়িয়ে যাবে।

অমিয় নিঃশব্দে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবনা—চিন্তা করার মতো মাথার অবস্থা নয়। মনে হয় বেশি ভাবতে গেলেই মাথায় সমুদ্রের মতো বিশাল ঢেউ উঠে সে পাগল হয়ে যাবে।

বসে থাকলে এ—রকম হবেই, অমিয় তাই উঠল।

কল্যাণ এক বার তাকিয়ে বলল, কোন দিকে যাচ্ছেন?

যাই এক বার প্যাটারসনে। ওদের কাল মিটিং গেছে। লাহিড়ী বলছিল একটা ডিসিশন হবেই। যদি কিছু হয়ে থাকে দেখে আসি।

মিশ্রিলাল কত পায়?

ন'শো।

গতকাল আমি একটা পেমেন্ট পেয়েছি। শ'চারেক দিতে পারি। মিশ্রিকে আপাতত কাটাবেন না, কিছু দিয়ে হাতে রাখুন।

কেন?

ফুড সাপ্লাইয়ের টেন্ডারটা ধরে রাখুন। মিশ্রিকে কিছু খাওয়ালে ক্রেডিটে আবার মাল দেবে।

আপনি তো দু'শো অলরেডি পান।

দেবেন এক সময়ে। পালাবেন কোথায়?

আবার চোখ বোজে। কল্যাণ ও—রকমই। খুব মহৎ কাজও খুব অবহেলার সঙ্গে করে। অমিয় ঠিক কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারে না। মনটা সে—রকম নেই। সেনগুপ্ত পালিয়েছে, হাসি চলে যাচ্ছে। ব্যবসা ঝুল।

নীচে এসে স্কুটারটা চালু করে সে। ভিড় কাটিয়ে ধীরগতিতে এগোয়।

কাচের টেবিলে ছায়া পড়তেই লাহিড়ী মুখ তোলে।

ভালো খবর মশাই।

কী?

আবার অর্ডার পাবেন। আপনার টেন্ডার আমরা নেব। কাল খুব লড়ালড়ি হল আপনার জন্য।

কত টাকার অর্ডার?

কম। হাজার পাঁচেক। কিন্তু ব্যাড বুকে আছেন এখন, এই অর্ডারই আপাতত পাঁচলাখের সমান। মেশিনগুলো যদি পালটাতে না পারেন তবে অন্তত মেরামত করে দেবেন, বিল কিছু ছাঁটকাট হবে। সাত হাজারের জায়গায় হাজার চারেক পেয়ে যাবেন কিন্তু সেটা পাবেন মেশিন মেরামতের পর।

অমিয় ম্লান মুখে বসে থাকে। খবরটা ভালোই। খুব ভালো। কিন্তু পাঁচ হাজারের অর্ডার ধরাও মুশকিল। পেমেন্টটা আটকে রইল।

লাহিড়ী চা বলল। তারপর জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে, খারাপ দেখছি যে।

কিছু না। শরীরটা ভালো নেই।

বয়স কত?

পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশ।

লাহিড়ী গম্ভীর ভাবে বলে, ড্রিঙ্কস?

একটু—আধটু।

মেয়েছেলে?

নীল।

স্মোক?

দিনে চল্লিশ—পঞ্চাশটা।

চেক আপ করান। হার্ট, ব্লাড, ইউরিন।

চা এসে যায়। দামি চায়ের গন্ধ। ভালো লাগে অমিয়র। আস্তে আস্তে চেখে চেখে খায়। প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগামেশান পুরনো কোম্পানি। ব্রিটিশারদের হাত থেকে গত বছর কিনল এক পাঞ্জাবি। দশ বছর ধরে প্যাটারসনের সঙ্গে ব্যবসা করছে অমিয়। সকলের সঙ্গেই চেনা হয়ে গিয়েছিল, গুডউইল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেনগুপ্ত ডুবিয়ে দিয়ে গেল। পুরনো সাপ্লায়ার বলে প্যাটারসন অমিয়কে ছাড়াল না, কিন্তু নিচু নজরে দেখবে এখন, বেশি টাকার অর্ডার দিতে ভয় পাবে।

লাহিড়ীর খাঁই বেশি নয়। ওয়ান পার্সেন্ট নেয় বিল থেকে। অন্য পারচেজ—অফিসারদের বায়নাক্কা অনেক। সেই তুলনায় লাহিড়ী দেবতা।

অমিয় উঠে বলল, অনেক ধন্যবাদ।

লাহিড়ী হাসল। বলল, সেনগুপ্তর খবর কী?

খবর নেই।

ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

ও—সব মাল আমরা চিনি। আপনিই চিনতে পারেননি।

অমিয় দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখে।

নীচে এসে আবার স্কুটার চালু করে অমিয়। কোথাও যাওয়ার নেই। সব জায়গায় পাওনাদার বসে আছে। হাজার দশ—বারো টাকার ক্রেডিট বাজারে। গোটা দুই বিলের পেমেন্ট সামনের সপ্তাহে পাওয়া যাবে। তার আগে অমিয়র কোথাও যাওয়া হবে না। পেমেন্ট পেলেই কিছু ধার শোধ হবে। হাতে কিছু থাকবে না।

প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগামেশন পিছনে ফেলে অমিয়র স্কুটার ধীরগতিতে, ভ্রমরের গুঞ্জন তুলে চলতে থাকে। উদ্দেশ্যহীন।

চললে বাতাস লাগে। থেমে থাকলে গুমোট। একটা পেট্রল পাম্পে থামতেই গুমোটটা টের পায় সে। তিনটে গাড়ি তেল নিচ্ছে কাজেই একটু অপেক্ষা করতে হয় তাকে। কাঁচা পেট্রলের গন্ধে একটা মাদকতা আছে। গন্ধটা বরাবর ভালো লাগে তার। মন চনমন করে ওঠে। বুক ভরে সে পেট্রলের গন্ধ নেয়। ঝিমোয়। কয়েক মুহূর্তেই শার্টের নীচে ঘাম কেঁচোর মতো শরীর বেয়ে নামে। হাতের তেলো ভিজে যায়।

পিছনে একটা গাড়ি তীব্র হর্ন দেয়। অমিয় ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ চায়। সামনের গাড়ি চলে গেছে। অমিয় এগোয়। ট্যাঙ্ক—ভরতি তেল নেয়। আবার স্কুটার ছাড়ে। উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে থাকে।

মধ্য কলকাতার অফিসপাড়ায় কত বাড়ি তৈরি হচ্ছে। দারুণ দারুণ বাড়ি, লাখ লাখ টাকা খরচ। ভিতরে কোটি কোটি টাকার লেনদেন।

অফিস, কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, জীবনবিমার বাড়ির ছায়ায় ছায়ায় অমিয় তার স্কুটার চালায়। শরীরের ঘাম মরে আসে। হাসি কিছু টাকা চেয়েছে। কত টাকা তা বলেনি। স্টিলের আলমারিতে শ'তিনেক আছে মনে হয়। অমিয়র পকেটে বড় জোর শ'খানেক। হাসি জানে, অমিয় এখন দড়ির ওপর হাঁটছে, তাই বেশি নেবে না বোধহয়। হাসি টাকা চায় না। মুক্তি চায়। কিন্তু ওকে এ সময়ে কিছু টাকা দিতে পারলে অমিয় খুশি হত।

সোনাদা যে—ব্যাঙ্কে চাকরি করে সেই ব্যাঙ্কটা পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থামে অমিয়। বছর তিনেক আগেই সোনাদা অ্যাকাউন্টস অফিসার ছিল। এখন কি আর—একটু ওপরে উঠেছে? সাহেবি ব্যাঙ্ক, একগাদা মাইনে পায় সোনাদা। কপালটা বড় হয়ে হয়ে অনেকটা মাথা জুড়ে টাক পড়েছিল। এখন বোধহয় টাকটা পুরো হয়ে গেছে। সোনাদা বরাবর গম্ভীর। দেখা হলে হাসে না, কথাও বেশি বলে না। পাত্তা না দেওয়ার ভাব। কিন্তু অমিয় জানে, সোনাদা মানুষটা বাইরে ওইরকম, ওর মুখে কথা কম, ভাবের প্রকাশ কম। কিন্তু এখনও অমিয়কে দেখলে ওর চোখের পাতা কাঁপে। স্নেহে, মমতায়। কত কষ্ট করেছে সোনাদা! বড় কষ্টে মানুষ।

অমিয় স্কুটার থেকে নেমে শীতাতপ—নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কটায় ঢুকে যায়। সোনাদার কাছে কোনও কাজ নেই। তবু এক বার অনেক দিন বাদে দেখা করে যেতে বড্ড ইচ্ছে করছে। মনটা ভালো নেই।

কাউন্টারে ভিড়। অজস্র সুন্দর কাউন্টারে ছাওয়া চার দিক। রঙিন দেওয়াল, টিউব—লাইট— সব মিলিয়ে ব্যাঙ্কটার ভিতরটা বড় চমৎকার।

জিজ্ঞেস করতেই একজন পিয়ন সোনাদার ঘর দেখিয়ে দেয়। ঘষা কাচের পাল্লা। বাইরে টুলে বেয়ারা বসে আছে। একটা টেবিলের ওপর সাজানো স্লিপ, ডটপেন।

নিজের নাম লিখে অমিয় স্লিপ পাঠায়। একটু পরে বেয়ারা এসে ডাকে।

প্রকাণ্ড টেবিলের ও—পাশে সুন্দর পোশাকের সোনাদাকে প্রথমটায় আত্মীয় বলে ভাবতে কষ্ট তার। গোলাপি রঙের টাক মাথায়, নীলাভ কামানো গাল, খুব ব্যস্ত।

এক বার চোখ তুলে আবার কাগজপত্রে ডুবে গেল। বসতেও বলল না। অমিয় একটু হেসে নিজেই বসে।

সোনাদা ওইরকমই। বসতে বলে না। জানে, বসতে বলার কিছু নেই। অমিয় তো বসবেই। এটা তার সোনাদার ঘর নয় কি?

ছোটবেলা থেকে তারা ভাইবোনেরা একে অন্যকে আপন বলে ভাবতে শিখেছিল। যৌথ পরিবার ওই একটা রক্তের গূঢ় সম্পর্ক তৈরি করে দিয়ে গেছে। এ জীবনে ওটা আর ভাঙবে না।

সোনাদা এক বার একফাঁকে প্রশ্ন করে, শরীরটা দেখছি শেষ করেছিস?

হুঁ।

কেন?

শরীরটা ভালো নেই।

কোম্পানি লালবাতি জ্বালেনি তো?

জ্বালছে।

জ্বালাই উচিত। তখন যদি ব্যাঙ্কের চাকরিটা নিতিস, আজ কত মাইনে হত জানিস?

কত?

হাজার খানেকের ওপরে। গর্দভ।

মাসে ওর চেয়ে অনেক রোজগার আমি করেছি। ব্যবসা বলে তোমরা গুরুত্ব দাও না। বাঁধা মাইনের লোকেরা ব্যবসাকে ভয় পায়।

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকায়। কোথায় একটা গোপন বোতাম টেপে, বাইরে রি রি করে বেল বাজে। বেয়ারা এলে সোনাদা চা আনতে বলে। তারপর আবার কাজেকর্মে ডুবে যায়।

ঠান্ডা ঘরখানা। অমিয়র ঝিমুনি আসে।

সোনাদা আবার চোখ তুলে তাকে দেখে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, প্রবলেমটা কী?

তুমি বুঝবে না। অমিয় শ্বাস ছাড়ে, তারপর বলে, সোনাদা, তুমি কি প্রমোশন পেয়েছ?

চাকরিতে থাকলে প্রমোশন হয়। তোর মতো ব্যবসাদাররা চিরকাল ব্যবসাদার থেকে যায়।

তুমি কি খুব বড় পোস্টে আছ?

সোনাদা হাসে। মাথা নাড়ে।

তা হলে আমার ব্যবসার জন্য তোমার ব্যাঙ্ক থেকে কিছু ধার পাইয়ে দাও না!

তোকে ধার দেবে কেন? ইন্ডাস্ট্রি বা এগ্রিকালচার হলেও না হয় কথা ছিল।

যদি সিকিউরিটি দেখাই, যদি হাই ইন্টারেস্ট দিই?

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে বলে, তোর আবার সিকিউরিটি কী? একটা পুরনো স্কুটার, ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায় একখানা ভাগের অফিস। আর কী আছে তোর? বড়জোর একখানা রিফিউজি সার্টিফিকেট, তা সেখানাও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছিস! কাজে লাগাতে জানলে রিফিউজি সার্টিফিকেটও মস্ত অ্যাসেট—কিন্তু তা তুই লাগালি কোথায়?

অমিয় চুপ করে থাকে।

সোনাদা আবার জিজ্ঞেস করে, প্রবলেমটা কী?

অমিয় উত্তর দেয়, তুমি বুঝবে না। মানুষ কত রকম গাড্ডায় যে পড়ে সোনাদা!

তোর গাড্ডাটা কী রকম?

অমিয় শুধু হাসে। চার দিকে এক বার তাকায়। যে চেয়ারে সে বসে আছে তা ফোম রাবারের গদিওয়ালা, টানলে শব্দ হয় না, ভীষণ ভারী। টেবিলখানা লম্বা এল—এর মতো। ঘসা কাচের দরজা, ঢেউখেলানো কাচ দিয়ে তৈরি ঘরের পার্টিশন। ও—পাশে লোকজন চললে কাচের ঢেউয়ে বিচিত্র প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই একখানা চেম্বার করতেই ইন্টিরিয়র ডেকরেটর অন্তত দশ—বিশ হাজার কি তারও বেশি নিয়েছে। এ—রকম একখানা অফিসঘর বানাবার ইচ্ছে তার অনেক দিনের। হবে না আর। এ—রকম নিস্তব্ধ কাচের ঘর, মাছি উড়লে যেখানে শব্দ পাওয়া যায়, এ—রকম ঠান্ডা ঘর, ফোম রাবারের গভীর তলিয়ে যাওয়া গদি, বিচিত্র ডিজাইনের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, আলো—এইসব আর কোনও দিন হবে না।

লাঞ্চে তুমি কী খাও সোনাদা?

তোর মুণ্ডু।

এই ঘরটা সাজাতে কত খরচ পড়েছে?

তোর মতো দশটা ব্যবসাদারকে বিক্রি করলে যত ওঠে।

এরা তোমার বাড়ি—ভাড়া দেয়? গাড়ি?

সোনাদা তাকে গ্রাহ্য না করে কাজ করে যায়। কিন্তু সোনাদার কপালে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দেয়। কাজ করতে করতেও এক—আধবার চোরা চোখে অমিয়কে দেখে নেয়।

অমিয় বলে, উঠি।

বোস। প্রবলেমটা কী বলে যা।

কিছু না।

টাকা সত্যিই চাস?

অমিয় মাথা নাড়ে, না।

দরকার হলে ম্যাক্সিমাম হাজারখানেক নিতে পারিস। ব্যাঙ্কের টাকা নয়, আমার টাকা।

কোনও দিন নিয়েছি?

সোনাদা চুপ করে থাকে।

অমিয় বলে, তুমি যদি সাপ্লায়ার হতে, কিংবা সুদখোর মহাজন, কি আমার ক্লায়েন্ট, তো নিতাম। তুমি আমার সোনাদা, কিন্তু আমার ব্যবসার কেউ নও। তোমার কাছ থেকে নিলে আমি তোমার আর পাঁচজন আত্মীয়ের মতো নিচু হয়ে যাব।

তার মানে?

অমিয় হাসে, আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে সাকসেসফুল। তোমার কাছ ঘেঁষে বহু আত্মীয় ঘোরাফেরা করে, আমি জানি। কিন্তু তুমি জেনে রেখো, আমি তাদের দলে নই।

সোনাদা একটু হাসে।

সোনাদা, আমার একটা প্রবলেমের কথা তোমাকে বলব? শুনবে ঠিক?

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। ছোট্ট একটা নড করে।

আমি প্রায়ই একটা স্টিমারঘাটকে দেখতে পাই।

সোনাদা নড়েচড়ে বসে বলে, কী রকম?

আমি যেন উঁচু বালির চড়ায় বসে আছি। অনেক দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ি গড়িয়ে গেছে—আধমাইল—একমাইল—তারপর ঘোলা জল—একটা জেটি—প্রকাণ্ড নদী দিগন্ত পর্যন্ত। কখনও কখনও দেখি, রাতের স্টিমারঘাট—কেবল বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে, জেটির গায়ে জলের শব্দ—ও—পারে ভীষণ অন্ধকার। কেন দেখি বলো তো?

সোনাদা তাকিয়ে থাকে।

এ কি মৃত্যুর প্রতীক নাকি? অমিয় বলে।

ইয়ারকি হচ্ছে?

ইয়ারকি নয় সোনাদা। কাজকর্মে, ঘুরতে—ফিরতে হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে ওই বালিয়াড়ি, আর বালিয়াড়ির পর জেটি, জল—এইসব ভেসে ওঠে।

সোনাদার চোখ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ব্যস্ত সোনাদা একটু হেলান দিয়ে বসে। টেবিলের ওপর থেকে হাতড়ে ইন্ডিয়া কিংসের সোনালি প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ অমিয়র নাকে এসে লাগে। সোনাদার সামনে খায় না, নইলে এই মুহূর্তে তারও একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যৌথ পরিবারের শিকড়—বাকড় সব রয়ে গেছে ভিতরে। সোনাদার সামনে কোনও দিনই আর সিগারেট খাওয়া যাবে না।

সোনাদা বলে, এ—সবই নস্ট্যালজিয়া। আমারও হয়। দেশের বাড়িতে করমচা তলার ছায়ায় মাটির ওপর শ্যাওলা গজাত। সেই ঠান্ডা জায়গাটার কথা হঠাৎ কেন যে মনে পড়ে।

অমিয় মাথা নাড়ে, না এটা শৈশব স্মৃতি নয়। স্টিমারঘাট আমি আর ক'বার দেখেছি। দু'তিন বার বড় জোর। তারপরই তো কলকাতায় পার্মানেন্ট চলে এলাম। তাছাড়া সেই স্টিমারঘাট তো দেশে যাওয়ার গোয়ালন্দি ঘাট নয়। এটা কেমন যেন ধু ধু বালুর চর, নির্জন অথৈ ঘোলাজল, ও—পারটা দেখা যায় না।

সোনাদা হাসে। বলে, ভালো খাওয়া—দাওয়া কর। হাসিকে নিয়ে কিছুদিন বাইরে—টাইরে ঘুরে আয়।

অমিয় অবাক হয়ে বলে, কেন?

তা হলে ও—সব সেরে যাবে।

সারাতে চাইছে কে? আমার তো খারাপ লাগে না। কলকাতার ভিড়ভাট্টা গরম, ঘাম, কাজকর্মের ভিতরে মাঝে মাঝে হঠাৎ ছুটি পেয়ে একটা অচেনা স্টিমারঘাটে চলে যাই, বালিয়াড়িতে বসে থাকি, বেশ লাগে। একে সারাব কেন? শুধু জানতে চাইছি, ব্যাপারটা কী। তুমি জান?

উত্তর দেওয়ার সময় পান না সোনাদা। স্টেনোগ্রাফার পারশি মেয়েটি ঘরে ঢোকে। লম্বা ফরসা, ভাঙাচোরা মুখ। তবু মুখে একটা অদ্ভুত শ্রী আছে। দারুণ একখানা বাটিকের শাড়ি পরনে। মেয়েটা সোনাদার ডান দিকে গিয়ে নিচু হয়ে একটা টাইপ করা চিঠি দেখায়। কথা বলাবলি হয়। ততক্ষণ অমিয় মেয়েটার শাড়ি দেখে। হয়তো বা এ—রকম শাড়িতে হাসিকে ভালো মানাত। হাসির কথা মনে পড়তেই অমিয়র এক ধরনের শারীরিক কষ্ট হয়। বুক—পেট জুড়ে একটা তীক্ষ্ন বেদনার আভাস পাওয়া যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। বুক ধড়ফড় করে। একটা চেক—আপ বোধহয় অমিয়র দরকার ছিল। বয়স পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশ, ইররেগুলার জীবন, অতিরিক্ত চা আর সিগারেট, ব্যবসার উত্তেজনা, শক, সব মিলিয়ে ভিতরটা ভালো থাকার কথা নয়। হাসিকে এই শাড়িটায় বোধহয় এখনও মানায়। নীলের ওপর হলুদ বাটিকের কাজ। পকেটে একশোর কাছাকাছি টাকা আছে। বাজার ঘুরে এক বার খুঁজে দেখবে নাকি শাড়িটা। অবশ্য তা আর হয় না। হাসি বড় অবাক হবে, তাকিয়ে থাকবে, বা দু'—একটা বিদ্রূপাত্মক কথাও বলতে পারে। দরকার নেই। হাসি নিষ্ঠুর। তার হৃদয় নেই।

মেয়েটা ফাইলিং ক্যাবিনেটে কাগজপত্র ঘাঁটে। সোনাদা আবার কাজকর্মে ডুবে যায়। একজন—দুজন করে অফিসে লোকজন আসে। সুন্দর পোশাকের চটপটে লোকেরা। সোনাদা হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে, চমৎকার ইংরেজিতে কথা বলে। বিজনেসের পিক—আওয়ার। সোনাদার দম ফেলার সময় নেই।

এক ফাঁকে অমিয় বলে, সোনাদা, উঠি।

কাগজপত্র ঘেঁটে কী একটা খুঁজে পায় সোনাদা। সেটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলে অমিয়কে বলে, সামনের সোমবার মিন্টুর জন্মদিন। তোর বউদি হয়তো হাসিকে খবর দিয়েছে। তবু বলে রাখছি, বিকেলের দিকে হাসিকে নিয়ে চলে যাস, রাতে খেয়ে একেবারে ফিরবি।

আচ্ছা।

তোর স্টিমারঘাটের ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব।

অমিয় হাসে। জন্মদিনে যাওয়া হবে না। স্টিমারঘাটের কথা সোনাদা ভুলে যাবে।

ব্যাঙ্কটা থেকে বেরোতেই জ্বরো কলকাতা চেপে ধরে। কী তাপ রোদের। গুমোট।

অমিয় তার স্কুটার চালু করে। কোথায় যাবে, ভেবে পায় না, তবু যায়। যেতে থাকে।

টিফিন। কিন্তু টিফিনের সময়েও সোমাদি বাইরে যায় না, আড্ডা মারে না। নিজের জায়গায় বসে থাকে। প্রকাণ্ড হলঘরের একধারে টাইপিস্টদের সারি সারি মেশিন। সব খালি। কেবল সোমাদি ঠিক বসে আছে। ডান হাতে একখানা এককামড় খাওয়া টোস্ট, আলতো ভাবে ধরা, বাঁ হাত মেশিনে ছোবল মারার জন্য উদ্যত। অমিয় এগিয়ে যেতে শুনল টুক করে মেশিনের একটা অক্ষর লাফিয়ে উঠল। অমিয়র করুণা হয়।

সোমাদির বয়স পঁয়তাল্লিশের নীচে নয়। সিঁথির কাছে চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে প্লাস পাওয়ারের চশমা। রোগা গড়নের বলে বয়স খুব বেশি দেখায় না, কিন্তু দীর্ঘদিনের ক্লান্তির ছাপ আছেই। নাকের দু'ধার দিয়ে গভীর রেখা নেমে গেছে, মেচেতার ছোপ ধরেছে মুখে। বছরে বড়জোর এক—দু'দিন ছুটি নেয়। চোদ্দো বছর টানা চাকরি করছে আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোলে, তবু চাকরি পাকা হয়নি। কন্ট্রোল উঠে যাবে চাকরি কারওই পাকা নয় এখানে। ওর বিয়ের জন্য কেউ তেমন করে চেষ্টাই করল না। পিসেমশাই মারা যাওয়ার পর একটা চাকরিতে ঢুকেছিল, তারপর চাকরিই করে গেল। বার দুই দুটি ছেলেকে বোধহয় ভালো লেগেছিল। তাদের একজন ছিল ভিন্ন জাতের, অন্যজনের ছিল কম বয়স। হল না। হবেও না। সোমাদি তা জানে বলেই কোথাও আর যায় না। মনপ্রাণ দিয়ে চাকরি করে। ছুটি পেলে হাঁফ ধরে যায়।

টোস্টটা আর—এক কামড় খাওয়ার জন্য মুখের কাছে এনে সোমাদি তাকায়। প্রথমটায় বোধহয় চিনতেই পারে না। তাকিয়ে থাকে।

সোমাদি, কেমন আছ?

সোমাদি টোস্টটা রেখে দিয়ে একটু চেয়ে থেকে বলে, বেরো বেরিয়ে যা।

কেন?

লজ্জা করে না? এক বছরের মধ্যে এক বার মাকে দেখতে যাওয়ার সময় হয়নি। কতবড় অসুখ গেল মা'র, তোকে দেখার জন্য আকুলি—বিকুলি, তিনটে চিঠি দিলাম, একটা উত্তরও দিসনি। বেরো—কেন এসেছিস?

তুমি কত মাইনে পাও?

তাতে কী দরকার? চালাকি ছাড়।

চালাকি না। সত্যিই জিজ্ঞেস করছি।

ভারী তো ব্যবসা। অফিসে মাছি ওড়ে, সেই ব্যবসা করেই তোর সময় হয় না? অমানুষ!

একটা চেয়ার টেনে অমিয় বসে নিজের থেকেই। মাঝখানে মেশিন, ও—পাশে সোমাদি। বলে, এর পরের জেনারেশনে আর এইসব চোটপাট শোনা যাবে না সোমাদি। যা বকাবকি করার তা তোমরাই করে নিলে।

তার মানে?

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একটা ফ্যামিলি আছে। স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চা ছেলে একটা। একদিন সাজগোজ করে বিকেলে কোথায় বেরোচ্ছে, ছেলেটার গাল টিপে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছ বাবু? সে উত্তর দিল—ঠাকুমার বাড়ি। বুঝলে সোমাদি,—কথাটা সেই থেকে বুকে মাঝে মাঝে ধাক্কা দেয়। ঠাকুমার বাড়ি! মাই গড, ঠাকুমার বাড়ি যে একটা আলাদা বাড়ি, সেখানে যে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া যায় তা আমরা ভাবতেই পারি না এখনও। ঠাকুমার বাড়ি আবার কী? ঠাকুমা যে আমাদের রক্ত—মাংস মজ্জায় মিশে আছে—তার বাড়ি কী করে আলাদা বাড়ি হয়। এই যে তুমি আমাকে বকছ, পিসিমাকে দেখতে যাইনি বলে, এ—সব সম্পর্কের টান আমাদের সময়েই শেষ। এরপর পিসতুতো মামাতো ভাইবোনে দেখা হলে হয়তো হাতজোড় করে নমস্কার করবে, আপনি আপনি করে কথা বলবে। বলবে, এক দিন কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাবেন, কেমন। খুব খুশি হব।

সোমাদি একটু হাসে। বলে, তোর সঙ্গে তো আমাদের সম্পর্ক তা—ই দাঁড়িয়ে গেছে। এক বছরে ঢাকুরিয়া থেকে বেহালা যাওয়ার সময় হয় না, কী করে বুঝব যে সম্পর্ক রাখতে চাস?

গত এক বছর ধরে আমি ভালো নেই সোমাদি।

কী হয়েছে?

তুমি কত মাইনে পাও বললে না?

জেনে কী হবে?

এমনিই। কৌতূহল। বলো না।

সব কেটে—ছেঁটে পৌনে আটশো। হাসি কেমন আছে?

ভালো। গত বছর তুমি একটা স্টিলের আলমারি কিনেছ আর একটা সিলিং ফ্যান, না?

সোমাদি হাসে, এ বছর একটা সুতোর কার্পেট কিনেছি, ড্রেসিং টেবিল করেছি, গ্যাসের উনুন কিনেছি। দেখে আসিস।

পৌনে আটশোর মধ্যে কী করে ম্যানেজ করো? তোমার তো উপরিরও রাস্তা নেই।

এইসব জানতেই এসেছিস? হাসিকে নিয়ে কবে যাবি বল?

তোমার পোষ্যও তো কম নয়। পিসিমা, নীতা তোমার এক জ্যাঠতুতো ভাই তোমার কাছেই থাকে, কী করে ম্যানেজ করো?

কী করব! তোরা ভাইরা তো আর মাসোহারা দিস না, ওতেই কষ্টে সৃষ্টে ম্যানেজ করে নিই। একটা টোস্ট দিয়ে টিফিন সারি, বিড়ি—সিগারেট খাই না, সাদামাটা পোশাক করি, সিনেমা দেখি কালেভদ্রে, কোথাও বেড়াতেও যাই না। তোদের তো তা নয়। হাসির খবর কিছু বললি না, বাচ্চাকাচ্চা হবে নাকি?

তুমি খুব কষ্ট করো, না সোমাদি?
দূর পাগলা, তোর হয়েছে কী? এ—সব বলছিস কেন?
তুমি এত কষ্ট করছ কেন?
কেন আবার, নিজের জন্য।
দূর। নিজের জন্য কষ্ট করে সুখ কী। কষ্ট করলে করতে হয় ভালোবাসার মানুষের জন্য। তুমি সবচেয়ে বেশি কাকে ভালবাসো সোমাদি?
কী জানি? তোর হয়েছে কী?
কিছু না!
হাসিকে নিয়ে কবে যাবি? হাসি তো আমাদের ভালো করে চিনলই না।
যাব একদিন ঠিক। আগে বলো, তুমি কার জন্য এত কষ্ট করছ?
বললাম তো, নিজের জন্য।
তবে তো তুমি নিজেকে ভালোবাসো।
বললাম তো, বাসি।
আমি বাসি না।
তুই হাসিকে বাসিস। ভালোবাসলেই হল।
নিজেকে ভালোবাসলে হাসিকেও ভালোবাসা যায়। এই যে তুমি নিজেকে ভালোবাসো বললে, স্বামী—পুত্র হলে তাদেরও বাসতে, বাধা হত না। ভালোবাসা তো মাস—মাইনে নয় যে টান পড়বে।
হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি? কী হয়েছে বল? দরকার হলে আমি না হয় গিয়ে হাসিকে বুঝিয়ে—সুঝিয়ে মিটমাট করে আসি। মাত্র তিন বছর হল বিয়ে, এখনই ঝগড়াঝাটি হলে—
পাকামি কোরো না। ম্যারেড লাইফ সম্পর্কে তুমি কী জানো? ওই ব্যাপারে আমি তোমার সিনিয়র।
তা হলে এই গরম দুপুরে ঘামে নেয়ে এসে ভালোবাসা ভালোবাসা করছিস কেন? কিছু খাবি? বেয়ারা ডেকে কিছু আনিয়ে দিই। একটা ডিমভাজা—না গরমে একটু দই খাবি?
আমার মুশকিল কী জানো?
কী?
আমি হাসিকে ভালোবাসতাম, ব্যবসাকে ভালোবাসতাম, স্কুটারকে ভালোবাসতাম, কিন্তু এইসব ভালোবাসার মাঝে মাঝে একটা স্টিমারঘাট এসে পড়ছে।
স্টিমারঘাট?
হুঁ।
সোমাদি চেয়ে থাকে। বলে, কী বলছিস?
খুব উঁচু বালিয়াড়ি থেকে তুমি কখনও কোনও নির্জন ফেরিঘাট দেখেছ? একটা জেটি—তারপর বিশাল ঘোলা জলের নদী... ও—পারটা ধু ধু করে... দেখা যায় না। দেখেছ? আমি চোখ বুজলেই দেখি।
সোমাদির মুখটা কেমন হয়ে যায় যেন। বয়েস হয়ে যাওয়া, কৃচ্ছ্রসাধনের ছাপওলা নীরস মুখ সোমাদির। তবু কয়েক পলকের জন্য যেন একটা কোমলতা গাছের ছায়ার মতো মুখে খেলা করে। মুখের কর্কশ রেখাগুলি লাবণ্যের সঞ্চারে হঠাৎ ডুবে যায়।
কোন স্টিমারঘাটের কথা বলছিস? কলকাতার গঙ্গা, না কি গোয়ালন্দ, আমিনগাঁতেও ফেরিঘাট দেখেছিলাম।
ও—সব নয়। এ একটা অন্য রকম ফেরিঘাট। বহ দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ি, তারপর ঘোলা জল—চোখ বুজলেই দেখতে পাই। ভীষণ ভয় করে, আবার ভীষণ ভালোও লাগে।

আমি ঠিক জানি, তুই হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস। কিংবা ব্যবসাতে মার খেয়েছিস। কত টাকা রেখে গিয়েছিল মামা?

হাজার দশেক।

সেটাই ভুল হয়েছিল। কে যে তোর মাথায় ব্যবসা ঢুকিয়েছিল। বাঙালি ছেলে আবার কবে ব্যবসা করতে শিখেছে। তার চেয়ে একটা বাড়ি করে ভাড়াটে বসিয়ে গেলে—

স্টিমারঘাটটার কথা তুমি কিছু জানো না, না?

কী জানব? তোর মাথায় যত সব পাগলামির পোকা। হাসিকে নিয়ে কবে আসবি বল?

তোমার কিছু মনে হয় না? স্টিমারঘাট বা ও—রকম কিছু?

সোমাদি হাসে। বলে, আচ্ছা জ্বালাতন! ভাবনা—চিন্তা করার সময় কোথায় আমার বল তো? সকাল সাড়ে আটটার লেডিজ স্পেশাল ধরতে বেরোই, মাইলখানেক হেঁটে বাস রাস্তা, অফিসে সারাক্ষণ কাজ, ফিরতে ফিরতে আটটা হয়ে যায়। তখন শরীরে থাকে কী? খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্নও দেখি না।

অমিয় শ্বাস ফেলে। বলে, তুমি কাঠ হয়ে গেছ।

একটু ইতস্তত করে সোমাদি বলে, তোর দেশের পুকুরঘাটের কথা মনে পড়ে। খুব বড় বড় কচুপাতা বাতাসে নড়ত। মাছ ফুট কাটত জলে। কদমগাছের ছায়ায় আমরা গঙ্গা যমুনা খেলতাম। মনে হওয়ার কি শেষ আছে! কত কী মনে হয়। ও—সব নিয়ে ভাবনার কী। হাসির সঙ্গে ভাব করে ফেল। ফেরার সময় একখানা শাড়ি আর দুটো সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে যা। কালকের দিনটা হোটেল—রেস্টুরেন্টে খাস। এ—রকম একটু—আধটু করলেই দেখিস আর ঝগড়া হবে না।

তুমি এ—সব কবে থেকে ভেবে রেখেছ সোমাদি! বিয়ে হলে বরের সঙ্গে কীরকম সব মান—অভিমান হবে, সব ভেবে রেখেছিলে। আর বলছ, ভাববার সময় পাও না!

সোমাদি হেসে ওঠে। বলে, ঠিক বলেছিস।

একজন—দুজন করে মেশিনগুলোর সামনে মেয়েরা এসে বসছে। টিফিন শেষ।

অমিয় উঠে দাঁড়ায়।

চলি।

সোমাদি প্লাস পাওয়ারের চশমার ভিতর দিয়ে তাকায়। চোখে অন্যমনস্কতা। বলে, সম্পর্কটা রাখিস অমিয়। মাকে গিয়ে দেখে আসিস। হার্ট ভালো না, কখন কী হয়ে যায়।

যাব।

অফিসে এসে অমিয় দেখে, কেউ নেই। দুপুরের ডাকে ইনশিওরেন্সের একটা চিঠি এসেছে। গত বছরের প্রিমিয়াম বাকি। বছর তিনেক আগে, বিয়ের পরই দশ হাজার টাকার একটা পলিসি করিয়েছিল। দু'বছর প্রিমিয়াম টেনেছে। যাকগে, পেইড আপ হয়ে যাবে।

গ্লাসের নীচে চাপা দিয়ে কল্যাণ একটা চিঠি রেখে গেছে—বাগচী, হায়দার তাগাদায় এসেছিল। ভুজুং ভাজুং দিয়ে বিদায় করেছি। ইনকাম—ট্যাক্সের অজিতকে এক বার ফোন করবেন, ওকে আপনার কথা বলা আছে। ওর দাদা একটা লোন সোসাইটির মেম্বার, একটা লোন পাইয়ে দিতে পারে। আমি সিনেমায় যাচ্ছি, আজ ফিরব না। রাজেনের কাছে চারশো টাকা রাখা আছে। কাল সকালেই গিয়ে মিশ্রিলালকে দিয়ে আসবেন। ফুড—সাপ্লাইটা ছাড়বেন না—

চোখটা একটু ঝাপসা লাগে। চিঠিটা রেখে দেয় অমিয়। অফিস—ঘরটা নির্জন। পাখার হাওয়ায় কোথায় যেন একটা কাগজ উড়বার শব্দ হয় কেবল। অমিয় বসে হাই তোলে। তারপর টেবিলে মাথা রেখে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে।

বিকেলের দিকে রজত ফিরে এসে ডাকে, বাগচী—

উঁ।
আমার কাছে কেউ এসেছিল?
না।
দূর! কেউ আসেনি!
রাজেনকে জিজ্ঞেস করুন তো।
করেছি। ও তো বিশ বার বাইরে যাচ্ছে চা খাবার সিগারেট আনতে। আমার মোটর পার্টসটা দিয়ে গেল না শালা রায়চৌধুরী। কাল ডেলিভারি নিতে আসবে।
অমিয় আড়মোড়া ভাঙে। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। বাইরে এখনও ফরসা রোদ।
রজত তার চেয়ার টেনে বলে, ব্যবসার মুখে পেচ্ছাপ। ভিসা পেয়ে যাচ্ছি কাল।
কবে রওনা?
দিন পনেরোর মধ্যে। প্রথমে ডুসেলডর্ফে যাব মাধুর কাছে। সেখান থেকে বন হয়ে কাজের জায়গায়। দাঁড়ান, আজ আমি চা খাওয়াব, সন্দেশ খাবেন?
খাব। খুব খিদে পেয়েছে। অমিয় বলে।
বেল বাজায় রজত। রাজেন এলে চা সন্দেশ আনবার পয়সা দেয়। তারপর অমিয়কে বলে, খুব দামি সিগারেট কী আছে বলুন তো?
আপনি তো খান না।
আজ খাব।
ইন্ডিয়া কিংস।
রাজেনের দিকে ফিরে রজত বলে, ইন্ডিয়া কিংস এনো এক প্যাকেট, আর দেশলাই। বাগচী, যাওয়ার আগে একটা পার্টি দেব।
অমিয় হাসে।
শুধু একটা ভয়, বুঝলেন বাগচী!
কী?
এর আগে গুরুপদ গিয়েছিল। ল্যাংগুয়েজ জানত না বলে ওকে ফেরত পাঠিয়েছে। আমিও ভালো জানি না। ওদিকে ব্রজগোপালদাকে দিয়ে জার্মান ভাষায় করেসপন্ডেন্স করেছি, নিজে শেখবার সময়ই পেলাম না। শেষে গুরুপদর মতো ফেরত পাঠাবে না তো?
সকলের কপাল সমান না।
চেয়ারটা পিছনে হেলিয়ে একটু দোল খায় রজত। ভাবে। বলে, অবশ্য মাধুও জানত না। কোম্পানি ওকে তবু রেখে দিয়েছে।
অমিয় রজতকে একটু দেখে। অন্তত দশ বছরের ছোট রজত। বাচ্চা ছেলে। কোনও জমিতেই শেকড় নেই। কলকাতায় জন্ম—কর্ম। অমিয়র মনে হয়, কলকাতায় জন্মালে মাটির টান থাকে না। রজতের খুব ইচ্ছে, আর ফিরবে না। একটা আবছায়া স্টিমারঘাট চোখের সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অমিল ক্যালেন্ডারের ছবিটা দেখে। একজন মেয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় একটা কলসি, কোমরের কলসিটা কাত করে ধরা তা থেকে অঝোরে জল পড়ে যাচ্ছে।
রজত মুখ তুলে বলে, আমার একটা লাভ অ্যাফেয়ার প্রায় ম্যাচিওর করে এসেছিল বুঝলেন বাগচী!
হুঁ।
সেটার কী করব বলুন তো?
আপনার কী ইচ্ছে?
ইচ্ছে নেই।

অমিয় চেয়ে থাকে।

রজত আবার বলে, চলেই যাচ্ছি যখন, তখন আবার এখানে একটা ফ্যাকড়া রেখে যাই কেন! মেয়েটা হয়তো অপেক্ষা করবে। করতে করতে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাবে। এক ফাঁকে এসে অবশ্য বিয়ে করে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু তার আর কী দরকার! ওখানেই যখন বরাবর থাকব তখন ওদিকেই বিয়ের সুবিধে। তাই মেয়েটাকে সব বুঝিয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাব। ভালো হবে না?

অমিয় মাথা নেড়ে বলে, হবে।

রজতকে খুশি দেখায়। সে এক বার শিস দেয়, দু'কলি গান গুন গুন করে গায়।

কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। কেউ আসছে। টপ করে নিজের অজান্তেই উঠে পড়ে অমিয়।

রজতবাবু, কেউ এলে কাটিয়ে দেবেন। আমি বোসের ঘরে ফোন করতে যাচ্ছি।

রজতের অভ্যাস আছে। অনেক দিন ধরেই অমিয়র সময় ভালো যাচ্ছে না। রজত মাথাটা হেলিয়ে একটু হাসল, ঠিক আছে ঠিক আছে। বাগচী, উই আর কমরেডস আফটার অল—

সিঁড়ি দিয়ে যে উঠেছে সে যে—ই হোক অল্পের জন্য অমিয়কে ধরতে পারল না। অন্ধকার প্যাসেজটা প্রায় লাফিয়ে পার হয়ে এল অমিয়।

বোস বুড়ো মানুষ। দুই ভাই পাশাপাশি চেয়ারে বসে থাকে। এক সময়ে ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার হিসাবে একটু নাম ছিল। এখন কিছু নেই। অফিস আছে। এই পুরো তিনতলাটা তাদের লিজ নেওয়া। লিজ নিয়ে কল্যাণের তৃষ্ণা এবং আরও কয়েকজনকে অফিস ভাড়া দিয়েছে। ওইটাই আয় এখন। জটাওয়ালা একজন তান্ত্রিক এসে প্রায়ই দুই ভায়ের মুখোমুখি বসে থাকে। আজও আছে। ঠান্ডা অন্ধকার ঘরে তিনজন বয়স্ক, নিস্তব্ধ মানুষ। কোনও কাজ নেই।

টেলিফোনটার সামনে একটু দাঁড়ায় অমিয়। কাকে ফোন করবে বুঝতে পারে না। কোনও নম্বর মনে আসে না। তবু হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নেয়, ডায়াল টোন শোনে। কিড়—কিড় শব্দ হয়। কোনও নম্বর মনে আসে না। তবু অমিয় আঙুল বাড়ায়। দুইয়ের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে ডায়াল ঘোরায়। তারপর তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত—। অপেক্ষা করে। টেলিফোন একটু নিস্তব্ধ থাকে। তারপর খুট করে একটা শব্দ হয়। পরমুহূর্তে হঠাৎ অমিয়কে চমকে দিয়ে ওপাশে একটা দীর্ঘ টানা মুমূর্ষু চিৎকার শোনা যায়—অমিয়—ও—ও, অমিয়—ও—ও—

অমিয় কেঁপে ওঠে প্রথমে। 'কে?' বলে চিৎকার করতে গিয়েও থেমে যায়। তারপর বুঝতে পারে, ওটা এনগেজড সাউন্ড। ধীর কান্নার মতো বিষণ্ণ শব্দ। কত বার শুনেছে সে। আসলে মনটা ঠিক জায়গায় নেই। ফোনটা আবার রেখে দেয় অমিয়। দাঁড়িয়ে থাকে। একটু আগে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে এল তা ভাবতে চেষ্টা করে। অন্ধকার সিঁড়িতে আবছায়া নতমুখ একটা অবয়বকে এক ঝলক দেখেছিল। একটু সময় কাটানো দরকার।

আবার ডায়াল ঘোরায় অমিয়। সম্পূর্ণ আন্দাজে। কোন নম্বরে আঙুল তা তাকিয়ে দেখে না। খুব খিদে পেয়েছে অমিয়র। মুখটা তেতো—তেতো। বোধহয় পিত্তি পড়েছে। সকাল থেকে সে প্রায় কিছুই খায়নি। মাথাটা ঘোরে। শরীর দুর্বল লাগে। এর পর থেকে অফিসের নীচে, খোলা রাস্তায় আর স্কুটারটা রাখা যাবে না। নীচে স্কুটারটা দেখে সবাই বুঝতে পারে, অমিয় অফিসে আছে। আহমদকে বলবে একটা গোপন জায়গায় বন্দোবস্ত করতে। ঘড়ির দোকানের পাশে একটা এঁদো গলি আছে—সেখানে রাখলে কেমন হয়?

ফোনটা কানে চেপে ধরে থাকে অমিয়। ডায়াল টোন থেমে গেছে। এইবার নম্বর আসবে। অমিয় অপেক্ষা করে। স্পষ্ট শুনতে পায় ওপাশে দু'—একটা কলকবজা নড়ছে, লিভার উঠছে। প্রথমে ভার্টিকাল তারপর হরাইজন্টাল খোঁজ শুরু করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র! কিন্তু নম্বরটা খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজছে—প্রাণপণে খুঁজছে যন্ত্রটা। খুঁজে পাচ্ছে না। অমিয় অপেক্ষা করে। যন্ত্রের শব্দ থেমে যায়। নম্বরটা কি পাবে না অমিয়? সে অপেক্ষা করে।

যন্ত্রটা অস্ফুট শব্দ করে, তারপর প্লাগ দেয়। রিং করার শব্দ হয় না, এনগেজড থাকারও শব্দ হয় না। কিন্তু তবু কানেকশন ঠিকই পায় অমিয়। স্পষ্ট বুঝতে পারে, ও—পাশে টেলিফোন হাতে নিয়েছে এক গভীর নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতায় খুব উঁচু থেকে বালিয়াড়ি নেমে গেছে বহু দূর। ধু ধু বালিতে শব্দহীন জ্যোৎস্না পড়ে আছে। হাড়ের মতন সাদা বালি—গড়ানে—তারপর অন্ধকার জেটি, ঘোলা জল। শেয়ালের চোখের মতো চকচক করে ওঠে জোনাকিপোকা। এ—পারে দিনের আলো থেকে ও—পারে গভীর রাতের মধ্যে চলে যায় টেলিফোন। সেখানে বাতাসের শব্দ নেই, জলের শব্দ নেই। বালির ওপরে একটা সাপের খোলস উলটে পড়ে আছে। বালিতে ঢেউয়ের দাগ। বহু দূর—দিগন্তব্যাপী সেই নিস্তব্ধতা টেলিফোন ধরে থাকে ও—পাশে। অমিয় সেই নিস্তব্ধতাকে শোনে।

ক'দিন ধরেই ইঁদুরের খুটখাট সারা বাড়িময় শুনছে হাসি। কখনও ওয়ার্ডরোবে, কখনও খাটের তলায়, জুতোর র‍্যাকে, রান্নাঘরে। অবিরল দাঁতে কেটে দিচ্ছে সংসার। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে মাঝে মাঝে শুনেছে এক ঘর থেকে আর—এক ঘরে চিঁ—চিক—চিক আনন্দিত চিৎকার ছুটে যাচ্ছে। কুড়—কুড়—কুড়—কুড় কাটার শব্দ হয়েছে। হাসি তেমন গা করেনি। কাটছে কাটুক।

সকালে অমিয় বেরিয়ে যাওয়ার পরই হাসি গোছগাছ করতে বসেছে। থাকে থাকে সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার জমে গেছে। এতসব পরার সময় হয়নি। ট্রাঙ্ক ভরতি রয়েছে শাড়ি, র‍্যাকে নানা রকমের জুতো, ড্রেসিং টেবিলে সাজগোজের অসংখ্য টুকিটাকি। এ—সব কিছুই নেবে না সে। দু'—চারটে মাত্র নেবে... যা না হলে নয়।

নীচের থাক নাড়া দিতেই হাসি দেখতে পায় ইঁদুরের কাটার চিহ্ন। তার সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের এখানে—সেখানে ফুটো। গরম—জামার থাক ভরতি জামা—কাপড় কেটে রেখেছে। কত কী কেটেছে দেখার জন্য হাসি সব জামা—কাপড় নামিয়ে মেঝেতে স্তূপ করে। একটা পুরনো ফুলহাতা সোয়েটারে জড়ানো দু' বান্ডিল চিঠি। চিঠির বান্ডিল তুলতেই ঝুরঝুর করে কাগজের টুকরো ঝরে পড়ে। অমিয় দু' দফায় দিল্লি আর কানপুর গিয়েছিল। প্রথমবার দু' মাস, দ্বিতীয়বার মাসখানেকের জন্য। আর দু'বার বাপের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন করে ছিল হাসি। সেইসব সময়ে অমিয় লিখেছিল এইসব চিঠি। ইঁদুর নষ্ট করে গেছে। সবচেয়ে ওপরের চিঠিটা খুলে কয়েক পলক দেখে হাসি। ছিদ্রময় প্রেমপত্র। 'প্রিয়তমাসু...' হাসি পড়তে থাকে... 'তোমার জন্য ভীষণ (ফুটো) হয়ে আছি। কবে আসছ? তোমার জন্য এমন (ফুটো) লাগছে যে কী বলব। আমার (ফুটো) ভিতরটা তো তুমি (ফুটো) পাও না... রানি আমার, আমার (ফুটো), কবে (ফুটো)? তোমার জন্য আমি সব (ফুটো) পারি। তাড়াতাড়ি চলে (ফুটো)...'

হাসি একটু হাসে। চিঠিটা দেখে নয়। প্রেমপত্র লিখতে অমিয় জানে না। দু'—চারটে দুর্দান্ত এলোমেলো আবেগের লাইন লিখেই তার সব কথা ফুরিয়ে যায়। কোনও ইনল্যান্ডের একটার বেশি ফ্ল্যাপ ভরতি করতে পারেনি সে।

ছিদ্রময় এই চিঠিগুলো নিয়ে কী করবে তা ঠিক করতে পারে না সে। নিয়ে যাবে? না কি পুড়িয়ে ফেলবে? ভাবতে ভাবতেই আবার পুরনো পুলওভারে চিঠিগুলো জড়িয়ে ওয়ার্ডরোবে আগের জায়গায় রেখে দেয়। থাকগে। থাকতে থাকতে একদিন পুরনো হয়ে হয়ে ধুলো হয়ে যাবে আপনা থেকে।

মধুকে ডেকে হাসি ন্যাপথলিন আনতে বলে, আর ইঁদুর—মারা বিষ। তারপর একে একে ট্রাঙ্ক বাক্স, স্টিলের আলমারি—সবই খুলে ফেলে সে। জামা—কাপড় নামায়, ছিদ্র খুঁজে দেখে। সব জায়গাতেই হয়েছে ইঁদুরের দাঁতের দাগ। ভিতরে ভিতরে সব ফোঁপরা করে দিয়ে গেছে। আবার সব গোছ করে তুলতে বেলা গড়িয়ে যায়। সঙ্গে নেওয়ার জন্য সাদামাটা কয়েকটা জামা—কাপড় আলাদা করে রাখে হাসি। দু'—একটা প্রসাধন। কিছু টাকা। কবে যাওয়া হবে তার কিছু ঠিক নেই। দার্জিলিং মেলে এখন সামার—রাশ। জামাইবাবুকে রিজার্ভেশন করতে বলা আছে।

ঘর—দোর আবার ঝাঁট দেয় হাসি, আটার গুলিতে বিষ মিশিয়ে রাখে ওয়ার্ডরোবে, খাটের তলায় রান্নাঘরে। স্নান করে খেয়ে উঠতে বেলা দুটো বাজে।

মেঝেয় শতরঞ্জি পেতে একটু গড়িয়ে নেয় হাসি। মেঝে থেকে শীতভাব উঠে আসে শরীরে। বাইরে রোদের মুখে ছায়া পড়েছে। মেঘ করল নাকি! বুকের ওপর সিলিং ফ্যানটার ঝকঝকে ইস্পাতের রঙের ব্লেডগুলো একটা প্রকাণ্ড স্থির বৃত্ত তৈরি করেছে। ঘূর্ণিঝড়ের মতো। বাতাস নেমে এসে মেঝেতে চেপে ধরে হাসিকে! মধু রান্নাঘর ধোলাই করছে। কলঘরে জলের শব্দ। দূরে মেঘ ডাকছে। জানালা—দরজায় সবুজ পরদা ফেলা। ঘরে একটা সবুজ আভা। হাসি একটু চেয়ে থাকে, কিন্তু কিছুই দেখে না। দেখার জন্য সে চেয়েও নেই। দুই ঘরের এই যে ছোট্ট বাসা, এই কি সংসার? খাট আলমারি, খাওয়ার টেবিল, ড্রেসিং টেবিলের আয়না—দৃশ্যমান যা—কিছু আছে, যা ধরা—ছোঁয়া যায় তার কোনওটাই কি মানুষের সঙ্গে আর—একটা মানুষকে আটকে রাখতে পারে? ঘরে দরজা দিয়ে দাও, শরীরে শরীর মিশিয়ে ফেলো, সারাবেলা বলো ভালোবাসার কথা পোষা পাখির মতো, ওয়ার্ডরোবে জমে উঠুক প্রেমপত্র—তবু কিছুই প্রমাণ হয় না। সরকারি দপ্তরে হাসি আর অমিয়র বিয়ের দলিল নব্বই—একশো বছর ধরে জমা থাকবে, অত দিন ধরে তাতে লেখা থাকবে যে তারা আইনগতভাবে স্বামী—স্ত্রী। তবু কিছুই প্রমাণ হয় না। হাসি পাশ ফিরে শোয়।

খামের ওপর সাঁটা একটা ডাকটিকিট জলে ভিজিয়ে খুব সাবধানে তুলে নিচ্ছে হাসি। খামের ওপর টিকিটের চৌকো চিহ্ন একটা থেকে যাবে— থাকগে। না কি কোনও দিনই টিকিটটা ঠিকমতো সাঁটা ছিল না খামের গায়ে? দুটো শরীর কেবল পরস্পরকে ডাকাডাকি করেছে এতকাল? মন নয়, বিশ্বাস নয়, নির্ভরতা নয়।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত—কলকাতা কলকাতা!

গরিব ঘরেই জন্ম হয়েছে হাসির। তার বাবা কাছাড়ের এক ছোট্ট চা—বাগানের কেরানি। তারা ছয় ভাইবোন। হাসি চতুর্থ। লেখাপড়ার কোনও সুযোগ ছিল না। শিলচরে থাকত এক মাসি, তার ছেলেমেয়ে নেই। সেই মাসিই নিয়ে গেল হাসিকে, পালত পুষত। শিলচর কলেজ থেকেই সে বি এ পাশ করে, শিলচরেই শেখে মণিপুরি নাচ। লেখাপড়া, নাচ, গান—বাজনা—এ—সবই হাসি শিখত প্রাণ দিয়ে। এইসব লোকে শেখে কত কারণে। হাসির কারণ ছিল ভিন্ন। হাস্যকর সে কারণ, তবু কত সত্য।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত—কলকাতা, কলকাতা! চা—বাগানে তার ছেলেবেলা কেটেছে। চার দিকে ঘন গাছের বেড়াজাল, বৃষ্টি পড়ত খুব, আবার রোদ উঠলে চা—পাতার মাতলা গন্ধে ম—ম করত বাতাস। রাতে ফেউ ডাকত, শেয়াল কাঁদত, তাদের বাড়ির আনাচে—কানাচে এঁটোকাঁটা খেতে আসত শুয়োরের মতো মুখওয়ালা বাগডাশা। ঝিঁঝির ডাক রাতে অরণ্যকে গভীর করে তুলত। শীতকালে পড়ত অসহ্য শীত, মাটির ভাপ কুয়াশার মতো হয়ে বর্ষাকালে চরাচর আড়াল করত। পাহাড়ি পথ হঠাৎ বাঁক ঘুরে রহস্যে হারিয়ে যেত। তারা ভাইবোনেরা উতরাই ভেঙে দৌড়ে দৌড়ে খেলত ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা। দীনদরিদ্র ছিল তাদের পোশাক, আসবাব। তাদের ছোট্ট বাড়িটিতে তাদের অতজনের ঠিক আঁটত না। সেই বাগানে তার ছেলেবেলায় প্রথম বাবার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। বেশিরভাগই কলকাতার দৃশ্যের গল্প। গাড়িঘোড়া আলো দোকান আর লোকজনের গল্প। বাবা গল্প বলতেন সুন্দর, আস্তে আস্তে, সময় নিয়ে, প্রতিটি দৃশ্য যেন নিজেও প্রত্যক্ষ করতেন। সেইসব গল্পে তাঁর যৌবনকালে কলকাতার ছাত্রজীবনের নানা দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকত। আর থাকত কলকাতা ছেড়ে আসবার বিরহ—যন্ত্রণা। হাসির মনে সেই প্রথম কলকাতার নাম বীজের মতো ঢুকে যায়। সে বাবাকে বলত, চলো না বাবা, কলকাতা যাই। বাবা স্থির থেকে বলত, দূর! আর যাওয়া হবে না। সেখানে আমাদের আত্মীয়—স্বজন কেউ নেই, কোনও কাজ নেই সেখানে, খামোখা টাকা—পয়সা খরচ করে চার দিনের রাস্তার ধকল সয়ে কার কাছে যাব? হাসির মন বলত—কেন, কলকাতার কাছে।

শিলচর ছিল সুন্দর ছিমছাম শহর। লোকজন বেশি না, গাড়িঘোড়া বেশি না, চার দিকে জঙ্গল—ঘেরা ছোট্ট শহর। সেখানে মাসির বাড়িতে এসে সে প্রথম শহরের স্বাদ পায়। সুন্দর সেই স্বাদ। তখন তার মনে কলকাতার বীজটি ফেটে অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। সে বুঝতে পারে—শহর—শহরের মতো জায়গা নেই। সাত বছর সে শিলচরে কলকাতার আরও বিচিত্র গল্প শোনে বন্ধুবান্ধবীর কাছে। মাসিদের আত্মীয় হারুকাকার ক্যানসার হয়েছিল, সে গেল চিকিৎসার জন্য কলকাতায়। শচীন নামে কলেজের একটি ছেলে বেশ কবিতা লিখত, সে গেল কলকাতায় বড় কবি হওয়ার জন্য। অনুরাধা ক্লাসিকাল গাইত গৌহাটি রেডিয়ো থেকে। সে প্রায়ই বলত, মফস্‌সলে কিছু হয় না, শিখতে হলে যেতে হবে কলকাতা। হাসির মন বলতে থাকে—কলকাতা, কলকাতা। তুমি গান গাও? নাচো? কবিতা লেখো? তুমি চাকরি চাও? উন্নতি চাও? তোমার মরণাপন্ন অসুখ! তবে কলকাতা যাও। যাও কলকাতায়। এক বার কলকাতা থেকে ঘুরে এসো। মানুষকে কলকাতা সব দিতে পারে। খ্যাতি, টাকা, প্রাণ পর্যন্ত। কলকাতা থেকে যারা শিলচরে ফিরে যায় সেইসব বন্ধুদের কাছ ঘেঁষে কলেজে বসত হাসি। দেখত—ঠিক। ওদের মুখে—চোখে আলাদা দীপ্তি, ঝলমলে আনন্দিত ওদের পোশাক, গায়ে কলকাতার মিষ্টি গন্ধ। মাসিকে বলত, মেসোকে বলত, কী গো তোমরা! ভারী ঘরকুনো, চলো এক বার কলকাতা যাই। মাসি—মেসো সমস্বরে বলত, সে ভারী দূরের রাস্তা, পথের কষ্ট খুব, একগাদা টাকা খরচ, তা সেখানে গিয়েই বা হবে কী? যা ভিড়, গণ্ডগোল, মারপিট—আমাদের মতো সুন্দর নিরিবিলি শহর নাকি সেটা? চোর পকেটমার, রকবাজ ছেলে, রাজনীতি—দূর দূর—

যাওয়া হত না। হত না বলেই হাসির কল্পনায় কলকাতা ক্রমে ক্রমে এক বিশাল ব্যাপক রাজত্ব স্থাপন করে। কলকাতায় যেন বা আলাদা সূর্য ওঠে, আলাদা চাঁদ, কলকাতা শূন্যে ভাসমান বুঝি বা। কলকাতাকে ঘিরে যে—সব কল্পনা হাসির—সে—সব কল্পনা কলকাতার দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের মতো তার ভিতরটা তছনছ করে দিয়ে যেত। কলকাতা কল্পনা—লতা তার ওপর দু'চোখের পল্লবের ছায়া ফেলেছিল। কলকাতা বলে বোধহয় কিছু নেই তবে। লোকে কেউ কখনও যায়নি। সবাই মিলে যোগাযোগ করে বানিয়েছে গল্প। যারা কলকাতার কথা জানে তারা, নিজেদের মধ্যে চোখ—টেপাটেপি করে, কানাকানি করে, যুক্তি করে, হাসিকে এক কাল্পনিক শহরের কথা শোনায়। কলকাতার খণ্ডিত ছবি সে অনেক দেখেছে ভূগোলের বইতে, খবরের কাগজে, ক্যালেন্ডারে। কখনও জি—পি—ও—র ঘড়ি, হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া, মনুমেন্ট, তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ক্রমে সে বুঝতে পারে, কলকাতার দৃশ্য নয়, রাস্তা—ঘাট আলো নয়; নয় তার দোকান—পাট কিংবা বিচিত্র পসরা—এ—সবের অতীত, কিংবা এ—সব মিলিয়ে কলকাতা এক মন্ত্রের মতো। কিংবা কলকাতা কি জ্বলন্ত পুরুষ তার বুকে রহস্যের শেষ নেই, সীমাহীন তার নিষ্ঠুর উদাসীনতা, চুম্বকের মতো তার আকর্ষণ! দূরদূরান্ত থেকে, প্রেমিকারা চলেছে কলকাতার দিকে! কেবলই চলেছে!

কলকাতা এক প্রেমিকেরই নাম। জ্বলন্ত দুর্বার এক প্রেমিক পুরুষ। কলকাতায় এক বার গেলে আমি আর ফিরব না, ভাবত হাসি।

হাসি লেখাপড়া শিখত কলকাতায় যাবে বলে। গান শিখত, নাচ শিখত—কলকাতায় যেতে হলে কোনটা যে দরকার হবে, কোনটার সূত্রে কলকাতায় যাওয়া হবে তা বুঝতে পারত না। কিন্তু হাস্যকর হলেও এ—কথা খুবই সত্য যে তার সবকিছুর পিছনেই ছিল কলকাতা, কলকাতা। বিয়ের সম্বন্ধ মাসিই খুঁজছিল। হাসি একদিন খুব লজ্জার সঙ্গে তাকে বলে, যদি বিয়ে দাও তো কলকাতায় দিয়ো। মাসি অরাজি ছিল না। কিন্তু অত দূরের পাল্লায় ঠিকমতো যোগাযোগ কে করে!

সেই সময়ে ডিগবয়ের তেল কোম্পানির এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে চমৎকার সম্বন্ধ এসে গেল হাসির। বিলেত—ফেরত ছেলে, বেশ স্মার্ট চেহারা, দেড়—দুই হাজার মাইনে। হাসিকে পাত্রপক্ষ পছন্দও করে গেল। মণিপুরি নাচে, রবীন্দ্রসংগীতে শিলচরে তখন হাসির বেশ নাম। রং চাপা হলেও বড় সুশ্রী ছিল হাসি। সবাই জানত হাসির ভালোই বিয়ে হবে। হয়েও যাচ্ছিল। পাত্রের ঠাকুমা মারা গিয়েছিল মাস আষ্টেক আগে, চার মাস পর কালাশৌচ কাটবে। তখন অস্থি বিসর্জন দিয়ে বিয়ে হবে—ঠিক হয়েছিল। হয়ে গেল পাটিপত্র।

এমনকী আশীর্বাদের ব্যাপারে কালাশৌচ ওঁরা মানেননি। হাতে তখন চার মাস সময়। মাসির অ্যালবামে পাত্রের ফোটো সাঁটা হয়ে গেছে, পাশে হাসির ফোটো। মাসি মাঝে মাঝে হাসিকে অ্যালবামের সেই পাতাটা খুলে দেখাত—দ্যাখ হাসি!

হাসির মন বলত, কলকাতা, কলকাতা। বহু দূরে এক বিশাল পর্বতের মতো বহ্নিমান পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দিককে কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণে টানছে চুম্বক পাহাড়ের মতো। সেখানে গেলে ফিরত না হাসি। যাওয়া হবে না কি!

কাছাড়ের এক লোকনাট্য দল সেবার কলকাতায় যাচ্ছে। তারা হাসিকে দলে নিতে রাজি। হাসি মাসিকে গিয়ে ধরল, এখনও চার মাস বাকি। এক বার ঘুরে আসি মাসি। মাত্র তো পনেরোটা দিন।

বিয়ের আগে কলকাতায় গিয়ে নাচবি—গাইবি, সেটা কি ভালো দেখাবে? পাত্রপক্ষ যদি কিছু মনে করে!

হাসি হাসে, কলকাতার জলে রং ফরসা হয়, জানো না?

অনেক বলা—কওয়ায় মাসি রাজি হল।

কলকাতা কীরকম দেখতে, তা আজও হাসি সঠিক জানে না। প্রথম দিনের মতোই। বহু দূর থেকে একটা যৌবনকালের প্রতীক্ষা নিয়ে সে যখন কলকাতায় নামল তখন আর রাস্তার কষ্টের কথা মনেও ছিল না, খুব পিপাসা পেয়েছিল, বিবেকানন্দ ব্রিজ পেরিয়ে আসার সময়ে যে গুমগুম আওয়াজ করেছিল রেলগাড়ি, সেই আওয়াজ শিয়ালদা পর্যন্ত তার বুকের ভিতরে কলকাতার শব্দতরঙ্গ তুলেছিল। শিয়ালদার ঘিঞ্জি কলকাতা সে তো চোখে দেখেনি। শুভদৃষ্টির সময়ে কেউ কি বরের মুখ ঠিকঠাক দেখতে পায়, নির্লজ্জ ছাড়া? সে গাড়ি থেকে প্লাটফর্মে পা দিতেই এক দুরন্ত পুরুষের প্রকাণ্ড উষ্ণ বুকের মধ্যে চলে এল। গর্জমান এক কামুক পুরুষ যার শিরা—উপশিরায় প্রাণস্রোত, যার আদরে অবহেলায় সর্বক্ষণ জীবন বয়ে যাচ্ছে। সেই প্রথম পুরুষটির আদরে লজ্জায় চোখ বুজেছিল বুঝি হাসি। চোখ আর খোলা হল না। কলকাতা তার চার দিকে সর্বক্ষণ এক শিশু বয়সের বিস্তৃত রঙিন মেলার মতো কাল্পনিক হয়ে রইল।

জ্যাঠতুতো দিদির বাড়িতে উঠেছিল হাসি, চিৎপুরের এক ফ্ল্যাটবাড়িতে। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে সে একদিন লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানও করল। কিন্তু সারাক্ষণ সে কেবলই তার শিরায় শিরায় উল্লসিত রক্তের স্পন্দনে কলকাতার শব্দ শুনল। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে টের পেল তার যুবতী বুক কলকাতার পাথুরে বুকের সঙ্গে মিশে আছে। একের হৃদস্পন্দন মিশে যাচ্ছে আর একজনের সঙ্গে। আমি তোমাকে ছেড়ে কী করে আবার ফিরে যাব—মনে মনে বলত হাসি।

পাশের ফ্ল্যাটে এক দম্পতি ছিলেন, আর ছিল অমিয়। দম্পতি অমিয়রই দিদি—জামাইবাবু। এ ফ্ল্যাটে হাসিরও দিদি—জামাইবাবু। দুই পরিবারে যাতায়াত ছিল। সামনের বারান্দাটা কমন। সেইখানে দাঁড়িয়ে কলকাতা দেখতে দেখতে হাসি কত দিন দেখেছে পাশের ফ্ল্যাট থেকে সুন্দর পোশাক পরে অমিয় বেরোচ্ছে, নীচে রাস্তায় রাখা তার স্কুটার। স্কুটারে চলে যেত ছেলেটা, যাওয়ার আগে তাকে লক্ষ করত। কিন্তু অমিয়কে কেন লক্ষ করবে হাসি? কলকাতার প্রেমিকা কেন গ্রাহ্য করবে অন্য পুরুষকে?

দুই পক্ষের দিদি—জামাইবাবুরা প্রায় রাতেই খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ফিশ খেলার আসর বসাতেন। হাসি থাকত, অমিয়ও। দু'পক্ষের কথাবার্তা মাঝে মাঝে হাসি আর অমিয়কে ঘেঁষে যেত। সে—সব ঠাট্টার গুরুত্ব ছিল না। হাসির দিদি—জামাইবাবু জানতেন হাসির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

হাসি অমিয়কে তেমন করে লক্ষ করত না ঠিকই, কিন্তু তার মন বলত—কলকাতা, কলকাতা।

অমিয় খুব বেশিমাত্রায় লক্ষ করেছিল হাসিকে। কতটা তা হাসি টের পায়নি। কিন্তু একদিন অমিয় খুব দুঃসাহসের সঙ্গে প্রস্তাব করেছিল, চলুন, আমার স্কুটারে আপনাকে কলকাতা দেখিয়ে আনি। প্রথমদিন হাসি রাজি হয়নি। কিন্তু কয়েক দিন পরে হয়েছিল। কলকাতার মেয়াদ তখন শেষ হয়ে এসেছে। কয়েক দিন পরই হাসি চলে যাবে।

মসৃণ, সুন্দর ক্যাথিড্রাল রোড হয়ে ময়দানের দিকে স্কুটার ছুটিয়ে অমিয় প্রস্তাব দিয়েছিল, যদি কিছু মনে না করেন—

কলকাতা—কেবলমাত্র কলকাতার জন্য হাসি থেকে গেল। কয়েকটা কাগজপত্রে সই করে বিয়ে, বাড়িতে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানানো, তারপরই ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাট।

হাসির মন বলত—কলকাতা, কলকাতা!

হাসির জীবনে অমিয় কোথাও ছিল না। যৌবনকালে একশো ছেলে ভালোবেসেছে হাসিকে। শিলচর জুড়ে ছিল তার প্রেমিকেরা। তাদের মধ্যে ছিল আসামের রঞ্জি ট্রফির ক্রিকেট খেলোয়াড়, কবি, অধ্যাপক, ছাত্রনেতা, ভবঘুরে। তাদের অনেকের সঙ্গে হাসির দীর্ঘকালের সম্পর্ক। কোথায় ছিল অমিয়! পাত্র হিসেবেও অমিয় তো কিছুই না। সদ্য ব্যবসা শুরু করেছে! কয়েকটা অর্ডারে লাভ পেয়ে কিনেছে স্কুটার, দু'হাতে টাকা ওড়ায়, পোশাক কেনে। সেই অমিয় হাসির জীবনে এসে গেল! এসে গেল, আবার এলও না। সারা দিন টাটা—বিড়লা হওয়ার আশায় সারা কলকাতা দৌড়ঝাঁপ করে যখন অমিয় ফিরত, তখন সদর খুলে অমিয়কে দেখে একটু অবাক হয়ে এক পলকের জন্য হাসি ভাবত—আরে এ লোকটা কে? স্বামী? তার মনে পড়ত, সারা দিন সে অমিয়র কথা ভাবেইনি!

শরীরে শরীরে কথা হত ঠিকই। অমিয়র প্রথম দিকের ভালোবাসা ছিল তীব্র, শরীরময়, আক্রমণাত্মক। হাসি সেই খেলায় আগ্রহভরে অংশ নিয়েছে। কিন্তু সে কতটুকু সময়ের ভালোবাসা? শরীর জুড়োলেই তা ফুরোয়। তারপর আর আগ্রহ থাকে না অচেনা পুরুষটির প্রতি। হাসি তখন থেকে নিষ্ঠুর।

চিৎপুরের দিদি—জামাইবাবু এসে বলতেন, হাসি, তোমার বাবা—মা আমাদের দোষ দিয়ে চিঠি লিখেছেন, আমরা কি লিখব ওদের?

দোষ! আপনাদের দোষ কী?

দোষ নেই ঠিকই, তুমি ভালোবেসে বিয়ে করেছ, কিন্তু আমাদের বাসায় থেকেই তো ব্যাপারটা ঘটল!

ভালোবাসা! হাসি ভারী অবাক হত। ভালোবাসা কীসের! কাকে! অমিয়কে? অমিয়কে তো সে কোনওকালে ভালোবাসেনি। সে ভালোবেসেছিল কলকাতাকে। বিশাল কলকাতার কতটুকু প্রতিদ্বন্দ্বী অমিয়? অমিয়কে জানালায় এসে বসা চড়াইপাখির মতো তুচ্ছ মনে হত তার। যার সঙ্গে হাসির বিয়ে ঠিক হয়েছিল, বা তার শিলচরের অন্য প্রেমিকেরা—তাদের তুলনাতেও অমিয় কিছুই না। কিছুই না। অমিয় কেবল কলকাতায় হাসিকে আশ্রয় দিয়েছে।

বিয়ের ছ' মাস পরে মাসি আর মেসোমশাই এসেছিলেন।

এটা কী করলি হাসি? সেই ডিগবয়ের ছেলেটা বিয়েই করল না।

হাসি উত্তর দেয়, আমি যা চেয়েছিলাম, পেয়েছি।

কী চেয়েছিলি?

হাসি মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, কলকাতা।

তিন বছরে ডাকটিকিটটা ভিজে ভিজে আলগা হয়ে এসেছে। খামের গা থেকে এবার সাবধানে তুলে নেবে হাসি, একটা চৌকো দাগ থেকে যাবে কি? থাক। শরীর বহতা নদীর মতো, শরীরে কোনও চিহ্ন থাকে না। অমিয়কে শরীরের বেশি দেয়নি হাসি।

সিলিংফ্যানের ঝকঝকে ইস্পাতের রঙের ঘূর্ণি বৃত্তটা দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল হাসি। উঠে দেখল রোদের মুখে বসেছে কালো মেঘ। গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে। পুবের বাতাসে পরদা উড়ে আসছে। উদ্ভিদহীন কলকাতায় প্রকৃতির বন্য গন্ধ নিয়ে আসে বৃষ্টি।

পাশ ফিরতেই খুব অবাক হয়ে হাসি দেখে, শতরঞ্জির একধারে তার মাথার কাছেই একটা ছোট্ট লালচে ইঁদুর মরে পড়ে আছে। শিশু শরীর ইঁদুরটার, উদোম ন্যাংটো, মুখে নির্দোষ একখানা ভাব, চুপ করে মরে গেছে কখন। আহা রে! এত দূর এসেছিলি কেন? কিছু বলতে চেয়েছিলি আমাকে? লাল টুকটুকে হাত—

পা, সুন্দর সতেজ লেজ, রেশমের মতো রোমরাজি, ঠোঁটে গোঁফের নরম সাদাটে চুল। আস্তে আস্তে উঠে বসে হাসি। তার একটু কষ্ট হয়। বিষ সে নিজে মিশিয়েছিল।

উঠে মধুকে ডাকে হাসি, ঘরগুলো খুঁজে দেখ মধু, ইঁদুরগুলো কোথায় কোথায় মরে পড়ে আছে। পচে গন্ধ বেরোবে।

চারটে বেজে গেছে। জামাইবাবুকে একটা ফোন করা দরকার। রিজার্ভেশনটা যদি পাওয়া যায়!

জলে কলকাতার ভঙ্গুর প্রতিবিম্ব পড়েছে, ভেঙে যাচ্ছে। জল হলে এক কলকাতা অনেক কলকাতা হয়ে যায়। ঢাকুরিয়া থেকে বাস ধরে হাসি গড়িয়াহাটায় এসে পেট্রল পাম্প থেকে জামাইবাবুর অফিসে টেলিফোন করে।

জামাইবাবু, আমি হাসি।

বলো।

আমার রিজার্ভেশনের কী হল?

হয়নি। দার্জিলিং মেলে ভীষণ ভিড় হচ্ছে। এখন সামার রাশ।

রেলে যে কে আপনার বন্ধু আছে চেকার?

থাকলেই বা, সিটি বুকিংগুলো দেখে এসো না। তিন দিন ধরে লাইন দিয়ে বসে আছে লোক—কোথায় কত টিকিটের কোটা আছে সব তাদের মুখস্থ, একটা টিকিট কম পড়লে আস্ত রাখবে?

এত লোক যাচ্ছে কোথায়?

কলকাতা থেকে পালাচ্ছে; আবার কলকাতায় পালিয়ে আসবে বলে।

আমার মনে হয়, আপনি গা করছেন না।

তা তো করছিই না।

কেন?

তুমি সুখের পাখি উড়ে যাবে, আর আমরা পড়ে থাকব হাঁফিয়ে ওঠা ভ্যাপসা কলকাতায়—তা কি হয়!

আমার যে যাওয়াটা দরকার।

কেন?

যাব না কেন?

ওপাশে জামাইবাবু একটা শ্বাস ফেলে।

হাসি, গতকাল অমিয় আমার কাছে এসেছিল।

হাসি তীক্ষ্ন গলায় বলে, কেন?

ভয় পেয়ো না। সে তোমার চলে যাওয়া আটকানোর ষড়যন্ত্র করতে আসেনি।

হাসি চুপ করে থাকে।

ও এসেছিল একটা স্টিমারঘাটের কথা বলতে।

স্টিমারঘাট!

স্টিমারঘাট। ও আজকাল মাঝে মাঝে একটা স্টিমারঘাট দেখতে পায়।

তার মানে?

তার মানে তোমাকেই আমরা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।

স্টিমারঘাটের কথা আমি কী জানি। কোথাকার স্টিমারঘাট?

তার আগে বলো, ওর ব্যবসার অবস্থা কী?

হাসি একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, বোধহয় ভালো না। বাজারে অনেক ধার জমে গেছে।

আর এ—সময়ে তুমি সুখের পাখি উড়ে যাচ্ছ?

আমি কী করব জামাইবাবু?

ওপাশে জামাইবাবু আবার চুপ।

আমার রিজার্ভেশনের কী করবেন বলুন? কাছে—পিঠের রাস্তা হলে আমি রিজার্ভেশন ছাড়াই চলে যেতাম। কিন্তু চার দিন ধরে যাওয়া তো সেভাবে সম্ভব না।

দেখছি।

আমার কিন্তু সময় নেই। আর পনেরো দিনের মাথায় খুশির বিয়ে। তারপর ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব। বুঝলেন?

বুঝেছি। কিন্তু অমিয়র স্টিমারঘাটের কী হবে?

আমি কী জানি।

হাসি, অমিয়র ওজন কত?

হাসি হেসে ফেলে। বলে, আমি কি দাঁড়িপাল্লা?

না। কিন্তু বউরা তো স্বামীর ওজন জানে। জানা উচিত।

ফোন রেখে দেব কিন্তু।

আমি ইয়ারকি করছি না। অমিয়কে দেখে মনে হয় অন্তত কুড়ি কেজি ওজন কমে গেছে।

হাসি একটা শ্বাস ফেলে। অমিয় বোধহয় তাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু তাতে হাসির কিছু যায় আসে না।

জামাইবাবু, আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করিনি। আমাদের মধ্যে কোনও ভুল—বোঝাবুঝি নেই।

তোমার দিদির সঙ্গে আমার রোজ চার বার করে ঝগড়া হয়, আর ভুল—বোঝাবুঝি? আমরা জীবনে কেউ কাউকে বুঝব না। কিন্তু চার মাসেও আমার ওজন দুই কেজি বেড়েছে।

ওজনের কথা বলছি না।

আমি ওজনের পয়েন্টেই স্টিক করতে চাই। হাসি, অমিয়র ওজন কমে যাচ্ছে কেন?

আমার রিজার্ভেশনের কথাটা মনে রাখবেন। ছেড়ে দিচ্ছি—

ছেড়ো না। শোনো, স্টিমারঘাটের কথা ও তোমাকে কখনও বলেনি?

না।

আশ্চর্য!

আশ্চর্যের কী? ও আমাকে অনেক কথাই বলে না।

কিন্তু স্টিমারঘাটের ব্যাপারটা বলা উচিত ছিল।

কেন?

স্টিমারঘাটটা ও খুব স্পষ্ট দেখতে পায়, আর এমনভাবে বলে যে আমিও যেন সেটা দেখতে পাই। শুনতে শুনতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল।

কীরকম স্টিমারঘাট সেটা?

খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি বহু দূর গড়িয়ে নেমে গেছে.... কিন্তু ফোনে অতসব বলা যায় না। তুমি ওর কাছে শুনো।

আমি শুনব কেন জামাইবাবু? আমার কৌতূহল নেই।

তুমি আসাম থেকে কবে ফিরবে হাসি?

বললাম তো, খুশির বিয়ে হয়ে গেলেই। ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব।

সেটা তো ফেরা নয়। স্কুলে মানে বাগনানের কাছে যাবে, গ্রামে। কিন্তু তুমি অমিয়র কাছে কবে ফিরবে হাসি?

হাসি উত্তর দেয় না। ফোনটা খুব আস্তে ক্রাডলে নামিয়ে রাখে।

আজ কলকাতা বৃষ্টির পর বড় সুন্দর সেজেছে। সূর্যের শেষ আলো সিঁদুরগোলা রং ঢেলেছে রাস্তায় রাস্তায়। গড়িয়াহাটার বাড়িগুলোর গায়ে সেই অপার্থিব রং। জলে ছায়াছবি। রাস্তাগুলো ভেজা, রাস্তার নিচু অংশে পাতলা জলের স্তর জমে আছে। সেই জল থেকে আলোর অজস্র প্রতিবিম্ব উঠে আসে। একা একা হাঁটতে বড় ভালো লাগছে হাসির। মোড়ের দোকানগুলোর শো—কেসে সে সুন্দর শাড়িগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল একটু। পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল। কী ভিড় চার দিকে! তবু এ ভিড় বড় রঙিন। বাগনান থেকে হয়তো প্রায়ই আসা হবে না, কিন্তু পুরনো ভালোবাসার টানে ছুটিছাটায় ঠিক চলে আসবে হাসি, উঠবে চিৎপুরে দিদি—জামাইবাবুর কাছে। একা একা ঘুরবে কলকাতায় যেমন সে গত তিন বছর ধরে ঘুরেছে এবং ক্লান্ত হয়নি। কলকাতার রূপ কখনও ফুরোয় না।

একটা মরা বেড়াল পড়ে আছে বৃষ্টিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামতে বেড়ালটাকে ডিঙিয়ে গেল হাসি। পচা গন্ধ, কাছেই বসে কোনও নেমন্তন্ন—বাড়ির এঁটো—কাটার রাশ খবরের কাগজে জড়ো করে বসেছে এক ভিখিরি মেয়ে তার বাচ্চা—কাচ্চা নিয়ে। হাসি ট্রামলাইন পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। তার মন বলে, আজও বলে—কলকাতা, কলকাতা।

চলে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল অমিয়, ঠিক সে সময়ে নিঃশব্দ পায়ে কালীচরণ এল। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ হয়নি। অমিয় একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

চলে যাচ্ছিলেন? কালীচরণ জিজ্ঞেস করে। তার মুখে ঘাম, উৎকণ্ঠা।

হুঁ।

আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম।

অমিয় চুপ করে থাকে।

গত দু' মাস কিছু চাইনি। জানতাম আপনি অসুবিধেয় আছেন। কিন্তু এখন আমার বড় ঠেকা। পেমেন্টের একটা তারিখ দিন এবার।

অমিয় জিজ্ঞেস করে, সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ হয়নি কেন কালীচরণ?

কালীচরণ একটু থমকে যায়। চেয়ে থাকে। অমিয় হাত বাড়িয়ে ওর ঘেমো হাতখানা ছুঁয়ে বলে, কাঠের সিঁড়িটা বড় পুরনো হয়েছে, বেড়াল বাইলেও শব্দ হয়। তুমি কী করে শব্দ না করে উঠলে? তুমি বেঁচে আছ তো! ভূত হয়ে আসোনি তো কালীচরণ? কিংবা পাখায় ভর করে?

কালীচরণ একটু হেসে একটা ময়লা রুমালে মুখ মোছে। তার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হার্ডওয়ার বাজার যদিও কালীচরণের পায়ের তলায়, কিন্তু তবু বাইরের চেহারায় সে ভদ্রলোক থাকেনি। ময়লা মোটা ধুতি, গায়ে লংক্লথের হাফ—হাতা জামা, পায়ে টায়ারের চটি।

বাগচীবাবু, আমার মেয়ের বিয়ে। তিন হাজার যদি আপনার কাছে আটকে থাকে তো আমি গরিব, কী দিয়ে কী করব?

অমিয় একটু চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে, দুটো সরকারি অর্ডার আছে কালীচরণ, পনেরো হাজার টাকার। করবে?

আপনি পেয়েছেন?

অমিয় মাথা নাড়ে, আমারই। কিন্তু আমি করব না। তুমি করো তো তোমাকেই ছেড়ে দিই।

কালীচরণ সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনি কত পার্সেন্ট নেবেন?

এক পয়সাও না। শুধু পেমেন্টের জন্য আমাকে একটু সময় দাও।

অর্ডার দেখি, বলে কালীচরণ হাত বাড়ায়।

অমিয় অর্ডারের কাগজপত্র বার করে দেয়।

কালীচরণ কয়েক পলক অর্ডারের কাগজপত্র দেখে বলে, মাত্র আট পার্সেন্ট উঁচু দর দিয়েছেন! তাও হচ্ছে একমাস—দেড়মাস আগেকার দর। গত এক মাসে মেশিন পার্টস, কয়েল আর স্প্রিংয়ের দর দশ থেকে কুড়ি পার্সেন্ট বেড়েছে। পনেরো হাজার টাকার অর্ডার, অফিসার আর বিল ডিপার্টমেন্টকে খাইয়ে হাজারখানেকও ঘরে তোলা যাবে না। পরিশ্রম পোষায়?

তুমি করবে না?

কালীচরণ একটু হাসে, করব না কেন? ব্যবসা চালু রাখতে হলে কাজ ধরতেই হবে, লোকসান হলেও।

গায়ের জামা খুলে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে রজত টেবিলের উপর শুয়ে ছিল। তার রায়চৌধুরী এখনও আসেনি। শুয়ে থেকেই মুখ ফিরিয়ে বলল, কালীচরণ, বাগচীর জায়গায় আমি হলে অর্ডার দুটো কেড়ে নিয়ে তোমাকে ঘাড়—ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম।

কেন?

সরকারি অর্ডারের জন্য হাজারটা লোক হন্যে হয়ে ঘুরছে। তুমি ভদ্রলোক হলে লোকসানের কথা বলতে না। পনেরো হাজারে তোমার অন্তত ছ' হাজার মার্জিন থাকবে।

কালীচরণ বিড়বিড় করে বলে, দেনা—পাওনার কথা উঠলেই সব জায়গায় খিচাং—

রজত ধমক দিয়ে বলে, দেনা—পাওনা আবার কী। বাগচীর তিন হাজার ওই অর্ডারে শোধ হয়ে গেল। আর এসো না।

তার মানে? তিন হাজার টাকা আমি এখনও পাই—

না পাও না। তোমাকে সেনগুপ্ত এনেছিল, তার আমলে তুমি সাপ্লায়ার ছিলে। পারো তো তাকে খুঁজে বের করো।

তাকে পাব কোথায়?

বাগচী তার কী জানে কালীচরণ? ছোট কোম্পানি, আট—দশ হাজার টাকা ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল, আর লায়াবিলিটি সব রেখে গেল—এটা কি মগের মুল্লুক?

আমি তার কী জানি!

তোমাদের সঙ্গে সেনগুপ্তর সাট আছে, আমি জানি! সে—ই তোমাদের পাঠাচ্ছে তাগাদায়। যাতে বাগচী বিপদে পড়ে। বাগচী ভালো লোক কালীচরণ, দেনা সে সব মেনে নিচ্ছে, সরকারি অর্ডার বিলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মনে রেখো গড়বড় করলে ঝামেলা হবে।

কালীচরণ চুপ করে থাকে।

রজত হাই তুলে বলে, সকলের দিন সমান যায় না। বাগচী তোমাদের অনেক বিজনেস দিয়েছে এখন বেরোও—

কেউ তার হয়ে বোঝাপড়া করুক, কিংবা তাকে করুণা করুক, এটা আজও পছন্দ করে না অমিয়। সেইটুকু অহংকার তার এখনও আছে। তবু সে কিছুই বলে না। চেয়ে থাকে।

দুর্বল চোখে একটু চেয়ে থেকে কালীচরণ উঠে পড়ে।

শ্লথ ভঙ্গিতে টেবিল থেকে রজত তার চেয়ারে নেমে বসে। অলস ভঙ্গীতে বুশশার্টটা চেয়ারের পিঠ থেকে খুলে নিয়ে গলায় দিতে দিতে অমিয়র দিকে তাকায়। চোখে ভর্ৎসনা।

কেমন লজ্জা করে অমিয়র। চোখ সরিয়ে নেয়। অর্ডার দুটো রাখবার জন্য তাকে অনেক বার কল্যাণ বলেছিল। তিন—চার মাস কোনও অর্ডার পায়নি অমিয়, এই দুটো পাওয়াতে দিন সাতেক আগে তারা তিনজন অফিসঘরে একটা ছোট উৎসব করেছিল। সবীর থেকে রেজালা আর তন্দুরি রুটি এনেছিল, আর কে সি দাসের সন্দেশ। কল্যাণ মুখার্জি, রজত সেন আর অমিয় বাগচী—তারা কেউ কারও বন্ধু নয়। একটা ঘরে তিনটে টেবিলে তাদের তিনটে আলাদা কোম্পানি। যে যার ব্যবসার ধান্দায় ঘোরে। রোজ দেখাও হয় না। কিংবা খুব কম সময়ের জন্য দেখা হয়। তবু কী করে যেন তাদের মধ্যে বুনো মোষের মতো পরস্পরের

প্রতি বিশ্বস্ততা এসে গেছে। তারা কেউ কখনও তিনটে কোম্পানিকে এক করার কথা বলেনি। তারা বন্ধুও নয়, তা হলে কী? তা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু বাগচীর কিছু হলে আপনা থেকেই রুখে দাঁড়ায় মুখার্জি আর সেন, যেমন সেনের কিছু হলে রুখে ওঠে বাগচী আর মুখার্জি। বোধহয় এই ঘরটাই তাদের এই সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে।

সেনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অমিয় মাথা নিচু করে ছিল।

রজত ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেটটা ছুড়ে দেয় অমিয়র টেবিলে। বলে, আপনার ঠোঁটে সন্দেশের গুঁড়ো লেগে আছে বাগচী, মুছে নিন।

অমিয় একটু হাসে। সহজ হতে চেষ্টা করে। বলে, আমার দ্বারা সাপ্লাইটা হত না সেন।

রজত ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকিয়ে থেকে বলে, গত তিন মাস আপনি বিজনেস পাননি বাগচী। এই অর্ডারটা ছাড়তে আপনাকে আমরা বারণ করেছিলাম।

আমি পারতাম না।

আমরা চালিয়ে দিতাম। আফটার অল উই আর কমরেডস।

রজত ওঠে। তার ডেস্ক, আলমারি বন্ধ করতে করতে হঠাৎ একটু হেসে বলে, জার্মানি থেকে আপনাকে কী পাঠাব বলুন তো! ঘড়ি? শেভার? না কি কলম? তার চেয়ে জব ভাউচার একটা পাঠিয়ে দেব বরং—কী বলেন?

রজত নিজেই হাসে, কিন্তু মিসেসকে রেখে আপনি তো যাবেন না। গিয়েও শান্তি পাবেন না। ম্যারেডদের ওই এক বিপদ।

সে—কথার উত্তর না দিয়ে অমিয় তার গভীর অন্যমনস্ক মুখ তুলে বলে, সেন, লক্ষ করেছেন কালীচরণের পায়ের কোনও শব্দ হয় না!

কী বলছেন? রজত ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

বলছি, যাদের পায়ের শব্দ হয় না তারা খুব ডেঞ্জারাস। সেনগুপ্তরও হত না।

সেনগুপ্তর উল্লেখে রজতের মুখটা ঝুলে পড়ে। চাপা গলায় সে বলে, বাস্টার্ড। আপনাকে কি সেনগুপ্ত হিপনোটাইজ করেছিল বাগচী? কী করে তবে সে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকা তুলে নিল, আদায় করে নিল চার—চারটে বিল—পেমেন্ট, সমস্ত লায়াবিলিটি কী করে আপনার ঘাড়ে ফেলে গেল?

অমিয় এক বার হাত উলটে তার অসহায়তা প্রকাশ করে মাত্র। কথা বলে না। হতাশ গলায় রজত বলে, ব্যবসা আপনার কর্ম নয় বাগচী। আপনি ভীতু হয়ে যাচ্ছেন, লোককে দাবড়াতে পারেন না।

সেনগুপ্তর পায়ের কোনও শব্দ হত না—সত্যটা আবিষ্কার করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অমিয়। কালো ছিপছিপে সুপুরুষ এবং হিংস্র সেনগুপ্ত ছিল বার্ড কোম্পানির চাকরে। চাকরি নামে মাত্র, সে ছিল কোম্পানির টিমের নামকরা গোলকিপার। খেলার জন্যই চাকরি পেয়েছিল। পোস্ট থেকে পোস্টে উড়ে শট আটকাত, বহুবার পেনাল্টি ধরেছে। অবধারিত একটা লিফট পেত, কিন্তু সেবার হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে পড়ে রইল ছ' মাস। উন্নতির আর আশা নেই দেখে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে এল অমিয়র সঙ্গে।

তখন অমিয় মারাত্মক পোশাক পরত, দারুণ হাসত, পিচের রাস্তার মতো গড়গড়ে ইংরেজি বলত। সাপের মতো সাবলীল ছিল তার নড়াচড়া, ক্রুর চোখ, ঘন ভ্রূ। সেনগুপ্ত তার দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকত। একটা সময় ছিল তখন সেনগুপ্তর মতো বিপজ্জনক ছেলেকে নিপুণভাবে চালাত অমিয়। তখন সাপ্লায়ারেরা সাবধানে মাল দিত, ছ'মাস ন'মাস তাগাদা করত না। অর্ডার আসত ঝাঁকে ঝাঁকে। চোখা, চালাক, সাহসী অমিয় হিংস্র মারকুট্টা সেনগুপ্তকে ব্যবহার করত ব্যবসার ডেকর হিসেবে, কখনও তাকে বানাত দেহরক্ষী, কখনও তাকে আউটডোরে ঘুরিয়ে আনত সেলসম্যান হিসেবে! সেনগুপ্তকে তৈরি করেছিল সে—ই। তারপর কবে থেকে—কবে থেকে যেন—বহু দূরের এক অচেনা নির্জন ফেরিঘাট জাহাজের মতো ধীরে অমিয়র কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। তখন থেকেই সে মাঝে মাঝে সেনগুপ্তর দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে চমকে

উঠত। সে দেখতে পেত, তার সামনে স্বাভাবিক পোশাক পরা সেনগুপ্ত নয়, সেনগুপ্তর পরনে কালো শর্টস, লাল টকটকে গেঞ্জি, দস্তানা পরা দুটো হাত থাবার মতো উদ্যত হয়ে আছে, মাথায় টুপি, টুপির ছায়ায় দুটো আলপিনের মতো চোখ, ফণা তুলে দুলছে এক হিংস্র গোলকিপার, অমিয়র সব রাস্তা বন্ধ করে সে দাঁড়িয়ে।

মানুষের পতনের কোনও শব্দ হয় না। তবু আশপাশের কিছু লোক ঠিক কেমন করে টের পায়, এ লোকটার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কোনও দিন দীর্ঘ টেন্ডার টাইপ করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে সেনগুপ্ত হয়তো দেখেছিল, অমিয় ভীত চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। কিংবা হয়তো কোনও দিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে দুজনে বেরোনোর সময় অন্ধকার সিঁড়িতে সেনগুপ্তর আগে আগে নামতে দ্বিধা করেছে। কিংবা এ—রকমই কোনও তুচ্ছ কিছু লক্ষণ দেখেছিল সেনগুপ্ত। বুঝেছিল ব্যবসাতে অমিয়র দিন শেষ, তার শুরু। বুঝেছিল সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা। বুঝেছিল আরও অনেকে। সবার শেষে বুঝেছে অমিয়। স্পষ্টই নিজের ভেতরে সে এখন এক দিনাবসান টের পায়, প্রত্যক্ষ করে সূর্যাস্ত। বহু দূর থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে এক নির্জন ফেরিঘাট আর জেটি, তার অতলান্ত জল। অমিয় মুখ তোলে, কিছু বলছেন সেন?

একটা মেয়েকে কী করে রিফিউজ করতে হয় বাগচী? আমি কোনও ল্যাঙ্গুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। না কি জার্মানিতে গিয়ে চিঠি দেব?

অমিয় একটু হাসে, ল্যাঙ্গুয়েজের দরকার হয় না সেন। রিফিউজাল মনে থাকলেও লোকে ঠিক বুঝে নেয়। ডোন্ট বদার।

মাইরি! তা হলে বেঁচে যাই।

অমিয় হাসে।

চলি বাগচী। সিগারেটের প্যাকেটটা আপনি রেখে দিন। যদি রায়চৌধুরী আমার মোটর পার্টস নিয়ে আসে তবে আমার হয়ে ওর পাছায় তিনটে লাথি কষবেন, তিনটে—ভুলবেন না—

অমিয় অনেকক্ষণ বসে থাকে। অফিসঘরটা অন্ধকার হয়ে আসে। অমিয় আলো জ্বালে না। রাস্তার নানা আলোর ছায়াছবি এসে সিলিংয়ে কাঁপতে থাকে, দেয়ালে চমকায়। কাকের পাখার মতো অবসাদ নেমে আসে অমিয়র শরীর জুড়ে।

বাড়ির দেয়ালের কোনও গোপন কোণে হঠাৎ উঁকি দেয় এক অশ্বত্থ চারা। কেউ লক্ষ করে না। কলকাতায় শ্যাওলা জমে, দেয়ালের চাপড়া খসে পড়ে। কেউ লক্ষ করে না। কিন্তু ওইভাবেই অলক্ষিতে শুরু হয় একটা বাড়ির ক্ষয়। অমিয় নিজের ভিতরে সেই অশ্বত্থের গোপন চারাটিকে খুঁজছে। অনুসন্ধান করছে। শ্যাওলা জমল কোথায়, কোথায়ই বা খসে পড়ছে চাপড়া। খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু এ তো ঠিকই যে, সে সেনগুপ্তকে ভয় পেতে শুরু করেছিল একদিন। অথচ ভয়ের তেমন কারণ ছিল না। গোলকিপারের পোশাক বহুকাল আগেই ছেড়ে ফেলেছিল সেনগুপ্ত, খুলে রেখেছিল দস্তানা, ক্রমে হয়ে আসছিল অমিয়র বশংবদ। সাপুড়ে কবে আবার তার ঝাঁপির সাপকে ভয় পেয়েছে?

কিন্তু এর জন্য তো সেনগুপ্ত দায়ী নয়।

সারা কলকাতা দৌড়—ঝাঁপ করত অমিয়, আর তার স্কুটার। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনে থেকে ভারী স্কুটারটা অবলীলায় টেনে তুলত সিঁড়ির তলায়, শিস দিয়ে সিঁড়ি ভাঙত অমিয়। ভাবত দরজা বন্ধ করেই সে এক সুন্দর জগতে চলে যাবে। কিন্তু প্রায়দিনই সে অর্গলহীন দরজা ঠেলে এক আবছা অন্ধকার ঘরে ঢুকত। পরিত্যক্ত বাড়ির মতো ঘর। দেখত, হাসি তার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেই। হয়তো শুয়ে আছে, কিংবা দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। মুখোমুখি হতে হাসির চোখে সে বিস্ময় দেখতে পেত। কোনও দিন বা দেখত, হাসি ঘরে নেই।

পরস্পর আশ্লিষ্ট রতিক্রিয়ার সময়ে সে কি দেহসংলগ্ন হাসির শীৎকার শোনেনি? অনুভব করেনি তার শিহরন, বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা? লক্ষ করেনি মুখমণ্ডলে মুক্তোর মতো স্বেদবিন্দু? করেছিল। হাসির শরীরে অর্গলহীন দরজা খুলে ফেলে অমিয় দেখেছে, সেখানেও এক আবছা অন্ধকার ঘর—পরিত্যক্ত

ঘরের মতো নিরিবিলি—সেখানে হাসি সাজেগোজে চুল বাঁধে, আয়নায় দেখে মুখ, প্রতীক্ষা করে—অমিয় সেই ঘরে ঢুকলে হাসি যেন অবাক মুখ তুলে নীরব প্রশ্ন করে, তুমি কে?

মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল একদিন। গতবারে। জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে অনুর বিয়েতে যাবে তারা। সে আর হাসি। ধুতি—পাঞ্জাবি কোনও দিনই পরে না অমিয়। ধুতি—পাঞ্জাবিতে কোনও দিন অমিয়কে দেখেনি হাসি। বিয়েতে যাওয়ার সময়ে অমিয় সেদিন ওয়ার্ডরোব খুঁজে হাঁটকে বের করেছিল পাঞ্জাবি আর ধুতি। বহু যত্নে পরিশ্রমে ধুতির কোঁচা কুঁচিয়েছিল সে। অন্য ঘরে তখন হাসি সাজগোজ শেষ করে সবশেষে তার বেনারসি পরছে। হাসি বেরিয়ে এসে ধুতি—পাঞ্জাবি পরা অমিয়কে দেখে ভ্রূ ওপরে তুলে হেসে ফেলবে, বলবে, ওমা, তোমাকে যে চেনা যাচ্ছে না। এ—রকমই হবে বলে ভেবেছিল অমিয়। ধুতি—পাঞ্জাবি পরে সে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এ—ঘরে, ও—ঘরের দরজার দিকে মুখ, মুখে অপ্রতিভ হাসি। হাসি বেরিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু একটুও অবাক হয়নি। ঘড়ি দেখে কেবল বলেছিল, বড় দেরি হয়ে গেল, বর এসে গেছে বোধহয়—তোমার হল? একসঙ্গে তারা বেরোল, ট্যাক্সিতে উঠল, গেল বিয়েবাড়ি। সেখানে অমিয়কে পরিবেশন করতে হয়েছিল, বরযাত্রীদের তদারকও। দৌড়—ঝাঁপে পাঞ্জাবির ভাঁজ গেল নষ্ট হয়ে, ধুতি গেল দুমড়ে—মুচড়ে, ঝোল—তেলের দাগ ধরল তাতে। ফেরার সময়ে আবার ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে আসছিল তারা। অমিয়র মুখে বিকেলের প্রথম ধুতি—পাঞ্জাবি পরে হাসির সামনে দাঁড়ানোর সেই অপ্রতিভ হাসিটি কখন বিষণ্ণ ক্লান্তিতে ডুবে গেছে। শরীরের ঘামে, ঝোলে, তেলে ন্যাকড়া হয়ে গেছে তার পোশাক। হাসি তবু লক্ষ করেনি। ট্যাক্সিতে হাসির খোঁপা থেকে বেলফুলের মালার গন্ধ আসছিল, আর প্রসাধনের সুবাস, গয়নার টুং—টাং শব্দ। অভিজাত মহিলাকে ভিখিরি যেমন দেখে, তেমনই হাসির দিকে ভয়ে ভয়ে এক বার চেয়েছিল অমিয়। বলেছিল, হাসি, আমি আজ অন্য পোশাক পরেছিলাম। তুমি দেখোনি।

হাসি চমকে বলল, কই?

অমিয় হাসল, দেখছ না?

হাসি ভ্রূ কুঁচকে বলল, নতুন পোশাক কোথায়, এ তো ধুতি আর পাঞ্জাবি, তুমি তো প্রায়ই পরো।

পরি! কবে পরেছি?

পরোনি? হাসি একটু ভেবেটেবে বলে, গতবার মিঠুর কাকার শ্রাদ্ধের সময়ে পরেছিলে না?

না। অফিস থেকে এসেই তো তোমাকে নিয়ে বেরোলাম, পোশাক পালটানোর সময় ছিল না।

তা হলে বোধহয় জামাইবাবুদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে।

না।

তবে নিশ্চয়ই দীপালির বিয়ের সময়ে—

তাও নয় হাসি।

কী জানি! আমার তো মনে হচ্ছে তুমি পরেছ, আমি দেখেছি।

না হাসি, তুমি দেখনি।

হাসি একটু হাসল, তারপর বলল, দেখি, কেমন দেখাচ্ছে। বাঃ বেশ তো, একদম নতুন মানুষ! তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না!

শুনে কেমন একটু ভয় এসে ধরেছিল অমিয়কে।

এইসব তুচ্ছ ঘটনা থেকেই কি মানুষের ভয় জন্ম নেয়! মূল্যহীন হয়ে যাওয়ার ভয়! গুরুত্ব না পাওয়ার ভয়!

গির অরণ্যে এক বার সিংহ দেখতে গিয়েছিল অমিয়। বহুকাল আগে। দেখেছিল পিঙ্গল জটার মাঝখানে রাজকীয় গম্ভীর মুখে সিংহ বসে আছে, তার চার দিকে কয়েকটা সিংহী ঘুরঘুর করে কাছে আসছে, গা শুঁকছে, গরগর শব্দ করে জানাচ্ছে তাদের প্রেম। পিঙ্গল জটার সিংহ গ্রাহ্যই করছে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ, উদাসী, নির্মম সিংহকে দেখেছিল অমিয়, দেখেছিল তার ভয়ংকর পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার

দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, নিষ্ঠুরতা। বারে বারে তার পায়ের কাছে মাথা নত করে দিচ্ছে প্রেমিকরা, সে ফিরেও দেখছে না।

সেই সিংহটির কথা ভাবলে নিজের তুচ্ছতাকে বুঝতে পারে অমিয়, আজ। সে স্কুটারের পিছনে হাসিকে বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ক্যাথিড্রাল রোডে, উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে বের করেছিল, মিষ্টি মোলায়েম কয়েকটা কথা মনে মনে তৈরি করেছিল আগে থেকে। বিয়ের পর সে কত খুশি করতে চেয়েছে হাসিকে, নিজেকে বারবার নানা পোশাকে সাজিয়ে ডামির মতো দাঁড়িয়েছে হাসির সামনে। হাসি তাকে ভালোবাসেনি।

গিরের প্রায়ান্ধকার অরণ্যে একটা সিংহকে প্রায়ই ভাবে অমিয়। সেই সিংহকে কেউ নারীপ্রেম শেখায়নি। প্রকৃতিদত্ত পুরুষকার বলে সে উদাসী নির্মম! মানুষেরাও কি নয় সিংহের মতো! পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, পিঙ্গল কেশর—ঘেরা মুখে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার—পুরুষ এ—রকমই ছিল বহুকাল থেকে। কে তাকে শেখাল নারীপ্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রেমভিক্ষা, মোলায়েম ভালোবাসার কথা!

বলতে গেলে তখন থেকেই অমিয়র পতনের শুরু, যখন সে হাসির কাছে ক্যাথিড্রাল রোডে, ময়দানের সুন্দর বাতাসে স্কুটারে ভেসে যেতে যেতে ভিক্ষা চেয়েছিল হাসিকে। তখনই তার পতনের, ক্ষয়ের প্রথম অশ্বত্থ চারাটি উঁকি দিয়েছিল অলক্ষ্যে।

সেই পতনের প্রথম চিহ্ন ছিল এই, সে সারা দিন হাসির কথা ভাবত। নির্বিকার হাসির কথা, তার নিষ্ঠুরতা, উপেক্ষা—ভাবতে ভাবতে তার ঘুম হত না। ডিগবয়ের তেল কোম্পানির বিলেত—ফেরত ইঞ্জিনিয়ারটির কথা বলত হাসি, বলত তার শিলচরের প্রেমিকদের কথা, তার মণিপুরি নাচের কথা। শুনতে শুনতে ভিতরে ভিতরে উন্মাদ হয়ে যেত অমিয়। কিনে আনত পোশাক প্রসাধন—হাসির মনের মতো সাজত, হাসিকে খুশি করার জন্য সুন্দর কথা ভেবে রাখত সারাদিন, অন্যমনস্ক হাসির কাছে অনর্গল বলত, সে একদিন বড় হবে, খুব বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস ম্যাগনেট। সে হাসির জন্য শাড়ি কিনেছিল, গয়না, চমৎকার সব আসবাব, একটা ফ্রিজও। হাসি কিছুই তেমন আদর করে নেয়নি। অমিয়কেও না। রাতে শরীরে শরীর মিশিয়ে দিত অমিয়, মিশিয়ে ভাবত—পেয়েছি, পেয়েছি তোমাকে। তারপর মুখের স্বেদবিন্দু মুছে তৃপ্ত হাসি যখন পাশ ফিরে ঘুমোত, তখন উত্তপ্ত মাথায় সারা রাত ছিল অমিয়র জেগে থাকা। নিজের সেই পতন তখনও টের পায়নি অমিয়, তখনও গির অরণ্যে দেখা পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত—বিদ্যুৎ সেই সিংহের ছায়া তার চোখে পড়ত না। সে আধোঘুম থেকে চমকে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলত তখন, খুব জোরে স্কুটার চালাতে ভয় পেত, তখন থেকেই তার নিজের ভবিষ্যৎ এবং কর্মক্ষমতার ওপর সন্দেহ জন্মাতে থাকে। আর জন্ম নেয় ভয়।

ব্যবসা হচ্ছে তারের ওপর হাঁটা। সবাই লক্ষ রাখে, মানুষ কখন টলছে, পড়ো—পড়ো হচ্ছে, কখন পা ফেলছে না ঠিক জায়গায়। লক্ষ রেখেছিল তার সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা, প্রতিদ্বন্দ্বীরা আর সেনগুপ্ত। সি এম ডি—এর একটা বিল—পেমেন্ট গোপনে আদায় করেছিল সেনগুপ্ত, চেক ক্যাশ করেছিল। অমিয় টের পেয়েছিল দেরিতে। দুর্দান্ত সেনগুপ্তর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল খুব। সেনগুপ্ত তার ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল। আর অন্যমনস্ক, দুঃখিত অমিয়র চোখের আড়ালে আদায় করে নিয়ে গেল আরও তিনটে বিল—পেমেন্ট। সেগুলো টের পেতে আরও অনেক দেরি হয়েছিল তার। কলকাতার রাস্তার ভিড়ে আজও সেনগুপ্তকে খুঁজে বেড়ায় অমিয়। কিন্তু দেখা হলে কী করবে তা বুঝতে পারে না। চোখ বুজলেই সে দেখতে পায়, কালো শর্ট, টুকটুকে গেঞ্জি, দস্তানা পরা দুটি উদ্যত হাত, টুপির ছায়ায় আলপিনের মতো দুটি হিংস্র চোখ—সেনগুপ্ত ফণা তুলে দুলছে। পোস্টে পোস্টে উড়ে যাচ্ছে সেনগুপ্ত, পেনালটি আটকাচ্ছে বেতের মতো শরীর বেঁকিয়ে। আশ্চর্য! সেনগুপ্তর খেলা কোনওদিনই দেখেনি অমিয়, তবু চোখ বুজলেই ওই কাল্পনিক ভয়ংকর দৃশ্যটিই সে দেখতে পায়।

বাইরের লড়াইয়ে যে হারতে থাকে, সে তত ভিতরে ঢুকে কল্পনার দৃশ্য দেখে। কল্পনায় প্রতিশোধ নেয়; কল্পনায় ভয় পায়। হাসির জন্যই কি? কে জানে!

অমিয় আলো জ্বালল না। অন্ধকারেই উঠল। দু'—একটা কাগজ গুছিয়ে রাখল, বন্ধ করল ডেস্ক, চাবি কুড়িয়ে নিল। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওপর থেকেই বৃষ্টির গন্ধ পায় অমিয়। ঠান্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগে।

গাড়ি—বারান্দার তলায়, এক—ভিড় লোক বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুটারটা ফুটপাথে তুলে রেখেছে আহমদ। স্কুটারটা ছুঁয়ে বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টি একটুক্ষণ দেখে অমিয়। তারপর স্কুটারটা টেনে বৃষ্টিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। বৃষ্টির ঝরোখার ভিতর দিয়ে তার প্রিয় স্কুটার চলে লঞ্চের মতো জল ভেঙে। অমিয় ভিজতে থাকে। কপালের ঘামের নোনা স্বাদ জলে ভিজে গড়িয়ে এসে স্পর্শ করে তার জিভ। একটা সুন্দর কাচের বাসন ভেঙে ছড়িয়ে পড়লে যেমন দেখায়, বৃষ্টির ভিতর তেমনি শতধা বিদীর্ণ কলকাতার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। চার দিকের কাচের টুকরোর মতো ধারালো, রঙিন, ভঙ্গুর কলকাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

গড়িয়াহাটা পর্যন্ত একটানা চলে এল সে। তারপর খাড়াই ভেঙে স্কুটার উঠতে থাকে গড়িয়াহাটা ব্রিজের ওপর, ধনুকের পিঠের মতো সম্মুখ আড়াল করে উঠে গেছে রাস্তা। স্কুটারের মেশিন গোঙাতে থাকে ভয়ংকর। বরাবর এইটুকু উঠতে ভালো লাগে তার। ঝড় তুলে স্কুটার উঠতে থাকে। ব্রিজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুতে উঠে এলে হঠাৎ দিগ—দিগন্তের বাতাস ঝাপটা মারে এসে, চার দিকে বহু দূরের বিস্তর ডানা মেলে দেয়। সামনে স্বচ্ছন্দ উতরাইয়ের শেষে তার বাসা। বাসায় হাসি।

প্রবল বৃষ্টির ফোঁটা বর্শাফলকের মতো ঝকঝকে হয়ে ছুটে আসে। মুখের চামড়া ফেটে যায়। ব্রিজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুটিতে বাতাস—পাগল বৃষ্টির ফোঁটা খরশান। স্কুটার টাল খায় এখানে। ডান দিকে একটা অন্ধকার মাঠে বিস্ফোরকের মতো বিদ্যুৎ ফেটে পড়ে। এমন বাদলার দিন—এই দিনে হাসির কাছে ফিরে গিয়ে কী হবে অমিয়র?

অমিয় উতরাই ভেঙে নেমে আসে। বড় রাস্তার ওপর ওই দেখা যায় অমিয়র বাসা। দোতলায় আলো জ্বলছে, উড়ছে সবুজ পরদা। বাইরের দিকে একটা ঝুল—বারান্দা। অমিয় একপলক তাকায়। তারপর অচেনা বাড়ির দিকে চেয়ে যেমন চলে যায় রাস্তার লোক, তেমনিই না থেমে চলতে থাকে অমিয়। স্কুটার ভেসে যায়।

বহু দূর পর্যন্ত সোজা চলে তার স্কুটার। তারপর বাঁক নেয়। রাস্তার আলো এখানে ক্ষীণ, বহু দূরে দূরে। দু'ধারে গাছ—গাছালি, ব্যাঙের ডাক শোনা যায়, রাস্তায় লোকজন বিরল। এক—আধটা দোকান খদ্দেরহীন, আলো জ্বেলে বসে আছে দোকানি। এইসব রাস্তা পার হয়ে অমিয়র স্কুটারের আলো পড়ে একটা লেভেল ক্রসিংয়ের সাদা লোহার গেটে। এবড়ো—খেবড়ো রাস্তায় লাফায় হালকা স্কুটার, ভেঙে পড়তে চায়। অমিয় দাঁতে দাঁত চেপে হাতল সোজা রাখে। লেভেল ক্রসিংয়ে লাইনের মাঝখানে গভীর খন্দ, তাতে জল জমে আছে। ঝাঁকুনিতে ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে পড়তে চায়। গর্তে পড়ে জলে ঢেউ তোলে স্কুটার। অমিয়র জুতো—মোজা ভিজে যায়। লেভেল—ক্রসিং পার হয়ে অন্ধকার কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে ফাঁকা জমিতে দু'—একটা ঘুমন্ত বাড়ি চোখে পড়ে। স্কুটার গোঙায়, তবু এগোয় ঠিক। বহুকাল আসা হয় না এদিকে। রাস্তাটা একটু গোলমেলে লাগে। স্কুটার থামিয়ে হেড লাইটটা বার কয়েক চারধারে ফেলে অমিয় স্কুটার ছাড়ে। এগোয়। অনেকটা গিয়ে ডান ধারে ইটখোলাটা দেখতে পায় অমিয়। নাবাল মাঠে জল জমে গেছে। কী গম্ভীর ব্যাঙের ডাক। মনে হয় রাত নিশুতি হয়ে গেছে। ইটখোলার গা বেয়ে একটা শুঁড়ি পথ। দু'ধারে এই বর্ষায় আগাছা জন্মেছে খুব। পিছল হয়েছে রাস্তা, ক্ষয়ে গেছে। সেই রাস্তায় স্কুটার এগোয় না। এঁটেল মাটিতে চাকা পড়ে একই জায়গায় ঘুরতে থাকে। অমিয় টেনে তোলে। আবার এগোয়।

একটা নিমগাছ ছিল এখানে, আর কলার ঝাড়। সামনে উঠোন। মনে করতে চেষ্টা করে অমিয়। স্কুটার অনিচ্ছায় বহন করে তাকে। অনেকটা ভিতর ঢুকে যায় সে। চার দিকে বাড়িঘর নেই। আলো নেই। কোনও মানুষ চোখে পড়ে না। অমিয় এগুতে থাকে। আঁকাবাঁকা পথে স্কুটার ঘোরে। কাদা ছিটকে আসে, ব্যাঙ লাফায়, জলের কল কল শব্দ হতে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায় জলে—স্থলে। অমিয় প্রাণপণে চেয়ে দেখে, চিনতে চেষ্টা করে জায়গাটা। বহুকাল আসা হয়নি। বহুকাল।

স্কুটার লাফিয়ে উঠে একটা কলার ঝাড়ে আলো ফেলে এক মুহূর্তের জন্য। আভাসে একটা নিমগাছ দেখা যায় অবশেষে। উঠোন জলে ভাসছে। একটা অন্ধকার বেড়ার ঘর, টিনের চালে অবিরল বৃষ্টির শব্দ উঠছে। অমিয় স্কুটার থেকে নেমে উঠোনের আগল ঠেলে গোড়ালি—ডুব জলে পা দেয়। ডাক দেয়, খুড়িমা! ও খুড়িমা!

দরজা খুলতেই একটা হারিকেনের ম্লান হলুদ আলো দেখা যায়।

কে?

অমিয় বারান্দায় উঠে আসে। একটা স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে বোকা চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। শোভনাদির ছেলে ভাসান। অমিয় চিনতে পারে।

ভাসান, আমি অমিয়মামা। খুড়িমা কেমন আছে?

ছেলেটা ঠিক চিনতে পারে না প্রথমে, বিশ্বাস করতে পারে না। বোকা চোখে চেয়ে থেকে একটু সময় নেয় বুঝতে। তারপর বলে, অমিয়মামা? তুমি এই রাতে? কী হয়েছে?

অমিয়র হঠাৎ লজ্জা করতে থাকে। কী বলবে সে! এত রাত্রে মানুষ বড়জোর বাড়ি ফেরে। কোথাও যায় না।

ভিতর থেকে ঘুম—ভাঙা বুড়ি—গলায় কে জিজ্ঞেস করে, কে রে? কে এল রে ভাসান?

অমিয়মামা।

কে অমিয়?

ভাসান আলোটা সরিয়ে দরজা ছেড়ে বলে, ভিতরে এসো অমিয়মামা। দিদিমা ভালো নেই। হার্ট খুব খারাপ।

অমিয় তার ভেজা জুতো ছাড়ে। জামা—প্যান্ট থেকে যত দূর সম্ভব জল ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ঘরে ঢুকতেই ম্লান আলোয় বহুদিন আগেকার সেই ঘরখানা দেখে। হারিকেনের গন্ধে ঘর ভরা, বিছানায় মশারি ফেলা! মশারির ভিতর হাতপাখা নড়ার শব্দ। খুড়িমার কাছে মা মরার পর বহুদিন শুয়েছিল অমিয়। ঘুমের মধ্যেও খুড়িমার পাখা নড়ত নির্ভুলভাবে।

কে এলি রে? মশারির ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে।

আমি খুড়িমা, আমি অমিয়।

একটা অস্ফুট শব্দ করে খুড়িমা, গোঁজা মশারির এক দিক তুলে বুড়ো মুখখানা বের করে। চোখে আলো লাগতে মিটমিট করে তাকিয়ে বলে, অমিয় মানে মেজোঠাকুরের ছেলে?

ভাসান ধমক দেয়, তো আর কে অমিয় আছে?

হারিকেনটা তোল তো ভাসান, দেখি। অমিয়, কাছে আয়। দেখি তোর গা। ঠিক তুই তো?

ভাসান বলে, শার্টটা ছেড়ে ফেলো অমিয়মামা। ইস! তুমি খুব ভিজে গেছ।

অমিয় বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, খুড়িমা, তুমি এত বুড়ো হলে কবে? এত বুড়িয়ে যাওয়ার কথা তো ছিল না তোমার!

তুই কি এই বৃষ্টিতে এলি? কী হয়েছে তোর? খারাপ খবর আছে কিছু? কাছে আয় না, দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

তুমি কাকার থেকে চোদ্দো বছরের ছোট ছিলে, তবে বুড়ো হলে কী করে?

মশারি তুলে খুড়িমা উঠে বসে। গা উদোম। কাপড় খসে গেছে। কোমরের কাপড় ঠিক করতে করতে বলে, তোর কাকা গেছে বিশ বছর আগে, তখনই আমার পঞ্চাশ পুরে গেছে। বয়সের হিসেব তুই কী জানবি? মেজোঠাকুরের বুড়ো বয়সের সন্তান তুই! তোর জন্মের সময়ে মেজোঠাকুরের বয়স পঞ্চাশ—বাহান্ন, তোর মা'র চল্লিশ। তোর এখন বয়স কত?

পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশ।

তবে? বয়সের হিসেব ঠিক রাখতে পারিস না তোরা। কাছে আয় তো দেখি, কী—রকম ভিজেছিস!

খুড়িমা হাত বাড়িয়ে অমিয়কে ধরে কাছে টেনে নেয়। সমস্ত শরীরে মরা হাতখানা দিয়ে সেঁক দেওয়ার মতো চেপে চেপে ধরে তার শরীর দেখে।

তুই কি পাগল? এমন কাক—ভেজা কেউ ভেজে? ভাসান, জামা—কাপড় দে এক্ষুনি, তার আগে গামছা দে। রাখুকে বল এক পাতিল আগুন করতে, সেঁক না—দিলে ও মরে যাবে।

খুড়িমা, তুমি কেমন আছ?

কী জানি! ডাক্তার বলছে, ভালো না। কাপড়ে—চোপড়ে হেগে—মুতে ফেলি, আর বুকে একটা চাপ ব্যথা হয়। কতকাল আসিস না।

আজ তো এলাম।

এটা কী—রকম আসা। তোর মাকে আমি রোজ স্বপ্নে দেখি। আমার ভরসায় তোকে ছেড়ে গিয়েছিল, তাই রোজ এসে খবর নিয়ে যায়। বাইরের নিমগাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে, ডাকে। বহুকালের পুরনো ঝগড়া শত্রুতা তার সঙ্গে। ক'দিন পর আমিও তো তার কাছে যাব, এখন যদি তোর কিছু হয় তো সে আমাকে আস্ত রাখবে? এই বৃষ্টিতে ভিজে এলি, তুই কেমন পাগল? ও ভাসান—

দিই।

তাড়াতাড়ি দে।

খুড়িমা, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি, চলে যাব। এখন আর জামা—কাপড় ছেড়ে কী হবে?

তোর বর্ষাতি নেই? ছাতা কিনিসনি? ওর তোরা ওঠ, ও ভাসান, পাখিকে বল চা করবে, রাখুকে ঠেলে তুলে দে, পাতিলের আগুনটা করে দিক, আমি ওকে সেঁক দেব। অমিয়, কেন এসেছিস? অমিয়র বলতে ইচ্ছা করে, এইজন্যই। কিন্তু তা বলে না অমিয়, বলতে নেই। চুপ করে থেকে তার বুকে—পিঠে মাথায় কঙ্কালসার হাতখানা অনুভব করে সে। এইটুকুর জন্য এত রাতে, দীর্ঘ পথ জল কাদা ঝোড়ো বাতাস ভেদ করে এসেছে সে।

কেন এসেছিস? আমাকে দেখতে? আমি মরে গেলাম কি না দেখতে এসেছিস? বলতে বলতে খুড়িমা একটু কাঁদে। বলে, সত্যিই খুড়িমাকে ভালোবাসিস অমিয়? তোর বউ বাপের বাড়িতে গেছে নাকি? বাচ্চা—কাচ্চা হবে না তো?

না।

তোর বাচ্চা হয় না কেন রে? অ্যাঁ! কী করিস তোরা? আঁট—বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি? বুড়ো বয়সে হলে মানুষ করার সময় পাবি না। এখন হইয়ে ফেল।

চুপ করো খুড়িমা।

আমার তো ছেলে নেই। ভাসানকে বলি তোর খবর আনতে। তা সে তোর দোরগোড়ায় গিয়ে গিয়ে ফিরে আসে, ভিতরে ঢোকে না, এসে বলে—মামা বাড়িতে থাকে না, মামিকে চিনি না, লজ্জা করে। আমি অবাক হই। মামিকে আবার চেনার কী আছে। গিয়ে কোলে বসে পড়বি, আবদার করবি, জ্বালাবি—তাতেই চিনবে।

চুপ করো, তুমি চুপ করো।

চুপ করব কেন? অমিয়, কেন এসেছিস?

তোমাকে দেখতে।

ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে রাখী আর পাখী। কেটলিতে জল ফোটে। পাতিলে কাঠকয়লার আগুন জ্বালে রাখী। অমিয় খালি গায়ে, ধুতি পেঁচিয়ে বসে। তাকে ঘিরে হারিকেনের আলোয় একটা ছোট উৎসব শুরু হয়।

আমার কেউ নেই অমিয়। শোভনা তার তিন ছেলেমেয়ে রেখেছে আমার কাছে, রক্ষা। ভেবেছিলাম, শোভনা আমার মেয়ে আর তুই ছেলে?

পাতিলের আগুনের ওপর দুই হাত মেলে ধরে খুড়িমা। গরম হাত দু'খানা এনে তার গায়ে চেপে চেপে ধরে। কতকালের পুরনো এক রক্তস্রোত আর—এক রক্তস্রোতের খবর নিতে থাকে।

রাখু, ভাত চড়াসনি?

না তো! মামা কি খেয়ে যাবে?

খেয়ে যাবে না তো কী? কোথায় খাবে?

আমি খাব না খুড়িমা।

কেন খাবি না? বউ রেঁধে রেখেছে বলে? গেরস্তর ঘরে কখনও ভাত নষ্ট হয় না। খেয়ে যা। আপিস থেকে এলি তো?

হ্যাঁ।

পাখী, তুই একটু হাত গরম করে সেঁক দে। আমি একটু শুই, বুকটা কেমন করে।

কথা বোলো না।

বলব না! কেন? কাছে এসে বোস আরও। তোর বউকে বিয়েতে আমি গয়না দিইনি, না? কী দিয়েছিলাম যেন?

পাখী মুখ তুলে বলে, দিয়েছিলে। নাকছাবি।

ওঃ। নাকছাবি আবার গয়না! অমিয়, তোর ছেলেমেয়ে হলে একছড়া গোঠ দেব। তিন ভরি সোনা। তুই কোথায় থাকিস যেন?

ঢাকুরিয়া।

সে কি অনেক দূর? যদি দূর না হয় তো তোর বউ, কী নাম যেন, তাকে নিয়ে আসিস। ভাসান, পাখী, তোরা ওর সঙ্গে কথা বলছিস না কেন? কথা বল।

তুমি অত তাড়া দিলে কথা বলবে কখন? চা করছে, গা সেঁকছে, ভাত রাঁধছে, ওদের তো বসতেই দিচ্ছ না।

তাড়া কি সাধে দিই! তোর মাকেই আমার ভয়। তার মুখের বড় ধার ছিল। এখনও এ বাড়ির আনাচে—কানাচে ঘুরে জিভ শানাচ্ছে, আমি গেলেই ধরবে আমাকে। হ্যাঁ রে, পরের মেয়ে বউ হয়ে এসে আপনজন হয়ে যায়, আর পরের মা কিছুতেই কি মা হতে পারে না? কেন এসেছিস অমিয়?

খুড়িমা, তুমি আমাকে গল্প বলো।

কীসের গল্প শুনবি?

আমার গল্প বলো। আমি কেমন ছিলাম?

তুই? তুই আবার আলাদা কী ছিলি! আর পাঁচজনের মতোই ছিলি তুই। শিশুকালে সবাই এক থাকে, বড় হয়ে আলাদা রকমের হয়।

তবু বলো।

খুব দুষ্টু ছিলি। ভীষণ। মা ছিল না বলে তোর আদর ছিল সবচেয়ে বেশি। আশকারা পেয়ে মাথায় উঠেছিলি। তোর দিদি নানি সেই তুলনায় ঠান্ডা ছিল। পারুলিয়ার বাড়িতে একটা মস্ত দিঘি ছিল—তার এপার—ওপার দেখা যায় না, তার কালো জল খুব গভীর, বড় বড় মাছ ছিল। দিঘির পারে একটা ডিঙিনৌকো বাঁধা থাকত—তাতে চড়ে মাঝদিঘিতে শ্বশুরমশাই মাছ ধরতে যেতেন। সেই ডিঙিনৌকোয় চড়ে এক দুপুরে তুই আর নানি চুপি চুপি দিঘির মাঝখানে চলে গিয়েছিলি। চিৎকার শুনে আমরা দিঘির পাড়ে গিয়ে দেখি, নানি উঠে দাঁড়িয়ে বৈঠা তুলে চেঁচাচ্ছে, তুই নৌকোর এক ধারে ঝুঁকে আছিস। কেতরে নৌকোটা ভেসে আছে। সে যে কত দূর চলে গিয়েছিলি তোরা—এই টুকু টুকু দেখাচ্ছিল তোদের। চার দিক থেকে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে কিন্তু তোরা এত দূরে যে পৌঁছতে পারছিল না। নৌকোটা কেবলই কাত হচ্ছিল তখন, তুই ঝুলে ছিলি, পড়ে যাচ্ছিলি। কী ভয় আমাদের!

তুমি কী করেছিলে?

আমি! আমি কী করব? বোধহয় খুব চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তোরা মা—মরা দুটো ভাইবোন কেন যে ওই বিদঘুটে খেলা করতে গিয়েছিলি! লোকে বলাবলি করেছিল যে তোদের ভূতে পেয়েছে। কেন গিয়েছিলি অমিয়?

আমরা কী করে ফিরে এলাম আবার?

কেউ ধরার আগেই তুই ঝাঁপ দিয়েছিলি জলে। তোকে কেউ ধরতে পারেনি। একা সাঁতরে এলি পাড়ে। খুব রোখ ছিল তোর।

খুড়িমা, আমি একটা জলের স্বপ্ন খুব দেখি।

কী—রকম জল?

অনেক জল, অথৈ জল। একটা খুব বড় নদী, তার ও—পার দেখা যায় না। তার একধারে একটা বিরাট বালিয়াড়ি, আর একটা স্টিমার বাঁধার জেটি। সেখানে কেউ নেই। বালির ওপর একটা কেবল সাপের খোলস পড়ে আছে।

খুড়িমা হঠাৎ রোগা, মরা হাত বাড়িয়ে অমিয়র হাত ধরে। বলে, অমিয়, কী বলছিস?

একটা স্টিমারঘাটের কথা। একটা বালিয়াড়ির কথা।

খুড়িমা একটু চুপ করে থাকে।

খুড়িমা তুমি এই স্টিমারঘাটের কথা কিছু জানো?

খুড়িমা, আস্তে আস্তে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে, না তো! স্টিমারঘাটের কথা কী জানব! তুই কবে থেকে এটা দেখিস?

অমিয় একটু ভাবে। তারপর বলে, অনেক দিন থেকে। এক দিন ঘুমের মধ্যে ওই স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। তারপর আবার ঘুমোই, আবার সেই স্বপ্ন। তিন বার করে স্বপ্নটা দেখে আর ঘুম হল না। একা একা শুয়ে খুব ভয় করতে লাগল। মনে হল, কেউ পাশে থাকলে খুব ভালো হত।

বউয়ের সঙ্গে কি তোর ঝগড়া অমিয়?

কেন, ও—কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

এই যে বললি—তুই একা শুস। একা শুবি কেন অমিয়? বউ বিছানায় নেয় না? আলাদা শোয়? তা তার এত গুমোর কীসের? ওই জন্যই তোদের বাচ্চা হয় না—

খুড়িমা স্টিমারঘাটের কথাটা আগে শোনো।

কী শুনব! স্টিমারঘাটের কথা আমি কিছু জানি না। রাখু ভাতটা টিপে দ্যাখ, হাঁ করে গল্প শুনছিস, ভাত গলে যাবে। একটু ডাঁটো থাকতে নামাস, অমিয় ঝরঝরে ভাত ভালোবাসে। ভাসান, কত রাত হল রে?

ন'টা।

অমিয় যাওয়ার সময়ে টর্চ জ্বেলে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিস। আমি একটু চোখ বুজে থাকি। আমার মনটা ভালো লাগছে না।

কেন খুড়িমা?

তুই কেন স্টিমারঘাটের কথা বললি? ও—সব অলক্ষুণে কথা, মন বড় খারাপ হয়ে যায়।

খুড়িমা মশারির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে নেয়, হাতপাখার মৃদু শব্দ হতে থাকে। রাখু এসে বলে, মামা, রান্না হয়ে গেছে। বসবেন না?

অন্যমনস্ক অমিয় ওঠে।

খেয়ে উঠে পোশাক পরছিল অমিয়। খুড়িমা ঘুমচোখে বলে, ভেজা পোশাক আবার পরছিস অমিয়, ঠান্ডা লাগবে না? ওগুলো ছেড়ে রেখে যা—

রাখু বলে, উনুনে ধরে শুকিয়ে দিয়েছি দিদিমা।
ওতে কি শুকোয়? সেলাইয়ের জল থেকে যায়। স্টিমারঘাটের কথা যেন কী বলছিলি অমিয়?
তুমি তো শুনতেই চাইলে না।
খুড়িমা একটু অস্ফুট শব্দ করে। তারপর বলে, ছেলেবেলা থেকে তুই বড় একা। সেই জন্যে তোর দুঃখ নেই তো অমিয়? তোর মা—বাপ নেই—সে বড় দুঃখ। আমি তোর মা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চাইলেই কি হওয়া যায়! নিজের মেয়েটা, এই যে সব নাতি—নাতনি—এ—সব থেকেও তো কেমন একা লাগে। রাত—বিরেতে ঘুম ভাঙলে কারও নাম মনে পড়ে না। ডাকতে গিয়ে দেখি, মাথা অন্ধকার লাগে। মনে হয় কেউ নেই আমার। সে বড় কষ্ট। ভাবি মানুষের আপনজন কে—ই বা আছে! তুই কেন এসেছিলি যেন অমিয়?
তোমাকে দেখতে।
একটা শ্বাসের শব্দ হয়। খুড়িমা বিছানায় পাশ ফিরে শোয়। তারপর বলে, স্টিমারঘাটের কথা কেন বললি? কী জানি কেন, আমিও ঠিক একটা ধু ধু বালির চর দেখতে পাই এখন, অনেক দূরে একটা ঘাট, তারপর অথৈ জল... সাবধানে যাস অমিয়, উঠোনটা পিছল, রাস্তা ভালো না, অনেক রাত হয়েছে!
খুড়িমা, তুমি ঘুমোও।
ঘুম কি আসে। ভাসান টর্চটা ধর। অমিয় তোর বউয়ের নাম যেন কী?
হাসি।
হাসি! হাসির কেন বাচ্চা হয় না রে? আঁট—বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি?
অমিয় চুপ করে থাকে।
বাচ্চা না হলে বউ আপন হয় না। আঁটকুড়ি নয় তো? ডাক্তার দেখাস। তোর কেউ নেই অমিয়, বাচ্চা—কাচ্চা হলে একটু বাঁধা পড়বি। কিন্তু বয়স হলে আবার সেই—
কী?
সেই যে কী যেন বললি! সেই স্টিমারঘাট—অথৈ জল... অমিয় সাবধানে যাস—

মেঘ কেটে ভয়ংকর জ্যোৎস্না পড়েছে। অমিয় নির্জন রাস্তায় তার স্কুটার চালায়। বাতাস লাগে, জল—মাটির গন্ধ পায় সে। চলতে থাকে। হাসি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। অমিয়র ঘুম হয় না আজকাল।
দূরে সিংহের ডাকের মতো মেঘগর্জন শোনা যায়। গির—অরণ্যে দেখা এক সিংহের অবয়বের ছায়া পড়ে অমিয়র চোখে। সে চলতে থাকে!

স্কুটারের শব্দ ঠিক শুনতে পেল হাসি। আধো—ঘুমের মধ্যেও। যেন এতক্ষণ সে এই শব্দের অপেক্ষায় ছিল। উঠে ঘড়ি দেখল সে। রাত এগারোটা বেজে গেছে। অমিয়র জন্য তার কোনও কৌতূহল নেই। সে শুধু আধো জেগে ছিল বলে মাঝে মাঝে রাস্তার চলমান স্কুটারগুলির শব্দ শুনে উঠে এক বার ঘড়ি দেখেছে। কোনও স্কুটারের শব্দই এতক্ষণ থামেনি।
হাসি শুনতে পেল, অমিয় স্কুটার টেনে সিঁড়ির নীচে নামিয়ে রাখছে। আবার বিছানায় এসে শুয়ে থাকল হাসি। আগে আগে অমিয় এলে অন্তত খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসত সে। মুখোমুখি দু'চারটে কথা হত। খাওয়ার পর ছিল তাদের বাঁধা রতিক্রিয়া। এখন আর হাসি খাওয়ার টেবিলে যায় না।
সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে অমিয়র পায়ের শব্দ, ভেজানো দরজা ঠেলে ও—ঘরে ঢোকে। জামা—কাপড় ছাড়ে। বাথরুমে যায়।
ও—ঘর থেকে একটা চৌকো আলো এসে এ—ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। অমিয়র রাত্রে ভালো ঘুম হয় না—হাসি জানে। অনেক রাত জেগে ও বই পড়ে। সিগারেট ধরানোর শব্দ হয় রাতে,

পায়চারির শব্দ, কাশির।

চৌকো আলোটাতে একটা মানুষের ছায়া পড়ে। বাঁকা ছায়াটা, একটা কাঁধ উঁচু দেখায়, মাথাটা বেঁকে পড়ে আছে।

হাসি চেয়ে থাকে।

দরজার কাছ থেকে অমিয় বলে, কেউ এসেছিল?

হাসি মৃদুগলায় বলে, টেলিফোনের লোক। কাল তোমার টেলিফোন দিয়ে যাবে।

টেলিফোন! একটু অবাক হয় অমিয়।

বলল, তুমি তিন বছর আগে অ্যাপ্লাই করেছিলে, এত দিনে মঞ্জুর হয়েছে।

টেলিফোন দিয়ে আমি এখন কী করব?

হাসি একটু হাসে। বলে, লোকের সঙ্গে কথা বলবে। কত কথা আছে মানুষের, শোনার লোকেরও অভাব নেই।

আমার কোনও কথা নেই।

কে বলল নেই! শুনতে পাই, তুমি লোককে একটা স্টিমারঘাটের কথা বলো।

সে—কথা থাক হাসি। আর কে এসেছিল?

এক বুড়োমতো ভদ্রলোক, তোমার পিসেমশাই। তাঁর মেয়ের বিয়ের চিঠি রেখে গেছেন।

চিঠি দেখেছি। তিনি কিছু বলেননি?

বলেছেন। পরশু বিয়ে, আমি যেন অবশ্যই তোমাকে নিয়ে বিয়েতে যাই। অনেক বার বললেন। আমি বলেছি, যাব। চা করে খাইয়েছি। অনেকক্ষণ বসে ছিলেন তোমার জন্য।

আর কিছু বলেননি?

না। বোধহয় কিছু বলার ছিল, তোমাকে বলতেন। আমাকে কিছু বলেননি।

বলেছিলাম, রেখার বিয়েতে এক হাজার টাকা দেব। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে ভাবিনি।

দেবে যখন বলেছিলে তখন তো দেওয়াই উচিত। তাঁর পোশাক দেখেই মনে হয় অবস্থা ভালো না।

কোথা থেকে দেব?

তুমি আমাকে যে—সব গয়না দিয়েছিলে সব স্টিলের আলমারিতে আছে। দরকার হলে নিতে পারো, আমি তো নিচ্ছি না।

আমাদের বংশের কেউ কখনও ঘরের জিনিস বেচেনি।

তা হলে কী করবে?

বুঝতে পারছি না।

হাসি লক্ষ করে একটা ধুতি জড়িয়ে অমিয় দাঁড়িয়ে আছে। কোমরের ওপর ওর খালি গা। পিছন থেকে আলো এসে পড়েছে ওর গায়ে। মাথাটা বোধহয় ভেজা, পাট—করা চুল থেকে আলো পিছলে আসছে। লম্বাটে হাড়সার দেহ অমিয়র। অমিয় রোগা হয়ে গেছে কি না তা ঠিক বুঝতে পারে না হাসি। এ—সব বোঝা খুব মুশকিল। ওই দেহটির স্বাদ সে বহু বার পেয়েছে। তার দুই হাতে, নগ্ন শরীরের আনাচে—কানাচে আজও ছড়িয়ে আছে সেই স্বাদ। কত বার সে বেষ্টন করেছে ওই শরীর, মথিত হয়েছে। তবু ওই শরীরের সব খবর তার জানা নেই।

অমিয়র ঠোঁটে একটা সিগারেট একটু জ্বলে উঠল। সেই আগুনটাই বোধহয় একটা আশ্লেষ তৈরি করে হাসির শরীরে। সে শরীরের ভঙ্গি বদলায়। হঠাৎ প্রশ্ন করে, তোমার ওজন কত?

অমিয় একটু থমকে থাকে। প্রশ্নটা বুঝতে না—পেরে জিজ্ঞেস করে, কী বলছ?

তোমার ওজন কত?

কেন?

এমনিই জিজ্ঞেস করছি। জামাইবাবু বলছিল, তুমি নাকি রোগা হয়ে গেছ। তোমার কি ওজন কমে গেছে?
কী জানি।
তুমি ওজন নাও না?
না।
হাসি একটু শ্বাস ফেলে বলে, আমার রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি। কলকাতায় আমাকে আরও কয়েক দিন থাকতে হবে।
থাকবে। তাতে কী?
আমি দিদি—জামাইবাবুর কাছে চলে যেতে পারতাম এ ক'দিনের জন্য। কিন্তু সেখানে পাশের ফ্ল্যাটে তোমার দিদি—জামাইবাবু থাকেন। গেলে ওঁরা নানা রকম সন্দেহ করতে পারেন বলে যাইনি।
যেমন তোমার ইচ্ছে।
খুশির বিয়ের তারিখ এসে গেল। রিজার্ভেশন পাওয়া যাচ্ছে না। কী যে করব!
প্লেনে চলে যাও।
তুমি ভাড়া দেবে? অনেক ভাড়া কিন্তু।
দেব।
তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ।
প্লেনের ভাড়া কত?
দু'—তিনশো হবে বোধহয়। আমি ঠিক জানি না। তোমার ব্যবসার অবস্থা কী?
ভালো নয়।
খুব খারাপ।
হুঁ।
কী—রকম খারাপ?
উঠে যাওয়ার মতো।
কেন?
হাসি, আমি প্লেনের ভাড়া ঠিক দেব।
হাসির ঘুম পায়। সে হাই তুলে বলে, দরজার পরদাটা টেনে দেবে? চোখে আলো লাগছে।
পরদিন দুপুরবেলা জামাইবাবুকে ফোন করে হাসি।
জামাইবাবু, রিজার্ভেশন যদি না পাওয়া যায় তো আমি প্লেনে যাব।
তার দরকার নেই, তেরো তারিখের একটা স্লিপার বার্থ পাওয়া গেছে।
পাওয়া গেছে? সত্যি?
সত্যি। সুখের পাখি এবার উড়ে যাও।
হাসি চুপ করে থাকে।
ফোন কি ছেড়ে দিয়েছ হাসি?
না।
কাল ছেড়ে দিয়েছিলে। একটা প্রশ্নের জবাব দাওনি।
জামাইবাবু, আমাদের মধ্যে কোনও ঝগড়াঝাটি হয়নি। কথাবার্তা বন্ধ হয়নি। কাল রাতেও অনেকক্ষণ আড্ডা মেরেছি। আমরা সম্পূর্ণ নরমাল। এমনকী কোর্ট—কাছারির কথাও ভাবছি না।
তবে কি ফিরে আসার কথাও ভাবছ?
না!
তুমি কোথা থেকে ফোন করছ হাসি?

কেন?
ফ্রিলি কথা বলতে পারবে?
আমি বাসা থেকে ফোন করছি।
বাসা থেকে! বাসায় কবে ফোন এল?
আজ। বছর তিনেক আগে অ্যাপ্লাই করেছিল, আজ কানেকশান দিয়ে গেছে।
ফোন কেন নিতে গিয়েছিল অমিয়? দুপুরে অফিস থেকে তোমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য?
হবে হয়তো।
ফোন কোম্পানির মতো বেরসিক দেখিনি। যখন পাখি উড়ে যাচ্ছে তখন এল ফোন! এখন দুপুরে কার সঙ্গে কথা বলবে অমিয়? বেচারা!
কী বলছিলেন বলুন।
ডিগবয়ের তেল কোম্পানির সেই ইঞ্জিনিয়ার, সে এখনও বিয়ে করেনি শুনেছি। সত্যি?
সত্যি।
সে কখনও তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল হাসি?
হাসি একটু দ্বিধা করে বলে, না না।
তবে কী করেছিল?
একটা দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিল। তাতে বারবার একটা প্রশ্ন করেছিল—আমার কী দোষ? আমাদের অপরাধ কী? আপনি কেন এমন করলেন? আরও লিখেছিল, যদি কখনও নিজের ভুল বুঝতে পারি তবে যেন তাকে জানাই, সে সারা জীবন অপেক্ষা করবে, নিঃশর্তে গ্রহণ করবে আমাকে... জামাইবাবু, আপনি কি শুনছেন? আপনার শ্বাস—প্রশ্বাসও যে শোনা যাচ্ছে না।
শুনছি। বলো।
সে এই কথা লিখেছিল। আরও লিখেছিল, তাদের কালাশৌচের মধ্যেই যে তারা আমাকে আশীর্বাদ করে রেখেছিল, সেটাও তারই আগ্রহে। তার ভয় ছিল, আশীর্বাদ করে না রাখলে ওই সময়ের মধ্যে আর—কেউ এসে আমাকে বিয়ে করে ফেলবে। তখন শিলচরে আমার স্যুটার অনেক, ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি পেতুম... শুনছেন?
শুনছি।
কালো হলেও তো আমি সুন্দরী—ই। তার ওপর দারুণ নাচতাম, গাইতাম। আমার পায়ে পুরুষদের মাথা নূপুরের মতো বাজত।
ও—পাশে জামাইবাবু বহুক্ষণ শ্বাস ধরে রেখে আবার অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস ছাড়ে। হাসি হাসে।
কিছু বুঝলেন জামাইবাবু?
বুঝলাম।
কী?
তুমি আর ফিরবে না হাসি।
ও—পাশে জামাইবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। হাসি অপেক্ষা করে।
হাসি, স্টিমারঘাটটা সাবধানে পার হয়ো। ও—জায়গাটা ডেঞ্জারাস।
হাসি চমকে উঠে বলে, স্টিমারঘাট! কোন স্টিমারঘাট?
বাঃ, ফারাক্কায় তোমাকে ঘাট পেরোতে হবে না?
ওঃ। বলে স্তব্ধ হয়ে থাকে হাসি।
একা যাচ্ছ, আমরা চিন্তায় থাকব। ও—পারে বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেসে তোমার রিজার্ভেশন আছে, ভুল করে দার্জিলিং মেলে উঠো না।

ভুল ট্রেনে ওঠাই কি আমার স্বভাব জামাইবাবু?

জামাইবাবু একটু চুপ করে থেকে বলে, ভুল ট্রেনের কথা বলছ হাসি! কিছু ইঙ্গিত করছ কি? তবে বলি, আমাদের আমলে ভুল ট্রেনে উঠলেও শেষ পর্যন্ত যেতে হত। হয়তো ভুল জায়গায় গিয়ে পৌঁছোতাম। কিন্তু তবু যেতে হত। তোমাদের আমল আলাদা। তোমরা ভুল ট্রেন বুঝতে পারলেই চেন টেনে নেমে পড়তে পারো।

আমরা ভাগ্যবান।

দেখা যাক। আমি আরও কিছুদিন বাঁচব হাসি।

হাসি হাসে।

এখনও সাত—আট দিন সময় আছে, এ ক'দিন কী করবে হাসি?

কী করব! ঘুরব, ঘুরে বেড়াব!

কোথায় যাবে?

কোথাও না। কলকাতা—কেবল কলকাতায় ঘুরব—ইচ্ছেমতো।

কলকাতায় আর কোথায় ঘুরবে, কী আছে কলকাতায়?

কী আছে? কী জানি! আমি তো বিশেষ কোথাও যাব না। আমি ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায়। রঙিন দোকান দেখব, আলো দেখব, পার্কে বসে থাকব, কলকাতা পুরনো হয় না।

কলকাতায় তুমি কী পেয়েছ হাসি?

কী পেয়েছি! হাসি তা ভেবে পায় না। সে চোখ বুজে থাকে। মনে মনে বলে, কলকাতা! কলকাতা আমার প্রেমিক। জ্বলন্ত এক পুরুষ কলকাতা। সে আমাকে সব সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে টেনে এনেছিল, সুখী হতে দেয়নি। সে আমাকে নিয়ে আরও কত খেলা খেলবে, তোমরা দেখো।

হাসি, ফোন কি ছেড়ে দিয়েছ?

না তো।

তোমার শ্বাস—প্রশ্বাসও যে শোনা যাচ্ছে না।

শুনছি। বলুন।

এ কয়দিন অমিয়কে সঙ্গে নিয়ে ঘুরো।

ও—মা! ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরব না কেন? এই তো ওর পিসতুতো বোনের বিয়েতে যাচ্ছি একসঙ্গে। ওর স্কুটারে বহুদিন চড়িনি। ভাবছি ওর স্কুটারের পিছনে বসে এ—ক'দিন ঘুরে বেড়াব। অফিসপাড়া, কলেজ স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিটের রেস্টুরেন্ট দেখে বেড়াব দুজনে। জামাইবাবু, আপনি কি ভাবছেন আমার প্রেজুডিস আছে? একদম নেই। আমরা দুজনে কথা বলি, হাসি—ঠাট্টা করি, কখনও ঝগড়া করি না। এমনকী মাঝে মাঝে এক বিছানায়... জামাইবাবু, শুনছেন?

কী ভয়ংকর!

কী?

তোমার নিষ্ঠুরতা।

মাথা আস্তে আস্তে পিছনে হেলিয়ে দিচ্ছিল হাসি। ক্রমে পিঠ বেঁকে গেল পিছনে, মাথা প্রায় স্পর্শ করল পিঠ। কত উঁচু বাড়ি। উঠে গেছে তো উঠেই গেছে। কী বিশাল বাড়িটার বুক, কী পাথুরে গড়ন! দেখতে দেখতে নেশা ধরে যায়। হ্যারিংটন স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটার ঠিক পায়ের তলা থেকে চূড়া দেখার চেষ্টা করল হাসি, তার মুখে ঘাম জমে গেল বেদনায়।

বাব্বাঃ! আপনমনে বলল সে। হেসে আঁচলে এক বার মুখ মুছে নিল। কলকাতার প্রোথিত ইমারত চার দিকে, তার মাঝখানে নিজেকে ধূলিকণার মতো লাগে তার। কান পাতলে—পাতালের খরস্রোতা নদীর

গর্জনের মতো উতরোল কলকাতার গম্ভীর শব্দ শোনা যায়। কী রোমাঞ্চ জাগে শরীরে! কলকাতা—তার চারদিকে উষ্ণ কল্লোলিত কলকাতা!

হাসি পায়ে পায়ে পার হয় রাস্তা। ময়দানের দিকে ট্রাম লাইন পেরোলে দেখা যায় সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এলোমেলো পড়ে আছে—যেন—বা যে খুশি নিয়ে যেতে পারে। ঘনপত্র গাছের ছায়া। পাতা ঝরে পড়ছে। পাখিরা ফেলে দিচ্ছে কুটোকাটা। নিবিড় ছায়া এখানে। পায়ের নীচে ঘাস, পাতা। নির্জনতা। হাসি পায়ে পায়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটে। কিছুই দেখে না, অথচ সবকিছু অনুভব করে তার সর্বগ্রাসী মন।

সামনেই একটা কালো হেরাল্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নতুন চকচকে গাড়ি। গাড়ির বনেটে হাত রেখে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে। ফরসা, মজবুত চেহারা, লম্বা জুলপি, ঘন বড় চুল, চৌকো মুখ। রঙিন চৌখুপিওলা শার্ট তার পরনে, আর জলপাই—রঙা সরু চাপা প্যান্ট, পায়ে চোখা জুতো, কোমরের চওড়া বেল্টের বকলেশে একটা ইস্পাত রঙের ইংরেজি 'ডি' অক্ষর ঝলসে ওঠে। কবজির ঘড়িতে মোটা সোনারঙের চেন। মানুষটা হাসিকে দূর থেকেই লক্ষ করে। অন্যমনে একটা ঘাসের ডাঁটি তুলে আলস্যভরে চিবোয়। হাসি এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে। সেই হাঁটা দেখে লোকটা। দেখে তার পোশাক, মুখশ্রী, তার বুক, চোখ। চোখই বেশি লক্ষ করে। চেয়ে থাকে। একটা লক্ষণ খুঁজে দেখে। বোধহয় লক্ষণটা মিলে যায়। মিলিয়ে লোকটা হাসে। একটু বড় এবং মসৃণ দাঁত তার। ধারালো। হাসির একটুও ভয় করে না। সে এগোতে থাকে। লোকটা হাসে। হাসি এগোয়। হেরাল্ড গাড়িটার গায়ের পালিশে হাসির ছায়া পড়ে। লোকটা বনেট থেকে হাতের ভর তুলে নেয়। ঝুলে—পড়া শার্ট, কোমরে গুঁজে এক পা এগিয়ে আসে। আর এক—পা। আর—এক পা এগুলেই হাসির পথ আটকাতে পারে, ছুঁয়ে ফেলতে পারে হাসিকে। ডাক দেয়—মিস—ও মিস—

হাসি ছেলেটার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসে। প্রশ্রয়ের হাসি। ছেলেটা লক লক করে ওঠে লোভে। দাঁতাল হাসি হাসে। বেল্টের 'ডি' অক্ষরটা ঝলসায়। ভাঙা গলায় ডেকে বলে, আই হ্যাভ এ কার মিস—

হাসি বড় বড় চোখে ছেলেটাকে দেখে। ছেলেটা টেরও পায় না, ঠিক তার পিছনেই উদ্যত আঠারো তলা উঁচু এক হিংস্র ইমারত। সেই ইমারতের সামনে তাকে কত তুচ্ছ, এইটুকু পতঙ্গের মতো দেখায়। হাসি সেই ইমারতের ফ্রেমে ছেলেটার ক্ষুদ্রতা মাত্র একপলক অবাক হয়ে দেখে। ছেলেটা ঝুঁকে ফিস ফিস করে কী যেন বলে। অমনি ময়দান থেকে মার মার করে ছুটে আসে বাতাস, তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যায়। হাসির করুণা হয়। তার প্রেমিক কলকাতা চার দিকে জেগে আছে সহস্র চোখে। উদাসী, নির্মম, আবার ঈর্ষায় কাতর। যদি ইঙ্গিত করে হাসি তবে অমনি তার প্রেমিক কলকাতা পিছনের ওই আঠারোতলা বাড়িটার চূড়া হয়ে মড় মড় করে ভেঙে পড়বে ছেলেটার মাথায়। গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেবে মাটিতে। কিন্তু করে না হাসি। শুধু মুখটা ফিরিয়ে নেয় অবহেলায়। একা একা ঘোরে বলে এ—রকম কত মানুষ কত বার তার পিছু নিয়েছে, ডাকাডাকি করেছে ইঙ্গিতে, কীটপতঙ্গের মতো সব ছোট মাপের জীব। কলকাতার গায়ে উড়ে এসে বসে, আবার উড়ে যায়।

হাসি হাঁটতে থাকে। কত দূর দূর হেঁটে যায় হাসি। কখনও ট্রামে ওঠে। কিছু দূর যায় আবার নেমে পড়ে। ধ্বংসাবশেষ দুর্গের শেষ একটি মাত্র স্তম্ভের মতো মনুমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে দেখে। দেখে, গঙ্গার কোল জুড়ে শুয়ে আছে হাওড়ার পোল। তার চোখের পাশ দিয়ে ভেসে যায় ভাঙা টুকরো সব দৃশ্যাবলী, ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়। চকিতে মানুষের চোখ ঝলসে ওঠে। কানাগলির মুখ সরে যায়। গভীর গভীর অগাধ কলকাতার ভিতর হারিয়ে যায় হাসি। ভোগবতীর গম্ভীর নিনাদের মতো কলকাতার কত শব্দ হয়।

জাহাজঘাট! হাসি থমকে দাঁড়ায়। মাস্তুল। জল। না এখানে নয়। এ তো কলকাতা থেকে বিদায়ের বন্দর। এর অর্থ তো ছেড়ে যাওয়া। মাস্তুল অদৃশ্য রুমাল উড়িয়ে বিদায় জানায়। জাহাজ ভেসে যাবে দূর সমুদ্রে। হাসি ফিরে দাঁড়ায়। এখানে নয়, এখানে নয়। এখানে কলকাতার শেষ। জীবনের শেষ, এখানে অচেনার শুরু। হাসি ফিরে আসে।

সেনগুপ্ত নিয়ে গেছে অনেক। হিসেব করলে কত দাঁড়াবে তা ভেবে দেখেনি অমিয়। হিসেব করা সে প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। ক্যাপিটাল শেয়ার আর সেই সঙ্গে লভ্যাংশ মিলে একটা বেশ বড় অঙ্কের টাকা। অমিয় আটকাতে পারেনি। কিন্তু তবু সেটা কিছু নয়। সেনগুপ্ত বা তার টাকা কোনওটার অভাবেই ব্যবসা আটকাত না। যদি অমিয় খাড়া থাকত। তরতরে তাজা জোয়ান বয়সের মানুষের কাছে এ আবার একটা সমস্যা ছিল নাকি। ছিল না—অমিয় তা জানে, কিন্তু সে কেমনধারা মেঘলা মানুষ হয়ে গেল। দিন না ফুরোতেই আলো মরে গিয়ে ঘনিয়ে এল দিনশেষ।

দুপুরে অমিয় আজকাল কিছুই খায় না। লাঞ্চ সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। কল্যাণ বা রজত সবাই এ সময়টায় বাইরে থাকে, পাঞ্জাবি হোটেল বা গাঙ্গুরামে টিফিন সারে। ডিউক রেস্টুরেন্টে নতুন একটা আড্ডা হয়েছে কল্যাণের। সেখানে সারাটা দুপুর কাটায় কখনও কখনও। অমিয় একসময়ে যেত। এখন টিফিনের সময়টায় বসে থাকে চুপচাপ। রাজেন এক কাপ চা রেখে যায় না—বলতে। আজ চায়ের সঙ্গে একটা শালপাতার ঠোঙায় কয়েকটা দেওঘরের প্যাঁড়া রেখে গেছে। কোন ভাই যেন এনেছে দেশ থেকে।

চা—টা খেল অমিয়, প্যাঁড়া ছুঁতে ইচ্ছে করল না। পেটে খিদে মরে একটা গুলিয়ে ওঠা ভাব। সবাই তাকে লক্ষ করে আজকাল। সে যে খায়নি, সে যে বিপাকে পড়েছে। ভাবতে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসে। রাত্তিরে অফিস—বাড়িটা ফাঁকা থাকে। তখন রাজ্যের দেশওয়ালি মুটে মজুর রিকশা বা ঠেলাওয়ালাকে এখানে এনে তোলে রাজেন। এক রাত্তির বসবাসের জন্য মাথাপিছু দু'চার আনা করে নেয়। তারা দিব্যি ফ্যানের হাওয়া খায়। অনেক রাত অবধি বাতি জ্বেলে গল্পসল্প করে। মাসের শেষে মস্ত অঙ্কের ইলেকট্রিক বিল আসে। তাই রাজেনকে তার সাইড বিজনেসের জন্য বিস্তর বকাবকি করেছে অমিয়, কল্যাণ আর রজত। সেই খারাপ ব্যবহারটুকুর জন্য এখন প্যাঁড়াগুলির দিকে চেয়ে একটু বুকটা টনটন করে। রাজেন আজকাল না বলতেই টিফিনের সময়ে কোনও কোনওদিন একঠোঙা মুড়ি বাদাম হাতের কাছে রেখে যায় নিঃশব্দে। এ—সবই সহৃদয়তার নিদর্শন। কিন্তু অমিয়র ভিতরটা জ্বালা করে।

দুপুরের দিকে পিসেমশাই ফোন করলেন।

অমিয়, আমি সেদিন তোর বাসায় গিয়েছিলাম। রেখার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে রে!

শুনেছি পিসেমশাই, পাত্র কেমন?

খুব ভালো। টাটার ইঞ্জিনিয়ার, তবে দাবি—দাওয়া অনেক।

অমিয়, একটা শ্বাস ছাড়ল। পিসেমশাই আবার বললেন, মেয়েটার সুন্দর মুখ দেখে পছন্দ করেছে, নইলে গরিব ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ করার মতো পাত্র তো নয়।

পিসেমশাই আপনার কত দরকার?

পিসেমশাই লজ্জিত হন বোধহয়। একটু নীরব থাকেন। তারপর আস্তে করে বলেন, দরকারের কি শেষ আছে অমিয়! প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা যা অবশিষ্ট ছিল সবই প্রায় তুলেছি। কিছু ধার—কর্জ করেছি। এখনও দু'—তিন হাজার কম পড়বে। আলমারিটা এখনও কেনা হয়নি, সোনার দোকানেও যা আন্দাজ করেছিলাম তার বেশি পড়ে গেল।

ঠিক আছে, আমি হাজারখানেক দেব।

দিতে তোর কষ্ট হবে না তো?

কষ্ট কি পিসেমশাই? রেখার বিয়েতে আমার তো দেওয়ার কথাই ছিল।

পিসেমশাই হাসলেন ফোনে। বললেন, কথা দিয়েছিস বলেই আবার কষ্ট করে দিস না।

অমিয় একটু আহত হল। সে দিতে পারবে না—এমন যদি কেউ ধরে নেয় তবে তার আহত হওয়ারই কথা।

সে একটু নিচু স্বরে বলল, পিসিমা বেঁচে থাকতে, সেই কবে ছেলেবেলায় আমি পিসিমাকে প্রায় সময়েই বলতাম, রেখার বিয়ে আমি দেব, সে—কথা তো রাখতে পারলাম না পিসেমশাই।

পিসিমার উল্লেখে পিসেমশাই নীরব হয়ে গেলেন। অনেকটা পরে যখন কথা বললেন তখন টেলিফোনেও বোঝা গেল, গলাটা ধরে গেছে।

বললেন, তা হোক, ছেলেবেলায় মানুষ কত কী বলে। যা দিতে পারিস দিস।

আচ্ছা পিসেমশাই।

শোন, বউমাকে বিয়ের দু'—এক দিন আগে আমাদের এখানে পাঠাতে পারবি না? বিয়ের কাজকর্ম মেয়েছেলে ছাড়া কে বুঝবে!

হাসিকে বললে হাসি রাজি হবে কি না তা কে জানে। তাই অমিয় উত্তরটা ঘুরিয়ে দিল, সেদিন যখন গিয়েছিলেন তখন নিজেই তো বউমাকে বলে আসতে পারতেন।

লজ্জা করল। বউমা তো আমাকে খুব ভালো চেনেন না, দু'—এক বার মাত্র দেখেছেন, তুইও সাহেবি কায়দায় বিয়ে করলি, সামাজিক অনুষ্ঠান হল না!

অমিয় লজ্জা পায়। বলে, তাতে কী?

সামাজিক বিয়ে হলে সেই অনুষ্ঠানে সব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে নতুন বউয়ের চেনাচিনি হয়ে যায়। তোর বেলায় তো সে—রকম হয়নি, তাই একটু দূরের মানুষ হয়ে আছি আমরা। তবে তোকে বলি অমিয়, বউমা ভারী ভালো হয়েছে। পরিচয় দিতে কত যত্নআত্তি করল। আজকালকার মেয়েদের মতো নয়।

অমিয় উত্তর দিল না।

অমিয়।

বলুন পিসেমশাই।

পারিস তো বিয়ের আগে হাসিকে পাঠিয়ে দিস।

দেখি।

দেখিটেখি নয়, এয়োর কাজ করার লোক নেই।

আচ্ছা।

ছাড়ছি, বলে পিসেমশাই ফোন রাখলেন।

ফোনটা রেখে অমিয় তিন বুড়োর দিকে তাকাল, তিনজনই পাথর হয়ে বসে আছে।

একেই কি স্থবিরতা বলে! তান্ত্রিক লোকটা এক বার চোখ তুলে অমিয়র দিকে তাকায়, মাথায় জটা, কপালে মস্ত লাল একটা ফোঁটা, চোখ দুটোয় বেশ তীব্র চাউনি। হেসে এবং তাকিয়ে হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলল, টাকা!

অমিয় হাসে। উলটো দিকের দুই বুড়ো খুব আগ্রহের সঙ্গে তান্ত্রিকের দিকে ঝুঁকে বসল, বাবা যদি এবার কিছু বাণী দেন।

অমিয় মাথা নেড়ে বলল, টাকা।

তান্ত্রিক তার দুই ভক্তের দিকে চেয়ে আস্তে করে বলল, টাকা।

ভক্ত দুজন কী বুঝল কে জানে। জুল জুল করে চেয়ে থাকে।

অফিসঘরে এসে অমিয় ফাঁকা ঘরটার চার দিকে চাইল। কেউ নেই। কাগজপত্র হাওয়ায় নড়ে শব্দ করছে। পুরনো ফ্যান থেকে একটা ঘট—ঘটাং শব্দ উঠছে।

কিছুক্ষণ বসে থাকল অমিয়। রেখার বিয়ে, এক হাজার টাকা দিতে হবে।

অমিয় বেরিয়ে এল।

স্কুটারটা এখনও তার আছে। বেশিদিন থাকবে না। কল্যাণকে সে দিয়ে দিয়েছে, যতদিন ও না নেয় তত দিন তার। আহমদ একটা মফস্বলের লোককে জাঙ্গিয়া গছানোর চেষ্টা করছে। অমিয়কে দেখে নিচু গলায় বলল, সাহা ব্রাদার্স থেকে লোক এসেছিল তাগাদায়, হটিয়ে দিয়েছি। আবার তিনটের পর আসবে।

অমিয় উত্তর না—দিয়ে গিয়ে স্কুটার চালু করে।

যে—ব্যাঙ্কে অমিয়র অ্যাকাউন্ট আছে তা অনেকটা তার ঘরবাড়ির মতো হয়ে গেছে, বহুকাল ধরে একই ব্যাঙ্কে সে টাকা রাখছে, তুলছে, চেক বা ড্রাফট ভাঙাচ্ছে। সবাই মুখ—চেনা হয়ে গেছে। কেউ কেউ একটু বেশি চেনা। এবং একজনের সঙ্গে পরিচয় আরও একটু গভীর।

ব্যাঙ্কের বাইরে স্কুটার রেখে অমিয় ভিতরে আসে! সোনাদার ব্যাঙ্ক যেমন বড়, আর হালফ্যাশানের এ—ব্যাঙ্কটা তেমন নয়। প্রাইভেট আমল থেকেই এর মলিন দশা, কাউন্টারের পুরনো কাঠ গাঢ় খয়েরি রং ধরেছে, দেয়ালের রং বিবর্ণ, কাঠের পার্টিশনগুলো নড়বড় করে।

কারেন্ট অ্যাকাউন্টটা অমিয় বহু দিন হল বন্ধ করে দিয়েছে। সেভিংসে কিছু টাকা থাকা সম্ভব, পাশবইটা বহুকাল এন্ট্রি করানো হয়নি। কত টাকা আছে কে জানে!

টোকেন ইসু করার কাউন্টারে এক সময়ে নীপা চক্রবর্তী বসত। ভিতরের দিককার একটা ঘরে বসে আপন মনে কাজ করে। পাবলিকের সামনে আর থাকে না।

কাউন্টারের মেয়েটি ফোর ওয়ান নাইন নাইন অ্যাকাউন্ট লেজার খুলে দেখে বলল, না, হাজার টাকা তো নেই। দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে!

অমিয় যন্ত্রের মতো শব্দ করে—ও।

আরও দুটো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে অমিয়র। কিন্তু সেখানে আর যাওয়ার আগ্রহ হয় না। খুব বেশি নেই। যা আছে তাতে হাত দেওয়া যায় না। হাসি চলে যাবে। অনেক পেমেন্ট বাকি। একটা হতাশা ভর করে তাকে। মুখটা বিস্বাদ। খালি পেটে সম্ভবত পিত্ত পড়েছে। মাথার মধ্যে একটা রিমঝিম। চোখের সামনে একটু অন্ধকার, অন্ধকারে উজ্জ্বল কয়েকটি তারা খেলা করে মিলিয়ে গেল। দুর্বলতা থেকে এ—রকম হয়।

দুটো বাজতে আর খুব বেশি দেরি নেই। বেলা দুটোয় সব জায়গায় টাকা—পয়সার ওপর ঝাঁপ পড়ে যায়।

ভিতরের দিকে একটা করিডোর গেছে। ওদিকে একটা বাইরে যাওয়ার দরজা আছে। ব্যাঙ্কের সামনের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে ওদিক দিয়ে যাতায়াত করে লোক। ব্যাঙ্ক আওয়ারের পরে এসেও বহু দিন ওই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে অমিয়, চেক ক্যাশ করে নিয়ে গেছে। নীপা চক্রবর্তী ওইটুকু ভালোবাসা দেখাত।

দুশো পঁয়ত্রিশ টাকায় হাত দিল না অমিয়। থাকগে। সে করিডোর ধরে ভিতরের পার্টিশনের কাছে এসে দাঁড়ায়। কাঠের পার্টিশনে কাচ লাগিয়ে বাহার করার চেষ্টা হয়েছে। ময়লা ঘোলা কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর ঝুঁকে কয়েকজন কাজ করছে। তৃতীয়জন নীপা। শ্যামলা রং রোগা শরীরে ইদানীং একটু মাংস লগেছে। মুখখানা নোয়ানো বলে ভালো দেখা যায় না। কিন্তু অমিয় জানে মুখখানা ভালোই নীপার। টসটসে মুখ বলতে যা বোঝায় তা—ই। বড় বড় দুখানা চোখ ভরে একটা নরম সৌন্দর্য ছড়িয়ে থাকে। চোখে কাজল দেয় নীপা, কপালে টিপ পরে, সাদা খোলের শাড়ি পরে বেশির ভাগ সময়ে। রঙিন পরলে হালকা রঙা। গায়ের রং চাপা বলে চড়া সাজ কখনও করে না। তাতে ও ফুটে ওঠে বেশি।

অমিয়র সঙ্গে নীপার এমনিতে কোনও সম্পর্ক ছিল না।

চেক জমা দিয়ে টোকেন নেওয়ার সময়ে, বা অ্যাকাউন্টের টাকার অঙ্ক জানতে এসে, মুখোমুখি একটু বেশিক্ষণ কি দাঁড়াত অমিয়?

চোখে চোখ পড়লে সহজে চোখ সরাত না বোধহয়? মাঝে মাঝে একটু—আধটু হাসত কি? সে যাই হোক, তাদের চেনাজানা ছিল খুব সহৃদয়তায় ভরা। ব্যাঙ্ক—আওয়ার্সের পরে এসে অমিয় বলত, একটু জ্বালাতে এলাম।

নীপা মৃদু অহংকারী হাসি হেসে বলেছে, কে না জ্বালায়! জ্বলে যাচ্ছি। দিন কী আছে... বলে হাত বাড়িয়ে চেক নিত।

রোগা মেয়ে পছন্দ করত অমিয়। মোটা বা বেশি স্বাস্থ্যবতী তার পছন্দের নয়। বুকের স্নিগ্ধ ফল দুটি মুখ তুলে চেয়ে থেকেছে পুরুষের দিকে। কনুই বা কবজির হাড় তেকোনা হয়ে চামড়া ফুঁড়ে উঠে থাকত না। শরীরের চেয়ে অনেক আকর্ষক ছিল গলার স্বরে নম্রতা। অমিয় ছাড়া আর কাউকে কখনও ঠাট্টা করে কথার

উত্তর দিয়েছে এমনটা অমিয় দেখেনি। খুব সিরিয়াস ভাবে কাজ করত। মেয়েরা অফিসের কর্মচারী হিসেবে বেশির ভাগই ভালো হয় না। যেখানে তিন—চারটে মেয়ে জোটে সেখানে কাজ হওয়া আরও মুশকিল! কিন্তু নীপা ছিল অন্যরকম। শনিবার যখন প্রচণ্ড রাশ হয়, কিংবা কোনও ছুটির আগে যখন টাকা তোলার ধুম পড়ে যায় তখনও নীপাকে বরাবর নিচু গলায় লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে অমিয়, দেখেছে মুখে স্নিগ্ধ হাসি, অবিরল ব্যস্ততার মধ্যেও নানা লোকের অপ্রয়োজনীয় বোকা প্রশ্নের উত্তর দিতে। একদিন দুজন অল্পবয়সি ছোকরা স্রেফ ইয়ার্কি দিতে ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়েছিল। তারা উইথড্রয়াল স্লিপ নিয়ে মোট অঙ্কের টাকা লিখে জমা দিয়ে টোকেন নিল। ব্যাপারটা ধরতে দু'মিনিটের বেশি লাগেনি নীপার। লেজার বইটা খুলে অ্যাকাউন্ট দেখে যখন তার উচিত ছিল দারোয়ান ডেকে ছোঁড়া দুটোকে বের করে দেওয়া, তখনও সে বিনীত ভাবে তাদের ডেকে বলেছিল—সইয়ে যে নাম লিখেছেন তার সঙ্গে অ্যাকাউন্টের নাম মিলছে না। ছেলে দুটো সাহস পেয়ে আরও কিছু ইয়ারকি দেয়, একজন বলে, তা হলে অ্যাকাউন্ট খুলব। ফর্ম দিন। নীপা আশ্চর্য, ধৈর্য ধরে রেখে ওদের ফর্মও দিয়েছিল যেটা ওরা কিছুক্ষণ কাটাকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে চলে যায়। দৃশ্যটা অমিয়র চোখের সামনে ঘটে। নীপা স্বাভাবিক হাসি হেসে বলেছিল তাকে, এ—রকম প্রায়ই হয়। আমরা কিছু মনে করি না।

তখনও হাসির সঙ্গে দেখা হয়নি। এ হচ্ছে প্রাক—হাসিতিক ঘটনা। তখন অমিয় মাঝে মাঝে নীপার কথা ভাবত বিরলে। মনে—পড়া শুরু হয়েছিল, ভাবতে ভালো লাগত। ঘন ঘন তখন ব্যাঙ্কে যাওয়ার দরকার পড়ত তার। রাজেন বা সেনগুপ্তকে পাঠালেও যখন কাজ চলে তখনও নিজেই যেত। নীপা যেদিন আসত না সেদিন ক্ষুণ্ণ হত সে। পরদিন এলে অনুযোগ করত, কাল আসেননি কেন? কাল আমার পেমেন্ট পেতে অনেক দেরি হয়েছে।

নীপা সে—অনুযোগের সহৃদয় উত্তর দিত। বলত, রোজ তো আসি। এক—আধদিন না এলে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। যন্ত্র তো নই।

এ—ধরনের কথা নীপা একমাত্র তার সঙ্গেই বলত এবং তখন চোখে চোখে মানুষের গভীর হৃদয় গোপন বার্তা পাঠাত না কি।

ব্যাঙ্কের বাইরে দেখা হয়েছিল মোটে এক দিন। গ্র্যান্ট স্ট্রিটের একটা দোকানে নীপা পুজোর জামা—কাপড় কিনতে ঢুকেছিল। অফিসের পাড়া। অমিয় ডাব খাচ্ছিল পাশের পানের দোকানটায়। নীপা দেখেনি। অমিয় ভিতরে ঢুকে নীপাকে ধরল, এই যে!

নীপার সঙ্গে অফিসের আরও দুটি মেয়ে ছিল। তারা একটু ভ্রূ—কুঁচকে চেয়ে দেখল অমিয়কে। নীপারই ভ্রূ সহজ ছিল। মুখে হাসি ফুটল সহৃদয়তার। অনেক কিছু এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলতে পারত। কিন্তু খুব আন্তরিক লাজুক গলায় একটা ঘন নীল পাছাপেড়ে শাড়ি তুলে দেখিয়ে বলল, দেখুন তো, এটা অদিতিকে মানাবে না? অদিতি সঙ্গী মেয়েদের একজন। ফরসা। অমিয় হেসে বলে, নীল শাড়ি সবাইকে মানায়।

যতক্ষণ শাড়ি কিনেছিল ওরা ততক্ষণ নীপা চোখের শাসনে আটকে রাখল অমিয়কে। অমিয় যত বার বলে, এবার যাই, কাজ আছে। তত বার নীপা বলে, দাঁড়ান। মেয়েরা ঠিক ঠিক শাড়ি পছন্দ করতে পারে না। পুরুষেরা অনেকে পারে। আমাদের শাড়ি পছন্দ করা হয়ে গেলে যাবেন।

শাড়ি কেনা হলে সঙ্গিনীরা চলে গেল। বোধহয় একটা ষড়যন্ত্র করেই। নীপা একা হয়ে বলল, এবার আমাকে সাউথের বাসে তুলে দিন তো।

অমিয় তার স্কুটার দেখিয়ে বলে, বাসের দরকার কী! যদি সাহস থাকে তো উঠে পড়ুন। পৌঁছে দিয়ে আসি।

ও বাবা! স্কুটার! পড়ে—টড়ে যাব, কখনও চড়িনি।

অবশেষে উঠেছিল নীপা স্কুটারেই। মাঝপথে একটা রেস্টুরেন্টে চা খেয়ে নিয়েছিল তারা। অনেক কথাও হয়েছিল। এলোমেলো কথা। আর কথার মাঝখানে লজ্জার সংকোচের এবং আকর্ষণের ঝাপটা এসে

লাগছিল। মাঝে মাঝে কথা বন্ধ হয়ে যায়। নীরবতা নৈকট্যকে অদ্ভুতভাবে টের পায় তারা।

শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয়নি। টালিগঞ্জের খাল পাড় পর্যন্ত নীপাকে পৌঁছে দিল অমিয়। তারপর সিগারেট জ্বেলে থেমে—থাকা স্কুটারে বসে দেখল নীপা নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে অনেক বার পিছু ফিরে চেয়ে দেখল তাকে। মুখটায় স্মিত গভীর একটা বিশ্বস্ততা।

না, কিছু হয়নি শেষ পর্যন্ত। হয়তো হতে পারত। মাঝপথে হাসি এসে সব তছনছ করে দিল। তুলে নিল তাকে। নিল, আবার নিলও না। বড়ঘরের মেয়েরা যেমন নিত্য নূতন জিনিস কিনে সে—সব জিনিসের কথা ভুলে যায় দু'দিন পর। অবহেলায় ফেলে রেখে দেয়। তেমনি অমিয়কে কবে ভুলে গেছে হাসি।

ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে কয়েক পলক চেয়ে থাকে অমিয়। নীপা টের পায়। মুখ তোলে।

অমিয় একটু হাসে। নীপাও একটু হাসে। ওর সিঁথিতে সিঁদুর। হাসিটা তেমনি। সহৃদয়তায় ভরা। দেখে ভিতরে একরকম ছুঁচ ফোটার যন্ত্রণা হয়। ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে প্রায়ান্ধকার করিডোরে দাঁড়ানো অমিয়কে চিনতে পেরেছে নীপা।

চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে এল।

কী খবর? আবার বুঝি জ্বালাতে এসেছেন? নীপা করিডোরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে।

অমিয় মাথা নাড়ল। বলল, না। কোনওদিন আপনাকে কাজ ছাড়া দেখি না। আজও দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

কাজের জায়গায় দেখা হলে কাজ ছাড়া কী দেখবেন?

অমিয়র এখন আর সাহসের অভাব হয় না। সে বলে, অকাজের জায়গায় কেমন দেখাবে কে জানে!

আশেপাশে ব্যস্তসমস্ত লোকেরা যাচ্ছে—আসছে। নীপা বলে, বলুন না বাবা কী কাজ আছে। কোনও চেকের ক্লিয়ারেন্স আসেনি নাকি!

ও—সব নয়। অ্যাকাউন্টে টাকাই নেই। চেক জমা দিই না অনেক দিন।

সে তো জানি।

কী করে জানলেন?

আপনার অ্যাকাউন্টটা দেখি মাঝে মাঝে। আজকাল কেবল উইথড্রয়াল হচ্ছে, জমা পড়ে না। কী ব্যাপার?

অমিয় একটা শ্বাস ফেলে। মাথা নেড়ে বলে, আপনি আমাকে মনে রেখেছেন।

মনে রাখব না! ব্যাঙ্কের সব ক্লায়েন্টকে আমার মনে থাকে।

বানানো কথা। মিথ্যে।

অমিয় একটা বিষ—বোলতার কামড় খায় এই কথায়। বলে, কোনও পক্ষপাত নেই, না?

নীপার মুখে একটু দুঃখের ছায়া খোঁজে অমিয়। পায় না। হাসিকে বিয়ে করার পর মাস দুই বাদে নীপার বিয়ে হয়। কেউ কাউকে নিমন্ত্রণ করেনি। জানায়ওনি। কিন্তু জানাবার দরকার হয় না। অমিয় তখন বিয়ের পর দেদার টাকা ওড়াত। হাসিকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে নিয়ে আসত ব্যাঙ্কে। টাকা তুলত আর টোকেন নিয়ে অপেক্ষা করার সময় কলকলাত দুজনে। সে—সব কি দেখেনি নীপা? তেমনি আবার দু'মাস বাদে নীপার সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছে অমিয়। কেউ কাউকে প্রশ্ন করেনি। জেনে গেছে।

নীপার মুখে তাই কোনও দুঃখের ছায়া নেই। কিন্তু তবু সে কেন অমিয়র অ্যাকাউন্টের খবর রাখে?

অমিয় বলে, আপনার টিফিনের সময় হয়নি?

হয়ে গেছে। কেন?

হতাশ অমিয় বলে, হয়ে গেছে! আমি ভাবছিলাম আজ আপনাকে খাওয়াব।

তাই বা কেন! কোনও খাওয়া কি পাওনা হয়েছে। নীপা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে হাসল।

অমিয় মাথা নেড়ে বলল, খাওয়ার জন্য নয়।

তা হলে?

অমিয় বুঝল, নীপার সঙ্গে আসলে আর কোনও বোঝাবুঝি তৈরি হয়নি। এমন অধিকার তার নেই যে সে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে যেতে পারে বিশ্বস্ত নীপাকে। এখন তার উচিত হবে ভদ্রতাসূচক দু'—একটি কথা বলে চলে যাওয়া।

কিন্তু চলে যেতে পারে না অমিয়। আস্তে করে বলে, আপনি মিস চক্রবর্তী ছিলেন, এখন কী হয়েছেন?

নীপা একটু তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বোধহয় মনে মনে বলে, আর যা—ই হই, বাগচী হইনি। তাকিয়ে থেকে নীপা মৃদুস্বরে বলে, আমার বুঝি কাজ নেই। কী দরকার বললেই তো হয়।

আমার জানা দরকার, আপনি চক্রবর্তী ছেড়ে কী হয়েছেন!

নীপা মৃদু হাসল বটে, কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে গেল একটু। বলল, চক্রবর্তীদের অনেক গোত্র হয় জানেন তো! আমি চক্রবর্তী থেকে চক্রবর্তীই হয়েছি। গোত্রটা আলাদা। জেনে হবে কী!

এমনি, কৌতূহল।

আপনার চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। আনঅফিশিয়াল কথাটা বলে ফেলেই বোধহয় লজ্জা পায় নীপা। মুখ ফিরিয়ে বলে, চলি।

অমিয় মাথা নাড়ল, তারপর করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে ধীরে ধীরে। দরজাটার কাছ বরাবর এসে ফিরে তাকায়। নীপা দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য মেয়ে হলে এই অবস্থায় চোখে চোখ পড়তেই পালিয়ে যেত। নীপা পালাল না। হাতটা তুলে তাকে থামতে ইঙ্গিত করল। তারপর ঢুকে গেল ভিতরে।

অমিয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষা করে। একটু বাদেই নীপা আসে। হাতে ব্যাগ, ছোট ছাতা, মুখখানায় একটু রক্তাভা। কাছে এসে বলে, আজ ছুটি নিয়ে এলাম। বাড়ি যাব।

অমিয় অবাক হয়। বলে, বাড়ি যাবেন?

হ্যাঁ।

তা হলে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন যে!

নীপা উত্তর দিল না।

রাস্তায় এসে তারা ঝিরঝিরে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। অদূরে অমিয়র স্কুটার। অমিয় স্কুটারটা দেখিয়ে বলে, আজ আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি। যাবেন?

মুখ নিচু করে নীপা মাথা নেড়ে বলে, না। রাধাবাজারে আমার স্বামীর ঘড়ির দোকান আছে। কাছেই। এখন ওখানে যাব। সেখানে আমাদের গাড়ি আছে। তাতে ফিরব। এখন আমি নর্থ—এ থাকি। পাইকপাড়ায়।

ও। অমিয় বুঝতে একটু সময় নেয়। নীপাকে ছাড়া নীপার আর কিছুই জানত না অমিয়। এখনও জানে না। শুধু ঘড়ির দোকান, স্বামী, গাড়ি আর পাইকপাড়া শব্দগুলো তার ভিতরে খুচরো পয়সার মতো হাত খসে পড়ে গিয়ে গড়াতে থাকে।

আপনি কী যেন বলতে চেয়েছিলেন। বললেন না।

অমিয় কষ্টে হাসে। ঘড়ির দোকানে স্বামী। স্বামীর গাড়ি। আর গাড়িতে পাইকপাড়া। এ সবই খুব রহস্যময় লাগে তার কাছে। নীপার কেন স্বামী থাকবে। সে কেন স্বামীর গাড়িতে পাইকপাড়া যাবে।

কেন সে আজও অমিয়র নিজস্ব জিনিস নয়, তা ভেবে এক ধরনের ক্রোধ আর হতাশা মিশে যায় তার ভিতরে।

সে বলল, শুনুন।

কী?

আপনার সম্পর্কে কিছুই কোনও দিন জেনে নেওয়া হয়নি।

নীপা মৃদু হেসে বলে, জানাটা কি দরকার ছিল?

আমার সম্পর্কেও আপনি কিছু জানেন না।

না। তবে আপনার বউকে দেখেছি। খুব সুন্দর বউ।

অমিয় স্থির চোখে নীপাকে দেখে। ঠিক। হাসি নীপার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। হাসিও কালো। নীপার মতোই। তবু হাসির মুখ—চোখ, শরীরের গঠন অনেক উঁচু জাতের। নীপার হিংসে হতে পারে।

অমিয় মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে, আমরা কেউ কারও সম্পর্কে জানলাম না কেন?

নীপা এ—কথার উত্তর দিল না। কারণ, এ বড় বিপজ্জনক কথা। উত্তর হয় না।

অমিয় বলল, স্কুটার থাক, চলুন আপনাকে রাধাবাজারের দিকে একটু এগিয়ে দিই। পথে বরং এক কাপ চা খেয়ে নেব।

তারা হাঁটতে থাকে। নীপা মাথা নত রাখে। অমিয়কে সে যে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিচ্ছে সে—বিষয়ে সচেতন। দূরত্ব বজায় রাখছে। বোধহয় ভয়ও পাচ্ছে মনে মনে। আবার বোধহয় চাইছেও, অমিয় তাকে কিছু বলুক।

আজ এমন করছেন, কী হয়েছে আপনার? নীপা তার মস্ত চোখ তুলে হঠাৎ বলে।

আশপাশ দিয়ে কলকাতার দৃশ্যাবলী মিলিয়ে যাচ্ছে ডাইলিউশনে। রেলগাড়ির মতো বয়ে যাচ্ছে কলকাতা। সেই গতিশীলতার মধ্যে তারা ধীরে হাঁটে। অমিয় বলে, আমার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট কী বলছে?

নীপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ও!

আবার হাঁটতে থাকে তারা। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট পার হতে হতে অমিয় বলে, আমি ভালো নেই নীপা।

নিজের নাম শুনে একটু চমকে ওঠে নীপা। চমকটা ঢাকা দিয়ে মৃদুস্বরে বলে, কেন? ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের কথা ভেবে?

না। অমিয় বলে, আমি তোমাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু সে—কথা কখনও বলা হয়নি। এই অপরাধে।

নীপা ঠোঁট কামড়ায়, মাথা নত করে।

কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে। চারদিকে মানুষ আর মানুষের মধ্যে, প্রবল গাড়ির আওয়াজের মধ্যে এক নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ নেমে আসে।

অমিয় হঠাৎ দাঁড়ায়। ভিতরে বিষবাষ্প জমে উঠেছে আজ।

নীপা তার দিকে মুখ তুলে তাকায়। দুটি চোখ বাঙ্ময়। কিছু বলতে চায়।

অমিয় আস্তে করে বলে, দেখা হবে। আবার।

কোথায়?

অমিয় তেমনি আস্তে টরে—টক্কার মতো মৃদু লয়ে বলে, একটা স্টিমারঘাট আছে। সেইখানে সকলের দেখা হয়।

কোথায়? নীপার কপালে ভাঁজ পড়ে।

ধু—ধু গড়ানে বালিয়াড়ি বহু দূর নেমে গেছে। তারপর কালো গভীর জল। একটা ফাঁকা শূন্য জেটি। অথৈ জল। ওপরে একটা কালো আকাশ ঝুঁকে আছে। বালির ওপরে পড়ে আছে একটা সাপের খোলস। হাহাকার করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেখানে।

অবাক চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা।

অমিয় বলে, দেখা হবে।

তারপর হেঁটে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল অমিয়।

নীপা খুব ধীরে ধীরে হাঁটে। ভাবে। মুখে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা খেলা করে যায়। তারপর কখন যেন চোখ ভরে জল আসে। জলভরা চোখে চেয়ে দেখে। কলকাতা শহরটা কেমন ভেঙেচুরে গেছে! আবছা, অস্পষ্ট আর অলীক হয়ে গেল চারধারে। অর্থহীন হয়ে গেল জীবন। বেলুনের মতো ফেটে গেল বাস্তবটা।

চোখের জল মুছে নেয় নীপা। ভুল রাস্তায় চলে যাচ্ছিল। সতর্ক হয়ে ফিরে এল সঠিক রাস্তায়। মানুষটা কেমন! খুব অদ্ভুত, না? ফের জল আসে চোখে। ওর অ্যাকাউন্টে মোটে দু'শো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে, নীপা

জানে।
স্বামীর দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে নীপা। কলকাতা শহর চারদিকে, তবু কেবলই মনে হয়, বালিয়াড়ির ভিতরে ডুবে যাচ্ছে পা। সামনে জল। জলের শব্দ। কেউ কোথাও নেই, কেবল বাতাস ঝড়ের মতো বয়ে যায়। মাথার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে।

টাপে টোপে প্যান্ডেলের ফাঁক—ফোঁকর দিয়ে উঁকি দেয় কুকুরের মুখ। তারা আসছে সতর্ক পায়ে। ক্রমে ক্রমে। বেড়ালেরা আসছে নিঃশব্দে, ভিখিরিরা বাইরের গাছতলায় অনেকক্ষণ বসে আছে। একটা ভিখিরির ছেলে ঢুকে গেছে প্যান্ডেলে। কুকুর—বেড়ালের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে পাতার ঠোঙায় কুড়িয়ে নিচ্ছে এঁটো—কাঁটা। মাংসের হাড়, লুচির টুকরো, মাছের কাঁটা জড়ো করছে এক জায়গায়। খাঁ খাঁ করছে প্যান্ডেল। স্টিক লাইট জ্বলছে, ঘুরছে পাখা, এঁটো পাতা উড়ে উড়ে পড়ছে মাটিতে। উৎসব—শেষের বীভৎসতা চার দিকে।
বর—বউ শোওয়ার ঘরে চলে গেল। নিয়ম নয়, কিন্তু আজকাল তো কেউ আর বাসর জাগে না। প্যান্ডেলের এক কোণে এখনও যজ্ঞের ছাই পড়ে আছে, দুটো রং করা চিত্রিত পিঁড়ি এখনও তোলা হয়নি, দেবদারু পাতায় সাজানো দরজায় মঙ্গল কলস, রঙিন কাগজের শিকল দুলছে হাওয়ায়।
একটা সিগারেট ধরিয়ে অমিয় দৃশ্যটা দেখে। সে এ—রকমভাবে বিয়ে করেনি। কয়েকটা সই করে তারা বিছানায় চলে গিয়েছিল।
পিসেমশাইয়ের হাতে এক হাজার টাকা দেওয়া গেছে অবশেষে। গতকাল সারা দিন ঘুরে বেড়িয়েছে অমিয়। টাকা—টাকা করে। প্যাটারসনের লাহিড়ী শুনে বলল, দূর মশাই, কে—বি ফিট করুন না।
কে—বি কী?
কাবলে। আপনার যদি জানাশুনো না থাকে আমি ফিট করে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধানে ট্যাকল করবেন। এক হাজার ধার নিলে দু'হাজার লিখে দিতে হবে।
সে কী?
ভয় নেই, আসলে ওরা লাইসেন্স—ওলা মানিলেন্ডার, গভর্নমেন্টের বেঁধে—দেওয়া সুদের বেশি আইনত নিতে পারে না। আপনাকে লেখাবে ছয় পারসেন্ট সুদ, নেবে তার দ্বিগুণের বেশি। যদি বাইচান্স আপনি সুদ নিয়ে ঝামেলা করেন, তখন মামলা করবে দু'হাজার টাকার ওপর। আর যদি সুদ ঠিকমতো দিয়ে এক হাজার শোধ দেন তা হলে কাগজ ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু সাবধানে ট্যাকল করবেন।
আজ সকালে টাকা পেয়ে গেছে অমিয়। এক হাজার। পিশেমশাইকে কথামতো দেওয়া গেল। রেখার বর ভালোই হল। টাটার ইঞ্জিনিয়ার। দু'হাজার নগদ, গোদরেজের আলমারি, সিঙ্গল খাট দুটো, সোফাসেট, পনেরো ভরি গয়না। পিসেমশাইয়ের বোধহয় আকাশ—বাতাস চাঁদ—সূর্যের আলো ছাড়া আর কিছু রইল না। অমিয়র জন্য সারা দিন হা—পিত্যেশ করে বসে ছিলেন বুড়ো মানুষ। অমিয় এসে টাকাটা হাতে দিতেই উদ্ভাসিত হয়ে গেল মুখখানা। চোখের কোলে জল। বললেন, ভাবলাম তুই বুঝি আর এলি না! ভয়ে তোর অফিসে ফোন করিনি, যদি খারাপ খবর শুনি!
অমিয় একটু হেসেছিল।
হাসি আজ কিছুতেই ট্যাক্সিতে উঠতে চায়নি। বলেছে, এত সুন্দর রাত আজ। বাতাস দিচ্ছে, চাঁদ উঠেছে, বন্ধ গাড়িতে বসে কেন যাব! আমাকে তোমার স্কুটারে নিয়ে চলো।
তা—ই এনেছে অমিয়। তার কোমর ধরে বসে এল হাসি। মেয়েদের দঙ্গলে মিশে গেছে এখন। উৎসবে হাসিকে চেনা যায় না।
রাস্তায় পার্ক—করা শেষ দুটো মার্ক টু গাড়ির একটা ছেড়ে গেল সোনাদাকে নিয়ে। যাওয়ার সময়ে সোনাদা মুখ বাড়িয়ে বলল, অমিয় তোর সঙ্গে কথা আছে।

কী কথা?

সেই যে, মনে নেই কী বলেছিলি?

কী সোনাদা?

তুই বড় পাজি অমিয়, চিরকাল পাজি ছিলি।

কেন?

আমার বয়স হচ্ছে না রে? এই বয়সে মানুষ একটু গুছিয়ে বসতে চায়, এই বয়সেই তো সংসারের ভোগ—সুখ, এই চল্লিশ—পঁয়তাল্লিশে।

অমিয় চেঁচিয়ে হেসে বলেছে, ঠিকই তো।

তবে তুই কেন আমাকে স্টিমারঘাটের কথা বলতে গেলি?

কেন, কী হয়েছে?

অমিয়, তুই কী বলিস তুই জানিস না! তুই চিরকালের পাজি। জানিস না, ওটা বলতে নেই! অমিয়, তুই চলে আসার পর থেকেই আমার বড় অস্থির লাগে। রাতে ঘুম হয় না। সারা দিন যখন—তখন অন্যমনস্ক হয়ে যাই। কেবলই মনে পড়ে—স্টিমারঘাট—স্টিমারঘাট।

শেষ মার্ক টু—টা দাঁড়িয়ে আছে। ওটা কার তা জানে না অমিয়। গাড়িটার আড়ালে তার স্কুটার হিম হয়ে আছে। হ্যান্ডেলটা এক দিকে বাঁকানো। দেখে মনে হয়, ক্লান্ত মানুষ যেমন বসে বসে ঘুমোয় তেমনি ঘুমোচ্ছে।

পরিবেশনের সময়ে এঁটো—আঁটার গন্ধে গা গুলিয়েছে বলে কিছু খায়নি অমিয়। হাসি কখন আসবে কে জানে! রাত অনেক হয়েছে। পায়ে পায়ে প্যান্ডেল ছেড়ে খোলা মাঠে আসে অমিয়। ঠান্ডা। দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছে। সেই বাতাসে আকাশ—জোড়া এক বৃক্ষ নড়ে ওঠে, বকুলের মতো খসে পড়ে একটি তারা।

অন্ধকার বারান্দায় দুই বুড়ো বসে আছেন। বরের মামা, আর পিসেমশাই। বরের মামার দু'গালে পানের ঢিবি। তিনি পিসেমশাইয়ের দিকে ঝুঁকে বলছেন, পুরুতরা আজকাল বড় শর্টকার্ট শিখেছে বিয়াই, আধ ঘণ্টায় কুসুমডিঙে সেরে ফেলল। আমার বিয়ের সময়ে চার ঘণ্টা লেগেছিল যজ্ঞে। কনে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে ঢুলতে দেখে আমি চিমটি কেটে জাগিয়ে দিই।

পিসেমশাই মুখ তুলে বলে, তুই কিছু খাসনি অমিয়?

না। বমি—বমি করছে।

খুব খেটেছিস। সোমাকে বলি তোকে একটু শরবত করে দিক।

না, আমি এবার চলে যাই।

অমিয়, লোকজন খেয়ে কী বলল? কিছু দোষ ধরেনি তো?

বরের মামা পিচ ফেলে বললেন, আজকালকার বাজারে যা করেছেন যথেষ্ট।

ঘরে মেয়েদের ভিড়। অমিয় দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে। হাসিকে দেখা যায় না।

সেই ভিড় থেকে সোমাদি এগিয়ে আসে, অমিয়, কী খাবি?

কিছু না।

আমি তো নেমন্তন্নের রান্না খেতে পারি না, তাই এ—ঘরে একটু ঝোল—ভাত রেঁধে রেখেছি। খাবি তো আয় ভাগ করে খাই।

হাসি কোথায় সোমাদি?

ওকে তো সব ঘিরে রেখেছে। বলছে, তুমি ফাঁকি দিয়ে রেজেস্ট্রি বিয়ে করেছ, আমাদের খাওয়া মার গেছে। এবার খাওয়াও। অমিয়, হাসি দেখতে কী সুন্দর হয়েছে।

রাত অনেক হয়ে গেল সোমাদি। হাসিকে ডাকো।

তোর তো স্কুটার আছে, ভুস করে চলে যাবি। রাত হলে ভয় কী? তোকে একটু দই—মিষ্টি এনে দিই?

সোমাদি, তুমি এত কষ্ট করো কেন?

কীসের কষ্ট?

খুব খাটো তুমি, টিফিনের পয়সা বাঁচাও, এত খেটে কী হবে সোমাদি?

তোকে তো বলেছি, আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন?

সোমাদি, একটা স্টিমারঘাট—

অমিয়, আমার এখনও অনেক কিছু করা বাকি, টাকা জমাচ্ছি, আমার অনেক দিনের শখ, একটা রেকর্ড—চেঞ্জার কিনব। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গানের অনেক রেকর্ড। শোন অমিয়, তুই নাকি রেখার বিয়ের জন্য মেশোমশাইকে এক হাজার টাকা দিয়েছিস। সত্যি?

সোমাদি, তোমাকে সেদিন বলছিলাম—

কী বলছিলি?

একটা ফেরিঘাটের কথা—

অমিয়, মেসোমশাইকে এক হাজার টাকা দিয়ে খুব ভালো করেছিস। আমারও দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কী করে দেব? জানিস তো, গত চোদ্দো—পনেরো বছর আমার চাকরির ওপরই সংসার চলছে। রেখাকে একটা আংটি দিলাম, তাতেই ধার হয়ে গেল। তুই টাকা দিয়ে ভালো করেছিস। মেসোমশাই সবাইকে ডেকে ডেকে তোর দেওয়া টাকার কথা বলছেন।

সোমাদি—

শোন অমিয়, এখন আর আমার চাকরি করতে ভালো লাগে না রে। তুই যে সেদিন গিয়ে বললি, ভালোবাসার লোক না থাকলে রোজগার করে সুখ নেই, সেটা বাজে কথা নয়। এখন আমি বুঝতে পারি সংসারে আমার যেটুকু আদর তা ওই চাকরিটার জন্য। এ—চাকরিটা যদি ছাড়ি তবে দেখব আমি কিছু নই, কেউ নই। আজকাল তাই ভীষণ টায়ার্ড লাগে। বাসায় ফিরে রাত্রে এমন মন খারাপ লাগে। একটা ইজিচেয়ার কিনেছি, সামনের মাসে কিনব একটা রেকর্ড—চেঞ্জার। বুঝলি অমিয়, বারান্দায় অন্ধকারে বসব। উঠোনে থাকবে অন্ধকার, চুপচাপ বসে চেঞ্জার চালিয়ে দেব—গান হবে—দুঃখের গান—বিরহের গান... শুনতে শুনতে কাঁদব হয়তো—আর মনে পড়বে... কী মনে পড়বে রে অমিয়...?

অমিয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তুমি তো জানো, সোমাদি...

সোমাদি মাথা নেড়ে চাপা গলায় বলে, জানিই তো, জানব না কেন? মনে পড়বে...

পিসেমশাই সামনে এসে দাঁড়ান। কুঁজো দেখায় তাঁকে, বুড়ো দেখায়। অমিয়র দিকে অপলক একটু তাকিয়ে থেকে বলেন, আমি ভাবতাম ওর পিসিমা মরে গেছে বলেই বোধহয় অমিয় আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, কিন্তু তা নয়। সোমা, অমিয় আমাকে—

জানি মেসোমশাই। অমিয় বড় ভালো ছেলে।

পিসেমশাই শ্বাস ছেড়ে বলেন, আমি বড় একা হয়ে গেলাম। শেষ মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। সোমা, মাঝে মাঝে আসবি তো? অমিয় তুই?

আসব না কেন!

কী কথা হচ্ছিল তোদের?

সোমাদি মাথা নিচু করে বলে, কিছু না মেসোমশাই, অমিয় মাঝে মাঝে একটা ফেরিঘাটের কথা বলছে—

ফেরিঘাট! কীসের ফেরিঘাট? কী রে অমিয়?

স্টিমার বাঁধার জেটি, জল...

ওঃ। পিসেমশাই হাসেন, স্টিমারঘাট মনে পড়তেই খালাসিদের মাংস রান্নার গন্ধ নাকে এসে লাগে এখনও। গোয়ালন্দে পারাপারের সময়ে ওই গন্ধ যে কী ভালো লাগত। বুঝলি, বাহাদুরাবাদে একবার কাজলি মাছের

ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম—সরষেবাটা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল—তেমন আর কখনও কি খাওয়া হবে? এক কাঠা চালের ভাত তুলে ফেলেছিলাম। তুই কোন ফেরিঘাটের কথা বলছিস অমিয়? গোয়ালন্দ? না কি...

কী জানি? আমি ঠিক জানি না। খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি গড়িয়ে নেমে গেছে বহু দূর পর্যন্ত... কালো ছোট্ট একটা জেটি...নির্জন...বালিতে একটা সাপের খোলস পড়ে আছে কেবল...আবছায়ায় জল দেখা যায়...সে কী জল...অনন্ত, অথৈ এক নদী বয়ে যাচ্ছে...

পিসেমশাই আর একটু কুঁজো হয়ে যান। একটা শ্বাস ফেলে বলেন, এখন এই বাড়িতে আমার একা কাটবে, বাদবাকি যে ক'টা দিন আছি। অমিয়, রাত হল যে, বউমাকে নিয়ে যাবি, অনেকটা রাস্তা, এইবার বেরিয়ে পড়। সোমা, তুই তো আজ যাবি না, না?

না।

অমিয় আর দেরি করিস না। সোমা, বউমাকে ডেকে দে।

দিই।

বড় একা লাগবে, বুঝলি অমিয়? মাঝে মাঝে বউমাকে নিয়ে চলে আসবি। দু'—চার দিন করে থেকে যাবি। মনে করিস, আমি তোর এক বুড়ো ছেলে, আমার তো কেউ রইল না...

অমিয়র স্কুটার ডাকছে। গুড় গুড় গুড় গুড়। পিছনে হাসি। বাতাস সামনে থেকে পিছনে বয়ে যাচ্ছে। তবু মাঝে মাঝে এক এক ঝলক হাসির গন্ধ এসে নাকে লাগে। হাসির গন্ধ! তা তো নয় হাসির আবার গন্ধ কী? ও তো ওর খোঁপার বেলফুলের গন্ধ, সেন্ট আর প্রসাধনের গন্ধ।

হাসির মুখ দেখতে পাচ্ছে না অমিয়। কেবল তার দু'খানা হাত অমিয়র কোমর বেষ্টন করে আছে। এক বার ঝুঁকে নিজের পেটের কাছে হাসির জড়িয়ে থাকা হাতের পাতাদু'টি দেখল অমিয়। আঙুলে আংটি ঝলসে ওঠে। মোমে মাজা আঙুলগুলি কী নরম হয়ে লেগে আছে তার পেটে।

হাসি দুরন্ত শ্বাসের সঙ্গে বলে, আরও জোরে চালাও না।

কেন?

জোরে না চালালে স্কুটারে ওঠার আনন্দ কী!

হাসি, আমার স্কুটারটা পুরনো হয়েছে। স্পিড নেয় না।

পচা, তোমার স্কুটারটা পচা।

অমিয় হাসে। তিন, সাড়ে তিন বছর আগে ক্যাথিড্রাল রোডে, এই স্কুটারে...

জ্যোৎস্না ফুটেছে কেমন, দেখছ?

হুঁ।

ঠিক দুধভাতের মতো জ্যোৎস্না, আমার খেতে ইচ্ছে করে।

হাসি, তুমি কবে যাচ্ছ?

তেরোই।

তোমার যদি টাকার দরকার থাকে...

সামনে ওটা কী, ওই উঁচু মতো?

গড়িয়াহাটা ব্রিজ।

ওমা! ওর ওপর দিয়ে তো রোজ যাই—আসি, কই অত উঁচু বলে তো মনে হয় না, ঠিক টিলার মতো দেখাচ্ছে দেখো। চা—বাগানে আমরা ছেলেবেলায় টিলা থেকে ছুটে নামতাম...একবার দৌড় শুরু করলে আর থামা যায় না, কেবলই গতি বেড়ে যায়।

হুঁ।

তোমার স্কুটারটা পচা। আর একটু জোরে চালাও না।

কেন?
আমার স্পিড ভালো লাগে।
গুড় গুড় করে স্কুটার ডাকে। গড়িয়াহাটা ব্রিজের গোড়া থেকে চড়াই ভাঙে। অমিয় স্পষ্টই টের পায় তার বয়স্ক স্কুটারটার এই চড়াই ভাঙতে কষ্ট হচ্ছে। খুব বেশি দূর নয় আর, সে মনে মনে তার স্কুটারকে বলে, 'আর একটু কষ্ট করো স্কুটার। তারপর অন্ধকার সিঁড়ির নীচে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।'
ব্রিজের ওপর ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াবে?
হাসি, অনেক রাত হয়েছে।
ক'টা বাজে?
বারোটা চল্লিশ।
হোকগে। তুমি দাঁড়াও।
ব্রিজের ঠিক ওপরটায় বাতাসের জোর বেশি। আকাশের কাছাকাছি উঠে তারা দাঁড়ায়। হাসি রেলিঙের কাছে চলে যায়। ডেকে বলে, দেখো, কত দূর পর্যন্ত কী ভীষণ জ্যোৎস্না। সব দেখা যাচ্ছে। এত রাতে কলকাতা কখনও দেখিনি।
অমিয় বাতাসে সিগারেট ধরাতে পারছিল না। বার বার দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যাচ্ছে। সে স্কুটারের ওপর না—ধরানো সিগারেট মুখে নিয়ে বসে রইল। হাসি তাকে ডাকে না। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হাসি একা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত অনন্ত শহরটি দেখে মুগ্ধ চোখে। এখন যদি নিঃশব্দে অমিয় তার স্কুটারকে ব্রিজের ঢালুর ওপর দিয়ে গড়িয়ে দেয়, যদি চলে যায়, তা হলে হাসি অনেকক্ষণ টেরই পাবে না। যে অমিয় চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে এবং অমিয়কে না—দেখে একটুও অবাক হবে না হাসি। তার মনেও পড়বে না যে, এই ব্রিজের ওপর সে অমিয়র সঙ্গে এসেছিল, তার স্কুটারে। হাসির মনেই পড়বে না।
না—ধরানো সিগারেট মুখে অমিয় অপেক্ষা করে। বাতাসে আকাশজোড়া এক বৃক্ষ নড়ে। বকুলের মতো খসে পড়ে তারা। অমিয় অপেক্ষা করে।

এক দিন যায় দু'দিন যায়।
দীর্ঘ টেন্ডার টাইপ করতে করতে অমিয়র কাঁধ ব্যথা করে। চোখে ঝাপসা দেখে। সিগারেটে—সিগারেটে জিভ বিস্বাদ। রাজেন চা এনে রেখে গেছে। খাওয়া হয়নি।
বাগচী। কল্যাণ ডাকে।
উঁ?
আপনার কি কিছু টাকার দরকার?
অমিয় হাসে।
রাজেনের কাছে আমি আরও ছ'শো টাকা রেখে দিয়েছি। আমি থাকি বা না—থাকি, যখন দরকার হয় নেবেন।
অনেক ধার হয়ে গেল মুখার্জি।
আপনার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। সেনগুপ্তের কোনও পাত্তা পেলেন?
না।
কত টাকার বিল পেমেন্ট নিয়ে গেছে?
প্রায় সাত হাজার।
ওকে খুঁজে পেলে কী করবেন—
কিছুই না। কেবল একটা কথা বলব—
কী কথা?

বলব...
অমিয় আর বলে না। বলতে পারে না। টাইপরাইটারের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখ। চোখে মেঘ। বাষ্পরাশি জমে ওঠে। সে দেখে, টাইপ করা লাইনের অক্ষরগুলো কে যেন আঙুলের টানে লেপে দিয়ে গেছে। কালো রেখার মতো দেখায়। লাইনগুলো ধীরে আঁকাবাঁকা হয়ে যেতে থাকে। দুলতে থাকে। অমিয় দেখতে পায়, লাইনগুলো দুলতে দুলতে ঢেউ হয়ে যাচ্ছে।...ঢেউ আর ঢেউ। ফুলে উঠছে জল—অনন্ত অথৈ মহাসমুদ্রের মতো জল। কালো মহা আকাশ ঝুঁকে আছে তার ওপর। বালিয়াড়ি ধু—ধু করে সাদা হাড়ের মতো। গড়ানে বালি, বালির ওপর ঢেউয়ের দাগ। সাপের খোলাস উলটে পড়ে আছে।
মুখার্জি, আমি আপনাকে একটা জিনিস প্রেজেন্ট করব।
কী?
আমার স্কুটারটা।
তা কেন বাগচী। এখন আপনার সময় ভালো যাচ্ছে না। প্রেজেন্ট সুসময়ে করবেন।
এই ঠিক সময় মুখার্জি। স্কুটারটার আর আমার দরকার নেই।
কল্যাণ একটু চুপ করে থাকে, যদি দরকার না থাকে তো ওটা আমি কিনে নিতে পারি।
না মুখার্জি, আমাদের বংশে কেউ কখনও ঘরের জিনিস বেচেনি। আমি ওটা আপনাকে দিয়ে দেব। অভাবের সময়েই দেওয়া ভালো, সুসময়ে দেওয়া হয় না।
কল্যাণ চুপ করে থাকে।
রাজেনের কাছে টাকাটা আছে বাগচী, দরকার হলে নেবেন।
আচ্ছা।
টেন্ডার সিল করে অমিয় বেরোয়। মেঘ কেটে রোদ উঠছে। চার দিকে পাথুরে শহর। প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতা। নীচে স্কুটারটা দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় চেয়ে থাকে। তারপর স্কুটার ছাড়ে।

লাহিড়ী।
উঁ।
টেন্ডার দিয়ে গেলাম।
আচ্ছা। দেখব।
লাহিড়ী, প্যাটারসন কি এখনও আমাকে বিশ্বাস করে?
লাহিড়ী হাসে। বলে, ও—সব রোমান্টিক কথা ছাড়ুন। কে কাকে বিশ্বাস করে! অর্ডার আপনি পাবেন। ঠিকমতো রেট দিয়েছেন তো, যেমন বলেছিলাম?
দিয়েছি।
ঠিক আছে।
অমিয় বেরোয়। ঘুরতে থাকে। মাঝে মাঝে নিজের অফিস ছুঁয়ে যায়।

বাগচী।
উঁ?
ল্যাংগুয়েজ নিয়েই সবচেয়ে মুশকিল।
অমিয় হাসে। বলে, কেন?
রজত হাই তুলে বলে, কিছুতেই ল্যাংগুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ মেয়েটা রোজই মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ভারী অস্বস্তি।

চেয়ে থাকে কেন?

বোধহয় এক্সপেক্ট করে, জার্মানি যাওয়ার আগে আমি তাকে ফাইনাল কিছু বলে যাব। বাঙালি মেয়েদের জীবন খুব অনিশ্চিত তো। অথচ আমি কিছু বলতে পারছি না। ল্যাংগুয়েজ নিয়েই মুশকিল।

কবে যাচ্ছেন?

হরি সিং—এর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছি। দিন কুড়ির মধ্যেই চলে যাব।

আমাদের একা লাগবে।

জানি। আফটার অল উই ওয়্যর কমরেডস। বাগচী, আপনার জন্য কী পাঠাব বললেন না?

ভেবে দেখি।

সেনগুপ্তকে যদি কখনও খুঁজে পান বাগচী, গিভ হিম অ্যান এক্সট্রা কিক ফর মি। মনে রাখবেন।

অমিয় হাসে।

মিশ্রিলাল এসে চুপ করে বসে থাকে, ধৈর্য ধরে।

বাগচীবাবু।

জানি মিশ্রিলাল।

আপনি তো আর কোনও অর্ডার পেলেন না। বিজনেসের কী হবে? আমি ডুবে যাব না তো।

বোধহয় দূরে কোথাও মেঘ—গর্জনের মতো একটা শব্দ হয়। অমিয় কান পেতে শোনে। শার্সির বাইরে আজ প্রবল রোদ। কোথাও মেঘ নেই, তবুও শব্দটা কোথা থেকে শোনে অমিয়? একবার চোখ বোজে সে। অমনি এক পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত—বিদ্যুৎ সিংহ তার চোখে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়। গভীর অরণ্যের ছায়ায় বহু দূরের সিংহ ডাকে—মেঘ—মাটি কেঁপে ওঠে।

সে বলে, ডুববে না মিশ্রিলাল। আমি আছি। থাকব।

হাসির সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না আজকাল। রাত পর্যন্ত সে বাইরে থাকে। ফিরে এসে দেখে, হাসির ঘর ফাঁকা। বোধহয় হাসি কলকাতায় তার চেনাশোনা মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, দেখে সিনেমা—থিয়েটার, বোধহয় তার নেমন্তন্ন থাকে খাওয়ার। কে জানে! মধু তাকে চা করে দেয়। জিজ্ঞেস করে, বাবু, আপনার গাড়ি!

দিয়ে দিয়েছি একজনকে।

বুড়ো মধু বিড় বিড় করে কী যেন বলে। বোধহয় জীবনের অনিত্যতার কথা নিজেকে শোনায়।

রাত বেড়ে যায়। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে। ঘুম হয় না। উঠে বসে অমিয় আলো জ্বালে। অফিসের কাগজপত্র দেখে। টেন্ডারের খসড়া তৈরি করে। সে—সময়ে ভেজানো দরজা ঠেলে হাসি আসে। নিঃশব্দে ঘরে চলে যায়। কাপড় ছেড়ে কলঘরে ঢোকে। বেরিয়ে আসে, জল খায়। শুয়ে পড়ে।

তাদের মধ্যে কোনও কথা হয় না। হাসির যাওয়ার দিন এসে গেল।

রোদের তাপ আজকাল খুব বেড়ে গেছে। অমিয়র তাই কষ্ট হয় খুব। অনেকটা হাঁটতে হয়। কল্যাণ প্রায়ই বলে, বাগচী, স্কুটারটা নিয়ে বেরোবেন।

অমিয় হাসে। নেয় না। কল্যাণ কয়েকদিনে ভালোই শিখে গেছে চালাতে। ও যখন স্কুটার চালায় তখন মুগ্ধ হয়ে দেখে অমিয়। ভালো লাগে। হিংসে হয় না।

রজতের কোনও কাজ নেই আজকাল। ব্যবসা সিল করে দিয়েছে। তবু রোজ এসে দেখা করে যায়।

কবে ফ্লাই করছেন সেন?

বলিনি আপনাকে? বিশ তারিখ, টিকিট পেয়ে গেছি।

বাঃ। ভালো খবর।

বাগচী ইউ আর সাফারিং টু মাচ।

ধারগুলো শোধ করতে হবে সেন।

পালিয়ে যান না। সেনগুপ্তকে কে আর ধরতে পেরেছে।
ঠিক দেখা হবে একদিন—তখন? অমিয় হাসে।
বাগচী, যদি সত্যিই কেটে পড়তে চান তো ব্যবস্থা করতে পারি।
কী রকম ব্যবস্থা?
জব ভাউচার। তিন মাসের মধ্যে আপনাকে নিয়ে যাব।
অমিয় হাসে।
কখনও কখনও শূন্য ঘরে, তার টেবিলের ওপর বিশাল সিংহ এক লাফ দিয়ে উঠে আসে। ধক ধক করে জ্বলে তার শরীর, পঞ্জরসার দেহ, পিঙ্গল কেশর। মুখে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার। পুরুষের এ—রকমই হওয়ার কথা ছিল। কে তাকে শেখাল নারী—প্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রণয়ভিক্ষা, মোলায়েম ভালোবাসার কথা! অপরূপ মগ্ন হয়ে দেখে অমিয়।
তারপর টাইপরাইটার টেনে নিয়ে বসে।

আপনি বার বার কেন একটা স্টিমারঘাটের কথা বলেন জামাইবাবু?
আমি বলি না। অমিয় বলে। তুমি ওর কাছ থেকে কখনও শুনে নিয়ো।
কী করে শুনব! আমি কাল চলে যাচ্ছি।
শুনলে ভালো করতে।
কেন?
জামাইবাবু টেলিফোনের অন্য প্রান্তে শ্বাস ফেলে।
হাসি, আমাদের বয়স হয়ে গেল।
হঠাৎ এ—কথা কেন?
কী জানি! আজকাল হঠাৎ কাজকর্মের মাঝখানে বয়সের কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে—
কী?
স্টিমারঘাট—তুমি সাবধানে যেয়ো হাসি। গঙ্গার ওপরে ব্রিজটা যে কবে ওরা শেষ করবে!
আমি পাগল হয়ে যাব জামাইবাবু, স্টিমারঘাটের কথাটা আগে বলুন। কোন স্টিমারঘাট?
ফরাক্কা।
না, ফরাক্কার কথা আপনি বলছেন না।
জামাইবাবু চুপ করে থাকে।
বলবেন না?
তুমি অমিয়র কাছে শুনো।
ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে কখন? ও অনেক রাতে ফেরে, খুব সকালে বেরিয়ে যায়।
কাল স্টেশনে অমিয় যাবে না?
বলেছিল তো যাবে। অফিসে কাজ আছে, সেখান থেকেই সম্ভব হলে স্টেশনে যাবে।
তবে আর সময় হবে না।
কীসের?
স্টিমারঘাটের কথা শোনার। ফোন রেখে দিচ্ছি হাসি—
হাসি রিসিভার রেখে দেয়।
পরমুহূর্তেই আবার তুলে দ্রুত ডায়াল করে।
হ্যালো আমি অমিয় বাগচীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। এক্ষুনি, জরুরি দরকার। একটু অপেক্ষা করতে হয়। তারপর অমিয়র গলা ভেসে আসে, বাগচী বলছি।

শোনো, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে।
কী কথা?
তুমি আমাকে একটা কথা কোনও দিন বলোনি।
কী?
স্টিমারঘাটের কথা। সবাইকে বলেছ, আমায় ছাড়া। এক বার আমাকে বলবে?
আমার সময় নেই হাসি।
কেন?
আমি খুব ব্যস্ত।
কেন ব্যস্ত?
অনেক কাজ হাসি। আমাদের সময় তো বেশি নয়।
বলবে না?
সময় বড় কম হাসি।
স্টিমারঘাটের অর্থ কী?
কী করে বলব। আমিই কি জানি?
কী আছে সেখানে?
কিছু নেই। শুধু একটা উঁচু বালিয়াড়ি, ধু ধু বালি গড়িয়ে নেমে গেছে, একটা সাপের খোলস উলটে পড়ে আছে। বালির শেষে দূর থেকে একটা কালো জেটি দেখা যায়। তারপর জল। সে খুব অথৈ জল, অনন্ত জল, প্রকাণ্ড এক নদী, তার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে...
হাসি স্তব্ধ হয়ে থাকে।
এর মানে কী?
আমি জানি না। তবে মনে হয়, এখানে এক দিন সকলের দেখা হবে।
কেন?
...
কেন?
...
কেন?
...
কেন?

প্যাটারসনের অর্ডারটা আজ বেরিয়েছে।
সকাল থেকেই অমিয় ঘুরছে বাজারে। ভাদ্র মাস পড়ে গেল প্রায়। রোদের তাপ অসম্ভব। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় ওঠে। ঘূর্ণি হাওয়ার মতো হাওয়া দেয়। হাঁটতে খুবই কষ্ট হয় অমিয়র। তবু সে হাঁটে। মাঝে মাঝে স্পষ্ট দেখতে পায় সামনে, ভিড় ভেদ করে চলেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ। পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, গায়ে বৈরাগ্যের ধূসর রং, চোখে দূরের প্রসার। সিংহ মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে দেখে নেয়। দেখে নেয়, অমিয় ঠিকঠাক চলছে কি না।
অমিয় চলে। সাপ্লায়ারদের কাছে ঘোরে। দোকান যাচাই করে। সে আছে। থাকবে।
স্টিমারঘাটের ছায়াটা চকিতে ভেসে ওঠে চোখে। মিলিয়ে যায়। দেখা হবে, একদিন সকলের সাথে দেখা হবে।

দুপুরের দিকে অফিসে ফিরে একটা সিগারেট মুখে টাইপরাইটারের সামনে বসে অমিয়। টাইপ করতে থাকে।

কল্যাণ ঘরে ঢুকেই বলে, এ কী বাগচী?

কী?

আপনি এখনও যাননি?

কোথায়?

কাল যে বলছিলেন আজ দার্জিলিং মেলে আপনার স্ত্রী চলে যাচ্ছেন!

ওঃ।

ভুলে গিয়েছিলেন?

অমিয় লজ্জিত হয়ে হাসে। সে ভুলে গিয়েছিল। হাসির কথা তার মনেই ছিল না।

ক'টা বাজে মুখার্জি?

বারোটা চল্লিশ। পঞ্চাশে ট্রেন ছেড়ে যাবে।

তা হলে আর গিয়ে কী হবে!

উঠুন তো। নীচে স্কুটার রয়েছে—তাড়াতাড়ি করুন, হার্ড লাক—পেতে পারেন। উঠুন, উঠুন—

দেরিই হয়ে গেল অমিয়র।

স্কুটার থেকে নেমে সে দ্রুত পায়ে উঠে এল স্টেশনের হলঘরে। আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষ—যারা প্রিয়জনদের বিদায় জানাতে এসেছিল। কোলাপসিবল গেটের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অমিয় শূন্য রেল লাইনটা দেখে। বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়, লাইনটা চকচক করছে। কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসছিল। তারা সরে যেতেই অমিয় দেখতে পেল হাসি দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে সুটকেস। সে একা।

কী হল?

হাসির মুখ চিন্তান্বিত। কপালে ভ্রূকুটি। কেমন যেন আস্তে আস্তে চিন্তা করে বলল, আমি ট্রেনটা ধরতে পারিনি।

কেন?

পারলাম না।

কেন?

হাসি খুব বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বলে, কী জানি। আমাকে কখনও জিজ্ঞেস কোরো না।

অমিয় একটু হাসে।

আজকাল অমিয় যখন সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ঘুমোয় তখন তার স্বপ্নের মধ্যে উপর্যুপরি সিংহের ডাক শোনা যায়।

মেঘ—গর্জনের মতো সেই ডাক। মাটিতে লেজ আছড়ানোর শব্দ হয়। পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, গায়ের ধূসর রঙের বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার—সিংহেরা তার ভিতরে ঘুরে বেড়ায়। উপর্যুপরি ডাক দেয়, মেঘ—মাটি কেঁপে ওঠে। ঘুমের মধ্যে অমিয় হাসে।

অন্য ঘরে হাসির তেমন ঘুম হয় না। বহু দূর থেকে এক অচেনা রহস্যময় স্টিমারঘাট এগিয়ে আসে। সে দেখে ধু ধু বালিয়াড়িতে চাঁদের আলো পড়েছে। পড়ে আছে সাপের খোলস। উঁচু থেকে দেখা যায়—গড়ানো বালিয়াড়ির শেষে জেটি, তারপর অনন্ত নিঃশব্দ জলরাশি—অথৈ। সেই স্রোতের ওপর আবহমান কাল ধরে ঝুঁকে আছে কালো আকাশ। ওইখানে সকলের দেখা হবে। কেন না, তারা বিশ্বস্ত থাকেনি নিজের প্রতি, এই দুর্লভ পার্থিব জীবন নিয়ে তারা হেলাফেলা করেছিল।

এ—সব সে নিজেই ভাবে। ভাবতে ভাবতে ভাবনা পালটে ফেলে। বারংবার সে ওই স্টিমারঘাটের অর্থ খুঁজতে থাকে। খুঁজে পায় না। কিন্তু না—বুঝেও সে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে অপলক চেয়ে থাকে। জলে চোখ আপনি ভেসে যায়।

কাঁচের মানুষ

লাভ স্টোরের বারান্দায় পা ঠেকিয়ে সাইকেলটা দাঁড় করাল ঝিন্টু। কাউন্টারের ওধারে তার মেজদা বিটু একজন খদ্দেরকে হাত নেড়ে কী যেন খুব নিবিষ্টভাবে বোঝাচ্ছিল। আরও দুজন দাঁড়িয়ে শুনছিল মন দিয়ে। খদ্দেরদের একজন গোপাল মুখার্জি—রেলের টিকিট কালেক্টর, দ্বিতীয় জন বিষ্ণু সমাদ্দার—গুদামবাবু। বিটু যার সঙ্গে কথা বলছে তাকে চিনতে পারল না ঝিন্টু।

মেজদা! এই মেজদা!

বিটু একবার তাকাল। বিরক্ত না নির্লিপ্ত তা বোঝা গেল না। তবে বিটুর মুখে একটা স্থায়ী উদাসীনতা আছে। কোন কথা শুনছে, কোন কথা শুনছে না তা ওর ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝা যাবে না কিছুতেই।

ঝিন্টু বলল, পেইন! পেইন! বউদির!

বিটু শুনল কি না বা বুঝল কি না তা বোঝা গেল না। তবে নিজের বউকে দেখাশোনা করার অনেক লোক বাড়িতে আছে। তার বাবা, মা, দাদা—বউদি, ভাইপো, ভাইঝি, ভাই। বিটু খবরটা শুনল মাত্র, তারপর আবার খদ্দেরকে হাত নেড়ে বোঝাতে লাগল।

ঝিন্টু বারান্দা থেকে পা তুলে পেডালে চাপ দিল। খবরটা তার দেওয়ার কথা ছিল, দিয়েছে। এখন সে ফ্রি। তার নিচু হ্যান্ডেলের রেসিং সাইকেলটা ভালো রাস্তা পেলে দারুণ চলে। এরকম সাইকেল এ শহরে দু'—তিনটির বেশি নেই। ছ'মাস আগে বাবা তাকে এটা কিনে দিয়েছিল। তবু আগের সাইকেলটার কথা তার খুব মনে পড়ে। না, সেটা খুব ভালো জাতের সাইকেল ছিল না। অতি সাধারণ। তারা চার বন্ধু সাইকেলে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিল। ওড়িশা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ হয়ে তাদের ফেরার কথা ছিল। নাগপুরের কাছে দুপুরবেলা দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটা লরি তার সাইকেলটাকে পিষে দিয়ে গেল। তার বাঁ হাতটা ভাঙল, মাথায় চোট হল দারুণ। দিন দশেক হাসপাতালে পড়ে থেকে সে অবশেষে ফিরে এল। বাকি রাস্তাটা তাকে আসতে হল ট্রেনে এবং একা। তার তিন বন্ধু সাইকেলে যাত্রা শুরু করে সাইকেলেই যাত্রা শেষ করে। এই সাইকেলটা সেই সাইকেলের চেয়ে অনেক বেশি দামি এবং ভালোও। কিন্তু এটা যে সেটা নয়, সেই ভাঙাচোরা সাইকেলটা মহারাষ্ট্রের কোন জংলা জায়গায় পড়ে পড়ে লক্কড় হয়ে যাচ্ছে, সেই কথা ভেবে আজও তার মাঝে মাঝে খুঁত খুঁত করে মনটা। কান্না পায়। সেই সাইকেল তাকে অনেকটা রাস্তা পার করে দিয়েছিল তো!

ঝিন্টুর এত নরম মনের ছেলে হওয়ার কথা নয়। সে বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়, কলেজের অপরিহার্য ক্রিকেট খেলোয়াড়, শহরের সেরা পাঁচজন অ্যাথলিটদের মধ্যে একজন, টেবিল টেনিসেও তার হাত দুর্দান্ত। এই মফসসলে অবশ্য স্পেসিফিকেশনের বালাই নেই। কলকাতা হলে এত বহুমুখী প্রতিভা কল্কে পেত না। সেখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়ালড়ি। যে ক্রিকেট খেলে সে ক্রিকেটেই জান লড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে তাকানোর ফুরসত পায় না। যে ফুটবল খেলে তার দম ফুটবলের জন্যই নিংড়ে দিতে হয়। কিন্তু এ শহর তো কলকাতা নয়, এখানে খেলাধুলো কারও পেশা হয়ে ওঠে না কখনও। এখানে যে কেউ যা—খুশি খেলে এবং কেউ খুব বেশি ওপরে ওঠে না। ঝিন্টুর একটিই শখ আছে। গোটা পৃথিবী সাইকেলে ঘুরে আসবে।

সেবক রোডের দিকে মোড় নিতেই পিছনে একটা স্কুটার তাড়া করল। ঝিন্টু মুখ ফিরিয়ে দেখল, অলক আগরওয়াল। তার দিকে একবার হাত তুলে হাসল। তারপর ধেয়ে এল।

অল্প বয়সের এইটেই ধর্ম। স্পিড। আরও স্পিড। এবং কম্পিটিশন। ঝিন্টু তার রেসিং সাইকেলটাকে উড়িয়ে দিল। পিছনে অলক।

আগের মতো সেবক রোড এখন আর ফাঁকা রাস্তা নয়। দোকানপাট, রিকশায় ছয়লাপ। পদে পদে জ্যাম। তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝিন্টু গলে যেতে লাগল, ডাইনে বাঁয়ে আশ্চর্যরকম অ্যাঙ্গেলে হেলে ও দোল খেয়ে খেয়ে। অলকের ছোট চাকার স্কুটারে অতটা ব্যালান্স নেই। পারল না।

কিছুদূর গিয়ে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে যায় ঝিন্টু। মাঝে মাঝে ভারী সব লোড—করা লরি মার মার করে তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়, এগিয়ে যায় দ্রুতগতি গাড়িও। এগুলোর সঙ্গে ঝিন্টু পারবে না জানে। তবু সে সাইকেলটায় একটা দামাল গতি তুলে দেয়। সাইকেল আর ঝিন্টু, ঝিন্টু আর সাইকেল। একাকার।

২

পুরনো জেলখানার পাশে একটা লাশকাটা ঘর ছিল। কবে সেই ঘর ভেঙে দিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি। কিন্তু আশ্চর্য এই কংক্রিটের যে টেবিলটায় পোস্টমর্টেম হত সেটা আজও দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে ভেঙে—পড়া দেয়াল, টুকরো ইট, ফাঁকে ফাঁকে আগাছা, তারই মধ্যে চারটে পায়ে আস্ত টেবিলটা দাঁড়িয়ে। চোখ পড়লেই বুকের ভিতরটা ঝাঁৎ করে ওঠে। সকলের হয়তো হয় না। পিন্টুর হয়। আসতে যেতে রোজ তার ওইদিকে চোখ পড়ে। আজও পড়ল। চলন্ত রিকশা থেকে সে অপলক চোখে কিছুক্ষণ দেখল, যতক্ষণ দেখা যায়।

এই টেবিলটাকে অনেকবার নানাভাবে সে স্বপ্ন দেখেছে। বাঁদিকে কাছারি, কাছারির পাশে কাঁচা নর্দমা, ডানধারে জেলখানার উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের পাশেই ওই পুরনো লাশকাটা ঘরের ধ্বংসাবশেষ। এখানে সবাই আজকাল আবর্জনা ফেলে। দুর্গন্ধে নাকে রুমাল দিতে হয়।

একদিন পিন্টুরও এই টেবিলে শুয়ে কাটাকুটি হওয়ার কথা ছিল। কপালটা কি তার একটু ফেবারে?

রাজনীতি ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে বা বেঁচে আছে বলে পিন্টু বিশ্বাস করে না। কোনো না কোনোভাবে সব মানুষই রাজনীতি করে। কেউ জেনে, কেউ না জেনে। পিন্টু বরাবর যা করেছে তা জেনেই করেছে। সে রাজনীতিতে নামে কলেজে থাকতে। তখন থেকেই তার খ্যাতি। কুখ্যাতিও। পিন্টু এও বিশ্বাস করে, রাজনীতি করতে গেলে কখনও সখনও গা—জোয়ারির দরকার হয়, দরকার হয় সমাজবিরোধী মার্কামারা ছেলেদেরও। নিরামিষ রাজনীতি বলে কিছু নেই, কিছু হয় না। কাজেই সে রাজনীতিতে নেমেছিল আস্তিন গুটিয়েই। ফলে কলেজে থাকতেই মোটামুটি তাকে লোক ভয় খেতে শুরু করে।

ফুন্টসোলিং থেকে ফেরার পথে মধু চা—বাগানের কাছে চিরুর দল তাদের জিপে হামলা করেছিল। নাহক হামলা। পিন্টুর মাথায় রড লেগেছিল। জলপাইগুড়ি হাসপাতালে আসবার পথে কয়েক লিটার রক্ত বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। মরতে মরতে বেঁচে ফিরে আসে পিন্টু। তারপর চিরুর ওপর হামলা চালায়। কিছুদিন শহর খুব গরম করে রেখেছিল দুই পক্ষ। তখন মনে হয়েছিল হয় চিরু না হয় পিন্টু শিলিগুড়ি দখল করবে। কার্যত তার কিছুই হয়নি। চিরু এখন সরকারি ট্যুরিস্ট লজ আর এম ই এস—এ মাছ মুরগি সাপ্লাইয়ের ঠিকাদারি করছে, বেচছে দেদার বিদেশি জিনিস। আর পিন্টু? সে এখন তার বাবার জুনিয়র হয়ে ওকালতি জমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। জীবনের ধারাটাই অন্যভাবে বইতে লাগল। রাজনীতি হল বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে থাকার মতো। যতক্ষণ পিঠে চেপে আছ ততক্ষণ ভালো, পড়লেই বাঘে খেয়ে নেবে।

পিন্টু এখন আর তেমনভাবে রাজনীতি করে না। সোজা কথায় বলতে গেলে, সে এখন কল্কে পায় না। তবে একসময়ে তার যে হাঁকডাক এবং প্রতাপ ছিল তার কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে। লোকে তাকে হ্যাটা করে না। অনেকে সেলাম বাজায়।

পিন্টুর বয়স এখন ত্রিশ। নতুন করে জীবন শুরু করার পক্ষে বয়সটা এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু আসল সমস্যা হল, নতুন জীবনটা গড়ে উঠবে কী নিয়ে? কীরকমভাবে? রাজনীতি ছাড়া তার কাছে আর সবকিছুই 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—র মতো। সে জানে রাজনীতির জন্যই তার এই জীবনধারণ। কিন্তু সে এও জানে না, রাজনীতির অচলায়তনে নতুন কোনো ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা তার আর নেই। দলে এখনও নাম লেখানো

আছে। দলের মিটিং—এ তার ডাকও পড়ে, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে তাকে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হয় না আজকাল।

বেঁচে থেকেও নিজের মৃত্যু এইভাবেই প্রত্যক্ষ করে পিন্টু।

কলেজের মোড়ে পানের দোকানের সামনে যে রিকশা দাঁড় করাতে হবে তা রিকশাওলা জানে। পিন্টুকে নামতে হয় না, দোকানদার তাকে দেখেই পিলাপাতি কালাপাতি দিয়ে পান সেজে নেমে এসে এগিয়ে দেয়। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে।

পিন্টু এই শ্রদ্ধার ভাবটা খুব নজর করে দেখে। শ্রদ্ধা কোথাও কমে যাচ্ছে কি না, বা আর কারও প্রতি বেড়ে উঠছে কি না এটা তার জানা দরকার। এই যে রিকশাওলাকে কিছু বলতে হয় না, শুধু পিন্টু উঠে বসলেই রিকশা নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে থাকে, পানের দোকানে দাঁড় করায় বা বাসায় নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেয়, এর ব্যত্যয় হলেই পিন্টুর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এসব ছোটখাটো ঘটনা হল মিটার। জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব—প্রতিপত্তি মাপবার যন্ত্রবিশেষ।

এল আই সি, স্টেট ব্যাংক, সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, কোর্ট, এসডিও অফিস যেখানেই সে যায় কোথাও তার নিজেকে পরিচয় দিতে হয় না। পিন্টু নিজে গিয়ে দাঁড়ালে বা পিন্টুর নাম করে কেউ গেলে এখনও এই টাউনে অনেক কার্যোদ্ধার হয়ে যায়। মরা হাতি এখনও লাখ টাকা।

দোকানের অদূরে একটা গাছতলায় কয়েকজন ছেলেছোকরা গ্যাঞ্জাম করছিল। পিন্টুকে দেখে এগিয়ে এল।

পিন্টুদা শুনেছেন?

পিন্টু বোঁটা থেকে একটু চুন চেটে নিয়ে বলে, কী?

ফুডের চ্যাটার্জি সাহেব আবার কাল রাত থেকে ঘেরাও হয়ে আছে। ফুড কর্পোরেশনের ম্যানেজার চ্যাটার্জিসাহেব প্রায়ই ঘেরাও হন। এ যুগের পক্ষে লোকটা নিদারুণ 'মিসফিট'। ঘুষ—টুস খান না, কর্মচারীদের একটু ডিসিপ্লিনে রাখতে চেষ্টা করেন, তার চেয়েও বড়ো কথা চুরি আটকানোর চেষ্টা করেন। ফলে মাসে দু'—একবার তাঁকে ঘেরাও হতে হয়। খবরটা তাই নতুন নয় বটে, কিন্তু পিন্টুর খিঁচ অন্যখানে। খবরটা যে যথাসময়ে পায়নি। আজকাল টাউনে কোনো ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পিন্টুর কানে কেউ পৌঁছে দেয় না, আগে যেমন দিত। যে—কোনো ঘটনাতেই পিন্টুর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। আর আজকাল? সে সময়মতো কোনো খবরই পায় না।

সামনেই ফুড কর্পোরেশনের অফিস। পিন্টু রিকশায় বসেই অফিসের সামনে ভিড় দেখতে পেল। খুব নিস্পৃহভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। ভিতরে কোনো তাগিদ অনুভব করল না। ফুড কর্পোরেশনের ইউনিয়নে চারটে ভাগ। বড় ভাগটি তাদের— অর্থাৎ তার দলের। কিন্তু কেউ তাকে ডাকেনি, তার পরামর্শ চায়নি।

পিলা আর কালাপাতি জর্দার ধার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। পিক ফেলে পিন্টু অস্পষ্ট গলায় বলল, চল।

রিকশা চলতে থাকল।

৩

ব্রহ্মকুমার গাঙ্গুলিকে এ শহরের সবচেয়ে বড় উকিল বলা যাবে কি না তা বলা মুশকিল, তবে তিনি যে সবচেয়ে বড়দের একজন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সবচেয়ে বড় উকিলদের সংখ্যা খুব বেশিও নয়। মেরে কেটে চার—পাঁচজন। এবং তাঁদের মধ্যে সকলেই বৃদ্ধ এবং প্রবৃদ্ধ। উপেন বিশ্বাসের বয়স আশি ছাড়িয়েছে। তবু সক্ষম আছেন বলে কোর্টে প্রায় রোজই হাজিরা দেন। বেশিরভাগ সময়েই বসে ঝিমোন। মামলা চালায় জুনিয়ররা। নিরাপদ সরকার ছিয়াত্তরে পা দিয়েছেন। আজকাল আদালতে আসতে চান না। প্রায়ই ছেলের কাছে আমেরিকার হিউস্টনে চলে যান এবং কয়েকমাস করে থেকে আসেন। কেস প্রায় নেন না বললেই চলে। গৌর ব্যানার্জি কিছুটা অ্যাকটিভ। বয়স তিয়াত্তর। ব্রহ্মকুমারের একমাত্র সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রদ্যোৎ সেন তেমন বৃদ্ধ নন, মাত্র পঞ্চান্ন বা ছাপ্পান্ন। উকিলও ভালো। কিন্তু শোকতাপ পেয়ে ইদানীং বড্ড নিঝুম হয়ে গেছেন, কোনো কাজেই উৎসাহ নেই।

আর যেসব উকিল আছে তারা উঠতি, ঝলবলে খলখলে। এখনও কারওরই ভালো পসার জমেনি। বুড়ো আর যুবোদের মধ্যে পেশাগত এই প্রজন্মের ফাঁকটুকুতে যে ভ্যাকুয়াম আছে সেখানেই ব্রহ্মকুমারের স্থান। তিনি যথেষ্টই রোজগার করেন, উদয়াস্ত তাঁর সময় নেই। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি তাঁর মেশিন চালু থাকে। তাঁর তেমন কোনো শখ নেই, আহ্লাদ বা প্রমোদ নেই, তিনি কোথাও ভ্রমণে যান না, তা ছাড়া তাঁর কোনো নেশা নেই। তাঁর একটাই নেশা—মামলা। কত টাকা তিনি মাসে রোজগার করেন তার সঠিক হিসেব তাঁর নিজেরও জানা নেই। তবে কম করেও দশ থেকে পনেরো হাজারের মধ্যে। টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে, জমা হচ্ছে না খরচ হয়ে যাচ্ছে তা তাঁর স্ত্রী বলতে পারবেন। তিনি কিছুই জানেন না সংসার কীভাবে চলে। স্ত্রীই সবকিছু চালিয়ে নেন, সংসারকে এবং তাঁকেও। তিনি আজকাল সুখাদ্যের স্বাদ টের পান না, সুন্দরী ও কুৎসিত নারীর তফাত বুঝতে পারেন না, মাত্র উনষাট বছর বয়সেই তাঁর কামবোধ লুপ্তপ্রায়।

সকালবেলায় ব্রহ্মকুমার তাঁর বাইরের ঘরে বসেই তাঁর তৃতীয় পুত্র পিন্টুকে গালাগাল করছিলেন, অপদার্থ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, ফাজিল, ভূত। তার কারণ জলপাইগুড়িতে পরশুদিন একটা মামলার হিয়ারিং ছিল। কথা ছিল পিন্টু কেসটা অ্যাটেন্ড করবে। কিন্তু সে তা করেনি এবং সে কথা বাপকে জানায়নি পর্যন্ত।

মক্কেলদের দিকে চেয়ে ব্রহ্মকুমার বলছিলেন, এই এরাই সব আধুনিক কালের ছেলেমেয়ে। এদের হাতে দেশ আর দশের ভার দিয়ে যেতে হবে আমাদের। বিশ—পঁচিশ—পঞ্চাশ বছর পর দুনিয়াটার কী হাল হবে ভাবতে পারেন?

জলপাইগুড়ির মক্কেল করুণভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একধারে। ফাঁক পেয়ে বলল, সামনের পনেরো তারিখে ডেট পড়েছে। এবারটায় আপনি নিজে যাবেন তো উকিলবাবু?

যেতেই হবে। তুমি তেরো—চোদ্দো তারিখে একবার তাগিদ দিয়ে যেয়ো। আর মুহুরির কাছে আমার এনগেজমেন্ট বুক আছে, তাতে শুনানির তারিখ আর নামধাম লিখে রেখে যাও। কোনোক্রমে যাতে ভুল না হয়।

মামলার ব্যাপারে ব্রহ্মকুমারের ভুল হয় কদাচিৎ, তিনি তো এই প্রজন্মের দায়দায়িত্বহীন বাপের হোটেলের অন্নধ্বংসকারী ছেলেছোকরা নন। যখন বিয়ে করেছিলেন তখনও ল—এর ছাত্র, রোজগারের নামে ঢু ঢু, তবু বাপের হুকুমে টোপর পরতে হয়েছিল। বাপের হুকুম কী জিনিস তা এরা সব বুঝবে না, তখন বাপই ছিল আইন, বাপই সুপ্রিম কোর্ট, প্রিভিকাউন্সিল। খেঁদি পেঁচি কাকে গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন বিগ বস তা বুঝতে পারছেন না বলে ভয়ে শুভ দৃষ্টির সময় চোখ পর্যন্ত খোলেননি। আর এই পিন্টুকে বিয়ে করার কথা বলে বলে মুখে ফেকো উঠে গেল, কথাটা শুনতে পায় বলেই মনে হয় না। অথচ ছেলেটার বিয়ে দরকার। রাজনীতি করতে গিয়ে দাগা খেয়েছে, আইনেও মন নেই। এই অবস্থায় বিয়ের বাড়া ওষুধ নেই। কিন্তু ওষুধ না গিললে কী করবেন তিনি?

বাচ্চা চাকরটা এসে খবর দিল, মা একটু ডাকছেন বাবু।

ব্রহ্মকুমার আঁতকে উঠে বলেন, এখন ডাকছে কী রে? কত মক্কেল দেখছিস না!

আজ্ঞে খুব দরকার।

পরে হবে, পরে। এখন যা।

চাকরটাকে ব্রহ্মকুমার স্টেশন থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। উত্তরবঙ্গের বছরওয়ারি বন্যায় বছর চারেক আগে গোটা পরগনা ভেসে গিয়েছিল। শিলিগুড়ি উঁচু ভিতের শহর, কখনও ডোবে না, রাজ্যের লোক এসে পঙ্গপালের মতো ঝাঁপ ফেলল শহরে। স্টেশন, গুমটি, চালা, স্কুল কলেজ সব জায়গায় লোক। সেইসময় পুরনো বাজার থেকে মাসকাবারি বাজার করে ফেরার পথে স্টেশনে এ এস এম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশ—কাল—পরিস্থিতি নিয়ে দুটো কথা বলছিলেন দাঁড়িয়ে। বাচ্চা একটা সাত—আট বছরের গোপাল গোপাল চেহারার ছেলে কাছেই দাঁড়িয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে কাঁদছিল। ছেলেটার দিকে বিরক্ত চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন ব্রহ্মকুমার। এমন সময় পাশেই একটা দঙ্গল থেকে একটা আদুর—গা লোক বিগলিত মুখে

এগিয়ে এল। গায়ে—পড়া অসহ্য রকমের আলাপি কিছু লোক আছে দুনিয়ায়। এদের আস্পদ্দার শেষ নেই। হুট বলে যখন তখন শ্রেণিভেদ ভুলে যার—তার সঙ্গে মনের কথা বলতে লেগে যায়। এ লোকটাও তেমন। চক্রবর্তী আর তাঁর কথা হচ্ছে, মাঝখানে উদয় হয়ে লোকটা বলল, এই যে ছেলেটা দেখছেন না বাবু এর বাপ নেই। মা একটা পাগলি। তা ছিল মায়ে—পোয়ে একরকম, কিন্তু আজ সকাল থেকে মা—টারও তল্লাশ নেই। কোথায় চলে গেছে পাগল মানুষ। ছেলেটা কেঁদে কেটে সারা হচ্ছে। তা বাবু নেবেন নাকি ছেলেটাকে? ঘরে দোরে থাকবে, কাজকম্ম করবে, মানুষ হয়ে যাবে একরকম।

ব্রহ্মকুমারের রেগে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু একটু সংসারী বুদ্ধি তখন খেলল মাথায়। তাঁর স্ত্রীর একটু বাতের লক্ষণ আছে। হাঁটু আর পায়ে কোনো বাচ্চা ছেলে উঠে মাড়িয়ে দিলে আরাম পান। কিন্তু সেরকম বাচ্চা তাঁর বাড়িতে কেউ নেই। এটাকে নিলে সেই কাজ হয়। লোকটাকে ব্রহ্মকুমার জিজ্ঞেস করলেন, জাতে কী রে?

আজ্ঞে, বারুজীবী। ভালোই, জলচল।

গার্জিয়ান কেউ নেই?

আমি গ্রাম সম্পর্কে কাকা। আর কেউ নেই।

ব্রহ্মকুমার লোকটার নামধাম টুকে নিলেন। তারপর ছেলেটাকে নিয়ে এলেন বাসায়। প্রথম প্রথম তিন—চারদিন খুব কাঁদত। খেতে চাইত না, খেলতে চাইত না। পরে আস্তে আস্তে এমন বশ মানল যে আর বলার নয়। ভেলু না ফেকু কী একটা নাম যেন ছিল আগে। এ বাড়িতে আসার পর নাম দেওয়া হয়েছে জনার্দন। ছেলেটা একটু খেতে ভালোবাসে। কোমরের কষি খুলে যায়। ভোজনে চ জনার্দন স্মরণ করে ওই নামটা বোধহয় পিন্টুই দিয়েছিল। সেই থেকে জনার্দন।

মায়া মোহের কথা শাস্ত্রে যা বলা আছে তা যে অতিশয় খাঁটি তা উকিলবাবু বেশ টের পান। এই জনার্দনকে দিয়েই টের পান। কুড়িয়ে পাওয়া এই ছেলেটার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, কিছু নেই তবু একটা ভারী মায়ার টান এসে গেছে। এখন যদি জনার্দনের মা এসে ছেলেকে দাবি করে বসে তবে ছাড়তে ভীষণ কষ্ট হবে।

ব্রহ্মকুমার জনার্দনের দিকে চেয়ে বললেন, তোর মা'র এমন কী জরুরি দরকার বল তো যে মক্কেল ছেড়ে যেতে হবে?

জনার্দন মাথা নেড়ে বলল, সে জানি না।

এক মক্কেল আগ বাড়িয়ে বলে উঠল, শুনেই আসুন না উকিলবাবু, আমরা বসছি।

বসুন তা হলে।—বলে ব্রহ্মকুমার উঠলেন, বেলা প্রায় পৌনে দশটা হল। কোর্টে একটু বেলা করেই যান। তবু তারও বেশি সময় নেই।

৪

সুমনা জানেন, স্বামীটিকে ডেকে তেমন কোনো লাভ নেই। কারণ খুব দুঁদে উকিল হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মকুমারের বাস্তব বুদ্ধি অতিশয় সীমাবদ্ধ। বিপদের সময় ব্রহ্মকুমারের একমাত্র ভূমিকা হল চেঁচামেচি করে অন্যদের ডাকাডাকি করা। এবং অবাস্তব সব পরামর্শ দেওয়া।

বিপদ বলতে অবশ্য তেমন কিছু নয়। তার মেজো বউমার ব্যথা উঠেছে। সুমনা নিজে বহুবার মা হয়েছেন। কাজেই অভিজ্ঞতার অভাব তাঁর নেই। এ অবস্থায় কী করতে হয় না—হয় সবই তাঁর নখদর্পণে। তা ছাড়া কেষ্ট মিত্রের নার্সিং হোম—এ নাম লেখানো আছে।

কিন্তু মুশকিল হল তাঁর মেজো বউমা সোমার হার্ট ভালো নয়। কলকাতার বড় ডাক্তারও দেখে বলেছে, বেশি ধকল সইতে পারবে না। সন্তান প্রসব না করলেই ভালো।

ডাক্তারদের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে জীবন অচল। সুতরাং তা কদাচিৎ মানা হয়।

কিন্তু সুমনা ভাবছেন, এক্ষেত্রে মানাই বোধহয় ভালো ছিল। ব্যথা ওঠার পর থেকেই সোমার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুকে ভীষণ ধড়ফড়ানি এবং ক্ষীণ একটু ব্যথাও। ছেলেরা কেউ বাড়ি নেই। ভরসা জনার্দন আর ব্রহ্মকুমার। শুধু নার্সিং হোম—এ নিয়ে ফেলে রেখে আসলেই চলবে না, ব্যাপারটা বুঝেও আসতে হবে। বড় বউমা মঞ্জরী কাছে থাকলেও খানিকটা ভরসা পেতেন সুমনা। সে গেছে লাটাগুড়ি চা—বাগানে বাপের বাড়ি, তার মায়ের এখন—তখন অবস্থা বলে আজ সকালেই ভাই এসে নিয়ে গেল। দুই ছেলে আর এক মেয়েকে রেখে গেছে। এখন তারাও সবাই স্কুলে।

চিনচিনে ব্যথাটা উঠতেই সোমাকে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করিয়েছেন তিনি। এ সময়ে হাঁটাহাঁটি করলে প্রসব সহজ হয়। কিন্তু ভিতরের বারান্দায় কয়েকবার এপাশ ওপাশ করেই সোমা বুক চেপে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে। ঝিন্টুকে পাঠিয়েছেন বিটুকে খবর দিতে। কিন্তু সেও এসে পৌঁছয়নি এখনও। সুমনা পরিস্থিতিটা ভালো বুঝছেন না।

ব্রহ্মকুমার ব্যস্তবাগীশ লোক। চোখ কপালে তুলেই বাইরের ঘর থেকে ধেয়ে এসে বললেন, কী হয়েছে কী? তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময় নেই।

শোনো, চেঁচামেচি কোরো না। বউমার ব্যথা উঠেছে।

ব্যথা।

প্রসবের ব্যথা। বাড়িতে ছেলেরা কেউ নেই। তুমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো এক্ষুনি।

কথাটা শুনেই ব্রহ্মকুমার চেঁচাতে লাগলেন, কোথায় থাকে সব নবাব—নন্দনেরা? কোথায় যায়? এটা কী হোটেলখানা নাকি? এখন হার্ট ফেল—টেল করলে কে দায়ী হবে?

সুমনা স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে তাঁকে ভস্ম করে দেওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করে বললেন, ষাঁড়ের মতো চেঁচালে বউমার আরও শরীর খারাপ হবে, খেয়াল আছে?

ব্রহ্মকুমারও স্ত্রীর দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, তোমরা আমাকে পেয়েছটা কী বলতে পারো? এক ঘর মক্কেল ছেড়ে এখন আমি ছুটব গাড়ি আনতে?

তাতে দোষটা কী হল? মক্কেলরা কেউ পালাবে না। সারাজীবন কেবল মক্কেল—মক্কেল করে গলা শুকোলেই তো হবে না। সংসারে আরও পাঁচজনের প্রতি কর্তব্যও আছে।

ব্রহ্মকুমার আদালতে সওয়াল—জবাব মারফত রোজই বিস্তর ঝগড়া কাজিয়া করে থাকেন। বস্তুতপক্ষে মামলা মানেই তো দু'পক্ষের ঝগড়া। সেই ঝগড়ায় তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জেতেনও। কিন্তু মুশকিল হল সংসারের ঝগড়ায় তিনি কিছুতেই এঁটে ওঠেন না। সেইজন্য পারতপক্ষে সুমনার সঙ্গে তিনি বিতর্ক এড়িয়ে চলেন। কিন্তু ঝগড়া না করলেও রোষকষায়িত লোচনে স্ত্রীকে বিদ্ধ করতে ছাড়েন না ব্রহ্মকুমার। বলেন, কর্তব্য কেবল এক আমারই? বাঃ, বেশ।

সুমনা ব্রহ্মকুমারের রোষদৃষ্টিকে একটুও গ্রাহ্য না করে বললেন, সংসারের দায়—দায়িত্ব আমি ঘাড়ে না নিলে বাইরের ঘরে বসে ঠ্যাং নাচানো বেরিয়ে যেত। কিন্তু এখন এত কথার সময় নেই, ঘরে সিরিয়াস রুগি। দয়া করে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো।

ব্রহ্মকুমার বিরক্তির গলায় বলেন, গৌর কন্ট্রাক্টারকে তো বলাই আছে তার গাড়িটা দরকার হতে পারে। কাউকে দিয়ে তাকে একটু খবর পাঠালেই তো হয়।

সুমনা মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। একটু রাঙাও হলেন কি? গলাটা এক পরদা নেমে গেল। বললেন, গৌর তোমার পেয়ারের লোক, তুমি খবর পাঠাও গে। কিন্তু সে থাকে সেই এক নম্বর ডাব গ্রামে, মাইল তিনেক দূর! অতদূর গিয়ে গাড়ি আনতে আনতে ভালোমন্দ একটা কিছু না হয়ে যায়!

তা হলে?

তা হলে কী সেটা জানার জন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠালাম। একটু বেরিয়ে দেখো কাছাকাছি কারও গাড়ি পাও কি না। রিকশায় নিয়ে যেতে আমার সাহস হয় না। তোমার মক্কেলদের কারও গাড়ি—টাড়ি নেই?

ব্রহ্মকুমার হঠাৎ উদ্ভাসিত হন। তাই তো! জলপাইগুড়ির মক্কেলটি যতদূর মনে হয় গাড়ি করেই এসেছে। লোকটা এখনও চলে যায়নি বোধহয়।

দেখছি।—বলে ব্যস্তসমস্ত ব্রহ্মকুমার বেরিয়ে গেলেন। জলপাইগুড়ির মক্কেল বারান্দায় মুহুরির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় এনগেজমেন্ট বুক—এ মামলার তারিখ লেখাচ্ছে। সেরকমই কথা।

লোকটার নাম মনে পড়ল না। ব্রহ্মকুমার বললেন, ওহে—

লোকটা ফিরে তাকাল, আমাকে বলছেন?

ইয়ে, আপনার গাড়ি আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই তো।

ব্রহ্মকুমার দেখলেন, নতুন ঝকমকে অ্যামব্যাসাডার।

ইয়ে, আমার পুত্রবধূকে একটু নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে। সিরিয়াস অবস্থা।

মক্কেল ব্যস্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৌঁছে দিচ্ছি। এ আর বেশি কী কথা?

আড়াল থেকে সুমনা দৃশ্যটা দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ি পালটাতে গেলেন। সোমার ঘরে উঁকি মেরে দেখলেন, বউটা নিঝুম হয়ে পড়ে আছে।

বউমা।

উঁ?

চলো। একটু তৈরি হয়ে নাও। গাড়ি জোগাড় হয়েছে।

একটু কাতর শব্দ করে সোমা উঠল।

কেমন লাগছে বউমা?

বুকের ভিতরটায় ভীষণ ভার।

শাড়ি কী আমি পরিয়ে দেব?

না। পারব।

তা হলে আর দেরি কোরো না। আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

ব্রহ্মকুমার আবার গিয়ে বাইরের ঘরে বসেছেন। সুমনা একখানা পাট—ভাঙা শাড়ি পরতে পরতে স্বামীর কথা ভাবছিলেন। যা রোজগার তাতে একটা গাড়ি কেনা কিছু শক্ত নয় ব্রহ্মকুমারের পক্ষে। বাড়িতে একটা টেলিফোনও বড্ড দরকার। কিন্তু এসব প্রয়োজনের কথা ব্রহ্মকুমার কানে তোলেন না। কথা উঠলেই বলেন, ওসব স্ট্যাটাস সিম্বল—এ আমার দরকার নেই।

টাকাপয়সা অবিশ্যি সবই সুমনার হেফাজতে। কিনলে তিনিই কিনতে পারেন। কিন্তু নিজেকে ততটা স্বাধীন বলে আজও ভাবতে শেখেননি সুমনা। ব্রহ্মকুমারের মত না হলে সেটা সম্ভব নয়। শুধু গত বছর অনেক বলে কয়ে মত আদায় করে একটা ফ্রিজ কেনা সম্ভব হয়েছে মাত্র। আর গ্যাসের উনুন। সংসার এখনও ব্রহ্মকুমারের আয়েই চলে। বড় দুই ছেলে রোজগার করে বটে কিন্তু এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য রকমের টাকা সংসারে দেয় না। না দিলে সুমনা কীই—বা করতে পারেন?

শাড়ি পরা হয়ে গেল। সোমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, বউমা হল?

হয়ে এল মা। ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছি।

ঠাকুর প্রণাম করে যাও এসে। মক্কেলের গাড়ি, বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা চলবে না।

জনার্দনকে ডেকে বললেন, রান্না অর্ধেক করে রেখে যাচ্ছি। আজ বাবুর খাওয়ার খুব কষ্ট হবে। মাছভাজা আর ডাল দিয়ে ভাত দিস। গাছ থেকে একটা গন্ধলেবু এনে কেটে দিস। দেখিস, সর্দারি করে আবার গ্যাস জ্বালাতে যাবি না খবরদার। আর একবার সিলিন্ডার বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলি মনে আছে তো!

তুমি এ বেলা ফিরবে না মা?

ফিরব বইকি। পৌঁছে দিয়েই ফিরব। সব একটু দেখেশুনে রাখিস বাবা। আর বিটু ফিরলে বলিস তখনই যেন নার্সিং হোমে চলে যায়।

নতুন গাড়িটার অভ্যন্তরে যখন উঠে বসলেন সুমনা তখন তাঁর একটু হিংসে হল। এরকম একখানা গাড়ি ব্রহ্মকুমার অনায়াসেই কিনতে পারেন। কিন্তু লোকটার বড় জেদ, বড় গোঁ। যেন গাড়ি কিনলেই ট্র্যাডিশন ভাঙা হবে, বড়লোকি দেখানো হবে আর ছেলেদের অধঃপাতে যাওয়ার রাস্তা করে দেওয়া হবে।

বিটুকে দোকান থেকে তুলে নেবেন কি না একবার ভাবলেন সুমনা। কিন্তু ভেবে মনে হল, কাজটা যুক্তিযুক্ত হবে না। বউয়ের প্রতি বিটুর বিশেষ দায়িত্ববোধ আছে বলে সুমনার মনে হয় না। তা ছাড়া ও সঙ্গে গিয়ে কীই—বা করবে? সোমার সঙ্গে বিটুর বিয়ে দেওয়াটা হয়তো ভুলই হয়েছে। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় আর পাত্রী খুঁজেও পাওয়া গেল না। বিয়ে না দিয়েও উপায় ছিল না। বেশিরভাগ পরিবারেই একটু—আধটু কেলেংকারি থাকে। বড় বউমা মঞ্জরী আর মেজো ছেলে বিটু এই সাদামাটা পরিবারে সেই দাগটাই দেগে দিতে গিয়েছিল প্রায়। মন্টুর সঙ্গে মঞ্জরীর সবে বিয়ে হয়েছে তখন। বছর না ঘুরতেই দেওর আর বউদির সম্পর্কটা বড্ড বেশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে পড়েছিল। মন্টু চাকরি করত মালদায় স্টেট ব্যাংকে। আসা—যাওয়া ছিল। তবে টানা থাকত না। বউ নিয়ে যাওয়ারও খুব আগ্রহ ছিল না। মন্টু একটু অন্যরকম। সাধু সাধু ভাব। অবসর পেলেই ধর্মের বই পড়ে। সাধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। মঠে মন্দিরে যায়। একা একা গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারবদ্রী, কাশী, গয়া ঘুরে বেড়ায়। ওই ছেলের বউ যদি এদিক—ওদিক করে তবে আর সুমনা দোষ দেবেন কাকে? আর বিটু তখন দুর্দান্ত পুরুষ। ব্যাডমিন্টনে জেলার চ্যাম্পিয়ন। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানশিপে খেলে রানার্স আপ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া চোখা, চালাক, ছলবলে যুবক। সিনেমায় নামবার জন্যও তোড়জোড় করছিল। এ ছেলের সঙ্গে যে—কোনো যুবতীর ঢলাঢলি খুব স্বাভাবিক। দোষের মধ্যে বিটুটার লেখাপড়া তেমন এগোয়নি। বি এসসি—টা কিছুতেই পাশ করতে পারল না। তাতেও বাধেনি। একদিন মঞ্জরীর কোলে মাথা রেখে বুঝি শুয়ে ছিল সন্ধেবেলায়। অন্ধকার ঘরে ফোঁপানির শব্দ পেয়ে জানালার ফোকর দিয়ে দৃশ্যটা দেখে ফেলে যূথী। যূথী এসে মাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দৃশ্যটা দেখায়। অন্ধকার বলে তেমন কিছু দেখতে পাননি সুমনা। তবে কিছু গাঢ় কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন।

বিটুর একটা অসাধারণ গুণ আছে। মাতৃভক্তি। পারতপক্ষেও কখনও সে সুমনার অবাধ্য হয়নি কখনও। খুব শিশুবেলা থেকেই সে মায়ের ন্যাওটা। সুমনা বিপদ দেখে ছেলের সেই দুর্বলতা কাজে লাগালেন। বিয়ের প্রস্তাবে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল বিটু। রাগারাগিও করেছিল। কিন্তু সুমনা নাওয়া—খাওয়া ছেড়ে শয্যা নেওয়ায় আর বেশি প্রতিরোধ করতে পারেনি। হয়তো সে বুঝেছিল যে, বউদির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা বাড়ির লোকে জানে। মত দিতেই পাত্রী খোঁজা হয়েছিল ঝড়ের বেগে। সোমা চা—বাগানের মেয়ে। মা—বাবা নেই, মামার কাছে অনাদরে মানুষ। বড় মায়া হয়েছিল মেয়েটাকে দেখে।

মায়া এখনও একটু আছে। বিটুটা বড় অনাদর করে ওকে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বিয়ে, তা সফল হয়েছে সন্দেহ নেই। মঞ্জরী আর বিটু একই বাড়িতে আজও বাস করে। কিন্তু দুজনেই পরস্পরের প্রতি একেবারেই উদাসীন। বিটুর ব্যাডমিন্টন গেছে, দুরন্তপনা গেছে, স্মার্টনেস গেছে। বিয়ের পর থেকেই কেমন যেন আনমনা, কেমন যেন ছন্নছাড়া ভাব ওর। সেই বিটুকে আর চেনা যায় না। ব্রহ্মকুমার একটা দোকান করে দিয়েছেন, বিটু এখন সেই দোকান নিয়েই পড়ে থাকে।

সোমা খুব ক্ষীণ স্বরে কোঁকাচ্ছিল। সুমনা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, খুব কষ্ট হচ্ছে?

বুকটা কেমন করছে মা।

ব্যথাটা?

তেমন নয়। শুধু চিনচিন করছে।

ব্রহ্মকুমারের মক্কেল সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসা। মুখ ঘুরিয়ে তাদের দিকে একবার চেয়ে বলল, মিত্র সাহেবের নার্সিং হোম তো! এসে গেছি।

সুমনা বউমাকে নিয়ে নামলেন।

৫

স্টকে অনেক জিনিস নেই। আনতে হবে। দুটো বেবি ফুড, একটা সিরিয়াল, দু'রকম হোল মিল্ক, দু'ধরনের ক্রিম, একটা বিশেষ ব্র্যান্ডের ব্লেড, আরও অনেকরকম জিনিস। চালু জিনিস টক করে বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু আনাতে গেলেই দেখা যায়, প্রতি পিস জিনিসের ওপর কিছু দাম চড়িয়ে বসে আছে পাইকার। আজকাল জিনিসের দাম বাড়ে মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে। ম্যানুফ্যাকচারার বা পাইকারকে পাবলিক ফেস করতে হয় না। খুচরো খদ্দেরদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয় রোজ এই তার মতো খুচরো দোকানদারদের।

এই তো গত সপ্তাহে তিনটাকা ডজন দরে ব্লেড নিলাম। এর মধ্যেই সাড়ে তিন!

কোম্পানি দাম বাড়ালে আমরা কী করব বলুন?

কই সম্পদ স্টোরে তো বাড়েনি! এই তো কালই কলেজের নয়নবাবু তিন টাকা দরে কিনে নিয়ে গেলেন।

কিংবা

মশাই কী ব্ল্যাক করছেন নাকি?

কেন বলুন তো!

বেবি ফুডটার তো টিনের গায়েই লেখা আছে, রিটেল প্রাইস নট টু একসিড—

লেখা তো থাকেই। আমরাও জানি। কিন্তু হোলসেলার যদি বেশি নেয়—

না মশাই, এটা একটা কথার কথাই নয়। এ সোজা ব্ল্যাক।

সারাদিনই বিটু এবং বিটুর মতো দোকানদারকে মুখ বাজিয়ে যেতে হয়। কতকগুলো স্টক কথা আছে। সেগুলোয় কাজ না হলে মিনমিন করতে হয়। পুরোনো স্টক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ একরকম। নতুন স্টক আনলেই হাঙ্গামা। লোকে বোঝে না একটা চালু দোকানের দোকানদার অনর্থক বেশি দাম চেয়ে নাম খারাপ করতে চায় না। তাই বিটুকে ফের মুখের তুবড়ি ছোটাতে হয়।

বিটু কী ক্লান্তি বোধ করে? হতাশা? বিরক্তি?

না। বিটু জানে সে আর কোনওদিনই ভারতের এক নম্বর ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হতে পারবে না। বিটু জানে সে আর কখনও হতে পারবে না কোনো সিনেমার নায়ক। বিটু জানে পৃথিবীতে ভালোবাসা বলে আর কিছু নেই। আছে শুধু অন্তহীন কেনা বেচা। আছে লাভ লোকসান নামক কিছু উত্তেজনা।

প্রবীর।

বলুন বিটুদা।

বিটঠলভাইয়ের আড়তে গিয়ে মালগুলো নিয়ে আয়। লিস্ট করে রেখেছি।

যাচ্ছি।

স্টক মিলিয়ে দেখেছিস তো! আর কিছু লাগবে?

এ সপ্তাহটা চলে যাবে। গ্লিসারিন সাবানটা কম আছে। নুডলসের প্যাকেট আর নেলপালিশটাও।

লিস্টে ওগুলোও লিখে নে। পরের সপ্তাহে দাম বাড়তে পারে। স্টক রাখা ভালো। আর সম্পদ স্টোর্সে ব্লেডের দামটা জেনে আসিস তো। তিন টাকা ডজন দিচ্ছে কী করে পৌনে তিন টাকায় কিনে?

ঠিক আছে।—বলে প্রবীর নামক উনিশ—কুড়ি বছরের দীন এবং বিনয়ী চেহারার ছেলেটি খুব নরম স্বরে বলে, একবার বাড়ি যাবেন না দাদা?

বাড়ি! কেন?

ঝিন্টু কী বলে গেল শোনেননি?

ঝিন্টু! ওঃ!

একবার যাবেন না?

এখন না। যাব'খন। তুই মালগুলো নিয়ে আয়।

দশটা বেজে গেছে। অফিস—কাছারি, স্কুল—কলেজ বসে গেছে। এই সময়টায় খদ্দের কিছু কম। গিন্নিবান্নি গোছের কয়েকজন খদ্দের আসতে পারে। তাদের সুখময়ই সামলাতে পারবে। দোকানটা আগের চেয়ে একটু বড় হওয়াতে এখন দুজন সেলসম্যান রাখতে হয়েছে বিটুকে। সুখময় নতুন। বয়স কম, একটু অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে দাম বলতে ভুল করে। ওজন করার হাতও পাকা নয়। তা ছাড়া বড্ড কামাই করে। ওর ভরসা বড় একটা করা উচিত নয়। তবে এ সময়টায় সুখময়ই সামলাতে পারবে।

বিটু সকালে দোকানে আসে বলে বাড়িতে খবরের কাগজ পড়ার সময় পায় না। তাই দোকানে সে একখানা করে কাগজ রাখে। শিলিগুড়িতে কলকাতার খবরের কাগজ আসে বিকেলের দিকে প্লেনে। কাজেই বিটুকে স্থানীয় দৈনিকটি রাখতে হয়। চার পৃষ্ঠার কাগজ তবে সবরকম খবরই থাকে একটু সংক্ষিপ্ত আকারে।

প্রথম পৃষ্ঠায় বিটুর পড়ার কিছু নেই। রাজনীতি, বক্তৃতা আর দুর্ঘটনার খবর। সে খোলে খেলার পৃষ্ঠায় ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশানাল চ্যাম্পিয়ানশিপে প্রকাশ পাড়ুকোন সেমি—ফাইনালে হেরে গেল।

এখন তার নিজেরই বিশ্বাস হয় না যে, অনেক দিন আগে জব্বলপুরে সে এই প্রকাশের সঙ্গে খেলেছিল। খুবই ভালো খেলেছিল সে। তবে স্ট্রেট সেটে হারতে হয়েছিল তাকে। কেন হেরেছিল তা হারের দিন বুঝতে পারেনি সে। নিজস্ব অ্যাটাকিং গেম খেলে সে অগ্নিবর্ষী সব স্ম্যাশ—এ মাটি কাঁপিয়ে দিয়েছিল সেদিন। পায়ের কাজও ছিল ভালো। প্লেস করেছিল নানা কোণে বুদ্ধি খাটিয়ে। কিন্তু মুশকিল হল প্রকাশ একটুও অ্যাটাকিং গেম খেলেনি, শুধু অনায়াস দক্ষতায় তার স্ম্যাশগুলো তুলে তুলে দিচ্ছিল। বারবার লম্বা মার মেরে তাকে ঠেলে দিচ্ছিল বেস লাইনে। স্ম্যাশ করে তার ফলো—আপ করতে গিয়ে বেদম হয়ে পড়ছিল বিটু। দ্বিতীয় গেমেই বুঝতে পেরেছিল তার বিরুদ্ধে খেলছে একটি রোবট। রোবট ক্লান্ত হয় না, ঘাম ঝরায় না, রোবটের খেলায় আছে নির্ভুল ধারাবাহিকতা। বিটু পারবে কেন? বহুদিন ধরে খেলাটা বিশ্লেষণ করে দেখেছে সে। আধুনিক ব্যাডমিন্টনে বা যে—কোনো খেলারই মূল কথা হল স্ট্যামিনা, ফিটনেস এবং কন্ট্রোল। প্রকাশের সঙ্গে, দীপু বা রমেন ঘোষ, পার্থ গাঙ্গুলি বা অরুণ ব্যানার্জি কার সঙ্গেই বা খেলেনি বিটু? বিভিন্ন টুর্নামেন্টে এক—আধজন অল ইন্ডিয়া খেলোয়াড়কে সে প্রায়ই পেয়ে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। খুব বড় অঘটন ঘটাতে না পারলেও এক—আধবার জিতেও গেছে। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের সেমি—ফাইনালে সে হারিয়েছিল তৎকালীন চ্যাম্পিয়নকে। ফাইনালে হেরে গেল উঠতি যে খেলোয়াড়ের কাছে সেই খেলোয়াড় টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

সুখময় এক কাপ চা এনে সামনে রাখল।

বিটু চায়ে একটা চুমুক দিয়ে প্রকাশের খবরটা আবার পড়ল।

বিদেশে সত্যজিৎ রায় যদি প্রাইজ পায়, রবিশংকর যদি বাহবা কুড়োয়, প্রকাশ পাড়ুকোন যদি জেতে, হকিতে ভারত সোনা আনে অলিম্পিক থেকে, ক্রিকেট যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারায় এবং গাভাসকার যদি ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙে একমাত্র তখনই নিজেকে কিছুক্ষণ ভারতীয় বলে মনে হয় বিটুর। আর কোনো সময়ে এটা হয় না।

এখনও হচ্ছিল না। প্রকাশ সেমি—ফাইনালে হেরে গেছে। হেরে তো বিটুও যেতে পারে। হারার জন্য তো প্রকাশকে পাঠানো হয়নি!

আরে আসুন ভটচায্যিদা! কী খবর?

একটা মশার ক্রিম দাও তো বিটু। তোমার খবর কী?

এই তো, চলে যাচ্ছে।

গেলেই ভালো। তোমার বউয়ের কি বাচ্চা—কাচ্চা হবে নাকি?

বিটু একটু বিনয়ের হাসি হাসল।

ভটচায ওডোমসের দাম দিতে দিতে বলে, এই তো প্রথম, না?

না। আগেও একবার ইয়ে হয়ে গেল।

আহা রে। সবই ভবিতব্য।

আপনার কলকাতা যাওয়ার একটা কথা শুনেছিলাম না?

আজই যাচ্ছি। আর সেইজন্যই তো ওডোমস কেনা। বুঝলে আজকাল ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে পর্যন্ত দারুণ মশার উৎপাত।

জানি। আগে ছিল ছারপোকা।

আজকাল মশা। কলকাতাতেও ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে মশা। আগে মফস্‌সলে মশা ছিল, কলকাতায় ছিল না। আজকাল উলটো। কেন জানো?

না।

গাঁয়ে—গঞ্জে ফসলের পোকা মারতে বিষ দেয়, তাতে মশাও সাফ হয়ে গেছে। কলকাতায় তো আর তা নেই। যে শালার বিয়েতে যাচ্ছি সে থাকে যাদবপুরে। সেখানে যে কী মশা, না দেখলে বিশ্বাস করবে না। গত পুজোয় গিয়েছিলাম, রোদে বসে দাড়ি কামাচ্ছি, দেখি পায়ের পাতায় একসঙ্গে সার দিয়ে দশ থেকে বারোটা মশা বসে ভোজ খাচ্ছে।

বিটু বিনয়ের সঙ্গে হাসল। আগড়ম বাগড়ম কথা দোকানিকে শুনতেই হয়। নিয়ম।

যাওয়ার সময় ভটচায বলে গেল, দেশে অ্যাডমিনস্ট্রেশন বলে আর কিছু নেই, বুঝলে। যা কন্ডিশন তৈরি হয়েছে তাতে মানুষ বেশিদিন টিকবে না। ওই মশা মাছিই থাকবে।

চায়ের তলানিটুকু গলায় ঢেলে বিটু আবার খবরের কাগজ খোলে। খেলার পাতা। বাংলা—বিহার রঞ্জি ট্রফি ম্যাচের খবর পড়তে থাকে। টিকটিক করে একটা কিছু নড়ে তার ভিতরে। ঝিন্টু খবর দিয়ে গেছে সোমার পেইন উঠেছে। তার একবার যাওয়াটা বোধহয় দরকার। কাজটা শক্তও নয় কিছু। রিকশায় গেলে তিন—চার মিনিট।

বিটু!

মফফসল শহরের এই এক দোষ। বেশির ভাগ লোকই চেনা। বিটু ব্যস্ত হয়ে বলে, আরে দুলুদি! আসুন! ময়নাগুড়ি থেকে কবে এলেন?

পরশু। তোর কী খবর? শুনলাম বউয়ের বাচ্চা হবে!

বিটুকে কথা বলে যেতে হয়। কী বলছে তা সবসময়ে বিটু বুঝতেও পারে না। অর্থহীন সংলাপ সম্পূর্ণ না ভেবে—চিন্তে চালিয়ে যায়। কিন্তু বলে খুব কনফিডেন্স নিয়ে। বাকযন্ত্রের এরকম অপব্যবহার বুঝি আর হয় না।

বিটু পরিষ্কার বুঝতে পারে, এই যারা আসে, কথা বলে, জিনিস কেনে তারা কেউ পুরনো বিটুকে মনে রাখেনি। যে বিটু একসময়ে প্রকাশ পাড়ুকোনের সঙ্গে খেলেছিল, যে বিটুর সিনেমায় নায়ক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরা বিটুকে চেনে কেবল দোকানদার বলে।

দুলুদি একখানা ক্রিমের টিউব কিনল। তারপর বলল, কালই চলে যাচ্ছি।

কালই? কেন ক'দিন থেকে যান না!

না রে। কর্তাকে তো জানিস। আমি ছাড়া চলে না।

বিটু খবরের কাগজটা ফের টেনে নেয়।

কিন্তু পড়তে পারে না। বারবারই টিকটিক করছে কী একটা। সোমা! সোমার পেইন উঠেছে। সেটা বড় কথা নয়। মেয়েদের তো বাচ্চা হয়েই থাকে।

তবে সোমার একটু বুকের দোষ আছে। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছিল। বাচ্চা হতে গিয়ে বিপদ ঘটতে পারে। তার কী একবার যাওয়া উচিত?

আজকাল গভীর একটা আলস্য এসেছে বিটুর। শরীরে নয়, মনে। কিছুই যেন তাকে চমকে দেয় না, নড়াতে পারে না। সংসারে যা—ই ঘটুক তার মনে একটুও বুজকুড়ি কাটে না কোনো ঘটনা। নিজের এই

নির্লিপ্ততা দেখে নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয় বিটু। দু'—তিন বছর আগেও যে—বিটু এ শহরে দাবড়ে বেড়াত তার সঙ্গে আজ এই বিটুর দেখা হলে কেউ কাউকে চিনতেই পারবে না।

৬

শাশুড়ির অসুখ, একটু দেখতে যাওয়া উচিত। কিন্তু মন্টু বুঝতে পারে না সে গিয়েই বা কী করবে। মঞ্জরী তাকে বারবার বলে গেছে বটে, অফিসের পরই সোজা গিয়ে মহানন্দার মোড় থেকে মিনিবাস ধরবে। ভুল যেন না হয়। মা তোমাকে দেখতে চেয়েছে।

শাশুড়ির বোধহয় শেষ অবস্থা। কিন্তু তিনি মন্টুকে দেখতে চান কেন সেটাই প্রশ্ন। ভয় অবশ্য তাঁর একটা আছে। জামাইয়ের বৈরাগ্যব্যাধির কথা তিনি জানেন। যদি জামাই কখনও সংসার ছেড়ে হিমালয়—টিমালয়ে লম্বা দেয় তো তাঁর মেয়েটির কী দশা হবে।

মন্টু তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি যে, এই বিশাল জীবজগতে হরেক প্রাণের নিত্যি নতুন খেলায় কোথায় একটি প্রাণ নিবে গেল, কোথায় আর—একটি জ্বলে উঠল তাতে জগতের ক্ষয়বৃদ্ধি নেই। যে একবার এই জগতের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে সে—ই জানে ব্যক্তিগত মৃত্যু কোনো ঘটনাই নয়। যেমন নয় বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী নাই বা হল মন্টু, যদি আজই অফিস থেকে ফেরার পথে সে অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় তা হলে কি দুনিয়া অচল হয়ে যাবে? না কি দিন কাটবে না মঞ্জরীর? পৃথিবীতে অপরিহার্য তো কেউ নয়।

উনি অবশ্য এসব খুবই মন দিয়ে শোনেন। আবেগে চোখের জল মুছে বলেন, তুমি বড় জ্ঞানী বাবা, বড় জ্ঞানী। তবে কী জানো, আমরা সংসারী মানুষ, তত্ত্ব দিয়ে সংসারীদের কি বিচার হয়?

মন্টু টের পায় বৈরাগ্য তো নয়ই, বরং সংসার এবং বিষয় তাকে এক মস্ত অজগরের মতো পাকে পাকে জড়াচ্ছে আরও। দেব না দেব না করেও অফিসারের পরীক্ষা দিয়েছিল মন্টু। এক চান্সে হয়ে গেল। মালদা থেকে সটান পাঠিয়ে দিল শিলিগুড়ি। মন্টুর ইচ্ছে ছিল, সংসার থেকে একটু দূরে থাকে। বিশেষ করে মঞ্জরীর কাছ থেকে। স্ত্রী—সঙ্গকে সে পাপ মনে করে না বটে, কিন্তু স্ত্রী সঙ্গে থাকা মানেই ধ্যান থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। ভ্যানর ভ্যানর ভ্যাজর ভ্যাজর নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিযোগ অনুযোগ নালিশ ও পরনিন্দা শুনতে শুনতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় সে। অবিরল তার ভিতরে এক রক্তক্ষয় হতে থাকে। শিলিগুড়িতে বদলি না হলে খুব ভালো হত। সে চেয়েছিল সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের বদলে এই বদলির চাকরি একরকম ভালো। সে নিজে রেঁধে খেত। একলা ঘরে বসে নিত্য পূজা পাঠ করে কাটিয়ে দিতে পারত। শিলিগুড়িতে আসতে হল বোধহয় কর্মফল কাটাতে।

বেলা সাড়ে দশটা বাজতে চলল। এখনও অফিসে হাজিরায় বিস্তর ফাঁক। অধিকাংশ কাউন্টার এবং টেবিলেই লোক নেই। আমানতকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। অধৈর্যের নানা শব্দ আসছে।

মন্টু একটু চিন্তিতভাবে চারদিকে তাকায়। ভারী অস্বস্তি বোধ করে। ধর্মের মধ্যে নানা কথা থাকে। সবই প্র্যাকটিক্যাল কথা। একটা হল, যথাসময়ে যথাবিহিত কর্তব্যটি করো। মন্টু এক মিনিটও দেরিতে অফিসে আসে না। ডিসিপ্লিন কথাটার মূলে আছে ডিসাইপেল কথাটা। শিষ্যত্ব। আগের দিনে গুরুগৃহে শিষ্যত্ব নিয়ে বহু কষ্টে শিখতে হত আত্মশাসন। এখন কে কাকে শেখায়, আর কেই বা শেখে!

মন্টুর পাশের টেবিলে টেলিফোন। বার সাতেক বাজার পর করচৌধুরী টেলিফোনটা তুলল। অনেক আগেই তুলতে পারত। বসে বসে খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল।

গাঙ্গুলি, আপনার ফোন।

মন্টু হাত বাড়িয়েই ফোনটা নাগালে পায়। শাশুড়ির কিছু হয়ে গেল নাকি?

মিত্র নার্সিং হোম থেকে বলছি। আপনার মা কথা বলবেন।

মা! কী হয়েছে মা?

সুমনার ঘাবড়ানো গলা পাওয়া গেল, মেজো বউমাকে ভরতি করে দিলাম।

কেন, পেইন উঠেছে নাকি?

হ্যাঁ, কিন্তু হার্টটাও বোধহয় ভালো না। ডাক্তার ই সি জি করাতে নিয়ে গেছে। একজন হার্ট স্পেশালিস্টকে খবর দেওয়া হয়েছে। একবার আসতে পারবি?

পারব। ঘণ্টাখানেক পরে গেলে হবে তো?

তা হবে। বিটুকে খবর দিয়ে দিয়ে আনতে পারিনি। পারলে তাকেও নিয়ে আসিস।

ঠিক আছে।

আমি তা হলে বাড়ি চলে যাই?

যাবে? যাও না।

তোর বাবাকে ভাতটুকু বেড়ে দিয়ে আসতে পারিনি। জনার্দন কী দিতে কী দেয়! ছেলেমানুষ।

হ্যাঁ হ্যাঁ চলে যাও। তোমার ওখানে আর কাজই বা কী?

তুই কিন্তু আসিস বাবা। ডাক্তারের কাছে অবস্থাটা একটু বুঝে যাস।

মন্টু ফোন রেখে দিল। মনটা একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল তার। সোমা মেয়েটিকে বড়ো স্নেহ করে সে। বড় দুঃখী মেয়ে। দুঃখীদের মুখে ভগবানের ছাপ থাকে। এ কথা ঠিক যে দুঃখ ব্যাপারটা মানুষ পছন্দ করে না। ধর্মের উদ্দেশ্যই হল দুঃখকে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু এমন কিছু দুঃখ আছে যা আনন্দের চেয়েও গভীর। যে দুঃখের ভিতর দিয়ে ভগবান ধরা দেন তা কি পরিত্যাগযোগ্য?

মন্টু সংসার—উদাসীন বটে, কিন্তু সোমা আর বিটুর সম্পর্কটা সে টের পায়। বিটুটা একদম অন্যরকম হয়ে গেছে। দোকান ছাড়া আর কোনো দিকেই মন নেই। বউটার প্রতি তার কোনোদিনই কোনো মনোযোগ নেই। অথচ মেয়েটা বিয়ের আগেও এক দুঃখের জীবন যাপন করে এসেছে। বিয়ের পরও তাই। কী যে হবে! এত অনাদরেই বুঝি মেয়েটার শরীর সারে না। ওই অনাদরই বুঝি জন্ম দিয়েছে দুরারোগ্য হৃদরোগের।

এক—একদিন সে সোমাকে উপনিষদ বোঝায় বা গীতা শোনায় এবং ব্যাখ্যা করে। মেয়েটা ভাশুরকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করে বটে কিন্তু এইসব ধর্মগ্রন্থ পাঠে তেমন আগ্রহ বোধ করে না। কেমন শক্ত হয়ে জোর করে বসে থাকে মাত্র।

ভাইয়ের বউ হলেও সোমাকে মা বলেই ডাকে মন্টু। বেশিরভাগ মহিলাকেই সে মাতৃ সম্বোধন করে। মা ডাকের মতো আর ডাক নেই। যে ডাকে তারও শুদ্ধি হয়, যে শোনে তারও শুদ্ধি হয়। একদিন সে সোমাকে বলল, মাগো, তোমার কি ধর্মে বিশ্বাস নেই?

সোমা অনেকক্ষণ চুপ করে গোঁজ হয়ে বসে থেকে বলল, ঠিক বুঝতে পারি না।

কেন মা? কোনটা শক্ত?

সবটাই ভীষণ শক্ত মনে হয়।

মন্টু মৃদু মৃদু মাথা নেড়ে বলে, ধর্মের মতো সহজ স্বাভাবিক আর কিছুই নয়। এ তো বাক্সে তুলে রাখার জিনিস না, এ নিত্য চর্চার ব্যাপার। যদি ধর্মকে জীবনের সব আচার আচরণের মধ্যে অনুবাদই না করা গেল তবে ধর্ম দিয়ে মানুষের কোনো লাভ নেই। ধর্ম একটা ফলিত জিনিস, একটা হওয়ার ব্যাপার। শুধু শুনলে শক্ত তো লাগবেই। কিন্তু যদি করে দেখো যদি চর্চা করো তাহলে দেখবে শ্বাস চলার মতো স্বাভাবিক।

সোমা তর্ক করেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করেছিল শুধু।

মেয়েটা তর্ক জানে না, ঝগড়া জানে না, কুচুটেপানা নেই, এক অবোধ ভীরু চাউনি আছে শুধু। মেয়েটাকে কেন যে বিটু অত অবহেলা করে! বিটু আর মঞ্জরীকে নিয়ে যে গুজবটা আছে তা সবই জানে মন্টু। যুথীর কাছে শুনেছে, মায়ের কাছেও খানিকটা। বাকিটা আন্দাজ করে নিতে তার কষ্ট হয়নি। কিন্তু মন্টু এমন এক মানসিক অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছে যেখানে ঈর্ষার জ্বলুনি নেই, রাগ নেই, দখলদারি নেই। সে ঘটনাটি শুনেই ওদের ক্ষমা করেছে। সে জানে কৃতকর্মের জন্য মানুষের অনুশোচনা না এলে বাইরের গঞ্জনা দিয়ে কর্মফল কাটে না।

মন্টু হাফ—ডে ছুটি চেয়ে একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে উঠে পড়ল। গিয়ে ঢুকল এজেন্ট কর্মকার সাহেবের ঘরে।

ছুটি! হঠাৎ ছুটি কেন গাঙ্গুলি?

একটু দরকার আছে। বাড়ির লোকের অসুখ।

কার? আপনার ওয়াইফের?

না, ভাইয়ের স্ত্রীর।

ভাই মানে বিটু তো? তার বউ তো আমাদের সোমা! তার আবার হল কী?

বাচ্চা হবে। হার্টটাও ভালো না।

আপনি জানেন না সোমাকে আমি এইটুকু থেকে দেখেছি। আমিও চা—বাগানের ছেলে তো। ওর মামা আর আমি বানারহাট স্কুলে পড়তাম। ওর মামা অবশ্য আমার চেয়ে বছর কয়েকের সিনিয়র।

তাই নাকি! বলেননি তো কখনও?

আপনি তো মশাই সদ্য বদলি হয়ে এলেন। আপনার পর আমি এসে জয়েন করেছি। বলার সুযোগ হয়নি বলে বলিনি। সোমার হার্টের অসুখ ছিল জানতাম না তো! অবশ্য হতেই পারে। যা অত্যাচার ওর ওপর করত।

মন্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। সোমার সঙ্গে যখন বিটুর সম্বন্ধ হচ্ছিল তখনকার একটি ঘটনা মন্টুর খুব মনে পড়ে। একদিন বিকেলের দিকে সোমার মামা এসেছেন বিয়ের কথাবার্তা বলতে। হঠাৎ জামার বোতাম খুলে পৈতেগাছা বের করে হাতে জড়িয়ে নিয়ে জোড়হাত করে কেঁদে ফেলে বলে উঠল, আমার ভাগনিটাকে সংসারের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করুন। এর বেশি আর কিছু বলার নেই আমার।

বড় কষ্ট হয়েছিল মন্টুর। নিজের স্ত্রীর কথা ভদ্রলোক ভেঙে বলেননি। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ওই ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

কর্মকার জরুরি কাজ সারতে সারতে বললেন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

মন্টু বসল।

কর্মকার কাগজপত্র সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, আপনি তো ধার্মিক মানুষ বলে সবাই বলে। আমার ছেলের কুষ্ঠিটা একদিন একটু বিচার করে দেবেন?

মন্টুর হাসি পেল। ধর্ম আর জ্যোতিষকে অনেকেই এক করে দেখে। অনেকে আবার ভাবে, ধর্ম মানেই অলৌকিক ঘটনাবলি। এই অজ্ঞতার বুঝি শেষ নেই। সে বলল, আমি জ্যোতিষচর্চা করিনি তো কখনও!

সে কী মশাই? জ্যোতিষ না জানলে ধর্ম করেন কীসের?

মন্টু একটু হাসল, ধর্ম আর কীই—বা করি বলুন? তবে জ্যোতিষের সঙ্গে ধর্মের তেমন কোনো যোগাযোগ আছে বলে জানি না। ও একটা আলাদা শাস্ত্র, খানিকটা বিজ্ঞান, খানিকটা অনুমান। অদৃষ্ট মানে যা দৃষ্ট নয়, যা অগোচর। আমার তো মনে হয় সৎ কাজ করে গেলে তার ফল পাওয়া যায়ই। সৎকর্মীর কখনও অমঙ্গল হয় না। একদিন আগে আর পাছে।

কুষ্ঠি বলে কিছু বিশ্বাস করেন না?

করি। তবে প্রাচীন শাস্ত্রে যে ক'টা গ্রহের উল্লেখ আছে তা ছাড়াও আরও গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে পরে। সুতরাং জ্যোতিষ শাস্ত্র পূর্ণাঙ্গ নয়।

যাঃ, আপনি যে একেবারে জল ঢেলে দিলেন মশাই। আমি ভাবছিলাম একদিন আপনাকে নিয়ে জমিয়ে বসব কুষ্টি—ফুষ্টি পেতে।

না, আমি ওসব তেমন জানি না।

ঠিক আছে। তা হলে একদিন ধর্ম আলোচনাই শোনান আমাদের। আমার বাড়িতে। আমার স্ত্রী আবার ভীষণ সন্তোষী মা'র ভক্ত।

আজকাল অনেকেই।

হুজুগ, না?

তা একরকম বলা যায়।

শুক্রবারে তো মশাই উপোস—টুপোস করে সে এক পেল্লায় কাণ্ড বাধিয়ে বসে।

মন্টু বিনীতভাবে একটু হাসল।

কর্মকার মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি চলে যান। সোমা কি নার্সিং হোম—এ আছে?

হ্যাঁ। মিত্র নার্সিং হোম—এ।

বিকেলের দিকে একবার যাব'খন।

৭

ড্রেনের ওপর বাঁশের চ্যাটাইয়ের সাঁকোটা ঝিন্টুর খুব অদ্ভুত লাগে। একটু উঁচু রাস্তা থেকে এবড়ো খেবড়ো জমি নেমে গেছে। তারপরই মস্ত ড্রেন। তার ওপর সাঁকো। যখন নতুন ছিল একরকম। এখন জরাজীর্ণ। বাঁধন খুলে গেছে, বাচ্চা ছেলেরা বাঁখারি টেনে বের করে নিয়ে খেলা করেছে, সাঁকোটার ওপর এখন বিপজ্জনক গর্ত। সাইকেলে পার হওয়া খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু ঝিন্টুকে সেকথা কে বোঝাবে? সে ওই উঁচু রাস্তা থেকে সাইকেলে গড়িয়ে প্রচণ্ড স্পিডে নেমে আসে। ধুলো উড়িয়ে, মচাক মচাক শব্দ তুলে সাঁকোটা পার হয় প্রায়ই।

পর্ণা রাগ করে, খুব বাহাদুরি, না! একদিন যখন উলটে পড়বে তখন তো প্রেস্টিজ পাংচারড।

সকলেরই যেমন থাকে তেমনি ঝিন্টুরও একজন আছে। পর্ণা। খুব ডাঁটিয়াল মেয়ে। কাউকে পাত্তা দিত না এতকাল। ঝিন্টুর সঙ্গেই প্রথম। তবে ডাঁটিয়াল হলেও পর্ণারা গরিব। বেশ গরিব। শহরের একটু বাইরে গরিবদের পাড়ায় সরে এসে বাড়ি করতে হয়েছে ওর বাবাকে। বাড়িটাও তেমন দেখনসই নয়। পাকা ঘর, টিনের চাল। পর্ণার বাবা যে কী করে তা বলা মুশকিল। সোজা কথায় বলা যায় ধান্দাবাজ। যেখানেই কোনো কাজ কারবার হচ্ছে সেখানেই গিয়ে ঢুঁ মারা ভদ্রলোকের স্বভাব। এই ধান্দাতেই সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তার মধ্যেই দেখা যায় জ্যোতিষচর্চা করছেন, হোমিয়োপ্যাথি করছেন, বাড়ির দালালি করছেন।

পর্ণা ঝিন্টুর চেয়ে নিচুতে পড়ে। মুখখানায় শ্রী আছে। চোখ দু'খানা ভারী মায়াবী। ঝিন্টুর বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল ওকে। আজও লাগে। তা বলে যে পর্ণার সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধতে হবে এমন নয়। ঝিন্টুর একটু আপত্তি আছে পর্ণার বাবাকে নিয়ে। ফোর টুয়েন্টি শ্বশুর তার পছন্দ নয়। তার ওপর পর্ণারা কায়স্থ। অন্য জাতের বউ বাড়িতে নিয়ে তুললে তুলকালাম হবে। তাই ঝিন্টু ওসব ভাবে না। ভাববার দরকার নেই। তার বিয়ে এখনও ঢের দেরি।

পর্ণাদের বারান্দায় পা ঠেকিয়ে সাইকেল দাঁড় করিয়ে ঘন ঘন দু'বার ঘন্টি দিল ঝন্টু। পর্ণা আজ কলেজে যাবে না, কথা ছিল।

পরদা সরিয়েই পর্ণা বলল, এই! মাংস খাবে?

কীসের মাংস?

আহা! কীসের আবার, খাসির। আমি রাঁধছি।

ওরে বাবা। তুমি রাঁধছ। তার মানে খাসিটার মরেও সুখ নেই।

ইয়ারকি কোরো না। বোসো, আসছি।

ঝিন্টু ঘরে ঢুকে চারদিকে রোজকার মতো চেয়ে দেখল। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না বলে একটা উদ্ভট প্রবাদ আছে। প্রবাদটার অবশ্য কোনো মানে হয় না। ঝিন্টুর তো মনে হয় প্রচুর শাক দিয়ে একটুকরো মাছ অনায়াসেই ঢাকা যায়। ড্যাম ইজি। তবু পর্ণাদের এই ঘরে ঢুকলে তার প্রবাদটা মনে পড়বেই। কারণ এই ঘরে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার একটা প্রাণান্তকর প্রয়াস তার চোখে পড়ে। দেয়াল থেকে বেশি বালি মেশানো পলকা পলেস্তারা খসে যাচ্ছে, চৌকাঠের কাঠ ফাটছে, জানালা দরজার রং চটে যাচ্ছে, তবু বাঁধানো

এমব্রয়ডারি ঝোলে দেয়ালে, লেস লাগানো ঢাকনায় ঢাকা হয় সস্তার টেবিল, নড়বড়ে চৌকির বিছানায় বেশ ঝকঝকে বেডকভার পাতা। এলেবেলে একটা কাচ বসানো আলমারিতে গুচ্ছের মাটির পুতুল। এসবই ঝিন্টু একটু বাঁকা চোখে এবং সকৌতুকে লক্ষ করে। গরিবদের ঘরে দেখা যায় পরদাটা বাহারি হবেই। পর্ণাদেরও তা—ই। ভারী উজ্জ্বল সব উদ্ভট ফুলছাপা পরদা ঝুলছে।

পর্ণা নয়, ঘরে ঢুকলেন ওর ফোর টুয়েন্টি বাবা। হাতে ঘটিভরা জল, পরনে ভেজা গামছা, চোখে ধান্দাবাজের চাউনি।

এই যে, বোসো বোসো। পর্ণা বোধহয় রান্নাঘরে।

দেখা হয়েছে।

হয়েছে? বাঃ।

ভদ্রলোক ঘটিটা ঘরের কোণে রাখলেন। কাঁধ থেকে নিংড়ানো ধুতিটা চট করে বারান্দার তারে মেলে দিয়ে একটা লুঙ্গি গলিয়ে ফের ঘরে ঢুকে গিট মারতে মারতে বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে সেদিন সারদা ক্লথ হাউসে দেখা। তুমি নাকি ওয়ার্ল্ড ট্যুরে যাচ্ছো!

ইচ্ছা আছে।

বেশ বেশ। সাইকেলে গেলে বোধহয় পাসপোর্ট লাগে না, না?

লাগে।

পৃথিবীটা খুব বড়। বিশাল। যাও, দেখে এসো। আমাদের লাইফে অ্যাডভেঞ্চার বলে তো কিছু নেই। ওনলি টু পাইস। আচ্ছা, বিটুর বউয়ের নাকি হার্টের কীসব ট্রাবল শুনছিলাম!

হ্যাঁ।

এদিকে তো আবার প্রেগন্যান্সি। বড় মুশকিল। ভেরি ডেলিকেট কেস। আমি একটা ওষুধ রেখেছি বেছে। নিয়ে যাবে নাকি? প্রসবের ব্যথা উঠলেই দিতে হবে।

উঠেছে।

উঠেছে? সর্বনাশ! কবে?

আজ সকালে। এতক্ষণে বোধহয় নার্সিং হোম—এ নিয়েও গেছে।

ইস পালসেটিলা থার্টিটা সকালেই পড়া উচিত ছিল। একেবারে পাকা আমের আঁটির মতো প্রসব হয়ে যেত। নার্সিং হোম—এ কি হোমিয়োপ্যাথি চলবে?

ঝিন্টু জানে লোকটা ধূর্ত। সবাই জানে। বউদির জন্য মা নিশ্চয়ই ওর কাছে ওষুধ চায়নি। কিন্তু ধান্দাবাজটা নিজেই একটা যোগসূত্র খুঁজছে। কাছে ঘেঁষতে চাইছে। এরকম শ্বশুর হলে ঝিন্টুকে আত্মহত্যা করতে হবে।

ঝিন্টু পা নাচিয়ে বলল, হোমিয়োপ্যাথি একটা বোগাস জিনিস।

লোকটা চটল না। দেয়ালের গায়ে লটকানো কাঠের ফ্রেমের মধ্যে তেড়াবেঁকা আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নির্বিকার মুখে বলল, হোমিয়োপ্যাথি হল পরমাণু তত্ত্ব। তোমরা অ্যাটমিক এজ—এর ছেলে হয়ে পরমাণুর শক্তি মানো না?

পরমাণুর সঙ্গে হোমিয়োপ্যাথির কোনো মিল নেই। পরমাণু একটা এনার্জি আর হোমিয়োপ্যাথি একটা ধাপ্পাবাজি।

পর্ণার বাবা যে চটবেন না তা ঝিন্টু জানে। এইসব ধান্দাবাজরা সহজে চটে না। চটলে এদের চলে না। তা ছাড়া চটবেই বা কেন, এর তো কোনো আদর্শবোধ নেই, ব্যক্তিত্ব নেই।

পর্ণার বাবা হাতের মাদুলিটা সেট করে নিয়ে বলল, অনেকেই বলে বটে, তারা জানে না। জিনিসটা জানলেই তবে বোঝা যায়—

এই ঝিন্টু, চলে যাওনি তো?— বলতে বলতে পর্ণা ঘরে ঢুকল। বাবাকে দেখেও বিশেষ গ্রাহ্য করল না। হাতে একটা ছোট প্লেট। তাতে ধোঁয়া—ওঠা অনেকটা মাংস।

ঝিন্টুর ভারী কষ্ট হল দেখে। অত মাংস সে এমনিতেই খাবে না। কিন্তু অতটা নিয়ে এসেছে তাও চক্ষুলজ্জাবশে। মাংসের কেজি এখন বাইশ বা চব্বিশ টাকার কম নয়। সম্ভবত পর্ণাদের বাড়িতে পাঁচশো গ্রামের বেশি আসেনি। ওদের ফ্যামিলি মেম্বার তো কম নয়। তবু সেই টানটান পরিমাণ থেকে যতটা পারে তুলে এনেছে শুধু গরিব বলে প্রমাণিত না হওয়ার জন্যই।

ঝিন্টু মাথা নেড়ে বলল, মাংস খেয়েই কাল রাত থেকে পেট আপসেট। দেখলেই গা শিরশির করে নিয়ে যাও সামনে থেকে।

পর্ণা ফ্যাকাসে হয়ে বলে, খাবে না? এ মা!

কী বললাম তা হলে? খাওয়ার উপায় নেই। তবে গন্ধটা দারুণ ছেড়েছে। রিমার্কেবল। ঘ্রাণেই অর্ধভোজন হয়ে গেল।

ইস দেখো তো!

ফোর টুয়েন্টিটা আর দাঁড়াল না। চট করে ভিতরবাড়িতে সেঁধিয়ে গেল।

পর্ণা বলল, তা হলে রেখে আসি?

প্লিজ রেখে এসো।

কত কষ্ট করে করলাম! খেলে না।

আহা, যদি তেমন কপাল হয় তবে তোমার রান্নাই তো হোল লাইফ খেতে হবে।

কী আমার সুখের কথা রে! হোল লাইফ ওর জন্য রাঁধতে হবে! ইঃ বয়ে গেছে।

আর আমাকে যে সে রান্না কষ্ট করে খেতেও হবে সেটাও কি কম কথা?

পর্ণা মাংস রেখে আসতে গেল। একটু বাদে আঁচলে মুখের তেলঘাম মুছতে মুছতে ঘরে এসে বলল, বিটুদার বউয়ের নাকি পেন উঠেছে? বাবা বলছিল।

তোমার বাবাটা পর্ণা, মাইরি একটা ফোর টুয়েন্টি।

অ্যাই! ভ্যাট ওসব বলতে নেই।

আমাকে হোমিয়োপ্যাথি বোঝাচ্ছিল।

তা বোঝাক না। শুনে গেলেই তো হয়। কম—জানা হোমিয়োপ্যাথরা একটু বেশি বকবক করেই।

ঝিন্টু হেসে ফেলল। বলল, তা বটে।

তোমার মেজো বউদির চোখ দু'খানা কিন্তু ফ্যান্টা।

বউদিটা খুব আনহ্যাপি।

শুনেছি। বিটুদা নাকি একটু নেগলেক্ট করে।

এ শহরে কারও কোনো সিক্রেট থাকে না কেন বলো তো! সবাই সকলের ঘরের কথা জানে!

সোমা বউদির কথা তুমিই বলেছ আমাকে মশাই।

কবে?

একদিন সাইকেলের রডে আমাকে বসিয়ে আনছিলে তিলক ময়দানে ফাংশনের পর। রিকশা পাওয়া যায়নি সেদিন। মনে আছে?

ওঃ, মে বি।

তখন তোমার রডওলা সাইকেলটা ছিল। পুরোনোটা।

একটু মাথা নাড়ল ঝিন্টু। চোখের সামনে ঝক করে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য। মহারাষ্ট্রের এক অখ্যাত অজ্ঞাত জায়গায় রাস্তার ধারে আগাছার জঙ্গলে সাইকেলটা আজও কি পড়ে আছে? জং ধরছে তাতে? মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ধীরে ধীরে?

মনটা ধীরে ধীরে বিষণ্ন হয়ে গেল। ঝিন্টু উঠে বলল, চলি পর্ণা।

কোথায় যাচ্ছ এখনই?

যাই একটু শহরটা টহল দিই গে।
এত টহল দাও কেন বলো তো! সাইকেল যে তোমার শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেল। দু'চোখে দেখতে পারি না তোমার সাইকেল।
ওয়ার্ল্ড ট্যুর করে ফিরে এলে যখন খবরের কাগজে নাম বেরোবে তখন বুঝবে সাইকেলের মহিমা।
সাইকেল আমার সতীন।
হাসতে হাসতে ঝিন্টু উঠল।
বাইরে তো ঘরের অবরোধ নেই। অবারিত পৃথিবী। উত্তরে ওই দেখা যায় পৃথিবীর উত্তুঙ্গ ঢেউ। হিমালয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝকঝক করে জ্বলছে রোদে। পাহাড় ঝিন্টুকে ডাকে। তাকে ডাক পাঠায় সমুদ্র। জঙ্গল। মাঠ। প্রান্তর। দেশ ও বিদেশ। সাইকেল তাকে ডেকে নিয়ে যাবে দূর দূরান্তে। একদিন খুব বেশি বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগেই সে নাগপুরের কাছে সেই জায়গাটায় যাবে। খুঁজবে। বহু খুঁজতে হবে তাকে। তবু খুঁজে দেখবে তার পুরনো সাইকেলখানা তখনও সেখানে পড়ে আছে কি না।
দুঃসাহস ছাড়া কেউ এভাবে বাঁশের চ্যাটাইয়ের সাঁকো দ্বিতীয়বার প্রবল গতিতে পার হয় না। তারপর এক দুরূহ অসম্ভব চড়াই ভেঙে খানাখন্দ পার হয়ে সে উঠে আসবে রাস্তায়। ঝিন্টুকে শিলিগুড়ির লোকেরা যে সাইকেল জাগলার বলে, তা এমনিতে নয়। রোজ এইভাবেই সাইকেলে এই পথটুকু নামে এবং ওঠে ঝিন্টু। লোকে অবাক মানে। কিন্তু তারা দেখেনি, ঝিন্টু কলেজের পাঁচ—সাতটা সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় উঠে যেতে পারে সাইকেলে। এক—দেড় ঘণ্টা অনায়াসে সাইকেল স্থির রেখে বসে থাকতে পারে সিটে। গোলপোস্টের ক্রসবারের ওপর সাইকেল চালিয়ে লোককে তাক লাগিয়েছে ঝিন্টু। চালিয়েছে তারের ওপর। সাইকেল তার অঙ্গীভূত স্বাভাবিক, সহজাত। পৃথিবীতে সাইকেল আবিষ্কার না হলে ঝিন্টু বোধহয় জন্মগ্রহণই করত না।
পিছনের চাকায় একটু হাওয়া কম আছে। কাঞ্চার দোকানে হাওয়া ভরে নিল সে।
পাম্প করতে করতেই সে রিকশায় আর—একজন ফোর টুয়েন্টিকে যেতে দেখল। ধর্ম—গেঁড়ে, ধান্দাবাজ, পুরুষত্বহীন। লোকটা তার বড়দা মন্টু। ছেলেবেলা থেকেই ঝিন্টু শুনে আসছে তার বড়দার মধ্যে নাকি বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রকট, একদিন, লোকটা নাকি সাধু হয়ে যাবে। আজও হয়নি, আজও হব—হব করছে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, ভালো চাকরি, ব্যাংক ব্যালান্স, শরীরে সুখের মেদ। তবু লোকটা নাকি হাফ—সাধু হাফ—গেরস্থ। খুবই হাসি পায় ঝিন্টুর। মাঝে মাঝে তাকে বোজানোর চেষ্টা করে যে, ঈশ্বর আছেন জলে, আছেন অগ্নিতে, আছেন প্রতি পরমাণুতে... ইত্যাদি। এ আর—এক হোমিয়োপ্যাথি। আছে তো বুঝলাম বাবা, কিন্তু মালটিকে বের করে দেখাও চাঁদু। গদগদ স্বরে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে 'আছেন' বললেই তো হবে না।
ধর্ম—বাতিকের জন্য লোকটার বোধহয় সেক্স—ফোর্সও কমে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। আর সেইজন্য বড় বউদি একসময়ে তিতিবিরক্ত হয়েই জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ধরে পড়েছিল মেজদা বিটুকে। কেলেংকারিয়াস কাণ্ড আর কাকে বলে! শহরে ঢি ঢি। সেই ছিছিক্কারেও এই ধর্মের ষাঁড়ের চৈতন্য হল না। দিব্যি নির্বিকার ঠান্ডা মেরে নানা বাতিক করে যাচ্ছে।
আজকাল ধরেছে সেজো বউদি সোমাকে। আহা, সোমার বড় দুঃখ। সোমা বড় হতভাগিনী। সোমা বড় একা। তাই সোমা—উদ্ধার করতে বেদ বেদান্ত গীতার কচকচি ঝেড়ে যাচ্ছে। ঝিন্টুর পাপী মন। তার সন্দেহ হয়, লোকটার মধ্যে অবরুদ্ধ সেক্স একটা নির্গমনের পথ খুঁজছে। সোজা পথে বেরোতে পারছে না। অতএব বাঁকা পথ। সোজা কথায় বিকৃতি। বোধহয় সোমার সাহচর্যে লোকটার মানসিকভাবে যৌনতৃপ্তি হয়। এরকম হতেই পারে।
রিকশাটা ঘ্যাচ করে থামল।
এই, এই ঝিন্টু!

ঝিন্টু সাইকেল ঝড়াকসে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, কী বড়দা?

কোথায় যাচ্ছিস?

সাইকেলে হাওয়া দিচ্ছিলাম।

বউমার খবর শুনেছিস তো?

শুনেছি।

অবস্থা খুব ভালো নয়।

কেমন অবস্থা?

অপারেশন মানে সিজারিয়ান করা দরকার। কিন্তু হার্টের কন্ডিশন ভীষণ খারাপ।

ঝিন্টু একটু ভাববার ভান করে বলল, তা আমাদের কী করার আছে?

করার নেই?

ঝিন্টু বাধো বাধো গলায় বলে, মানে বলছিলাম, আমরা তো লে ম্যান, মেডিক্যাল ম্যানরা যা করার তা তো করবেই। খামাখো আমাদের ব্যস্ত হওয়া দরকার কী?

বড়দা একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর বলল, বিটুকে খবর দিয়েছিলি?

দিয়েছি।

এল না কেন?

কিছু বলল না তো।

আমি নার্সিংহোম—এ যাচ্ছি। তুই বিটুকে ধরে নিয়ে আয়।

ঝিন্টু এ ব্যাপারটা একদম বোঝে না। কারও অসুখ হলে আত্মীয়রা অকারণ অস্থির হতে থাকে! কিন্তু বোঝে না যে, তারা ডাক্তার না হলে অসুখের ব্যাপারটা তাদের হাতে নেই। অনেক সময় ডাক্তার হলেও নেই। মেডিকেল সায়েন্সও সীমাবদ্ধ জিনিস। তবু নিজেরা উদ্বিগ্ন হবে এবং সবাইকে খুঁচিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। বউদি নার্সিং হোম—এ আছে, চিকিৎসাও হচ্ছে। তবু একে ডাক, ওকে ডাক। বিরক্তিকর।

সাইকেলে উঠে ঝিন্টু বলল, যাচ্ছি।

দোকানটার নাম লাভ স্টোর কে রেখেছিল যেন! তার বাবাই। হ্যাঁ, যৌবনে যখন কলকাতায় ল' পড়তেন তখন তাঁর এক গরিব বন্ধু লাভ স্টোর নামে এক দোকান খুলে ধাঁ করে বড়লোক হয়ে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি থেকেই নামা রাখা। ইংরেজিতে সাইনবোর্ড, সুতরাং লোক ভাবে, লাভ মানে প্রেম। আসলে তো জানে না ওই লাভ—এর ধ্বনি সাদৃশ্যের বাংলা শব্দটির মানে হল নাফা বা মুনাফা। তার মধ্যে কোনো রোমান্টিক ব্যঞ্জনা নেই। এল ও ভি ই নয়, নিতান্তই ল—এ আকার আর ভ।

৮

ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টি বাজছে। ঝিন্টু।

মেজদা, বউদি নার্সিংহোম—এ। এখনও যাওনি যে!

বিটু ঝিন্টুর দিকে তাকাল। বলল, গিয়ে কী হবে?

ঝিন্টু বিরক্ত মুখে বলে, বড়দা তোমাকে বলতে বলল যে, বউদির অবস্থা খারাপ। তোমার একবার যাওয়া দরকার।

খারাপ? কীরকম খারাপ?

খুব খারাপ, হার্ট ট্রাবল হচ্ছে।

বিটু হাতের খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রেখে বলল, সেদিনই তো ই সি জি করানো হয়েছে। নরম্যাল। আজ আবার কী হল?

জানি না। আমি যাচ্ছি। তুমি চলে এসো।

দাঁড়া দাঁড়া। দোকান ফেলে এখনই যাওয়ার উপায় নেই। দুপুরে যখন বাড়িতে খেতে যাব তখন নার্সিংহোম হয়ে যাব। আর যদি তেমন বুঝিস তবে সাইকেলে করে এসে খবর দিয়ে যাস। বুঝলি?

ঝিন্টু সাইকেলটা রেখে নেমে এসে বলল, দোকান আমি দেখছি। তুমি গিয়ে ঘুরে এসো।

পারবি?

এ আবার না পারার কী? সুখময় আর প্রবীর তো আছেই।

প্রবীর নেই। তাকে মাল আনতে পাঠিয়েছি। সুখময়টা নভিস।

তবু আমি পারব। তুমি যাও।

বিটু বলল, কেস জটিল। ভ্যাবলার মতো বোধবুদ্ধিহীন চোখে কিছুক্ষণ ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, মরে—ফরে যায়নি তো অলরেডি?

আরে না। তা হলে আমি এত নরম্যাল থাকতাম নাকি?

পিন্টু কোথায়?

সকালে বোধহয় বউদিকে বাসে তুলে দিতে গিয়েছিল। তারপর এখনও ফেরেনি।

বিটু উঠে বলল, তা হলে বোস। আমি তোর সাইকেলটা নিয়ে যাচ্ছি।

সাবধানে চালিয়ে যেয়ো।

কেন সাবধান হওয়ার কী আছে?

এটা তো তুমি চালাওনি কখনও। গিয়ার সিস্টেম। টপ করে স্পিড উঠে যায়। তার ওপর যা রাস্তা!

তুই পারলে আমিও পারব।

একটু ঝাঁঝের গলায় কথাটা বলে বিটু বেরিয়ে এল। সেদিনকার ছোকরা সব বিটুকে সাইকেল চেনাচ্ছে। ঝিন্টুর বয়সে বিটুও কিছু কম সাইকেলবাজ ছিল না। শুকনা থেকে একবার সাইকেলে পাহাড়ে অবধি অনেকখানি উঠে গিয়েছিল। সত্য বটে আজকাল সে আর সাইকেল চালায় না। তার স্কুটার আছে। তবে সেটা কয়েকদিন হল খারাপ হয়ে গ্যারেজে পড়ে আছে।

বিটু সাইকেলে উঠেই বুঝল, ঝিন্টু কিছু বাজে কথা বলেনি। সাইকেলটায় আচমকাই স্পিড ওঠে। ঝিন্টু রাখেও যত্নে। নিয়মিত তেল—টেল দেয়, ঝাড়ে মোছে। এই—ই ওর স্বভাব। যা কিছু ওর আছে সব জিনিসের প্রতিই ওর প্রগাঢ় যত্ন। পারতপক্ষে নিজের জিনিসে ও কাউকে হাত দিতে দেয় না। বিটুকে যে সাইকেলটা দিল তার কারণ হল বিটু তার স্কুটার ওকে প্রায় চড়তে দেয়।

নিউ মার্কেট অবধি ভিড়েও বেশ চলে এল বিটু। মোড় ঘুরবার সময় ঘ্যাচাং করে পেছনের চাকাটা একটা রিকশার সঙ্গে বেঁধে গেল। বিটু পা ঠেকিয়ে পতন আটকাল বটে, কিন্তু লক্ষ করতে দেরি হল না যে পিছনের চাকার একটা স্পোক বেঁকে গেছে। দামি সাইকেল।

রিকশাওলাটা বেকুবের মতো চেয়ে ছিল। বিটু এবং তার ভাইদের বোধহয় খানিকটা চেনে।

সাইকেল থেকে নেমে রাগে অন্ধ বিটু চটাং করে চড় কষাল বেকুবটার গালে।

বাপ রে!—বলে লোকটা মুখটা চেপে ধরল দু'হাতে।

বিটু বাঁ হাতে চুলের মুঠিটা ধরে আরও দু'চারটে রদ্দা কষাতেই লোক জমে যেতে লাগল চারদিকে।

শুয়োরের বাচ্চা! গাঁজা খেয়ে রিকশা চালাস?

মারটা একটু বেশি হয়ে গেল বুঝি। বিটু চুলটা ছাড়তেই লোকটা মাটিতে বসে পড়ল, তারপর হিক্কা তোলার মতো একটা অদ্ভুত জান্তব শব্দ তুলতে লাগল গলায়।

এতক্ষণ লক্ষ করেনি বিটু, রিকশায় একজন অল্পবয়সি মেয়ে বসে আছে। অদ্ভুত সুন্দর চেহারা। মেয়েটার মুখে কেমন ঘাবড়ানো সাদা ভাব। অপলক চোখে দৃশ্যটা দেখে ও বাক্যহারা হয়ে, চোখের পলক অবধি ফেলছে না।

লোকজন রিকশাওলাটাকে টেনে ওঠানোর চেষ্টা করল। একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, কী হয়েছে বিটুদা?

দ্যাখ না শুয়োরের বাচ্চা ঝিন্টুর দামি সাইকেলটা বরবাদ করে দিল।

ঝিন্টুর সাইকেল? ও বাবা। দেখি দেখি, এঃ, স্পোকটা একদম গেছে।

বিটু মেয়েটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেও লজ্জা পেল মনে মনে। একটু চিনতেও পারল। পরশু কি তার আগের দিন লাভ স্টোরে একটা টমেটো কেচাপ আর নুডলস কিনতে এসেছিল। শহরে বোধহয় নতুন। আগে দেখেনি।

একটা খদ্দের বোধহয় হাতছাড়া হয়ে গেল তার। যদি অবশ্য মেয়েটা তাকে চিনে থাকে।

বিটু ফের সাইকেলে ওঠার সময়েও লক্ষ করল, রিকশাওয়ালা মাটিতে বসেই আছে। উঠতে পারছে না। হিক্কার মতো শব্দটা হচ্ছে।

কিন্তু বিটু আর অপেক্ষা করল না। সাইকেলে উঠে পড়ল। বাঁকা স্পোক ফ্রেমে ঘষটাচ্ছে। অস্বস্তিকর একটা শব্দ। স্পিড নিচ্ছে না। হ্যান্ডেল কাঁপছে। বিটু নামল। সামনেই সুশীলদের বাড়ি। বারান্দায় উঠে হাঁক মারল, বেলা, এই বেলা।

সুশীলের ছোট বোন ছুটে এসে বলে, বিটুদা?

এই সাইকেলটা তোদের বাড়ি রেখে যাচ্ছি। ঝিন্টু এসে পরে নিয়ে যাবে।

আচ্ছা! তুলে রাখব ঘরে।

বিটু রাস্তায় এসে রিকশা নিল।

এ শহরের রিকশাওয়ালারা তার হাতে কিছু কম মার খায়নি। বেয়াদবি করলেই চড়টা চাপড়টা অনায়াসে কষিয়েছে। তখন কোনো অনুশোচনা হত না, মনে কষ্ট হত না। এখন কিন্তু একটু হল। অ্যাক্সিডেন্টে দোষ যতটা রিকশাওয়ালার, ততটা তারও। কিন্তু না মারলে রাগটা যেত না। ঝিন্টুর দামি সাইকেল ও কাউকে ধরতে দেয় না, তাকেও খুব সদিচ্ছার সঙ্গে দেয়নি। তার ওপর সেও যে এক সময়ে একজন দারুণ সাইকেলবাজ ছিল তা আর তেমন বিশ্বাসযোগ্য থাকবে না ঝিন্টুর কাছে।

ঝিন্টু সাইকেল ভালোই চালায়, বিটু জানে। ঝিন্টু আরও অনেক কিছুই ভালো জানে। ক্রিকেট, ফুটবল, টেবল টেনিস। কতটা ভালো তা অবশ্য পরীক্ষা করে দেখেনি বিটু। শুনেছে। এবার নাকি ওয়ার্ল্ড ট্যুরে যাওয়ারও তোড়জোড় করছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে জমা হল বিটুর।

নার্সিং হোম—এর ফটকেই রোদে দাঁড়িয়ে আছে মন্টু। মুখে—চোখে সাংঘাতিক উদ্বেগের ছাপ।

বিটু রিকশা থেকে নামতে নামতে বলল, কী রে?

অবস্থা খুব খারাপ।

কতটা খারাপ?

স্পেশালিস্ট এসে দেখে গেছে। বলেছে, চান্স ফিফটি—ফিফটি। হার্ট দুর্বল বলে সিজারিয়ানও করা মুশকিল।

বিটু এসব শুনল উদাস মুখে।

মন্টু বলল, বাবাকে বোধহয় একটা খবর দেওয়া দরকার।

বাবাকে কেন?

একবার এসে দেখে যেত।

দেখতে কি দেবে?

কী জানি।

বিটু মাথা নেড়ে বলে, দেবে না। ওকে রেখেছে কোথায়?

ওটি—তে। অক্সিজেন দিচ্ছে। বিমলকে একটু খবর দিবি?

বিমল?

ওই যে কন্ট্রাক্টর। দারুণ হোমিয়োপ্যাথ শুনেছি।

এখন এই অবস্থায় হোমিয়োপ্যাথি?

হোমিয়োপ্যাথি সকলে সবার শেষেই করায়। যখন অ্যালোপ্যাথি ফেল করে।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু মিত্র কি অ্যালাউ করবে?

করবে। আফটার অল ক্ষতি তো নেই।

দেখি।

বিটু আবার একটা রিকশায় উঠল। রিকশাওলাটা ঝুঁকে পেডাল মারছে। পিছন থেকে দেখে একটু চমকে উঠল বিটু। এইটে সেই রিকশাওলাই নয় তো, যাকে একটু আগে সে মেরেছে? ভালো করে দেখার জন্য ঝুঁকে বসল বিটু। তারপর বুঝল, না। এ নয়। এ অনেক বাচ্চা। তবে চেহারায় তেমন বৈশিষ্ট্য থাকে না বলে এদের সকলকেই কেমন যেন একরকম লাগে।

৯

সুমনা কাপড় ছেড়ে সবে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, পিন্টু এল।

কোথায় যে থাকিস!

কী হল মা?

সোমাকে এই নার্সিংহোম—এ ভর্তি করে দিয়ে এলাম। হার্টের ব্যথা উঠেছে। কী যে হবে। আলায় বালায় কোথায় ঘুরিস বল তো! সেই বড় বউমাকে বাসে তুলে দিতে কোন সকালে বেরিয়েছিস, আর এই ফিরলি! যা গিয়ে একটু মুখটা দেখিয়ে আয় নার্সিংহোম—এ। তোকে দেখলে একটু তটস্থ হবে সবাই।

পিন্টু জানে মা ঠিকই বলছে। এখনও সে গিয়ে দাঁড়ালে শিলিগুড়ির লোক তটস্থ হয়। তবে এই প্রভাব কতদিন থাকবে তা বলা কঠিন। এখন যুগ দ্রুত পালটায়। পরের জেনারেশনের ঢেউ এসে আগের জেনারেশনের সব চিহ্ন মুছে দেয়। সে যদিও নিতান্তই যুবাপুরুষ তবু যুবকতররাও এসে গেছে। রাজনীতি আজকাল এত মস্ত কেরিয়ার। চাকরির চেয়ে বহুগুণে ভালো জিনিস। সুতরাং আজকাল রাজনীতিতে বেজায় ভিড়। দলে দলে এসে জোটে। তীব্র প্রতিযোগিতা। এই বাজারে প্রভাব—প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখা শক্ত।

পিন্টু বলল, যাচ্ছি। ছোট বউদির অবস্থা কি খারাপ নাকি?

কী জানি বাবা, রোগা মেয়ে। বাচ্চা হওয়ার ধকল সইতে পারা কি চাট্টিখানি কথা! তার ওপর হার্টের ব্যামো। বিয়ের আগে ভালো করে খোঁজখবর করা উচিত ছিল। হুট করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল, এখন পস্তাও।

কথাটা শুনে পিন্টু খুশি হল না। একটু ঝাঁঝ দিয়ে বলল, নিজের মেয়ে বলে একটু ভেবে দেখো তো। তা হলেই দেখবে আর দুঃখ থাকবে না। পরের মেয়ের হরেক দোষ।

তোকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না। এখন যা, গিয়ে দেখ কিছু করতে পারিস কি না?

ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

পিন্টু বাইরে এসে ফের রিকশা থামাল একটা। একটা বিধ্বস্ত লাশকাটা ঘরের ধ্বংসস্তূপে কংক্রিটের টেবিলটা আজও দাঁড়িয়ে আছে—এই দৃশ্যটা সে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না আজ। ছোট বউদিটা কি বাঁচবে? চান্স খুব কম। কিন্তু মেয়েটা বড় ভালো ছিল। দেমাক—টেমাক নেই, দেওরদেরও ভাসুরের মতো করে সম্মান—টম্মান করত। আসলে বোধহয় খুব ভিতু। গরিবের ঘরের অনিশ্চয়তা থেকে, নিপীড়ন থেকে হঠাৎ এক সম্পন্ন পরিবারে অধিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রেণিগত দূরত্বটা ঘোচাতে অসুবিধে হচ্ছিল বোধহয়। খুব খাটে মেয়েটা। রোগা শরীর আর দুর্বল হৃদযন্ত্র নিয়েও প্রাণপাত পরিশ্রম করে। কুয়ো থেকে জল তোলা, কাপড় কাচা, গুল দেওয়া নিজে থেকেই করে যেত। অত কাজ করার দরকার নেই তার। বোধহয় নিজেকে ভুলে থাকার জন্য করে। পিন্টু ফেরে অনেক রাতে। কোনোদিনই রাত বারোটার আগে খায়

না। বরাবর তার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে। এই বউদিটি সেই নিয়ম ভেঙে প্রতি রাতে তাকে গরম ভাত খাওয়ায়। প্রথম প্রথম তাকে আপনি—আজ্ঞে করত, পিন্টু ধমক দিয়ে ছাড়িয়েছে। বউদি হলেও বয়সে পিন্টুর চেয়ে ঢের ছোট। তবু নববর্ষে বা বিজয়ায় বয়সে ছোট বউদিকে সে প্রকৃত ভক্তিভরে প্রণাম করে।

কে জানে কেন, এ বাড়িতে পিন্টুর একটু অনাদর আছে। বিটু যেমন মায়ের প্রাণ, তেমনি বাবার আদুরে। বড়দা মন্টুকেও সকলে খুব সুনজরে দেখে। শুধু পিন্টুই না ঘরকা, না ঘাটকা। একটু উড়নচণ্ডী, বারমুখো, পলিটিক্সবাজ ছেলে বলেই হয়তো। কিংবা কে জানে কী। সংসারের আদরের বড় তোয়াক্কাও করে না পিন্টু। সে চায় জনসাধারণের আদর, সমর্থন এবং ভোট। মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ ইত্যাদি তার কাছে ফালতু হয়ে গেছে কবে থেকে। সংসার হচ্ছে একটা বদ্ধ জলাশয়। তাতে জল পচে, গন্ধ হয়। বাইরের জগৎ হচ্ছে সমুদ্রের মতো বিশাল। পচন নেই, আবদ্ধতা নেই, অবিরল ঢেউ আর ঢেউ।

তবু সংসারে এই একটা মানুষ যে তাকে একটু আদর জানায় সেটাই বা ভোলে কী করে পিন্টু? সে তো অকৃতজ্ঞ নয়।

রিকশা থেকে একটু ঝুঁকে পড়ল পিন্টু, এই দাঁড়া! দাঁড়া! কী হয়েছে রে?

একটা রিকশাকে ঘিরে মেলা ভিড়। পিন্টু নেমে পড়ল।

একটা মুখচেনা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, পিন্টুদা। যাক বাবা, বাঁচা গেল।

কী হয়েছে?

একটা রিকশাওলাকে একটু আগেই বিটুদা কয়েকটা চড়চাপড় দিয়েছিল। ব্যাটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

চড়চাপড় দিল কেন?

সাইকেলে ধাক্কা দিয়েছিল।

পিন্টু দু'হাতে ভিড় সরিয়ে এগিয়ে যায়। রিকশাওলাটা মাটিতে পড়ে আছে। কেউ জলটল দিয়েছিল মুখে। মাথা মুখ জামা সব ভেজা। ভিড়ের মধ্যে সুন্দরমতো একটা মেয়ে খুব অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

পিন্টু ভিড়কে একটা ধমক দিল, হাঁ করে মজা দেখছেন সবাই? যান যান পাতলা হোন। অ্যাই এদিকে এসে ধর তো, আমার রিকশায় তুলে দে।

পিন্টুর কাছে এসব জলভাত। পলিটিক্স করে করে তার মনের জড়তা ভেঙে গেছে। শহরে বা যেখানেই যা কিছু ঘটুক সে চট করে যথাকর্তব্য করতে এবং দায়িত্ব নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। রিকশায় লোকটাকে তুলে পিন্টু তাকে জড়িয়ে ধরে বসল।

মেয়েটা এগিয়ে এসে বলল, শুনুন, ওকে আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

কেন বলুন তো?

আমি ওর রিকশায় ছিলাম। আমি পুলিশে একটা ডায়েরি করতে চাই।

পিন্টু বিনা দ্বিধায় বলল, করবেন। আমি ওকে হসপিটালে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

আপনার নামটা?

পিন্টু, পিন্টু গাঙ্গুলি।

ভিড়ের ভিতর থেকে দু'চারজন বলে উঠল, আরে আরে আমাদের পিন্টুদা, পিন্টুদাকে সবাই চেনে দিদি, ভাববেন না।

পিন্টু বলল, আপনি?

আমি শচী চক্রবর্তী। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশের লেকচারার। নতুন এসেছি।

পিন্টু একটু মুচকি হেসে বলল, মনে থাকবে। এই রিকশা, চল।

পুলিশে ডায়েরি করবে। এঃ। পিন্টু আপনমনেই একটু মুখ ভেঙাল। রিকশাওলাটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর উনি স্টাইল মেরে দাঁড়িয়ে মুখে প্যাথস ফোটাচ্ছেন, এই তো সিমপ্যাথি। সিমপ্যাথি থাকলে আগে পুলিশের কথা না ভেবে চিকিৎসার কথা ভাবতিস।

লোকটা একটু গোঙাল। কেমন করুণ কাতর শব্দ।

পিন্টু লোকটাকে ভালো করে ধরে রইল। ঘাড়টা লটপট করছে। বিটুটা যে দিন দিন কী হচ্ছে!

পিন্টু শুনেছে, জাপানে রাস্তায় ঘাটে ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হলে কেউ কারও সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়া করে না। দু'পক্ষই গায়ের ধুলো ঝেড়ে পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে যে যার পথে চলে যায়। ভারী সুসভ্য জাত। আর এখানে সকলেই সকলের প্রতি মুখিয়ে আছে। কিছু হলেই খ্যাঁক।

পিন্টু এও জানে, রিকশাওলাদের ওপর এরকম নির্যাতনের পিছনে কারণটা অর্থনৈতিক। ছোটলোককে ভদ্রলোকেরা হ্যাটা করবেই। যদি এরা সংগঠিত হত, শ্রেণিগতভাবে কিছু মর্যাদা পেত, তা হলে এরকমটা ঘটতে পারত না। রিকশাওলাদের একটা ইউনিয়ন আছে বটে। কিন্তু রিকশা যেমন কমজোরি যান, রিকশাওলাদের ইউনিয়নটাও সেইরকম।

হাসপাতালের দিকে যেতে যেতে পিন্টু সমাজব্যবস্থার হাজারও ফুটোর কথা ভাবতে থাকে। কবে যে পলিটিকসে প্রাণ আসবে, কবে যে জেগে উঠবে দেশটা, কবে যে সচেতন হবে মানুষ!

হাসপাতালে রুগি ভর্তি করা পিন্টুর কাছে কোনো সমস্যা নয়। আউটডোরের ডাক্তার দেখে—টেখে বলল, হেড ইনজুরি বলে মনে হচ্ছে।

কেসটা কি সিরিয়াস?

দেখা যাক। ভর্তি তো করে নিই। নামধাম জানেন?

না। কেয়ার অফ পিন্টু গাঙ্গুলি করে দিন। জ্ঞান হলে নাম বলবে।

ডাক্তারের ভ্রূকুটিকুটিল মুখখানা অনেকক্ষণ ধরে চোখের সামনে ভাসল পিন্টুর। কী যেন নাম বলল মেয়েটা? শচী চক্রবর্তী। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির ইংলিশের লেকচারার। একটু স্পিরিটেড মেয়ে কি? খোঁজ নিতে হবে।

রিকশাওলাটার যদি ভালো—মন্দ কিছু হয় তা হলে রাস্তার লোক কেউই বিটুর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে যাবে না। কিন্তু মেয়েটা গড়বড় করতে পারে। আহাম্মক বিটু বড্ড বেমক্কা মেরে বসেছে কমজোরি আধবুড়ো লোকটাকে।

১০

ব্রহ্মকুমার রায়টা খুব নির্বিকারভাবেই শুনলেন। তাঁর মক্কেল জিতেছে। কিন্তু যাকে এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জেতালেন ব্রহ্মকুমার সে একটি ঘড়েলস্য ঘড়েল। চোতা দলিল আর ব্রহ্মকুমারের গলাবাজির জোরে একটা পুরো সুপরিবাগান গাপ করে নিল। ওই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আর একগাল ভ্যাটকানো হাসি নিয়ে বসে আছে। তবে কে কীরকম তা আর ভাবেন না ব্রহ্মকুমার। মক্কেলমাত্রই লক্ষ্মী। মক্কেল মানেই সজ্জন।

ব্রহ্মকুমার কাগজপত্র ব্রিফ কেস—এ ভরলেন। আর—একটা শুনানি ছিল আজ। ডেট পিছিয়ে দিয়েছেন। নার্সিং হোম—এ একবার না গেলেই নয়। সংসারে বড্ড ঝামেলা। শুধু মামলা মোকাদ্দমা নিয়ে থাকতে পারতেন তো বেশ হত।

বাইরে আসতেই মক্কেলটা ঢিপ করে প্রণাম করল।

জোর লড়ে দিলেন উকিলবাবু।

ব্রহ্মকুমার জোর করে একটু হাসলেন। লোকটার পিছনে আর—একজন চামচা গোছের লোক। তার হাতে মস্ত সন্দেশের বাক্স। মক্কেল বাক্সটা নিয়ে ব্রহ্মকুমারের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, একটু মিষ্টিমুখ করবেন। সুপুরিও দিয়ে যাব'খন কিছু।

দিয়ো।

বাঁধা রিকশাওলা খগেন এগিয়ে এল গাড়ি নিয়ে। ব্রহ্মকুমার উঠলেন।

তাঁর মেজো বউমাটি ভালো না মন্দ সঠিক জানেন না ব্রহ্মকুমার। কথা—টথা বিশেষ বলেননি কখনও। তবে মেয়েটির গলার আওয়াজ কদাচিৎ পাওয়া যায়। যারা চুপচাপ থাকে তাদের একটু সমীহ করেন

ব্রহ্মকুমার। তবে তিনি লোকমুখে শুনেছেন, মেয়েটি ভালোই। তাঁর স্ত্রী সুমনা কারওই বিশেষ প্রশংসা করেন না। কিন্তু তিনিও এই মেয়েটি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলেন না। তিনি আরও শুনেছেন, তাঁর ছেলে বিটুর সঙ্গে বউমার সম্পর্ক ভালো নয়। কিন্তু ব্রহ্মকুমার এর বেশি আর কিছুই তেমন জানেন না। তাঁর ছেলে মেয়ে বউ এরা সব অস্পষ্ট কিছু অবয়ব, আধচেনা কিছু মানুষ মাত্র, সম্পর্কও নিতান্তই ক্ষীণ।

লাভ স্টোরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ব্রহ্মকুমার রিকশা থামিয়ে নামলেন। দোকানটা বেশ ঝকঝকে। প্রচুর জিনিস। কিন্তু কাউন্টারে ঝিন্টু কেন?

ঝিন্টুকে জিজ্ঞেস করার আগেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মেজদা নার্সিং হোম—এ গেছে। আমি দোকান দেখছি।

ও।—বলেই ব্রহ্মকুমারের কথা ফুরিয়ে গেল। ছেলের সঙ্গে আর কী কথা বলা যায় তা ভেবেই পেলেন না।

কিছু বলবে বাবা?

না, এই একটু খোঁজ নিয়ে গেলাম। বিক্রিবাটা কেমন?

খুব ভালো।

খদ্দের তো নেই দেখছি।

এ সময়টায় খদ্দের হয় না। সন্ধেবেলা দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না।

তাই নাকি? বাঃ।

আবার রিকশায় এসে বসলেন ব্রহ্মকুমার। কিন্তু খগেনটা কোথায়?

এই তো ছিল। বিড়িটিড়ি খেতে গেল নাকি। চারদিকে তাকিয়ে খগেনকে খুঁজতে লাগলেন ব্রহ্মকুমার। কোথায় যে যায়!

রিকশাটা আপনা থেকেই একটু পিছিয়ে গেল। তারপর থামল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই খগেন এসে সিটে চেপে বসল আবার। টাটকা বিড়ির গন্ধ পেলেন ব্রহ্মকুমার।

হুট করে কোথায় গিয়েছিলি?

কয়েকজন ডাকল, একটা হাঙ্গামা হয়েছে।

হাঙ্গামা? কীসের হাঙ্গামা?

একজন রিকশাওলাকে খুব মেরেছে। হাসপাতালে দিতে হয়েছে। বিকেলে রিকশা স্ট্রাইক হতে পারে।

কে মারল?

বিটুবাবু।

বিটু? বলিস কী?

তাই তো বলছে সবাই।

ব্রহ্মকুমার ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

কেন মেরেছে জানিস?

সাইকেলের সঙ্গে নাকি ধাক্কা লেগেছিল।

ব্রহ্মকুমার বললেন, সাবধানে চালাস। তোরাও বড্ড রেকলেস। এমন চালাস যে মনে হয় তোরা বুঝি ট্রাক ড্রাইভার।

মনে মনে ব্রহ্মকুমার ছেলের উদ্দেশে বললেন, গর্ভস্রাব! গর্ভস্রাব!

নার্সিং হোম—এ নামতেই তিন ছেলে এগিয়ে এল।

কী খবর রে?

মন্টু বলল, ভালো নয়।

ভালো! ভালো বলে কি কিছু আছে তাঁর জীবনে? নিজের মনে যে একটু নিজের কাজ নিয়ে থাকবেন, তার উপায় নেই। সংসার খাবলা মারে, নিয়তি এসে চিমটি কাটে, দুর্ভাগ্য আড়ালে হাঃ হাঃ করে হাসতে থাকে। বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, কাকে বলে মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছিস!

বিটুকে একটু বিবর্ণ দেখায়। মিনমিন করে বলে, ঝিন্টুর দামি সাইকেলটার বারোটা বাজিয়েছে। তাই দু'—একটা চড়চাপড় দিয়েছিলাম রেগে গিয়ে।

কী সব শুনছি। স্ট্রাইক—ফাইক হবে নাকি।

পিন্টু বলল, ও নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি জগার সঙ্গে কথা বলেছি।

জগা কে?

রিকশা ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

কী বলল?

রিকশাটার পারমিট ছিল না। রিকশাওলাটাও নতুন। কেউ তেমন চেনে না। ম্যানেজ করা গেছে।

ব্রহ্মকুমার সন্দেশের বাক্সটা নিয়ে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। বড় ছেলের দিকে বাক্সটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা রাখ।

এর পরেই তাঁর কথা ফুরিয়ে গেল। কী বলতে হবে বা কীরকম মুখভাব করতে হবে তা বুঝতে পারছেন না। ভ্রূ কুঁচকে একটা দুশ্চিন্তার ভাব ফোটানোর চেষ্টা করলেন। ফুটল কি না কে জানে।

হঠাৎ জলপাইগুড়ির মক্কেলের কথা মনে পড়ল। পিন্টুর দিকে চেয়ে ছেলেদের বললেন, জলপাইগুড়ির মামলাটায় তোকে অ্যাটেন্ড করতে বলেছিলাম না।

পিন্টু অধোবদন হল। কিন্তু ব্রহ্মকুমার আর কিছু বলতে পারলেন না।

ছেলেদের তিনি কখনও শাসন করেননি। কী করে বকাবকি করতে হয় সেই প্রসেসটাই জানেন না।

তিন ছেলে ও তাঁর মধ্যে এক অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। অস্বস্তিকর নীরবতা। যেন চারজন আগন্তুক পরস্পর পরিচয়বিহীন দাঁড়িয়ে আছে।

১১

ডাক্তারের কপালে চিনচিনে ঘাম। চোখে উদ্বেগ। দুটি নিপুণ হাত রক্তাক্ত গহ্বর থেকে একটা মানুষের ছানাকে বের করে আনল। একজন দক্ষ নার্স হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল বাচ্চাটাকে।

হার্ট?

ও—কে।

পালস?

ও—কে।

যাক, বেঁচে গেল বউটা। এ যাত্রায় বেঁচে গেল। বিটুকে ডাক্তার সাবধান করে দেবেন, আর যেন বাচ্চা না হয়।

ডাক্তার খুব দ্রুত হাতে সেলাই করতে লাগলেন! বড়লোকেরা সহজে মরে না। তাদের জন্যি নার্সিং হোম, দামি ওষুধ, ভালো ডাক্তার, ভালো খাদ্যদ্রব্য। গরিবেরা হাসপাতালে যায়। যেখানে অনন্ত ও গভীর এক নরক। ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তার কুকুর ও বেড়াল, পড়ে আছে মেঝেময় মল—মূত্র—বমি, বেড প্যান দেওয়ার লোককে কখনও ডেকে পাওয়া যায় না, ইউরিন্যাল বা বাথরুমে যাওয়ার পথ থই থই করছে মলমূত্রে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে ইনফেকশন ঘটছে, সেখানে এমন সব খাবার দেওয়া হয় যা গরিবেও গলা দিয়ে নামাতে পারে না। দু'—একজন ডাক্তার আছে, যারা ওই নরকেও মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করে। আছে কয়েকজন নিষ্ঠাবতী নার্স। কিন্তু তারা হাস্যকর রকমের সংখ্যালঘু। ওই অনন্ত ও গভীর নরকে বসে তারা ঈশ্বরকে ডাকে।

ডাক্তার বাসু হাসপাতালের ডাক্তার। তিনি জানেন। আর জানেন বলেই এই শহরে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক চিকিৎসার জায়গা তিনি খুঁজে নিয়েছেন। এই নার্সিং হোম যাঁর তিনিও বাসুর সিনিয়র ডাক্তার। ডাক্তার মিত্রর সঙ্গে বাসুর এই নিয়ে কথা হয়। বাসুর বয়স কম, রক্ত তেজি, অন্যায় অবিচারের নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব তাঁর মধ্যে এখনও প্রবল। মফসসলের আর এক হাসপাতালে তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে লট—কে লট দামি ওষুধ পাচার হয়ে যাওয়ার দুষ্টচক্র ভাঙতে এবং রোগীর পথ্য নিয়ে মামদোবাজি রুখতে তিনি কোমর বেঁধে লাগেন। ফলে তাঁরই অধস্তন কর্মচারীরা দল বেঁধে একদিন চড়াও হল। অকথ্য গালাগাল, চড়চাপড় আর প্রাণনাশের হুমকি খেয়ে তিনি হতভম্ব। শেষ অবধি কলকাতায় গিয়ে হেলথ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করে সব বলে বিহিত চান। মন্ত্রী করুণ হেসে বলেছিলেন, সবই জানি, করার কিছু নেই। আপনি বরং ট্রান্সফার নিয়ে নিন। চুজ ইয়োর স্পট।

বাসু সেদিনই বুঝেছিলেন, এ দেশে সৎকর্মীরা বড় একা, বড় বেশি সংখ্যালঘু এবং নিরাপত্তাহীন। যে দুষ্টচক্র চিকিৎসা জগৎকে ঘিরে বেড়ে উঠছে তাকে ভাঙতে হলে অনেক বড় শক্তিমান কাউকে দরকার। তাঁর মতো লোককে দিয়ে হবে না।

শিলিগুড়িতে বাসুর দু'বছর হয়ে গেল। একটু চড়া মেজাজ, ঠোঁট কাটা এবং দাম্ভিক বলে তাঁর দুর্নাম আছে। আবার অতিশয় দক্ষ এবং নিষ্ঠাবান শল্যবিদ বলেও খ্যাতি আছে। এ সবই বাসু জানেন। কিন্তু নিজেকে বদলানোর কোনো প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেন না।

অপারেশনের পর ডাক্তার তাঁর বাক্স খুললেন, রক্তমাখা অ্যাপ্রন ছাড়লেন। ভ্রু কুঁচকে তাকালেন অপারেশন থিয়েটারের দরজার মাথায় রামকৃষ্ণ—সারদার যুগ্ম মস্ত ছবির দিকে। তিনি ঠাকুর—দেবতা—ধর্মগুরু মানেন না। ডাক্তার মিত্র মানেন। নার্সিং হোমের প্রায় সর্বত্রই ওই দুটি ছবি সাজানো।

রুগিকে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হল। বাসু হাত—মুখ ধুয়ে ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে এলেন।

লবিতে বাপ আর তিন ছেলে গাড়লের মতো দাঁড়ানো। দু'বছর এ শহরে বাসুর বাস। তিনি এঁদের চেনেন।

প্রথম কথা বললেন ব্রহ্মকুমার, ডাক্তার বোস, মেয়েটা বাঁচবে তো?

বাঁচবে।

বাচ্চাটা?

বেঁচে যাবে। চিন্তা নেই।

ব্রহ্মকুমার একটা মস্ত স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন।

ডাক্তার বাসুর মুডটা যথানিয়মেই খারাপ। রিসেপশনের লগবুকে সই করতে করতে বললেন, কিন্তু একটা কথা। বউটাকে আপনারা ভীষণ নেগলেক্ট করেছেন। ওর হার্টট্রাবলটা ক্রনিক। আপনাদের তো টাকার অভাব নেই। ইচ্ছে করলে কলকাতা থেকেও ট্রিটমেন্ট করিয়ে আনতে পারতেন। তা হলে এত টেনশন হত না, আমাদেরও জীবন—মৃত্যুর খেলা খেলতে হত না।

হার্টের অবস্থা যে এত খারাপ তা বুঝতে পারিনি। বিশ্বাস তো দেখছিল। কিছু তেমন বলেনি।

বিশ্বাস? ডাক্তার বিশ্বাসের চেয়ে হাতুড়েও ভালো। যাকগে, সেম প্রফেশনের লোকদের সম্পর্কে নিন্দে করতে নেই। তবে আমি আবার মনে মুখে আলাদা হতে পারি না।

সই করে বিটুর দিকে তাকালেন বাসু। ছেলেটার চেহারায় অতীতের একটা জৌলুস দেখা যায়। এখন কেমন যেন মনমরা। তবে একসময়ে ব্রাইট ছিল। বাসু তার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো ওর হাজব্যান্ড। আপনারই তো দায়িত্ব ছিল ওর প্রপার ট্রিটমেন্ট করানোর।

বিটু মাথা নোয়াল। জবাব দিল না।

এনিওয়ে, এবার থেকে নজর রাখবেন। আমি নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার সেনগুপ্তকে খবর দিয়ে রেখেছি। উনি এখানে থাকেন না। সপ্তাহে দু'দিন প্লেনে কলকাতা থেকে এসে ক্লাস নিয়ে যান। আজ তাঁর আসার ডেট। উনি বিকেলের দিকে এসে দেখে যাবেন।

হঠাৎ পিন্টু বলে উঠল, এ শহরে একজন ভালো হার্ট স্পেশালিস্ট নেই, এটা খুব লজ্জার কথা।

ডাক্তার বাসু পিন্টুর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ খুবই লজ্জার কথা। আপনি আরও লজ্জিত হয়ে পড়বেন যখন শুনবেন যে, মফসসলের অনেক হাসপাতাল বা হেলথ সেন্টারে কোয়ালিফায়েড ডাক্তারই নেই। ওষুধ নেই, নার্স নেই, ঝাড়ুদার নেই, কম্পাউন্ডার নেই।

জানি। আমি মফসসলে ঘুরি না নাকি?

হ্যাঁ ঘোরেন। কিন্তু পলিটিক্স করতে ঘোরেন।

তা হলে কী করব?

ডাক্তাররা যাতে মফসসলে কাজ করতে পারে তেমন কন্ডিশন তৈরি করুন। খুব শক্ত তো নয়। তাদের ওষুধ দিন, এনভিরনমেন্ট দিন, নিরাপত্তা দিন। দেখবেন সব পালটে গেছে। ডাক্তাররা কাজ করতে চায় না এমন তো নয়।

জানি।

আপনারা পয়সার জোরে যে সুবিধেটা পাচ্ছেন তা তো আর সবাই পায় না। নার্সিং হোম বা বেশি ফি দিয়ে ডাক্তার দেখানো সব অ্যাফোর্ড করতে পারছেন, কিন্তু হাসপাতালটা গিয়ে দেখে আসুন একবার। হার্ট—স্পেশালিস্টের কথা বলছেন, একজন ভালো হার্ট—স্পেশালিস্টকে এ শহরে আনলেও আপনাদের মতো কিছু পয়সাওলা লোকই তাকে বিজনেস দিতে পারবেন, গরিবেরা পারবে না।

পিন্টু বাসুর দিকে কটমট করে একটু চেয়ে থেকে বলল, ডাক্তার বাসু, আমি আপনাকে জানি। আপনি গরিবের জন্য করেন, বিনা পয়সায় রুগি দেখেন, খুব ভালো। কিন্তু এ শহরে যেসব ডাক্তার আসে তাদের মধ্যে কয়টা মানুষ বলুন তো? বেশিরভাগই আসে টাকা লুটতে। এ শহরে দু'বছর প্র্যাকটিস করলেই লাল হয়ে যায়। ডাক্তার কর, ডাক্তার পাল এরা সব আসলে কসাই। কর দু'বার পাবলিকের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়েছে, তবু শিক্ষা হয়নি। প্লিজ, ডাক্তারদের হয়ে ওকালতি করবেন না।

ব্রহ্মকুমার এই বিতর্কটি পছন্দ করছিলেন না। হঠাৎ ছেলের কাঁধে একটা থাবড়া মেরে বললেন, হয়েছে হয়েছে, চুপ করো। যে যত মুখ্যু তার তত লম্বা লম্বা স্পিচ। উনি এই বড় একটা অপারেশন করে বউমাকে বাঁচালেন, আর তুমি ওকে লেকচার দিচ্ছ। যাও এখান থেকে।

পিন্টু একটু থতমত খেয়ে গেল। বাপকে সমীহ করে, তাই আর কথা বাড়াল না। গুটিগুটি "যাচ্ছি" বলে কেটে পড়ল।

ক্লান্ত চোখে ডাক্তার বাসু চেয়ে ছিলেন ব্রহ্মকুমারের দিকে।

ব্রহ্মকুমার অমায়িক হেসে বললেন, ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। পলিটিক্স করে করে মাথাটা গেছে। অতি অপদার্থ। মানী লোককে মান দিতে শেখেনি।

বাসু একটু হাসলেন, পিন্টুবাবুকে আমি জানি।

দোষ আমাদেরই হয়েছে ডাক্তারবাবু। সময়মতো চিকিৎসা করানোর দরকার ছিল। আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন, এ আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে।

ডাক্তার বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, আমি একটু হাসপাতালে যাব।

তটস্থ ব্রহ্মকুমার বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা।

বাসুর প্র্যাকটিস খুবই ভালো। দিনে দুটো—তিনটে অপারেশন থাকে বিভিন্ন নার্সিং হোম—এ। নিজস্ব চেম্বারে রুগির অভাব নেই। এই শহরে বাসু হলেন সার্জেনদের রাজা। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে একটা প্রচার আছে যে, তিনি নির্লোভ, টাকাপয়সার খাঁই নেই। উপরন্তু বাসু ব্যাচেলর। সেই জন্য যারা টাকা দিতে পারে তারাও কাঁচুমাচু মুখ করে গরিব সাজে। সুতরাং বাসুর টাকা তেমন হয় না। ফলে তাঁর সমকক্ষ ডাক্তাররা গাড়ি—বাড়ি করে ফেললেও তাঁর কিছুই হয়নি। এমনকী একটা স্কুটার কিনতেও তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছে। এক

মাড়োয়ারি খদ্দের স্কুটারটা মাগনা দিতে চেয়েছিল। উপহার। বাসু নেননি। পরে অনেক ঝোলাঝুলি করে সেই মাড়োয়ারি স্কুটারটা নামমাত্র দামে গছিয়ে ছাড়ল।

বাসুর মতো অন্যমনস্ক লোকের যে স্কুটার জাতীয় বিপজ্জনক যান চালানো উচিত নয় তা তিনি নিজেও জানেন। কিন্তু এই শহরে এক জায়গা থেকে আর—এক জায়গা দিনের মধ্যে পঁচিশ বার দিনে ও রাতে টানা মারা তো সহজ কথা নয়। প্রথম প্রথম হাঁটতেন। পরে রিকশার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু মন্থর রিকশা তাঁর পেশার পক্ষে উপযুক্ত বাহন নয়। স্কুটার সেদিক দিয়ে খুবই উপযোগী। কিন্তু বাসু সারাক্ষণ নানা চিন্তায় এমন আচ্ছন্ন থাকেন যে, স্কুটার চালাতে তাঁর নিজেরও একটু ভয়—ভয় করে। কিন্তু উপায়ই বা কী?

যতক্ষণ স্কুটারটা চলে এবং তার উপর বাসু সওয়ার থাকেন ততক্ষণ তাঁর একটা টেনশন হয়। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত সমস্ত শরীর ও মন সজাগ ও পথ—অভিমুখী রেখে তিনি ছোটখাটো দূরত্ব পার হন। এবং যাত্রাশেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। সেই কারণেই স্কুটারটার সঙ্গে আজও তাঁর সঠিক বনিবনা হয়নি।

হাসপাতালের চত্বরে স্কুটার থামতেই আবার নতুন টেনশন। এক দঙ্গল রিকশাওয়ালা এসে ঘিরে ফেলল।

ডাক্তারবাবু মাহিন্দরকে মেরে লাট করে দিয়েছে।

না বাঁচালে বহুত ঝঞ্ঝাট হয়ে যাবে বাবু।

আমরা বদলা নেব। বিটুবাবুর খুব তেল হয়েছে।

লাভ স্টোর জ্বালিয়ে দেব।

বাসু খুব ক্লান্ত বোধ করেন। কিছু একটা হয়েছে। রোজই হয়। স্কুটারটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে সমবেত ক্রুদ্ধ রিকশাওয়ালাদের দিকে চেয়ে ঠান্ডা গলাতে শুধু বললেন, আমি দেখছি। তোমরা শান্ত হয়ে বোসো।

ওয়ার্ডে যেতেই মিত্রা নার্স বলল, এমারজেন্সিতে একটা কেস আছে, স্যার। মনে হয় সার্জিক্যাল কেস।

রিকশাওয়ালা কি?

হ্যাঁ। ওই যে বাইরে সব জড়ো হয়েছে। এতক্ষণ চেঁচামেচি করছিল।

কীরকম দেখলেন?

হেমারেজ হচ্ছে। কোমা।

দেখছি। আর কোনও কেস?

একটা স্নেক বাইট আছে। আর—একটা বোন ফ্র্যাকচার। সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে বার্ন কেসটার সেকেন্ডারি ইনফেকশন দেখা দিয়েছে।

কোয়াইট এক্সপেক্টেড।

বাসু এমারজেন্সিতে এসে দেখলেন লোকটাকে মেঝেয় কম্বলের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। জ্ঞান নেই। গোঙানোর একটা শব্দ হচ্ছে। কশে রক্ত।

বাসু হাঁটু গেড়ে বসে নাড়ি দেখলেন। তারপর বুকে স্টেথো বসিয়ে এবং নানারকম নাড়াচাড়া করে অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর উঠে দাঁড়ালেন। ঝটকা মার সহ্য করতে পারেনি লোকটা। অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, অনির্ণীত নানারকম রোগ, দুশ্চিন্তা শরীরটাকে অনেক আগে থেকেই খেয়ে রেখেছে। এসব লোক বেঁচে থাকে মাত্র পঁচিশ পারসেন্ট। অস্তিত্বে শতকরা পঁচাত্তর ভাগই মরা। বাসু প্রতিদিন শয়ে শয়ে পঁচাত্তর ভাগ মরা মানুষকে দেখতে পান রিকশা টানছে, মোট বইছে, ভিক্ষে করছে, বেকার বসে আছে। শরীরে স্বাস্থ্য নেই, চোখে দীপ্তি নেই, মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল নয়।

এ লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা বাসু কেন করবেন? বাঁচাতে হলে অনেক মেহনত যাবে। প্রথম কথা, এর রক্ত দরকার। প্রচুর রক্ত। ব্রেন ড্যামেজ যদি হয়ে থাকে তবে চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে হবে অবজারভেশনে। ইনটেনসিভ কেয়ার বলে এখানে কিছু নেই, কিংবা যা আছে তাকে ইনটেনসিভ কেয়ারের ক্যারিক্যাচার বলা যায়। সামান্য একজন রিকশাওয়ালার জন্য এতটা কেন করতে যাবেন বাসু? আরও কোটি কোটি ভারতবাসীর মতো এরও মৃত্যু ঘটে যাক অর্থহীন ভাবে। এ মরলে কার কতটা ক্ষতি? হঠাৎ বাসুর মনে

পড়ল, রিকশাওয়ালারা বিটুর কথা বলছিল। বিটু একে মেরেছে। একটু আগে বিটুর বউকে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন বাসু। আর বিটুর হাতেই মার খেয়ে এ বেচারা ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে।

না, তা হলে লোকটাকে এভাবে মরতে দেওয়া যায় না। বড়লোকেরা টাকা আর প্রভাবের জোরে বাঁচে। গরিবেরা মরে এ দুইয়ের অভাবে। বাসু তাদের মরা ঠেকাতে পারল না। কিন্তু বিটুর হাতে মার—খাওয়া লোকটাকে না বাঁচালে একটা অপরাধ থেকে যাবে।

বাসু নার্সকে ডেকে একটা বেড—এর ব্যবস্থা করতে বললেন।

১২

নামের সঙ্গে মন্টুদের পদবি এমন জুড়ে গেছে যে আর ছাড়াতে পারে না গৌর কন্ট্রাক্টর। চেষ্টাও করে না। পৈতৃক পদবি বিশ্বাস। পারসিদের পদবি ছিল না, পেশা অনুযায়ী যেমন তেমন পদবি নিয়েছিল তারা। তাই কন্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, সোডাওয়াটার বটল ওপেনারওয়ালা ইত্যাকার নানা বিচিত্র পদবিতে তারা ভূষিত। গৌরেরও না তাই হয়ে যায়।

কন্ট্রাক্টরি করলেও গৌর একসময়ে মধ্যপ্রদেশের এম এল এ ছিল। রাজ্যসভায় যাওয়ার কথা হয়েছিল একবার। গৌর দু'বার অল ইন্ডিয়া মোটর র‍্যালি জিতেছিল। গৌর তারও আগে পাহাড়ে উঠত। বেশ দুরূহ কয়েকটা শৃঙ্গ সে জয় করেছে। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, প্লে বয়, বুদ্ধিমান ও প্রায় অবিশ্বাস্য সাহসের অধিকারী গৌর অবশেষে ঠিকাদারিতে থামবে এটা কেউ আশা করেনি। শিলিগুড়িতে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল। অনেকগুলো ভাইবোন। অভাবের সংসার থেকে গৌর একদিন উধাও হল। তার সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি আছে। মধ্যপ্রদেশে সে সোনার খনি বা গুপ্তধন পেয়েছে, বোম্বাইতে একটা ঘোড়দৌড়ে কয়েক লাখ টাকা পিটেছে, উদ্বাস্তু রিলিফের টাকা মেরেছে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য গৌর এসব কিছুই করেনি। মধ্যপ্রদেশ জায়গাটা সে বেছে নিয়েছিল নিজের চারণভূমি হিসেবে। এই রাজ্যে লোক কম প্রচুর অনাবাদি জমি ও গহিন জঙ্গল আজও আছে। এ রাজ্যের অধিবাসীরা অধিকাংশই বহিরাগত। গৌর এ রাজ্যে এসে কয়েকজন প্রবাসী ও প্রভাবশালী বাঙালির আনুকূল্য পেয়ে যায়। প্রতিভাবানদের খুব সামান্য সাহায্য হলেই চলে। গৌরেরও চলল। মোট দশ—বারো বছর মধ্যপ্রদেশে ছিল সে। তার মধ্যেই ওই এম এল এ হওয়া অবধি ছিল। এর থেকেই তার এলেম অনুমান করা যায়।

শিলিগুড়িতে সুমনাদের বাস ছিল গৌরদের বাড়ির কাছেই। এ দুজনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই। সুমনাও জানতেন, গৌরও জানত। কিন্তু বাউন্ডুলে গৌর ফিরলই না সময়মতো। সুমনার বিয়ে হয়ে গেল ব্রহ্মকুমারের সঙ্গে।

গৌর ফিরল যখন সুমনার কোল ভরে দু'—দুটি বাচ্চা এসে গেছে। ফিরেই গৌর ঝাঁপিয়ে পড়ল শিলিগুড়ির ভাণ্ডার লুটতে। মাত্র দু'—তিন বছরে নিজস্ব বুদ্ধি ও ভুজবলে গৌর এমন উঁচু থাকের ঠিকাদার হয়ে বসল যে, মাড়োয়ারি বেনেরা পর্যন্ত অবাক। আজ গৌরের চার—পাঁচখানা গাড়ি, শ'খানেক লরি, চারখানা পেল্লায় বাড়ি, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি এবং দিঘায় হোটেল, হিলকার্ট রোডে মস্ত মোটর পার্টসের দোকান, নিউ মার্কেটে টিভি এবং ইলেকট্রনিকসের শোরুম, আরও নাকি করবে কী সব। বিয়ে করেনি। টাকা রোজগারই একমাত্র নেশা।

এমনিতে গৌর অতিশয় সজ্জন মানুষ।

সুমনার বিয়ের তিন বছর বাদে গৌর একদিন দেখা করতে এল। সুমনা লজ্জায় সামনে যাননি প্রথমে। ব্রহ্মকুমার বড্ড বেশি ব্যাকুল হয়ে ডাকাডাকি করায় গেলেন।

এ মানুষটা তাঁর স্বামী হতে পারত, এ কথা ভাবাও যে এখন পাপ!

গৌর বেশ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ সুমনার দিকে চেয়েছিল। তারপর বলল, বেশ হয়েছ তো! একদম অন্যরকম।

সুমনা লজ্জা পেয়ে পালাচ্ছিলেন।

গৌর বলল, লজ্জা পেয়ো না, এখন লজ্জা পাওয়ার মানে হয় না।

সুমনার অনেক কথা বলার ছিল। খুব বকতে ইচ্ছে করছিল লোকটাকে, একটা জীবন এই যে অন্যের বউ হয়ে কাটাতে হচ্ছে তাঁকে এটা তো একটা অপমানই।

পরে বিরলে গৌর একদিন সুমনার কাছে এসেছিল।

মিতু সুমনার ডাকনাম। সেই নাম ধরে ডেকে বলল, দোষ আমারই। কিন্তু আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরলে পারতে।

কী হত তাতে? তুমি মধ্যপ্রদেশের অত কাজ ছেড়ে আমাকে বিয়ে করতে আসতে?

আসতাম। বিয়ের জন্যই তৈরি হচ্ছিলাম। হঠাৎ বাড়ির চিঠি গেল তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

তখন কী করলে?

কী আর করব। জীবনের অর্থটাই হারিয়ে গেল। আর বিয়ে করারও কোনো মানে হয় না। কাউকে তো আর বউ বলে নেওয়া যাবে না।

সুমনা খুব কাঁদলেন এ কথায়।

গৌর চলে যাওয়ার আগে বলল, শিলিগুড়িতে ফিরে এলাম তোমার জন্যেই। তোমাকে পেলাম না ঠিকই, তবে কাছাকাছি থাকারও সুখ আছে।

থাকো। কোথাও চলে যেয়ো না পাগলাসাহেব।

যাব না।

সত্যিই বিয়ে করবে না?

না। বলেছি না, বিয়ে করা অর্থহীন হবে। ওরও তো একটা রচনা আছে।

গৌর যে বিয়ে করল না এটা সুমনার এক মস্ত জয়। বলতে গেলে তাঁর একমাত্র জয়। গৌর যে খুব আসে বা তাঁদের মধ্যে যে গোপনে অনেক কথা হয়, তা কিন্তু মোটেই নয়। গৌর ব্যস্ত মানুষ, হিল্লি—দিল্লি করতে হয়। তবে আড়াল থেকে এই পরিবারটিকে গৌর ঠিকানা দিয়েছে অনেক। ব্রহ্মকুমারের যখন পসার ছিল না তখন গৌরই তাঁকে প্রতিষ্ঠা পেতে সবচেয়ে সাহায্য করেছে। গৌরই করে দিয়েছে ব্রহ্মকুমারের বাড়িখানা। গৌর আরও কত কী করেছে তার হিসেব নেই। সুমনা যে—কোনো প্রয়োজনেই আজও নিঃসংকোচে গৌরের কাছে হাত পাতেন। একটি অধিকারবোধ কাজ করে। মাঝে মাঝে তিনি জিভ কেটে ভাবেন, আমার কি দুটো স্বামী?

গৌর সেরকম ভাবে না। তার মনটা অন্যরকম। প্রেমার্ত সে কোনওদিনই নয়। আসলে সুমনার প্রতি তার এক নিরঙ্কুশ অধিকারবোধ ছিল। শরৎচন্দ্রের নভেলে এরকম অনেক দেখা যায়। সেই বাল্য—প্রণয়ের ব্যাপারটা সুগন্ধের শূন্য শিশিতে কেমন করে যেন একটু লেগে থাকে।

বিটুর বাচ্চা হয়েছে, এ খবরটা গৌর পেল তার মোটর পার্টসের দোকানে বসে। নার্সিং হোম থেকে ফোন করেছিল পিন্টু।

গোরাকা, তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি।

গৌর খুবই ব্যস্ত ছিল। সামনেই এক মিলিটারি অফিসার বসা। বিজনেস টক হচ্ছে। একটু সতর্ক গলায় বলল, খারাপ কিছু নয় তো!

আরে না। মেজোবউদির একটা বাচ্চা হয়েছে।

ও। সোমা কেমন আছে?

ভালো।

ওর না সেই হার্টের কী একটা গন্ডগোল ছিল?

হ্যাঁ। ডাক্তার বাসু সেফলি ব্যাপারটা ট্যাকেল করেছেন।

কোনও কমপ্লিকেশন নেই তো?

না।

এই পিন্টুকে পুষ্যি নিতে চেয়েছিল গৌর। সুমনা দেননি। তিনি মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, পুষ্যি আবার ঘটা করে নেবে কেন? পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে তা হলে। তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তা তো কিছু লোক জানে। তার চেয়ে নিজের ছেলে বলে ধরে নাও, ওর যাতে ভালো হয় দেখো, সেইটেই ভালো।

গৌর যুক্তিটা বুঝেছিল। পুষ্যি নেওয়াটা কাজের কথা নয়। পিন্টুকে সেই থেকে গৌর আলাদা রকমের প্রশয় দেয়। শখের জিনিস কিনে দেওয়া, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, সাইকেল বা স্কুটারে বা গাড়িতে চাপানো—এসব পিন্টুর ছেলেবেলায় গৌর অনেক করেছে। রোজ একবার ছেলেটাকে না দেখে থাকতে পারত না। পিন্টু একটু বড় হওয়ার পর তার স্কুল—কলেজের মাইনে বইখাতা জামাকাপড় এবং হাতখরচ সবই ছিল গৌরের দায়িত্ব। রাজনীতিতে পিন্টুর তালিমও গৌরের কাছে। গৌরের সঙ্গে পিন্টুর সম্পর্ক পরস্পরের অজান্তেই বাপ—ব্যাটায় দাঁড়িয়ে গেছে। আজও গৌরকেই যা একটু পোঁছে পিন্টু।

গৌর পিন্টুর মুখখানা একটু ভাবল। বুকটি ভরে গেল মায়ায়। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল, ভালো খবর। বিকেলের দিকে একবার নার্সিং হোম—এ যেতে পারি।

আর শোনো গোরাকা। একটা বিপদ হয়েছে।

কী বিপদ?

বিটু আজ একটা রিকশাওয়ালাকে খুব মেরেছে। লোকটা এখন হাসপাতালে। বাঁচতে পারে, নাও পারে। মনে হচ্ছে লোকটা মরে গেলে একটা জোর হাঙ্গামা হবে।

গৌর একটু বিরক্ত হয়ে বলে, তোরা কি হাত—ফাত না চালিয়ে থাকতে পারিস না। ভদ্রতা সৌজন্য মায়া—দয়ার পাট যে তুলে দিলি!

আহা, আমাকে বকছ কেন? আমি আর এখন ওসব করি?

নিজে হাতে না করলেও তোর দল করে। যাকগে, কী হয়েছে পরিষ্কার করে বল। পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছে?

এ কেস পুলিশের খাতায় উঠবেই। তবে এখনও এনকোয়ারি হয়নি। হলে মুশকিল।

তা আমাকে কী করতে হবে?

আমি তার কী বলব? যা ভালো বুঝবে করবে।

আমি এসব ভালো বুঝি না। তুই বরং একবার থানায় যা। দেখ ডায়েরি হয়েছে কিনা। এক্ষুনি যা।

হলে কি করব?

আমাকে ফোন করিস। রিকশা ইউনিয়ন থেকে এসেছিল?

না। তবে রিকশাওয়ালা মেলা জড়ো হয়েছে হাসপাতালে, শুনলাম।

হবেই। এখন যা বলছি করগে যা।

আর একটা কথা। শচী চক্রবর্তী নামে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির এক লেকচারার আছে। চেনো?

না। চিনবার মতো নাকি?

সে একটু জল ঘোলা করতে পারে। তেজি মেয়ে।

গৌর একটু শঙ্কিত গলায় বলে, কেন? তুই কি তার সঙ্গে তর্কাতর্কি কিছু করেছিস নাকি?

না। মেয়েদের সঙ্গে আমি কখনও ঝগড়া—টগড়া করি না। সেকেন্ড—গ্রেড সিটিজেনদের সঙ্গে কেউ তর্ক করে জাত খোওয়ায়?

গৌর একটু হাসল। তারপর বলল, মেয়েটা দেখতে কেমন?

খুব চোখা।

বয়স?

বেশি নয়। ছুকরি।

সে কি ওই রিকশায় ছিল?

হ্যাঁ। সেটাই তো শুনলাম।

বিটু হঠাৎ রুস্তম সাজতে গেল কেন? তোদের ভাইদের রক্ত আর ধাত এত গরম কেন বল তো? গরিব একটা রিকশাওয়ালার ওপর এইসব করার কোনো মানে হয়?

সেইটেই তো কথা গোরাকা। মানুষ যে কেন এত রি—অ্যাক্ট করে বুঝি না। বিটুকে তো জানো। টোটালি ফ্রাস্ট্রেটেড। ও যে কখন কী করবে তার ঠিক নেই। এমনিতে তো ঠান্ডা, শান্ত, ভদ্র।

গৌর গম্ভীর গলায় বলল, জানি। বিটুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস। আর লাভ স্টোর একবেলার জন্য বন্ধ করে দিতে বল। আজ যেন আর না খোলে।

কেন বলো তো!

পাবলিকের হাতের নাগালে থাকার দরকার কী?

এ কথায় পিন্টু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হেসে বলল, আরে গোরাকা, তুমি মারধরের ভয় পাচ্ছ নাকি? ওসব হবে না। হলেও থোড়াই পরোয়া করি। পাবলিক এখনও আমাদের সমঝে চলে। আর বিটু মারদাঙ্গা কিছু কম করেনি।

করেছে বলেই ভয়। অনেকের রাগ পোষা আছে।

১৩

শচী শিলিগুড়িতে নতুন। শহরটা সে ভালো চেনেও না। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস শহর থেকে অনেক দূরে, সেই রামমোহন রায়পুরে। সেখানেই তার কোয়ার্টার, মাঝেমধ্যে বাস ধরে চলে আসে কেনাকাটা করতে। শহর মাত্রই ভালো লাগে শচীর। লোকজন, দোকান পসার, জমজমে ভাব। রামমোহনপুরে বড্ড একটেরে একঘেয়ে লাগে। পড়াশুনো ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অবসর বিনোদন নেই। মাত্রই মাস চারেক হল সে এসেছে, এখনও তেমন চেনাজানাও হয়নি সকলের সঙ্গে।

একা থাকতে তার কোনো অসুবিধে হয় কি না তা জিজ্ঞেস করেছিলেন এক বয়স্ক কলিগ।

শচী বলেছিল, হয়। একঘেয়ে লাগে।

উনি বললেন, না, সে কথা বলছি না, একঘেয়ে তো লাগবেই। আমি বলছিলাম, আপনি যুবতী মেয়ে, একা, বিপদের আশঙ্কা করে না?

শচী একটু হেসেছিল। এরা তো আর অতীতটা জানে না। শচী চক্রবর্তী ভয় পাবে কী শচীই তো কত মানুষের ভয়ের কারণ ছিল একদা। যখন সে সক্রিয় রাজনীতি করত এবং ছিল মোটামুটি সাহসী, মুখর ও প্রবল অনুভূতিশীল। থানা ঘেরাও করা বা পুলিশের উদ্যত বন্দুকের সামনে এগিয়ে যাওয়া কোনো ব্যাপার ছিল না তার কাছে। দু'বার সে গ্রেফতার হয়েছিল। তার মধ্যে একবার তাকে দেড়মাসের মতো জেল খাটতে হয়েছে।

এসব খুব বেশিদিনের কথাও নয়।

তবে বছরখানেক হল, শচী অনেকটা জুড়িয়ে গেছে। ঘোর বামপন্থী শচী ভূত—ভগবান—ভাগ্য মানে না। প্রচণ্ড আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মবিশ্বাসী। লতানে স্বভাব তার এক্কেবারেই নেই। বাঙালি ছেলেদের সম্পর্কে সে এতই উন্নাসিক যে, আজ অবধি কোনো বাঙালি ছেলের প্রেমে পড়ার কথা সে ভাবতেও পারেনি। বিয়ে ব্যাপারটাকে এখনও অবধি সে প্রচণ্ড ঘেন্না পায়।

শচী রাজনীতিতে যেমন উগ্রপন্থী ছিল, ব্যক্তিগত রুচি এবং মেজাজেও তেমনি উগ্রপন্থী। তার সঙ্গে যে—ই একটু মিশেছে সে—ই বুঝেছে যে এটি একটি ঠান্ডা বোমা। সাবধানে না চললে যে—কোনো সময়ে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

আজ রিকশা—সাইকেল সংঘর্ষের পর যে কুৎসিত ব্যাপারটা ঘটে গেল তা শচীর জীবনে একেবারে নতুন ঘটনা। এরকম পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। সে হকচকিয়ে গিয়েছিল বলে বিটু আজ বেঁচে গেছে। কিন্তু

দরিদ্র রোগা বুড়ো রিকশাওয়ালার ওপর ওই মারের দৃশ্যটা শচীর মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।
মারকুট্টা ছেলেটার নাম জেনে নিয়েছে শচী। যে ছেলেটা রিকশাওয়ালাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেছে তার নামও। শচী ছাড়বে না।
আর—একটা রিকশা ধরে সে সোজা থানায় চলে এল।
সর্বত্রই শচী নিজেকে জাহির করতে পারে। তার চোখ, ধারালো মুখ, মুখে কাঠিন্যের রেখা, দৃপ্ত ভঙ্গি এসবের মধ্যেই তার অন্তর্নিহিত সেই উগ্রতা প্রকাশ পায় যাকে কেউ সহজে উপেক্ষা করতে পারে না। ভিড়ের মধ্যেও তাকে আলাদা করে চিনে নেয় লোকে। মাতাল, বদমাশ, পাড়ার মস্তান বা রকবাজেরা সহজে তাকে ঘাঁটায় না। তাকে কখনও বিরক্ত করেনি তার সহপাঠীরা।
থানায় সে ঢোকামাত্র খাতির পেল। একজন সুদর্শন সেকেন্ড অফিসার তাকে বসাল, পরিচয় জানল এবং কেসটা লিখে নিল।
শচী জিজ্ঞেস করে, আপনারা বিটুকে কখন অ্যারেস্ট করবেন?
এনকোয়্যারির পর।
এনকোয়্যারি কখন হবে?
সেকেন্ড অফিসার ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি। জিপটা একটু বেরিয়েছে। ওটা ফিরলেই।
আমি শুনেছি বিটুবাবুর বাবা বেশ প্রভাবশালী উকিল এবং পরিবারটাও বোধহয় টাকাপয়সাওলা। কিন্তু আমার অনুরোধ এগুলো যেন আপনাদের ইনফ্লুয়েন্স না করে।
সেকেন্ড অফিসার একটু হাসল। বলল, আমরা সরকারি চাকরি করি। আমাদের ওপর হাজার রকমের প্রেশার। এসব তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তবু বলছি, আমরা যথাসাধ্য করব। বিটু আর পিন্টুকে আমি চিনি। পিন্টু তো প্রায়ই থানায় আসে।
শচী একটু চিন্তিতভাবে বলল, এখানে একটা ডেইলি পেপার আছে না?
আছে।
খবরটা আমি তাদেরও জানাতে চাই।
ঠিক আছে। তবে আপনি না জানালেও জেনে যাবে। থানা থেকেই ওরা খবর নেয় রোজ।
শচী উঠল। রিকশা অপেক্ষা করছিল তার জন্য। রিকশাওয়ালা একটি ছোকরা। সে জানে যে, শচী তাদেরই একজন সহকর্মীর জন্য লড়তে নামছে। শচী সিটে উঠে বসতেই ছোকরাটি বলল, কিছুই হবে না দিদি। বিটুবাবুদের পয়সা আছে। ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবে।
শচী বলল, জানি। তবু ছাড়ব না। তোমরাও ছেড়ো না।
আমাদের মধ্যে এককাট্টা ভাবটা নেই তো।
তোমাদের তো ইউনিয়ন আছে।
আছে। কিন্তু বিটুবাবুদের কিছু করতে পারবে না। ইউনিয়নের লিডাররা পিন্টুবাবুর বন্ধু।
শচী কিছু বলল না। তবে ভাবল। এক জায়গায় একটা পুরনো পরিবার বহুদিন বসবাস করার ফলে শেকড়বাকড় গেড়ে ফেলেছে। প্রভাব—প্রতিপত্তি টাকার জোরও কম নয়। হয়তো কিছুই করা যাবে না এদের। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।
হাসপাতালের সামনে বেশ একটু ভিড়। জনা ত্রিশেক রিকশাওয়ালা জড়ো হয়েছে। চেঁচামেচি নেই, তবে চাপা উত্তেজনা রয়েছে।
শচী নামতেই একজন এগিয়ে এল। একটু মস্তানের মতো চেহারা। গায়ে লাল স্যান্ডো গেঞ্জি। গলায় কার—এ বাঁধা একটা চৌকো তাবিজ। পরনে ময়লা লুঙ্গি। বয়স বছর ত্রিশেক।
দিদি, আপনি কিন্তু সাক্ষী দেবেন।

শচী অবাক হয়ে বলল, কেন দেব না?

অনেকেই শেষ অবধি ভয় খেয়ে যায় তো।

আমি কাউকে ভয় পাই না। লোকটা কেমন আছে?

ডাক্তার বাসু দেখছেন। ভালো ডাক্তার। তবে কেউ কিছু বলছে না।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করা যায় না?

লোকটা হাত তুলে দেখাল, ওই দিকে আউটডোরের ঘর আছে। ওখানেই চলে আসবেন। আপনি গিয়ে বসুন।

হাসপাতালের অবস্থা এই প্রথম দেখল শচী। যথেষ্টই খারাপ। তবে তৃতীয় বিশ্বে তো এরকমই হওয়ার কথা।

ডাক্তারের ঘরখানা একেবারেই বে—আব্রু এবং শ্রীহীন। এখানে কোনো চিকিৎসা বা রোগী পরীক্ষা হয় বলে মনেই হয় না। শচী একটা শক্ত কেঠো চেয়ারে বসে আঁচল দিয়ে মুখের সামান্য ঘাম মুছল। একটা লড়াইয়ের গন্ধ আছে বলে সে যথেষ্ট চনমনে বোধ করছে। টনটন করছে বিষদাঁত। সে ছোবল তুলেছে। ছোবলটা লক্ষ্যবস্তুতে সে বিঁধিয়ে দেবেই।

শান্তভাবেই অপেক্ষা করতে লাগল শচী। হাতব্যাগ থেকে একখানা বই বের করে পড়তে লাগল। 'টেরোরিস্টস অর মারসিন্যারিজ' নামে একখানা পেপারব্যাক! সদ্যই কিনেছে। টেররিজম—এর মধ্যে যে পেশাদার ভাড়াটে মনোভাব ঢুকেছে তা—ই প্রতিপাদ্য বিষয়। অশান্ত পৃথিবীর সর্বত্রই চলছে সন্ত্রাস, হত্যা, গন্ডগোল এবং তার পিছনে মদত দিচ্ছে অন্ধ ব্যবসায়ী, ড্রাগ পাচারকারী, অসাধু ক্ষমতালোভী। শচী সবই মোটামুটি জানে।

পড়তে পড়তে ডুবে গিয়েছিল। ডাক্তার বাসু চেয়ারের শব্দ তুলে বসতে শচীর চটকা ভাঙল।

বাসুকে এক নজরে জরিপ করে নিল শচী। বিষণ্ণ চেহারা। তবে সুপুরুষ।

আপনিই ডাক্তার বসু?

বাসু প্রথমে কোনো জবাব দিল না। নীরবে একটু চেয়ে রইল শচীর দিকে। তারপর বলল, বসু আমার পদবি নয়। আমার নাম বাসুদেব ব্যানার্জি। লোকে ডাক্তার বাসু যে কেন বলে তা আমিও ভেবে পাই না।

শচী একটু লজ্জা পেয়ে বলে, মাফ করবেন।

আরে না, লোকে যা বলে তা বলতে দোষ কী? তবে আপনি ডাক্তার বসু বলায় ভুলটা ভেঙে দিলাম। এবার বলুন, কী জানতে চান?

আমি ওই লোকটার খবর নিতে এসেছি। রিকশাওয়ালা।

মার্জিনাল কেস। তবে—

তবে কী?

ইনজুরি তো ফ্যাটাল নয়। সমস্যা হল ভাইটালিটি নিয়ে। শরীরে জীবনশক্তি বলে কিছু নেই।

এটাকে নিশ্চয়ই পুলিশ—কেস হিসেবে নিয়েছেন?

দু'হাতের তেলো ডলে একটা অসহায় ভঙ্গি করে বাসু বলল, আমি তার কী জানি? পুলিশকে খবর দেওয়ার দায়িত্ব আমার নয়, হাসপাতালের।

আমি ওর রিকশায় ছিলাম। আমার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে।

বাসু আবার তার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মৃদু স্বরে বলল, আপনি কি অ্যাকশন চান?

চাই। বিটু না কী যেন লোকটার নাম, তাকে আমি জেলে পাঠাতে চাই। মেডিক্যাল রিপোর্টটা আপনি কীরকম দেবেন তার ওপর সব নির্ভর করবে।

বাসু এবার হাসল। মৃদু স্বরে বলল, রিপোর্ট হবে। তার আগে আমার যা কাজ তা আমাকে করতে হবে। বিটুর জেল হওয়ার চেয়ে বেশি ইমপর্ট্যান্ট লোকটাকে বাঁচানো। আপনার ব্লাড গ্রুপ কী তা জানা আছে?

ও গ্রুপ।

খুব ভালো। আপনার রিকশাওয়ালার কিছু রক্ত দরকার। আপাতত আপনি ওর জন্য কিছুটা রক্ত দিতে পারেন।

শচী একটু বিবর্ণ হল। সে যথেষ্ট সাহসী ও ডাকাবুকো বটে, কিন্তু ছুঁচকে সে ভয় পায়। রক্তের রং দেখলে তার গা শিরশির করে। একটু থেমে ভেবে নিল শচী। তারপর বলল, ঠিক আছে।

বাসু ক্লান্তিতে একটু পিছন দিকে হেলে বসল। চোখ বুজে নিস্পন্দ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর স্তিমিত গলায় বলল, আপনি বোধহয় একটু নার্ভাস টাইপ।

না। আমি রক্ত দিতে পারব।

হিরোইকসের দরকার নেই। ও গ্রুপ খুব কমন গ্রুপ। আপনি না দিলেও ওরা বন্ধুরা দেবে। হয়ে যাবে।

শচী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, প্রয়োজন হলে আমিও দিতে পারি।

বাসু তার দিকে চেয়ে বিমর্ষ মিয়োনো গলায় বলল, হাসপাতালের অবস্থা কীরকম তা তো নিশ্চয়ই জানেন?

দেখছি, খুব খারাপ।

হ্যাঁ, ভীষণ খারাপ, চিকিৎসা খারাপ, ওষুধ খারাপ, পরিবেশ খারাপ, আর তার চেয়েও খারাপ হল এখানকার খাবার। খুব গরিবেরও খেতে কষ্ট হয়।

তাও জানি।

আপনার রিকশাওয়ালাটির যখন জ্ঞান ফিরবে এবং নরম্যাল ডায়েট নিতে পারবে তখন তার কিছু পুষ্টিকর খাবার দরকার হবে। পারবেন কিছু কিনে দিতে?

নিশ্চয়ই পারব। কী লাগবে বলুন?

এখন নয়। এখন ওকে ড্রিপ দেওয়া হয়েছে। যদি লোকটা বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারে তা হলে দু'—তিন দিন পর আপনি আমার কাছ থেকে একটা লিস্ট নিয়ে যাবেন। ভয়াবহ কিছু নয়। দামি কিছু লাগবে না। কিছু ফল, কয়েকটা ওষুধ, একটু প্রোটিন আর দুধ।

নিশ্চয়ই। আমার নাম শচী চক্রবর্তী। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। আমার ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে যাব।

বাসু অবাক হয়ে বলল, ঠিকানা দিয়ে কী করব? আপনি যদি নিজে থেকেই রোগীর খবর নেন তবে হবে।

ডাক্তার বাসু ছোকরা নয়, তবে বয়স খুব বেশিও নয়। এই বয়সেই মুখে গভীর বিষাদের রেখা কেন তা বুঝতে চেষ্টা করছিল শচী। তারপর সে ডাক্তার বাসুকে যা বলল তা সম্পূর্ণ বাস্তব এক হিসেবি কথা। সে বলল, রিকশাওয়ালার জন্য আমার যা যা করা উচিত তা শুনলাম। কিন্তু যে লোকটা ওকে মেরেছে তার কি কিছুই কর্তব্য নেই?

ডাক্তার বাসু তার ম্লান চোখ তুলে তাকাল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আমি যাকে সামনে পাই তাকেই কিছু না কিছু করার কথা বলি। কার কোনটা কর্তব্য তা সবসময়ে মনে থাকে না। বিটুকে দিয়ে যদি করাতে চান তাও পারেন। কেউ একজন করলেই হল। বোধহয় ওর ফ্যামিলির জন্যও কাউকে কিছু করতে হবে, নইলে তারা মরবে না খেয়ে।

হ্যাঁ, সেটাও বিটুদেরই করা উচিত।

বাসু একটা অসহায় কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কে করাবে?

পুলিশ।

বাসু চুপ করে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আপনি কি সোশ্যাল ওয়ার্কার?

একরকম।

তাহলে হয়তো আপনি পারবেন। কে করবে, কার করা উচিত তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু কাউকে তো করতেই হবে। সেই দায়িত্বটা আপনি নেবেন? নিলে ভালো হয়। আমার মাইনে বা প্র্যাকটিসের রোজগার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, থাকলে—

শচী একটু আগ্রহ বোধ করল বাকিটা শুনতে, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করা অভদ্রতা হবে বলে চুপ করে রইল।

বাসু মাথা নেড়ে বলে, কিছুই থাকে না। মানুষের প্রয়োজন আর চাহিদা এত বিপুল যে, কিছুই করতে পারি না।

শচী একটু নম্র হয়ে বলল, এটা তো একার কাজ নয়। অনেকের কাজ। সরকারের দায়িত্ব। আপনি নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে কত মানুষের উপকার করবেন?

বাসু গভীর হতাশার গলায় বলল, কেউ তো দায়িত্ব নেয় না। কাউকে বলেও কিছু লাভ হয় না। এই হাসপাতালের পিছনে যে বিরাট টাকা খরচ হয় তাই দিয়ে চমৎকার চলতে পারত। ওষুধ, খাবার, যন্ত্রপাতি কিছুই যে কেন পাওয়া যায় না হাসপাতালে। একজন ঝাড়ুদার বা মেথরও ঠিকমতো কাজ করে না।

ডাক্তার বাসুর গভীর হতাশা শচীকে একটু স্পর্শ করল। লোকটির মধ্যে এখনও দয়ামায়া আছে। এখনও পোড় খায়নি, শক্তপোক্ত হয়ে ওঠেনি বেচারা।

শচী বলল, আমার যেটুকু করার করব। তবে আমি অনেক দূরে থাকি।

অত দূর থেকে খুব বেশি কিছু করা যাবে না।

আপনি কোথায় থাকেন?

একবার বোধহয় বলেছি আপনাকে, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে। আপনি এত অন্যমনস্ক কেন? ডাক্তারের অন্যমনস্ক হওয়াটা কিন্তু বিপজ্জনক।

বাসু অবাক হয়ে শচীর দিকে চেয়ে বলল, আমি আর অন্য সব ব্যাপারে অন্যমনস্ক হলেও চিকিৎসার ব্যাপারে নই। আজ অবধি কেউ এ কথা বলেনি।

যাদের মধ্যে আনমাইন্ডফুলনেস থাকে তাদের সব ব্যাপারেই সেটা ফুটে ওঠে।

বাসুর ফর্সা রঙে একটু লালচে আভা লাগল। তবে কিছু তেমন বললেন না, শুধু বলল, ও, তা হবে।

শচী উঠল, আজ যাচ্ছি।

১৪

ঝিন্টু তার আদরের সাইকেলটার দুর্দশা দেখছিল হাঁটু গেড়ে বসে। লাভ স্টোরের সামনে। এই স্পোক এখানে পাওয়া যাবে না। সারাই করে নিতে হবে।

একটু অপরাধী মুখ নিয়ে বিটু দৃশ্যটা দেখছিল। ঝিন্টু তার চমৎকার সাইকেলটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

ঝিন্টু সাইকেলটা একটু তুলে চাকাটা ঘোরাল। না, রিম টাল খায়নি। খেলে ফ্রেমের গায়ে লাগত। স্পোকগুলো মোটামুটি ঠুকে সোজা করে দিয়েছে সারাইকার। আপাতত চালানো যাবে। তবে নিখুঁত জিনিসটার একটা খুঁত হয়ে গেল। ঝিন্টুর চোখ ফেটে জল আসছিল। শরীর রি রি করছে রাগে। দাদা না হলে হাত চালিয়ে দিত। তবে মনে মনে যে অবিরল গালাগাল দিয়েছিল, শালা ঢ্যামনা, সাইকেল চালাতে জানে না তবু শালা ওস্তাদি দেখাবে। ব্যালান্স নেই, শরীর ঢ্যাপসা, রিফ্লেক্স নেই, দু'নম্বরি একটা দোকানদার, তোর এত আস্বা কীসের? ইঃ, বউয়ের বাচ্চা হয়েছে। উনি একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটলেন সাইকেলটার বারোটা বাজাতে।

সাফাই হিসেবে বিটু অবশ্য ভাইকে অনেক স্তোক দিয়েছে। ঝিন্টু একটাও কথা বলেনি।

বিটু নেমে এল দোকান থেকে।

বুঝলি ঝিন্টু, লোকটাকে খুব মেরেছি। খুব।

ভালো। আমি যাচ্ছি।

তোর সাইকেল আমি কিনে দেব।
লাগবে না। দেনেওলা বহুত দেখেছি।
রাগছিস কেন? সাইকেল আমারও ছিল।
জানি। ব্যালান্স নেই, সাইকেল চালাতে জানো না, তবু চড়তে গেলে কেন?
বিটু একটু গরম হয়ে বলে, দেখ, বড় বড় কথা বলিস না। সাইকেলবাজ আমি তোর চেয়ে কম ছিলাম না।
ছিলে তো ছিলে। তাতে কী? এখন তো বসে বসে আর খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছ। সাইকেলে তোমার চড়াই উচিত নয়।
বিটুর রাগ হঠাৎ ওঠে। তার কারণ বহুবিধ। এক হল, যে বুড়ো রিকশাওয়ালাকে সে মেরেছে তার অবস্থা ভালো নয় বলে একটা খবর রটেছে। হাঙ্গামা লাগা বিচিত্র নয়। তার ওপর বাচ্চা হওয়া নিয়ে টেনশন, তার ওপর দোকান নিয়ে টেনশন।
বিটু রাগে গড়গড় করে উঠল, মুখ সামলে কথা বলিস কিন্তু ঝিন্টু, ভালো হবে না।
ঝিন্টু সেদিনকার ছেলে, একরত্তি। কিন্তু তেজ তার কিছু কম নয়। মুখটা তুলে বিটুর দিকে চেয়ে সমান দাপটের গলায় বলল, যাও, যাও, বেশি দাদাগিরি ফলাতে এসো না। কাকে ভয় দেখাচ্ছ?
খুব বাড় বেড়েছে তোর! অ্যাঁ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!
তোমাকে আমি কিছুই বলিনি, আগ বাড়িয়ে ভালমানুষি দেখাতে এসেছ কেন? জানো, এই সাইকেলটার দাম কত? কিনে দেবে! এ বড় কিনে দেনেওলা লোক! ব্রহ্ম গাঙ্গুলির পয়সায় ফুটানি করে বেড়াচ্ছ আবার কিনে দেবে।
বিটু আচমকাই ভাইয়ের চুলের মুঠির জন্য হাত বাড়াল, ডান হাতে তুলল থাবড়া।
চোখের পলকেই ঝিন্টু সাইকেলটা টেনে আনল দুজনের মাঝখানে। বিটু কিছু দ্বিধা করেছিল। একটু আগেই এক রিকশাওয়ালাকে মেরেছে সে। কাজটা ভালো হয়নি।
কী হত বলা যায় না। কিন্তু কিছু হওয়ার আগেই একটা রিকশা এসে লাভ স্টোরের সামনে থামল। চটপটে পায়ে একটা মেয়ে নেমে এসে বিটুর দিকে অতিশয় কঠিন চোখে চেয়ে বলল, আপনি বিটু গাঙ্গুলি?
বিটু ঝিন্টুকে মারার জন্য যে হাতখানা তুলেছিল তা নামিয়ে এনে বলল, হ্যাঁ।
আমাকে চিনতে পারছেন?
না তো!
একটু আগে আপনি যে রিকশাওয়ালার ওপর দারুণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন আমি তার রিকশায় ছিলাম। আমার নাম শচী চক্রবর্তী।
বিটুর রিফ্লেক্স অনেক কমে গেছে। কেমন ভোঁদামার্কা হয়ে গেছে তার মাথা। কেমন যেন হতচকিত হয়ে বলল, ও।
আপনার নামে আমি পুলিশে একটা রিপোর্ট করেছি। তারা অ্যাকশান নেবে কি না জানি না। যদি না নেয় তা হলে আমি আপনার বিরুদ্ধে পোলিটিক্যাল অ্যাকশান নেওয়ার চেষ্টা করব।
বিটু মেয়েটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। তার মুখের ওপর এরকম ভাবে কথা বলছে, মেয়েটা কে?
ঝিন্টু সাইকেলে কনুইয়ের ভর রেখে দৃশ্যটা দেখছিল। এটা ঠিকই মেজদাকে সে পছন্দ করছে না। রাগ এখনও দাউ দাউ জ্বলছে ভিতরে। কিন্তু মেজদার অপমানটাও সে তো আর দাঁড়িয়ে দেখতে পারে না।
ঝিন্টু হঠাৎ বলল, শুনুন দিদি, আমি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। তবে আপনার সাবজেক্টে নয়। আপনাকে চিনি। নতুন এসেছেন, একসময় পলিটিক্স করতেন, সব জানি। কিন্তু এভাবে রাস্তায় ঘাটে চোখ রাঙানোটা ঠিক নয়। আপনি চলে যান।
শচী ঝিন্টুর দিকে তাকাল। ছেলেটাকে তার চেনা ঠেকল না। বলল, তুমি এর মধ্যে কথা বলছ কেন?

ঝিন্টু ইঙ্গিতে বিটুকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, আপনার ভিকটিম আমার দাদা, সহোদর ভাই। আমাদের সব ভাইকেই শহরের সবাই চেনে। কেউ কখনও চোখ রাঙায় না।

শচী রাগে জ্বলে যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। তবু গলা ঠান্ডা রেখে বলল, কেন রাঙায় না বলো তো? তোমরা কি গুন্ডা?

গুন্ডা—ফুন্ডা নই। ভদ্রলোক। আর ভদ্রলোক বলেই রাস্তার লোক আমাদের চোখ রাঙায় না।

শচী তবু মাথা ঠান্ডা রাখল, তুমি জানো তোমার দাদা কী করেছে? একটা রোগাভোগা রিকশাওয়ালাকে এমন মেরেছে যে সে এখন কোথায় পড়ে আছে, বাঁচবে কি না ঠিক নেই!

ঝিন্টু একটু ভড়কে গেল। গণ্ডগোল একটু হয়েছে সে জানে। সেই গণ্ডগোলে তার আদরের সাইকেলটাও চোট হয়েছে। কিন্তু এতটা সে জানত না।

অবাক হয়ে ঝিন্টু বলল, কে বলল?

কে বলবে? আমি হাসপাতাল থেকেই আসছি।

শচীর রিকশাওয়ালা ছোকরা ছেলেটা নেমে দাঁড়িয়ে শুনছিল। হঠাৎ সে বলল, দিদি ঠিকই বলেছেন। লোকটার অবস্থা খারাপ।

ঝিন্টু বলল, কে দেখছে? ডাক্তার বাসু?

শচী জবাব দিল, হ্যাঁ।

ঠিক আছে, খোঁজ নিচ্ছি।

নাও। ভালো করে নাও।

ভাববেন না দিদি, আমরা ভদ্রলোক। রিকশাওয়ালার তেমন কিছু হলে আমরা দায়িত্ব নেব।

শচী বিটুর দিকে চেয়ে বলল, সেই কথাটাই বলতে আসা। ডাক্তার বাসু একটা প্রেসক্রিপশন করে দিয়েছেন। কয়েকটা ওষুধ আর ইনজেকশন, এগুলো হাসপাতালে পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে কিনতে হবে। রিকশাওয়ালারা চাঁদা তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে বোধহয় হবে না। যদি আপনারা ভদ্রলোকই হবেন তা হলে অন্তত লোকটার চিকিৎসার ভার নিন।

বিটু হাত বাড়িয়েছিল, তার আগেই ঝিন্টু ছোঁ মেরে প্রেসক্রিপশনটা শচীর হাত থেকে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে দিয়ে বলল, ঠিক আছে। আমরা দেখছি।

শচী বিরক্তির গলায় বলল, ডাক্তার বাসু ওষুধগুলোর জন্য অপেক্ষা করছেন। একটু তাড়াতাড়ি দেখলে ভালো হয়।

বিটু মিইয়ে গেছে এটা ঠিক। আজই তার বাচ্চাটা জন্মেছে। এই দিনটায় যত অঘটন না ঘটলেও পারত। মাথাটা তার কেমন যেন নিরেট লাগছিল।

শচীর দিকে চেয়ে বিটু অতিশয় নরম গলায় বলল, দেখুন, আমার একটা ভুল হয়ে গেছে। মানুষ সব সময়ে ইচ্ছে করে সব কাজ করে না। হয়ে যায়।

শচী একটু ভ্রু কুঁচকে লোকটাকে দেখল। এক সময়ে লোকটা বেশ হ্যান্ডসাম ছিল, সন্দেহ নেই। সম্ভবত স্পোর্টসম্যান ছিল। শরীরটা পেটানো, শক্তপোক্ত, শচীর রাগটা এক পরদা নেমে গেল। তবু যথেষ্ট ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, রিকশায় আমি বসে ছিলাম। ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছি। রিকশাওয়ালার কোনো দোষ ছিল না। আপনি সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে পারেননি, অথচ ও বেচারা মার খেয়ে মরল।

সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে পারেননি কথাটা কানে খট করে লাগল বিটুর। সে অবশ্য রাগল না। বলল, ব্যালান্স তো সবসময়ে রাখা যায় না। যাই হোক, আমার ভাই যা বলেছে তাই হবে। লোকটার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করব।

ঝিন্টু হঠাৎ গলা বাড়িয়ে বলল, কিন্তু মেজদা, উনি যে পুলিশে রিপোর্ট করেছেন তার কী হবে?

শচী অবাক হয়ে বলল, পুলিশে রিপোর্ট তো করাই উচিত।

ঝিন্টু মাথা নেড়ে বলল, পুলিশ যদি অ্যাকশন নেয় তা হলে আমরা লোকটার চিকিৎসা করাব কেন? পুলিশকে দিয়েই করান গে।

শচী এই উদ্ধত যুবকটির কথা শুনে বুঝল, ছেলেটা সোজা নয়। বলল, তা হলে কী করবে?

আমরা চিকিৎসাও করাব আবার জেলও খাটব তা তো হয় না। আপনি থানায় গিয়ে কেসটা উইথড্র করুন, বাদবাকি যা করার আমরা করব।

যদি না করি?

তা হলে আমাদের দায়িত্ব নেই।

শচী হাত বাড়িয়ে বলল, প্রেসক্রিপশনটা আমাকে ফেরত দাও।

ঝিন্টু পকেট থেকে সজোরে প্রেসক্রিপশনটা বের করে একরকম ছুড়ে দিয়ে বলল, অতই যদি দরদ তা হলে নিজের পকেট থেকে খরচ করুন।

শচী অসহায় রাগে মূক হয়ে গেল।

বিটু মৃদু স্বরে বলল, প্রেসক্রিপশনটা আমাকে দিন।

না থাক। যা পারি আমিই করব।

রাস্তায় দু'—চারজন দাঁড়িয়ে গেছে এবং ভিড় জমে যাওয়ার লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে দেখে শচী আত্মসংবরণ করল। আসলে ঠিক এভাবে অ্যাপ্রোচ করাটাও বোধহয় ঠিক হয়নি। রাগ এবং ঝোঁকের বশে সে এরকম হুট করে এদের মুখোমুখি হয়েছে।

শচী বিটুর দিকে ফিরে বলল, আপনি কোনো কথাই বললেন না। আমি আপনার মুখ থেকে জবাবটা শুনতে চেয়েছিলাম, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হবে না।

বিটু কথাটা শুনল, কিন্তু তবু কেমন যেন ভ্যাবলার মতো চেয়ে রইল।

তারপর বলল, ভুল হয়ে গেছে। আমার মেজাজটার কিছু ঠিক নেই।

তারপর ঝিন্টুর দিকে চেয়ে বলল, তুই এখান থেকে যা তো। চ্যাটাং চ্যাটাং অনেক কথা বলেছিস। যা।

বিটুর চাপা আক্রোশ তার চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছিল। ঝিন্টু আর কথা বাড়াল না। সাইকেলে উঠে চলে গেল।

শচী এসে রিকশায় উঠল। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে বাস ধরবে।

১৫

বিকেল পাঁচটা নাগাদ গৌরের জিপ গাড়িটা এসে লাভ স্টোরের সামনে থামল। গৌর নেমে এল।

বিটু!

আরে, কাকা! কী খবর, কিছু লাগবে?

গৌর গম্ভীরভাবে বলে, তুই দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যা।

কেন?

বাড়ি গিয়ে বই—টই পড়। আজ দোকানে থেকে কাজ নেই।

কেন বলুন তো! বিকেলেই তো বিক্রিবাটা।

রিকশা ইউনিয়ন থেকে স্ট্রাইক কল করেছে। মিছিল বেরোবে। সিচুয়েশন খারাপ হতে কতক্ষণ? পুলিশ অ্যাকশন নেবে, খবর পেয়েছি।

বিটুর ফর্সা মুখটা আচমকাই লাল হয়ে উঠল। রাগে, অপমানে গরগর করে উঠে সে বলল, কেন, লোকটা কি মরে গেছে?

মরে যে যায়নি সে তোর কপাল ভালো বলে। ডাক্তার বাসু বুক দিয়ে আগলে না থাকলে এতক্ষণে হয়ে যেত। তা কমও কিছু হয়নি। আমি হাসপাতালে খবর নিয়ে এসেছি। অক্সিজেন স্যালাইন চলছে।

বিটু মাথা নেড়ে বলল, আমি দোকান বন্ধ করব না। যা হয় হোক। দোষ যখন করেই ফেলেছি একটা, ফলও পেতে হবে।

অত বীরত্ব ভালো নয়। এটা ট্যাকটিক্সের যুগ। ফিলজফির নয়। যা বলছি শোন। বাড়ি যা। না যদি যাস তবে তোর মা বাবা এসে চেঁচামেচি শুরু করবে।

স্ট্রাইক কল হল, পিন্টু জানে না?

জানে। জেনে কী করবে?

পিন্টুর তো হোল্ড আছে।

ছিল। এখন নেই। পলিটিক্সে হোল্ড রাখা অত সোজা নয়। তুই তো আর খবর রাখিস না।

বিটু কেমন হাল—ছাড়া গলায় বলল, ঠিক আছে। আপনি যান আমি দেখছি।

গোঁয়ার্তুমি করিস না কিন্তু। হাঙ্গামা হলে ঠেকানোর কেউ নেই। মিছিল এই রাস্তা দিয়েই যাবে। বাঘাযতীন পার্কে জমায়েত শুরু হয়ে গেছে। যদি চাস তো জিপটা রেখে যেতে পারি। ড্রাইভার তোকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

আমি নিজেই যেতে পারব কাকা, আপনি চলে যান।

আর একটা কথা। পুলিশ তোকে আজ হোক কাল হোক, অ্যারেস্ট করবেই। অ্যারেস্ট করতে এলে রেজিস্ট করিস না। পুলিশের কর্তাকে আমার বলা আছে। অ্যান্টিসিপেটরি বেইলও নিয়ে রাখছি।

বিটু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে শুনল। জবাব দিল না।

তুই কীসে যাতায়াত করিস?

একটা বাঁধা রিকশা আছে।

সেটা কই?

সে তো রাত ন'টায় নিতে আসবে।

তা হলে কীসে বাড়ি ফিরবি?

আর একটা রিকশা ধরে নেব।

গৌর বিরক্ত গলায় বলে, তোর মাথায় কথাটা ঢুকছে না নাকি? বললাম না স্ট্রাইক কল হয়েছে। রাস্তা থেকে সব রিকশা তুলে নিয়েছে। বাস—টাসও বন্ধ হয়ে যাবে এরপর।

তা হলে হেঁটেই চলে যাব।

ভেবে দেখ। জিপটা রেখে যাব?

না। তার দরকার নেই।

একা ফিরবি, লোকের মাথা এখন গরম। সামনাসামনি কিছু না করলেও দূর থেকে ইট—ফিট মেরে দিতে পারে।

এখনও লোকের এত সাহস হয়নি কাকা।

ওই অহংকারেই তুই গেলি। ভাবছিস বিটু মস্তান এখনও মস্তানই আছে। বোকা কোথাকার, তোদের যুগ বহু দিন আগে শেষ হয়ে গেছে। আমি বলি, এই সিচুয়েশনে বীরত্ব দেখানোটা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। পাবলিক খেপলে কোনো বীরত্বই টেকে না।

এই বলে গৌর জিপগাড়িতে গিয়ে উঠল। চলে গেল।

বিটু কিছুক্ষণ চেয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে। দোকানে খদ্দের অনেকক্ষণ আসেনি। রাস্তায় বাস্তবিকই কোনো রিকশা দেখা যাচ্ছে না। আবহাওয়াটা কি একটু থমথমে?

বিটু লাভ স্টোরের সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল। দোকানে নিজের প্রিয় জায়গাটিতে বসে ভাবতে লাগল।

কেন মারলাম লোকটাকে? কোনও ভাইট্যাল কারণও তো ছিল না। লোকটার বয়স বেশি, রোগা, গাঁইয়া, মারার তো কারণও নেই। আজ সে প্রথম বাবা হল, আর আজই এই ঘটনা? বাচ্চাটা কি তা হলে অপয়া?

কর্মচারীরা একটু গা—ছাড়া ভাবে বসে আছে। সুখময় আর প্রবীর দুজনেই নিরীহ প্রকৃতির, ভিতুও।

বিটু দুজনকে ডেকে বলল, প্রবীর, সুখময়, তোরা বাড়ি চলে যা। এ বেলা আর আসতে হবে না।

প্রবীর অবাক হয়ে বলে, কেন দাদা?

দোকান বন্ধ করে দেব।

এখনই?

না, একটু বাদে। কিন্তু তোদের থাকার দরকার নেই।

হাঙ্গামা হবে নাকি?

হতে পারে।

তা হলে আপনিই বা থাকবেন কেন?

আমার একটু খুচরো কাজ আছে। হিসেব মিলিয়ে যাব। তোরা যা।

একটু দোনোমোনো করল দুজন। তারপর সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল। বিটু একা। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে বাইরের লোক চলাচল দেখল বিটু। তারপর উঠে রোলিং শাটারটা টেনে নামিয়ে দিল। দোকান থেকে বেরোনোর ওই একটাই পথ।

ভিতরটা সঙ্গে সঙ্গে ভেপসে উঠল। সামান্য ভেন্টিলেশন দিয়ে তেমন বায়ু চলাচল নেই। পাখাটা খুলে বিটু তার হিসেবের খাতা নিয়ে বসল। সে একজন সফল দোকানদার, তার বেশি কিছু নয়। শুধু কেনা—বেচা। এইভাবেই একদিন জীবন শেষ হয়ে যাবে।

বছর তিনেক আগে একবার বন্ধুদের সঙ্গে কেদার—বদ্রী গিয়েছিল বিটু। তারপর আর বাইরে কোথাও বেড়াতে যায়নি। কেদার—বদ্রীর স্মৃতি তিন বছরেই ঝাপসা হয়ে এসেছে। এক বদ্ধ জলাশয়ে, নিত্যকার চেনা মানুষজনের মধ্যে একই প্যাটার্নের জীবন যাপন করতে করতে মানুষের কি পচন ধরে? তার মধ্যে নানা উন্মার্গগামিতা মাথাচাড়া দেয়?

দেয়, নইলে সে কেন এতটা অস্বাভাবিক?

তার এক মস্ত যন্ত্রণা হল সোমা। যাকে সে ভালোবাসে না, যার প্রতি তার কোনো আসক্তি নেই, তার সঙ্গে দিনের পর দিন এক ঘরে রাত কাটানো যে কী শক্ত! অথচ সোমা মেয়েটা খারাপও নয়। অনাদরে মানুষ হয়েছে বলে ওর প্রতি স্বাভাবিক একটু করুণাও হতে পারত তার। কিন্তু তাও হয়নি। মায়ের মুখ চেয়ে বিয়ে করতে হয়েছিল। ব্যস, ওইটুকুতেই তার কর্তব্য ফুরিয়ে গেছে।

বদ্ধ দোকানঘরের মধ্যে ফ্যানের হাওয়ায় আবদ্ধ বাতাসই ঘুরে ঘুরে কার্বন ডাই—অক্সাইড ছড়িয়ে দিচ্ছে। হিসেবটা ঠিকমতো করতে পারছে না সে।

বাচ্চাটা চেয়েছিল সোমাই। একদিন কেঁদেকেটে বলেছিল, যদি আমাকে তোমার প্রয়োজন না—ই থাকে তা হলে অন্তত আমাকে একটা অবলম্বন দাও। একটা বাচ্চা হোক, তাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে পারব। নইলে গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে।

সেই সুবাদে এই বাচ্চা। সোমার হার্ট ভালো নয়। বাচ্চা এখনই হোক তা ডাক্তাররাও চাননি। বাসু একবার বলেছিলেন, আগে হার্টটা ঠিক করে আসুন তারপর ওসব হবে।

বাইরে কার গলা না?

বিটু বাতি নিবিয়ে দিল। তারপর উঠে গিয়ে শাটারে কান পাতল।

মনে হচ্ছে ঝিন্টু আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

ঝিন্টু কাকে বলল, দোকান তো বন্ধ দেখছি। কিন্তু তালা তো বাইরে লাগানো নেই!

ভিতরে নেই তো?

মেজদা! এই মেজদা!

বিটু ভাবল, জবাব দেবে না। তারপর সিদ্ধান্ত পালটে শাটারটা টেনে খানিক ওপরে তুলল।

কী রে?
দোকান বন্ধ করেছিস নাকি?
গৌর কাকা তাই তো বলে গেল।
বন্ধ করে ভালো করেছিস। জোর হাঙ্গামা হতে পারে। তোকে বাড়ি নিয়ে যেতে মা পাঠিয়ে দিল।
বিরক্ত বিটু বলল, আমি নিজেই যাচ্ছি। তোরা আয়।
নিজে পারবি না। বহু লোক জড়ো হয়েছে বাঘাযতীন পার্কে। লেকচার হচ্ছে। বাজার গরম।
শুনেছি। গৌরকাকা বলে গেছেন।
দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গেছে মেলা।
তাতে কী?
তোর বাড়ি যাওয়াটা উচিত। মা—বাবা ভাবছে।
পুলিশ এসেছিল?
এখনও আসেনি। চল, আর দেরি করিস না।
বিটু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। একটু ভাবল। তারপর বলল, চল।
সন্ধ্যাবাতিটাও দেওয়া হল না।
ওসব পরে ভাবিস।
বিটু দোকানে তালা দিচ্ছিল নিচু হয়ে, এমন সময় একটা মস্ত ইট এসে লাগল ঠং করে রোলিং শাটারের গায়ে।
বিটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। কার এত সাহস?
ছায়ামূর্তির মতো সটাসট সরে গেল ঝিন্টু আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা।
আর তখন মাঝারি মাপের একখানা ইট উড়ে এসে জমে গেল বিটুর কপালে।
টুঁ শব্দটিও করতে পারল না বিটু। ধড়াস করে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল।

১৬

বহুকাল বাদে গৌর কন্ট্রাক্টর মুখোমুখি হল সুমনার।
ছেলেরা আজ কেউ বাড়ি নেই। ব্রহ্মকুমার নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। তারপর হাসপাতালে গেছেন আহত রিকশাওয়ালার বিলিব্যবস্থা দেখতে। সেখান থেকে নিউ মার্কেট যাবেন বিকেলের বাজার করতে। ফিরে এসে মক্কেল নিয়ে রাত দশটা অবধি কাটিয়ে দেবেন কাছারিঘরে।
সুমনা আজ বড্ডই একা।
গৌরের জিপ যখন বাইরে থামল তখন সুমনা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। এই বয়সেও গৌরকে দেখলে বুক কাঁপে। লজ্জায় রাঙা হন।
দরজাটা খুলে দিয়ে বললেন, এসো।
কর্তাটি কই?
বেরিয়েছে।
রিকশা ছাড়া বেরোল কী করে?
হেঁটেই।
হাঁটা তো ভালোই। তোমার কর্তা দিনকে দিন তো স্থবির হয়ে যাচ্ছে। কেবল টাকা রোজগার ছাড়া কোনো ব্যায়াম নেই। এভাবে চললে তো ব্লাড সুগার বেড়ে যাবে।
সেই চিন্তায় বুঝি ঘুম হচ্ছে না? কী খবর বলো তো! পাশের বাড়ির ছেলেটা এসে বলে গেল, বিটুকে নাকি মারধর করতে পারে!
গৌর গম্ভীর হয়ে বলে, তোমার এ ছেলেটা মানুষ হল না সুমনা। একটি একগুঁয়ে গাড়ল।

সুমনা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, ছেলেটা কার দেখতে হবে তো?

গৌর নীরবে সুমনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, হঠাৎ বুঝি মনে পড়ল কথাটা?

হঠাৎ পড়বে কেন? সব সময়েই মনে হয়।

তোমার কোনও পাপবোধ নেই তো?

সুমনা মাথা নাড়লেন, না নেই। কেন থাকবে বলো? ওদের একজনও তো তোমার সেটাই আমার সান্ত্বনা। নইলে তোমার ওপর খুব অবিচার করা হত। সে কথা যাক, কী করবে এখন বলো তো?

গাড়লটাকে তো বললাম, দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে আসতে, এখনও আসেনি?

না।

থানা পুলিশ নিয়ে ভয় নেই। ম্যানেজ করা যাবে। কয়েকটা দিন ওকে কোথাও পাঠানো যায় না?

যাবে কি?

তোমার কথা নাকি খুব শোনে?

শোনে। আবার শোনেও না। অত বড় ছেলেকে কি আর ইচ্ছেমতো চালানো যায়। তুমি ভিতরে এসে বোসো। চা করে দিই।

বসব? এখন কি আর বসবার সময় আছে?

একটু বোসো। ফাঁকা বাড়িটায় কেমন ভালো লাগছে বুকটা। আচ্ছা বিটুর কি বিপদ?

আরে না। তোমার ছেলেরা কিছু কম গুন্ডা নয়। পিন্টু, বিটু, ঝিন্টু এরা কি কম হাঙ্গামা করেছে?

ভয় তো সেখানেই। বিশেষ করে বিটু। বিয়ের পর এখন একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে বটে, কিন্তু আগে ওকে নিয়েই ছিল আমার সবচেয়ে বেশি ভয়।

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বিটুই ছিল তোমার ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে ব্রাইট।

সুমনা আবার লাল হলেন। মেয়েদের কতই গোপন কথা থাকে। দুনিয়া জানতে পারে না, কিন্তু তলায় তলায় কত বাঁধ ভাঙে, ভূমিক্ষয় হয়, ঝড়—বাদলায় মাতাল হয়ে যায় অভ্যন্তর। ও কি পাপ হয়েছিল তাঁর? গৌরকে আর তো কিছুই দেওয়া যায়নি। ওই একটি সন্তান শুধু। এমন কী পাপ হয়েছিল?

পাপ পুণ্য কর্মফলের হিসেব করে কি শেষ করা যায়? ও হতেই থাকে, হয়েই যেতে থাকে। কে যে পাপ পুণ্যের বিচার করে কে জানে?

সুমনা মাথা নিচু করে ছিলেন। খুব ধীরে মাথাটা তুলে বললেন, কী হল বলো তো? এত ব্রাইট ছিল, কেন অমনধারা হয়ে গেল?

গৌর খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, তেমন খারাপও তো কিছু হয়নি। বলতে পারো, সিনেমার নায়ক বা অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন হয়নি। তা না—ই হল, মদ মেয়েমানুষের দোষও ডেভেলপ করেনি। তাছাড়া মস্ত গুণ, মাতৃভক্ত। মায়ের উপর টান থাকলে সব কাটিয়ে উঠবে।

সুমনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজ নাতি হল আমার। তোমারও। কত আনন্দের দিন। আর কী সব হচ্ছে দেখো! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো। বোসো তো, চা করে আনি।

তোমার কাজের লোকটা কোথায়?

নার্সিংহোমে গেছে বউমার খাবার নিয়ে। খেতে তো আর পারবে না আজ। তবু পাঠিয়ে দিলাম।

গৌর বসল।

সুমনা রান্নাঘরে গিয়ে সযত্নে চা করলেন দু'কাপ। প্লেটে বিস্কুট আর চানাচুর সাজিয়ে নিয়ে এলেন ট্রে—তে করে। গৌর খুব চানাচুর, ঝালমুড়ি তেলেভাজা ভালোবাসে। ওইসব করেই পেটে আলসার বাঁধিয়ে বসেছিল।

খাও।

গৌর কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল। তেমনি আনমনেই চা খেল।

কী ভাবছ বলো তো!

কত কী! তোমার কথা, আমার কথা, আমাদের কথা। তোমরা ছাড়া আমার আপনজন আর কে আছে বলো সুমনা?

আপনজনের কথা আর বোলো না। পুরুষেরা থোড়াই আপনজনদের তোয়াক্কা করে। কর্তাটাকে তো দেখছি, আমরা থেকেও নেই।

১৭

বিটুকে ইটটা যে নির্ভুল লক্ষ্যে ছুড়ে মেরেছিল সে কোনো রিকশাওয়ালা নয়। ঝিন্টু তাকে ভালোই চেনে। পালপাড়ার লাট্টু। নয়া মস্তান। মেঘদূত সিনেমা হল—এ যারা টিকিট ব্ল্যাক করে তাদের সর্দার। হংকং মার্কেটে দুটো স্টল দিয়েছে। বিরাজবাবুর কাছ থেকেই যখন দোকানটা নেয় বিটু তখন লাট্টুও চেষ্টা করেছিল। তখন থেকেই বিটুর সঙ্গে খটাখটি। মিনি বাস—এর জন্য ব্যাংকের লোন পেতে অনেক ঘোরাঘুরি করেছিল। ঝিন্টুর জন্য লোনটা হয়নি। সেই রাগও আছে।

ঝিন্টু গোটা ষাটেক লোককে চক্রাকারে এগিয়ে আসতে দেখতে পেয়েই ঝাঁপ খেয়ে সরে যায়। সে বুঝতে পেরেছিল ওরা মারলে বিটুকেই মারবে।

ইট খেয়ে বিটু যখন লাট হয়ে পড়ল তখন ঝিন্টু আর তার দুই বন্ধু কী করবে ঠিক করতে পারছিল না। লাট্টু পালায়নি। সজ্ঞানেই এগিয়ে এল পড়ে থাকা বিটুর কাছ বরাবর।

লাট্টু ঝিন্টুর দিকে চেয়ে বলল, ফোট, নইলে কলজে খিঁচে নেব।

ঝিন্টু একটু কাঁপা গলায় বলল, ওকে মারছিস কেন?

তাতে তোর বাবার কী? ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

খুন করতে চাস?

চাইলে কী করবি?

লাট্টু এর ফল ভালো হবে না।

যাঃ যাঃ বে, এই লালু, দে তো শালাকে ভরে।

লালুকেও চেনে ঝিন্টু। মহাবীরস্থানের কাছে বাড়ি। একনম্বর হেক্কোড়। ঠোঁট চোয়াল হিংস্র।

ঝিন্টু পালাতে পারত। গায়ের জোরে না হোক, ছুটে এদের আজও হারিয়ে দিতে পারে সে। কিন্তু সব কিছুরই তো একটা শেষ আছে।

ঝিন্টু কিন্তু ভাবনাচিন্তা না—করেই এগিয়ে গেল। তারপর আচমকা লাফিয়ে একটা লাথি কষাল সোজা লালুর বুকে। শব্দটা হল সাংঘাতিক। মড়াৎ।

ঝিন্টুর পা বিখ্যাত। সাইকেলে চড়ে এবং দু'পায়ের আরও বহু ব্যায়ামের পর দু'খানাতেই সাংঘাতিক জোর।

লালু বুকটা চেপে ধরে একটা কোঁক শব্দ করে মাতালের মতো কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েই পড়ল।

তারপর কী হল ঝিন্টুর আর মনে নেই। বিস্তর দ্রুত পা হাত ঘুসি ইট ইত্যাদির মধ্যে একটা ক্যালোডিওস্কোপ কোনো প্যাটার্নই স্থির নয়।

তবে ঝিন্টুর জ্ঞান রইল না।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন বাসু ডাক্তার তার মুখের দিকে চেয়ে চিন্তিতভাবে বসে আছেন।

কোথায় লেগেছে ঠিক বুঝতে পারছে না ঝিন্টু। মনে হচ্ছে শরীরের কোনো অংশই বাকি নেই। মাথা থেকে পা অবধি শরীরটা কোথাও অবশ, কোথাও ফোড়ার মতো যন্ত্রণা।

বেশ কয়েক মিনিট লাগল মাথার ধোঁয়াটে ভাবটা কাটতে।

ডাক্তার বাসু বললেন, তোমাদের আজকের দিনটাই খারাপ। না?

কেন? কী হয়েছে?

কত কী তো হল।

মেজদা! মেজদা কি শেষ?

বাসু মাথা নাড়লেন, না, শেষ কি এত সোজা? একটা মানুষ বড় অল্পে শেষ হয় না। একটু সময় নাও। পুলিশ অপেক্ষা করছে জেরা করার জন্য।

আমার বাবা কোথায়?

তিনিও আছেন।

লালুকে আমি একটা লাথি মেরেছিলাম বাসুদা।

বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, মাথা ঠান্ডা রাখো। লালুকে তুমি লাথি মেরেছিলে কি না তা তো কেউ জানে না। পুলিশকে তোমার অত কিছু বলার দরকার নেই। শুধু বোলো বিটুকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি মার খেয়েছ।

ঝিন্টু একটু হেসে বলল, আমি উকিলের ছেলে, কী বলতে হবে তা জানি। আউট অফ রেকর্ডস আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, লালুর অবস্থা কী?

পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভেঙেছে। যদি ভাঙা হাড় ফুসফুস ফুটো করে দিয়ে থাকে তবে কেস খুব সিরিয়াস। সাধারণত পাঁজরের হাড় ভিতর দিকেই ভেঙে ঢোকে। কাল সকালের আগে কিছু বোঝা যাবে না।

আর লাট্টু? ওর কিছু হয়নি?

লাট্টু কে?

ওই যে মেজদাকে ইট মেরেছে। লম্বা, ছিপছিপে, হাড়কাঠ চেহারা। মেঘদূতে টিকিট ব্ল্যাক করে, দেখেননি?

বাসু হাসলেন, না আমি সিনেমা দেখার সময়ও পাই না।

আমার চোট কতখানি বাসুদা?

কয়েকদিন ভুগবে। বিটুকে মারল কেন জানো?

না বাসুদা, আজকাল কে যে কাকে কেন মারে তার কোনো ঠিক নেই। লাট্টুর খাড় ছিল। অনেক কারণ।

যাক গে। তুমি পাঁচ মিনিট শুয়ে চোখ বুজে মনটাকে ঠিক করে নাও। পুলিশ আসছে।

আমি কি আন্ডার অ্যারেস্ট?

না, এখনও নও।

বাসু চলে গেলেন, পুলিশ এল। ঝিন্টু পুলিশ ইন্সপেক্টরকে ভালোই চেনে। তাদের বাড়িতেও গিয়েছে কয়েকবার।

এই যে ঝিন্টুবাবু কী খবর?

ভালো।

প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে?

পারব।

গণ্ডগোলটা লাগল কী করে?

গণ্ডগোল লাগেনি। লাট্টু হঠাৎ মেজদাকে ইট মারল। মেজদা তখন দোকান বন্ধ করছিল। ইনফ্যাক্ট মেজদাকে দোকান থেকে আমিই টেনে বের করেছিলাম।

লাট্টুর ঠিকানা জানো?

হাসালেন স্যার, লাট্টুর ঠিকানা সবাই জানে।

ইন্সপেক্টর একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, তা বটে। তবে এখন এখানে সে নেই। অ্যাবসকন্ডিং।

হংকং মার্কেটে ওর স্টল আছে।

সেখানেও খোঁজা হয়েছে।

তা হলে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

তোমার দাদা বিটুর সঙ্গে ওর কোনো শত্রুতা ছিল?
লাভ স্টোরের ঘরটা লাট্টু নিতে চেয়েছিল। তখন কিছু হয়ে থাকলে থাকতে পারে।
লাট্টু পলিটিক্স করে কি না জানো?
না। তবে গুন্ডা—বদমাশদের পলিটিক্যাল কভার তো একটা থাকবেই।
সেটাই হয়েছে মুশকিল। একজন লিডার অ্যান্টিসিপেটারি বেইল চেয়েছেন ওর জন্য।
তা হলে কেস কেঁচেই গেল।
না না, অত সহজে কাঁচবে না, আমরা তো আছি।
মেজদা কোনো স্টেটমেন্ট দিতে পেরেছে?
না। জ্ঞান এখনও ফেরেনি।
ওকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন। আর সেজদা পিন্টু যদি কিছু জানে।
তোমার সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে, সুতরাং যা হয়েছে তার একটা ডিটেল স্টেটমেন্ট কাল এসে নেব। তোমার সঙ্গে বোধহয় তোমার দুই বন্ধুও ছিল, তাই না?
হ্যাঁ। তারা কোথায় তা অবশ্য জানি না। মারপিটের সময় কে যে কোথায় ছিটকে গিয়েছিল কে জানে। ওদের কোনো খবর জানেন?
না। ইনজিয়োরড অবস্থায় তিন জনকে পাওয়া গিয়েছিল। তুমি, বিটু আর লালু।
ঝিন্টু চোখ বুজল। একটু শঙ্কিত গলায় বলল, আমার সাইকেলটা ছিল। সেটা আস্ত আছে?
ইনস্পেক্টর একটু হাসলেন, সাইকেল ঠিক আছে। ভয় নেই।
ইনস্পেক্টরের দিকে চেয়ে ঝিন্টু একটু হাসল। তৃপ্তির হাসি। পৃথিবীতে তার সাইকেলখানার চেয়ে মূল্যবান সামগ্রী আর কীই বা আছে?
শোনো ঝিন্টু, আমি চাই না তোমার ওপর আর কোনো হামলা হোক। লালুকে তুমি যে লাথিটা মেরেছ সেটা ফেটাল হতে পারত। এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। যদি লালুর কিছু হয় তবে কেসটা জটিল হয়ে যাবে।
আমি কী করব? লালুকে না—মারলে যে লালুই আমাকে মারত।
সে তো জানি। আমি বলি কী, তুমি তোমার স্টেটমেন্টে লালুকে মারার কথাটা কবুল কোরো না। তোমার বাবা অবশ্য সবই সাজিয়ে দেবেন। তবু বলে গেলাম।
ইনস্পেক্টর চলে যাওয়ার পরই ব্রহ্মকুমার ঘরে ঢুকলেন। চারদিকে চেয়ে হাসপাতালের বিলিব্যবস্থার প্রতি একটু নাসিকাকুঞ্চন করে ছেলের দিকে তাকালেন।
ব্রহ্মকুমারের একটিই সমস্যা। ছেলেদের সঙ্গে তিনি সহজভাবে কথা বলতে পারেন না। আসলে সওয়াল জবাব ছাড়া অন্যরকম কথার অভ্যাসটাই তাঁর চলে গেছে।
কী রে? অ্যাঁ! কী সব হচ্ছে! তোরা সব কী গণ্ডগোল করেছিস?
ঝিন্টু বাবার দিকে চেয়ে রইল করুণভাবে। বলল, বাবা, আমরা কিন্তু কিছু করিনি।
করোনি! অ্যাঁ। করোনি! তা হলে রিকশাওয়ালাটাকে বিটু মেরেছিল কেন? অ্যাঁ।
তুমি কি ভাবছ মেজদাকে রিকশাওয়ালারা মেরেছে?
তাই তো শুনছি। লাট্টু না কী যেন নাম!
সে রিকশাওয়ালা নয়। ব্ল্যাকার।
ও—ই হল। এসব ভালো কথা নয়। তোর এখন কেমন লাগছে?
ভালো। আমার কিছু হয়নি।
কিন্তু হতে পারত। সাংঘাতিক হতে পারত। তোমরা দুই ভাই আজ মারাও যেতে পারতে।
মরিনি তো! বাবা, মা কোথায়? আসেনি?
তাকে খবর দেওয়া হয়নি। প্রেশার বেড়ে যেত শুনলে।

তুমি ভয় পেয়ো না বাবা। আমরা সামলে উঠব।

বিটুটার এখনও জ্ঞান নেই।

ডাক্তার কী বলছে?

বাসু তো বলছে চিন্তা নেই। কিন্তু কত রক্ত গেছে। তার ওপর তুই আবার কাকে লাথি মেরেছিস। পুলিশ কেস।

ও কিছু নয়। সে তো বিকেলে মেরেছি। পুলিশ বলল, ওটা স্টেটমেন্টে উল্লেখ না করতে।

ব্রহ্মকুমার সামান্য উষ্মার সঙ্গে বললেন, গুন্ডাদের খেপিয়ে দিলে তারা কি তোমাদের সহজে ছাড়বে?

তাদের পরিবারে ঝিন্টুই একমাত্র লোক যে ব্রহ্মকুমারের সঙ্গে মোটামুটি জড়তাহীনভাবে কথা বলতে পারে। ব্রহ্মকুমারের বোধহয় এই কনিষ্ঠ পুত্রটির উপর একটু বিস্ময়কর টান থেকে গেছে। ঝিন্টু তাই ব্রহ্মকুমারের চোখের দিকে চেয়েই বলল, লাট্টু এমন কিছু মস্তান নয় বাবা। ওকে ভয় খাওয়ার কিছু নেই। দেখলে না, মেজদাকে সামনে থেকে অ্যাটাক করার সাহস পর্যন্ত নেই। আগে খাড়া হই সাতদিনের মধ্যে ওকে শিক্ষা দিয়ে দেব।

ব্রহ্মকুমার রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বললেন, নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়াটা সবচেয়ে বড় অপরাধ। ওসব যারা করে তারা করুক। তোমাদের ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী? লাট্টু একটা অন্যায় করেছে, তার জন্য পুলিশ যা করার করবে।

বাঃ, আর আমরা ছেড়ে দেব?

তোমরা একদম গণ্ডগোল করবে না। এটা আমার অর্ডার, বুঝলে?

ঝিন্টু বাবাকে চেনে। খেপলে চণ্ডাল, ভালো থাকলে গঙ্গাজল। সে একটু হেসে বলল, ঠিক আছে বাবা। তবে পুলিশ কিছু করবে না। ধরলেও লাট্টুকে ছেড়ে দেবে। তখন কী হবে?

সে তখন দেখা যাবে।

ব্রহ্মকুমার উঠলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, তোমার মা এখনও খবরটা জানেন না। জানলে কী হবে বুঝতে পারছি না।

বিটুর জ্ঞান ফিরেছে অনেকক্ষণ। সে শক্ত মালে তৈরি। বহু জলঝড় তার ওপর দিয়ে গেছে একসময়। ঘায়েল হলেও সে নিস্তেজ হয়ে বা নেতিয়ে পড়েনি।

অনেকটা রক্ত গেছে। মাথার ক্ষতটাও বেশ গভীর। তবু জ্ঞান ফেরার পর থেকেই সে ছটফট করছে, আমাকে ছেড়ে দিন। বাড়ি যেতে দিন।

ডাক্তার বাসু চিন্তিতভাবে বললেন, বাড়ি যাওয়াটা রিস্কি হবে বিটুবাবু। অন্তত আজকের রাতটা রেস্ট নিন। হেড ইঞ্জুরিতে অবজারভেশনে রাখাটা ভীষণ জরুরি।

আমার কিছু হয়নি। ছেড়ে দিন।

কতটা রক্ত গেছে জানেন?

আমি প্রতি মাসে একবার ব্লাড ডোনেট করি। শরীরে অনেক ফালতু রক্ত থাকে ডাক্তার বাসু, আমি জানি। ইট—ফিট আমি অনেক খেয়েছি। ছাত্র আন্দোলন করেছি না! দু'বার ছুরি খেতে হয়েছিল।

তা হলে তো আপনার অভিজ্ঞতা অনেক।

হ্যাঁ। তাই তো বলছি দু'—চার লিটার রক্ত চলে গেলেও আমার কিছু হবে না।

ডাক্তার বাসু একটু হাসলেন। বড়লোকদের তেমন কিছু হয় না তা তিনি জানেন। তাদের শরীরে যথেষ্ট বাড়তি রক্ত থাকে। তারা মরে অতি ভোগে, রোগগ্রস্ত হয়ে।

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের তিনতলায় কেবিনে দুটো বিছানাওলা এই ঘরখানাই হাসপাতালের শ্রেষ্ঠ ঘর। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ঘরের অবস্থা এতই খারাপ যে, কোনোরকম ইনফেকশনই ঠেকানোর উপায় নেই। এই ঘরেই রাখা হয়েছে বিটুকে। পাশের বেডে হাতে নল, মুখে নল আর একজন রুগি। অচেতন।

ডাক্তার বাসুকে একজন লোক দরজার কাছ থেকে ডাকল, স্যার।
কী হল আবার?
ওই পেশেন্টের বউ এসেছে।
বউ? ডাকো।
ডাক্তার বাসু হঠাৎ বিটুকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই পেশেন্টকে চিনতে পারছেন?
না তো! কে?
মনে পড়ছে না? আজ দুপুরে যাকে আপনি মেরেছিলেন সেই রিকশাওয়ালা।
বিটু কেমন ফ্যাকাসে মেরে গেল। তারপর ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখল। বেডের মাথার ওপরকার বাতিটা নেবানো। মুখটা আবছামতো।
বাঁচত না। রিকশাওয়ালা তো হাসপাতালের মেঝেয় পড়ে থাকত, কেউ অ্যাটেন্ড করত না, ওষুধ পড়ত না, মরে যেত। তবে আমি কেসটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম।
বিটু কাঁপা গলায় বলল, ডাক্তার বাসু, আমি জানি আপনি ভীষণ ভালো লোক।
বাসু মাথা নেড়ে বললেন, এ দেশে কোনো ভালো লোক নেই। আমিও নই। ভালো থাকার চেষ্টা হয়তো কেউ কেউ করি। কিন্তু যে সিস্টেমের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয় তা আস্তে আস্তে আমাদের খারাপ করতে থাকে।
বিটু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, জানি। সিস্টেমের কথা খুব জানি।
বিটু জানবে না তো কে জানবে? বেঙ্গল টিমের স্কোয়াডেও যে শেষ অবধি চান্স পায়নি আর—একজন কমজোরি খেলোয়াড় খুঁটির জোরে জায়গা করে নিয়েছিল বলে। কোচিং নিতে ইন্দোনেশিয়া যেতে চেয়েছিল। পারেনি। সে প্রকাশের মতো খেলোয়াড় ছিল কি না কে জানে, কোচিং নিলে বোঝা যেত। আজকাল ব্যাডমিন্টন আর টেবিল টেনিসে শিলিগুড়ির খেলোয়াড়েরা সারা ভারতেই সুযোগ পাচ্ছে। কেউ কেউ খুবই নাম করেছে। তাদের আমলে শিলিগুড়ির এত গুরুত্ব তো ছিল না। সিস্টেমই ডুবিয়েছিল বিটুকে।
বিটু সভয়ে লোকটার দিকে চেয়ে ডাক্তারকে বলল, আপনি কি ইচ্ছে করেই আমাকে ওর ঘরে রেখেছেন?
ডাক্তার বাসু একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ইচ্ছে করে রেখেছি বললে বাড়াবাড়ি হবে। তা নয়। আসলে এই ঘরখানাই হাসপাতালের সবচেয়ে ভালো ঘর। পেয়িং বেড। একজন রিকশাওয়ালার এখানে থাকার কথাই নয়। আমি নিজের রিস্কে রেখেছি। আর একটা বেড ছিল, আপনার সার্জিকাল কেস বলে এখানেই রাখতে হল। পরে দেখলাম ব্যাপারটা বেশ মজার। আক্রান্ত এবং আক্রমণকারী একই ঘরে।
বিটু বালিশে কনুই রেখে উঠে বসল। বলল, ওর জন্য যা খরচ করতে হয়েছে সব আমি দেব ডাক্তারবাবু।
দেবেন।
শচী চক্রবর্তী নামে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর আজ আমাকে গিয়ে এ ব্যাপারটা নিয়ে ধমক চমক করছিল। অ্যাগ্রাসিভ টাইপের ভদ্রমহিলা।
জানি। উনি আজ এখানেও এসেছিলেন। রিকশার সওয়ারি ছিলেন তিনিই।
পুলিশে উনিই রিপোর্ট করে এসেছেন, বললেন।
ডাক্তার বাসু হাসলেন, পুলিশ নীচে অপেক্ষা করছে বিটুবাবু।
অপেক্ষা করছে! কেন, আমাকে অ্যারেস্ট করবে নাকি?
বোধহয়। আর সেইজন্যই আজ রাতে আমি আপনাকে ছাড়তে চাইছিলাম না।
বিটু একটু চিন্তিত হয়। তারপর বলল, বাবা কি সব জানে?
আপনার বাবাও নীচে আছেন। আপনি অ্যারেস্ট হলেও জামিন পেয়ে যাবেন। সেটা প্রবলেম নয়। প্রবলেম হল হ্যারাসমেন্ট। আপনি পায়ে হেঁটে বেরোলে পুলিশ হয়তো থানায় নিয়ে যাবে। সেটা ভালো হবে না।
কিন্তু এখানে যে আমার ঘুম হবে না।

আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে দেব। আনফিট অবস্থায় আপনাকে ছাড়লে আমার বদনামও হবে। অবশ্য বন্ড দিয়ে আপনি যে—কোনো সময়েই চলে যেতে পারেন।

এই সময়ে দরজায় এক শীর্ণকায়া যুবতী এসে দাঁড়াল। কালো চোখ, গলা বসা, পরনে একখানা সস্তা ছাপা শাড়ি। কাঁখে একটা বাচ্চা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই এসেছে।

ডাক্তার তার দিকে চেয়ে বললেন, কাঁদছ কেন? সব ঠিক আছে।

ও কোথায় ডাক্তারবাবু? একটু দেখা করে যাব।

দেখা তো হবে না। ওই যে শুয়ে আছে দরজা থেকেই দেখে নাও। কথা তো বলতে পারবে না।

জ্ঞান আছে?

জ্ঞান ফিরেছে। এখন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

মেয়েটা দোরগোড়ায় বসে পড়ল। বাচ্চাটা ককিয়ে উঠল। মেয়েটা বলল, খুনই হয়ে গিয়েছিল, সবাই বলছে যে!

না, তেমন কিছু নয়।

তবে অত সব নল কীসের?

ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওষুধ দেওয়া হয়েছে শিরা দিয়ে।

বাঁচবে তো?

না বাঁচলে এসে আঁশবটি দিয়ে আমার গলাটা কেটে দিয়ো।

আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। গলা কাটতে হলে সেই গুন্ডাটার কাটতে হয় যে ওকে ওরকম মেরেছে।

বিটুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল দেখে ডাক্তার একটু হাসলেন। তারপর মেয়েটাকে বললেন, এই যে বাবুকে দেখছ একে কেমন লোক বলে মনে হয়?

মেয়েটা বিটুর দিকে জলভরা চোখে তাকাল। আঁচলে চোখটা মুছে নিয়ে বলল, ভদ্দরলোক।

একেও কারা যেন মেরেছে। মাথা ফেটে গেছে।

মেয়েটা কিছু বলল না।

ডাক্তার বাসু মেয়েটার দিকে চেয়ে বললেন, এরকম কত কী হয়ে যায়। বাচ্চাটাকে কিছু খাইয়েছ?

মেয়েটা মাথা নিচু করে বলল, এটাকে খাওয়াতে পারি। বুকের দুধ খায় তো। কিন্তু অন্যগুলো পেটে কিল মেরে আছে।

তোমার ক'টা বাচ্চা?

তিনটে। ওবেলা রান্না হয়নি। লোকটা তো তিনদিন জ্বরে পড়ে ছিল। আজ জ্বর গায়েই বেরিয়েছিল। এতগুলো লোক উপোস। আমি যে বাড়িতে কাজ করি তারা আগাম টাকা দেবে না।

ডাক্তার বাসু পকেট থেকে টাকা বের করলেন, যা তাঁকে প্রায়ই করতে হয়। গোটা কুড়ি টাকা মেয়েটার হাতে দিয়ে বললেন, দু'—চারদিন আমার কাছ থেকে নিয়ে চালিয়ে নিয়ো।

মেয়েটা টাকাটা হাতে ধরে বলল, রিকশাওয়ালারা চাঁদা তুলে কিছু দিয়েছে ডাক্তারবাবু।

কত দিয়েছে?

গুনিনি। গোনার মতো মনের অবস্থা ছিল না। পেট কোঁচড়ে বেঁধে রেখেছি। বেশি হবে না। দশ—বিশ টাকা।

ঠিক আছে। দু'—চার দিন চালিয়ে নাও। এখন বাড়ি যাও। রান্নাবান্না করে বাচ্চাদের খাওয়াও গে। তোমার বরের জন্য চিন্তার কিছু নেই। ভালো হয়ে যাবে।

কথা বলবে না?

আজ নয়। কাল বিকেলে এসো। কথা বলতে পারবে।

বউটা বসে বসে খানিকক্ষণ চোখ মুছল। তারপর কাউকে কিছু না—বলে যান্ত্রিকভাবে চলে গেল।

ডাক্তার বাসু বিটুর দিয়ে চেয়ে বললেন, আমাকে রাউন্ডে যেতে হবে। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকুন।
আমার বাবা তো কই দেখা করতে এলেন না?
আসবেন। ছোটজনের সঙ্গে এখন হচ্ছে।
ছোটজন!—বিটু অবাক হয়ে বলল, ছোটজন কে?
ঝিন্টু। আপনার চেয়ে মার সে বেশিই খেয়েছে। সিরিয়াস নয়, তবে ভুগবে ওই বেশি।
ঝিন্টু মার খেল কেন?
আমি তো স্পটে ছিলাম না। কে বলবে কেন আপনারা মার খেলেন!
আমি কেন মার খেয়েছি তা আন্দাজ করতে পারি। কোনও রিকশাওয়ালার বুকের পাটা হবে না আমাকে ইট মারবে।
আপনার কি অনেক শত্রু?
শত্রু? হ্যাঁ, অনেক। আমার শত্রুর অভাব নেই। অন্তত বারোজন মাড়োয়ারি আর গুজরাটি আর পাঞ্জাবি আমার দোকানটা নিতে চেয়েছে। আপনি কি জানেন ইটটা কে মেরেছিল?
লাট্টু না কার নাম যেন শুনছিলাম।
লাট্টু? বুঝেছি। এর আগেও আমাকে থ্রেট করেছে। লাট্টুর পিছনে অন্য লোক আছে। কিন্তু ওরা ঝিন্টুকে মারল কেন? ঝিন্টু তো কিছু করেনি।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বলল, ঝিন্টু আপনার মারের বদলা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।
ডাক্তার চলে যাওয়ার পর বিটু খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল চোখ বুজে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। রিকশাওয়ালার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে। বিটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ নয়। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।
উঠে বসে বিটু অনুভব করল, তার তেমন কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। শরীরটা একটু দুর্বল ঠিকই। তার শরীরের ভিত শক্ত কাঠামোয় তৈরি। এই দুর্বলতা তার কাছে কিছুই নয়।
বিটু বিছানা ছেড়ে নামল এবং কয়েক পা হেঁটে দেখল। চমৎকার। কোনও জড়তা বোধ করছে না সে, মাথা টলমল করছে না, চোখে ঝাপসা দেখছে না। মাথায় একটা গভীর ব্যথা টনটন করছে। সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয়।
বিটু ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।
পুলিশ নীচে অপেক্ষা করছে হয়তো কিন্তু তারা সকলে বিটুকে চেনে না।
তা ছাড়া এমন কিছু সতর্কও তারা থাকবে না। কারণ বিটু বড় অপরাধী নয়।
বিটু একতলায় নেমে চারদিকে চেয়ে দেখল। রাত সাড়ে ন'টা। ভিড়ভাট্টা নেই। দুজন কনস্টেবল সিঁড়ির মুখে বসে আছে।
বিটু তাদের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল। তাকে কেউ তেমন গ্রাহ্য করল না।
রাস্তায় নেমে সে দেখল, রিকশা চলছে। বিকেলে ওরা একটা মিছিল করেছিল ঠিকই। তবে ধর্মঘট হয়নি। সে একটা রিকশা থামাল। ছেলেটা চেনা, মন্টু।
বাড়িতে পৌঁছে দে।
মন্টু অবাক হয়ে বলল, আরে বিটুদা! আপনার কী হয়েছে?
ইট লেগেছে। সে অনেক কথা। দারুণ খিদে পেয়েছে। চালা।
মন্টু জোরে চালাতে গেল। কিন্তু পয়লা ঝাঁকুনিতেই মাথাটা ঝন করে ওঠায় বিটু ককিয়ে উঠে বলল, একটু আস্তে। ঝাঁকুনি লাগলে ফের হেমারাজ হবে রে।
পিন্টু যখন ফিরল তখন সুমনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে।
হ্যাঁ রে, কী সব শুনছি?

কী শুনছ?

বিটু আর ঝিন্টুর কী হয়েছে?

পিন্টু মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু না। লাট্টু গুন্ডা নাকি একটু হামলা করেছিল। অল্প চোট লেগেছে।

ওরা কি হাসপাতালে?

হ্যাঁ। কাল—পরশুই ছেড়ে দেবে।

তা হলে তো ভালোরকমই চোট লেগেছে। আমাকে সব কথা খুলে বলবি?

বললেই তো কাঁদতে—টাঁদতে শুরু করবে।

আমি তত নরম মেয়ে নাকি রে? তোদের মতো চার—চারটে গুন্ডাকে পেটে ধরতে হয়েছে। মারদাঙ্গা কম করেছিস তোরা? এখন বুক শক্ত হয়ে গেছে। বল তো কী হয়েছিল?

লাট্টু ইট মেরেছিল বিটুকে।

কেন?

অনেকদিন ধরেই রাগ জমে আছে। পিছনে কিছু টাকাওয়ালা লোক আছে। তারাই কাজটা করিয়েছে।

আর ঝিন্টু?

ওটার তো কাণ্ডজ্ঞান নেই। খালি হাতে লাট্টুর সঙ্গে লড়তে গেছে।

লাট্টু কে?

একটা উঠতি মস্তান।

তার ঘাড়টা তোরা মুচড়ে ভেঙে দিতে পারিস না?

দেব। গা—ঢাকা দিয়েছে। তুমি ভেবো না মা।

ঘটনাটা তোর গৌর কাকা জানে?

গৌরকা সব জানে। এ শহরে যা যখন হয় গৌরকা তখনই জেনে যায়।

তার হাতে তো অনেক লোক।

পিন্টু মাকে একরকম টেনে ঘরে এনে বলল, তুমি আজ খুব রেগে আছ মা।

সুমনা রাগে গমগম করছেন। আর দু'চোখ জলে ভরা। সোফায় বসে বললেন, আমার দু'—দুটো ছেলেকে যে মেরেছে তাকে কি সহজে ছেড়ে দেব? তুই একটা রিকশা ডাক, আমি হাসপাতালে যাব।

ডাকছি। খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও। আজ বহুত পেরাসনি গেছে। বিটু সেই রিকশাওয়ালাকে মেরেছিল বলে দারুণ গণ্ডগোল। শেষে ইউনিয়নের নেতা—ফেতাকে ধরে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছি।

সুমনা উঠে ছেলেকে খাবার বেড়ে দিয়ে বললেন, তোরা আর আমাকে শান্তি দিলি না। আজ আমার একটা নাতি হল, তা আনন্দ আর করব কখন? সন্ধেবেলা গিয়ে একটু দেখে আসা উচিত ছিল।

পিন্টু চটপট খেয়ে উঠে পড়ল।

বেরোবার মুখেই একটা রিকশা এসে থামল বাড়ির সামনে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা বিটু নেমে দাঁড়াল।

মা!

সুমনা ছেলের দিকে চেয়ে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

বিটুই এসে মাকে ধরল, কাঁদছ কেন? কিছু হয়নি আমার। দেখো না, হাসপাতাল থেকে চলে এলাম।

মাতৃভক্ত বিটুকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে এলেন সুমনা।

১৮

আউটডোরে আজ প্রচণ্ড ভিড়। ডাক্তার বাসুর হিমশিম অবস্থা। এক—একদিন রোগ ভোগ দুর্ঘটনা এত বেড়ে যায় যে, দম ফেলার সময় থাকে না।

ডাক্তার বাসু তবু এই পেশাটিকে উপভোগ করেন। কদাচিৎ কোনো রুগি রোগমুক্ত হয়ে ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসে। সেরকম ঘটনা ঘটেই না। মানুষ স্বভাবত অকৃতজ্ঞ। মানুষ স্বভাবত বিস্মৃতিপরায়ণ।

কিন্তু ডাক্তার—একজন সত্যিকারের ডাক্তার সর্বদাই উপভোগ করতে পারেন নানা বিচিত্র রোগভোগের সঙ্গে তাঁর লড়াই।

ডাক্তার বাসুদেব আজ ক্লান্ত ছিলেন। আজকাল ক্লান্তি ক্রমেই বাড়ছে। মানুষের রোগভোগ নিয়ে তাঁর চিন্তা প্রবল বটে, কিন্তু নিজের শরীরের খবর অনেককাল নেওয়া হয়নি।

হাসপাতালে আর বেড খালি নেই। তবু অন্তত ছ'জন রুগি ভর্তি করা একান্ত দরকার। তার মধ্যে দুটো বোধহয় ক্রিমিন্যাল কেস। তবু চেষ্টা করা যেত। কিন্তু জায়গা না থাকলে কী করতে পারেন বাসু? বেড নেই, মেঝেতেও আর জায়গা নেই। অন্তত আরও শ খানেক বেড যদি পাওয়া যেত। কত লোককে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে রোজ।

ডাক্তারের ক্লান্তি কেন এত গভীর তা মানুষ বুঝতে পারবে না। ডাক্তার বাসু কতকাল যে ভালো করে ঘুমোননি, কতকাল পুষ্টিকর খাবার খাননি, কোনো আমোদ প্রমোদ করেননি, একটাও সিনেমা দেখেননি, গান শোনেননি। শুধু রোগ আর রোগ তাঁকে ঘিরে আছে চব্বিশ ঘণ্টা।

মাঝরাতে টেলিফোন পেয়ে চলে আসতে হয় বিছানা ছেড়ে। হাসপাতালে, নার্সিং হোম—এ। বিয়ে করেননি বলে বাঁচোয়া, নইলে বোধহয় বউ ডিভোর্স করত।

আউটডোরের সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও আজ বাসু রুগি দেখে গেলেন আরও ঘণ্টাখানেক। এরপর হাসপাতালে দু'টি এবং নার্সিং হোম—এ একটি জরুরি অপারেশন। দুপুরে আজ খাওয়া জুটবে না হয়তো। ব্রেকফাস্ট বলতে দুটো টোস্ট আর সঙ্গে কালো কফি। পেটের মধ্যে একটা অস্বস্তি হচ্ছে কখন থেকে। তবু এই খিদের কষ্টটা সহ্য করতে হবে। খালি পেটে ডাক্তার বাসুদেব অপারেশন ভালো করেন।

শেষ রুগিকে বিদেয় করে উঠতে যাবেন, হঠাৎ দেখলেন, লম্বা বেঞ্চের একটি প্রান্তে সপ্রতিভ সুন্দরী এক তরুণীকে।

চিনতে পেরে একটু হাসলেন বাসু। আরে! আপনি কখন?

ঘণ্টা দেড়েক ধরে বসে আছি, যদি আপনার চোখে পড়ে।

বাসু লজ্জিত ভাবে বললেন, বড্ড ভিড় ছিল আজ। একটু যদি আওয়াজ দিতেন!

শচী উঠে এসে মুখোমুখি বসে বলল, ডিস্টার্ব করা উচিত নয় বলে করিনি। একজন ব্যস্ত ডাক্তারকে অন্যমনস্ক করে দিলে রুগির বিপদ। আমার দরকারটা তেমন জরুরিও নয়।

বলুন কী করতে পারি?

আমি সেই রিকশাওয়ালাটার জন্য কিছু ফলটল এনেছিলাম। পাঠিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে দু'—একটা ওষুধ।

ভালো করেছেন।

কাল বিটু আর ঝিন্টুদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। পুলিশে খবর দিয়েছি বলে ওরা খুব অসন্তুষ্ট।

বাসু হাসলেন, জানি।

আমার কি আর কিছু করার আছে?

১৯

দিন সাতেক বাদে এক সন্ধেবেলা ব্রহ্মকুমার তাঁর অফিসঘরে মক্কেলদের সঙ্গে মোকদ্দমা নিয়ে তুমুল আলোচনায় ব্যস্ত, সুমনা রান্নাঘরে তাঁর নিজের জায়গায় স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিতা। কোণের একখানা ঘরে মশারির নীচে সোমা কাত হয়ে শুয়ে তার নবজাতকের মুখখানা নিবিড় চোখে দেখছে আর দেখছে। নিষ্পলক। আশা যেন আর মিটতেই চায় না। মঞ্জরী তার নিজের ঘর গোছাচ্ছিল, সাহায্য করছিল জনার্দন। দিন কয়েক বাপের বাড়িতে যেতে হয়েছিল মায়ের অসুখের খবর পেয়ে। মা এ যাত্রা বাঁচল। ঘরদোর সৃষ্টিছাড়া নোংরা হয়ে রয়েছে কয়দিনে। মন্টু, বিটু, পিন্টু, ঝিন্টু কেউ বাড়িতে নেই। এ সময়ে থাকেও না।

ব্রহ্মকুমার এক মক্কেলকে খুব ধমকাচ্ছিলেন। সে এক ঝুড়ি কচু নিয়ে এসেছে উকিলবাবুর জন্য। নিতান্ত গেঁয়ো লোক। যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে। কিন্তু কচু দেখে মেজাজটা ব্রহ্মকুমারের বিগড়েছে। তিনি কচু

দু' চোখে দেখতে পারেন না। ছেলেরাও পছন্দ করে না। কে খাবে?

ব্রহ্মকুমার বলছিলেন, এ কি কচু খাওয়ার সিজন হে? ওসব তুমি নিয়ে যাও। আমাদের হেঁসেলে ওসবের বিশেষ চলন নেই।

বলতে বলতে ব্রহ্মকুমারের হঠাৎ মনে হল, শরীরের মধ্যে একটা কী যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন একটু বে—এক্তেয়ার লাগছে মাথাটা। উনষাট বছর বয়সের কথা খেয়াল থাকে না সবসময়। এখন হঠাৎ খেয়াল হল।

উকিলবাবু! আপনার কি শরীর খারাপ?

ব্রহ্মকুমার কথাটার জবাব দিলেন না। মাথাটা চড়াত করে একটা পাক খেল। টেবিলটা দু'হাতে ধরে সামাল দিলেন। তারপর তাঁর মনে হল, দুনিয়ার খেলা তাঁর দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। শরীরে একটা ঘাম দিচ্ছে। মাথাটা খুব দ্রুত আর—একটা চক্কর দিতেই চোখ অন্ধকার হয়ে গেল।

মাথাটা আবার পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু ব্রহ্মকুমার আর দেরি করলেন না। উঠে দাঁড়ালেন।

দুজন মক্কেল এসে তাড়াতাড়ি ধরল দু'দিক দিয়ে, চলুন নিয়ে যাচ্ছি।

ব্রহ্মকুমার ভিতরবাড়িতে আসতেই প্রথম চেঁচাল জনার্দন, বাবামশাইয়ের কী হয়েছে?

তারপর দৌড়ে এলেন সুমনা।

ব্রহ্মকুমার বিছানায় শুয়ে কলকল করে ঘামছেন। হাঁসফাঁস করছেন। চোখের দৃষ্টি যেন কেমনধারা।

কোনোরকমে বললেন, ছেলেদের খবর পাঠাও। আর বেশিক্ষণ নয়।

সুমনা চোখে আঁচল চাপা দিলেন। মঞ্জরী কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জনার্দন ছুটল দাদাদের খবর দিতে। একজন মক্কেল নিজের গরজেই বলল, আমার মোটরবাইক আছে, বাসু ডাক্তারকে ধরে আনি গিয়ে।

খুব কষ্টে দেয়াল ধরে ধরে উঠে এল সোমা।

বাবা! আপনার কী হয়েছে?

যাচ্ছি মা। ভালো থেকো।

সোমা তার নিজের মতো করে শ্বশুরকে ভালোবাসে। সে উবু হয়ে বসে কাঁদতে লাগল।

ব্রহ্মকুমার আর—একটা চক্করে পড়লেন। চোখে ধাঁধা দেখছেন। মাকড়সার জাল যেন আবছা করে দিয়েছে দৃষ্টি। ওপরে পাখা ঘুরছে, কিন্তু তিনি বাতাস টের পাচ্ছেন না।

সুমনা মাথায় গলায় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ব্রহ্মকুমার স্ত্রীর দিকে চাইলেন, তোমার জন্য কিছু করতে পারলাম না। যা আছে সব দেখে রেখো।

এরকম করছ কেন? কেন ওসব ভাবছ?

টের পাচ্ছি। মানুষ মৃত্যুকে খুব টের পায়। একটু জল দাও, বড্ড তেষ্টা।

অনেকটা জল খেলেন ব্রহ্মকুমার।

মঞ্জরী বেরিয়ে গেল, একে ওকে খবর দিতে। বাচ্চা কাঁদছে বলে সোমাকেও যেতে হল।

ফাঁকা ঘর পেয়ে ব্রহ্মকুমার বললেন, শোনো সুমনা, আমার কাছে কিছু গোপন নেই। বিটু আমার ছেলে নয়, জানি। তবু তাকে কখনও অনাদর করিনি। করেছি বলো? তোমাকেও কখনও....

সুমনার পায়ের নীচে মাটি দুলে উঠল, মাথায় বজ্রপাত ঘটতে লাগল মুহুর্মুহু।

শেষ সময়টায় অসত্যের আড়ালটা সরিয়ে দিলাম। তোমাকে জানানো দরকার যে আমি সব জানি। ক্ষমা করেছি।

সুমনা এমন স্থির ও ঠান্ডা হয়ে গেলেন যে তাঁকে প্রস্তরমূর্তির মতো মনে হচ্ছিল।

ব্রহ্মকুমার চোখ বুজলেন। তলিয়ে যাচ্ছেন, কোথায় যেন এক গভীর গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন, নিরালম্ব বায়ুভূত, মরার পর কী হবে তা বুঝতে পারছেন না। অস্ফুট একটা চিৎকার করলেন, আঃ.....

সুমনার চটকা ভাঙল। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, কী হল? কী হল তোমার?

চোখ থেকে টপ টপ করে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ল ব্রহ্মকুমারের মুখের ওপর। ব্রহ্মকুমার সাড়া দিলেন না।

সাইকেলের একটা ঘণ্টির শব্দ হল। তারপরই বাড়ি কাঁপিয়ে ঝিন্টু ঢুকল ঘরে।

বাবা! বাবার কী হয়েছে? এঃ এ তো সিরিয়াস অবস্থা দেখছি!—বলেই ঝিন্টু আবার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

খবর পেয়ে দ্বিতীয়জন যে এল সে বিটু। লাভ স্টোর্সে এখন খদ্দেরের দারুণ ভিড়। তার মধ্যেই জনার্দন গিয়ে খবর দিল বাবামশাইয়ের সাংঘাতিক অবস্থা।

বিটুর বিশ্বাস ছিল তার বাবা ব্রহ্মকুমারের আয়ু খুব দীর্ঘ, অসুখ বিসুখ কখনওই করে না। সে প্রথমটায় খবরটা বিশ্বাসই করেনি।

কিন্তু ব্রহ্মকুমারের ঘর্মাক্ত মুখ, শ্বাসকষ্ট আর শরীরের পাক খাওয়া দেখে সেও কেমন হয়ে গেল। তার মাথায় এখনও ব্যান্ডেজ।

মন্টুকে খবর দিতে পারেনি জনার্দন। সে একটা এনকোয়ারিতে বাইরে গেছে। পিন্টুরও কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। বোধহয় সে একটা মোকদ্দমা তার বাবার হয়ে লড়তে জলপাইগুড়ি গেছে!

জনার্দন হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে বলল, গৌর কন্ট্রাক্টরকে খবর দিয়ে এসেছি, দুই দাদাকে পেলাম না।

সুমনা বিপন্ন চোখে চেয়ে রইলেন, কী করবেন? তাঁর তো কিছু করার নেই।

মোটরবাইকের শব্দ তুলে মক্কেল ফিরে এল।

বাসু ডাক্তার কল—এ বেরিয়েছে। অন্য ডাক্তার কাউকে কাছেপিঠে ধরতে পারলাম না। তবে বাসুর বাড়িতে খবর দিয়ে এসেছি। আমি বলি কী, নার্সিং হোম বা হাসপাতালে নিলে ভালো হয়।

সুমনা বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, কী করবি?

বিটু মাথা নাড়ল, দেখছি।

বাসু এলেন বিটু বেরোবার মুখেই, স্কুটারটা ধীরেসুস্থে স্ট্যান্ডে খাড়া করে ঢুকলেন ঘরে। মুখটা বরাবরই গম্ভীর আর হাস্যহীন। বাসুর ওপরেই যেন দুনিয়ার সব ভার চেপে আছে। লোকটাকে তেমন পছন্দ করে না বিটু। অনেকেই করে না। কিন্তু ডাক্তার ভালো। দারুণ ভালো। বাসু একটিও কথা না বলে ব্রহ্মকুমারকে পরীক্ষা করতে লাগল।

নাড়ি, বুক, প্রেশার।

আর সেই সময়টুকু সকলের চোখ নিষ্পলক চেয়ে রইল বাসুর দিকে।

ডাক্তার বাসুদেব ব্যানার্জি কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন ভগবান। ভাগ্যনিয়ন্তা। ভাবীকাল।

ব্রহ্মকুমারের সঠিক জ্ঞান ছিল না। মাঝে মাঝে অস্ফুট আওয়াজ করছিলেন। সেই সঙ্গে শরীরটা মোচড় খাচ্ছে মাঝে মাঝে।

বাসু নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে একটা অ্যাম্পুল বের করলেন। ইনজেকশান ভরলেন। তারপর ওষুধটা ঠেলে দিলেন ব্রহ্মকুমারের হাতে।

হাসিমুখে সুমনার দিকে চাইলেন তারপর।

সুমনাও চেয়ে আছেন, কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় হচ্ছে।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, অতটা গম্ভীর হওয়ার কিছু নেই। কিছুই তেমন হয়নি ওঁর। পেটে প্রচুর গ্যাস। তাই থেকে প্রেশার বেড়েছে। রাতটা ঘুমোতে দিন। কাল সকালে আমি আবার আসব।

কোনো ভয় নেই?

না, তবে ডিমেনশিয়া হতে পারে। হয়তো একটু স্মৃতিভ্রংশ ঘটবে, তবে সাময়িক। ভয় পাবেন না। এসব কেস—এ হয়।

বাসু উঠলেন। ক্লান্ত, ধীর পায়ে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সুমনা ব্রহ্মকুমারের মশারিটা টাঙাতে টাঙাতে বিটুকে বললেন, আর কাউকে ডাকবি?

বিটু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি চাইলে ডাকতে পারি, কিন্তু বাসুর ওপর ডাক্তার নেই।

জানি। তবু কেমন যেন মনে হয়, শুধু গ্যাস থেকে কি এতটা হবে?

ডাক্তারির আমিও তো কিছু জানি না মা। কী বলব?

সুমনা মশারি গুঁজলেন। বাসু প্রেসক্রিপশন রেখে গেছেন একটা। সেটা বিটুর হাতে দিয়ে বললেন, নিয়ে আয়।

বিটু বেরিয়ে গেল।

সুমনা পায়ে পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। জিপের নির্ভুল শব্দ শুনতে পেলেন। বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল, গৌর আসছে।

জিপটা থামতেই গৌর লাফ দিয়ে নামল।

কী খবর?

ভালো।

জনার্দন যে গিয়ে বলল, শেষ অবস্থা!

না। সিরিয়াস কিছু নয়। বাসু ডাক্তার দেখে গেছে।

বাসু! ওঃ তা হলে চিন্তা নেই।

আমার একটু কথা আছে।

কথা! বলো।

ঘরে এসো। আমার ঘরে।

গৌরকে নিজের ঘরে এনে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলেন সুমনা।

সর্বনাশ হয়েছে।

কী সর্বনাশ হয়েছে সুমনা?

ও তো সব জানে।

কে? ব্রহ্ম?

হ্যাঁ।

গৌর হঠাৎ হেসে উঠল, জানবে না কেন?

তার মানে?

গৌর সুমনার দিকে হাসিমুখেই চেয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, সব কি গোপন করা যায় সুমনা?

তার মানে?

ব্রহ্ম একদিন আমাকে বলেছিল।

কী বলেছিল?

সে অনেক কথা। সব তোমার শুনে কাজ নেই। কিন্তু তোমার বর আমাকে চার্জ করেনি, রাগ দেখাননি, কিছু না। শুধু সে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে সব জানে বা আন্দাজ করে।

সুমনার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে।

আমার তা হলে কী হবে? কী করে ওর ঘর করব?

যেমন করছ তেমনই করবে। কিছু ইতরবিশেষ হবে না। ব্রহ্মও তো জানে, সে তোমাকে সময় দিতে পারে না, বেচারার প্রেম ভালোবাসাটাও আসে না, অ্যান্টিরোমান্টিক লোক। হি ইজ এ ডিফল্টার অ্যাজ এ হাজব্যান্ড। সুতরাং তার বউ যদি সামান্য দ্বিচারিণী হয় তো কী করার আছে?

কিন্তু আমি? আমি কী করে ওকে মুখ দেখাব?

পারবে। জীবন তো একটাই, যা পেয়েছ আঁজলা ভরে তুলে নিয়েছ। পাপ—টাপ বলে কিছু নেই সুমনা।

তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন এসব কিছুই নয়। এরকম হওয়াই বুঝি স্বাভাবিক। আমি তোমার বউ হলে বলতে পারতে এ কথা?

গৌর হঠাৎ গম্ভীর হল। চোখ নামিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়াল, না সুমনা, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী হলে হয়তো এরকম উদার হতে পারতাম না। সেদিক দিয়ে ব্রহ্ম অনেক বড় মাপের মানুষ। কিন্তু কেন পারতাম না জানো? তুমি বলেই। আর তোমার সঙ্গে যে পরকীয়া করেছি তারও কারণ হল, তোমাকে আমার হাফ—বউ বলেই তো ধরতে হয়। একটু সময়ের গণ্ডগোলে পিছলে গেল লগ্নটা, নইলে—

সুমনার চোখে টলটল করছে জল, যদি বিটু কখনও জানতে পারে?

গৌর উদার গলায় বলল, আজকালকার ছেলে তাদের মানসিকতা আলাদা। হয়তো স্পোর্টিংলিই নেবে। আমার তো মনে হয়, বিটু অলরেডি এরকম কিছু আন্দাজও করেছে।

সুমনা চোখ কপালে তুলে বললে, সে কী! আমি তা হলে মরে যাব। বুঝলে? মরে যাব।

গৌর একটু তিক্ত মুখ করে বলে, শোনো সুমনা, গোপন করার লজ্জা আর ভয় বড় মারাত্মক। ওই টেনশন সহ্য করা যায় না, তার চেয়ে জানাজানি হয়ে গেলে খোলসা হওয়া যায়।

বিটু তোমাকে কী বলেছে?

মাঝে মাঝেই তো বলে, গৌরকা তুমি আমার বাবা হলে বেশ হত।

তুমি কি কখনও কিছু বলেছ?

না। আমি কি পাগল?

তা হলে?

বিটুর মুখ সে তো নিজেও দেখতে পায়। ও—মুখে কার ছাপ আছে তা কি এতই কঠিন যে ধরা যায় না?

যায়? আমি তো ওর মুখে আমার ছাপ দেখি।

সেও আছে। দুজনেই আছি আমরা বিটুর ভিতরে।

সুমনা কথা বলতে পারলেন না। মুখ চাপা দিলেন আঁচলে।

গৌর বলল, বয়স হয়ে গেল সুমনা, এসব নিয়ে আর খামোখা মন খারাপ কোরো না। যা ভালো মনে হয়েছিল করেছি। এখন যা হওয়ার হবে। আমরা তো আর বেশিদিন থাকব না।

তুমি বুঝবে না মায়ের কতখানি লজ্জা সন্তানের কাছে।

লজ্জা একটু তো থাকবেই। তোমরা সামাজিক মানুষ। কিন্তু আমার ওসব নেই। আমি বাস করি আদিম পৃথিবীর মানসিকতায়। তখন বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানই ছিল না। সকলেই সকলের ভোগ্য আর ভোগ্যা ছিল। আমার সমাজ নেই।

অনেকক্ষণ হল দরজা বন্ধ করে আছেন। আর ভালো দেখায় না। সুমনা গিয়ে ছিটকিনিতে হাত দিলেন।

তাঁর হাতের ওপর গৌরের হাত এসে পড়ল।

বড্ড গা ঘেঁষে উত্তপ্ত লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

কী হল? দরজা খুলতে দাও।

দাঁড়াও, শেষ পাপটুকু করে নিই।

এই বলে হঠাৎ সুমনার ওষ্ঠাধরে চুম্বন করে গৌর। দীর্ঘ প্রগাঢ় এক চুম্বন।

সুমনা বাধা দিলেন না। কোনোদিনই দেননি। দুজন পুরুষের মধ্যে তিনি বরাবর দ্বিধাবিভক্ত। কার পাল্লা ভারী বলা মুশকিল।

গৌর বলল, শোনো সুমনা, ম'রো না। তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে একটা কিছু কাণ্ড করার কথা ভাবছ। ম'রো না, প্লিজ। তুমি মরলে আমাকেও মরতে হয়। তোমাকে আমি বড্ড বেশি ভালোবাসি।

সুমনা এ কথার জবাব দিলেন না। দরজা খুললেন।

সামনেই মঞ্জরী দাঁড়ানো, মুখটা কেমন যেন।

সুমনা লজ্জা পেলেন না। মাথা উঁচুতে রেখেই জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলবে?

বাবা কি কিছুই খাবেন না?

না।

ড্রিপ দিতে লোক এসেছে। বাসু পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চলো যাচ্ছি।

যখন স্বামীর বিছানার পাশে গিয়ে বসলেন সুমনা তখনও নিজেকে অশুচি লাগল না তাঁর। দুজন লোক স্ট্যান্ডে বোতল ঝুলিয়ে ব্রহ্মকুমারের হাতে ছুঁচ ঢুকিয়ে দিল। ফোঁটা ফোঁটা ড্রিপ চলে যেতে লাগল শরীরে।

সুমনা শুনতে পেলেন, বাইরের ঘরে গৌর উঁচু গলায় কথা বলছে বিটুর সঙ্গে। তারপর জিপগাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ হল। গাড়িটা বহুদূর চলে গেল।

সুমনা ভাবলেন, মরব কেন? শেষ পর্যন্ত দেখব। তারপর মরণ তো আছেই, কে খণ্ডাবে?

ট্যাঁ করে কেঁদে উঠল নবজাতক। একটু হাসলেন সুমনা। এই সংসার ছেড়ে কোথায় যাবেন তিনি?

২০

ডাঃ ব্যানার্জি।

বাসু টেবিল থেকে উপরে মুখখানা তুললেন। আউটডোর শেষ করে রাউন্ড সেরে এসে ফাঁকা ঘরটায় বসেছিলেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলতে পারেন না।

সামনে দাঁড়িয়ে শচী।

আরে আপনি? কী খবর?

আমি আপনার খবর নিতে এসেছি। কেমন আছেন সত্যি করে বলুন তো!

আমি! আমি তো অ্যাবসোলিউটলি ভালো আছি।

শচী মাথা নেড়ে বলল, না, আপনি ভালো নেই।

কে বলল?

আমিই বলছি।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, কিছু নয়। একটু টায়ার্ড এই যা।

আপনি বড্ড খাটেন।

একটু খাটতে তো হয়ই।

কেন?

এ দেশে কিছু লোক ক্রনিক অলস। তাই বাকি কিছু লোককে ডবল খাটতে হয়। উপায় নেই। বসুন।

বসব না। আপনার তো ছুটি হয়ে গেছে, এবার উঠুন।

বাড়ি।

বাসু হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, সেখানেই বা কী আছে? একজন চাকর। ব্যস।

শচী গম্ভীর হয়ে বলল, ডাক্তার ব্যানার্জি, আপনি নিজেকে শেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু সেটা বুঝতে পারছেন না।

খাটলে কি লোকে শেষ হয়? আমি তো কাজের মধ্যেই বেশ থাকি।

আর কাজ নয়। বিশ্রাম। উঠুন।

দাঁড়ান মিস চক্রবর্তী। এখনও একটা ভিজিট বাকি। ব্রহ্মকুমার গাঙ্গুলি ইজ সিক। আজ সকালে তাকে দেখতে যাওয়ার কথা। আউটডোর থাকায় সকালে হয়ে ওঠেনি।

শচী অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, বিয়ে করলে আপনার বউ নিশ্চয়ই পালিয়ে যেত।

বাসুদেব হাসলেন। শরীরটাকে টেনে দাঁড় করাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

টায়ার্ড। ভীষণ টায়ার্ড।

মিস চক্রবর্তী, কোনো দরকার ছিল কি?

শচী গম্ভীর মুখে বলল, ছিল। কিন্তু আপনাকে দেখে ভারী মায়া হচ্ছে। যাক, পরে বলা যাবে।

বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, হাতে এখনও কিছু সময় আছে। বলুন না!

আপনার রুগি আগে! দেখে আসুন।

এসে তো আর আপনাকে পাব না।

শচী মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল, সাধারণ মেয়েদের মতো আমার বিশেষ লজ্জা—টজ্জা নেই। আমি একসময়ে একস্ট্রিমিস্ট ছিলাম, জানেন কি?

জানি।

অ্যাকশনে ছিলাম।

তাও জানি।

আমি একটি ছেলের সঙ্গে ইনভলভড হয়েছিলাম তখন। পুলিশ তাকে গুলি করে মারে। আমার দু'হাতের মধ্যেই সে মারা যায়।

এটা জানতাম না। সরি।

শচী মাথা নেড়ে বলল, আমার সেন্টিমেন্ট নেই। যা হয়েছে তা হয়েছে। আমি বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে ভালোবাসি।

বাসু চুপ করে রইলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, বর্তমান মানেই হচ্ছে অতীতের ক্রম—পরিণতি। অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমানকে মানা যায় না। ওটা ক্রনোলজিক্যাল নয়, সায়েন্টিফিক নয়।

স্বীকার করছি। কিন্তু আমার মানসিকতা ওইরকম।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু কথাটা কী?

শচী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, আজ থাক। কথাটা আর একদিন হবে।

বাসুদেব আপত্তি করলেন না। অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে বললেন, কিন্তু বলবেন। ভুলে যাবেন না।

শচী মাথা নেড়ে বলল, ভুলব না।

শচী চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন বাসু। তারপর স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ব্রহ্মকুমার আজ ভালো আছেন। মুখ—চোখ স্বাভাবিক। রক্তচাপ নেমে এসেছে। ড্রিপ খুলে নেওয়া হয়েছে।

বাসু সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, খিদে পাচ্ছে তো?

পাচ্ছে।

সব খাবেন। ঝালমশলা কিছু কম। সাতদিন রেস্ট নিন। তারপর পুরোপুরি কাজে নেমে পড়বেন।

আমার যে ইমপর্ট্যান্ট মামলা আছে ডাক্তার।

পিন্টু তো আছেই। ও দেখবে।

পিন্টু! —বলে চুপ করে রইলেন ব্রহ্মকুমার। তারপর বললেন, বেশ তাই হোক।

বাসুদেব বাড়ি ফেরার পথে টের পেলেন তাঁর মনের মধ্যে একটা গুঞ্জন হচ্ছে। শচী কিছু বলতে চায়। খুব সাধারণ কথা কি? কোনো রোগ? কোনো সমস্যা? কী?

ডাক্তার বাসু বুঝতে পারলেন না।

স্নান করে খেয়ে একটু শুলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা আঠা হয়ে লেগে গেল। আজকাল বড্ড ঘুম পায়।

ঘুমিয়ে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন বাসু। শচীর বিয়ে হয়ে গেছে। একটা ফুটফুটে বাচ্চা কোলে নিয়ে তাঁকে দেখাতে এসেছে। সঙ্গে ছোকরা স্বামী, তার বুকে একটা ছ্যাঁদা। রক্ত পড়ছে। অভ্যাসবশে ডাক্তার বাসু স্বপ্নেও ক্ষতটার দিকে চেয়ে রইলেন। রক্ত দরকার, এর এক্ষুনি রক্ত দরকার।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন বাসু। মাথাটা বড্ড ঝিমঝিম করছে। উঠে কিছু না ভেবেচিন্তেই পোশাক পরলেন।

চাকর এসে বলল, বাবু বেরোচ্ছেন?

হ্যাঁ। ফিরতে রাত হবে।

স্কুটারে তেল ভরে নিলেন পেট্রল পাম্প থেকে। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অনেকটা দূর।

শেষ দুপুরে রাস্তায় তেমন ট্র্যাফিক নেই। বাসুদেব বিনা বাধায় চলে এলেন ক্যাম্পাসে। দু'—চারজনকে জিজ্ঞেস করে শচীর কোয়ার্টারের হদিশ পাওয়া গেল। একটা বিল্ডিং—এর দোতলায় দু'ঘরের ফ্ল্যাট।

দরজা খোলা। পরদা ঝুলছে।

আসতে পারি?

জবাব নেই।

আসতে পারি?

জবাব নেই।

বাসু পরদাটা সরালেন। ভিতরে কেউ নেই। ঘর ফাঁকা। বাসু ঢুকলেন।

অজস্র বই আর বই। বিছানা, জামাকাপড়, রূপটান কোনোটাই তেমন গুছিয়ে রাখা নয়। তবু মেয়েলি ঘর বোঝা যায়।

বাসু বিছানার ওপরেই বসলেন। একটা হাই উঠল। দুটো, তিনটে। বাসুর আজকাল এটা হয়। কোথাও বসলেই ঘুম পায়। ভীষণ ঘুম। বাসু কখন ঘুমিয়ে পড়লেন টেরই পেলেন না।

শচী গিয়েছিল বাগানে। বাসার পিছন দিকে ফাঁকা জমিতে সে বাগান করেছে। একগোছা গোলাপ হাতে ঘরে ঢুকেই সে থমকাল। বুকটা কি ধক করে উঠল তার?

তারপর সে একটু হাসল। গোলাপগুলো টেবিলে ছুড়ে দিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে বাসুর জুতোজোড়া খুলে পা দুটো তুলে দিল বিছানায়। তারপর মায়াভরে মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। আপনমনে বলল, ওর চিকিৎসা কে করে তার ঠিক নেই! উনি আবার পরের চিকিৎসা করবেন!

বাসু গভীরতর ঘুমে তলিয়ে গেছেন। কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত।

শচী গিয়ে দরজাটায় ছিটকিনি তুলে দিল। তারপর বাসুর দিকে চেয়ে মুখ টিপে একটু হাসল।

বাসুর চেতনা থাকলে হাসিটার গভীর অর্থ অন্যমনস্ক বাসুরও বুঝতে ভুল হত না।

লাল নীল মানুষ

কুঞ্জনাথকে খুন করবে বলে তিনটে লোক মাঠের মধ্যে বসে ছিল। পটল, রেবন্ত আর কালিদাস।

কুঞ্জনাথ এ পথেই রোজ আসে। আজও আসবে।

রাত তেমন কিছু হয়নি। তবে নিশুত দেখাচ্ছে বটে। মাঘের এই মাঝামাঝি সময়টায় এইদিকে ডাহা শীত। তবে ইদানীং যেমন সব কিছু পালটে যাচ্ছে তেমনি হাওয়া বাতাসও। শীত নেই যে তা নয়, বরং শরীরে কালশিরে ফেলে দেওয়ার জোগাড়। এমন ঠান্ডা যে মনে হয় চারপাশের বাতাস দেয়ালের মতো জমে গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আজ বিকেল থেকে এক ঝোড়ো হাওয়া কোত্থেকে নোংরা কাগজ উড়িয়ে আনার মতো একখানা মেঘ এনে ফেলল। সেই মেঘের ছোট টুকরোটাকেই বেলুনের মতো ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে অ্যাত্তো বড় করে এখন আকাশ ঢেকে ফেলেছে। খুব কালো হয়েছে চারধার। ভেজা মাটির গন্ধ আসছে।

তিনজনই আকাশে চেয়ে দেখে বার বার। জল এলে এই খোলা মাঠে বসে থাকা যাবে না। দৌড়ে গিয়ে কোথাও উঠতেই হবে। কুঞ্জনাথও দুর্যোগে খাল পেরিয়ে মাঠের পথে আসবে না। পিচ রাস্তায় ঘুরে যাবে। যদি তাই হয় তো কুঞ্জনাথের আরও এক দিনের আয়ু আছে, তা খণ্ডাবে কে? কিন্তু এ সব কাজ ফেলে রাখলে পরে আলিস্যি আসে, ধর্মভয়ও এসে যেতে পারে। রাত মোটে ন'টা। কুঞ্জনাথ স্টেশনে নামবে ছ'টা দশের গাড়িতে। সাড়ে ছ'টার পর আসবার বাস নেই। সুতরাং ওই সাড়ে ছ'টার বাসেই তাকে চাপতে হবে। বাজারে এসে নামতে নামতে সাড়ে সাতটা। কুঞ্জনাথ এখানে না নেমে আগের গাঁ শ্যামপুরেও নামতে পারে। তার কত কাজ চারদিকে! তা হলেও গড়িয়ে গড়িয়ে এখন সময় যা হয়েছে তাতে কুঞ্জনাথের এই বেলা আসার কথা। এখন কুঞ্জনাথই আগে আসে, না জল—ঝড়ই আগে আসে সেটাই ভাবনা।

ছাতা নিয়ে বড় একটা কেউ খুন করতে বেরোয় না। এই তিনজনও বেরোয়নি। জল এলে ভরসা এক কাছেপিঠে হাবুর বাড়ি। তা সেও বড় হাতের নাগালে নয়। পুকুরপাড় ধরে ছুটে দু'—দুটো বাগান পেরিয়ে তবে। তা করতে ভিজে জাম্বুবান হয়ে যাবে তারা।

পটলের হাতে একখানা ভারী কসাই—ছুরি আছে। এটাই কাজ সারার অস্ত্র। কুঞ্জনাথ যাতে আবার জোড়া—তাড়া দিয়ে না উঠতে পারে তার জন্য এবার ঠিক হয়েছে মুন্ডু আর ধড় আলাদা করে দুটো কম করে দশ হাত তফাতে রেখে ভালো করে টর্চ মেরে দেখে নিতে হবে কাজটা সমাধা হয়েছে কি না। এর আগে কুঞ্জনাথ দু'বার জোড়া দিয়ে উঠেছে।

কালিদাসের ধারণা কুঞ্জনাথের পকেটে হোমিয়োপ্যাথির একটা ওষুধ থাকে। মরার সময়ে টপ করে এক ফাঁকে খেয়ে নেয়। তাইতে জিয়নকাঠি ছোঁয়ার মতো ওর প্রাণটা ধুক ধুক করতে থাকে নাগাড়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা সেলাই—টেলাই করে দিলে বেঁচেও যায়। কুঞ্জর বাপ হরিনাথ মস্ত হোমিয়ো ডাক্তার ছিলেন। মরা মানুষ আকছার বাঁচাতেন। তিনি থাকতে এ অঞ্চলের লোকে সাপের বিষকে জল বলে ভাবত। কলেরাকে দাস্তর বেশি কিছু মনে করত না। এমনকী এত বিশ্বাস ছিল লোকের যে, মড়া শ্মশানে নেওয়ার পথেও হরি ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিতে যেত। যদি বাঁচে।

মানুষের এমনি বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। ভাবতে ভাবতে কালিদাস মনের ভুলে হাতের টর্চটা জ্বেলে ফেলল। ফটফটে আলো ফুটে ওঠে ঝোপঝাড়ে, রাস্তার সাদা মাটিতে। আলো জ্বালার কথা ছিল না। রেবন্ত 'হেঃ ই' করে উঠতে কালিদাস কল টিপে আলো নেভায়।

পটল জানে আসল কাজটা তাকেই করতে হবে। রেবন্তর হাতে একটা মোটা লাঠি আছে, কালিদাসের কাছে টর্চ ছাড়াও একটা হালকা পলকা ছুরি আছে। কিন্তু কাজের সময় যত দায় তারই! লোকে জানে, তার

হল পাকা হাত। তবু ঠিক কাজের সময়টায় পটল ভেতরে ভেতরে কেমন থম ধরে থাকে। একটু বেখাপ্পা কিছু শব্দ সাড়া বা স্পর্শ ঘটলে সে তিন হাত লাফিয়ে ওঠে। টর্চের আলোতেও সে তেমনি চমকে গেল। একবার শুধু দাঁত কিড়মিড় করে। পটল টের পাচ্ছে, তার হাঁফির টানটা ঠান্ডায় কিছু তেজি হয়েছে। বুকে শব্দ হচ্ছে। মুখ দিয়ে রাশি রাশি বাতাস টানতে হচ্ছে। সাবধানে কিছু কেশে সে গয়ের ফেলল। এই রোগেই কি একদিন সে মরবে?

রেবন্ত হাতের আড়াল করে সিগারেট টানছে। সব ব্যাপারেই তার মাথা ঠান্ডা। অন্তত দেখায় তাই। কিন্তু আসলে সে তার কিশোরী শালি বনাকে ভাবছে। সবসময়েই আজকাল সে বনাকে ভাবে। সে যে ভাবে তা দুনিয়ার আর কেউ টের পায় না। বনাও না। যদি অন্তর্যামী কেউ থাকেন তো তিনি জানেন। আর কারও জানার উপায় নেই। বনাকে ভাবে, কারণ তাকে কোনওদিন পাবে না রেবন্ত। বনা স্বপ্নেও জানে না কখনও যে, তাকে রেবন্ত ভাবে। কিন্তু ওই একটুই রেবন্তর জীবনের আনন্দ। দুঃখ, বিষাদ, উৎসব, আমোদ, আতঙ্ক যাই ঘটুক জীবনে রেবন্ত তৎক্ষণাৎ বনাকে ভাবতে শুরু করে। আর তখন চোখের সামনের ঘটনাটা আর তাকে স্পর্শ করে না। সে একদম বনাময় হয়ে যায়। এখনও তাই হয়ে আছে সে। একটু বাদেই রক্ত ছিটকোবে, হাড় মাসে ইস্পাতের শব্দ উঠবে, গোঙানি, চেঁচানি কত কী ঘটতে থাকবে। এ সময়েও বনার চিন্তা তাকে অন্যমনস্ক রেখেছে। সব সময়ে রাখে। তাই তাকে ভারী ঠান্ডা আর ধীর স্থির দেখায়।

কুঞ্জর সঙ্গে রবি থাকবে। আর সেইটেই কালিদাসের চিন্তা। কুঞ্জকে মারার কথা, রবিকে নয়। কালিদাসের ক্ষুদ্র বুদ্ধি। সে বোঝে, রবির বেঁচে থাকা মানে সাক্ষী রইল। রবি অবশ্য পালাবে। তা পালালেও কিছু না কিছু তো তার নজরে পড়বেই। সাক্ষীর শেষ রাখাটা ঠিক হচ্ছে কি না তা সে ভেবে পায় না। যাই হোক, কুঞ্জর যে আজ আর শেষ রাখা হবে না তা কালিদাস খুব জানে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, কুঞ্জ প্রথম জখমে মুখ থুবড়ে পড়লেই সে গিয়ে তার পকেট হাতড়ে হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের শিশিটা সরিয়ে ফেলবে। এর আগের বার গলার নলি কাটা পড়েও কুঞ্জ বেঁচে যায়। তারও আগে বল্লম খেয়ে বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়েছিল। কুঞ্জ মরেনি। হোমিয়োপ্যথি ছাড়া আর কী হতে পারে? কালিদাস অনেকক্ষণ ধরেই টের পাচ্ছে যে, পটলের হাঁফির টান উঠেছে। কাশছে মাঝে মাঝে।

খালের ওধারে সরু পিচের রাস্তা কল্যাণী কটন মিল অবধি গেছে। সেই রাস্তা থেকে আবার একটা পিচরাস্তা বাঁ ধারে ধনুকের মতো বেঁকে হাইস্কুলের বাহারি বাড়িটার গা ঘেঁষে তেঁতুলতলায় ঢুকেছে। তেঁতুলতলায় গা ঘেঁষাঘেঁষি লোকবসতি। বাইরের লোকজন নয়, তেঁতুলতলায় কল্যাণী কটন মিলের মালিক ভঞ্জদের বাস। তারাই একশো ঘর। জ্ঞাতিগুষ্টি দূরে যারা ছিল তারাও কিছু এসে গেড়ে বসেছে। ভঞ্জদের জামাইবংশও আছে কয়েক ঘর। কুঞ্জনাথের বাবা হরিনাথও ছিল এদের জামাই।

পিচ রাস্তা দিয়ে গুড় গুড় করে একটা স্কুটার গেল। খুব জোর যাচ্ছে। ধনুকের মতো বাঁকা পথে সেটা ঢুকতেই আলো দেখা গেল। রেবন্ত বহু দূরের আলোটা দেখে। গিরিধারী ভঞ্জই হবে। ললিতমোহনের এই একটি ছেলেই কিছু শৌখিন। স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানে স্কুটার জমা রেখে রোজ ট্রেন ধরে কলকাতায় ফুর্তি করতে যায়। এতক্ষণে ফিরছে। তবে কুঞ্জর আসারও আর দেরি নেই!

কিন্তু বৃষ্টিও আসছে। ঠেকানো গেল না। বহু দূরের মাঠে বৃষ্টির ঝিন ঝিন শব্দ।

২

বাজারের মধ্যে ব্রজেশ্বরী গ্রন্থাগার। আসলে পুরোটাই এক মুদিখানা। একধারে হলদি কাঠের একটা মাঝারি আলমারিতে শ' দুয়েক বই। আলমারির পাশে একটা চৌকি। তাতে মাদুর পাতা। চৌকির মাঝামাঝি একটা জানালা। ওপাশে খাল। গাছপালার ডগা জানলায় উঁকি মারে।

চৌকিতে বসে জানালার বাইরে ঘরের বিজলিবাতির আভায় যতটুকু দেখা যায় ততটুকু অন্ধকারে মাখা একটু সবুজ দেখছিল রাজু। খুব মন দিয়ে দেখছিল।

গ্রন্থাগার আর মুদির দোকান একসঙ্গে চালায় তেজেন। তার একটু লেখালেখির বাতিক আছে। রাজু এর আগে আরও কয়েকবার এসেছিল, তখন তেজেন তাকে গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ শুনিয়েছে। রাজু হাঁ হুঁ কিছু বলেনি। লেখা যেমনই হোক তেজেন লোকটা ভারী সরল। বি এ পাশ করে বসে বসে এইসব করে। প্রায়ই বলে, আমার কিছু হবে না, না রাজুবাবু?

গ্লাসের চা শেষ হয়ে গেছে। তেজেন পান আনাল। কুঞ্জ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্তা বলছে।

রাজুর হাতে পান দিয়ে তেজেন বলে, আপনি কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছেন।

রাজুকে এ কথাটা ভীষণ চমকে দেয়। বুকে ঘুলিয়ে ওঠে একটা ভয়। মাথা দপ দপ করতে থাকে।

কুঞ্জ তেজেনের দিকে চেয়ে চোখ টিপল। তারপর পানের পিক ফেলে, তোর মাথা। এই শীতে সকলেরই শরীরের রস কষ কিছু টেনে যায়।

না। কিন্তু—

তেজেন আরও কী বলতে যায়। কুঞ্জর ইঙ্গিতটা সে ধরতে পারেনি।

কুঞ্জ টপ করে বলে, রাজুর ঝোলায় দুটো বই আছে। চাইলেই রাজু তোর লাইব্রেরিতে দিয়ে দেবে।

রাজুর দিকে চেয়ে তেজেন সোৎসাহে বলে, কী বই?

রাজুর মুখটা সাদা দেখাচ্ছিল। চোখে একটা জ্বলজ্বলে চাউনি। শ্বাস জোরে চলছে। তেজেনের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়ল।

মুখ নামিয়ে রাজু তার শান্তিনিকেতনি ঝোলায় হাত পুরে দুটো বই বের করে দেয়। একটা নভেম্বর মাসের রিডারস ডাইজেস্ট আর একটা ইউ এস আই এস থেকে পাওয়া সল বেলোর উপন্যাস। তেজেনের লাইব্রেরির সভ্যরা ছোঁবেও না। তবু তেজেন খুশি হয়ে বলে, যদি দেন তো দু'লাইন উপহার বলে লিখে দেবেন।

রাজু একটু হেসে বলে, দিলাম। লেখা—টেখার দরকার নেই।

এই তেজেনের দিকে চেয়েই রাজুর বুকের ভয়টা একটু থিতিয়ে পড়ে। বই—পাগল সাহিত্য—পাগল এই ছেলেটা কী ব্যর্থ চেষ্টায় লাইব্রেরি বানানোর কাজে লেগে আছে। ছোট থেকে এখন কেউ বড় হয় না। সে যুগ আর নেই। তেজেনের দিকে চেয়ে রাজু ওর ব্যর্থতাকে দেখতে পায়। ভারী মায়া হয় তার।

রবি কোথায় গিয়েছিল। একটা থলে হাতে দরজায় উদয় হয়ে বলল, জল আসছে কুঞ্জদা।

চল।—কুঞ্জ বলে, ওঠ রে রাজু।

তেজেন জিজ্ঞেস করে, আছেন তো কয়েকদিন?

রাজু মাথা নাড়ে, না, কাল—পরশুই ফিরব।

থাকুন না ক'দিন। একদিন সবাই মিলে বসি একসঙ্গে। এদিকে তো সাহিত্য নিয়ে কথা বলার লোক নেই।

আবার আসব।

রাজু উঠে পড়ে।

রাস্তায় নেমে এসে যে তারা হন হন করে হাঁটা দেবে তার জো নেই। দু'পা এগোতে না এগোতেই কেউ না কেউ কুঞ্জকে ডাকবেই। ও কুঞ্জদা! কুঞ্জবাবু নাকি? এই কুঞ্জ!

সেবার কুঞ্জ ভোটে দাঁড়িয়ে খুব অল্পের জন্য হেরে যায়। তখন পুরনো কংগ্রেসে ছিল। তারপর হাওয়া বুঝে নতুন কংগ্রেসে নাম লেখাল। কিন্তু নমিনেশন পেল না। এখন রাজনীতির হাওয়া এত উলটোপালটা যে, কোন দলে নাম লেখাবে তা বুঝতে পারছে না। তবে হাল ছাড়েনি। বাপ কিছু টাকা বোধ হয় রেখে গেছে, জমি আছে, বুড়ি দিদিমাও নাকি মরার সময় কিছু লিখে—টিখে দিতে পারে। তবে ভাগীদারও অনেক। ভাইরা আছে, তিন তিনটে বোন বিয়ের বাকি। কুঞ্জর সবচেয়ে বড় মূলধন তার মুখের মিষ্টি কথা। শরীরে রাগ নেই। কাউকে অবহেলা করে না। ওই আকাট বোকা রবি যে রবি সেও কুঞ্জর কাছে যথেষ্ট মূল্য পায়। তাই আঠা হয়ে লেগে থাকে। দু'—দু'বার কুঞ্জ মরতে মরতে বেঁচেছে। ঘাড়ের জখমের জন্য এখনও বাঁ দিকে মুখ

ঘোরাতে পারে না ভালো করে। ঠান্ডা লাগলে ডান দিকের ফুসফুসে জল জমে যাওয়ার ভয় থাকে। তবু সে থেমে নেই। তার এই অসম্ভব কাজে ব্যস্ত জীবনটাকে রাজু তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু কুঞ্জকে সে যে ভালোবাসে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রাস্তায় তিন—চারজন লোক জুটল সঙ্গে। হাঁটার গতি কমে গেল। টর্চ জ্বেলে রবি পথ দেখাচ্ছে। চারদিকে নিকষ্যি অন্ধকার। আঁধার রাজুর হাঁফ ধরে। সে কখনও আলো ভালোবাসে, কখনও অন্ধকার, কখনও অনেক লোকজনের সঙ্গ তার পছন্দ, কখনও নির্জনতা। আজকাল তার এ সব হয়েছে। সেই যে একদিন সেই ভয়াবহ স্বপ্নটা দেখেছিল, তারপর থেকে...

রবি বাঁ ধারে টর্চ ফেলে দাঁড়িয়ে। বড় রাস্তা থেকে পায়ের পথ নেমে গেছে। খালের ওপর কাঠের সাঁকো। সাঁকো পেরিয়ে মেঠো পথে গেলে পথ অর্ধেক। রাজু অনেকবার গেছে।

লোকজন বিদায় নিল এখান থেকে। কুঞ্জ ডাকল, রাজু, আয় রে।

রাজু সামনের গাছপালায় ঘন হয়ে ওঠা পাথুরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে চাপা স্বরে বলে, সাপখোপ নেই তো।

বলেই রাজুর খেয়াল হয়, এ তার শহুরে ভয়। এখন শীতকাল, সাপ বড় বেরোয় না।

সাপের কথায় রবি টর্চের মুখ ঘুরিয়ে পিছনে ফেলে বলে, নেই আবার! মেলা আস্তিক। এই পোলের ধারেই তো কদমকে ঠুকেছিল। ইয়া চিতি! ওঝা ডাকার সময়ও দেয়নি।

কুঞ্জ বলল, ধুঃ। আয় তো। রোজ যাচ্ছি। রবিটার মাথায় কিছু নেই। কদমকে কামড়েছিল বদরুদের বেড়ায় ধারে, সে কি এখানে?

পোলের ওপর উঠে রবি টর্চ মেরে জল দেখে খুব বিজ্ঞের মতো বলে, দ্যাখো কুঞ্জদা, চিত্ত জানা ডিজেলে কেমন জল টানছে। এরপর কিন্তু কাদা ছাড়া খালে কিছু থাকবে না।

তোর মাথা। চল, বৃষ্টি আসছে।—কুঞ্জ সস্নেহে ধমক দেয়।

রাজু জানে, রবি একটা আস্ত ছাগল। বোধবুদ্ধি নেই, পেটে কথা রাখতে পারে না, রাস্তায় বেরোলেই লোকে পিছু লাগে, খ্যাপায়। অতিরিক্ত কথা কয় আর হাবিজাবি বকে বলে তিন মিনিটে লোকে ওকে বুঝে ফেলে, সঙ্গ এড়াতে চায়। কিন্তু ভোটপ্রার্থী কুঞ্জ হচ্ছে আলাদা ধাতের লোক। কারও ওপর না চটা, কাউকে এড়িয়ে না চলা, কাউকে অবহেলা না করার একরকম অভ্যাস গজিয়ে গেছে তার। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বোকা রবি ছায়া হয়ে ঘুরছে তার সঙ্গে, তবু কুঞ্জর মাথা এখনও বিগড়োয়নি।

রবিকে একটু আগু হতে দিয়ে কুঞ্জ আর রাজু পিছিয়ে পড়ল। কুঞ্জ নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে, তনু চিঠিপত্র দিয়েছে?

দেবে না কেন? প্রায়ই দেয়।

সব ভালো তো?

রাজু মনে মনে একটু কষ্ট পায়। এই একটা ব্যাপারে কুঞ্জ বোধ হয় বোকা।

রবি সামনে এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন দিকে টর্চ ঘুরিয়ে বলে, পা চালাও কুঞ্জদা। এসে গেল জল।

কুঞ্জ বলে, তুই এগো। আমরা কথা কইতে কইতে যাচ্ছি।

রবি এগোয়।

কুঞ্জ আগে, রাজু পিছনে হাঁটে। রাস্তা অন্ধকার বটে, তবে ঘন ঘন আকাশের ঝিলিকে পথ বেশ দেখা যাচ্ছে।

রাজু জানে কুঞ্জ আর একটু কিছু শুনতে চায়। কিন্তু বলার কিছুই নেই। তনু স্বামীর ঘরে সুখেই আছে। কিন্তু সে কথা কি শুনতে চায় কুঞ্জ? বরং ওর ইচ্ছে, এখনও তনু ওর কথা ভেবে স্বামীর ঘর করতে করতেও একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলুক। প্রতি চিঠিতে কুঞ্জর কুশল জানতে চাক। সেই মধ্যযুগীয় ব্যাপার আর কী!

আর এই একটা জায়গাতেই কুঞ্জ বোকা।

একটু চুপ থেকে কুঞ্জ বলে, সিতাংশুবাবুর এখন গ্রেড কত রে?

রাজু মৃদু স্বরে বলে, ইঞ্জিনিয়ারদের গ্রেড কে জানে বাবা? তবে শুনেছি, হাজার দেড়েকের ওপরে পায়।

গাড়িও তো আছে?

এ সবই ভালো করে জানে কুঞ্জ। তবু প্রতিবার জিজ্ঞেস করে। এখনও কি নিজের সঙ্গে সিতাংশুকে মনে মনে মিলিয়ে দেখে কুঞ্জ? সিতাংশুর চেহারা মোটাসোটা, কালো, মাঝারি লম্বা। রাজপুত্তুর নয় বটে, কিন্তু সিতাংশু বিরাট বড়লোকের ছেলে, বিলেত—টিলেত ঘুরে এসেছে।

একমাত্র কুঞ্জই জানে না, তনু জীবনে কাউকে সত্যিকারের ভালোটালো বাসেনি। খুবই চালাকচতুর ছিল তবু, ছিল কেন, এখনও আছে। খুবই পাকা বিষয়বুদ্ধি তার। স্কুল কলেজে পড়ার সময় রাজ্যের ছেলেকে প্রশ্রয় দিত, নিজের বাপ—ভাই ছাড়া আর বড় বাছবিচার করত না। তা বলে তনু গলেও পড়েনি কারও জন্য। নিজের বোনের জন্য রাজুর লজ্জা বরাবর। কিন্তু তনু যে আগুপিছু না ভেবে কাজ করবে না, হুট করে শরীরঘটিত কেলেঙ্কারি বাঁধাবে না, এ বিষয়ে মা—বাবার মতো রাজুও নিশ্চিন্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত তনু খুবই স্থিরবুদ্ধিতে কাজ করেছে। এম এ পাশ করার পর বেছেগুছে নিজের পুরুষ সঙ্গীদের ভিতর থেকে সবচেয়ে সফল আর যোগ্য লোকটিকে বেছে নিয়ে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর তনু হয়ে গেছে একেবারে অন্য মানুষ। ঘর—সংসার, টাকা জমানো, স্বামী—শাসন, শ্বশুর—শাশুড়িকে হাত করা ইত্যাদি খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে করছে। কে বলবে, এ বিয়ের আগেকার সেই বার—মুখী মেয়েটা!

তনু যখন কিশোরী তখন থেকে কুঞ্জর যাতায়াত। অন্যদের মতো তনু হয়তো কুঞ্জকেও প্রশ্রয় দিয়েছে। খুব ভালোভাবে জানে না রাজু। তবে কুঞ্জর ভাব—সাব দেখে সন্দেহ হত। তনুর কোনও ভাবান্তর ছিল না, সে কুঞ্জকে যদি প্রশ্রয় দিয়েই থাকে তবে তা নিতান্তই অভ্যাসবশে দিয়েছে। তখন কুঞ্জর চেহারা খারাপ ছিল না, কিন্তু চেহারায় পটবার মেয়ে কি তনু? সুপুরুষ দেদার সঙ্গী তার চারদিকে গ্রহমণ্ডলের মতো লেগে থাকত। তনুর সঙ্গী ছেলে ছোকরারাও জানত, তনুকে নিয়ে ফুর্তি দু'দিনের। চিড়িয়া একদিন ভাগবে। শুধু কুঞ্জই তা জানত না। আজও তাই জানতে চায়, তনুর স্মৃতিতে সে এখনও একটুখানিও আছে কি না! কুঞ্জ এখনও বিয়ে করেনি, করবে কি না বোঝাও যাচ্ছে না। তবে রাজু বোঝে কুঞ্জ খুব প্রাণপণে বড় হতে চাইছে। বড় কিছু হওয়ার, নামডাকওয়ালা হওয়ার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলল, তনুর বিয়েটা ভালোই হয়েছে, কী বল রাজু?

রাজু সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করেই বলল, ভালো হয়েছে বুঝব কী করে? আজকাল বড় চাকরি বা গাড়ি—বাড়ি থাকলেই লোকে সেটা সাকসেস বলে ধরে নেয়। যেন ও ছাড়া জীবনে আর মহৎ কিছু নেই। আমি তো মনে করি, ওর চেয়ে সৎ, চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান, পরোপকারী লোককেই আসলে সাকসেসফুল লোক বলা উচিত।

খুশি হয়ে কুঞ্জ খুব আবেগের গলায় বলে, সে বড় ঠিক কথা। কিন্তু মেয়েরা এ সব বুঝতে চায় না কেন রে? বড় বোকা মেয়েমানুষ জাতটা।

মনে মনে রাজু বলে, কিংবা খুব চালাক।

পুকুরধার, বাগান, নারকোলকুঞ্জের ভিতর দিয়ে পথটা পাক খেতে খেতে গেছে। তারপরই মাঠ। রবি মাঠের ধারে পৌঁছে পিছনে টর্চ মেরে বলে, এসে গেল গো! ভেজা মাটির গন্ধ পাচ্ছি।

গাছের আড়াল সরে যেতেই হাওয়ার ঢল এসে লাগল বুকে। কী শীত! বাতাসে জলের হিম। এত হাওয়ায় শ্বাসকষ্ট হতে থাকে রাজুর। কান কনকন করতে থাকে, নাকের ডগায় জ্বালা। তবু এই মাঠখানা রাজুর বরাবর ভালো লাগে। তেপান্তরের মতো পড়ে আছে উজবুক একটা মাঠ। এখানে সেখানে চাষ হয় বটে, কিন্তু বেশির ভাগটাই এখনও সবুজ। একটা—দুটো নৈর্ব্যক্তিক পুকুর আছে, মাঝে মাঝে গাড়লের মতো গজিয়েছে তাল বা নারকোল গাছ। মেঠো পথের ধারে ধারে ঝোপঝাড়ও আছে রহস্যের গন্ধ মেখে। জ্যোৎস্না ফুটলে এ মাঠে বিস্তর পরি নেমে আসবে বলে মনে হয়।

কয়েক কদম আগে আগে কুঞ্জ ভারী আনমনা হয়ে হাঁটছে। ওর মাথা ভর্তি এখন তনুর স্মৃতি। কত জ্যান্ত আর শরীরী হয়ে তনু ওর মনে হানা দেয় এখনও! ভেবে রাজুর কষ্ট হয়। কুঞ্জর সঙ্গে তনুর অসম্ভব বিয়েটা যদি ঘটনাচক্রে ঘটতই তা হলে কি রাজু খুশি হত? না, কিছুতেই না। তনু ঠিক লোককেই বিয়ে করেছে, এমনকী জাত বর্ণ পর্যন্ত মিলিয়ে। এখন এই বিরহে কাতর কুঞ্জটার জন্য তবে কেন কষ্ট রাজুর? মুখ ফুটে কোনওদিন তনুকে ভালোবাসার কথা রাজুকে বলেনি কুঞ্জ, শুধু বরাবর আভাস দিয়েছে।

রবি এদিক ওদিক টর্চ ফেলছে। উলটোপালটা হাওয়ায় মাঝে মাঝে তার গানের শব্দ আসছে। এই বিশাল মাঠে, ঢলানি হাওয়ায়, অন্ধকারে তারা তিনজন যেন বহু দূর—দূর হয়ে গেছে। যেন কেউ কারও নয়। যেই এই একা হওয়ার বোধ এল অমনি রাজুর বুক খামচে ধরল সেই ভয়। সকলের অজান্তে কে এক মৃত্যুর জাল ছুঁড়ে দিচ্ছে তাকে ধরার জন্য!

রাজুর হাঁফ ধরে যায়। গলার কাছে কী যেন পুঁটুলি পাকিয়ে উঠে ঠেলা দেয়। শরীরের কিছুই তার বশে থাকে না।

গভীর কালো একটা পাথুরে আকাশে নীলাভ উজ্জ্বল এক রথ কোনাকুনি ধীর গতিতে উঠে যাচ্ছে, এই স্বপ্ন এক রাতে দেখেছিল সে। আর কিছু নয়, শুধু এক তারা চাঁদ সূর্যহীন নিকষ আকাশ, আর ওই ভূতুড়ে রথ। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল তার। শব্দহীন তলহীন ওই কালো আকাশ কখনও দেখেনি সে জীবনে। আর সেই নীল আলোয় মাখা রথই বা এল কোথা থেকে? যতবার সে রাতে ঘুমোতে গেল ততবার দেখল। হুবহু এক স্বপ্ন। কেউ কি দেখে এরকম? শেষ রাতটুকু জেগেই কাটাল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মাস তিনেক ধরে প্রতি রাত প্রায় জেগেই কেটে তার।

রথযাত্রায় ছাড়া সারা জীবনে রাজু আর রথ দেখল কই? তাছাড়া ওরকম নীলাভ সুন্দর রথের ছবিটাই বা সে পেল কোথায়? আকাশটাই বা কালো কেন? কেন ধীরগতিতে রথ উপরে উঠে যাচ্ছে? অনেক যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে এই স্বপ্নের সামাজিক বাস্তব ব্যাখ্যা খুঁজে দেখেছে রাজু। কিছু পায়নি। কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারেনি কিছুতেই। কেবলই মনে হয়, এই যৌবনের চৌকাঠেই বুঝি মৃত্যুদূত পরোয়ানা নিয়ে এল! কাউকেই স্বপ্নের কথা বলেনি সে। কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখেছে, এ স্বপ্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত ছাড়া কিছুই নয়। গত তিন মাসে তার শরীর গেছে অর্ধেক হয়ে। খায় না ভালো করে, ঘুম নেই। সারাদিন একটা দূরের অস্পষ্ট সংকেত টের পায়। রাতে সেটা গাঢ় হয় আরও। মৃত্যু আসছে। আসছে।

এই মাঠের মধ্যে ঠিক তেমনি মনে হল। বড় দামাল হাওয়া, বড় খোলামেলা মাঠ, অনেক দূর হয়ে গেছে লোকজন।

কাতরস্বরে রাজু ডাকে, কুঞ্জ!

কিন্তু কুঞ্জ শোনে না। রাজুর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মুছে ফেলে দেয় বাতাস।

সামনে, কিছু দূরে তখন হঠাৎ রবির হাতের টর্চটা ছিটকে পড়েছে মাঠে। পড়ে লাশের মতো স্থির হয়ে একদিকে আলোর চোখ মেলে চেয়ে আছে। সেই আলোয় বিশাল প্রেতের ছায়া নড়ছে। কয়েকটা পা, লাঠি।

রবি কি একবার চেঁচাল বোঝা গেল না, তবে সে টর্চটা কুড়িয়ে নেয়নি তা বোঝা যাচ্ছিল।

কুঞ্জ হেঁকে বলল, রাজু! ডাইনে নেমে যা।

কাঁপা গলায় রাজু বলে, কেন?

সে কথা কানে গেল না কুঞ্জর। দু'হাত ওপরে তুলে পাগলের মতো সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে সে চেঁচাতে লাগল, খুন! খুন! খুন!

রাজু খুনের মতো কিছু তেমন দেখতে পায়নি। কুঞ্জর মতো তার চোখ অত আঁধার—সওয়া নয়। বিজলিবাতি ছাড়া শহুরে রাজু ভারী অসহায়। কিন্তু কুঞ্জ যখন দেখেছে তখন ঠিকই দেখেছে।

রাজুর বুকে এমন ওলট পালট হচ্ছিল যে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। সে ডানদিকে মাঠের মধ্যে ছুটতে গিয়ে দেখে, পা চলে না। শরীরে খিল ধরে আসছে।

কুঞ্জ চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছে সামনে। কিন্তু এই বিশাল মাঠে হাওয়ার ঢল ঠেলে সেই চিৎকার কোথাও যাচ্ছে না। দূরে ভঞ্জদের পাড়ায় নিয়োন বাতি জ্বলছে, রাস্তায় আলোর সারি। লোকজন রয়েছে। কিন্তু এত দূর পর্যন্ত কোনও সংবাদই পৌঁছচ্ছে না।

মাঠের মধ্যে বুদ্ধুর মতো দাঁড়িয়ে রাজু সিদ্ধান্ত নিল, কুঞ্জটা মরতে যাচ্ছে, মরবেই।

এটা ভাবতেই তার মাথা ঠান্ডা হয়ে গেল। কুঞ্জকে কি মরতে দেওয়া যায়? যার বুকে অত ভালোবাসা? যে কখনও কাউকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করে না? কুঞ্জর মতো ভালো ক'জন?

রাজু অন্ধকারে পথের ঠাহর না পেয়ে সামনের দিকে জোর কদমে এগোতে থাকে। কয়েক কদম হেঁটে আচমকা দৌড় শুরু করে। ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে পরিশ্রমে। হাতে পায়ে খিল ধরছে, কুঁচকিতে খিঁচ। তবু প্রাণপণে দৌড়োয় রাজু।

ভঞ্জদের এলাকার উজ্জ্বল আলোর পর্দায় সে কয়েকটা কালো মানুষকে ভুঁইফোড় গজিয়ে উঠতে দেখে সামনে। ওদের হাতে লাঠি বা ওই জাতীয় সব অস্ত্র। মুখে কথা নেই।

এর পর থেকে রাজু সঙ্গে ছোরা রাখবে। খুব আফসোসের সঙ্গে সে উবু হয়ে বসে চারদিক খামছে ঢেলা খুঁজতে গিয়ে একটা ভারী মতো কী পেয়ে গেল! পাল্লাটা খুব দূরের নয়। মরিয়ার মতো চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার! শালা, খুন করে ফেলব।

বলেই সে হাতের ভারী বস্তুটা ছোড়ে।

কারও লাগেনি, রাজু জানে। কিন্তু আততায়ীরা বোধ হয় তৃতীয় কোনও লোককে প্রত্যাশা করেনি। চেঁচানি আর ঢিল ছোড়া দেখে হতভম্ব হয়েই বোধ হয় হঠাৎ অন্ধকারে তারা 'নেই' হয়ে গেল।

রাজু পথে বসে হাঁফাতে থাকে। বুক অসম্ভব কাঁপছে গলা চিরে গেছে।

কুঞ্জ খুবই স্বাভাবিকভাবে মাঠে নেমে জ্বলন্ত টর্চটা কুড়িয়ে চারদিকে ফেলে। তারপর নরম স্বরে বলে, ব্যাটা ভেগেছে।

কে?—রাজু জিজ্ঞেস করে।

রবি।—বলে খুব হাসে কুঞ্জ।

হাসছিস?

হাসিই আসে রে! বিপদে আজ পর্যন্ত সঙ্গী পেলাম না। আজ শুধু তুই ছিলি। এই দ্যাখ না, রবিকে তো সবাই আমার ছায়া ভাবে। দ্যাখ, শালা লোক দেখেই টর্চ ফেলে আমাকে রেখে হাওয়া।

ওরা কারা?

কে বলবে? তবে ঠাকুরের ইচ্ছেয় শত্রুর তো অভাব নেই। উঠতে পারবি এখন? শরীর খারাপ লাগছে না তো!

রাজু ওঠে। পা দুর্বল, শরীরে থরো—থরো কাঁপুনি।

কুঞ্জ শান্ত গলায় বলে, চ, বৃষ্টি এল বলে।

ভারী নির্বিকার কুঞ্জ। যেন এরকম ঘটনা নিত্য ঘটছে। দেখে রাজুর রক্ত গরম হয়ে যায়। কুঞ্জর ঠান্ডা রক্ত তার একদম পছন্দ নয়। বলে, লোকগুলো কোথায় গেল দেখবি তো! পথে যদি আবার অ্যাটাক করে?

কুঞ্জ নিভু—নিভু টর্চটা হাতের তেলোয় ঠুকে তেজ বাড়ানোর অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বলল, আর মনে হয়, চেষ্টা করবে না। তোকে দেখে ভয় খেয়েছে। ঠাহর পায়নি তো তুই কে বা কেমন ধারা!

চিনতে পারিসনি?

না। রবি হয়তো দেখেছে।

রাজু খুবই রেগে যায় মনে মনে। কিন্তু ওঠেও। টের পায়, ঘটনাটা আচমকা ঘটায় তার কিছু উপকার হয়েছে। মনের স্যাঁতসেঁতে ছিচকাঁদুনে ভাবটা আর নেই। ঝরঝরে লাগছে।

বনশ্রীর চেহারা ঠিক তার নামের মতোই, তাকে দেখলে যে—কোনও পুরুষেরই গাছের ছায়া বা দিঘির গভীর জলের কথা মনে পড়তে পারে। বনশ্রী নিজেও জানে তার চেহারায় তাপ নেই, তীক্ষ্নতা নেই, আছে স্নিগ্ধ লাবণ্য। তাকে কেউ মা বলে ডাকলে ভারী ভালো লাগে তার।

সবার আগে বলতে হয় তার চুলের ঐশ্বর্যের কথা। কালো নদীর মতো স্রোত নেমে এসেছে। তাতে সামান্য ঢেউ—ঢেউ। এলো করলে আস্ত একটা কুলো দিয়েও ঢাকা যায় না। তার গায়ের রং যেন কালো চুলেরই ছায়া। একবার এক পাত্রপক্ষ তাকে দেখতে এসে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, এ তো কালো! অহংকারী বনশ্রী লজ্জায় নতমুখী হয়েছিল। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, আপনি ভুল করছেন। আপনার চোখ নেই। বলেনি বটে, কিন্তু বনশ্রী মনে মনে ঠিক জানে যারা দেখতে জানে তারা দেখবে, এ রঙের কালো ফরসা হয় না। এ হল বনের গভীর ছায়া, এ হল দিঘির জলের গভীরতা। সে দেখেছে, পুরুষ মানুষ যখন তার দিকে তাকায় তখন ওদের তেমন কাম ভাব জাগে না, কিন্তু বুক জুড়ে একটা পুরনো তেষ্টা জেগে ওঠে। খুব বেশি পুরুষ যে তাকে দেখে তা নয়, কিন্তু সারা দিন শতবার আয়নায় মুখ দেখে বনশ্রী। কেমন মুখ? একটু লম্বাটে গড়ন, গালের ডৌলটি লাউয়ের ঢলের মতো। ঘন জোড়া ভ্রূ। এই একটু খুঁত তার, জোড়া বাঁধা ভ্রূ নাকি ভালো নয়। কিন্তু তার নীচে চোখ দুটির দিকে তাকাও। এমন মায়াভরা চোখ দ্যাখেনি কেউ। অন্য সব কিছুকে তুচ্ছ করে দেয় সীমানা ছাড়ানো তার দুই চোখ। চোখের মণি যেন দুধ—পুকুরে এক গ্রহণ—লাগা চাঁদের ছায়া। নাক চাপা বলে দুঃখ নেই বনশ্রীর। তবে ছোটবেলায় একবার বোলপুর রেলস্টেশনে একটা লোক তার নাকছাবি ছিঁড়ে নিয়েছিল নাক থেকে। সেই ক্ষতের দাগ আজও আছে। তার ঠোঁট শীতকালেও কখনও ফাটে না। সব সময়ে টই—টুম্বুর হয়ে আছে পাকা ফলের মতো। লম্বা নয় বনশ্রী, কিন্তু ছোট মাপের মধ্যে তার শরীর—স্বাস্থ্য ঢলঢলে। বনশ্রী নিজের রূপে মুগ্ধ বটে, কিন্তু কখনও শরীর বসিয়ে রেখে গতরখাস হওয়ার চেষ্টা করে না। রোদে—জলে সে গাঁয়ের পর গাঁ হেঁটে গ্রাম—সেবিকার কাজ করেছে। হরেক রকম ত্রাণকাজে ঘুরে বেড়িয়েছে শহরে গঞ্জে। কলেজে ইউনিয়ন করার সময় উদয়াস্ত খেটেছে নাওয়া—খাওয়া ভুলে।

সে জীবনটা চুকেবুকে গেছে বনশ্রীর। এখন তাকে ঘরেই থাকতে হয়। বরং বলা চলে ঘরে বসে তাকে অপেক্ষা করতে হয় বিয়ের জন্য। মাঝে মধ্যে পাত্রপক্ষ আসছেও। কেউ কেউ পছন্দও করছে। কিন্তু বড্ড খাঁই তাদের। মিল হতে গিয়েও ফসকে যাচ্ছে নানা গেরোয়। একটা বিয়ে সব ঠিকঠাক, শোনা গেল পাত্র দুম করে আর একজনকে রেজিস্ট্রি করেছে। আর একজন এসেছিল তুকারাম রাঠোর। তারা নাকি তিন পুরুষ ধরে কলকাতায়, বাঙালিদের সঙ্গে বিয়ে—শাদি। কিন্তু বাবা বললেন, রাঠোরটা কিছু কঠোর হয়ে যাচ্ছে। আমার নরম মেয়েটার সইবে না। খুব হাসি হয়েছিল নেই নিয়ে। বনশ্রীর বিয়ে নিয়ে কখনও মজার, কখনও দুঃখের, কখনও হতাশার নানা ঘটনা ঘটছে। বাবা সত্যব্রত এক সময়ে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে কিছুদিন ছাত্র ছিলেন। রবি ঠাকুরকে দেখেছেন। মাঝে মধ্যে তীর্থযাত্রার মতো সপরিবারে শান্তিনিকেতনে যান। তাঁর ইচ্ছে, বনশ্রীর বিয়ে হোক এমন ছেলের সঙ্গে, যে শিল্প বোঝে।

ইচ্ছে করলে বনশ্রী কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু বনশ্রী এই একটা ব্যাপার কখনও মনে মনে পছন্দ করেনি। ছেলে—ছোকরাদের ভারী দায়িত্বজ্ঞানহীন, ছটফটে আর অবিশ্বাসী মনে হয় তার। সে পছন্দ করে একটু বয়স্ক লোক। অন্তত দশ বছরের বড়, বেশ ধীরস্থির বিবেচক, দায়িত্ববান। খুব পরিশ্রমী আর বিশ্বস্ত পুরুষ হবে সে। গভীর মায়া থাকবে সংসারে, চরিত্রবান হবে, ইতি—উতি তাকাবে না, ছোঁক ছোঁক করবে না। তা ছাড়া বনশ্রী ভাবে, একটা লোকই তাকে পছন্দ করে নিয়ে যাবে, সেটা যেন বড় একপেশে ব্যাপার। সে চায়, পাত্রের গোটা পরিবার তাকে পছন্দ করুক, তারিফ করুক, সবাই মিলে সাদরে গ্রহণ করুক তাকে। সেই ধরনের সম্মান আলাদা। হোটেল রেস্টুরেন্ট ঘুরে, ফাঁকা কথায় পরস্পরকে ভুলিয়ে, নিতান্ত লোভে কামুকতায় জৈবিক ইচ্ছেয় বিয়ে সে কোনওদিন চায়নি। তাই কখনও কারও সঙ্গে প্রেম হয়নি তার, যদিও বহুজন পেয়ে বসতে চেষ্টা করেছে। কত চিঠি আসত তখন। কত ইশারা ইঙ্গিত ছিল চারপাশে।

নোংরামিই বা কম কী দেখেছে বনশ্রী। পথেঘাটে সুযোগ বুঝে ইতর পুরুষেরা অশ্লীল নানা মুদ্রা দেখানোর চেষ্টাও করেছে কতবার।

বনশ্রীকে তাই আজও অপেক্ষা করতে হচ্ছে। নিজের স্নিগ্ধ ছায়া নিয়ে বসে আছে সে। একদিন সেই পরম মানুষটি বহুদূর থেকে হা—ক্লান্ত হেঁটে এসে ঠিক বসবে ছায়ায়। তাকে জুড়িয়ে দেবে বনশ্রী।

বিনা কাজে আজও দুপুরে এসেছিল রেবন্তদা—তার জামাইবাবু। যদি বনশ্রী বুকে হাত দিয়ে বলে যে রেবন্ত লোকটাতে সে দু'চোখে দেখতে পারে না তা হলে মিছে কথা বলা হবে। লম্বাটে গড়নের ভাবুক ও অন্যমনস্ক রেবন্তকে প্রথম থেকেই তার ভালো লেগেছিল। দিদি শ্যামশ্রী দেখতে খারাপ নয়, বনার মতোই। তবে তার বুদ্ধি বড় কম। অল্পে রেগে যায়, সামান্য কথা নিয়ে তুলকালাম বাঁধায়। ওদের সংসারে শান্তি নেই। শ্যামশ্রীও খুব ঠ্যাঁটা মেয়ে, রেবন্তদা যা পছন্দ করে না ঠিক সেইটা জোর করে করবে। বিয়ের পর যেটা নিয়ে ওদের সবচেয়ে বেশি অবনিবনা হয়েছিল সেটা হল চরকা। আদর্শগত দিক দিয়ে রেবন্ত চরকার বিরুদ্ধে।

অথচ মা সবিতাশ্রীর প্রভাবে তারা তিন বোনই চরকা কাটতে শিখেছে। সবিতাশ্রীর বাবা কট্টর গাঁধীবাদী ছিলেন এবং এখনও আছেন। সরল ঋজু চেহারার মানুষ, ছাগলের দুধই তাঁর প্রধান পথ্য। খুব ভোরে উঠে চরকা কাটতে বসেন। বাড়ির প্রত্যেককেই দিনের কোনও না কোনও সময়ে কিছুক্ষণ চরকা কাটতেই হবে, তাঁর অনুশাসনে। গাঁধীজির আদর্শ অনুযায়ী নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাউকে কাউকে হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার আগ্রহ ছিল তাঁর। গাঁধীজী একবার নাকি সি আর দাশকেও বলেছিলেন, তোমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে অন্তত একজনকে হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো। সবিতাশ্রীর বাবার সেই আগ্রহ অবশ্য কাজে পরিণত হয়নি। এ নিয়ে সত্যব্রত নানা তর্ক করেছেন। এখনও স্ত্রীকে বলেন, তোমাদের গাঁধীজি পরম রামভক্ত ছিলেন। অথচ শম্বুক বর্ণাশ্রম ভেঙেছিল বলে স্বয়ং রামচন্দ্র তাকে চরম দণ্ড দেন। তা হলে বর্ণাশ্রমের সমর্থক রামচন্দ্রের ভক্ত হয়ে গাঁধীজি বর্ণাশ্রম ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন কেন? সবিতাশ্রী এর সঠিক জবাব দিতে পারেন না, বলেন, সে আমলের কথা আলাদা। সমাজ কত পালটে গেছে। সত্যব্রত বলেন, বাইরেটা পালটায় বটে কিন্তু তা বলে মানুষের রক্ত তো নীল হয়ে যায়নি। ভিতরটা পালটায় না। রবীন্দ্র—ভক্ত সত্যব্রত হিন্দুই বটে, ব্রাহ্ম নন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সংস্পর্শে তিনি কিছুটা বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন একদা। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুরের পরম গাঁধীভক্তি দেখে এবং সবিতাশ্রীকেও যে একদা হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তা জেনে তিনি কঠোর বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী হয়ে পড়লেন। শ্বশুরের সঙ্গে ঘোর তর্ক জুড়তেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের বক্তব্যকেও প্রকাশ্যে নস্যাৎ করতে লাগলেন। এখন আর স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করেন না বটে তবে মাঝে মাঝে ফুট কাটেন, ওগো শুনছ, এই দ্যাখো খবরের কাগজে লিখেছে পশ্চিমবাংলার একজন পরম গাঁধীবাদী নেতা খুব মাংস খেতে ভালোবাসেন। সবিতাশ্রী অবাক হয়ে বলেন, তাতে কী? সত্যব্রত খুব হেসে বলেন, স্বয়ং গাঁধী বলতেন আমি লাঠি ভেঙে ফেলব তবু সাপকে মারব না। তা ওরকম গোঁয়ার অহিংস মানুষের চ্যালারা মাংস খাচ্ছে, এটা একটু কেমন কেমন লাগে না!

সে সব দিন পার হয়ে গেছে! এখন গোটা ব্যাপারটাই পরিহাসের বিষয়। বিয়ের সময় সবিতাশ্রীকে তাঁর বাবা একটি চরকা উপহার দেন যথারীতি। সবিতাশ্রী আগে অভ্যাসবশে রোজ চরকা কাটতেন। ছেলেমেয়ে হলে তাদেরও শেখালেন। শ্যামশ্রী, বনশ্রী, চিরশ্রী এবং শুভশ্রী চমৎকার চরকা কাটতে শিখল। কিন্তু অনুশাসন বজায় রাখার জন্য কোনও গাঁধীবাদী তো এ সংসারে নেই। তাই চরকার অভ্যাস ক্রমে শ্লথ হয়ে এল। এখন সংসারে নানা কাজ আর সম্পর্কে জড়িত সবিতাশ্রী কেবল গাঁধীজির জন্মদিনে কিছুক্ষণ চরকা কাটেন। ছেলেমেয়েরা আর চরকা ছোঁয়ও না। কিন্তু শ্যামাশ্রীর বিয়ের সময় দাদু লোক মারফত উপহার বলে একটি চরকা পাঠিয়ে দিলেন। বিয়ের আসরে সেই চরকা দেখে প্রথম হাসাহাসি তারপর কিছু গুঞ্জন উঠল। বোকা কিন্তু জেদি শ্যামশ্রী সেইটেই অপমান বলে ধরে নেয়। অপমানের প্রতিশোধ নিতে সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে রোজ চরকা কাটে। রেবন্তর সঙ্গেও তার সেই নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত।

কিন্তু বনশ্রী জানে, চরকা থেকে ঝগড়াটা জন্মায়নি। দু'—চার দিনেই চরকাটা হয় শ্যামশ্রী ভুলে যেত, নয়তো রেবন্ত দেখেও দেখত না। চরকাটা কারণ নয়, উপলক্ষ মাত্র। ব্যক্তিত্ববান পুরুষরা জেদি মেয়ে পছন্দ করে না, জেদি মেয়েরা পছন্দ করে না পুরুষের খবরদারি। এ হল স্বভাবের অমিল।

কিন্তু এ ছাড়াও একটা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সেই কারণের কথা ভাবতে বনশ্রী ভয় পায়। বড় ভয় পায়। বছর দেড়েক আগে শ্যামশ্রীর যখন বিয়ে হয় তখন বনশ্রীও বিয়ের যুগ্যি যুবতী। তখন সে বেশ ভালো করে পুরুষের দৃষ্টি অনুবাদ করতে পারে। সেই বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই সে তার নতুন জামাইবাবুর চোখে অন্য আলো দেখতে পায়। সেই থেকে ভয়।

বাইরে তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কোথায় কোনও বৈলক্ষণ্য নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে রেবন্ত তাকে এক—আধ পলক নিবিড় বিহ্বল চোখে দেখে। ঘুরে ঘুরে তাকেই দেখতে আসে নাকি? যেমন আজও এসেছিল? একদিন দুপুরে বনশ্রী ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুমের মধ্যেই অস্বস্তি হতে থাকে তার। কেমন অস্বস্তি তা বলতে পারবে না, তবে কেমন যেন তার ভিতর থেকেই কেউ তাকে জেগে উঠবার ইশারা দিচ্ছিল বার বার। বেশ চমকে জেগে উঠেছিল সে। আর জেগেই দেখল তার পায়ের দিকে খাটে রেবন্ত বসে আছে। মুখে সামান্য হাসি, চোখে অপরাধীর দৃষ্টি। না, রেবন্ত কোনওদিন তার গায়ে হাত দেয়নি, কখনও খারাপ ইঙ্গিত করেনি। তবে ওই বসে থাকাটা একটু কেমন যেন। যুবতী মেয়ের ঘুমের শরীর পুরুষ দেখবেই বা কেন? বনশ্রী জাগতেই রেবন্ত বলল, বসে বসে তোমার পা দেখছিলাম। বনশ্রী তো লজ্জায় মরে যায়। ছি ছি, পায়ের ডিম পর্যন্ত শাড়ি উঠে আছে। ধড়মড়িয়ে বসে সে ঢাকাঢুকি দিল। তখন রেবন্ত বলল, বনা, লজ্জা পেয়ো না, কিন্তু এমন সুন্দর পায়ের গঠন কোনও মেয়ের দেখিনি। এ খুব ভাগ্যবতীর লক্ষণ।

সেই থেকে কেমন খটকা।

জামাইদের ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ি আসাটাও তো খুব স্বাভাবিক না। এখান থেকে রেবন্তর গাঁ কাছেই। শ্যামপুর। কিন্তু কাছে বলেই যে আসবে তারও তো মানে নেই। এমনিতেই গাঁয়ের জামাইদের পায়াভারী। ন'মাসে—ছ'মাসে পায়ে ধরে যেচে আনতে হয়। স্বভাব অনুযায়ী রেবন্তর আরও পায়াভারী হওয়ার কথা। সে খুব আত্মসচেতন, রাগী, খুঁতখুঁতে। তবে আসে কেন?

আজ দুপুরের দিকে এল। রুক্ষ চেহারা, দাড়ি কামায়নি, চোখের দৃষ্টিও এলোমেলো। কথাবার্তাও কিছু অসংলগ্ন ছিল। বাইরে থেকে ডাকছিল, চিরু, এই চিরু।

চিরশ্রী তখন বাড়িতে ছিল না, স্কুলে ছিল।

বাইরে থেকে কে ডাকে দ্যাখ তো। জামাইয়ের গলা নয়?—সবিতাশ্রী বনাকে ডেকে বলেন।

বাইরে থেকে ডাকার কিছু নেই। রেবন্ত অনায়াসে ঘরে দোরে ঢোকে। বনা গিয়ে দেখে বারান্দায় কাঁঠাল কাঠের চৌকিতে চুপ করে বসে আছে। একটু আগে পাড়ার বিশু, বাবুয়া আর ক'টা পাড়ার ছেলে মিলে টোয়েন্টি নাইন খেলছিল। তাস তখনও পড়ে আছে চিত—উপুড় হয়ে। রেবন্ত একদৃষ্টে সেই তাসের দিকে চেয়ে। বারান্দায় ঠেস দেওয়া তার সাইকেল।

বনা যথেষ্ট অবাক ভাব দেখিয়ে বলল, ও মা! জামাইবাবু! বাইরে বসে কেন?

রেবন্ত খুব কাতর দুর্বল এক দৃষ্টিতে চাইল বনার দিকে। বলল, আমি এক্ষুনি চলে যাব।

কথাটার মানেই হয় না। চলে যাবে তো এলে কেন? তবু বনা বলে, যাবেন তো, তাড়া কী? মা ডাকছে চলুন। চা বসাই গিয়ে।

রেবন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আমার সঙ্গে লোক আছে।

বনা কথাটা বুঝল না, বলল, তাতে কী? লোকদের ডেকে আনুন না, সবাই বসবেন, চা করে দিচ্ছি।

রেবন্ত মাথা নেড়ে বলল, তা হয় না। কাজ আছে। জরুরি কাজ।

বনা অবশ্য কোনও লোককে দেখতে পায়নি। রাস্তার লোককে বাড়ি থেকে দেখার উপায়ও নেই। সামনে অফুরন্ত বাগান, খানিকটা খেত। মেহেদির উঁচু বেড়ার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে নিম আম জাম তেঁতুল জামরুল

গাছের নিবিড় প্রতিরোধ। তার ওপর এবার অড়হর চাষ হয়েছে বড় জায়গা জুড়ে। সেই ঢ্যাঙা গাছের মাথা দেড় মানুষ পর্যন্ত উঁচু হয়ে সব আড়াল করেছে।

বনা বলল, মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে সকাল থেকে কিছু খাননি। চারটি মুড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছি, ডাল তরকারি দিয়ে খেয়ে তারপর রাজ্যজয়ে যাবেন খন।

রেবন্ত হাঁ করে বনার দিতে চেয়ে থেকে বলল, আমাকে কি খুব শুকনো দেখাচ্ছে? বনা ফাঁপরে পড়ে যায়। শুকনো দেখাচ্ছে বললে জামাইবাবুর যদি মন খারাপ হয়ে যায়? রোগা বলে রেবন্তর কিছু মন খারাপের ব্যাপার আছে। প্রায়ই জিজ্ঞাসা, আমার স্বাস্থ্যটা আগের চেয়ে ভালো হয়নি? বনা তাই দোনো—মোনো করে বলে, রোদে এসেছেন তো তাই।

নিজের গালে হাত বুলিয়ে অন্য মনে কিছুক্ষণ বসে থেকে রেবন্ত বলে, আজ দাড়িটাও কামানো হয়নি।

গাঁয়ের কোনও লোকই রোজ দাড়ি কামায় না। এমনকী বড় ভঞ্জবাবুপর্যন্ত নির্বাচনী সভায় তিন দিনের খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি নিয়ে বক্তৃতা করছেন, এ দৃশ্য বনশ্রী দেখেছে। তবে রেবন্ত শ্বশুরবাড়ি আসার সময় দাড়ি কামিয়ে আসবেই। বেশির ভাগ দিনই বোধ হয় বাজারের সেলুন থেকে কাজ সেরে আসে, গালে ভেজা সাবানের দাগ লেগে থাকে।

বনা বলল, এখন আপনি আমাদের পুরনো জামাই, শ্বশুরবাড়ি আসতে বেশি নিয়ম কানুনের দরকার হয় না। উঠুন তো, ভিতরে চলুন। সঙ্গের লোকেরা কি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? ডেকে আনুন গে তাদের।

রেবন্ত মাথা নেড়ে বলে, ওরা আসবে না।

কথাটা বনার ভালো লাগল না। রেবন্ত যে আজকাল কিছু আজেবাজে লোকের সঙ্গে মেশে তা শ্যামাশ্রীই বলে গেছে। বাবাও একদিন দেখেছেন, জামাই পটলের সঙ্গে বাগনান স্টেশনে বসে আছে। দৃশ্যটা ভালো ঠেকেনি তাঁর চোখে। পটলটা মহা বদমাশ।

সুন্দর চেহারার ভাবুক রেবন্ত কেন বদ লোকের সঙ্গে মেশে তা আকাশ পাতাল ভেবেও কূল করতে পারে না বনশ্রী। শুধু মনটা খারাপ হয়ে যায়।

রেবন্ত বনশ্রীর চোখে চোখ রেখে বলল, আমি যদি আর কখনও না আসি বনা?

বনশ্রী চমকে উঠে বলে, ও কী কথা?

রেবন্ত ম্লান হেসে বলে, অনেক কিছু ঘটতে পারে তো?

বনশ্রীর বুক কাঁপছিল। বলল, কী হয়েছে আপনার বলুন তো? দিদি কিছু বলেছে?

সে কথা নয়।—বলে রেবন্ত তার সাইকেলটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

এ সময়ে সবিতাশ্রী পরিষ্কার কাপড় পরে ঘোমটা অল্প টেনে শান্ত পায়ে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, রোদে এসেছ, স্নান করে দুটি খেয়ে যাও।

রেবন্ত অবশ্য রাজি হয়নি। বলল, না আমার কাজ আছে।

বনশ্রী চা করে দিল। সেটা খেয়েই সাইকেলে চলে গেল রেবন্ত। বনশ্রী মাকে বলল, দিদির সঙ্গে আবার বোধ হয় বেঁধেছে।

গাঁধীবাদী শিক্ষার দরুন সবিতাশ্রীর ধৈর্য খুব বেশি। সহজে রাগ উত্তেজনা হয় না, সব ব্যাপারেই কিছু অহিংস নীতির সমাধান ভেবে বের করতে চেষ্টা করেন। বললেন, জামাইকে দোষ দিই না, শ্যামা বড় জেদি।

বনশ্রী বলল, জামাইবাবুর আজকের চেহারাটা কিন্তু ভালো নয় মা। খুব একটা কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে। তুমি বরং দিদির কাছে কাউকে পাঠিয়ে খবর নাও।

বিকেলের আগেই শুভ সাইকেলে দিদির বাড়ির ঘুরে এসে বলল, দিদি বলেছে জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া—টগড়া হয়নি। তবে ক'দিন ধরে নাকি জামাইবাবু রাতটুকু ছাড়া বাড়িতে থাকে না, খেতেও যায় না। বাড়ির কেউ কিছু জানে না, কাউকে বলে না কোথায় যায়। দিদি জিজ্ঞেস করে জবাব পায়নি।

সত্যব্রত এ সব খবর জানেন না। কিন্তু বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে হাতমুখ ধুতে উঠোনের কোণে পাতা পিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে পায়ে পা ঘষতে ঘষতে সবিতাশ্রীকে বললেন, আজ ইস্কুলের কাজে দুপুরে বাগনান গিয়েছিলাম। ফেরার পথে শ্যামার বাড়ি যাই। সেখানে শুনলাম অমিতার সব ঘটনা নাকি রেবন্ত জানতে পেরেছে। শ্যামার সঙ্গে তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি। বলেছে নাকি আগে জানলে ও বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করত না।

অমিতা সবিতাশ্রীর ছোট বোন। খুবই তেজি মেয়ে এবং সমাজকর্মী। কুমারী বয়সে একবার সে সন্তানসম্ভবা হয়। এ নিয়ে হইচই খুব একটা হতে দেয়নি সবিতাশ্রীর বাবা। শান্তভাবেই তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন, সন্তানটির বাবা কে এবং তার সঙ্গে অমিতার বিয়ে সম্ভব কি না। অমিতা সন্তানের বাবার নাম বলেনি, তবে এ কথা বলে যে বিয়ে সম্ভব নয়। সবিতাশ্রীর বাবা গগনবাবু আর কোনও চাপাচাপি করেননি। যথারীতি অমিতার সন্তান জন্মায়। গগনবাবু সেই উপলক্ষে পাড়ায় মিষ্টি বিলোন। অমিতা কিছুদিন পরেই বাবার আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে চাকরি করতে থাকে। এখন সম্পর্কও রাখে না। ঘটনাটা বহুদিনের পুরনো। লোকে ভুলেও গেছে। অমিতা নামে যে কেউ আছে এ নিতান্ত তার আপনজন ছাড়া আর কারও মনে পড়ে না।

সবিতাশ্রী চিন্তিত মুখে বললেন, কার কাছ থেকে শুনল?

সত্যব্রত ঠোঁট উলটে বিরক্তির সঙ্গে বলেন, কে জানে! শ্যামাটা তো বোকার হদ্দ। কোনও সময়ে বলে ফেলেছে হয়তো। তবে জামাই অমিতার কাণ্ডকারখানা শুনে বিগড়োইনি। সে নাকি শ্যামাকে বলেছে, ও সব আমি অত মানি না, কিন্তু তোমার দাদু লোককে মিষ্টি খাওয়াল কেন? এটা কি আনন্দের ঘটনা? আসলে তোমাদের গুষ্টিই পাগল আর চরিত্রহীন।

সেই বিকেলের দিককার ঘটনা। বনশ্রী বা ভাইবোনরা কেউ মা—বাবার কথার মাঝখানে কথা তোলে না। এই সৎশিক্ষা সবিতাই দিয়েছেন। কিন্তু কথা না বলেও সে শীতের মরা বিকেলের ফ্যাকাশে আলোয় নিজের বাবার মুখে একটা গভীর থমথমে রাগ আর বিরক্তি দেখেছিল। ঘরে যেতে যেতে বাবা বারান্দায় ভাঁজ করা বস্তায় জোরে পায়ের পাতা ঘষটাতে ঘষটাতে খুব আক্রোশে, কিন্তু চাপা গলায় বললেন, কোনও পরিবারের অতীতটা যদি ভালো না হয় তবে এ সব ঝঞ্ঝাট তো হবারই কথা। জামাইকে দুষি কেন? আমাদেরও কি ভালো লাগে?

সত্যব্রতরও গভীর হতাশা রয়েছে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে তিনি কলকাতার আর্ট স্কুলে এসে পাশ করে শিল্পী হওয়ার চেষ্টায় লেগে যান। একটা স্কুলে ড্রইং শেখাতেন সামান্য বেতনে। বড় কষ্ট গেছে। রং তুলি ক্যানভাসের খরচ তো কম নয়। তার ওপর আছে মাউন্টিং আর একজিবিশন করার খরচ। বেশ কয়েক বছর কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন তিনি। কিন্তু শিল্পের লাইনে তিনি দাঁড়াতে পারলেন না। বহু টাকা গুনোগার দিয়ে অন্তত গোটা পাঁচেক একক প্রদর্শনী করেছিলেন, গ্রুপ একজিবিশনেও ছবি দিয়েছেন। তেমন কোনও প্রশংসা জোটেনি, ছবি বিক্রিও হয়নি তেমন। শিল্পসন্ধানী সাহেবদের পিছনে হ্যাংলার মতো ঘুরেছেন, শিল্প সমালোচকদের খাতির করে বেড়িয়েছেন। মদটদও তখন ধরেছিলেন ঠাটের জন্য। সব পণ্ডশ্রম। পরে জ্ঞানচক্ষু খুললে ভঞ্জদের স্কুলে ড্রইং মাস্টারের চাকরি নিয়ে চলে আসেন। বলতে কী, এখানেই তাঁর ভাগ্য খুলেছে। বুড়ো ভঞ্জ শীতলবাবু খুব স্নেহ করতেন। এই সব জমিজমা একরকম তাঁর দান বলেই ধরতে হবে। জলের দরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। চাষের জমিও পেলেন সস্তায় এবং ধারে। শীতলবাবু মরে গেলেও ছেলেরা সত্যব্রতকে শ্রদ্ধা করে। ভঞ্জদের বাড়ির অনেকেই তাঁর ছাত্র। সত্যব্রত এখন ড্রইং মাস্টার নন, হেডমাস্টার।

বনশ্রী বাবার দুঃখটা খুব টের পায়। বাইরে এক ধরনের অভাব ঘুচলেও এ লোকটার বুক খাঁ খাঁ করে। ব্যর্থতা কুরে কুরে খায়। তবে সত্যব্রতর আঁকার ব্যর্থতা থাকলেও নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা শিল্পবোধ আর সুরুচি ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন। ছেলে শুভশ্রীকে একটু—আধটু আঁকতেও শেখান আজকাল। কিন্তু শিল্পের অভ্যাস তাঁকে যত ছেড়ে গেছে ততই তিনি নিজের ওপর আর পারিপার্শ্বিকের ওপর মনে মনে খেপে গেছেন। মুখে প্রকাশ করেন না, কিন্তু মুখের গভীর রেখা ও দৃষ্টিতে তা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়।

দিনটা আজ ভালো গেল না। শ্যামশ্রী আর রেবন্তর দাম্পত্যজীবনের কথা শুনে, দেখে বনশ্রীর নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে একরকম ভয় হয়।

এইসব ঘটনায় মনটা উদাস হয়ে গেল। আর আজই যেন তার মন খারাপ করে দিতে মেঘ করল আকাশে। এমনিতেই শীতের বিকেল বড় বিষণ্ণ। তার ওপর মেঘ আর মন—খারাপ।

সন্ধের পর সত্যব্রত বেরোলেন। চিরশ্রী আর শুভশ্রী উঠোনের অন্যপ্রান্তে, পড়ার ঘরে। স্বভাব—গম্ভীর সবিতাশ্রী তার হরেক রকম ঘরের কাজে আনমনা। ফলে বনশ্রী একা। কিছুক্ষণ রেডিয়ো শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু মেঘলা আকাশ আর বিদ্যুৎ চমকানির জন্য রেডিয়োতে বড্ড কড় কড় আওয়াজ হতে থাকায় বন্ধ করে দিল। বই পড়তে মন বসল না। জানালায় দাঁড়িয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে। কিন্তু বড্ড কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া, তাতে বৃষ্টির মিশেল। বড় মাঠে একটা বাজ পড়ল বোধ হয়।

জানালার পাল্লা বন্ধ করতে না করতেই বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল। ছোট ছোট ঢিল পড়ার মতো শব্দ হচ্ছে দক্ষিণের ঘরের টিনের চালে। পুকুরের জলে জল পড়ার শব্দ একরকম, গাছপালায় বৃষ্টির শব্দ অন্যরকম।

মন—খারাপ নিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে হঠাৎ বনশ্রী টের পায়, বাইরের বারান্দায় কাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

কে?

বাইরে থেকে চেঁচিয়ে জবাব আছে, ভয় নেই, আমি কুঞ্জ, ঘরের লোক।

কুঞ্জ সকলেরই ঘরের লোক। লোকে তাকে নিজেদের ঘরের ভাবুক বা না ভাবুক কুঞ্জ নিজেকে সবার ঘরের লোক বলে মনে করে। এই ব্যাপারে তার লজ্জা সংকোচ নেই। কেউ মরলে, বিপদে পড়লে, আপনি এসে হাজির হয়। নিজেই দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে কাজ উদ্ধার করে দেয়। কুঞ্জকে লোকে ভোট হয়তো এককাট্টা হয়ে দেয় না, কারণ গাঁয়ের রাজনীতি অত সরল নয়। কিন্তু তাকে পছন্দ করে সবাই। সে কারও বাড়িতে গেলে কেউ বিরক্ত হয় না।

শ্যামশ্রীর বিয়েটা ঘটিয়েছিল কুঞ্জই। রেবন্ত তার খুব বন্ধু ছিল। এখন শোনা যায়, কুঞ্জর সঙ্গে রেবন্ত নাকি দায়ে—কুড়ুলে।

কুঞ্জকে কথাটা একটু বলতে হবে ভেবে বনশ্রী দরজা খুলে সপাট বাতাসের ধাক্কা খায়। দুটো দরজা ফটাং করে ছিটকে গিয়ে কাঁপতে থাকে। বাইরের গভীর দুর্যোগের চেহারাটা এতক্ষণে টের পায় বনশ্রী।

কুঞ্জদা, ঘরে আসুন।—চেঁচিয়ে বনশ্রী ডাকে।

বাইরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে দুটো ছায়ামূর্তিকে বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল। দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে।

ডাক শুনে কুঞ্জ উঠে এসে বলে, ভিতরে আজ আর যাব না। জলটা ধরলেই রওনা হয়ে পড়ব।

জমে যাবেন ঠান্ডায়, নিউমোনিয়া হবে।

কুঞ্জ হেসে বলে, আমাদের ও সব হয় না। বারো মাস বাইরে বাইরে কাটে।

আসুন, কথা আছে।

কুঞ্জ বলে, চা খাওয়াও যদি তবে আসি। সঙ্গে কলকাতার এক বন্ধু আছে কিন্তু।

আহা, তাতে কী। আমরা কি পর্দানশিন? নিয়ে আসুন। ইস, বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে গেছেন একেবারে। ডাকেননি কেন?

গেরস্তকে বিব্রত করার দরকার কী?

আসুন তো!

কুঞ্জ গিয়ে তার বন্ধুকে ডেকে আনে। দরজা নিজেই ঠেলে বন্ধ করে। বলে, ওঃ, যা ভেজাটাই ভিজেছি! ঘরের মধ্যে ভারী ওম তো! বুঝলি রাজু, এ বলতে গেলে আমাদের আত্মীয়ের বাড়ি।

বনশ্রী কুঞ্জর বন্ধুকে ইলেকট্রিকের আলোয় কয়েক পলক দেখে। একটু শুষ্ক চেহারা, চোখের দৃষ্টি একটু বেশি তীব্র, চোখদুটো লালও। গাল ভাঙা, লম্বাটে মুখ। তবে লোকটার মুখে চোখে একটা কঠোরতার

পলেস্তারা আছে। খুব শক্ত লোক।

কুঞ্জ বলে, এ হল রাজু, আমার কলেজের বন্ধু, দু'জনে একসঙ্গে ইউনিয়ন করতাম।

গাঁ গঞ্জে পুরুষ ছেলের সঙ্গে যুবতী মেয়েদের এরকমভাবে পরিচয় করানো হয় না সাধারণত। তবে বনশ্রীদের বাড়ির নিয়ম অন্যরকম। বনশ্রী নিজেও ছেলেদের সঙ্গে কম মেশেনি। এখন অবশ্য কেমন একটু সংকোচ এসে গেছে। বনশ্রী মৃদুস্বরে বলল, বসুন, খুব ভিজে গেছেন, শুকনো কাপড় দিই কুঞ্জদা?

আরে না। তেমন ভিজিনি। চা খাওয়াও, তাতেই গা গরম হয়ে যাবে।

রাজু বনশ্রীর দিকে একবারের বেশি তাকায়নি, কথাও বলেনি। এ ঘরে একটা পাটিতে ঢাকা চৌকি আর কয়েকটা কাঠের ভারী চেয়ার আছে। কুঞ্জ চৌকিতে বসল, রাজু চেয়ারে। কুঞ্জ নিঃসংকোচে, রাজু ভারী জড়সড় হয়ে।

কুঞ্জ বলল, কী কথা আছে বলছিলে?

আগে চা আনি।

ছাতা মাথায় উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘর পর্যন্ত যেতেই বনশ্রী বৃষ্টি আর হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

উনুনের সামনে বসা সবিতাশ্রী ঠান্ডা কঠিন মুখটা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, কে এসেছে?

কুঞ্জদা। ওকে কি জামাইবাবুর কথাটা বলব মা?

সবিতাশ্রী সামান্য সময় নিয়ে বললেন, দরকার কী? স্বামী—স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বাইরের লোকের না যাওয়াই ভালো।

সবিতাশ্রীর মতই এ বাড়িতে আদেশ। এত বড় হয়েছে বনশ্রী, এখনও মা'র মুখের কথার বিরুদ্ধে যেতে সাহস পায় না। তারা কোনও ভাইবোনই পায় না।

সবিতাশ্রীকে কিছু বলতে হল না, বড় উনুনের ওপর রান্নার কড়াইয়ের পাশে চায়ের কেটলি বসিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি যাও, কুসুমকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ক'জন?

দু'জন।

মুড়ি দিয়ো চায়ের সঙ্গে।

কিন্তু মুড়িটুড়ি ছুঁলও না কেউ। বনশ্রী দ্বিতীয়বার ঘরে আসার পর রাজু তার দিকে বারকয়েক তাকাল। তারপর প্রথম যে কথাটা বলল তা কিছু অদ্ভুত।

একটু আগে আমাদের খুব ফাঁড়া গেছে। তিনটে লোক বড় মাঠে কুঞ্জকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল। হাসিমুখে ঠান্ডা গলায় বলল রাজু।

বনশ্রী অবাক হয়ে বলে, সে কী!

কুঞ্জ মাঝখানে পড়ে বলে, আহাঃ, ও সব কিছু নয়। রাজু, তোর আক্কেলটা কী রে?

বনশ্রী একটু বিরক্ত হয়ে বলে, লুকোচ্ছেন কেন কুঞ্জদা? এ অঞ্চলের ব্যাপার যখন আমাদেরও জানা দরকার। তিনটে লোক কারা?

অন্ধকারে দেখেছি নাকি? হবে কেউ।—কুঞ্জদা উদাসী ভাব করে বলে।

কিন্তু বনশ্রীর ধারণা হয়, কুঞ্জ একেবারে না দেখেছে এমন নয়। হাতে টর্চ আছে, অন্তত এক ঝলক হলেও দেখা সম্ভব। তা ছাড়া কুঞ্জ না চেনে হেন লোক এখানে নেই। অন্ধকারেও ঠিক ঠাহর পাবে।

বনশ্রী বলে, মারতে পারেনি তা হলে?

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে, রাজু থাকায় বেঁচে গেছি। ওকে দেখে ওরা ভড়কে যায়। তিনজনকে আশা করেনি তো। ভেবেছিল রোজকার মতো আমি আর রবি ফিরব।

রবি কোথায়?—বনশ্রী জিজ্ঞেস করে।

রবির ওপরই প্রথম হামলা করে। সে টর্চ ফেলে দৌড়।

আপনার লাগে—টাগেনি তো!

না।

চা খেতে বৃষ্টির জোর কিছু মিয়োল। বনশ্রী দুটো লেডিজ ছাতা এনে দিয়ে বলল, আমার আর চিরুরটা দিয়ে দিচ্ছি। আর ভিজবেন না।

কুঞ্জ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কী কথা বললে না তো!

আজ থাক।

থাকল না হয়। রেবন্ত আর শ্যামার কথা বলবে না তো?

বনশ্রী চুপ করে থাকে। কী বুঝল কুঞ্জ কে জানে, তবে কথা বাড়াল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চ, রাজু।

দু'জনে চলে গেলে বনশ্রী ভাবতে বসে।

৪

অন্ধকার উঠোন ছপ ছপ করছে জলে। বৃষ্টির জোর কমে গিয়ে এখন ঝিরিঝিরি পড়ছে। এই গুঁড়ো বৃষ্টি সহজে থামে না। সেই সঙ্গে পাথুরে ঠান্ডা একটা হাওয়া বইছে থেকে থেকে, দমকা দিয়ে। শরীরের হাজারটা রন্ধ্রপথ দিয়ে হাড়পাঁজরে ঢুকে কাঁপ ধরাচ্ছে।

খাওয়া—দাওয়া সেরে রাজু আর কুঞ্জ ঘরে এসে বসেছে। এ ঘরটা বাইরের দিকে, ভিতরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এটায় কুঞ্জ থাকে। ভিতরবাড়িতে তাদের সংসারটা বেশ বড়সড়। রাজু সঠিক জানে না, কুঞ্জরা ক' ভাইবোন। আন্দাজ পাঁচ—ছ'জন হবে। নিজের বাড়ির সঙ্গে কুঞ্জর সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। খায়, ঘুমোয়, এই পর্যন্ত।

গামছায় ঘষে ঘষে পায়ের জল মুছল কুঞ্জ চৌকিতে বসে। বলল, রবির বাড়িতে একটু খোঁজ নিতে হবে।

রাজু বিরক্ত হয়ে বলে, রাত বাজে ন'টা। তার ওপর ওই ওয়েদার।

আরে দূর। এ আবার আমাদের রাত নাকি? তুই শুয়ে পড়। আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরোব। বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাব, তোকে উঠে দরজা খুলতে হবে না।

একটি অল্পবয়সি বউ একটু আগে এসে ঘুরঘুর করে গেছে এ ঘরে। বিছানাটা টানটান করল, আলনাটা খামোকা গোছাল। ঘোমটা ছিল একটু, তবু ঢলঢলে মুখখানা দেখতে পেয়েছিল রাজু। দু'খানা মস্ত চোখে কেমন একরকমের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি। রাজুর মনটা বার বার রাডার যন্ত্রে কী একটা অস্ফুট তরঙ্গ টের পেয়েছিল তখন। সেই বউটাই এখন পিরিচে পান সুপারি দিয়ে গেল ঘরে। আজকাল রাজু যেন অনেক কিছু টের পায়। অনেক অদ্ভুত গন্ধ, স্পর্শ, তরঙ্গ। যেগুলো স্বাভাবিক মানুষ পারে না।

কুঞ্জ অন্য দিকে চেয়ে ছিল। বউটা চলে যেতেই বলল, ও হল কেষ্টর বউ। বাগনানের এক মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে। বিয়েটা দিতে অনেক ঝামেলা গেছে।

কেষ্ট কে?

কুঞ্জ উদাস স্বরে বলে, আমার মেজো ভাই। দেখেছিস, মনে নেই হয়তো। অল্প বয়সেই নেশা—ফেশা করে খুব খলিফা বনে গিয়েছিল। তার ওপর এই মেয়েটার সঙ্গে ফস্টিনস্টি শুরু করে। উদ্যোগী হয়ে আমিই বিয়েটা দিই। কিন্তু বাড়িতে সেই থেকে মহা অশান্তি। বউটাকে দিনরাত কথা শোনাচ্ছে, উঠতে বসতে বাপান্ত করছে।

কেন?

এরকমই হয়। বিয়ের নামে ছেলে বেচে মোটা টাকা আসে যে! এই কেসটায় তো সেটা হয়নি। বললে বিশ্বাস করবি না, কেষ্ট পর্যন্ত সেই কারণে আমার ওপর চটা।

বলে কুঞ্জ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর খুব অন্যমনস্কভাবে বলে, এরপর আর বিয়ের ঘটকালিটা করবই না ভাবছি। কয়েকটা অভিজ্ঞতা তো হল। সত্যবাবুর বাড়িতে যে মেয়েটাকে দেখলি তার বড় বোন শ্যামার বিয়ে আমিই দিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানেও খুব গণ্ডগোল বেঁধে গেছে। আমার কপালটাই খারাপ।

রাজুর এ সব ভ্যাজর ভ্যাজর কথা ভালো লাগছিল না। সটান বিছানায় শুয়ে গায়ে মস্ত লেপটা টেনে নিয়ে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে চোখ বুজল। বুজতেই বনশ্রীর ঢলঢলে মুখখানা দেখতে পেল চোখের সামনে। কেমন স্নিগ্ধতায় ভরে গেল ভিতরটা। বড় সুন্দর মেয়ে। ও যদি আমার বউ হত।

অবশ্য এটা কোনও নতুন ভাবনা নয়। সুন্দর মেয়ে দেখলেই মনে হয়, ও যদি আমার বউ হত।

কাঠের চেয়ারে একটু কচমচ শব্দ হয়। কুঞ্জ উঠেছে, টের পায় রাজু। ওর হচ্ছে বুনো মোষের স্বভাব। যা গোঁ ধরবে তা করবেই। রবির খোঁজ কাল সকালেও নেওয়া যেত।

চোখ বুজেই রাজু বলে, কুঞ্জ, একটা কথা বলব?

বল।

যারা মাঠের মধ্যে রবিকে ধরেছিল তাদের কাউকে তুই চিনিস না?

কুঞ্জ একটু সময়ের ফাঁক দিয়ে বলে, কী করে চিনব? দেখতেই পেলাম না ভালো করে।

আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, তুই চেপে যাচ্ছিস।

না রে। তবে রবি কাউকে দেখে থাকতে পারে। ওর হাতে টর্চ ছিল। যদি দেখে থাকে তবে বিপদে পড়বে। লোকগুলো ভালো নয়।

রাজু শ্বাস ফেলে বলে, রবি দেখেছে, তুইও দেখেছিস। ভালো করে না দেখলেও আবছা দেখেছিস ঠিকই। কিন্তু পলিটিকস করে করে তোর মনটা এখন খুব প্যাঁচালো হয়ে গেছে। তাই চেপে যাচ্ছিস।

কুঞ্জ নরম স্বরে বলল, সিওর না হয়ে কোনও মত দেওয়া ঠিক নয় রে। তাই জোর দিয়ে কিছু বলতে পারব না।

তুই যে বেরোচ্ছিস, ওরা যদি ধারে কাছে ওত পেতে থেকে থাকে, তা হলে?

এই বৃষ্টি বাদলায় শেয়ালটাও বাইরে নেই, ওরা তো মানুষ।—বলে কুঞ্জ একটু হাসে।

রাজু আর কিছু বলল না। শুয়ে থেকে চোখ বুজেই টের পায় কুঞ্জ বেরোল, বাইরে শিকল টেনে তালা দিল। কেষ্টর বউয়ের চোখে ওরকম মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি কেন তা ভাবতে থাকে রাজু। বউটা কি কেষ্টকে ভালোবাসে না? অন্য কাউকে বাসে?

লেপের ওম পেয়েও ঘুমটা ঘনিয়ে এল না রাজুর। ভিতরটা বড় অস্থির। বুকের মধ্যে ধমাস ধমাস করে মিলিটারির বুটজুতোর মতো তার হৃৎপিণ্ড শব্দ করছে।

চারদিকে ঘনঘোর বৃষ্টির বেড়াজাল। অবিরল বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। মেঘ ডেকে উঠছে দূরে বাঘের মতো। হাওয়া দাপিয়ে পড়ছে গাছপালায় জানালায় দরজায়। কেমন একা করে দেয় তাকে এই দুর্যোগ। আর যখনই একা মনে হয় নিজেকে তখনই সে সেই কালো আকাশ আর নীলাভ উজ্জ্বল রথটির কথা ভাবে। মনে পড়ে মৃত্যু।

রাজু উঠে বসে। ভেজা জামাটা একটা পেরেকে ব্রাকেটে ঝুলছে। উঠে গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বের করে আনে। কিন্তু সিগারেট ধরাতে পারে না। দেশলাইটা জলে ভিজে মিইয়ে গেছে। এ ঘরে লণ্ঠনের ব্যবস্থা নেই। কাপড়কলের পাওয়ার হাউস থেকে বিজলি আসে বলে তেঁতুলতলায় প্রায় সকলের ঘরেই বিজলিবাতি। সন্ধেবেলা আলো টিমিয়ে জ্বলে, রাত হলে আলোর তেজ বাড়ে।

রাজু সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই হাতে করে বসে রইল চুপচাপ। আর বসে থেকে সিগারেট ধরানোর কথা ভুলে গেল। ভিতরবাড়ি থেকে একটা চেঁচামেচির শব্দ আসছে। উলটোপালটা হাওয়া আর বৃষ্টিতে প্রথমটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। তারপর চেঁচানিটা চৌদুনে উঠে গেল। সেই সঙ্গে মারের শব্দ। মেয়েগলার আর্ত চিৎকার। তারপর অনেক মেয়েপুরুষের গলায় চেঁচামেচি, ছেড়ে দে! আর মারিস না। ও নিতাই, ধর না বউটাকে। কেষ্ট, এই কেষ্ট, কী হচ্ছেটা কী? ইত্যাদি। রাজু একটু চমকে গেলেও খুব যেন অবাক হল না। তার মাথায় এখন একটা রাডার যন্ত্র কাজ করে। সে বুঝতে পারে, এরকমই হওয়ার কথা। সম্পর্কের মধ্যে মৃদু বিষ মিশেছে ওদের।

মারের এইসব শব্দ যেন রাজুর ভিতরে বোমার মতো ফেটে পড়ছিল। তার চার পাশের পৃথিবী আজকাল তাকে এইভাবেই আক্রমণ করে। মারধোর, চেঁচামেচি, গালমন্দ তাকে অসম্ভব অস্থির করে তোলে। এমনকী সে আজকাল দুর্ঘটনার খবর পর্যন্ত পড়তে পারে না, খুনখারাপির সংবাদ এড়িয়ে যায়, মৃত্যুর খবর সইতে পারে না। অথচ তার চারপাশে অবিরল এইসবই ঘটছে।

রাজু উঠে সন্তর্পণে ভিতরবাড়ির দিকের দরজাটা খুলে অল্প ফাঁক করে। হাওয়ার চাপে দরজাটা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। পাল্লা ঠেসে ধরে রাখতে বেশ জোর খাটাতে হয় তাকে। পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখে, উঠোনের ডান পাশে কিছু তফাতে এক ঘরের বারান্দায় কিছু চাকর—বাকর শ্রেণির লোক লণ্ঠন ঘিরে উবু হয়ে বসে খাচ্ছে। সেই ঘরের বারান্দায় কিছু মেয়েপুরুষ দাঁড়িয়ে দরজা ধাকাচ্ছে। একজন মোটা লোক চেঁচিয়ে বলে, মেরে ফেলবি নাকি রে হারামজাদা? ফাঁসিতে ঝুলবি যে! গলাটা ছেড়ে দে বলছি এখনও।

হাওয়া ভেদ করেও বন্ধ ঘর থেকে একটি মেয়ের অবরুদ্ধ কোঁকানি আসছিল। হাঁফ ধরা, দম বন্ধ আর সাঙ্ঘাতিক শ্বাসকষ্ট থেকে মাঝে মাঝে ছাড়া পেয়ে গলার স্বরটা গোঙায়। একজন পুরুষের গলা প্রচণ্ড চাপা আক্রোশে বলছে, বল ঢ্যামনা! বাঁচতে চাস তো স্বীকার কর।

বারান্দার লোকগুলো উবু হয়ে বসে নির্বিকারে খেতেই থাকে। তাদের মাঝখানে লণ্ঠনটার আলো দাপিয়ে উঠে নিভে যেতে চায়। একজন একটা র‍্যাপার দিয়ে লণ্ঠনকে হাওয়া থেকে আড়াল করল। মস্ত একটা ছায়া পড়ল উঠোনে। হয়তো বারান্দার বিজলি আলো ফিউজ হয়ে গেছে, কিংবা হয়তো চাকর—বাকর খাচ্ছে বলে বিজলি আলো জ্বালানো হয়নি। কে জানে রহস্য?

আঁচলে মাথা ঢেকে একটা মেয়ে উঠোন থেকে এ বারান্দায় উঠে এসেছে। ও বারান্দার লণ্ঠনের আলো আড়াল করে সে সামনে এসে দাঁড়াতেই রাজু চমকে ওঠে এবং মেয়েটার মুখোমুখি পড়ে যায়।

মেয়েটা দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে চাপা তীব্র স্বরে ডাকে, বড়দা!

রাজু দরজা ছেড়ে দিতেই পাল্লা দুটো ছিটকে খোলে। মেয়েটা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রাজুকে দেখেই একটু আড়ালে সরে বলে, বড়দা নেই?

একটু বেরিয়েছে।

রাজু মেয়েটাকে চেনে। কুঞ্জর তিনটে আইবুড়ো বোনের একটি। কখনও কথা—টথা বলেনি আগে।

মেয়েটা বিপন্ন গলায় বলে, কোথায় গেছে বলে যায়নি?

রবির বাড়ি। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে রাজু বলেই ফেলল—ও ঘরে কী হচ্ছে বলো তো?

মেয়েটির বয়স বেশি নয়, বছর পনেরো—ষোলো হবে। দেখতে কালো, রোগা, দাঁত উঁচু। আড়াল থেকেই জবাব দেয়, মেজদা খেপে গেছে।

কেন?

মেয়েটা জবাব দেয় না। রাজু বিরক্ত হয়ে একটু ধমকের স্বরে বলে, তুমি ভিতরে এসো তো! ব্যাপারটা খুলে বলো।

মেয়েটা বোধ হয় ঘাবড়ে গিয়েই ঘরে এসে দাঁড়ায়। গায়ে আধভেজা শাড়ি আর খদ্দরের নকশা—চাদর। শীতে জড়সড়। মাথা সামান্য নিচু করে ভয়ের গলায় বলে, দোষটা বউদিরই। বাপের বাড়িতে খবর দিয়েছিল নিয়ে যাওয়ার জন্য। আজ বিকেলে ভাই এসেছিল নিয়ে যেতে। এ বাড়ির কাউকে আগে জানায়নি পর্যন্ত। খবর পেয়ে মেজদা রেগে গেছে।

রাজু ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে রাগে গরম হচ্ছিল। কঠিন গলায় বলে, কেষ্ট কি মদ খেয়ে এসেছে?

সে তো রোজ খেয়ে আসে।

বউটাকে তো খুনও করে ফেলতে পারে। তোমরা কী করছ?

সেই জন্যই তো বড়দাকে খুঁজছি। কেউ ঘরে ঢুকতে পারছে না যে!

রোজ মারে?

মেয়েটা একটু থতমতভাবে চেয়ে মাথাটা এক ধারে নেড়ে বলে, মারে, তবে রোজ নয়। আজ বড্ড খেপে গেছে। কী যে করছে, মাথার ঠিক নেই।

মাথার ঠিক নেই।

মাথার ঠিক নেই রাজুরও। মাথার মধ্যে একটা আগুনের গোলা ঘুরছে। কথার ওজন না রেখে সে গাঁক করে উঠে বলে, কেষ্টকে গিয়ে বলো, এক্ষুনি যদি বাঁদরামি বন্ধ না করে তবে আমি ওর প্রত্যেকটা দাঁত ভেঙে দেব। তারপর পুলিশে চালান করব। যাও বলো গিয়ে। বোলো, আমার নাম রাজীব ব্যানার্জি।

মেয়েটা কোনও জবাব দিল না। কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ সব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু রাজুর ভিতর থেকে একটা পুরনো রাজু ফুঁসছে, আঁচড়ে কামড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভিতরের সেই ছটফটানিতে সে বসে বসে কাঁপে। তারপর শান্ত অবসাদ নিয়ে বসে থাকে। ও ঘরের সামনের বারান্দায় কেউ নেই এখন। অন্ধকার দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর একটু চিকন রেখা দেখা যাচ্ছে মাত্র।

ঠান্ডায় কান কনকন করছিল রাজুর। ভেজা বাতাসে ঘরটা স্যাঁতস্যাঁত করছে। ঘরের বিজলি আলো এখন টিমটিম করে জ্বলছে। খোলা দরজার সামনে বসে সে কেষ্টর ঘরের দিকে ভয়ংকর চোখে চেয়ে ছিল।

হুড়কো খোলার শব্দ হল। তারপর ও ঘরের দরজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে এল। কেষ্টই হবে। বারান্দা থেকেই খুব মেজাজি গলায় ডাকল, টুসি! এই টুসি!

কোত্থেকে 'যাই মেজদা' সাড়া দিল টুসি। কেষ্ট ফের ঘরে ঢুকে পড়ে। একটু বাদে রাজু দেখে সেই কালো রোগা কিশোরী মেয়েটা দৌড় পায়ে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

একটু বাদে দরজাটা খুলে টুসি কেষ্টর বউকে ধরে বারান্দায় আনে। বউটা টুসির কাঁধে মাথা রেখে এলিয়ে রয়েছে। বারান্দার ধারে টুসি তাকে উবু করে বসায়। একটা ঘটি থেকে জল দেয় চোখে মুখে। ঘরের ভিতরে আলোয় সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছে দেখতে পায় রাজু।

হঠাৎ তার দমকা রাগটা আবার ঘূর্ণিঝড়ের মতো উঠে আসে ভিতর তোলপাড় করে। পুরনো রাজু তার পাঁজরায় ধাক্কা মেরে বলে, ওঠো। ওই শুয়োরের বাচ্চার দাঁত ক'টা ভেঙে দাও।

এই রকমই রাগ ছিল রাজুর। গোখরোর মতো ছোবল তুলত সে। রাজু কত লোককে যে মেরেছে তার হিসেব নেই। মার খেয়েছেও বিস্তর। কিন্তু যেখানে প্রতিবাদ করা উচিত সেখানে কোনওদিন সে চুপ করে থাকেনি। একশো জন বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও নয়।

কিন্তু আজকাল এ কেমন ধারা হয়ে গেছে রাজু? একটা স্বপ্ন কি মানুষকে শেষ করে দিতে পারে এত নিঃশেষে? বসে বসেই নিজের রাগের হলকায় পুড়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু কিছুতেই উঠোনের দূরত্বটুকু পেরিয়ে গিয়ে ওই হারামজাদার চুলের মুঠি ধরে বের করে আনতে পারছে না। একদিকে ভিতরে যেমন রাগ ফোঁস ফোঁস করছে, অন্যদিকে তেমনি বুকের মধ্যে এক ভয়ের পাতাল কুয়ো।

বউটি মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তেমনি টুসির ওপর ভর রেখে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

রাজু উঠে এসে বিছানায় আধশোয়া হয়ে গলা পর্যন্ত লেপ টেনে নেয়। চোখ বুজে ঠান্ডার ছোবল খেতে থাকে চুপ করে।

হঠাৎ চোখ চেয়েই রাজু কুঞ্জর বোনকে দেখতে পায়। একটা পেতলের জলের জগ আর গেলাস রাখছে টেবিলের ওপর। রাজুকে তাকাতে দেখে কুণ্ঠিত স্বরে বলল, আর কিছু লাগবে আপনার?

রাজু উঠে বসে বলে, একটা দেশলাই দিতে পারো?

দিচ্ছি।—বলে মেয়েটা চলে যায়। রাজু টের পায়, মেয়েটা এ ঘরের বারান্দার কোনা থেকে কেষ্টর ঘরের বারান্দার কোনায় লাফিয়ে চলে গেল। দরজায় শেকল নেড়ে কেষ্টর কাছে দেশলাই চাইল।

একটু বাদে দেশলাই হাতে এসে বলে, এই যে।

মেয়েটার সামনে রাজুর লজ্জা করছে। হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা নিয়ে বলে, আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম তখন। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলাটা কে সহ্য করতে পারে বলো!

টুসি রাজুর দিকে অকপটে চেয়ে থাকে। চোখের দৃষ্টি খুব স্বাভাবিক নয়। কেমন যেন গভীর আতঙ্কের ছাপ আছে। একটু চেয়ে থেকে বলল, বউদির কিন্তু খুব লেগেছে। কেমন এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে বার বার। কথা বলতে পারছে না। চোখ উলটে আছে। দাঁত লেগে যাচ্ছে। আর...

বলে টুসি দ্বিধা করে একটু।

রাজুর শরীরে লোম দাঁড়িয়ে যেতে থাকে। ভয়ে, রাগে। বলে, আর কী?

খুব স্রাব হচ্ছে। পোয়াতি ছিল। কী জানি কী হবে।

ডাক্তার নেই আশেপাশে?

মেয়েটা ভয়—খাওয়া গলায় বলে, রাধু যাচ্ছিল ডাকতে। মেজদা তাকে বলেছে ডাক্তার ডাকলে খুন করে ফেলবে। বড়দা কোথায় যে গেল। বড়দা ছাড়া এখন কেউ কিছু করতে পারবে না।

এই বলতে বলতে টুসি চোখের জল ফস করে আঁচলে চেপে ধরে।

আজকাল একটা অক্ষম মন নিয়ে চলে রাজু। বর্ষার জলকাদায় খাপুর খুপুর করে যেমন কষ্টে চলতে হয়, রাজুর বেঁচে থাকা এবং কাজ কর্তব্য করাটাও তেমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব কাজেই তার ভয়, সব সিদ্ধান্তেই তার নানারকম দ্বিধা।

তবু কষ্টে সে নিজের মনটাকে ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়ে। বলে, একটা ছাতা দাও, আর রাধুকে ডেকে দাও।

ধরা গলায় টুসি বলে, আপনি যাবেন?

যেতেই হবে। নইলে বউটা মরে যাবে যে!

টুসি একটু ভরসা পেয়ে বলে, ঝড়—বাদলায় আপনার যেয়ে দরকার নেই। রাধু ডেকে আনতে পারবে। আপনি শুধু মেজদাকে একটু সামলাবেন। আপনি বড়দার বন্ধু তো, তার ওপর কলকাতার লোক। আপনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কিছু বলতে সাহস পাবে না।

রেগে গেলে রাজু সেই পুরনো রাজু। ভয়ডর থাকে না, দ্বিধা থাকে না।

রাজু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, রাধুকে দৌড়ে যেতে বলো। আমি কেষ্টর ঘরে যাচ্ছি। দড়িতে কুঞ্জর একটা খদ্দরের চাদর ঝুলছিল। সেটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে উঠোন পেরিয়ে গিয়ে কেষ্টর দরজায় ধাক্কা মেরে বলল, এই কেষ্ট। দরজাটা খোলো তো।

কেষ্ট দরজা খুলে বেকুবের মতো চেয়ে থাকে। বেশ আঁটসাট গড়নের লম্বাটে চেহারা। ভুরভুর করে কাঁচা দেশি মদের গন্ধ ছাড়ছে। গায়ে এই শীতেও কেবল একটা হাতওলা গেঞ্জি।

রাজু ধমক দিয়ে বলে, কী হয়েছে?

অবাক কেষ্ট গলা ঝেড়ে বলে, সাবির শরীরটা খারাপ হয়েছে। রক্ত যাচ্ছে।

ওকে এক্ষুনি একটা চড় কষাতে ইচ্ছে করে রাজুর। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে, কেষ্ট তাকে দেখে ভয় পেয়েছে। এ ব্যাপারটা বেশ ভালো লাগে রাজুর। তাকে যে কেউ ভয় পাচ্ছে এটা ভেবে তার আত্মবিশ্বাস এসে যায়। গম্ভীর গলায় সে বলে, তার জন্য কী ব্যবস্থা করেছ এতক্ষণ। কাউকে ডাকোনি কেন?

কেষ্ট সামনের বড় বড় শুকনো দাঁতগুলোয় জিভ বুলিয়ে বলে, কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি একবার ভিতরে এসে দেখুন না, খুব সিরিয়াস কেস কিনা!

ভিতর থেকে গভীর যন্ত্রণার একটা গোঙানির শব্দ হয় এ সময়ে। রাজুর শরীর কেঁপে ওঠে। একটু আগে বউটা পান দিয়ে এল ঘরে। আর এখন মরতে চলেছে বুঝি! সে এ সব যন্ত্রণার দৃশ্য সহ্য করতে পারে না আজকাল। রক্তের রং দেখলে তার হাত পা মাথা অবশ হয়ে যায়। সে মাথা নেড়ে বলে, না, না! তুমি বরং লোকজন ডেকে আনো।

কেষ্টর রগচটাভাব মরে গিয়ে এখন সত্যিকারের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। মদের নেশা কেটে গেছে একেবারে। বলল, যাচ্ছি। আপনি একটু দাঁড়ান এখানে, টুসি এক্ষুনি আসবে।

এই বলে কেষ্ট উঠোনে নেমে অন্ধকারে কোথায় তাড়াতাড়ি নিমেষে মিলিয়ে যায়। ওর ভাবসাব রাজুর ভালো লাগল না। তার মনে হল, কেষ্ট এই যে গেল, আর সহজে ফিরবে না। কেষ্টর যাওয়ার ভঙ্গি দেখেই রাজুর ভিতরের রাডার যন্ত্রে ব্যাপারটা ধরতে পারে রাজু। কেষ্ট বোধ হয় ধরেই নিয়েছে যে সাবি বাঁচবে না। থানাপুলিশ হবে। তাই পিটটান দিল।

৫

হাউর বাতাসে ছাতার শিক ছটকে উলটে গেছে, হাঁটুভর কাদা আর ঝড়—বাদলা ঠেলে শেয়ালের মতো ভিজতে ভিজতে রবির বাড়ি পৌঁছয় কুঞ্জ। ভেজা শরীরে বাতাস লেগে শীতে মুরগির ছানার মতো কাঁপছে।

ডাকাডাকিতে খোড়ো চলের মেটে ঘর থেকে জানলার ঝাঁপ ঠেলে সতর্ক চোখে কুঞ্জকে আগে দেখে নেয় রবি। দরজা খুলতেই কুঞ্জ দেখল রবির হাতে একটা মস্ত দা। কুঞ্জ জামাকাপড়ের জল যথাসাধ্য নিংড়ে ঘরে ঢুকতেই রবি দড়াম করে দোর দিয়ে বাঠাম লাগাল। শুকনো মুখে আর চোখের চাউনিতে কুঞ্জকে ভালো করে আর একবার দেখে নিয়ে দা'টা কুলুঙ্গিতে খাড়া করে রেখে এসে বলল, ভাবলাম বুঝি তোমার পেটি আর গাদা আলাদা করেছে শালারা।

শীতে সিঁটিয়ে গেছে কুঞ্জ। দাঁতে দাঁতে ঠকাঠক শব্দ। চাদর নিংড়ে মাথা গা মুছতে মুছতে বলে, চিনতে পেরেছিস?

রবি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, টের পেলে খুন করবে। তুমি বলেই বলছি। শালা লাফ দিয়ে সামনে পড়ে আমার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ফেলল, হাতে অ্যাই বড় গজ। মুখটা কম্ফর্টারে ঢাকা। খুব একটা ঘড়ঘড়ে শ্বাসের শব্দ হচ্ছিল। আমি তো সব সময়ে তোমার পেছু পেছু যাই, তাই মনে হয় আমাকে তুমি ভেবে ভুল করেছিলে। গজ যেই তুলেছে, অমনি পিছন থেকে আর এক শালা বলল, ওটা কুঞ্জ নয়, রবি। দুটো গাঁট্টা দিয়ে ছেড়ে দে, খুব পালাবে। তখন ছাড়ল। পেটে দুটো হাঁটুর গুতো দিয়ে বলল, রা করলে খুন হয়ে যাবি। ছাড়া পেয়ে পোঁ পোঁ দৌড়ে পালিয়ে এসেছি। পালাতে পালাতেই ঠিক পেলুম, এ হল পটল। পিছনের দু'জন কে ঠাহর পাইনি। একজন লম্বা।

কুঞ্জর গা থেকে জল গড়িয়ে ঘরে থকথকে কাদা হয়ে গেল। একদিকে বাঁশের মাচানে চ্যাটাই আর গুচ্ছের ময়লা কাঁথার বিছানা। অন্য ধারে একটা মস্ত ছাগল চটের জামা পরে একরাশ নাদির মধ্যে বসে এই রাতেও কী চিবোচ্ছে। ঘরময় ভরভরে ছাগলের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। কুঞ্জ রবির দিকে স্থির চোখে চেয়ে সবটা শুনে মৃদু স্বরে বলল, যা দেখেছিস দেখেছিস। ক্লাবে কিছু জানাসনি তো!

যখন দৌড়ুচ্ছি তখন ক্লাবের সামনে একজন জিজ্ঞেস করছিল কী হয়েছে, কেন দৌড়ুচ্ছি। কিন্তু তখন এত হাঁফ ধরেছে যে মুখে কথা এলই না। তোমাকে কী করল?

কী করবে! কিছু করেনি।

তুমি মরে ভূত হয়ে আসনি তো কুঞ্জদা। ইস, ভিজে ঢোল হয়েছ। আমার ক্যাঁথা কম্বল গায়ে দিয়ে বোসো। ছাতাটা দাও, সুতো দিয়ে শিকগুলো বেঁধে দিই।

রবির ঘরে ছাগলের গন্ধের মধ্যে ময়লা কাঁথা আর তুলোর কম্বল গায়ে চাপিয়ে অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকে কুঞ্জ। বস্তা থেকে সুতলি খুলে রবি খুব যত্নে ছাতার ডাঁটির সঙ্গে শিকের ডগাগুলো বেঁধে দিচ্ছিল, যাতে বাতাসে ফের উলটে না যায়। বলল, ক্লাবে খবর দেবে না? তোমার গায়ে ফের হাত পড়েছে শুনলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে, রক্তগঙ্গা বইবে।

কুঞ্জ জবাব দিল না। চোখ বুজে সে একটা লম্বা লোকের কথা ভাবছিল। রবির টর্চটা কেতরে পড়েছিল মাঠে। আলোটা টেরছা হয়ে ওপর দিকে উঠেছে। সেই আলোতে ক্ষণেকের জন্য একটা ফরসা মুখ ঝলসে উঠেছিল। রেবন্ত।

কুঞ্জ ছাতাটা নিয়ে উঠে পড়ে বলল, কাউকে কিছু বলিস না। বিপদে পড়ে যাবি। যা করার আমিই করব।
রবি অবাক হয়ে বলল, তুমি একা কী করবে? ও হল খুনে পটলা। ভালো চাও তো ক্লাবে খবর দাও।
সুস্থির চোখে রবির দিকে চেয়ে কুঞ্জ বলে, কাউকে না। কাকপক্ষীতেও জানবে না বুঝেছিস?
রবি তবু মাথা নেড়ে বলে, পাবলিসিটি হবে না বলছ? তুমিই তো বলো, এরকম সব হামলা—টামলা হলে লোকের পপুলারিটি বাড়ে, ভোট পাওয়া যায়। এমন একখানা জলজ্যান্ত কাণ্ড চেপে যাবে?
কুঞ্জর এত দুঃখেও হাসি হাসে। রবি যে রবি, সেও আজকাল পলিটিক্সের শেয়াল হয়ে উঠল। কথাটা মিথ্যেও নয়। যেবার বুকে সড়কি খেল সেবার হু—হু করে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। তখন ভোট হলে কুঞ্জ জিতে যেত। কিন্তু কুঞ্জ জানে, এটা ভোটের মামলা নয়। সে যদি মরে তা হলে এখন হয়তো এ চত্বরে অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। রবির দিকে চেয়ে সে ঠান্ডা গলায় বলে, অনেক ব্যাপার আছে রে। তুই সব বুঝবি না।
দরজা খুলে দিয়ে রবি বলল, সাবধানে যেয়ো। তারপর একটু লজ্জার স্বরে বলে, বুঝলে কুঞ্জদা, সবসময়ে মনে হয় আমি তোমার জন্য জান দিতে পারি, কিন্তু আজ বিপদে পড়ে প্রাণটা কেন যেন পালাই—পালাই করে উঠেছিল। তুমি হয়তো ভাবছ, রবিটা নেমকহারাম। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি...
আবার জলঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঞ্জর ওপর। তোল্লাই বাতাস এসে হ্যাঁচকা টান মারে খোলা ছাতায়। খুব ভালো করে শিক বেঁধে দিয়েছে রবি। সহজে ওলটাবে না। বাতাসের মুখে ছররার মতো ছিটকে আসছে জলের ফোঁটা। কুঞ্জ প্রাণপণে ছাতার আড়াল রাখতে চেষ্টা করে। কাদায় পা রাখা দায়, একবার পা ফেললে দু'—তিন কিলো কাদা পায়ে আটকে উঠে আসে। ভুসভাস নরম মাটিতে গেঁথে যাচ্ছে পা। বাতাস টালাচ্ছে। শীতের কম্প উঠে পেট বুক কাঁপিয়ে তুলছে। কুঞ্জ কোনওক্রমে শুধু এগিয়ে যাওয়াটা বজায় রাখতে থাকে। আর মনের মধ্যে বার বার বীজমন্ত্রের মতো পপুলারিটি শব্দটা এসে হানা দেয়।
এর আগেও কুঞ্জর ওপর বহু হামলা হয়ে গেছে। দু'বার মরতে মরতে বেঁচেছে। কিন্তু তাতে দমে যায়নি কুঞ্জ। তখন শত্রুপক্ষ তাকে মর্যাদা দিত, প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবত, যত জখম হয়েছে তত লোকের কাছে সে হয়ে উঠেছে গুরুতর মানুষ। লোকে তো আর যাকে তাকে খুন করতে চায় না। কুঞ্জ খুব বিচক্ষণের মতোই সেইসব হামলার ঘটনাকে ভাঙিয়ে নিয়েছিল রাজনীতির খুচরো লোভে। কিন্তু সে জানে, আজকের মামলা তা নয়। ধারে কাছে কোনও নির্বাচন নেই, কোনও তেমন রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেনি। আজ তার কপালে ছিল উটকো মৃত্যু। এই মৃত্যু তাকে মহৎ করত না। লোকের গোপন বেনামী জমি ধরে দেওয়ার বিপজ্জনক কাজে নেমেই সে টের পেয়েছিল, এ হল জাতসাপের লেজ দিয়ে কান চুলকোনো। কিংবা যখন হাবুর ঝোপড়ায় মদো মাতাল বদমাশদের আড্ডা ভাঙতে গিয়েছিল তখনই সে কি জেনেশুনে বিষ করেনি পান? কাজেই মরার ব্যাপারে তার তেমন চিন্তা নেই। কিন্তু বার বার আজ পপুলারিটি কথাটা তার বুকে হাতুড়ি মারে। কেন যেন মনে হচ্ছে, তার পপুলারিটির শক্ত ডাঙা জমি বড় ক্ষয় হয়ে গেছে। টর্চের আলোয় রেবন্তর মুখ দেখে চমকে যায়। কিন্তু রেবন্ত তাকে খুন করতে চায় বলে সে তত চমকায়নি। তাকে খুন করতে চাইতেও পারে রেবন্ত। তার কারণ আছে। কিন্তু খুন করলেও রেবন্ত তাকে ঘেন্না করবে না, কুঞ্জর এমন একটা ধারণা ছিল, তাই রেবন্তকে দেখে সে যত না চমকেছে তার চেয়ে ঢের বেশি অবাক হয়েছে রেবন্তর মুখে একটা খাঁটি নির্ভেজাল তীব্র ঘেন্নার ভাব দেখে।
পিচ রাস্তা পেয়ে কুঞ্জ একটু হাঁফ ছাড়ল। তেঁতুলতলা যুব সঙ্ঘের পাকা বারান্দায় উঠে ছাতাটা মুড়ে নিয়ে সে দরজায় ধাক্কা দেয়। এত রাতেও কয়েকজন বসে তাস খেলছে। কুঞ্জকে দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকে সবাই।
গোটা তেঁতুলতলাই কুঞ্জর মামাবাড়ি। জ্ঞাতিগুষ্টি মিলে তারা সংখ্যায় বড় কম নয়। তাস খেলুড়েদের মধ্যেও কুঞ্জর এক মামা, দুই মাসতুতো ভাই রয়েছে।
সতুমামা বলল, এই দুর্যোগে ব্যাপার কী রে? কোনও হাঙ্গামা নাকি?

কুঞ্জ মাথা নাড়ল।
তা হলে?
তা হলে কী তা কুঞ্জও তো জানে না। সে শুধু আজ সন্দেহভরে জানতে চায় তার বিশ্বস্ত ঘাঁটিগুলো এখনও তার দখলে আছে কি না! বোঝা বড় শক্ত। এই ক্লাবখানা তার নিজের হাতে গড়া। রাজ্যের ছেলে—ছোকরা জুটিয়ে জবরদস্ত ক্লাবখানা জমিয়ে দিয়েছিল কুঞ্জ। পিছনের ঘরে লাঠি, সড়কি, দু'—একখানা খাঁটি তরোয়াল এখনও মজুত। কুঞ্জর বিপদ শুনলে এখনও হয়তো গোটা ক্লাব ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। গতবার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে কুঞ্জ তার এক মাসতুতো দাদার কাছে হারতে হারতে কোনওক্রমে দশ ভোটে জিতেছিল। এই কথাটা এখন বড় খোঁচাচ্ছে তাকে। পায়ের নীচে মাটি এখনও আছে বটে, কিন্তু চোখের আড়ালে পাতালের অন্ধ গহ্বর নিঃশব্দে মাটি খসিয়ে নিচ্ছে না তো? কুঞ্জর বিপদ শুনলে এক দল রুখে দাঁড়াবে ঠিক, কুঞ্জ নির্বাচনে দাঁড়ালে এক দঙ্গল তার হয়ে খাটবে ঠিক, তবু আর একটা দল নিস্পৃহ থেকেই যাবে।
মাসতুতো ভাইদের মধ্যে একজন নলিনী। সে বলল, খুব ভিজেছ কুঞ্জদা, তোমার না বুকের অসুখ। বইয়ের আলমারির ওপর আমার বর্ষাতিটা মেলে দেওয়া আছে, নিয়ে যাও।
কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে, না রে, কিছু হবে না।
নলিনী আর কিছু বলে না। তাস বাটা হতে থাকে। বহুকাল বাদে কুঞ্জর যেন একটু অভিমান হয়। বর্ষাতিটা নিলুম না, তা আর একটু সাধতে পারলি না নলিনী?
কুঞ্জ বেরিয়ে আসে। তার আর একটা ঘাঁটি ছিল ফুটুনিমামার দোকান। জেলেপাড়ার ষাট—সত্তর ঘর রায়ত ফুটুনিমামার ভারী বশংবদ। একসময়ে পড়াশোনা ছেড়ে রাজনীতিতে নামার দরুন কুঞ্জকে তার বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিল। তখন ফুটুনিমামা কুঞ্জকে আশ্রয় দেয়। বাড়ি গিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বলে এসেছিল, আপনি না রাখেন ত্যাজ্যপুত্র করুন, কুঞ্জকে আমি পুষ্যি নেব। নির্বাচনে ফুটুনিমামা তার রায়তদের কুঞ্জর পক্ষে কাজে নামিয়ে দিয়েছিল।
মোড়ের মাথায় ফুটুনিমামার দোকানে ঝাঁপ ঠেলে বহুদিন বাদে কুঞ্জ হানা দিল। মামা উরুর ওপর লম্বা খাতা রেখে হিসেব করছে। খোল, ভুসি, হাঁসমুরগির খাবার আর মশলাপাতির ঝাঁঝালো গন্ধটা বহুকাল ভুলে গিয়েছিল কুঞ্জ। আজকাল আসা হয় না। গন্ধটা পেয়ে একটা হারানো বয়স কুঞ্জর কাছে ফিরে এল বুঝি।
মামা মুখ তুলে দেখে বলল, কী খবর রে? বলেই ফের হিসেবে ডুব দেয়।
কুঞ্জ ঠান্ডা হচ্ছে। খুব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। পাথর হয়ে যাচ্ছে। মামা আবার মুখ তুলে বলে, দুর্যোগে বেরিয়েছিস, ঠান্ডা লাগাবি যে! তারপর খবর—টবর কী?
কুঞ্জ বলে, ভালো।
ভালো বলছিস?—ফুটুনিমামা তাকিয়ে একটু হাসে। কিন্তু তাকানোর মধ্যে দৃষ্টি নেই, হাসির মধ্যে অনেক ভেজাল। একসময়ে খুব বাবুগিরি করত বলে নামই হয়ে গিয়েছিল ফুটুনি। এখন বাবুগিরি নেই। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে, কাছা খুলে রোজগার করছে মামা। কোথায় যায় মানুষের দিন?
ফুটুনিমামা ভ্রূ কুঁচকে বোধ হয় একটা উড়ন্ত মশার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তা হলে খবর—টবর সব ভালো?
ঝুরঝুরে মাটির ওপর দিয়ে কুঞ্জ হাঁটছে। যে—কোনও একটা পদক্ষেপেই সে দেখতে পাবে সামনেই ধস। তবু কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা হিসেব—নিকেশ থাকা ভালো।
পপুলারিটি শব্দটা রবারের বলের মতো মাথার মধ্যে ধাপাচ্ছে কে!
অন্য দিন সময় হয় না কুঞ্জর। এই দুর্যোগে আজ হঠাৎ সময় হল। বহুদিন বাদে ঝড়বাদল ঠেলে সে মেজদাদুর বাড়ির বারান্দায় উঠে এল। মেজদাদু হলেন এখন ভঞ্জদের সবচেয়ে বড় শরিক। কয়েক কোটি টাকা বোধ হয় তাঁর রোলিং ক্যাপিটাল। দেখে কিচ্ছু বোঝা যায় না। সাদাসিধে, গেঁয়ো।

আশির কাছাকাছি বয়স। মস্ত ঘরে কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। গায়ে তুষের চাদর, পায়ে মোজা, মাথায় বাঁদুরে টুপি। একদৃষ্টে চেয়ে দেখলেন। বললেন, এত রাতে এলে? খুব দরকার নাকি? কারও কিছু হয়নি তো?

না।

মেজদাদু শ্বাস ছেড়ে বললেন, সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি। আমি মরলে তোমাদের অশৌচও হয় না জানি। মাতুল বংশ, তায় জ্ঞাতি। কিন্তু আমার ভাবনা তেমনধারা নয়। আমি ভাবি, তেঁতুলতলায় সব আমার মানুষ। কখন কে মরে, কে পড়ে। ভারী দুশ্চিন্তা।

অনেকদিন দেখা করিনি, তাই এলাম।

কথাটা যেন বিশ্বাস হল না মেজদাদুর। সন্দেহের চোখে কুঞ্জর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কারও কোনও বিপদ হয়নি, ঠিক বলছ? ভয়ের কিছু নেই তো!

না, মেজদাদু।

তুমি ভালো আছ তো? বাড়ির সবাই? তোমার মাকে বহুকাল দেখি না। আজকাল সবাইকে দেখতে ইচ্ছে করে।

বলব।

মেজদাদু খানিক চুপ থেকে বলেন, বুদ্ধি পরামর্শ নিতে আমার কাছে কোনওদিন এলে না কুঞ্জ। এলে কি আমি তোমাকে কুপরামর্শ দিতুম। আমি তোমার কতখানি ভালো চেয়েছিলাম তা জানলে না।

কুঞ্জ খুব নিবিড় চোখে মেজদাদুকে দেখছিল। আগে দেখা হলে মেজদাদুর মুখে যে একটা খুশির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ত তা আজ আর কই? সে বুঝতে পারে, সুর কেটে যাচ্ছে। কোথায় লয়ে—তালে গোলমাল।

কুঞ্জকে জেতানোর জন্য সেবার মেজদাদু নিজের নমিনেশন উইথড্র করে নিয়ে বলেছিলেন, লোকে কুঞ্জকেই চায়। আমাদের খামোখা দাঁড়ানো। কথাটা বলেছিলেন হাসিমুখে, আত্মগৌরবের সঙ্গে। সেবার সড়কি খেয়ে কুঞ্জর জখমটা দাঁড়িয়ে ছিল মারাত্মক। ডাক্তার কলকাতায় পাঠাতে চেয়েছিল। মেজদাদু রুখে দাঁড়িয়ে বললেন, কলকাতার হাসপাতাল! কেন, কুঞ্জ কি ভাগাড়ের মড়া? কলকাতার হাসপাতালে আজকাল মানুষের চিকিৎসা হয় নাকি? ভঞ্জদের লোকবল, অর্থবল সবটুকু ঢেলে দিয়ে মেজদাদু কুঞ্জকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন। আর তার জন্যই তেঁতুলতলার ছোট হাসপাতালে হাজারও যন্ত্রপাতি আমদানি হল, ভালো একজন ডাক্তার এল চাকরি পেয়ে, এল এক্স—রে ইউনিট। কুঞ্জ যে খুব একটা কৃতজ্ঞ বোধ করেছে, তা নয়। সে তখন ভাবত, তাকে বাঁচানোর জন্য লোকে তো এ সব করবেই। সে যে নেতা।

আজ মেজদাদুর সামনে তাই একটু লজ্জা বোধ করে কুঞ্জ। মেজদাদুর জন্য তার যা করা উচিত ছিল তা তো করা হয়নি। অকৃতজ্ঞতার পাপ তাকে কিছুটা ছুঁয়ে আছে আজও।

কুঞ্জ মাথা নিচু করে বলে, আপনি আর আগের মতো ডাক খোঁজ করেন না তো দাদু। কোনও অপরাধ করিনি তো?

ভঞ্জবাবু ভারী অবাক হয়ে শশব্যস্তে বললেন, এসব কী বলছ? অপরাধ আবার কী? বুড়ো বয়সে বাইরের ব্যাপারে বেশি যাই না। তুমিও ব্যস্ত মানুষ। তবে খোঁজখবর সবই পাই। তোমার হচ্ছে পাবলিক লাইফ, আমরা তো নিজের ধান্দা নিয়ে পড়ে আছি।

এই বলে মেজদাদু খানিক কী যেন ভেবে আস্তে করে বলেন, তবে তোমার চেহারায় আগে যেমন একটা তেজ দেখতুম এখন আর সেটা দেখি না।

আমি কি কোনও ভুল করছি? কোনও অন্যায় পথে চলছি?—কুঞ্জর গলায় চাপা ব্যাকুলতা ফোটে। টর্চের আলোয় দেখা রেবন্তর মুখটায় বড় ঘেন্না ফুটে ছিল যে! ঠোঁট বাঁকানো, চোখে আগুন, দাঁতে দাঁতে বজ্র—আঁটুনি। হিংসে নয়, সংকোচ বা দ্বিধাও নেই। যেন মাজরা—পোকা নিকেশ করতে এসেছিল।

মেজদাদু এবার একটু ব্যস্ত হয়ে বলেন, ভেজা শরীরে এই হিমে কতক্ষণ থাকবে? তোমার শরীর ভালো নয়।

কুঞ্জ সংবিৎ ফিরে পায়। আজ সে কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে তা হঠাৎ টের পেয়ে ভারী লজ্জা করে তার। কোনওদিন কোনও মানুষের কাছে ঠিক এভাবে নিজের সম্পর্কে জানতে চায়নি কুঞ্জ। সে বরাবর নিজের সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসী। নিজেকে অভ্রান্ত ভাবাই কুঞ্জর স্বভাব।

সংবিৎ ফিরে পেয়েই কুঞ্জ গুটিয়ে গেল। গম্ভীর মুখখানায় হাসি এল না, তাই না হেসেই বলল, যাই মেজদাদু।

এসো গিয়ে। মাঝে মাঝে এলে ভালো লাগে। বাড়িতে তোমার কেউ যত্ন করে না নাকি তেমন? শুকিয়ে গেছ। তোমার মাকে দেখলে বলব তো।

কুঞ্জ আবার জলঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে আসে। বাতাসের মুখে ধেয়ে আসে খরশান বৃষ্টির অস্ত্রশস্ত্র। গেঁথে ফেলে তাকে বার বার। বৃষ্টির মিছিল চলে তার পিছনে পিছনে, ধিক্কার দেয়, ছিয়া, ছিয়া, ছিয়া...

পিচ রাস্তায় এক নিয়নবাতির তলায় ছোট ভাই রাধানাথের সঙ্গে দেখা। ছাতার নীচে গুঁড়ি মেরে যাচ্ছিল। কুঞ্জকে দেখে ভয়ার্ত মুখ তুলে বলল, বউদির বড্ড অসুখ, ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।

কী অসুখ?

মেজদা মেরেছে। রক্ত যাচ্ছে খুব।

কুঞ্জ সামান্য কেঁপে ওঠে। হয়তো ভেজা শরীরে হঠাৎ বাতাস লাগল, কিংবা হয়তো অন্য কিছু। ভাবতে চাইল না কুঞ্জ। ভাবতে নেই।

খুব অনেক রাতে মেঘ কেটে আকাশে সামান্য জ্যোৎস্না ফুটেছে। বাতাস থেমেছে। রুগির ঘরখানা নিরিবিলি হয়েছে এতক্ষণে। টুসি জেগে ছিল এতক্ষণ। আর পারল না। এক ধারে মাদুর পেতে তুলোর কম্বল মুড়ি দিয়ে নেতিয়ে পড়েছে অঢেল ঘুমে।

কুঞ্জ একা হল। সাবিত্রীর অবশ্য সাড় নেই। রক্ত বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। কয়েকবারই অজ্ঞান হয়েছে, আবার জ্ঞান ফিরেছে, ফের দাঁতে দাঁত লেগে চোখ উলটে গোঁ—গোঁ আওয়াজ করেছে। মেঝে ভেসে গিয়েছিল রক্তে। কুঞ্জ তখন ঘরে আসেনি। ভাসুর তো। সব ধোয়া মোছা হওয়ার পর, ভিড় পাতলা হয়ে গেলে এসে একটু দূরে চেয়ার পেতে বসে থেকেছে। এ ঘরে এভাবে বসে থাকা তার উচিত নয়। খারাপ দেখায়। তবু তার উপায়ও নেই। রাঙাকাকি আর মা থাকতে চেয়েছিল, কুঞ্জ একরকম জোর করে তাদের শুতে পাঠিয়েছে। কেবল টুসি। ডাক্তার বলে গেছে, ভয় নেই। কিন্তু কুঞ্জর ভয় অন্য জায়গায়। সে নিঃশব্দে চেয়ে থেকেছে সাড়হীন সাবিত্রীর দিকে। টের পেয়েছে ঠান্ডায় বৃষ্টিতে ভিজে তার ডান বুকে জল জমেছে। বাঁ বুকে ভয়।

টুসির শ্বাসের শব্দ মন দিয়ে শুনল কুঞ্জ। ঘুমন্ত শ্বাসের শব্দ চিনতে পেরে নিশ্চিন্ত হল একটু। আস্তে নিঃশব্দে উঠে এল বিছানার কাছে। ডাকল না, তবে বিছানার এক পাশে বসল খুব সাবধানে।

অনেক, অনেকক্ষণ বসে রইল। ঘরে একটা মৃদু নীল ঘুম—আলোর ডুম জ্বালানো। তাতে আলো হয় না। কেবল দৃশ্যগুলো জলে—ডোবা আবছায়া মতো দেখা যায়। সেই আলোয় যুবতী সাবিত্রীকে বুড়ি—ধুড়ির মতো দেখায়। দেখতে ভালো লাগে না। অনিচ্ছে হয়। চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে জাগে।

গভীর রাতের এক নিস্তব্ধ মুহূর্তে যখন সাবিত্রীর বিছানায় সসংকোচে বসে অন্যমনস্ক কুঞ্জ পপুলারিটির কথাই ভাবছিল তখন হঠাৎ খুব বড় করে চোখ মেলল সাবিত্রী। মাঝরাতে হঠাৎ সেই তাকানো চোখের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে কুঞ্জ। তারপর মুখ এগিয়ে খুব নরম স্বরে জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন আছ?

সাবিত্রী জবাব দিল না। বড় বড় চোখে নিষ্প্রাণ প্রতিমা যেমন চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ সেইরকম চেয়ে রইল। তারপর খুব ক্ষীণ, নাকিস্বরে বলল, ও কোথায়?

কুঞ্জ গম্ভীর হয়ে বলল, পালিয়েছে।

সাবিত্রী চারদিকে চাইল। টুসিকে দেখল, কুঞ্জর দিকে চেয়ে চোখের ইঙ্গিত করে বলল, টুসি?

ঘুমোচ্ছে।

সাবিত্রী গভীর শ্বাস ছেড়ে বলে, আর সবাই?

ধারে কাছে কেউ নেই।

শুনে সাবিত্রী সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ফুঁপিয়ে উঠে বলে, আপনাকে কতবার বলেছি, ও আমাকে সন্দেহ করে। কিছু টের পেয়েছে।

আজ কী বলল?

সাবিত্রী কুঞ্জর দিক থেকে অন্যধারে পাশ ফেরে। বলে, ও জানে।

কুঞ্জর ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায় হঠাৎ। বুক জুড়ে একটা বেলুন ফেঁপে ফুলে উঠে তার দম চেপে ধরে।

কুঞ্জ আস্তে করে বলে, টের পাওয়ার কথা নয়।

সাবিত্রী মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। চোখে জল। একটু ক্ষুব্ধ গলায় বলে, কী করে জানলেন, টের পাওয়ার কথা নয়? আপনি কি কখনও আমাদের গোপন সম্পর্কের কথা জানতে চেয়েছেন? গত চার মাস ও আমাকে ছোঁয়নি।

বজ্রপাতের মতো আবার সেই পপুলারিটি কথাটা মাথার মধ্যে ফেটে পড়ে কুঞ্জর। তার মন অভ্যাসবশে হিসেব করে নেয়, যদি কেষ্ট সন্দেহ করে থাকে, তবে সেটা চাউর করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। হাবুর ঝোপড়ায় মদের মুখে স্যাঙাতদের কাছে বলবে না কি আর? বউ আর দাদাকে জড়িয়ে তামসিক আনন্দ পাবে। যদি কথাটা ছড়ায় তবে কুঞ্জর অনেকখানি চলে যাবে। রেবন্তও কি জানে?

বড় ছটফট করে ওঠে কুঞ্জ। বলে, ছোঁয়নি?

সাবিত্রী চেয়েই ছিল। ধীর স্বরে বলল, কখনও—সখনও চাইত। আমার ইচ্ছে হত না। ঝগড়া করতুম। তখন রাগ করে গুটিয়ে যেত।

সাবিত্রীর এই বোকামিতে হাঁ হয়ে রইল কুঞ্জ। বোকা, জেদি মেয়েটা। খুব হতাশ গলায় কুঞ্জ বলল, তা হলে আর ওর দোষ কী? যদি কথাটা আমাকে আগে বলতে তবে তোমাকে পরামর্শ দিতুম অন্তত এক—আধবার ওকে অ্যালাউ করতে। দোষটা কেটে থাকত।

সাবিত্রী জেদি গলায় বলে, আমার ইচ্ছে হত না। ঘেন্না পেতাম।

কুঞ্জ কাহিল গলায় বলে, কিন্তু ধরা পড়ে গেলে যে।

সাবিত্রী মুখ ফিরিয়ে নেয় লজ্জায়। ক্ষীণ স্বরে বলে, গেলাম তো! কিন্তু সব দোষ কি আমার? আপনার কিছু করার ছিল না?

সাবিত্রীর ওপর এই মুহূর্তে ভারী একটা ঘেন্নার মতো ভাব হল কুঞ্জর। দোষ তোমার নয় তো কার? বিয়ে হয়ে আসার পর থেকেই কেন তুমি আর সবাইকে ছেড়ে সুযোগ পেলেই হাঁ করে দেখতে আমাকে? বাড়ির লোক আমাকে যত্ন করে না বলে কেন অনুযোগ তুলতে সবার কাছে? কেন আমার স্নানের সময় পুকুরঘাটে গেছ? আমার ঘরে গিয়ে সোহাগ করে বিছানা টান করত, আলনা আর টেবিল গোছাত কে? কেষ্টকে মদ ছাড়ানোর চেষ্টা করোনি, রাতে ও না ফিরলে তেমন গা করোনি কখনও। সেসব কেন? যদি স্বামী হিসেবে কেষ্টকে তোমার পছন্দ নয়, তবে বিয়ের আগে নটঘটি করেছিলে কেন? ঠিক কথা, দোষ আমারও। কী করব, আমার যে সেচহীন শুকনো জীবনের চাষ। একটা বয়সের পর পুরুষ চোত মাসের খরার জমি হয়ে যায় জানো না? মেয়েমানুষ হল জলভরা কালো মেঘের মতো। আমার সেই মেঘ কেটে গেছে কবে! তনু বিয়ে করে চলে গেল। শুকনো ড্যাঙা জমি পড়ে ছিলুম। ছিলুম তো ছিলুম। কে তোমাকে মেঘ হয়ে আসতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? চনমন করতে, উচাটন হতে, সম্পর্কের বাঁধন খসিয়ে ফেলতে চাইতে। তোমার চোখমুখ দেখেই জলের মতো বোঝা যেত। আর যত সেটা বুঝতে পারলুম তত আমারও চৈত্রের জমি মেঘ দেখে ফুঁসে উঠল। সেটা দোষ বটে, কিন্তু বিবেচনা করলে, বিশ্লেষণ করলে, তলিয়ে দেখলে দেখতে পাবে

মেঘের ছায়া পড়েছিল বলেই খরার জমি উন্মন হয়েছিল। শরীর জিনিসটা সম্পর্ক মানতে চায় না, সমাজ মানতে চায় না, আগে পরে কী হবে ভাবতে চায় না। বোবা, কালা, অন্ধ, অবিবেচক। যখন জাগে তখন মাতালের মতো জাগে, লন্ডভন্ড করে দিতে চায় সব। হাবুর ঝোপড়ায় একরাতিয়াকে নিয়ে পড়ে থাকত কেষ্ট। তুমি এ ঘরে একা। আমি ও ঘরে একা। মেঘ ডাকত, খরার মাটিও অপেক্ষা করত। তারপর এক ঘোর নিশুত রাতে ছোট করে শেকল নড়ল দরজায়। আমি যেন জানতুম, অবিকল এইভাবেই একদিন নিশুত রাতে শিকল নড়বে। আমি এত নিশ্চিতভাবে জানতুম যে শেকল কে নাড়ল তা জিজ্ঞেসও করিনি। উঠে কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিলুম। মনে কোরো না যে ভেসে গিয়েছিলুম, ডুবে গিয়েছিলুম, সুখে ভরে উঠলাম। মোটেই তা নয়। শরীর নিভলে বড় ঘেন্না হয়েছিল নিজের ওপর। সমাজ, সংসার, সম্পর্ক সব বজ্রাঘাতের মতো মাথায় পড়তে লাগল এসে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম, তুমি ভারী সুখী হয়েছ, তৃপ্তি শান্তি আনন্দে ঝলমল করছে মুখ। বলেছিলে, যে মানুষ মস্ত বড় তাকে সব দেওয়া যায়। দোষ হয় না। বলোনি?

কুঞ্জ শুকনো মুখে বলল, কেষ্ট জানে বলছ! কিন্তু লোকটা যে আমিই তা ঠিক পেল কী করে?

সাবিত্রী গভীর বেদনার শব্দ করল একটু। আস্তে করে বলল, বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ ব্যথা।

সাদা ঠান্ডা একটা হাত বাড়িয়ে কুঞ্জর হাতখানা ধরল সাবিত্রী। ভারী দুর্বল হাতের সেই ধরাটা যেন শালিখ পাখির পায়ের আঁকড়ের মতো। কুঞ্জর গা সামান্য ঘিনঘিন করে। অশুচি লাগে। ঘরের কোণে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে রক্তমাখা কাপড়চোপড়, ন্যাকড়া। ঘরের আঁশটে গন্ধটা যেন আরও ঘুলিয়ে ওঠে হঠাৎ। টুসি গভীর ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করে কী বলে ওঠে। কুঞ্জ হাত ছাড়িয়ে নেয়।

সাবিত্রী ক্লান্ত আধবোজা চোখে কুঞ্জর দিকে চেয়ে বলে, আপনার কথা আমিই বলেছি।

তুমি!—কুঞ্জ ভারী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

রোজ জানতে চাইত, আপনিই কি না। পেটে ছেলে এল, অথচ ওর নয়। তবে কার, তা হিসেব করে দেখত। স্বীকার করানোর জন্য মারত। কাল বলে ফেললাম।

তুমি কি পাগল?

সাবিত্রীর ক্ষীণ স্বরে যেন একটু জোয়ার লাগে, পাগল কেন হব? আমার তো সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে। ভাবতে কত সুখ হয়! গায়ে কাঁটা দেয়। মনে হয়, আপনার মতো মানুষ, এত বড় একটা মানুষ, যার এত নামডাক সে কিনা আমাকে এত স্নেহ করে! আমার এত আনন্দ হয়, সবাইকে বলতে ইচ্ছে করে। কাল মাঝরাতে যখন ও আমাকে গলা টিপে ধরেছিল তখন চোখে চোখ রেখে একটুও ভয় না খেয়ে বলেছিলাম। একটুও ভয় করেনি। বলে এত সুখ হল, গায়ে কাঁটা দিল আনন্দে। ও যখন মারছিল তখন একটুও লাগছিল না। আমি তখনও হাসছিলুম।

আস্তে আস্তে আড়ষ্ট হয়ে যায় কুঞ্জ। ভিতরে একটা কাঁপুনি শুরু হয়। এ যে বদ্ধ বেহেড হয়ে গেছে। এখন যে এ আর কোনও হায়া লজ্জা মানছে না। মাথাটা টলে যায় কুঞ্জর। বিছানার ওপর হাতের ভর রেখে ঝুঁকে সাবিত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, যেন ভূত দেখছে। বলে, কী করলে বলো তো! ছিঃ ছিঃ!

আমি ভয় পাই না। আমার লজ্জা নেই। এত মারল, কত কষ্ট পেলাম দেখুন তবু এখনও মনে হচ্ছে বলে দিয়ে বেশ করেছি।

কুঞ্জ কুঁকড়ে বসে হাঁটুতে থুঁতনি রেখে ক্ষীণ গলায় বলে, শুনে কেষ্ট কী করল?

খুব অবাক হল। সন্দেহ করত বটে কিন্তু আপনার মতো মানুষ এ কাজ করতে পারে তা যেন ওর বিশ্বাস হত না। তাই কথাটা শুনে কেমনধারা ভ্যাবলা হয়ে গেল। মারল আমাকে, কিন্তু কেমন পাগলাটে হয়ে গেল মুখ, মারতে মারতেই কেঁদে ফেলল। তারপর দরজা খুলে পালিয়ে গেল দৌড়ে। ফিরল আজ সন্ধেবেলায়। আবার ধরল আমাকে, বলল, দাদাকে মিথ্যে করে জড়াচ্ছ। দাদা নয়, অন্য কেউ। কে সত্যি করে বলো। আমি তেমনি চোখে চোখ রেখে বললাম। বলল, আমাদের দু'জনকেই খুন করবে। আগে কোনওদিন পেটে মারেনি, আজ মারল।—বলতে বলতে মুখ বালিশে চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে সাবিত্রী।

কুঞ্জ অসাড় হয়ে বসে থাকে। পপুলারিটি কথাটা খামচে ধরে মাথা। একনাগাড়ে অনেক কথা বলে ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সাবিত্রী। থর থর করে কাঁপছিল, ঠোঁট সাদা। লেপ টেনে মুড়ি দিয়ে গভীর ব্যথা—বেদনার শব্দ করে বলল, আমার শরীর বড্ড খারাপ লাগছে। ভীষণ শীত আর কাঁপুনি।

কুঞ্জ টুসিকে ডেকে তোলে। রাঙাকাকি আর মাকে ডেকে আনে।

৬

এতদিনে তবে কি বুড়ো হল পটল? চোখে ছানি আসছে নাকি? একটু আলো লাগলেই চোখ বড় ঝলসে যায় যে আজকাল? নইলে কি রবিকে কুঞ্জ বলে ভুল করত? টর্চের আলোটা এমন বিশাল গোলপানা চক্করের মতো ঝলসে উঠেছিল যে ধাঁধা লেগে গেল। সে ভুলটাও শুধরে নিতে পারত। কিন্তু একটা ফাঁকা আওয়াজে, একটা উটকো লোকের হাঁকাড় শুনে মাথাটা কেন যে ঘেবড়ে গেল আজ। হাবুর ঘরে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে অফুরন্ত হাঁফের টান ভোগ করতে করতে এইসব কথা ভাবে পটল। শ্লেষ্মার পর শ্লেষ্মা উঠে আসছে কাশির সঙ্গে। হরি ডাক্তার মরে গিয়ে অবধি এই শ্লেষ্মার আর চিকিৎসা হল না। বুকের মধ্যে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে শ্বাসের কষ্ট। এরপর কি মরবে পটল? ঝাড়গ্রামে মামাশ্বশুর সস্তায় একটা কলাবাগান বেচে দিচ্ছে। পটলের বড় ইচ্ছে, বাগানটা কেনে। মরবার আগে ছেলেপুলে সহ বউ বাসন্তীকে ঝাড়গ্রামে বসিয়ে যেতে পারলে একটা কাজের কাজ হয়। বাসন্তীর ব্যাবসার মাথা আছে, কলা বেচে ঠিক সংসার চালিয়ে নেবে। আজ কুঞ্জকে খুন করতে পারলে রেবন্তবাবু বাগান কেনার টাকা দেবে, কথা ছিল। খুন পটলের কাছে নতুন জিনিস তো নয়। পলিটিক্সয়ালাদের হয়ে, জোত—মালিকের হয়ে, হরেক কারবারির হয়ে নানান রকম মানুষ মেরেছে সে। সেজন্য বড় একটা আফসোসও নেই তার। মশা মাছি, পাঁঠা ছাগল মারলে যদি পাপ না হয় তবে মানুষ মারলেও হয় না। আর যদি পাপ হয়ই তবে পাঁঠা—ছাগল মারলে যতটা হয় তার বেশি হয় না। এ তত্ত্ব পটল অনেক ভেবে ঠিক পেয়েছে। কিন্তু এখন তার সন্দেহ হয়, সত্যিকারের বুড়ো হল নাকি সে? ছানি আসছে চোখে? মাথাটা কাজের সময় ঠিক থাকছে না কেন? এমন হলে লাশটা ফেলতে পারবে না পটল, আর যদি না ফেলতে পারে তবে ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা যে হাতছাড়া হয়ে যাবে। রেবন্তবাবু দায়ে দফায় অনেক দেখেছে তাকে, তার এই কাজটুকু করে যে দিতেই হয় পটলকে। ভাবছে আর কাশছে পটল। হাবুর দেওয়া বড় মাটির ভাঁড়টা ভরে উঠল শ্লেষ্মায়। বড় শ্বাসের কষ্ট।

চ্যাটাইয়ের অন্যধারে বসে কালিদাস তাড়ি টানছিল খুব। মাথাটা টলমলে হয়ে এসেছে। মিটি—মিটি হাসছে আর পটলের দিকে চাইছে। বিড়বিড় করে বলছে, হোমিয়োর কী গুণ বাবা! নিজের চোখে দেখলুম তো! কুঞ্জ ওই অত দূরে থাকতে পকেট থেকে শিশি বের করে ওষুধ খেল, আর সেই ওষুধের গুণে একশো হাত দূরে পটলার চোখে ধাঁধা লেগে গেল! শুধু তাই? হোমিয়োর গুণেই না কুঞ্জ আগেভাগে জানতে পেরেছিল যে আজ সে খুন হবে। তাই না এক বকরাক্ষসকে জুটিয়ে এনেছিল সঙ্গে। কী চেঁচাল বাবা মুশকো লোকটা! কাঁচা খেয়ে ফেলত ধরতে পারলে। পটল যে পটল সেও ভয় খেয়ে পালায় না হলে? রেবন্তবাবুও ঘাবড়ে গেছে খুব। এই জল—ঝড়ের মধ্যেই লেজ গুটিয়ে পালাল।

নারকোল বাগানের বাইরে আসতেই ধারালো বৃষ্টি ছেঁকে ধরল রেবন্তকে। পাথুরে ঠান্ডা জল। দমফাটা হুমো বাতাস খোলা মাঠের মধ্যে তাকে এলোমেলো ঘাড়ধাক্কা দিতে থাকে। দেয়ালের মতো নিরেট অন্ধকার চারদিকে, এক লহমায় ভিজে গেল রেবন্ত। গায়ের সোয়েটার, জামা গেঞ্জি ফুঁড়ে জল ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে। বৃষ্টি বাতাস আর মাঠে জমা জল ঠেলে জোরে হাঁটা যায় না। তবু প্রাণপণে হাঁটে রেবন্ত। শীতে ঠকঠক করে কাঁপে সে। দুটো কানে বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা। ঝোড়ো বাতাস হাড়—পাঁজরায় ঢুকে প্রাণটুকু শুষে নিচ্ছে। তবু সে পিছন ফিরে একবার দেখে নিল, ছায়া দুটো পিছু নিয়েছে কি না, ওই দু'জনের কাছ থেকে এখন তাকে যতদূর সম্ভব তফাত হতে হবে।

শরীর অবশ করে গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা আর কাঁপুনি ধরে গেল। কানের যন্ত্রণাটা মাথাময় ভোমরার ডাক ডাকতে থাকে, চিন্তার শক্তি পর্যন্ত থাকে না। এই অবস্থায় কীভাবে সে শ্যামপুর পৌঁছল সেটা সে নিজেও ভালো বলতে পারবে না।

আবছা মনে পড়ে, বাজারে তেজেনের দোকান থেকে নিজের সাইকেলটা নেওয়ার সময় তেজেন বলেছিল, পাগল নাকি? এ ভাবে যেতে পারে মানুষ! থেকে যাও।

রেবন্ত কথাটা কানে নেয়নি, অন্ধকারে বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে সে প্রবল বেগে সাইকেল চালিয়েছিল। কয়েকবার সাইকেল হড়কে পড়ে গেল। চাকার রিমে টাল খেয়েছে। চালানোর সময় ফর্কের সঙ্গে টায়ার ঘষা খাচ্ছিল খ্যাস খ্যাস করে। জোরে চলতে চাইছিল না। তবু পৌঁছেও গেল রেবন্ত।

শ্যামশ্রীর সামনে কোনওদিন কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করে না, আজও করল না। যখন উত্তরের দালানের বারান্দায় সাইকেলটা হিঁচড়ে তুলল তখন তার শরীর আপনা থেকেই টলে পড়ে যাচ্ছিল মেঝেয়। স্রেফ মনের জোরে খাড়া রইল সে। গামছায় শরীর মুছল, জামাকাপড় পালটাল। মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে চোখ আর নাক দিয়ে অবিরল জল ঝরছে। প্রবল হাঁচি দিল কয়েকটা।

শ্যামশ্রী মুখে কিছু বলছিল না বটে, কিন্তু দরজা খুলবার পর থেকেই একদৃষ্টে লক্ষ করছিল তাকে। ছাড়া জামাকাপড়গুলোর জল নিংড়ে দড়িতে মেলে দিয়ে এল শ্যামশ্রী। নীরবে শুকনো জামাকাপড় সোয়েটার এগিয়ে দিল। রেবন্তর গা আর জামাকাপড় থেকে চল ঝরে মেঝেয় গড়িয়ে যাচ্ছিল, নিজে হাতে চট নিয়ে এসে তা চাপাও দিল শ্যামশ্রী। অস্ফুট স্বরে একবার বলল, ছাদের ঘরে এখন যেয়ো না, ঠান্ডা, কিছুক্ষণ এখানেই শুয়ে থাকো লেপ গায়ে দিয়ে।

মাসখানেকের বেশি হল, নীচের শোওয়ার ঘরে শ্যামশ্রীর সঙ্গে শোয় না রেবন্ত। ছাদে একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে শোয়। শ্যামশ্রীর সঙ্গে শরীরের সম্পর্কও তার নেই বেশ কিছুদিন। কথাবার্তাও প্রায় হয়ই না।

রেবন্ত শ্যামশ্রীর কথার জবাব দিল না, কিন্তু ওর খাটের নরম বিছানায় গিয়ে বসল। ভাঁজ করা লেপটাও টেনে নিয়ে যথাসাধ্য মুড়ি দিল গায়ে। মাথা আর কান জুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা। সহ্য করতে লাগল চোখ বুজে।

শ্যামশ্রী হয়তো বুঝতে পারল রেবন্তর অবস্থা ভালো নয়। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। একটু বাদে একটা বড় কাচের গ্লাস ভর্তি আদা—চা নিয়ে এল, সঙ্গে মুড়ি, আলুভাজা আর লঙ্কা।

গরম চা পেটে যাওয়ায় আচ্ছন্নভাবটা কিছু কাটে। কিন্তু স্বাভাবিক বোধ করে না রেবন্ত। ভেতরে একটা ভয়ংকর অস্থিরতা।

নকশাল আমলে এ অঞ্চলে খুনখারাবি হতে পারেনি। পাঁচটা—সাতটা গাঁ জুড়ে তৈরি হয়েছিল প্রতিরোধ বাহিনী। এ সব কাজে সবচেয়ে বেশি জান লড়িয়েছিল কুঞ্জই। সে ছিল অস্ত্রহীন সেনাপতি। প্রাণের দায়ে পুলিশ কুঞ্জকে সাহায্য করেছে। তখন কুঞ্জর ছায়া হয়ে ফিরত রেবন্ত। রাত জেগে সাইকেলে ঘুরে গাঁয়ের পর গাঁ চৌকি দিত দু'জনে। কুঞ্জ বুকের দোষ বলে নিজে সাইকেল চালাত না। তাকে সামনের রডে বসিয়ে নিয়ে চালাত রেবন্ত। সাইকেলেই দু'জনের রাজ্যের কথা হত। হৃদয়ের কত গভীর কথা সে সব। স্বর্গরাজ্য তৈরি করার কত অবাস্তব স্বপ্ন! কুঞ্জ কখনও নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে চাইত না। অসম্ভব চাপা ছিল। কিন্তু একদিন মাঝরাতে জ্যোৎস্নায় খাড়ুবেড়ের মোড় থেকে বেলপুকুর ফিরবার পথে সাইকেলের রডে বসে দুর্বল মুহূর্তে কেঠো স্বভাবের কুঞ্জও বলে ফেলেছিল তনুর কথা। রাজুর বোন তনু। আর কাউকে কখনও বলেনি কুঞ্জ, বিশ্বাস করে শুধু তাকেই বলেছিল।

সেই বিশ্বাসটা আর অবশ্য নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর তারা দু'জনে গিয়েছিল যশোর অবধি। তাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তখন ছিল প্রবলতম, কিন্তু সেইটেই আবার ছিল বিচ্ছেদেরও পূর্বাভাস। যশোরযাত্রাই ছিল তাদের বন্ধুত্বেরও শেষ যাত্রা! মুক্তিযুদ্ধের পরই ইলেকশন। কংগ্রেসের হয়ে নমিনেশন পাওয়ার আশায় কুঞ্জ লড়ে গেল নানুর সঙ্গে। পারল না। পারার কথাই নয়। কুঞ্জ এ অঞ্চলের জন্য অনেক করেছে বটে, কিন্তু তার মানে তো এ নয় যে বিধানসভায় দাঁড়ানোর ক্ষমতাও তার এসে গেছে। সেই প্রথম রেবন্ত চটেছিল

কুঞ্জর ওপর। বোকার মতোই কুঞ্জ দাঁড়াল নির্দল হয়ে। রেবন্ত খাটতে লাগল নানুর জন্য। পাঁচ—সাতটা গাঁয়ে কুঞ্জর প্রভাব বেশি, নানু পাত্তা পাবে না। কিন্তু তখন নানু হারলে দলের বেইজ্জত। নিছক জোর ছাড়া গতি ছিল না। এমনিতেই হয়তো নানু জিতত, তবু সন্দেহের অবকাশ না রাখতে রেবন্তরা বুথ দখল করল ভোটের দিন ভোরবেলায়। তখন থেকেই গোলমালের সূত্রপাত। কুঞ্জর পোলিং এজেন্ট বেলপুকুর কলেজে মার খায়। যারা মেরেছিল তাদের মধ্যে রেবন্ত ছিল। তখন রেবন্ত দরকার হলে কুঞ্জকেও মারতে পারত।

সে যাত্রা কুঞ্জ জেতেনি। ইলেকশনের পর আবার ভাবসাব হয়ে গিয়েছিল কুঞ্জর সঙ্গে রেবন্তর। তবে কুঞ্জ আর দলে ফেরেনি। অন্য দলে ভিড়েছে। কিন্তু আজও ঝিমিয়ে যায়নি। সব সময় কিছু না কিছু করছে। দল পাকাচ্ছে, চাঁদা তুলছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, সাহায্য বা ত্রাণের কাজ করছে।

শ্যামপুরে রেবন্তদের পরিবারের প্রতাপ খুব। নামে—বেনামে তাদের বিস্তর জমি, চালের কল, বাগনানে তাদের মস্ত কাপড়ের দোকান। রেবন্তকে কাজ—কর্ম করতে হয় না। বি এসসি পাশ করে সে বহুদিন শুয়ে বসে আর পলিটিক্স করে কাটাচ্ছিল। তাঁতপুরে একটা ইস্কুলে অঙ্কের মাস্টারি করত। অলস মাথায় শয়তানের বাসা। রোজ বিকেলের দিকে একটু নেশা করার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। বেলপুকুর বাজারের পিছনে ঝোপ—জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ভিতর দিকে নির্জন জায়গায় হাবুর ঝোপড়া হল নেশার আস্তানা।

কিছু বদমাশ লোক হাবুর বউয়ের নামই দিয়েছিল একরাতিয়া। আসল নাম একরত্তি। মা—বাপের আদর করে রাখা সেই নাম একরত্তি এখন বদমাশদের মুখে একরাতিয়া। অর্থাৎ এক রাতের মেয়েমানুষ। একরাতিয়া দেখতে এমন কিছু নয়। স্বাস্থ্যটা ভালো। ছেলেপুলে নেই। কিছুটা হাবুর লোভানিতে, কিছুটা একঘেয়েমি কাটাতে রেবন্ত সেই ফাঁদে পা দেয়।

একদিন রাত্রে যখন রেবন্ত ঝোপড়ার ভিতরের খুপরিতে একরাতিয়ার সঙ্গে ছিল তখন ঝাঁপ ঠেলে টর্চ হাতে আচমকা ঢুকল কুঞ্জ। তার পিছনে জনা পাঁচ—সাত ছেলে—ছোকরা সমাজরক্ষী। কুঞ্জ অবশ্য টর্চটা পট করে নিবিয়ে ঝাপটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়েছিল। বলেছিল, পালিয়ে যা সামনের ঘর দিয়ে। আর কখনও আসবি না।

রেবন্ত পালিয়েছিল। তারপর লোকলজ্জার ভয়ে সিঁটিয়ে থেকেছিল কয়েকদিন। সামাজিক নোংরামি বন্ধ করতে কুঞ্জ তখন নানা জায়গায় হানা দিচ্ছে দলবল নিয়ে। যত অকাজের কাজ। কয়েকদিন বাদে একদিন শ্যামপুরে এসে রেবন্তর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বলল, সত্যবাবুর বড় মেয়েটি ভালো। তোদের স্বঘর।

রেবন্ত চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না লজ্জায়। কিন্তু মনে মনে বুঝতে পেরেছিল এটা ব্ল্যাকমেল। প্রথমটায় রাজি হয়নি। কিন্তু কুঞ্জর উসকানিতে তার বাবা মা আর কাকারা বিয়ের জন্য পিছনে লাগল। পারিবারিক চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা তাকে করতে হয়।

বিয়েটা পুরুষের জীবনের কী সাংঘাতিক গুরুতর ব্যাপার তা আগে জানত না রেবন্ত। বিয়ের পর হাড়ে হাড়ে জানল। বিয়ের আসরে দানসামগ্রীর মধ্যে একটা চরকা দেখে বরযাত্রীরা কিছু ঠাট্টা রসিকতা করেছিল। সে তেমন কিছু নয়। কিন্তু কন্যা সম্প্রদানের সময় রেবন্ত টের পেল তার করতলে শ্যামশ্রীর হাত শক্ত, ঘোমটার মধ্যে মুখখানা গোঁজ। বিদ্রোহের সেই শুরু। রেবন্তকে শ্যামশ্রী বহুভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে কালচারের দিক দিয়ে তার যোগ্য বর রেবন্ত নয়। এ কথা আরও নানা জনেও কানাঘুঁষো করে। একদিন এক বকারাজ খুড়শ্বশুর কলকাতা থেকে এসে সব দেখেশুনে মুখের ওপরেই তাকে বলেছিল, সত্যদা কলকাতায় থাকলে এ বিয়ের কথা ভাবতেই পারত না। গাঁ—ঘরে কি শ্যামাকে মানায়?

আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে গেল রেবন্তও। শ্যামশ্রী দেখতে খারাপ ন। সত্যিকারের ঢলঢলে চেহারা। মস্ত মস্ত গভীর চোখ। ভারী নরম তার চলাফেরা, কথাবার্তা, কিন্তু ওই নরম চেহারার ভিতরকার স্বভাবটি অহংকারী, জেদি, নিষ্ঠুর। বিয়ের পর থেকেই এক ঘরের মধ্যে তারা দু'জন জন্মশত্রুর মতো এ ওকে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজত। এখন আক্রমণ নেই। নিরুত্তাপ বিরাগ রয়েছে।

এ বাড়ির কারও সঙ্গেই শ্যামশ্রীর তেমন বনিবনা নেই, তবে সে এত গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্বময়ী যে কেউ তাকে বড় একটা ঘাঁটাতে সাহসও করে না। উঁচু গলায় শ্যামশ্রী বড় একটা কথা বলে না। তার তেজ রাগ সব ঠান্ডা ধরনের। সকালে উঠে সে রোজ চরকা কাটে, গাঁধীর বাণী পড়ে। এগুলো ওর সত্যিকারের ব্যাপার, না কি বিদ্রোহের প্রকাশ তা জানে না রেবন্ত। সে নিজে কিছু রাজনীতি করেছে বটে তবে কোনও আদর্শই তার ভিতরে গভীর হয়ে বসেনি। তার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্কই নেই। নিজের চারপাশেও সে বরাবর তার নিজের মতো লোকজনকেই দেখেছে। তাদের কারওরই কোনও নেতার প্রতি অবিচল ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসও নেই। তাই শ্যামশ্রীকে দেখে তার অসহ্য লাগে। গাঁধী কেন চরকা কাটতেন বা গাঁধী কী বলে গেছেন তা কখনও অনুসন্ধান করে দেখেনি রেবন্ত। সে শুধু জানে গাঁধী অহিংসবাদী ছিলেন, অসহযোগ আর ভারত ছাড়ো আন্দোলন করেছিলেন, লোককে চরকা কাটতে বলতেন, এর বেশি জানার আগ্রহ রেবন্তর নেই। উপরন্তু এখন শ্যামশ্রীর জন্যই গাঁধীকে সে মনেপ্রাণে অপছন্দ করতে শুরু করেছে।

বিয়ের পর শ্যামশ্রীকে সে পায়নি বটে, কিন্তু পেয়েছে বনাকে। যতবার সে বনাকে দেখে ততবার মনে হয়, এই বনা তো আমার জন্যই জন্মেছিল। বনশ্রীর কথা মনে পড়লেই তার ভিতরকার অন্ধকার আলো হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর, মনপ্রাণ জেগে ওঠে। একাগ্র হয়ে ওঠে সে।

বড় গোপন কথা। কোনওদিন বনশ্রীকে সে কিছু বুঝতে দেয়নি, কখনও লঙ্ঘন করেনি সম্পর্কের নিয়ম। শুধু তার মন জানে। যা অন্তরে গোপন করা যায় তাই বেড়ে ওঠে। যত দিন যাচ্ছে তত তার মন ভরে ওঠে বনশ্রীতে। কখনও পাগল—পাগল লাগে। অসহায় আবেগে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনশ্রীকে চিন্তা করে। মনে মনে জিয়ন্ত করে তোলে তাকে। তারপর ভালোবাসার কথা বলে পাগলের মতো।

এই অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আবার সে যাওয়া শুরু করেছিল হাবুর ঝোপড়ায়। একরাতিয়ার সঙ্গে আবার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এখন আর সে লোক—লজ্জার ভয়ও পায় না। ভারী বেপরোয়া লাগে নিজেকে। শ্যামশ্রী তার জীবনটা নষ্ট করেছে, এবং বনশ্রীকে সে হয়তো কোনওদিনই পাবে না। তবে আর ভয় কীসের, ভাবনাই বা কী? কুঞ্জর সমাজরক্ষী দল স্বাভাবিক নিয়মেই ভেঙে গেছে। এখন আর কেউ হামলা করে না। হাবুর ঝোপড়ায় মাইফেল জমেছে খুব। এমনকী কুঞ্জর নিজের ভাই কেষ্টও এখন হাবুর ঝোপড়ায় রোজকার খদ্দের।

বনশ্রীর কথা আর কেউ না জানুক, একদিন জেনে গেল কুঞ্জ। মাতাল অবস্থায় তাকে সেদিন তুলে এনেছিল কুঞ্জ। রিকশায় তাকে পাশে নিয়ে বসে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল রাতের বেলায়। এ সব করাই তো কুঞ্জর কাজ। মহৎ হওয়ার বড় নেশা ওর। আর সেই দিন রিকশায় ফাঁকা রাস্তায় কুঞ্জকে বহু দিন পরে একা পেয়ে রেবন্ত সামলাতে পারেনি নিজেকে। শ্যামশ্রীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল কুঞ্জ, সেই আক্রোশ শীতের সাপের মতো ঘুমিয়ে থাকে তার মনের মধ্যে। কুঞ্জকে পেয়ে ফুঁসে উঠল। দুর্বল হাতে কুঞ্জর জামার গলা চেপে ধরে সে বলল, কেন আমার সর্বনাশ করলি হারামি? কে তোকে দালালি করতে বলেছিল?

বার বার এই প্রশ্ন করে যাচ্ছিল সে। পারলে সেদিনই খুন করত কুঞ্জকে। কিন্তু ঠান্ডা গলায় কুঞ্জ তাকে নানা উপদেশ দিচ্ছিল। ভালো হতে বলছিল, যেমন সবাই বলে। কুঞ্জকে রিকশা থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল রেবন্ত বার বার। বলেছিল, কে তোকে শ্যামার সঙ্গে বিয়ে দিতে বলেছিল? আমি তো বনাকে ভালোবাসি, আমি বনাকে ভালোবাসি। শ্যামশ্রীকে খুন করে আমি বনশ্রীকে বিয়ে করব।

মাতাল অবস্থায় কী বলেছিল তা মনে ছিল না রেবন্তর। কিন্তু পরদিন সকালে কুঞ্জই এল। নিরালায় ডেকে নিয়ে গিয়ে থমথমে মুখে বলল, বনশ্রীর সঙ্গে তোর কোনও খারাপ সম্পর্ক নেই তো?

আতঙ্কে সাদা হয়ে গিয়েছিল রেবন্ত। ঘোলাটে স্মৃতি ভেদ করে গত রাত্রির কথা কিছু মনে পড়েছিল তার। সে হাবুর ঝোপড়ায় গিয়ে মদ খায় বা একরাতিয়ার সঙ্গে শোয়, এ কথা লোকে জানলেও সে আর পরোয়া করে না। কিন্তু বনশ্রীর কথা সে কোনও পাখি—পতঙ্গের কাছেও প্রকাশ করতে পারবে না যে। কী করবে

ভেবে না পেয়ে রেবন্তর মাথা গুলিয়ে গেল। ঝুপ করে কুঞ্জর দু'হাত ধরে বলল, না, না। দোহাই, বিশ্বাস কর।

কুঞ্জ বিশ্বাস করেনি। অত বোকা সে নয়। কিন্তু মুখে বলেওনি কিছু। শুধু কেমনধারা শুকনো হেসেছিল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, বনশ্রী বড় ভালো মেয়ে। নষ্ট করিস না।

তারপর থেকে কুঞ্জ এখন প্রাণপণে বনশ্রীর জন্য ভালো ভালো সম্বন্ধ জোগাড় করছে। বিয়ে হয়েও যেত এতদিনে। কিন্তু বড় মেয়ের বিয়েটা সুখের হয়নি বলে বনশ্রীর মা বাবা চট করে কোনও জায়গায় মত দিতে দ্বিধা করছেন। এবার একটু ভালো করে দেখেশুনে বিয়ে দেবেন ওঁরা।

রেবন্ত জানে, কুঞ্জ কখনও বনশ্রী সম্পর্কে তার মনের কথা কাউকে জানাবে না। মরে গেলেও না। সে স্বভাব কুঞ্জর নয়। কিন্তু রেবন্তর তবু বুকে জ্বলুনিটা যায় না। কুঞ্জ তো জানে। জেনে গেছে। পৃথিবীর একটা লোক তো জানল!

ইদানীং কুঞ্জর আর একটা কাজ হয়েছে। কে তার মাথায় ঢুকিয়েছে বে—আইনি জমি ধরতে হবে। সেই থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে পাগলের মতো ঘোরে সে। বাগনান হাওড়া আর কলকাতার কাছারিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দলিল—দস্তাবেজের খোঁজখবর নেয়, নকল বের করে। বি ডি ও থেকে শুরু করে মহকুমা হাকিম, ল্যান্ড সেটেলমেন্ট থেকে থানা, কোথায় কোথায় না হন্যে হয়ে হানা দিচ্ছে সে? যে ব্যাপারে হাত দেয় তাতেই ওর রোখ চাপে। আগুপিছু ভাবে না।

জমির স্বত্ব মানুষের কাছে কী সাংঘাতিক তা যে জানে না কুঞ্জ এমন নয়। সরকার বাড়তি জমি ছাড়তে বললেই লোকে ছাড়ে কখনও? তবে তো সরকার একদিন এও বলতে পারে, বাড়তি ছেলেপুলে বিলিয়ে দাও।

কুঞ্জ বিপদটা বুঝেও বোঝেনি। এই জমি উদ্ধারের জন্য সে আর একবার খুন হতে হতে বেঁচে যায় বরাত জোরে। তবু বোঝেনি। রেবন্ত জানে গোটা এলাকা জুড়ে এখন সযত্নে একটি স্টেজ তৈরি হয়ে রয়েছে, যে স্টেজে কুঞ্জর জীবনের শেষ দৃশ্যটার অভিনয় হবে। আজ বেঁচে গেল বটে, কিন্তু রোজ কি বাঁচবে? তার দিন ঘনিয়ে এল। তার জন্য টাকা খাটছে, পাকা মাথার লোক রয়েছে পিছনে। এও ঠিক হয়ে আছে, কুঞ্জ মরলে পুলিশ তদন্ত করবে পলিটিক্যাল লাইন ধরে। যে—কোনও দলের ঘাড়ে দোষটা চাপানো হবে। দল থেকে প্রতিবাদ উঠবে। হইচই হবে কিছুদিন। তারপর থিতিয়ে পড়বে। কুঞ্জ মরবেই। রেবন্ত, পটল বা কালিদাসের হাতে যদি নাও মরে তবু কারও না কারও হাতে মরতেই হবে। নানা জায়গায় লোক লাগানো আছে। শুধু ইশারার অপেক্ষা। কিন্তু সেজন্য কুঞ্জকে খুন করতে চায়নি রেবন্ত। কুঞ্জ যাই করুক ওকে সত্যিকারের ঘেন্না করতে পারেনি সে কোনওদিন। ঘেন্না না হলে, খুনে রাগ না উঠলে কি মারা যায়? সেই অভাবটুকু এতদিন ছিল। আজ আর নেই। আপন মনে রেবন্ত একটু হাসে। কুঞ্জ, তোর সঙ্গে আর পাঁচজনের তফাত রইল না। তুই আর আমার চেয়ে মহৎ নোস। সাবিত্রীর কথা আমি জানি।

বাইরে একটা দমকা হাওয়া দিল। বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা সাইকেলটা ঘড়াং করে পড়ে গেল। একটা চাকা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। উৎকর্ণ হয়ে শোনে রেবন্ত। খুবই দামি সাইকেল। বিয়ের পাওয়া জিনিস। কিন্তু উঠল না সে। কানের যন্ত্রণায় অস্থির রেবন্ত লেপমুড়ি দিয়ে বোম হয়ে বসেই রইল। শ্যামশ্রী ঘরে নেই, কিন্তু চারদিকে তারই জিনিসপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বিয়ের সময় শ্যামশ্রীদের বাড়ি থেকে অনেক জিনিস আদায় করা হয়েছিল। এ ঘরে খাট, বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল এমনকী পাপোশটা পর্যন্ত ওদের দেওয়া। ভেবে হঠাৎ গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে রেবন্তর। লেপটা ফেলে উঠে পড়ে বিছানা থেকে। আজকাল শ্বশুরবাড়ির জিনিসগুলোতে পর্যন্ত সে ঘেন্না পায়। সেই ঘেন্নায় এ ঘরে থাকার পাটই তুলে দিয়েছে।

ছাদের ঘরে যাবে বলে রেবন্ত বাইরের বারান্দার দিকে দরজাটা খুলতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখল শ্যামশ্রী ভিতরে দরদালানের দিককার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। একদৃষ্টে দেখছে তাকে।

রেবন্ত যথাসম্ভব তেতো গলায় বলে, আমি যাচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

শীতল কঠিন একরকম গলায় শ্যামশ্রী জিজ্ঞেস করে, তুমি আজ দুপুরে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে?

রেবন্ত শ্যামশ্রীর চোখ থেকে চট করে চোখ সরিয়ে নেয়। বলে, হ্যাঁ।

পুরুষদের শ্বশুরবাড়িতে বেশি যাওয়া ঠিক নয়।

শুনে রেবন্ত জ্বলে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে মুখ ঘুরিয়ে বলে, কেন, কোনও অসুবিধে হয়েছে নাকি?

শ্যামশ্রী বড় বড় চোখে অনুত্তেজিত স্বরে বলে, হয়। শুভ এসেছিল তোমার আমার ঝগড়া হয়েছে কি না তা জানতে। আমি চাই না, আমার বাপের বাড়ির লোকেরা কোনও কিছু সন্দেহ করুক। তোমার হাবভাব দেখে ওরা আজ নাকি ভেবেছে যে তুমি বাড়ি থেকে ঝগড়া করে গেছ।

মনে মনে বড় অসহায় হয়ে পড়ে রেবন্ত। শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরবাড়ি বলে সে সেখানে যায় নাকি? সে তো যায় বনার কাছে। না গিয়ে সে থাকবে কেমন করে? তার জীবনের একমাত্র খোলা জানালা, একমাত্র ডানায় ভর দেওয়া মুক্তি ওই বনা। বনার কাছে সে যাবে না? মুখে সে শুধু বলল, ও।

শ্যামশ্রী মৃদুস্বরে বলল, আর যেয়ো না। আমার ছোট ভাইবোনেরাও এখন বুঝতে শিখছে। তারা টের পায়।

শিউরে উঠে রেবন্ত কূট সন্দেহে বলে, কী টের পায়?

শ্যামশ্রী তেমনি বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে, আমাদের সম্পর্কটা।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রেবন্ত, শ্যামশ্রীর এই কথায় সহজ হল। বলল, টের পেলেও কিছু যায় আসে না।

তোমার যায় আসে না জানি। কিন্তু তোমার মতো গায়ের চামড়া তো সকলের পুরু নয়। আমার যায় আসে। জামাই হয়ে শ্বশুরবাড়িতে ঘন ঘন যাবেই বা কেন? তোমার লজ্জা হয় না?—এসব কথা খুবই শান্ত স্বরে আস্তে আস্তে বলল শ্যামশ্রী। যেন বিশ্লেষণ করছে, বোঝাচ্ছে, জানতে চাইছে। শিক্ষয়িত্রীর মতো ভঙ্গিতে।

অনেক দিনের গভীর আক্রোশ জমে জমে তাল পাকিয়ে আছে রেবন্তর ভিতরে। বনার প্রতি গোপন ভালোবাসা, কুঞ্জর প্রতি আক্রোশ, শ্যামশ্রীর প্রতি ঘৃণা। সে একদম স্বাভাবিক নেই। কান মাথা জুড়ে তীব্র যন্ত্রণা ফেটে পড়ছে। বাইরে চলমান হাওয়ায় সাইকেলের চাকাটা ঘুরে যাচ্ছে অবিরল। ফ্রি হুইলের কির কির শব্দ আসছে।

শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনতে শুনতে ভিতরে আক্রোশের পিণ্ডটা বোমার মতো ফাটল। তার ভেতরে একটা রাগে উন্মাদ পাগল চেঁচাল, প্রতিশোধ নাও, প্রত্যাঘাত করো।

দাঁতে দাঁত ঘষল রেবন্ত। সন্ধেবেলা কুঞ্জকে খুন করতে গিয়ে পারেনি, এখন সেই আক্রোশটা তার সমস্ত শরীরকে জাগিয়ে তোলে। ভিতরের পাগলটা চেঁচায়, লন্ডভন্ড করে দাও ওকে। শেষ করে দাও।

শ্যামশ্রী ঘরের মাঝখানটায় ভালো মানুষের মতো অবাক চোখে চেয়ে দেখছিল রেবন্তকে। রেবন্ত আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। মারবে? মারুক। শ্যামশ্রী মারকে ভয় খায় না। গাঁধীজিও কি মার খাননি? শ্যামশ্রী এক পাও নড়ল না।

রেবন্ত সামনে এসে দু'হাতে খামচে ধরল তার কাঁধ। তীব্র গরম শ্বাস মুখে ফেলে বলল, তুমি আমাকে শেখাবে?

বলে একটা ঝাঁকুনি দিল শরীরে। শ্যামশ্রী শরীর শক্ত করে বলল, দরকার হলে শেখাব। চোখ রাঙিয়ো না, আমি তোমাকে ভয় পাই না।

পাও না?—এক অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে অবাক গলায় বলে রেবন্ত। ভিতরের পাগলটা চেঁচায়, ছিঁড়ে নাও পোশাক। মারো। ধর্ষণ করো। শেষ করো।

শ্যামশ্রীর আঁচল খসে পড়েছিল। বড় বড় চোখে ভয়হীন ঘৃণায় সে দেখে রেবন্তকে। রেবন্তও দেখে ওই নরম চেহারার অহংকারী জেদি মেয়েটাকে।

কয়েক পলক তারা এরকম রইল। তারপরই রেবন্ত হঠাৎ শ্যামশ্রীর সবুজ উলের ব্লাউজের বড় বড় বোতামগুলো হিংস্র আঙুলে খুলে ফেলতে লাগল।

প্রাণপণে বাধা দিল শ্যামশ্রী। দু'হাতে ঠেকাচ্ছে রেবন্তর হাত, বলছে, কী করছ! ছাড়ো, ছাড়ো।

প্রবল ঘৃণা, আক্রোশ আর ভীষণ খুন করার ইচ্ছেয় পাগল রেবন্ত একটা চড় কষাল শ্যামশ্রীর গালে। চাপা গলায় বলল, চুপ। খুন করে ফেলব।

শ্যামশ্রী কী করবে! কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার সব আবরণ খসিয়ে ফেলে রেবন্ত। প্রায় হিঁচড়ে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে ফেলে বিছানায়। চুলের মুঠি চেপে ধরে শুইয়ে দেয়। তারপর কামড়ে ধরে ঠোঁট। দাঁতে চিবিয়ে রক্তাক্ত করে দিতে থাকে। দাঁত বসায় গাল, স্তনে, গলায়। প্রবল ব্যথায় গোঙাতে থাকে শ্যামশ্রী। চেঁচায় না। দরদালানের দরজা এখনও খোলা। চেঁচালে কেউ এসে পড়বে। তাই ভয়ে, আতঙ্কে, লজ্জায় যতদূর সম্ভব নীরবে সহ্য করার চেষ্টা করে।

রেবন্ত নয়, যেন ন্যাংটো এক পাগল হামলে পড়ে তার ওপর। সর্বাঙ্গ ক্ষত—বিক্ষত করে দিতে থাকে। শ্যামশ্রী বুঝতে পারে, রেবন্তর শরীরের ভিতর থেকে যে কাঁপুনি উঠে এসে তাকেও কাঁপাচ্ছে তা ঠিক দেহমিলনের উত্তেজনা নয়, প্রেম নয়। বহুদিনের পুঞ্জীভূত রাগ প্রতিশোধ নিচ্ছে মাত্র। এ হল ধর্ষণ, বলাৎকার।

শান্ত, সংযত, পাথরের মতো শক্ত শ্যামশ্রীকে প্রবল হাতে পায়ে দাঁতে থেঁতলে নিষ্পেষিত করে, নিংড়ে নিতে থাকে রেবন্ত। একদম ছোটলোক বর্বরের মতো হতে পেরে সে তীব্র আনন্দ পায়। এই শাস্তি বহু দিন হল পাওনা হয়েছে শ্যামশ্রীর। দাঁতে দাঁত চেপে আছে শ্যামশ্রী, চোখ ঊর্ধ্বমুখী, শরীর দিয়ে খানিকক্ষণ প্রতিরোধ করেছিল, এখন ছেড়ে দিয়েছে সব। ওর মুখে গরম শ্বাস ফেলে চাপা গলায় রেবন্ত মাঝে মাঝে হুংকার দেয়, চুপ! খুন! খুন করে ফেলব। একবার অস্ফুট স্বরে শ্যামশ্রী বলেছিল, তাই করো। এর চেয়ে সেটা ভালো। রেবন্ত তক্ষুনি কনুই দিয়ে নির্মমভাবে চেপে ধরেছে ওর মুখ।

দরদালানের দরজা হাট করে খোলা। বাইরের বারান্দায় প্রবল বাতাসে কিরকির করে ঘুরে যাচ্ছে সাইকেলের চাকা।

শ্যামশ্রীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে যখন উঠে বসল রেবন্ত তখন অবসাদে সে টলছে। তবু কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এসেছে তার। উঠে গিয়ে দরদালানের খোলা দরজা বন্ধ করে খিল দিল। বিছানার দিকে চেয়ে সে দেখল, শ্যামশ্রী তার শরীর ঢাকা দেয়নি। উপুড় হয়ে পড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফোঁপাচ্ছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় অমানুষিক গলায় গোঙানির শব্দ করছে।

এক মুহূর্তের জন্য যেন কী করবে ভেবে পেল না রেবন্ত। কাউকে ডাকবে? পরমুহূর্তেই মনটা কঠিন হয়ে গেল তার। এইটেই তো সে চেয়েছিল। ঠিক এইভাবে বর্বরের মতো ওকে ধ্বংস করতে।

রেবন্ত বাইরের বারান্দার দরজা খুলল। মুখ ফিরিয়ে হিংস্র গলায় বলল, আমি যাচ্ছি। দরজাটা দিয়ে দাও।

বলতে বলতেই সে লক্ষ করে বিছানার গোলাপি ঢাকনায় রক্তের ফোঁটা পড়েছে অনেক। শ্যামশ্রীর মুখের ওপর এলো চুলের ঝাপটা এসে পড়েছে। গভীর যন্ত্রণায় গুমরে মুখটা ফেরাতেই দেখা গেল তার রক্তাক্ত ঠোঁটে, গালে গভীর ক্ষত। স্থির চোখে আরও একটু চেয়ে থেকে রেবন্ত ওর বুকে আর কাঁধে তার নিজের দাঁতের কামড়ে ফুলে ওঠা চাকা চাকা দাগও দেখতে পায়।

রেবন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারল না। তার মনে হল, সে চলে গেলেও শ্যামশ্রী উঠবে না। ঢাকবে না নিজেকে। ঠিক ওইভাবেই পড়ে থাকবে, যাতে বাড়ির লোক এসে তাকে দেখতে পায়। যদি দেখতে পায় তবে রেবন্তর কীর্তির কথাটা চাউর হয়ে যাবে। শ্যামশ্রীর গায়ের সমস্ত ক্ষতচিহ্ন সাক্ষ্য দেবে তার বর্বরতার। শ্যামশ্রী ঠিক তাই চাইবে।

খাটের কাছে গিয়ে রেবন্ত লেপটা টেনে শ্যামশ্রীর শরীরটা ঢেকে দিল। স্থির দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল একটু, তারপর বলল, আমি যাচ্ছি।

জবাব নেই। শুধু গুমরে ওঠার শব্দ হয়। কান্নার একটা ঝলক তরঙ্গের মতো বয়ে যায় শ্যামশ্রীর ওপর দিয়ে। কিন্তু সেই কান্নাও বড় অস্ফুট। বলতে কী শ্যামশ্রীকে কাঁদতে প্রায় কখনওই দেখেনি রেবন্ত। যত যাই

হোক, শান্ত ও কঠিন শ্যামশ্রী কখনওই কাঁদে না। তাই নিজেকে একটু বোকা—বোকা লাগে রেবন্তর। তার ভিতরের গরমটা কমে গেছে। অস্বাভাবিক রাগটা আর নেই। মাথা আর কানের যন্ত্রণার সঙ্গে গভীর একটা ক্লান্তি টের পাচ্ছে সে। এক—একবার মনে হচ্ছে, এ কাজটা ভালো হল না।

কিন্তু শ্যামশ্রী আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। কান্নায় ভেসে গেল না সে। কিছুক্ষণ পড়ে থেকে দাঁতে দাঁত চেপে ধীরে ধীরে উঠে বসল। চুলগুলো সরিয়ে দিল মুখ থেকে। মস্ত মস্ত চোখে গভীর ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখল একবার রেবন্তকে। ঠোঁটের রক্ত ঘন হয়ে থকথক করছে, ফুলে ঝুলে পড়েছে ঠোঁট। গালের দু'জায়গায় কামড়ের দাগ ঘিরে লালচে বেগনি কালশিটে। চেনা মুখটা অচেনা আর ভয়ংকর হয়ে গেছে।

আস্তে উঠে দাঁড়ায় শ্যামশ্রী। ধীরে ধীরে পোশাক পরে। রেবন্তর দিকে তাকায় না।

রেবন্ত বাইরের দরজার কাছে গিয়ে ছিটকিনির দিকে হাত বাড়িয়ে আবার বলল, যাচ্ছি।

শ্যামশ্রী মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তারপর ওই বীভৎস ফোলা, প্রচণ্ড ব্যথার ঠোঁটেও একটু হাসল। সে হাসিতে বিষ মেশানো। উত্তেজনাহীন, অদ্ভুত ঠান্ডা গলায় বলল, তবু যদি মুরোদ থাকত মেয়েমানুষকে ঠান্ডা করার! যদি সেই ক্ষমতাটুকুও দেখাতে পারতে!

রেবন্ত তার পাগলা রাগের চোখে চেয়ে থাকে শ্যামশ্রীর দিকে। শ্যামশ্রী তার বড় ঠান্ডা চোখে চাউনিটা ফেরত দিয়ে বলে, কত বীরত্ব তোমার!

রেবন্ত দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। আর একটুক্ষণ এ ঘরে থাকলে সে শ্যামশ্রীর গলা ধরবে হয়তো।

সাইকেলের চাকাটা কির কির করে ঘুরে যাচ্ছে। রেবন্ত সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ছাদের ঘরে উঠে যায়। পিছনে মৃদু শব্দে শ্যামশ্রীর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

৭

এই যে এত সব বানিয়েছে মানুষ, বাড়িঘর আসবাবপত্তর, আর ওই যে গাছপালা, প্রকৃতির জগৎ, এ সব একটা বেড়ালের চোখে কেমন দেখায়? সে তো বোঝে না কেন এই ঘর বারান্দা, খাট, গদি, কাঠের চেয়ার। সে জানেও না এ সবের দাম বা উপযোগ। তবু সে তো দেখে। কেমন দেখে? কী বোধ করে সে? সে কি অনুভব করে আকাশের নীল, সূর্যের আলো? সে কি লজ্জা পায় মহিলার নগ্নতা দেখে?

রাজু নিবিষ্টমনে পায়ের কাছের বেড়ালটার মাথায় পায়ের চেটো ধীরে ধীরে বুলিয়ে দেয়। মনে মনে প্রশ্ন করে, কেমন রে তুই? তোর চোখ, মন, বুদ্ধি দিয়ে দেখলে কেমন দেখাবে জগৎটাকে? সে কি খুব অন্যরকম? যদি তোর চোখ দিয়ে দেখি তবে কি এই বাড়িঘর হয়ে যাবে পাগলাটে হাস্যকর এক নকশার মতো? অর্থহীন কিছু ধাঁধা? আকাশের নীল রং দেখা যাবে না? জ্যোৎস্না যে সুন্দর তা বুঝতেও পারব না নাকি?

তবে সে কেমন হবে? ভাবতে ভাবতে খুব নিবিড় হয়ে এল রাজুর চিন্তাশক্তি। অল্প অল্প করে সে নিজের ভিতরে একটা বেড়ালের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। বেড়ালের কার্যকারণ জ্ঞান নেই। সে জানে না, বীজ থেকে গাছ হয়। সে জানে না ঘরবাড়ি তৈরি করে মানুষের শ্রম ও বুদ্ধি, সে বোঝে না যুক্তির বিচারে সৌন্দর্যের সার্থকতা। তার জগৎ কেবল গন্ধ, শব্দ ও জৈব বোধ দ্বারা আচ্ছন্ন। অসীম অজ্ঞানতা তার। সুতরাং বেড়ালের চোখে গোটা জগৎকে দেখতে হলে সব বোধ বুদ্ধি ও যুক্তির বিচার ভুলতে হবে। প্রাণপণে রাজু সেই চেষ্টাই করতে থাকে।

ঝোড়ো হাওয়ার মুখে মুখে কখন উড়ে গেছে মেঘ। মাঝরাতে ভাঙা ভূতুড়ে এক চাঁদের কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্নায় চারদিকে গহিন প্রেতরাজ্য জেগে ওঠে। সঞ্চিত জল ঝরে পড়ছে টুপটাপ টিনের চাল থেকে, গাছের পাতা থেকে। কী শব্দহীনতার শব্দ। উঠোন জুড়ে টলটল জলের গাং।

মেঘ কেটে এক মরুণে ঠান্ডা পড়ল চারদিকে। এত শীত যে শরীর পাথর হয়ে যায়। কান—মুখ কম্বলে ঢেকে বারান্দার চেয়ারে বসে পাথর হয়েই থাকে রাজু। এখন বাতাসের শব্দ নেই, মানুষের শব্দ নেই। গভীর

নিস্তব্ধতার মধ্যে সে পা দিয়ে বেড়ালটাকে ছুঁয়ে খুব ধীরে ধীরে বেড়ালের চেতনার মধ্যে ডুবে যেতে থাকে।

ক্ষয়া চাঁদটার দিকে চেয়ে সে ভাবে, বেড়ালের চোখে চাঁদের কোনও অর্থ নেই, নাম নেই, বস্তুজ্ঞান নেই। তা হলে কেমন? চাঁদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে রাজু। ক্রমে ক্রমে বোধ বুদ্ধি, যুক্তি বিচার ও বস্তুজ্ঞান ডুবে যেতে থাকে। হঠাৎ চমকে সে দেখে, আকাশটা এক্সরে প্লেটের মতো স্বচ্ছ, কালো। তার একধারে লাল, রাগী, আগুনের মতো আকারহীন চাঁদ। গ্রহ নক্ষত্র সবই লম্বাটে, আগুনের মতো। চারদিকে ভুসো ছাইরঙা অন্ধকার। কিন্তু তাতে পরিষ্কার বেড়ালের চোখে সে দেখতে পায় লালচে গাছ, লালচে পাতা। অনেক পোকামাকড়ও নজরে আসে তার এই অন্ধকারে।

বুদ্ধিকে আরও ত্যাগ করতে থাকে রাজু। ছেড়ে দিতে থাকে মানুষের বস্তুজ্ঞান। বেড়ালের আত্মীয় হতে থাকে। শুধু চৈতন্যটুকু জেগে থাকে তার। শুধু অনুভব। অনেকক্ষণ চোখ বুজে মনকে স্থির রাখে সে। অনেকক্ষণ। গভীরভাবে ভাবতে থাকে, আমি বেড়াল। আমি বেড়াল। আমি বেড়াল।

ভাবতে ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মানুষের বোধবুদ্ধি নিভে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, সে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাণী। তার গোষ্ঠী নেই, সমাজ নেই, রাষ্ট্র নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। চারদিকে যে রং ও রূপের ঐশ্বর্যময় জগৎ ছিল তা মুছে গেছে। তার নাকে আসে বিচিত্র সব গন্ধ যা কোনওদিন মানুষ হিসেবে সে টের পায়নি। তার সজাগ কানে এসে পৌঁছোয় অদ্ভুত সব দূর ও কাছের আওয়াজ। সামনে মস্ত গাছের মগডালে ঘুমের মধ্যে একটা পাখি একটু নড়ল বুঝি, সেই শব্দও তার কানে আসে। কোনও স্মৃতি নেই, শুধু মস্তিষ্কের কিছু নির্দেশ কাজ করে তার মধ্যে। কোনও চিন্তা নেই, শুধু ক্ষুধা ভয় ও প্রীতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তার বোধ আছে মাত্র। অবাক হয়ে সে দেখে, চারদিকে সব কিছুই আমূল বদলে গেছে। ভারী গোলমেলে সব নকশা, নানা আকার ও আকৃতি, অদ্ভুত সব রং। লাল, গাঢ় লাল, ফিকে লাল, কালো, আবছা কালো, বেগুনি। নাকের কাছে দিপ দিপ করে একটা পোকা জ্বলে আর নেভে। পোকাটাকে খুবই স্পষ্ট দেখতে পায় সে। তার মুখ চোখ পাখনার গতি কিছুই নজর এড়ায় না। একদৃষ্টে চেয়ে সে একটা থাবা দেয়। পোকাটা ওপরে উঠে যায়। নিস্পৃহ লাগে তার। সামনে একটা সমতল, তারপর নিচু, তারপর আবার সমতল। ওদিকে একটা দরজা খুলে যায়। লম্বাটে এক প্রাণী বেরিয়ে এসে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলে। তার কানে গমগম করে শব্দটা। তবে সে বোঝে, এ শব্দে তাকে ডাকা হচ্ছে না। সে জানে, অদ্ভুত একটা শব্দ আছে, যে শব্দ হলেই তাকে কাছে যেতে হবে। সে খাবার পাবে, বা কোলের ওম আর আদর।

রাজু চেয়ে থেকে বুঁদ হয়ে যায়। বেড়ালের চোখে আশ্চর্য এক পৃথিবী দেখতে থাকে। এ যেন দুরূহতম ইমপ্রেসনিস্ট চিত্রকলা। একদিকে চৌকো কিউবিক সব আকৃতি। অন্যদিকে গলে পড়ছে জ্যাবড়া রং। রঙের সঙ্গে আলোর মিশেল। খুব কাছের সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায় সে। একটা পিঁপড়ে হাঁটছে তার থাবার ওপর। কেঁচো বাইছে খুঁটির গায়ে। কিন্তু কেঁচো বা পিঁপড়ে বলে সে চিনতে পারে না এদের। শুধু জানে, কিছু জিনিস চলে, কিছু স্থির থাকে। রাজু অবাক হয়ে দেখে আর দেখে। সে আর মানুষ নেই, বেড়াল হয়ে গেছে।

খুব কাছ থেকে কে যেন তাকে ডাকছে অনেকক্ষণ, সেই ডাক তার বোধের ভিতরে কোনও ঢেউ তোলে না। তারপর আস্তে আস্তে একটা গভীর জলের পুকুর থেকে সে ভেসে ওঠে। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। কিছু বুঝতে পারে না।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে, ঘুমিয়ে পড়েছিলি? ভিতরে গিয়ে শুয়ে থাক না। বসে আছিস কেন?

রাজু কথা বলল না। চেয়ে রইল শুধু। তার বেড়ালের বোধ এখনও সবটা কাটেনি।

রাজু কথা বলল না। চেয়ে রইল শুধু। তার বেড়ালের বোধ এখনও সবটা কাটেনি।

কুঞ্জর হাতে একটা অচেনা জিনিস। একটু চেয়ে অবশ্য রাজু চিনতে পারে জিনিসটা। হটওয়াটার ব্যাগ।

কুঞ্জ রবারের ব্যাগটা টেনেটুনে দেখছিল। বলল, এটা একটু দ্যাখ তো, চলবে কিনা, বহুকাল পড়ে ছিল ঘরে।

রাজু ব্যাগটা হাতে নিল। বারান্দার আলো জ্বেলেছে কুঞ্জ। রাজু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, রবার গলে গেছে। গরম জল ভরলেই ভুস করে ফুটো হয়ে যাবে।

তা হলে অন্য কারও বাড়ি থেকে আনাতে হবে।

কুঞ্জর মুখ কেমন যেন সাদা, চোখে মড়ার মতো দৃষ্টি। মানুষের জগৎ বুদ্ধিতে ফিরে এসে রাজু এখন মাথা ঝাঁকিয়ে বেড়ালের বোধ সবটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, কেষ্টর বউ কেমন আছে?

কুঞ্জ মৃদু স্বরে বলে, ভালো।

টুসিকে সঙ্গে নিয়ে কুঞ্জ কোন বাড়ি থেকে গরম জলের ব্যাগ আনতে যাচ্ছে। রাজু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলে, চল তা হলে তোদের সঙ্গে খানিকটা ঘুরেই আসি।

খানিক পরে কুঞ্জ আর টুসির পিছু পিছু টর্চ আর ভূতুড়ে জ্যোৎস্নার আলোয় জল, এঁটেল কাদা আর গর্তে ভর্তি রাস্তা পেরিয়ে ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছিল রাজু, তখনও তার মনের মধ্যে নানারকম অস্বাভাবিকতা। কোথায় যাচ্ছে তা বার বার ভুলে যাচ্ছিল সে। কেবলই মনে হচ্ছিল, সামনের দুটো ছায়ামূর্তি কেউ নয়। ওরা এক্ষুনি এগিয়ে যাবে, দূরে চলে গিয়ে হারিয়ে যাবে। তখন একা রাজুকে টেনে নেবে উদ্ভিদের জগৎ। টেনে ধরবে গভীর মাটি। রাজুর গতি হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো। এক জায়গায় সে গাছ হয়ে ডালপালায় বাতাস আর রোদ মাখবে সারা দিন, সারা জীবন।

রাতের আর বেশি বাকি নেই। ধোঁয়াটে কুয়াশা ও জ্যোৎস্নায় মাখা অন্ধকারে রাজু কেবলই পিছিয়ে পড়ছে। একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক উঠে আসে বুকে। ডাকে, কুঞ্জ।

সামনে কুঞ্জ টর্চের মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। মাঝখানে টুসি। কুঞ্জ বলে, আয়। বড় পিছিয়ে পড়েছিস। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?

রাজু নিজের সব অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি নিপুণভাবে চাপা দিতে চেষ্টা করে আজকাল। বলে, বড্ড পিছল। আমার অভ্যেস নেই তো।

টুসি মায়াভরা গলায় বলে, ইস! আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে রাজুদা। এলেন কেন?

আগে অনেকবার কুঞ্জদের বাড়ি এসেছে রাজু। কোনওদিনই টুসি বা কুঞ্জর অন্য বোনদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। ওরা বড় বাইরের পুরুষের সামনে আসে না। এবার কেষ্টর বউ যমে—মানুষে টানাটানির মধ্যে পড়ায় টুসির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। এইভাবেই ভাব হয়, ঘটনার ভিতর দিয়ে ঘটনায় জড়িত হয়ে, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে নিতে।

রাজুও প্রাণপণে তাই চায়। পৃথিবীর কোনও—না—কোনও ঘটনার সঙ্গে একের পর এক জড়িয়ে পড়তে। ভালো—মন্দ, সুখ—দুঃখ, জন্ম—মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে সামাজিক হয়ে উঠতে, দায়িত্বশীল হয়ে পড়তে। কিন্তু পারছে না। মনে মনে সে কেবলই ফিরে আসছে ভীষণ ব্যক্তিগত চিন্তায়, সমস্যায়। সে টুসিকে বলে, এলাম। ভালোই লাগছে তো।

প্রাণপণে ওদের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটে রাজু। টুসি সামনে থেকে বলে, রাস্তায় পা দেবেন না। পিছল। ঘাসে পা রেখে আসুন।

কুঞ্জ সামনে থেকে মাঝে মাঝেই টর্চ ঘুরিয়ে ফেলে। বলে, এই তো এসে গেছি।

ফটকে ঢুকে অনেকখানি বাগান পার হয় তারা। তারপর অন্ধকার এক বাড়ির দাওয়ায় ওঠে।

এই তো সেই সুন্দর মেয়েটার বাড়ি। না? কী যেন নাম মেয়েটার! বনশ্রী। হ্যাঁ, বনশ্রীই।

রাজুর বুক ধক ধক করে ওঠে। প্রেম নয়। এত সহজে আর আজকাল প্রেম হয় না। রাজু জীবনে বহু মেয়ের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে। তবু যে বুক ধ্বক করে ওঠে তার কারণ অন্য। সে ভাবে, আহা, ওই মেয়েটা যদি আমার বউ হত! ভাবে, তার কারণ আজকাল তার খুব বিয়ের ইচ্ছে হয়। প্রেম বা কাম বা গেরস্থালির জন্য নয়। সে চায়, সারা রাত তার একজন সঙ্গী থাক। তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সদাসতর্ক একজোড়া চোখ তাকে নজরে রাখুক। তার কথা ভাবে এমন এক ঘনিষ্ঠ হৃদয় বড় চায় সে।

টুসি দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে থাকে, মাসি! ও মাসি। এই বনাদিদি। চিরু। এই চিরু।
বনশ্রীর ঘুমই সব চাইতে পাতলা। বরাবর এক ডাকে ঘুম ভাঙে তার।
আজও ভাঙল। টুসির গলার স্বর না? এমনিতে বনশ্রীর ভয়টয় খুব কম। তবু মাঝরাতে চেনা স্বর শুনেই সাড়া দিতে নেই বা দরজাও খুলতে হয় না। তাই একটু অপেক্ষা করে বনশ্রী।
পাশের ঘর থেকে সবিতাশ্রী পরিষ্কার গলায় বলে ওঠেন, কে রে? কী হয়েছে?
বাইরে থেকে টুসি বলে, মাসিমা, আপনাদের গরম জলের ব্যাগটা নিতে এসেছি। বউদির খুব অসুখ।
দাঁড়া। দিচ্ছি।—বলে সবিতাশ্রী উঠতে যাচ্ছিলেন বোধ হয়।
বনশ্রী লেপ সরিয়ে উঠে পড়ে। বলে, মা, তুমি উঠো না। আমিই উঠেছি।
বউটার কী হয়েছে জিজ্ঞেস করিস তো।—সবিতাশ্রী উদ্বেগের গলায় বললেন।
বাইরের ঘরে এসে বনশ্রী দরজা খোলে এবং একটু সংকুচিত হয়ে পড়ে। টুসির পিছনে কুঞ্জ দাঁড়ানো আর তার পিছনে বারান্দার বাইরে উঠোনের মলিন জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজু।
কপাটের আড়ালে ঘরে এসে বনশ্রী বলে, সাবির কী হয়েছে?
টুসি কলকলিয়ে মিথ্যে কথা বলল, আর বোলো না, পিছল উঠোনে পড়ে গিয়ে খুব লেগেছে।
সর্বনাশ। বনশ্রী একটু শিউরে ওঠে, তারপর চাপা গলায় বলে, পোয়াতি ছিল যে!
সেই তো। রক্ষে হল না বোধ হয়।
দাঁড়া, ব্যাগ এনে দিচ্ছি।
দ্রুতপদে বনশ্রী মায়ের ঘরে ঢোকে। দেয়ালে পুরনো ন্যাকড়ায় বাঁধা ব্যাগটা যথাস্থানে ঝুলছে। এ বাড়িতে সব জিনিস নিখুঁত গোছানো। জায়গার জিনিস সব সময়ে ঠিক জায়গায় পাবে। রবারের ব্যাগটা রাখাও হয়েছে ভারী যত্নে। জল ঝরিয়ে শুকনো করে, ফুঁ দিয়ে একটু হাওয়া ভরে ফুলিয়ে ছিপি এঁটে।
বনশ্রী সেটা এনে টুসির হাতে দিয়ে বলে, কী হবে তা হলে?
কী করে বলি?
আমি যাব?
এত রাতে আর তোমার যেয়ে দরকার নেই। সকালে যেয়ো। যা হওয়ার তো হয়েই গেছে।
সাবি বাঁচবে তো, ও কুঞ্জদা?
কুঞ্জ চুপচাপ ছিল এতক্ষণ, এবার এক পা এগিয়ে এসে বলল, বেঁচে যাবে।
বনশ্রী কুঞ্জর দিকে চেয়ে বলে, চিকিৎসা আপনি করছেন না তো?
কুঞ্জ ম্লান হেসে বলে, না না। আমার ওষুধে ওরা কেউ বিশ্বাস করে না।
টুসি তাড়া দিয়ে বলে, চলো বড়দা।
ওরা চলে যাওয়ার পরও খানিকক্ষণ বনশ্রী দরজা বন্ধ করল না। দু'হাতে দুই পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে মেঘ ভেঙে সামান্য জ্যোৎস্না ফুটেছে। অল্প কুয়াশা। প্রচণ্ড শীত। বনশ্রীর বেশ লাগছিল চেয়ে থাকতে। এমনিতে দেখার কিছু নেই। সেই রোজকার দেখা একই বাগান, গাছপালা। তবু রঙের একটা অদল বদল, দু'—একটা চৌকস তুলির টানে চেনা ছবিটা কত গভীর হয়ে গেছে। রাজু ওদের সঙ্গে এসেছিল কেন তা কিছুতেই ভেবে পায় না বনশ্রী। কেনই বা ওর মন খারাপ!

ঝরঝরে রোদ মাথায় করে ভোর হল। বনশ্রীর দিন শুরু হয় খুব ভোরে। বিছানাপাটি তুলে ঘরদোর গুছিয়ে সে যখন একটু অবসর পেয়ে ভোর দেখতে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল তখনও সে অন্যমনস্ক। সিঁড়ির ধাপে পা রেখে দাওয়ায় বসে সে নিজের একরাশ খোলা চুলের জট ছাড়ায় আঙুলে। আর ভাবে।
বাইরের ঘরে জনা দশ—বারো ছাত্রকে বসিয়ে পড়াচ্ছেন সত্যব্রত। পড়ানোর শব্দ ভালো লাগছিল না বনশ্রীর। খানিকক্ষণ বসে সে উঠে পড়ল। বাগানের ভিতরে বেড়াতে বেড়াতে চলে গেল অনেকটা। নির্জনে

একা একা থাকতে ইচ্ছে করছে আজ। অলস লাগছে।

সাইকেলের শব্দে বনশ্রী ফিরে দেখে, ঝকঝকে মুগার পাটভাঙা পাঞ্জাবি, ধোয়া শাল আর ধবধবে সাদা ধুতি পরা রেবন্ত সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে ফটক দিয়ে সোঁ করে ঢুকে পড়ল। এত সকালেও গালের দাড়ি কামানো। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু মুখখানা গম্ভীর।

দেখে একটু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল বনশ্রী। রেবন্ত অনেকটা এগিয়ে গেছে ভিতরবাগে।

পিছন থেকে বনশ্রী হঠাৎ ডাকল, রেবন্তদা!

সেই ডাকে সাইকেলটা দুটো মস্ত টাল খেল। যেন পড়ে যাবে। পড়ল না অবশ্য। রেবন্ত লম্বা পা বাড়িয়ে ঠেক দিয়ে ফিরে দেখল তাকে।

বনশ্রী হেসে বলল, এত সকালে?

সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়ে রেবন্ত আস্তে আস্তে কাছে আসে। মুখের হাসির একটা চেষ্টা আছে, কিন্তু আসলে ওর মনে যে হাসি নেই তা দেখলেই বোঝা যায়।

হালকা হওয়ার জন্যই বনশ্রী বলল, একেবারে জামাইবাবু সেজে এসেছেন যে! ওমা। কী সুন্দর দেখাচ্ছে।

ফরসা রেবন্তর মুখটা লাল হল একটু। গলা সামান্য ভাঙা, একটু কাশি আছে সঙ্গে। সেই গলাতে বলল, আমি একটা কথা জানতে এসেছি বনা।

কথার ধরনটা খুব ভালো লাগল না বনশ্রীর। একটু যেন ছাইচাপা আগুনের মতো রাগ ধিকিধিকি করছে ভিতরে। বনশ্রী মুখে হাসি টেনে বলল, কী কথা বলুন তো!

শ্যামা আমাকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করে কেন?

বনা তার মস্ত এলোচুলের ঝাপটার আড়াল থেকে বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, আবার ঝগড়া করেছেন আপনারা?

কী করব? ও যে আমাকে কথায় কথায় অপমান করে। বনা, তোমরা সবাই ভারী অহংকারী।

বনশ্রী শ্বাস ফেলে বলে, হবে হয়তো। আপনি নিজেও খুব কম অহংকারী নাকি মশাই? কাল দুপুরে এসে কেমন ব্যবহারটা করে গেলেন মনে আছে?

জামগাছটার নীচে রেবন্ত সাইকেলের ওপর ভর রেখে আধখানা ভেঙে দাঁড়িয়ে। মাথায় কপাল ঢাকা মধু রঙের একরাশ ঘন চুলের ঘুরলি ফণা ধরে আছে। দুধ—সাদা শাল, ঝকমকে মুগা আর ফরসা রঙের ওপর ঝরে পড়ছে অজস্র আলো আর ছায়ার টুকরো। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে ওকে! যেন এই ভোরের আলো থেকে রূপ ধরে এল। কয়েক পলকের রূপমুগ্ধতায় বনশ্রী সম্পর্ক ভুলে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে রেবন্ত যদি বলে, চলো বনা, দুজনে পালিয়ে যাই, তবে বনশ্রী একবস্ত্রে বেরিয়ে যেতে পারে।

মনের ওপর একটু ছায়া ফেলে পাপ—চিন্তাটা সরে যায়। তবু একটু শিহরন থেকে গেল, গা কাঁটা দিয়ে রইল একটু বনশ্রীর। সে কোনওদিন কাউকে ভালোবাসেনি, এখনও বাসে না। তবু এ কী?

চাপা অভিমানে টলমল করছে রেবন্তর মুখ। বলল, আমি এ বাড়িতে আসি বলে তোমরা কিছু মনে করো না তো বনা?

বনশ্রী অবাক হয়ে বলে, ওমা! কী মনে করব?

রেবন্ত অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, তবে শ্যামা আমাকে এখানে আসতে বারণ করল কেন?

বনশ্রী মুখ নামিয়ে বলল, দিদিই বা কেন বারণ করবে?

রেবন্তর চোখমুখ আস্তে আস্তে অন্য একরকম হয়ে যায়। ভিতরে কী একটা তীব্র বেদনাবোধ চেপে রাখছে অতি কষ্টে। চোখমুখ ফেটে পড়ছে রুদ্ধ আবেগে। নাকের ডগা লাল, ঠোঁট কাঁপছে। স্খলিত গলায় বলল, আমি কি না এসে থাকতে পারব? বনা, একদিন তোমাকে একটা ভারী গোপন কথা বলার আছে।

বিহ্বল বনশ্রী উন্মুখ চোখে চেয়ে গাঢ় স্বরে বলে, বলবেন।

এন সি সি—র সিনিয়র ক্যাডেট হিসেবে সে যে রাইফেল ব্যবহার করত সেরকম নয়, অথবা সম্বলপুরে শিকার করতে গিয়ে যে থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালিয়েছে সেরকমও নয়, রাজুর হাতের এ রাইফেলটা প্রচণ্ড ভারী, আকারে বিশাল। ব্যারেলটা কামানের মতো মোটা। একটা ডাবল ডেকার বাসের দোতলার একদম সামনের সিটে বসে আছে সে, হাতের ভারী রাইফেলের নল সামনের খোলা জানালা দিয়ে বাড়ানো। বাসের দোতলাটা একদম ফাঁকা। সামনে নীচে কলকাতার প্রচণ্ড ভিড়ের রাস্তা। বাসটা হরদম চলছে, স্টপ দিচ্ছে না। রাজু ঝাঁকুনিতে টাল্লা খেয়ে যাচ্ছে, রাইফেলের নল জানালার ওপর ঘড়—ঘড় করে গড়িয়ে যাচ্ছে তাতে। কিন্তু এরকম হলে চলবে না। রাজু শক্ত হতে চেষ্টা করে। সামনেই জানালা থেকে সাপের লেজের মতো একটা দড়ি দেখতে পায় এবং তাতে একটা টান দেয়। নীচে ড্রাইভারের কেবিনে টং করে একটা শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসটার গতি কমে আসে।

রাজু রাইফেলটা টিপ করার চেষ্টা করে। তারপর ভাবে, টিপ করার দরকার নেই। এত লোক চারদিকে, গুলি চালালে কেউ না কেউ মরবেই। আর এ কথা কে না জানে যে, সব মানুষই তার শত্রু।

ভাবতে ভাবতে ট্রিগার টেপে রাজু। রাইফেলের কুঁদো ঘোড়ার পিছনের পায়ের মতো লাথি দেয় তাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বোতলের টাইট ছিপি আচমকা খোলার মতো দম করে শব্দ হয়। রাজু দেখতে পায়, রাস্তায় একটা লম্বা লোক সটান শুয়ে আছে।

টং টং। দু'বার দড়ি টানে রাজু। বাস আবার বেটাল হয়ে প্রচণ্ড জোরে ছোটে। রাজু আবার দড়ি টেনে বাসের গতি কমায় এবং খুব লক্ষ্য স্থির করে একটা বেঁটে লোককে মারে। পরের বার মারে একটা মস্তান গোছের ছোকরাকে। গা গরম হচ্ছে তার। টুকটাক এরকম লোক মারতে তার মন্দ লাগছে না। ভিয়েতনামের জঙ্গলে মার্কিন স্নাইপাররা এইভাবেই গাছের ডাল থেকে, ঝোপঝাড় থেকে লুকিয়ে একটা—দুটো করে ভিয়েতকং গেরিলা মারত।

কিন্তু একটা ভারী মুশকিল হল। আগে লক্ষ করেনি রাজু, রাইফেলের নলের মুখটা ফানেলের মতো ছড়ানো। এত বড় মুখ যে, পুরনো আমলের গ্রামোফোনের চোঙের মতো মনে হয়। আর আশ্চর্য এই, সেই চোঙ থেকে লাউডস্পিকারের বিকট শব্দে হিন্দি গান বাজছে। দম মারো দম। কান ঝালাপালা। মাথা গরম হয়ে গেল রাজুর। রাইফেলের ওপরে একটা ঘোড়া টেনে দিল সে। এবার রাইফেলটা হয়ে গেল অটোমেটিক। রাজু ট্রিগার টিপতেই মুষলধারে নল দিয়ে টিরিটিরি টিরিটিরি শব্দে ছুটতে থাকে বুলেট। সেই সঙ্গে পরিত্রাহি গানও বেজে যায়। তুমসে মুহব্বত... প্যার... হাম তুম... এই সব শব্দ গুলিবিদ্ধ হয়েও তার কানে আসে। আর সে দেখে সামনেই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। রাস্তার একধারে দিয়ে বয়ে চলেছে চমৎকার একটা কৃত্রিম খাল, তাতে গণ্ডোলা ভেসে বেড়াচ্ছে। আর একদিকে মাইল মাইল বাগান চলেছে। কিছু অস্বাভাবিক লাগে না তার। সে ঠিকই চিনতে পারে, এটাই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। রাস্তার ওপর হাজার হাজার মানুষ লুটিয়ে পড়ছে গুলি খেয়ে। রক্ত, রক্ত আর লাশ। আর, দম মারো দম।

দৃশ্যটা পালটে যায়। সে দেখতে পায়, কলকাতার ঠিক মাঝখানে একটা ভীষণ উঁচু কনট্রোল টাওয়ারে সে বসে আছে। ঘরটা চক্রাকার, চারদিক স্বচ্ছ কাচে ঘেরা। চারদিকে নিচু জটিল সব যন্ত্রপাতি। সুইচ বোর্ডের সামনে কানে হেডফোন লাগানো গোমড়ামুখো কয়েকজন লোক বসে আছে। বাইরে ঝকঝকে রোদে বহু নীচে দেখা যাচ্ছে শহর। কী সুন্দর শহর। কলকাতা যে অবিকল নিউ ইয়র্কের মতো তা এত ওপর থেকে না দেখলে বোঝাই যেত না। আশি—নব্বুই তলা সব বাড়ি, হাজার হাজার, অফুরন্ত। বহু দূরে আকাশের গায়ে অতিকায় তিমি মাছের পাঁজরের মতো হাওড়া ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। ব্রিজের মাথা এত উঁচু যে তাতে মেঘ এসে ঠেকে আছে একটু। হাওড়া ব্রিজ যে এতটাই উঁচু তা তার জানা ছিল না, কিন্তু অবাকও হল না সে। এত বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে মনুমেন্টটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না সে। বহু খুঁজে দেখতে পেল মনুমেন্টটা খুবই কাছে টাওয়ারের পায়ের নীচে পড়ে আছে। গড়ের মাঠ দেখা যাচ্ছে ডানদিকে যেদিকটায় শেয়ালদা স্টেশন। উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর মধ্যে কয়েকটা একটু হেলে আছে। এত সুন্দর শহর, অথচ মাঝখানটায় একটা কাদাগোলা

জলের পুকুর। পুকুরের চারধারে কচু বন, মাটির পাড়। রোদে কয়েকটা লোক আর মেয়েমানুষ গায়ে মাটি মেখে হাপুস হুপুস স্নান করছে পুকুরে। পাশে মস্ত বটগাছ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যস্মৃতিতে এই পুকুরটার কথাই বলেছিলেন বটে। আজও পুকুরটাকে বুজিয়ে ফেলা হয়নি দেখে ভারী রাগ হল রাজুর। এত সুন্দর শহরের মাঝখানে ওই নোংরা পুকুর কি মানায়? হেডফোনওয়ালা একজন বলে উঠল, নাউ, ইটস অলমোস্ট দি টাইম। এ কথায় রাজুর চৈতন্য হয়। তাই তো! এ শহরটার আয়ু তো মাত্র আর কয়েক মিনিট। কথা আছে, বেলা বারোটা পাঁচ মিনিটে কলকাতায় হাইড্রোজেন বোমা ফেলা হবে। রাজু ঝুঁকে দেখে, পুকুরে স্নানরত লোকজন ছাড়া শহরটা একদম ফাঁকা। রাস্তাঘাট থম থম করছে। নিঃশব্দে প্রহর গুনছে শহর। পশ্চিম দিকে নীল আকাশে ছোট্ট বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে একটা উড়োজাহাজকে। রুপালি মশার মতো। চোখের পলকে মশাটা মাছির মতো বড় হয়ে উঠল। মাছিটা আরও কাছে আসতেই হয়ে গেল ফড়িঙের মতো বড়। তীরের মতো চলে আসছে, পিছনে দুটো টানা ধোঁয়ার লাইন। হেডফোনওয়ালা একটা লোক মাইক্রোফোনে জিরো আওয়ার গুনতে শুরু করে। টেন... নাইন... এইট... সেভেন... সিক্স... ফাইভ... ফোর... থ্রি... টু— উড়োজাহাজ একটা ঝড়ের বাতাস তুলে পলকে মিলিয়ে যায় দিগন্তে। আর হঠাৎ বাঁ দিকে সামান্য একটু ঝলকানি দেখা দেয়। রাজু তাকিয়ে ভাবে, এই নাকি হাইড্রোজেন বোম, ধুস! কিন্তু না। হেডফোনওয়ালা একজন বলে ওঠে, পিছনে তাকান। তাকায় রাজু, আর আতঙ্কে বরফের মতো জমে যায়। পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত এক অতিকায় মহাবৃক্ষের মতো জমাট কালো ধোঁয়া। দিরি দিরি করে সেই ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আরও আরও বিশাল করাল চেহারা নিচ্ছে। একটু গরম লাগছিল বটে রাজুর, কিন্তু একটা লোক একটা টেলিভিশন স্ক্রিনের দিকে চেয়ে বলল, অল ভেপোরাইজড। রাজু ঘুরে দেখে শহরের বাড়ি—ঘর সব ছিটকে আকাশে উঠে কাছে বা দূরে ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে। বাষ্পীভূত অবস্থা কি একেই বলে? শুধু হাওড়া ব্রিজ এখনও আকাশ ছুঁয়ে খাড়া রয়েছে, তার ডগায় এখনও লেগে আছে ছবির মতো স্থির একটু মেঘ। একজন হেডফোনওয়ালা বলে উঠল, আমাদের টাওয়ারের সাপোর্টটা উড়ে গেছে। আমরা এখন শূন্যে, ইন অরবিট। রাজু হাইড্রোজেন বোমার ক্রিয়াকাণ্ড আগে কখনও দেখেনি। এখন খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে কিছু খারাপ লাগছে না। একদিকে ছত্রাকের মতো অতিকায় ধোঁয়ার মিশমিশে কালো মেঘ। সেই মেঘের কোলে কলকাতার সব উড়ন্ত ঘর—বাড়ি। তাদের এই কনট্রোল টাওয়ারের কেবিনটাও নাকি উড়ছে। সে অবশ্য তেমন কিছু টের পাচ্ছে না। কিন্তু সে পরিষ্কার দেখতে পেল, কলকাতার মধ্যিখানে সেই আদ্যিকালের নোংরা পুকুরটার কিছুই হয়নি। তার চারদিকে এখনও সেই কচু বন, মাটির পাড়, একধারে মস্ত বট। মেয়েপুরুষরা এখনও কাদাগোলা জলে ঝুপ ঝাপ স্নান করছে। তারা শুধু এক—আধবার অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর নির্বিকারভাবে স্নান করে যেতে লাগল।

ভীষণ বান আসছে। ভীষণ ঢেউ। কে যে চেঁচাচ্ছিল তা বুঝল না রাজু। কিন্তু বুকের ভিতরে একটা ভয় জলস্তম্ভের মতো খাড়া হয়ে উঠছিল। রেডিয়োতে খুব শান্ত কঠিন গলায় একজন ঘোষক বলে ওঠে: সামুদ্রিক যে ঢেউ কলকাতার দিকে আসছে তার উচ্চতা দেড় শো থেকে দুশো ফুট হতে পারে। রাজু একটা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। যতদূর সে জানে, এ বাড়িটা তাদেরই। দোতলার ব্যালকনির নীচেই একটা নর্দমা। সে দেখে নর্দমার জল হঠাৎ উপচে পড়া রাস্তা ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছে। শুনতে পেল, তাদের কলঘরে এই অসময়ে কল দিয়ে অবিরল জল পড়ছে। বারান্দায় রাখা আধ বালতি জল হঠাৎ ফুলে উঠল, বালতি উপচে বইতে লাগল শানের ওপর। এ কি জলের বিদ্রোহ? এই সব দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলেই সে একই সঙ্গে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। দিগন্তে ও কি মেঘ? আকাশের গায়ে এ প্রান্ত ও প্রান্ত জুড়ে ফ্যাকাশে রঙের ওটা কী তা হলে? ভাবতে হল না। হঠাৎ সে জলের গম্ভীর শব্দ শুনতে পেল। লক্ষ লক্ষ জলপ্রপাতের শব্দ এক করলে যেমনটা শোনায় ঠিক তেমন গম্ভীর গভীর ভয়াল। নীচের রাস্তা থেকে একটা বুড়ো লোক হঠাৎ মুখ তুলে বলল, আগেই বলেছিলুম এ সব জায়গা সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠেছে। যাকে বলে চরজমি। অনেকদিন পই পই করে বলে আসছি এখানে শহর—টহর কোরো না। যার জিনিস একদিন সে—ই নেবে।

এখন হল তো। হুঃ! বলে বুড়ো লোকটা রাগ করে রাস্তার জল ভেঙে চলতে লাগল। রাজু দেখল, কয়েক পলকের মধ্যেই নালা থেকে গড়ানে জল রাস্তায় হাঁটু অবধি হয়ে গেছে। দিগন্তে সেই জলের পর্দা ক্রমে আরও উঁচু হয়েছে। চলন্ত পাহাড়ের মতো আসছে। কলঘরে জলের শব্দ চৌদুনে উঠে গেল। কলের মুখ সেই তোড়ে ছিটকে মেঝেয় পড়ে লাফাতে লাফাতে চলে এল বারান্দায়। রাজু নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল সেটা। কলঘরে হোসপাইপের মতো জল ঘর ভাসিয়ে বারান্দায় চলে আসছে। বারান্দার বালতিটায় জলের মাতন লেগেছে। টলে টলে, নাচতে নাচতে উপচে পড়ছে তো পড়ছেই। বুড়ো লোকটা কি ঠিক বলেছে? সমুদ্র তার হারানো জমি উদ্ধার করতে আসছে নাকি? কিংবা পৃথিবীর সব জলই বিদ্রোহ করেছে সৃষ্টির প্রথম যুগের মতো পৃথিবী আবার জলময় করবে বলে? এ কি জলের বিদ্রোহ? এই কি বিপ্লব? ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক রাজু আচমকা চেয়ে দেখে সব পশ্চাৎভূমি মুছে তার হাতের নাগালেই চলে এল জলের প্রকাণ্ড দেয়াল। এই তো হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। শব্দ হচ্ছে ল—ল—ল—ল। কী প্রচণ্ড গম্ভীর গভীর শব্দ! মাটি কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে। সামনে নিচু একটা ঢেউ ডিগবাজি খেয়ে রোলারের মতো গড়িয়ে আসছে। তার চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের যত নির্মাণ আর প্রতিরোধ। সেই রোলারের পিছনেই মহামহিম অতিকায় জলের দেয়াল। ঘোলা মেটে এবড়ো—খেবড়ো অন্ধ হৃদয়হীন ও নির্বিকার। রাজু শক্ত হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। সে ভাবল, এবার বরং আত্মহত্যা করি, এ রকম ভয় সহ্য করা যায় না। ভাবতে ভাবতে সে লাফিয়ে উঠল রেলিং—এ। ঝাঁপও দিল, কিন্তু নীচে পড়তে পারল না। তার আগেই জলের ঢেউ লুফে নিল তাকে। কোলে নিয়ে তাকে দোল দিল জল। তারপর আস্তে আস্তে তরঙ্গ থেকে তরঙ্গের মাথায় মাথায় তুলে দিতে থাকল। রাজু ওলট পালট খেতে থাকে। টের পা, ক্রমে ক্রমে সে জলের মাথায় চড়ে এক অসম্ভব উচ্চতায় চলে যাচ্ছে। এত! এত জল! এই কি মহাপ্লাবন? তীব্র ঘূর্ণির সঙ্গে পাক খেয়ে ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ রাজু হাতে পেয়ে গেল একটা কার্নিশ। উঠে পড়ল। দেখে, একটা ছোটমোটো ছাদে জনা কুড়ি কাকভেজা লোক বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন বলল, খিচুড়ি হচ্ছে, চিন্তা নেই। রাজুর কথাটা ভালো লাগল। মনে হল, পৃথিবীতে কয়েকটা ভালো লোক আছে এখনও। চারদিকে চেয়ে দেখল, জল ছুটছে নক্ষত্রের বেগে। যেন একটা প্রকাণ্ড জলপ্রপাত শুয়ে পড়েছে হঠাৎ। চারদিকে কিছুই প্রায় নেই। বহু বহু দূরে এক—আধটা বাড়ির ছাদ দেখা যায়। তাতে পিঁপড়ের মতো মানুষ। যে লোকটা খিচুড়ির খবর দিয়েছিল সে এবার বলল, কিন্তু গুনতিতে মেয়েমানুষ বড় কম পড়ে গেল। জল তো কমবেই একদিন, ড্যাঙা জমিও দেখা দেবে। কিন্তু তখন দুনিয়া আবার মানুষে ভরে দিতে অনেক বছর লেগে যাবে। মেয়েমানুষ ছাড়া সে এলেম কারই বা আছে!

পাশ ফিরতেই চটকা ভেঙে রাজু তাকায়, জানলা দিয়ে সাদা ধপধপে একটা রোদের চৌখুপি এসে পড়েছে মেঝে আর খাট জুড়ে। চোখ চেয়েও সে স্পষ্টই সেই জলের শব্দ পাচ্ছিল, সেই উড়ন্ত টাওয়ার আর কলকাতার পথে পথে রক্ত আর লাশ দেখতে পাচ্ছিল স্পষ্ট। এত সত্য, এত স্পষ্ট, এত নিখুঁত কী করে স্বপ্ন হবে? লেপের ভিতরে সে নিজের গায়ে হাত দিয়ে ভেজা ভাব আছে কি না দেখে। ধাতস্থ হতে অনেক সময় লাগে তার। কোথায় সে আছে তা খুব আস্তে আস্তে মনে পড়ে।

হাতঘড়িতে প্রায় সাড়ে নটা। ভারী লজ্জা করতে থাকে রাজুর। অন্যের বাড়িতে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো! কে জানে কী মনে করবে এরা!

কুঞ্জর বিছানায় থাকার কথা নয়, নেইও। ঘর ফাঁকা। দোর ভেজানো। রাজু খুব স্মার্টভাবে তড়াক করে উঠে পড়ে। যতদূর সম্ভব নিজেকে চারদিকের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বাইরে কটকটে রোদের উঠোন, গাছপালা ঘেরা ঘরোয়া বাগান, কুয়ো, কিছু বিষয়কর্মে রত মানুষ। রাজু চারদিকে চেয়ে সবকিছু চিনে নিতে থাকে। হ্যাঁ, এই তো রোদ, মানুষ, গাছপালা। এই তো সব চেনা।

আজকাল প্রতিদিন রাজুকে এই লড়াইটা করতে হচ্ছে। এক কল্পনার থাবা তাকে কেড়ে নেয় মাঝে মাঝে। আবার ছেড়ে দেয় বাস্তবতার মধ্যে। রাজু ভেবে পায় না, সে কি পাগল?

এই নিয়ে তিনবার বনশ্রীর সঙ্গে দেখা হল রাজুর, বেরিয়েই সকালে প্রথম যে মানুষের মুখ দেখল সে বনশ্রী। কেষ্টর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে টুসির সঙ্গে কথা বলছে। গায়ে শান্তিনিকেতনি খদ্দরের চাদর। এত সুন্দর নকশা কদাচিৎ দেখা যায়, মেয়েটার মাথার খোঁপাটা মস্ত বড়। ঘুম থেকে ওঠার পর এই সকালের দিকটায় মুখখানা আরও একটু বেশি লাবণ্য মাখানো, রাজু হাঁ করে দেখছিল। সে মোটেই মুগ্ধ হয়ে যায়নি, প্রেমে পড়েনি, কিন্তু গুলি, হাইড্রোজেন বোমা আর মহাপ্লাবনের পর এই অসম্ভব শান্ত ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমেই একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখতে বেশ লাগছিল তার। যেন কিছুতেই ঠিক বুঝতে পারছিল না এটা স্বপ্ন, না ওটা।

রাজুদা, উঠেছেন!—বলে টুসি হঠাৎ তর তর করে স্রোতের মতো ধেয়ে এল, দাঁড়ান, মাজন এনে দিচ্ছি। বারান্দার কোণে বালতিতে জল রাখা আছে।

বলতে বলতে চড়াই পাখির মতো উড়ে গেল যেন ফুড়ুৎ করে।

এ বারান্দা থেকে ও বারান্দা, মাঝখানে একটু উঠোনের ফাঁকা শূন্যতা। সেই শূন্যতা ভরাট করে বনশ্রী একবার তাকায় রাজুর দিকে। চোখের চাউনির মধ্যে কী দেখল রাজু কে জানে! তার ভিতরে কে যেন ফিসফিস করে বলে ওঠে, এ মেয়েটা প্রেমে পড়েছে। পাপের ছায়া স্পর্শ করেছে ওকে।

বনশ্রী আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিল। কেমন যেন বিভোর ভাবভঙ্গি ওর। যেন নিজের ভিতরে কিছু প্রত্যক্ষ করছে নিবিড়ভাবে। কূট চোখে চেয়ে দেখে রাজু। বনশ্রী উঠোনে নেমে ধীরে ধীরে গায়ে রোদ মেখে, মাথা নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে চলে গেল।

টুসি একটা সাদা মাজনের শিশি এনে বারান্দায় রেখে আবার উড়ে যেতে যেতে বলে গেল, চা আনছি।

সকালের দৈহিক কাজকর্ম বড় ক্লান্তিকর রাজুর কাছে। মুখ ধোও, কলঘরে যাও, ছোট বাইরে—বড় বাইরে সারো।

ধীরে ধীরে প্রবল অনিচ্ছের সঙ্গে সবই সেরে নেয় রাজু। এর মধ্যেই টুসির অনর্গল কথা শুনে নিতে থাকে। কেষ্ট কাল রাত থেকে হাওয়া, বউদির পেটে রাজপুত্রের মতো ছেলে ছিল, নষ্ট হয়ে গেছে। রাজুদা নাকি আজই চলে যাবেন? সে হবে না।

বাইরের দিকে আলাদা একটা ঘরে কুঞ্জর ডিসপেনসারি। আজ রোদ হাওয়ার দিনে একাই বেরিয়ে পড়বে বলে রাজু ঘরের বার হয়ে ডিসপেনসারির দরজায় একটু দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে অনেকগুলো কাঠের বেঞ্চে বিস্তর ছেলে ছোকরা গুলতানি করছে। কয়েকজন বিমর্ষ চেহারার রুগিকেও দেখতে পাওয়া যায়। মাঝখানে একটা চেয়ারে কুঞ্জ বসা, সামনের টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাগজের পুরিয়ায় গুনে গুনে বড়ি ফেলছে। একবার চোখ তুলে রাজুকে দেখে স্মিত হাসি হেসে বলে, উঠেছিস? আয়, বোস এসে।

রাজু বলে, আমি একটু ঘুরে আসছি।

কুঞ্জ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। চলে যেতে গিয়েও রাজু মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। আর চেয়ে থাকতে থাকতেই রাজু হঠাৎ কেমন ঠান্ডা আর শক্ত হয়ে গেল। কুঞ্জ যখন তাকাল তখন রাজু কেন একটা মড়ার মুখের মতো ছাপ দেখল ওর মুখে? কেন দেখল, ওর চোখের মণি ঊর্ধ্বমুখী এবং স্থির? কেন ওর সাদা ঠান্ডা ঠোঁট? পাঁশুটে দাঁত? কেন মনে হল, কুঞ্জর গায়ের চামড়ার নীচে জমাট রক্তের আড়ষ্টতা?

কুঞ্জ কি মরে যাবে? আজ কিংবা কাল?

রাজু ডিসপেনসারির বারান্দা থেকে নেমে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকে। দুর্যোগের পর আজ চারদিকে এক পুকুর রোদ টলমল করছে। টেরিলিনের মতো মসৃণ নীল আকাশ, চারদিকে গাঢ় সবুজ গাছপালার গহিন রাজ্য। রাজু কিছু ভালো করে দেখছিল না। আজ তার কি কোনও অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল কিংবা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়? নাকি এ সব তার আবোল—তাবোল ভাবনা মাত্র?

সামনে আড়াআড়ি পথ পড়ে আছে। রাস্তায় পা দিয়ে রাজু অনেকক্ষণ ঠিক করতে পারল না, কোনদিকে যাবে। ডানদিকের পথটায় ভারী সুন্দর গাছের ছায়া পড়ে আছে। লোকজন নেই। শুধু একটা কুকুর ল্যাং ল্যাং করে হেঁটে চলে যাচ্ছে। রাজু সেই দিকে হাঁটতে থাকে।

ফাঁকা রাস্তায় রাজু একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছিল। গন্ধটা ভালো না মন্দ তা সে বুঝতে পারছিল না। তবে চারদিক থেকে অজস্র অদ্ভুত গন্ধ ভেসে আসছে। তার মধ্যে এই গন্ধটাই তাকে টানছে। বাতাস শুঁকতে শুঁকতে রাজু এগোতে থাকে। অনির্দিষ্টভাবে বেড়াবে বলে বেরিয়ে এসেছে সে, কিন্তু এখন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছিল, তার এই গন্ধটা অনুসরণ করে যাওয়া উচিত। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যেতে হবে তাকে।

মাঝে মাঝে উত্তরের শুকনো ঠান্ডা বাতাসে গন্ধটা হারিয়ে যায়। থমকে দাঁড়ায় রাজু। চারদিকে চেয়ে প্রবলভাবে শ্বাস টানে। আকুলি ব্যাকুলি করে ওঠে বুক। গন্ধটা হারিয়ে গেল না তো! না, আবার পায়। রাস্তা ছেড়ে ঘাস জমিতে নেমে গাছপালার মধ্যে গন্ধটা খুঁজতে হয় তাকে। শুঁড়িপথ ধরে সে তর তর করে এগোতে থাকে। গত রাত্রির জল—কাদায় থকথকে পথটাকে সে গ্রাহ্য করে না। এগোতে হবে। কোথাও পৌঁছোতে হবে।

একটা বাঁশঝাড়ের কোণে ভারী নিস্তব্ধ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পথ ঠিক করতে চেষ্টা করছিল রাজু। সে সময়ে হঠাৎ টের পেল, কাল রাতের মতো আজও সে অন্য এক চোখে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছে। যেন পিছন দিকে তার লেজ নড়ে উঠল হঠাৎ। কান দুটো খাড়া হল। বুঝতে পারল, সে অবিকল কুকুরের চোখে চেয়ে আছে। রোদ, আলো, হাওয়া কোনওটারই আর কোনও অর্থ নেই তার কাছে। তার আছে এক গন্ধের জগৎ। অনেক বিচিত্র শব্দও পায় সে। বহু অদ্ভুত পোকামাকড় দেখে চারদিকে। মাথার মধ্যে কোনও চিন্তা নেই। আছে শুধু এক গন্ধের নিশানা। শুধু জানে, যেতে হবে। কিন্তু যেদিকেই যাক সেদিকেই পথে পথে বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দেখা হবে বলে টের পায় সে। খুবই সতর্কতা দরকার। বহু বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পায় সে। আলো অন্ধকারের কোনও অর্থ নেই তার কাছে। শুধু জানে কখনও সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কখনও আবছা। চারদিকে এখন সেই স্পষ্টতা। এটা খেলার সময়। সে টের পায় কোনও আপনজন নেই। জন্ম বা মৃত্যুর কোনও চিন্তা নেই। অভাববোধ নেই। সে জানে, খুঁজলে খাবার পাওয়া যাবে। দেহের প্রয়োজনে আর একটা দেহ জুটে যাবে ঠিক।

রাজু এগোতে থাকে। গন্ধের রেখাটা মাটির সমান্তরাল এক অদৃশ্য সুতোর মতো চলেছে। কোনও অসুবিধে হয় না। মাঝে মাঝে এক—আধবার ঘুরে পিছনটা দেখে নেয় সে। থমকে দাঁড়িয়ে শব্দ শোনে। কে ডাকল ঘেউ। জবাব দিতে ইচ্ছে হল তার। কিন্তু দিল না। এখন এগোতে হবে।

শুঁড়িপথটা একটু আগেই আর একটা পথে মিশে গেছে। সেখানে গন্ধের সুতো তাকে টেনে নেয় একটা মস্ত ঘেরা বাগানের দিকে। বাগানের ফটকের ভিতরে ঢুকে পড়ে রাজু। গন্ধটা এখানে খুব গাঢ়, ঘন, পুঞ্জীভূত।

গাছপালার ভিতরে একটা নির্জন কোণে ফাঁকা সবুজ একটা মাঠের মতো জায়গা। সেখানে চুপ করে নিঝুম হয়ে বসে আছে মেয়েটি। তোলা হাঁটুতে মুখ, ডান হাতে আনমনে ঘাস ছিঁড়ছে। চেয়ে আছে, কিন্তু বাইরের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। দেখছে নিজের ভিতরের নানা দৃশ্য।

গন্ধটা এইখানে মূর্তি ধরে আছে। উন্মুখ রাজু সামনে দাঁড়ায়। তার ছায়া পড়ে মেয়েটির সামনে।

বনশ্রী চমকায় না। ধীরে মুখ তুলে তাকায়। অনেকক্ষণ লাগে তার পৃথিবীতে ফিরে আসতে।

রাজুরও অনেকক্ষণ লাগে কুকুর থেকে মানুষের অনুভূতি ও বোধে জেগে উঠতে।

তারপর দু'জনেই দু'জনের দিকে ক্ষণকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বনশ্রী ধীরে উঠে দাঁড়ায়, মৃদু স্বরে বলে, আপনি।

যে গন্ধের রেখা ধরে সে এসেছে তার উৎস যে বনশ্রী তা তো রাজু জানত না। কেন সেই গন্ধ তাকে টেনে এনেছে এখানে তাও জানা নেই। কিন্তু মনের মধ্যে জল—বুদবুদের মতো অস্পষ্ট কথা ভেসে উঠছে,

মিলিয়ে যাচ্ছে। একে কি কিছু বলার আছে রাজুর?

এক বিচারহীন অনুভূতির জগৎ থেকে বুদ্ধির জগতে জেগে উঠেছে রাজু। শহুরে অভিজ্ঞতা আর বোধ—বুদ্ধি খেলে যাচ্ছে মাথায়। চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে সামান্য হেসে সে বলে, আপনাদের বাগানটা বেশ। বেড়াতে বেরিয়ে বাগানটা দেখে বড় লোভ হল, তাই ঢুকে পড়েছি।

বনশ্রী হেসে বলে, বাগানটা এমন কী সুন্দর! এখন আর গাছ—টাছ লাগানো হয় না। এমনি পড়ে থাকে। কত জঙ্গল হয়েছে।

রাজু মাথা নেড়ে বলে, সাজানো বাগান আমার ভালো লাগে না।

সাজানো বাগানের কথায় কী ভেবে মুখ নিচু করে একটু হাসে বনশ্রী। রাজু স্পষ্ট দেখল, বনশ্রীর মুখ থেকে মিষ্টি হাসিটুকু ঝরে পড়ল ঘাসের সবুজে, ফুলের পরাগের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়িয়ে গেল বাতাসে, ওর গা থেকে একটা শ্যামল আলো গিয়ে রোদের সঙ্গে মিশে নরম করে দিল আলোর প্রখরতা। ভারী স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারপাশ। দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার নামী কাগজে ইংরিজি আর বাংলায় বুঝে না—বুঝে রাজু আর্ট রিভিউ লিখে আসছে। ছবির চোখ আছে বলেই আবহে ছড়িয়ে যাওয়া হাসিটাকে বুঝতে পারে রাজু। চারদিকে নিবিড় গাছপালার গাঢ় সবুজ, রুপোলি রোদ আর অনেকখানি প্রসারিত ফাঁকা জমির ওপর স্নিগ্ধ শ্যাম মেয়েটির এই ছবি যদি আঁকতে চায় কেউ তবে তাকে খুব বড় দার্শনিক হতে হবে। একটা সবুজ বাগান, কালো মেয়ে বা ফরসা রোদ এঁকে দিতে পারে যে—কোনও ছেঁদো পেইন্টার। গভীর অনুভূতি ছাড়া কী করে টের পাওয়া যাবে এখানে এখন বাতাসের গায়ে রোদের কুঁড়ো ছড়িয়ে রয়েছে? ঘাস থেকে এই যে গাঢ় সবুজ আভা উঠে এসে সবুজে ছুপিয়ে দিল বনশ্রীকে, কে দেখবে তা?

কী করে সাধারণ চোখে বোঝা যাবে, মেয়েটির অনেকখানি গলে মিশে আছে চারপাশের সঙ্গে? কে বুঝবে, পিছনে মস্ত ফাঁকা অনেকখানি ওই যে পটভূমি তা কেন্দ্রাভিগ গতিতে ছুটে আসছে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে? তারা বলছে, সরে যেয়ো না, চলে যেয়ো না। তুমি না থাকলে মূল খিলানের অভাবে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে পটভূমি। সব অন্যরকম হয়ে যাবে।

বনশ্রী মুখ তুলে বলল, কাল সারা রাত আপনাদের ঘুম হয়নি, না? টুসি বলছিল।

টুসি কে মনে পড়ল না রাজুর। কাল রাতে সে কি ঘুমোয়নি। হবেও বা। যা মনে এল তাই বলে দিল রাজু, রাতটা কেটে গেছে কোনওক্রমে। অন্ধকারেই যত গণ্ডগোল। দিনটা কত ফরসা আর স্পষ্ট।

বনশ্রী মায়াভরা মুখে বলল, বেড়াতে এসে কষ্ট পেলেন। আসবেন আমাদের বাড়িতে? আসুন না, চা খেয়ে যাবেন!

সকালে যখন মেয়েটিকে দেখেছিল তখনও রাজুর মনের মধ্যে একটা কালো বেড়াল হেঁটে গিয়েছিল। এখনও গেল। মেয়েটির মুখের উজ্জ্বলতায় মিশে আছে একটু পাপ। চালচিত্রের মতো ঘিরে আছে। পেখম মেলেছে ময়ূরের মতো। এই উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নয়। দূর থেকে কে যেন আয়নার আলো ফেলার মতো বনশ্রীর মুখে অনবরত প্রক্ষেপ করে যাচ্ছে নিজেকে। কোথায় যেন জ্বালা ধরেছে বনশ্রীর। গেঁয়ো মেয়ে, খুব বেশি ভাববার মতো মাথা নয়। তবু সাজানো বাগানের কথা শুনে হেসেছিল কেন? ও কি এখন একটা সাজানো বাগান ছেয়ে ফেলতে চায় ভয়ংকর বন্যতা দিয়ে? ভাঙতে চায় কারও সাজানো সংসার?

রাজু বনশ্রীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, চলুন।

৯

উঠতে গিয়ে মাথাটা পাক মারল একটা। টেবিলটায় ভর দিয়ে সামলে নিল কুঞ্জ। শ্বাস কিছু ভারী লাগছে। বুকে অস্পষ্ট ব্যথা।

সাবিত্রীর বাবা এসেছে। ভিতরবাড়িতে একবার যাওয়া উচিত। কিন্তু বড় দ্বিধা আসছে। দিনের আলো, চেনা মানুষজন, কথাবার্তা কিছুই সহ্য হচ্ছে না তার। একটা অন্ধকার ঘরে একা যদি বসে থাকতে পারত কিংবা যদি চলে যেতে পারত অনেক দূরে!

ডিসপেনসারির দরজা তালা দিয়ে কুঞ্জ খুব ধীর পায়ে যেন হাঁটুভর জল ঠেলে ভিতর বাড়িতে আসে। মুখ তুলে কোনও দিকে চায় না।

সাবিত্রীর ঘরে অনেকের ভিড়। শিয়রের কাছে একটা চেয়ারে সাবিত্রীর বাবা বসে আছে। তাকে ঘিরে মেয়েমানুষেরা একসঙ্গে কথা বলছে সবাই। কুঞ্জ ঘরে ঢুকে সবার পিছনে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ কোনওদিকে চাইতে পারে না। কিন্তু যখন তাকাল তখন যেদিকে, যার দিকে তাকাবে না বলে ঠিক করেছিল তার মুখের ওপর সোজা গিয়ে পড়ল চোখ।

অত ভিড়ের মধ্যেও ফাঁক ফোঁকর দিয়ে সাবিত্রীর অপলক চোখ তার দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁট সাদা, মুখ ফ্যাকাশে, বসা চোখের কোলে দুই বাটি অন্ধকার টলটল করছে। তবু সবটুকু প্রাণশক্তি দিয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে সাবিত্রী। লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, অপরাধবোধ নেই, ধরা পড়বার ভয়ও নেই একরত্তি। কুঞ্জর কাছ থেকে ও কোনও আশ্বাস চায়নি, বিপদ থেকে বাঁচাতে বলেনি, কোনও নালিশ নেই ওর। কুঞ্জর কেমন যেন মনে হয়, সাবিত্রী মানুষকে কুঞ্জর সাথে তার সম্পর্কের কথা বলে দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ওকে বোধহয় ঠেকানোও যাবে না। ও কেমন? বেহেড? মেয়েমানুষের কীই বা জানে কুঞ্জ! ওরা যখন বেহেড হয় তখন বুঝি এরকমই হয়। কই, তনু কোনওদিন কারও জন্য হয়নি তো! বরং নাড়ি টিপে, বুকের স্পন্দন শুনে, রক্তচাপ পরীক্ষা করে ডাক্তাররা যেমন রুগিকে যাচাই করে তেমনি আবেগহীন ঠান্ডা মাথায় তনু তার প্রেমিকদের যাচাই করেছে। মেয়েমানুষ সম্পর্কে ভুল ধারণাটা কুঞ্জর মনে গেঁথে দিয়েছিল সে—ই। ধারণাটা ভাঙল, যদি বেঁচে থাকে কুঞ্জ তবে আরও কত ধারণা ভাঙবে, আরও কত শিখবে সে।

সাবিত্রীর স্থির তাকিয়ে থাকা দেখে কুঞ্জ চমকায় না। কেবল তার ভিতরটা নিভে যায়। ঠান্ডা এক আড়ষ্টতা শরীরে আস্তে আস্তে নেমে আসে। ভালোবাসা কত বিপজ্জনক হয়!

কুঞ্জ দাঁড়ায় না। বেরিয়ে আসে। পিছন থেকে এসে তার সঙ্গ ধরে সাবিত্রীর বাবা। একটু গা শিরশির করে ওঠে কুঞ্জর। ভয়—ভয় করে। বেহেড সাবিত্রী কিছু বলেনি তো! মুখে চোখে তেমন উদ্বেগ নেই, একটু চিন্তার ভ্রূ কোঁচকানো রয়েছে কেবল। বার—বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ওর মা'র হার্টের ব্যামো, দেখবে কে? যেমন আছে থাক, বরং তুমিই দেখো।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে, ক'দিন ঘুরে এলে পারত।

বলতে গিয়ে সে টের পায়, কখন গলাটা যেন ধরে গেছে।

সাবিত্রীর বাবা মাথা নেড়ে বলে, বাড়িতে ওকে দেখবার কেউ তো নেই। এখানে তোমাদের বড় পরিবার, দেখার লোক আছে। আমার সবচেয়ে বড় ভরসা অবশ্য তুমি।

কুঞ্জ মুখ নিচু করে থাকে, বলে এখন কিছুদিন বাইরে গেলে ওর মনটা ভালো হবে। শরীরটা—

সাবিত্রীর বাবা ঝাঁকি দিয়ে বলে, এ অবস্থায়? পাগল হয়েছ? ওর মা'র চিকিৎসা করাতেই আমি ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছি। ঘন ঘন ই সি জি, ওষুধ; সাবি নিজেও তো যাওয়ার কথায় তেমন গা করল না। বলল, এখানে তাকে দেখার লোক আছে।

কুঞ্জর আর কী বলার থাকতে পারে? চুপ করে রইল। সাবিত্রী যাচ্ছে না। তার মানে, সাবিত্রী রইল।

বার—বাড়িতে রওনা হওয়ার মুখে একটু দাঁড়িয়ে সাবিত্রীর বাবা বলে, কেষ্টকে আজ সকালেই বাগনান স্টেশনে দেখা গেছে জানো বোধ হয়?

কেষ্টর নাম কানে আসতেই বুকটা হঠাৎ ক্ষণেকের জন্য পাথর হয়ে যায়। কথা বলতে গলাটা কেঁপে গেল, না তো!

আমার দু'জন ছাত্র দেখেছে। বলছিল। বোধহয় ট্রেন ধরে কলকাতা কি আর কোথাও পালাল। খবরটা সময়মতো পেলে ধরতাম গিয়ে।

পালিয়েছে। কেষ্ট পালিয়েছে। তা হলে কেষ্টর সঙ্গে এখন মুখোমুখি হতে হবে না তাকে! কুঞ্জর মনটায় একটা ভরসার বাতাস দোল দেয়। যদি পালিয়ে থাকে তবে এখনও খুব বেশি লোককে বলে যেতে পারেনি

কেষ্ট। খুব বেশি দুর্বল করে দিয়ে যায়নি কুঞ্জর ভিত। পরমুহূর্তেই কুঞ্জর মনের মধ্যে লুকোনো কাঁটা খচ করে বেঁধে। কেষ্ট নয়, কেষ্টর চেয়ে ঢের বেশি বিপজ্জনক সাবিত্রী।

বাগনানের স্কুলমাস্টার বিদায় নিলে কুঞ্জ খুব আস্তে আস্তে একদিকে হাঁটতে থাকে। আর গভীর চিন্তায় ডুবে যায়।

এই যে এইখানে মস্ত পিপুল গাছ, বহুকাল আগে ছেলেবেলায় এই গাছের তলায় একটা সাদা খরগোশ ধরেছিল কুঞ্জ। খরগোশটা তেমন ছুটতে পারছিল না, একটু যেন খুঁড়িয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে থিরিক থিরিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দামাল কুঞ্জ তাড়া করে করে ধরে সোজা বুকের মধ্যে জামার তলায় চালান করে দিল। আঙুলে কুটুস করে কামড়ে দিয়েছিল খরগোশটা। আজও খুঁজলে ডানহাতের কড়ে আঙুলে স্পষ্ট দাগটা দেখা যাবে হয়তো। কামড় খেয়েও ছাড়েনি। বুকের মধ্যে কী নরম হয়ে লেগে ছিল খরগোশ। নরম হাড়, তুলতুলে শরীর, চিকন সাদা লোম, চুনি পাথরের মতো লাল চোখে বোতামের ফাঁক দিয়ে দেখছিল কুঞ্জকে। চেয়ে কুঞ্জ মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হল, এ আমার। দিন দুই তাদের বাড়িতে ছিল খরগোশটা। রজনীগন্ধা ফুল খেতে ভালোবাসত খুব, কাঠের বাক্সে ঘুমোত। তারপর খবর হল ভঞ্জবাড়ির খরগোশ পালিয়েছে। লোকে খুঁজছে। কুঞ্জর মা খবর পাঠিয়ে দিতে বড় বাড়ির চাকর এসে নিয়ে গেল একদিন। খুব কেঁদেছিল কুঞ্জ। গভীর দুঃখের ভিতর দিয়ে বুঝতে শিখেছিল, এ পৃথিবীতে কিছু জিনিস তার, কিছু জিনিস তার নয়।

এই দিকটা ভারী নির্জন। ভাঁট জঙ্গলের আড়াল। পিপুলের ছায়ায় ভেজা মাটিতে বসে সামনে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে উদাস মাঠখানার দিকে চেয়ে থাকে কুঞ্জ। কী জানি কেন, আজ সেই খরগোশটার কথা তার বড় মনে পড়ছে। কিছু জিনিস তার, কিছু জিনিস তার নয়, এ কথা ভঞ্জদের খরগোশের কাছে শিখেছিল কুঞ্জ। যখন রাত্রিবেলা সব সম্পর্কের বাঁধন ছিঁড়ে নিশি—পাওয়া সাবিত্রী আসত তার কাছে তখন সে কি জানত না, এ হল কেষ্টর বউ? তার নয়?

একটা নোংরা কাদামাখা রোগা ডেঁয়ো পিঁপড়ে তার গোড়ালি বেয়ে উঠে আসছে। পায়ের লোমের ভিতর দিয়ে বাইছে সুড়সুড় করে। হঠাৎ ঘেন্নায় রি—রি করে ওঠে কুঞ্জর গা। পিঁপড়েটা ঝেড়ে ফেলে সে ওঠে, দাঁড়ায়। সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোয়নি কুঞ্জ, তার ওপর রাতে অত ভিজে ঠান্ডা বসেছে বুকে। হঠাৎ দাঁড়ালে, হাঁটতে গেলে টলমল করছে মাথা। ডান বুকে একটা ব্যথা থানা গেড়ে বসে আছে কখন থেকে। গায়ে কিছু জ্বরও থাকতে পারে।

কিন্তু শরীরের এই সব অস্বস্তি ভালো করে টেরই পাচ্ছিল না কুঞ্জ। এঁটেল কাদায় পিছল আলের রাস্তায় ভাঙা জমি আর কখনও আগাছা ভেদ করে হাঁটছে সে। এই পষ্টাপষ্টি আলোয় যতদূর দেখা যায়, এই তেঁতুলতলা বেলপুকুর শ্যামপুর জুড়ে গোটা চত্বরকে সে শিশুবয়স থেকে জেনে এসেছে নিজের জায়গা বলে। এইখানেই তার জন্ম, বেড়ে ওঠা। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ চেনাচেনি। কিন্তু এখন তার কেবলই মনে হয়, এ সব তার নিজের নয়। এ বড় দূরের দেশ। এখানে বিদেশি মানুষের বাস। এ তো তার নয়।

মাথার মধ্যে বিকারের মতো অসংলগ্ন সব চিন্তা ভিড় করে কথা কইছে। একবার যেন সে তনুকে ডেকে বলল, তোমার জন্যেই তো। কোনওদিন বুঝতে দাওনি যে, তুমি আমার নও। যখন পরের জিনিস হয়ে গেলে তখনও মনে হত, তুমি আমার, অন্যের কাছে গচ্ছিত রয়েছ। ভাবতুম একদিন খুব বড় হব, নাম ডাক ফেলে দেব চারদিকে, সেদিন বুঝবে তুমি কাকে ছেড়ে কার ঘর করছ। বুঝলে তনু, আমাদের শিশুবয়স কখনও কাটে না। কোনটা আমার, কোনটা নয় তা চিনতে এখনও বড় ভুল হয়ে যায়।

নিচু একটা জমিতে জল জমে আছে এখনও। কুঞ্জ জলে নামবার মুখে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় জলে। সামান্য বাতাসে জল নড়ছে, তার ছায়াটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। এক দুই পাঁচ সাত টুকরো হয়ে যাচ্ছে কুঞ্জ। এই হচ্ছে মানুষের ঠিক প্রতিবিম্ব। কোনও মানুষই তো একটা মানুষ নয়, এক এক অবস্থায় পড়ে সে হয়ে যায় এক এক মানুষ। আর বেশি দিন নয়, কেষ্ট ফিরবে, বেহেড সাবিত্রী বিকারের ঘোরে প্রলাপের

মতো গোপন কথা বিলিয়ে দেবে বাতাসে। তেঁতুলতলা, বেলপুকুর, শ্যামপুর হয়ে বাগনান পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে কথা। লোকে জানবে জননেতা কুঞ্জনাথ আসলে কেমন মানুষ।

জলের মাঠ পার হয়ে কুঞ্জ ঢালু জমি বেয়ে উঠতে থাকে। সামনেই অনেক ক'টা নারকোল গাছের জড়ামড়ি। তার ভিতরে সাদা উঠোন। দুটো মাটির ঘর।

ভূতগ্রস্তের মতো কুঞ্জ এগোতে থাকে। উঠোনে পা দেওয়ার মুখে একবার ফিরে তাকায়। অনেক দূর অবধি ঢলে পড়েছে গভীর নীল দ্যুতিময় আকাশ। কী বিশাল ছড়ানো সবুজ। কুঞ্জ তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। মনে মনে কেষ্টকে ডেকে বলে, এ সব কিছু নয় রে। সময় কাটতে দে। একশো বছর পর দেখবি আজকের কোনও ঘটনার চিহ্নই নেই পৃথিবীতে। কেউ মনে করে রাখেনি। সময় এসে পলিমাটির আস্তরণ ফেলে যাবে। কুঞ্জ আর সাবিত্রীর কেচ্ছা নিয়ে যেটুকু হইচই উঠবে, পৃথিবীর মস্ত মস্ত ঘটনার তলায় কোথায় চাপা পড়ে যাবে তা। মানুষ কি অত মনে রাখে!

প্রায় মাইল তিনেক একনাগাড়ে হেঁটে এসে কুঞ্জ উঠোনের মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সাদা রোদে কাঁথা মাদুর শুকোচ্ছে, একটা কালো চেহারার বাচ্চা বসে খেলছে আপনমনে। কাক ডাকছে। উত্তরের হাওয়া বইছে গাছপালায়।

কুঞ্জ ডাকল, পটল। এই পটল।

প্রথমে অনেকক্ষণ কেউ সাড়া দিল না। বাচ্চাটা হাঁ করে বোধহীন চোখে চেয়ে রইল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে উঠোনের মধ্যে এগিয়ে যায়। দাওয়ায় ওঠে। ডাকে, পটল।

নোংরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বিশাল চেহারার পটল আচমকা দরজা জুড়ে দেখা দেয়। গলায় কম্ফর্টার, মাথা কান ঢেকে একটা লাল কাপড়ের টুকরো জড়ানো। ক্রুর চোখ, মুখে হাসি নেই। ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, কী বলছ?

কথা আছে।—কুঞ্জ চোখে চোখে বলে, বাইরে আসবি?

আমার শরীর ভালো নয়। হাঁফের টান উঠেছে, পড়ে আছি।—পটল এক পা ঘরের মধ্যে পিছিয়ে যায়, যা বলবার এইখানে বলো।

কুঞ্জ ঠান্ডা গলায় বলে, আমার সঙ্গে লোক নেই রে। ভয় খাস না।

পটল একটু ঝেঁকে উঠে বলে, ভয় খাওয়ার কথা উঠছে কেন বলো তো?

কুঞ্জ খুব ক্লান্ত গলায় বলে, অস্তরটা নিয়ে বেরিয়ে আয়। মাঠবাগে চল, যে জায়গায় তোর খুশি। আজ কেউ ঠেকাবে না। মারবি পটল?

পটল তেরিয়া হয়ে বলে, তোমার মাথাটা খারাপ হল নাকি? ঝুটমুট এসে ঝামেলা করছ? বাড়ি যাও তো বাবু, আমার শরীর ভালো নয় বলছি।

দাঁতে দাঁত চেপে কুঞ্জ গিয়ে চৌকাঠে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, ভ্যাপসা গন্ধ। পটল পিছিয়ে অন্ধকারে সেঁধোয়। কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে, আমি কখনও মিছে বলেছি রে? বিশ্বাস কর, সঙ্গে লোক নেই, লুকোনো ছুরিছোরা নেই। মারলে একটা শব্দও করব না। শুধু দুটো কথা জিজ্ঞেস করব। বাইরে আয়।

পটল বাইরে আসে। দাওয়ায় উবু হয়ে বসে অনেকক্ষণ কাশে, গয়ের তোলে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, কী হয়েছে বাবু তোমার, বলো তো?

কুঞ্জ পাথরের মতো ঠান্ডা গলায় বলে, রেবন্ত আমাকে মারতে চায় কেন বলবি?

পটল ভারী অবাক হয়ে তাকায়। তারপর ময়লা ছ্যাতলা পড়া দাঁত বের করে হেসে বলে, বলছ কী গো! তোমায় রেবন্তবাবু মারতে চাইবে কেন? মাথাটাই বিগড়েছে। বাড়ি যাও তো বাবু।

তুই টাকার জন্য সব করতে পারিস জানি। তোর কথা ধরি না। কিন্তু রেবন্ত কেন চায় তার ঠিক কারণটা বলবি?

ঝুটমুট আমাকে ধরছ বাবু। আমি মরি নিজের জ্বালায়।

ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা কি কিনে ফেলেছিস পটল?

পটল এ কথায় বিন্দুমাত্র চমকায় না। কলাবাগান কেনার জন্য সে বহুকাল ধরে চেষ্টা করছে। কথাটা সবাই জানে। পটল ঝিম ধরে চোখ বুজে থেকে শুধু ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল, বলল, টাকা কই?

কেন, রেবন্ত দেবে না?

পটল একটা ঝোড়ো শ্বাস ছেড়ে বলে, পটলকে সবাই দেওয়ার জন্য বসে আছে! রেবন্তবাবু দেবে কেন বলো তো?

বলে পটল মিটমিটে ক্রুর চোখে কুঞ্জর দিকে চেয়ে থাকে।

কুঞ্জর মাথায় এখনও সঠিক যুক্তি বুদ্ধি ফিরে আসেনি। কেমন ধোঁয়াটে অসংলগ্ন চিন্তা। বলল, হাবুর ঝোপড়ায় কেষ্ট তোদের সঙ্গে রোজ বসে?

পটল একটু চুপ করে থেকে দুঃখের সঙ্গে বলল, তার আর আমরা কী করব বলো। বসে।

কিছু বলে না?

কী বলবে?

বলে না যে—

বড় ঠিক সময়ে কুঞ্জর মুখে বন্ধন পড়ে গেল। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আমার নিন্দে করে না?

তুমি আজ ভারী উলটোপালটা বকছ বাবু।—পটল বিরক্তি প্রকাশ করে মুড়ি দিয়ে বসে। উঠোনের দিকে চেয়ে বলে, নিন্দে করার কী আছে, তুমি কি মন্দ লোক?

কুঞ্জ সামান্য হেসে বলে, তবে কি ভালো? তুই কী বলিস?

পটল আবার হাসল। বলল, লোক ভালো, তবে ডাক্তার ভালো নও। বাপের এলেমদারিটা পাওনি। হরিবাবুর দু ফোঁটা ওষুধে ছ'মাস খাড়া থাকতাম। হরিবাবা গিয়ে অবধি রোগটার চিকিৎসে হল না আর। ভালো করে ভেবেচিন্তে একটা ওষুধ দিয়ো দিকি।

কুঞ্জ চেয়ে ছিল। পটল তার কাছে ওষুধ চাইছে। হঠাৎ খুব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গিয়ে কুঞ্জর বুকটা অনেক হালকা লাগল। এতক্ষণ যে জ্বরটা তার মাথায় বিকারের ঘোর তৈরি করেছিল তা হঠাৎ ছেড়ে গেল বুঝি।

পটলের বউ বাসন্তী কতক কাঁথা কাপড় কেচে নিয়ে এল পুকুরঘাট থেকে। উঠোনে ঢুকে কুঞ্জকে দেখে একটু অবাক। জড়সড় হয়ে বলে, ভালো আছেন তো বাবু?

জেলেপাড়ার মেয়ে বাসন্তীকে চেনে কুঞ্জ। এর আগে আরও দু'বার বিয়ে বসেছিল। কুঞ্জ যতদূর জানে, ওর দু'নম্বর স্বামীকে শিবগঞ্জের হাটে পটলই খুন করেছিল।

বাসন্তীর পিছনে গোটা তিন—চার ছেলে মেয়ে। কুঞ্জ স্থির চোখে চেয়ে দেখে। তিন পক্ষের ছেলেপুলে নিয়েই পটলের ঘর করছে বাসন্তী। গোটা সমাজটা যদি এরকম হত তো আজ বেঁচে যেত কুঞ্জ।

পটল ধীর স্বরে বলল, বাড়ি যাও বাবু।

কুঞ্জ ওঠে। বাইরে এসে উদাস পায়ে ফের তিন মাইল পথ ভেঙে ফিরতে থাকে।

দক্ষিণে শিয়র। শিয়রে খোলা জানালা দিয়ে রোদ হাওয়ার লুটোপুটি। বেলাভর জামগাছে কোকিল ডেকেছে। সেই জানালা দিয়ে বাতাসের শব্দের মতো মৃদুস্বরে ডাক এল, সাবিত্রী।

জেগে ঘুমিয়েছিল সাবিত্রী অথবা ঘুমিয়ে জেগে। হয়তো ঘুমের ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। বার বার ঢুলে পড়ছে ঘুমে, জেগে উঠছে। কখন ঘুম কখন জেগে ওঠা তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না সে। জেগে যার কথা চিন্তা করছে, ঘুমের মধ্যে সে—ই হয়ে যাচ্ছে স্বপ্ন। কাকে ভাবছে? আপনমনে মৃদু হাসে সাবিত্রী। কুঞ্জ ছাড়া কখনও আর কারু কথা তার মনেই আসে না যে। সম্পর্কের কথা তোমরা কেউ বোলো না, বোলো না। বলি, রাধা মেনেছিল? বঙ্কিমের উপন্যাসে শৈবলিনীর বর তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, প্রতাপ কি তোমার জার?

শিউরে উঠে শৈবলিনী বলেছিল, না, আমরা একবৃন্তে দুটি ফুল। সাবিত্রীকে কেউ যদি প্রশ্ন করে, কুঞ্জ কি তোমার প্রেমিক? সাবিত্রী ভেবে পায় না কী বলবে। সে কখনও কুঞ্জকে আপনি থেকে তুমি বলেনি। শরীরের গাঢ়তম ভালোবাসার সময়েও নয়। প্রেমিক নয়, তবে? কী দেখে মজলে সাবিত্রী? ও যে রোগাটে, কালো, ফুসফুসে জখম, ঘাড় শক্ত। কী এমন ও! তার সাবিত্রী কী জানে? কুঞ্জ সুন্দর কিনা তা তো কখনও ভেবেও দেখেনি সাবিত্রী। তবে? আছে, তোমরা জানো না, আছে। ও কি যে সে? বাগনানের জনসভায় সেই প্রায়—কিশোরী বয়সে সাবিত্রী দেখেছিল কুঞ্জকে। কালো, রোগা এক মানুষ হ্যাজাকের আলোয় দাঁড়িয়ে মুঠি তুলে বক্তৃতা দিচ্ছে। সেই অদ্ভুত গম্ভীর, বিষাদময়, তীব্র ও গভীর স্বর যেন দিকদিগন্তে আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল। কারও মনে নেই, কুঞ্জরও না, স্কুলের এক পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রেসিডেন্ট কুঞ্জর হাত থেকে প্রাইজ নিয়েছিল সাবিত্রী। তখন কুঞ্জ দাড়ি কামায় না। অল্প নরম দাড়িতে আচ্ছন্ন শান্ত মুখ, টানা কোমল দুটি চোখে বৈরাগ্যের চাহনি। কতই বয়স তখন কুঞ্জর! তবু সেই বয়সেই সে এ অঞ্চলের প্রধান নেতা। প্রাইজ নিতে আঙুলে আঙুল ছুঁয়েছিল বুঝি। সাবিত্রীর সেই শিহরন আজও রয়ে গেছে। ও কি আমার প্রেমিক? না তো। প্রেমিক বললে যে ভারী ছোট হয়ে যায় ও। তার চেয়ে ঢের বেশি যে। ও কি আমার প্রভু দেবতা? ও সব ভারী বড় বড় কথা। ওতে ওকে মানায় না যে। তবে কী সাবিত্রী? তবে ও তোমার কে? সাবিত্রী মৃদু হেসে বালিশের কানে কানে বলে, ও আমার।

ঘুমিয়ে ছিল কি সাবিত্রী। নাকি জেগে ছিল? ডাক শুনে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে মৃদু ঝংকারে। কিন্তু চমকায়নি সাবিত্রী, তার সমস্ত শরীর ওর ডাকে এমনিভাবে সাড়া দেয়। স্বপ্নোত্থিতের মতো সাবিত্রী মাথাটা তুলে বলে, বলুন।

জানালার ওপাশটা দেখা যায় না। ওপাশে রয়েছে ভাট ঘেঁটুর জঙ্গল, খেতের মাচান। জানালা দিয়ে কিছু গাছপালা, আকাশের নীল চোখে পড়ে।

মৃদু বাতাসের মতো স্বর বলে, আমার সব নষ্ট হয়ে গেল। আমরা এ সব কী করলাম?

বিমুগ্ধা সাবিত্রী মৃদু একটু হাসে। বালিশে কনুইয়ের ভর রেখে করতলে গাল পেতে বলে, আপনি কেন নষ্ট হবেন? পুরুষদের তো দোষ লাগে না।

কে বলল দোষ লাগে না? জানাজানি হয়ে যাবে সাবিত্রী। তখন আমার যেটুকু ছিল তাও নষ্ট হয়ে যাবে।

সামান্য একটু ভাবে সাবিত্রী। তারপর বলে, আপনি তো সকলের মতো সাধারণ মানুষ নন। আলোর গায়ে কি ছায়া পড়ে?

ও সব বই—পড়া কথা। তোমার নিজের বিপদের কথাও কি কখনও ভাবো না সাবিত্রী।

সাবিত্রী আপনমনে অদ্ভুত একটু হেসে বলে, পোয়াতির পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গেল, আর কী বিপদ হবে?

বাইরে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে। মৃদু স্বরে বলে, আমি মরে গেলে সব মিটিয়ে নিয়ো সাবিত্রী। কাউকে আমার কথা বোকার মতো বলতে যেয়ো না। আমি তোমার ভালো চাই।

সাবিত্রী উৎকর্ণ হয়। সচকিত হয়। কষ্টে উঠে বসবার চেষ্টা করতে করতে বলে, ও কথা কেন বলছেন? মরবেন কেন? মরা কি আপনাকে মানায়? শুনুন, আমি না হয় আর কখনও কাউকে বলব না।

কিন্তু জানালার ওপাশে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই, টের পেল সাবিত্রী। নিমীলিত চোখে সে ধীরে ধীরে বালিশে মাথা রাখল। প্রথমে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল চোখের কোল বেয়ে। তারপর আবার কান্না। আমি যে মরার কথাও ভাবতে পারি না। মরলে ভালোবাসব কী করে? ভালোবাসা—নিদানে, পালিয়ে যাওয়া বিধান বঁধু পেলে কোনখানে?

১০

ভিতরের বারান্দায় কাঠের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে কোলে খাতা রেখে রাজু পেনসিলে দ্রুত হাতে চিরশ্রীর স্কেচ আঁকছে। তাকে ঘিরে ছোট একটা ভিড়।

এ পর্যন্ত গোটা সাতেক স্কেচ এঁকে দিয়েছে রাজু। বনশ্রীর, সবিতাশ্রীর, সত্যব্রতর, শুভশ্রীর, আর কিছু পাড়া—পড়শির। তার আগে ভরাট গলায় শুনিয়েছে রবীন্দ্রসংগীত। ফাঁকে ফাঁকে পলিটিক্স আর আর্ট নিয়ে দেদার কথা বলেছে। হাত দেখেছে সকলের। খেয়েছে অন্তত চার কাপ চা, ওমলেট, চালকুমড়োর পুর ভাজা। অবশেষে সবিতাশ্রী বলেছেন, আজ আর দুপুরে কুঞ্জদের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। যা অঘটন ঘটল ওদের বাড়িতে। খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, এবেলা তুমি এ বাড়িতে খাবে।

এ কথা শুনে রাজু হঠাৎ মুখ তুলে বনশ্রীর দিকে চেয়ে ফেলল। তারপর প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করল, কোন বইতে সে যেন ঠিক এইভাবে প্রেম হওয়ার কথা পড়েছিল। শরৎচন্দ্র? হবে। কিন্তু একসময়ে এরকম ভাবেই প্রেম হত।

তবে রাজু নেমন্তন্নটা নিয়ে নিল।

সবিতাশ্রী একটু দেরিতে হলেন, কিন্তু সত্যব্রত মুগ্ধ হয়েছেন অনেকক্ষণ আগেই। এ ছোকরা একে বিখ্যাত আর্ট ক্রিটিক, তার ওপর কলকাতার ছেলে। শ্যামশ্রীর বিয়ের পর সত্যব্রত মনে মনে স্থির করে রেখেছেন আর কোনও মেয়ের বিয়ে গাঁয়ের ছেলের সঙ্গে দেবেন না। কলকাতায় দেবেন। সেই ছেলেই বুঝি আজ হেঁটে এল ঘরে। কী ভালো ছেলে। কী চোখ আর চালাক। কত খবর রাখে। তার ওপর সান্যাল, বারেন্দ্র, স্বঘর। এত যোগাযোগ একসঙ্গে হয় কী করে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকে? সবিতাশ্রী রান্নাঘর গেলে তাঁর পিছু পিছু সত্যব্রতও গেলেন। নিচু স্বরে কথা বলতে লাগলেন দু'জনে।

সেই ফাঁকে রাজু মুখ তুলে বনশ্রীকে বলল, এভাবেও হয়।

বনশ্রী সিঁড়ির ধাপে বসে ছিল। চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি। এর আগে সে কোনওদিন প্রেমে পড়েনি। আজ একদিনে দু'বার পড়ল কি? সে বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল, কী?

রাজু ফের স্কেচ করতে করতে বলে, কোথায় যেন পড়েছিলাম। আগে এইভাবে হত। প্রথম যাতায়াত তারপর খাওয়া—দাওয়া, তারপর—

থেমে চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে রাজু ফের বলে, এ ভাবেও হয়।

স্কেচটা শেষ করে পাতাটা ছিঁড়ে চিরশ্রীর হাতে দিল রাজু। কিশোরী মেয়েটির লাবণ্যে ঢলঢল মুখ আলোয় আলো হয়ে গেল নিজের অবিকল ছবি দেখে।

পরের পাতায় রাজ দুটো নিখুঁত বৃত্ত আঁকল পাশাপাশি। তারপর মৃদু একটু হাসল। বনশ্রী একটু ঝুঁকে এল দেখতে। বলল, এটা কী?

বলুন তো কী?

বনশ্রী তার বিশাল চুলের বোঝা সমেত মাথাটা ডাইনে—বাঁয়ে নেড়ে বলে, জানি না তো কী আছে আপনার মনে।

রাজু দুটো বৃত্তকে ভরে দিল স্পোক দিয়ে, আঁকল মাডগার্ড, হ্যান্ডেল, সিট।

বনশ্রী ভ্রূ তুলে বলে, ও মা! একটা সাইকেল!

একটা সাইকেল। অনেকক্ষণ ধরে সাইকেলটাকে টের পাচ্ছে রাজু। খুব দূরে নয়। একটা সাইকেল গাছপালার আড়াল দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরছে, ঘুরছে, ঘুরছে। ঝরে পড়া শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কখনও উঁচু নিচু খানা—খন্দে ঝাঁকুনি খেতে খেতে, অপথ কুপথ দিয়ে চলেছে অবিরাম। উৎকর্ণ হয়ে সাইকেলের শব্দ শোনে রাজু। মনের পর্দায় আবছা দেখতে পায় সাইকেলের ছায়া। চোরের মতো, ভয় দ্বিধা লজ্জায় জড়ানো তার গতি। কিন্তু ঘুরছে। অনেকক্ষণ ধরে এ বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে চলেছে। একবার, দু'বার তিনবার করে অসংখ্যবার। এক—একবার যেন আবর্তন পথ থেকে সরে যাবে বলে সাইকেলের মুখ ফেরাতে চাইল অন্যদিকে। পারল না। কেন্দ্রাভিগ এক আকর্ষণ টেনে রাখল তাকে।

রাজু সাইকেলের ছবিটা শেষ করে বলে, একটা সাইকেল হলে বহু দূর ঘুর আসা যেত। একটা সাইকেল কত কাজে লাগে।

বনশ্রী খুব হেসে বলে, সাইকেল চাই বললেই তো হয়। আমাদের বাড়িতে দু'—দুটো সাইকেল।

রাজু সে কথার জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভ্রূ কোঁচকানো, চোখে তীক্ষ্ন দৃষ্টি। আপন মনে বলে, অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছে সাইকেলটা।

বনশ্রী সামান্য অবাক হয়ে বলে, কে ঘুরছে? কার সাইকেল?

আছে।—বলে উঠোনে নেমে পড়ে রাজু। একটা সাইকেলের ছায়া, মাটিতে চাকা গড়িয়ে যাওয়ার একটা অস্পষ্ট শব্দকে লক্ষ্য করে এগোতে থাকে।

বাড়ির পিছন দিকে মস্ত খড়ের টাল, ধানের গোলা। সবজির খেত। কপিকল লাগানো একটা কুয়ো থেকে কালো একটা মেয়েছেলে জল তুলছিল, অবাক হয়ে দেখল একটু। খেত ডিঙিয়ে রাজু এগোতে থাকে। অনেকটা জমি পার হয়। সামনে কোমর সমান উঁচু ঘাসের মতো এক ধরনের জঙ্গল।

পিছনে তিরতিরে পায়ে বনশ্রী এগিয়ে আসতে আসতে ডাকে, শুনুন, শুনুন, কোথায় চললেন? ও দিকে পথ নেই যে।

মানুষের ভাষা রাজু বুঝতে পারে না আর। হিলহিলে সরীসৃপের মতো পিছল গতিতে এগিয়ে যায় সে। চোখে বহু দূরবর্তী এক সাইকেলের ছায়া, কানে মৃদু সাইকেলের শব্দ। ঘাসজঙ্গল মুহূর্তে পার হয়ে যায় সে। সামনে শ্যাওলা ধরা ইটের দেওয়াল। খুব উঁচু নয়। বুকে ভর রেখে রাজু দেয়ালের ওপর ওঠে। উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শোনে।

বনশ্রী ঘাসজঙ্গল ভেদ করে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ডাকছে, শুনুন, ও মশাই, পড়ে যাবেন যে। কী করছেন বলুন তো?

মাতালের মতো টলতে টলতে সাইকেলটা আসছে। বড় ধীর গতি। ডান দিক থেকে মোড় ফিরে একটা কাঁচা নর্দমা পার হল ঝকাং করে। খানিকটা উঁচু জমি বেয়ে উঠে এল কষ্টে। সাইকেলটার গা ধুলোয় ধুলোটে, পিছনের টায়ারে হাওয়া নেই, তেলহীন ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে যন্ত্রপাতির।

একদৃষ্টে সাইকেলটা দেখল রাজু। এত ক্লান্ত সাইকেল সে আগে কখনও দেখেনি। সামনে সাদা ধুলোর পথের ওপর পড়ে আছে চাকার অসংখ্যবার পরিক্রমার ছাপ।

রাজু বিড়বিড় করে বলে, এ ভাবেও হয়।

ভেবে দেখলে কাজটা খুব সহজ নয়। গলায় ফাঁস আটকে টেনে ধরলে মরতে শ্যামশ্রীর দু'মিনিট লাগবে। তারপর সিলিং—এর আংটায় ঝুলিয়ে তলায় একটা টুল কাত করে ফেলে রাখলে হুবহু আত্মহত্যার মতো দেখাবে। কিন্তু সন্দেহের উর্ধ্বে কি তবু থাকতে পারবে রেবন্ত? পুলিশ খোঁজ করবে আত্মহত্যা কবুলের চিঠি। আর, আত্মহত্যা করার সময়ে কেউ ঘরের দরজা খুলে রেখে মরে না তো, রেবন্ত বাইরে থেকে কী করে ভিতরে দরজায় খিল দেবে?

একটা হয়, যখন পুকুরে যাবে তখন জঙ্গুলে পথটায় যদি মাথায় ইট মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া যায়। বাদবাকি রাস্তাটুকু টেনে নিয়ে জলে ফেলে দিলেই হল। পরিষ্কার অ্যাকসিডেন্টের মামলা। অবশ্য শ্যামা সাঁতার জানে, সুতরাং পুলিশের সন্দেহ থেকেই যাবে। মাথার চোটটাই বা গোপন করবে কীভাবে? আর লোকের চোখে পড়ার ভয়ও থেকে যাচ্ছে না। পুকুরঘাট তো বাথরুম নয়।

যদি শ্যামাকে নিয়ে পাহাড়ে বেড়াতে যায় রেবন্ত? খুব উঁচু পাহাড় হবে, খাড়াই। একদম ধারে চলে যাবে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে। শেষ সময়টায় একটু চমকে দিতে হবে ওকে। সতর্কতা হারিয়ে ফেলবে তখন। সামান্য একটু ধাক্কা মাত্র। একটু সাবধান হতে হবে রেবন্তকে, শেষ সময়ে না পড়বার মুহূর্তে তাকে আঁকড়ে ধরে। যেভাবে মারলে কাজটা অনেকখানি বিপদমুক্ত। খোঁজখবর কি আর হবে না? রেবন্ত তো হোটেলে নিজের আসল নাম—ঠিকানা লেখাবে না। খোঁজ করে হয়রান হবে পুলিশ।

খবরের কাগজে পড়েছে রেবন্ত, দিঘার সমুদ্রের ধারে কটেজে কয়েকটাই খুন হয়েছে। মেয়েটার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুরুষটা লোপাট। দিঘা খুব দূরেও নয়। যাবে? কিন্তু পুলিশ নয় তার খোঁজ নাই পেল, বাড়ির লোক কিছু জানতে চাইবে না? শ্যামশ্রীর বাড়ি থেকে জিজ্ঞেস করবে না, শ্যামাকে কোথায় রেখে এলে বেরন্ত? একটা উপায় আছে অবশ্য। রেবন্ত রটিয়ে দেবে, শ্যামা আর একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। খুব অবিশ্বাস্য হবে না। ওদের রক্তে চরিত্রহীনতার বদরক্ত কি নেই? কেন, সেই মাসি, যে বিয়ের আগে ছেলে প্রসব করেছিল?

কিন্তু যত দিক ভেবে দেখে রেবন্ত, কোনও দিকই নিরাপদ মনে হয় না। সন্দেহ থেকে যাবে, বিপদ থেকে যাবে।

কিছু করতেই হবে যে রেবন্তকে! এতদিন বনশ্রী সম্পর্কে তার কিছু অনিশ্চয়তা ছিল। আজ সকালে অঝোর আলোয় স্বচ্ছ জলের মধ্যে রঙিন মাছের মতো সে দেখেছে বনশ্রীর হৃদয়। এতটুকু সন্দেহ নেই আর। বনশ্রীর এই দুর্বলতাটুকু কতদিন থাকবে তার কোনও ঠিক তো নেই। তাই দেরি করতে পারবে না রেবন্ত।

পটলকে বলবে? ভাবতে ভাবতে ব্রেক কষে রেবন্ত। সাইকেল থেমে টলে পড়ে যেতে চায়। পায়ে মাটিতে ঠেকা দিয়ে রেবন্ত একটু ভেবে মাথা নাড়ে। মেয়েছেলে মারতে চাইবে না পটল। নিজের বউকে ও বড় ভালোবাসে। তবে ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা কেনার বড় ইচ্ছে ওর। রাজি হতেও পারে।

প্যাডেলে আবার ঠেলা মারে রেবন্ত। গত রাত্রির জল রোদের প্রচণ্ড তাতে টেনে গিয়ে এখন ধুলো উড়ছে। থেমে গেছে রেবন্ত। মুগার পাঞ্জাবি, সাদা শাল, কাঁচি ধুতির আর সেই জেল্লা নেই। তার মুখ শুকিয়ে চড়চড় করছে এখন। তবে চলেও যেতে পারে না সে। আর একবার বনশ্রীর গভীর দৃষ্টি দেখবে না? আর একবার শিউরে দেবে না ওকে? কী করে চলে যাবে সে? কত সহজেই ওদের বাড়িতে এতদিন হুটহাট এসে ঢুকে গেছে রেবন্ত, কিন্তু আজ সকালের দুর্বলতাটুকুর পর আর কিছুতেই ফটক পেরোতে পারছে না। এক টান—সুতোয় বাঁধা সে সম্মোহিতের মতো পাক খেয়ে যাচ্ছে কেবল! কখন কোন কাঁটায় লেগে পিছনের চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেছে, উঁচুনিচু পথহীন জমি, আগাছা, খানাখন্দ দুরমুশ করে চলেছে অবিরাম সাইকেল। বড় ক্লান্ত হয়েছে শরীর। প্রতিবারই মনে হয়, এবার চলে যাব, আর ফিরব না।

চলে গিয়েওছিল রেবন্ত। তেজেনের দোকান অবধি। আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরে যাওয়ার মুখে মন ডাক দিল, আর একবার দেখে যাই। এরকম কয়েকবারই চলে গিয়ে ফিরে এসেছে রেবন্ত। ঘুরছে আর ঘুরছে। বাগানের অত ভিতরে গভীরে কেন বাড়ি করলে তোমরা বনা? কেন এত দুর্লভ হলে?

ভ্রূ কুঁচকে আনমনে শ্যামার কথা মাঝে মাঝেই ভেবে দেখে সে। না মেরেও হয়। যদি বনশ্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাই? থাক না শ্যামা বেঁচেবর্তে।

সব দিক ভেবে দেখছে রেবন্ত। পালানোও বড় মুখের কথা নয়। চাকরির প্রশ্ন, আশ্রয়ের প্রশ্ন, টাকার প্রশ্ন নেই? ভাবতে হবে। অনেক ভাবতে হবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।

কাঁচা নর্দমার ওপর প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সাইকেলের চাকা গেল। নিচু দেয়ালের ওপর দিয়ে বার বার ভিতরবাগে চেয়ে দেখেছে রেবন্ত। শুধু গাছপালা, দূরে একটা কপিকলের মাথা, বাড়ির ছাদ। আর কিছু দেখা যায় না।

উলটো সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখে সে। যদি শ্যামা না—ই মরে, যদি পালানোও ঘটে না—ই ওঠে, তবে একদিন নির্জনে বনশ্রীকে সম্মোহিত করবে রেবন্ত। হয়তো বাধা দেবে বনশ্রী। সব বাধা কি মানতে হয়? শরীরে শরীর ডুবিয়ে দেবে জোর করে। তখন সুখ। এতদিন এত সহজে এ সব কথা ভাবতে পারেনি সে। কাঁটা হয়ে ছিল কুঞ্জ। ঘাড় শক্ত, রোগা গড়নের তেরিয়া কুঞ্জ। নীতিবাগীশ, অসহ্য রকমের সৎ ও বিপজ্জনক রকমের সমাজ—সংস্কারক।

হেসে ওঠে রেবন্ত। বেলুন চুপসে গেল রে কুঞ্জ? শেষে ভাদ্দর—বউ? হাঃ হাঃ! হাসতে হাসতে বুঝি চোখে জল এসে যায় তার। শেষে কেষ্টর বউ? বেড়ে! বাঃ। এই তো চাই। জুজুর মতো তোকে ভয় খেতুম যে রে! অ্যাঁ, ভাবতুম যা—ই করি কুঞ্জ ঠিক টের পাবে। কুঞ্জর হাজারটা কান, হাজারও চোখ। ঠিক এসে পথ আগলে দাঁড়াবে। গুপ্ত কথা টেনে বের করবে পেট থেকে। শেষে ভাদ্দর—বউ কুঞ্জ? অ্যাঁ!

রেবন্ত মাথা নাড়ে। বড় কষ্টে প্রাণপণে প্যাডেল মেরে একটা উঁচু জমিতে ঠেলে তোলে হাওয়াহীন সাইকেল। কপালের ঘাম মুছবে বলে রুমালের জন্য পকেটে হাত দেয়। তারপরই ভীষণ চমকে যায় সে। সামনের পথের ওপর লাফিয়ে নামল, ও কে? রাজু না?

সাইকেলের হ্যান্ডেল টালমাটাল হয়ে যায়। প্রাণপণে সামনের চাকা সোজা রাখে রেবন্ত। খুব জোরে প্যাডেল মারতে থাকে। সাইকেল ধীরে ধীরে এগোয়।

রেবন্ত শক্ত করে মাথা নামিয়ে রাখে, যাতে চোখে চোখ না পড়ে যায়। হয়তো রাজুর তাকে মনে নেই, হয়তো চিনতে পারবে না। রেবন্তও চেনা দেবে না।

তবু বুক কাঁপতে থাকে তার। কাল রাতে অন্ধকারেও তাকে দেখেছিল নাকি রাজু? চিনেছিল? এ পথে ও ফাঁদ পেতে বসে ছিল নাতো! দাঙ্গাবাজ ছেলে রাজু। হামলা করবে না তো?

কিন্তু রাজু কিছুই করে না। সাইকেল ওর খুব কাছ ঘেঁষে পেরিয়ে যায়। রেবন্ত মাথা তোলে না। কিন্তু খুব জোরে প্রাণপণে চালাতে থাকে তার সাইকেল। কিন্তু হাওয়াহীন চাকা এবড়ো—খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে ক্লান্ত শরীরে তেমন টানতে পারে না। ভারী ধীরে চাকা ঘুরছে।

পিছু ফিরে চোর—চোখে চায় রেবন্ত। আবার চমকে যায়। রাজু আসছে একটু লম্বা পায়ে, তার দিকে স্থির চোখ রেখে হেঁটে আসছে রাজু। মন্থর সাইকেলের সঙ্গে সমান গতিবেগ বজায় রেখে।

প্রাণপণ চেষ্টা করে রেবন্ত। সিট থেকে উঠে শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে চেপে ধরে প্যাডেল। নির্মম পায়ের লাথিতে দাঁতে দাঁত চেপে সাইকেলটাকে নির্যাতন করে। কিন্তু নিঃশেষ আয়ুর মতো সাইকেলের গতি ক্রমে আরও কমে আসতে থাকে। রাজু এগিয়ে আসছে। খুব জোরে নয়। প্রায় স্বাভাবিক হাঁটার গতিতে। কিন্তু রেবন্তর সাইকেল যেন আজ এক কোমর জলের মধ্যে নেমেছে। এগোয় না, পালাতে চায় না, ধরে দেবে বলে কেবলই পেছিয়ে পড়ে।

রাজু আসছে। রেবন্ত রাস্তায় উঠে মাঠের দিকে সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পিচ রাস্তা ধরলে অনেকখানি পথ। অত পথ পেরোতে পারবে না। কোনাকুটি মাঠ পেরোলে খালের সাঁকো পেরিয়ে বাজারে উঠলেই সাইকেল সারাইয়ের দোকান।

রেবন্ত পিছনে তাকায়। রাজু স্থির চোখে চেয়ে সোজা চলে আসছে। আসছেই। যদি ধরতে চায় তবু একটু জোরে পা চালালেই ধরতে পারে। তা করছে না রাজু। সে সমান একটা দূরত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু আসছে।

বহুকাল এমন শরীরে কাঁটা দেয়নি রেবন্তর। মাঠের গড়ানে জমিতে সাইকেল ছেড়ে দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে নামতে নামতে তার মনে হল, এই নির্জন মাঠে রাজুর মুখোমুখি হওয়া কি ঠিক হবে?

আবার তাকায় রেবন্ত। একই গতিতে রাজু আসছে। তার পিছু পিছু। মাঠের ঢালু বেয়ে ওই নামল। এখনও একটু দূরে। তবে অনেকটা কমে আসছে দূরত্ব।

মাঠের মধ্যে উলটোপালটা হাওয়ায় সাইকেল টাল খায়। বেঁকে যায় হাতল। এগোয় বটে, কিন্তু বড্ড পিছনের টান। কোত্থেকে এল রাজু? কী করে টের পেল সে ওই পথ দিয়ে সাইকেলে আসবে?

রেবন্ত পিছনে আর একবার চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। জোরে চালাতে চেষ্টা করে লাভ নেই। রাজু ঠিক তার পিছনে এসে গেছে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে আলতো করে ছুঁয়ে আছে ক্যারিয়ার।

রেবন্ত ব্রেক চেপে ধরে। নামে। বলে, রাজুবাবু, কেমন আছেন?

রাজু অবাক হয়ে তার দিকে চায়। অনেকক্ষণ ধরে দেখে তাকে। বলে, আরে! রেবন্তবাবু না?

চিনতে পারছিলেন না?—কাঠ—হাসি হেসে রেবন্ত বলে।

না তো! আপনাকে লক্ষ করিনি। আমি শুধু সাইকেলটা দেখছিলাম।

সাইকেল!—বলে বুঝতে না পেরে রেবন্ত রাজুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ কোন শহুরে চালাকি বাবা!

মায়া ভরে সাইকেলের সিটে হাত রেখে রাজু বলে, সাইকেলের মতো জিনিস হয় না। একটা সাইকেল থাকলে কত দূর চলে যাওয়া যায়!

বড্ড ঘেমে যাচ্ছে রেবন্ত। কিছুতেই বুঝতে পারছে না, বিপদটা কোন দিক দিয়ে আসবে। সাইকেলের প্রসঙ্গটা একদম ভালো লাগছে না তার। রুমালে ঘাড় গলা মোছে রেবন্ত। ভাববার সময় নেয়। রাজু তীক্ষ্ন চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। রেবন্ত অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয় চট করে। বলে, এই সাইকেলটাই নিয়ে ঘুরে আসতে পারতেন, কিন্তু এটার পিছনের চাকাটায় হাওয়া নেই যে!

ভারী খুশি হয়ে রাজু বলে, তা হোক, তা হোক। আফটার অল সাইকেল তো!

কথাগুলো যত বুঝতে না পারে ততই মনে এক আতঙ্ক জেগে ওঠে রেবন্তর। রাজু পাগল নয়। ক্ষুরের মতো ওর বুদ্ধির ধার। ওর মুখোমুখি হলেই একটা ঝাঁজ টের পাওয়া যায়। কেমন গুটিয়ে যেতে, লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে জাগে। রেবন্ত তাই বলল, রেখে দিন তা হলে সাইকেলটা। পরে কুঞ্জর বাড়ি থেকে নিয়ে যাব।

রাজু কোনও কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদের কথা বলল না। এক ঝটকায় রেবন্তর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল সাইকেলটা। ঘুরিয়ে নিয়ে মহানন্দে উঠে বসল সিটে।

রেবন্ত মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কয়েক পলক দেখে দৃশ্যটা। কোনও মানে হয় না। রাজু হাওয়াহীন চাকার সাইকেলে মাতালের মতো টলতে টলতে ওই দূরে চলে যাচ্ছে।

রেবন্ত বাজারের দিকে হাঁটতে থাকে। মাথার মধ্যে একটা অস্পষ্ট দুশ্চিন্তা খামচে ধরেছে হঠাৎ। কোনও মানে হয় না।

১১

শ্যাওলা—ধরা পিছন দেয়ালের একটা খাঁজে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর রেখে উঠে বনশ্রী অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখল। ধূলিধূসর সাইকেলে হা—ক্লান্ত রেবন্ত আর তার পিছু পিছু রাজু। একটা আতা গাছ তার উচ্ছল সবুজ পাতা নিয়ে ঝেঁপে পড়েছে সামনে। তার আড়ালে চলে গেল ওরা।

এত অবাক বনশ্রী যে, ডাকতেও পারল না। রেবন্ত এই অবেলায় বাড়ির পিছনের ছাড়া জমিতে কী করছিল? কেনই বা রাজু বলছিল সাইকেলের কথা?

বনশ্রী পাঁচিল থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ফটকের দিকে যেতে থাকে। একটা কিছু হবে, একটা কিছু ঘটবে, তার মন বলছে।

ফটকের বাইরে এসে একই দৃশ্য দেখতে পায়। একটু দূরে খুব ধীরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে রেবন্ত। পিছনে রাজু। রেবন্ত মাঝে মাঝে ফিরে দেখছে রাজুকে।

এত দূর থেকে ডাকলে রাজু শুনতে পাবে না। বনশ্রী তাই দ্রুত পায়ে এগোতে থাকে। তাড়াহুড়োয় চটি পায়ে দিয়ে আসেনি, কাঁকর ফুটছে, ব্যথা লাগছে বড্ড। তবু বনশ্রী হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে বড় মাঠের ধারে শিমুল গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। মাঠের মাঝখানে সাইকেলের দু'দিকে দুজন দাঁড়িয়ে। কী কথা হচ্ছে ওঁদের? মারামারি হবে না তো! ভাবসাব বড় ভালো লাগে না বনশ্রীর। বুকটা কেঁপে ওঠে।

মাঠে নামতে ঢালুতে পা বাড়িয়েছিল বনশ্রী, হঠাৎ দেখল রাজু সাইকেলটা কেড়ে নিয়েছে রেবন্তর কাছ থেকে। বহু দূরে মাঠের মধ্যে একা বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে রেবন্ত। রাজু টলমল করে বাচ্চা ছেলের মতো চালিয়ে আসছে সাইকেল। মুখে উপচে পড়ছে হাসি। একটু চেয়ে থেকে রেবন্ত মুখ ফিরিয়ে হাঁটা দিল। ক্রমে মিলিয়ে গেল অজস্র ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে। ব্যাপারটা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না বনশ্রী।

রেবন্ত চলে গেলে বনশ্রী তরতর করে নেমে আসে খোলা মাঠের মধ্যে। রাজু এখনও অনেকটা দূরে। হাত তুলে বনশ্রী ডাকে, এই যে শুনুন, শুনছেন? এই যে!

রাজু টলমলে সাইকেলে আসতে আসতে খোলা মাঠের মধ্যে হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে গিয়ে চক্কর খায়। আবার এগিয়ে আসে। কী ভেবে আবার উলটোবাগে ঘুরে দূরে চলে যেতে থাকে।

আচ্ছা পাগলা! বনশ্রী ডান হাতখানা তুলে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, শুনুন, শুনুন, ও মশাই, শুনছেন? স্নান করবেন না? খিদে পায় না আপনার?

রাজু আবার ঘুরে গেল অন্য দিকে। বনশ্রী আবছা শুনতে পায় সাইকেলে বসে রাজু গান গাইছে—ঝিলমিল... ঝিলমিল... ঝিলমিল... ঝিলমিল...

বড্ড বাঁধন—ছেঁড়া, বড্ড অবাধ্য লোক তো! বনশ্রী দাঁতে দাঁত চাপে। রাগে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে লঘু পায়ে ছুটে যায় সে। কোথায় পালাবে লোকটা? পালাতে দেবে কেন বনশ্রী?

ধীর সাইকেলে কিছু দূর চলে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে আসতে থাকে রাজু। যেন জীবনে প্রথম সাইকেল শিখছে।

বনশ্রীর মুখ লাল। ঘামে ভেজা, চুলের ঝাপটা এসে পড়েছে কপালে। সাইকেলের পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে বলে, এটা কী হচ্ছে শুনি!

রাজু বনশ্রীর মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসে। হঠাৎ হ্যান্ডেল ছেড়ে দু'হাত তুলে চেঁচায়—ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...

বনশ্রী হ্যান্ডেল ঠেলে ধরে। সাইকেলটা কাত হয়ে পড়ে। রাজু ফের টেনে তোলে সাইকেল। গম্ভীর মুখে বলে, এটা নিয়ম নয়।

বনশ্রী হাসে, আমি নিয়ম মানি না।

কাতর স্বরে রাজু বলে, সবাই দুয়ো দেবে যে!

অবাক বনশ্রী বলে, কীসের জন্য দুয়ো দেবে?

রাজু মাথা নেড়ে বলে, সাইকেল থামাতে নেই! অবিরাম চলবে। অবিরাম। ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...

বনশ্রী বাধা দিতে ভুলে যায়। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাজু হাওয়াহীন চাকার ধীরগতি সাইকেলে উঠে ভারী কষ্টে প্যাডেল ঠেলতে থাকে।

মাটির নীচে প্যাচপ্যাচে জল, কাদামাখা ঘাস, পিছল জমি হাওয়াহীন চাকাটাকে টেনে ধরে বার বার। গভীর চাকার দাগ বসে যেতে থাকে মাটিতে। সাইকেল ধীরে ধীরে চক্কর দেয়।

বনশ্রীর গা শিউরে ওঠে হঠাৎ। সে দেখে, রাজুর সাইকেল তাকে মাঝখানে রেখে বার বার ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে।

নিজের রোগলক্ষণ খুব ভালো চেনে কুঞ্জ। বুকে ধীরে ধীরে জল জমছে। জ্বর বাড়ছে। অপঘাতের জন্য তাকে হয়তো অপেক্ষা করতে হবে না। শুধু নিজেকে একটু ঠেলে দিতে হবে মৃত্যুর গড়ানে ঢালুর ওপর দিয়ে। যখন গড়িয়ে যাবে তখন কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা না করলেই হল! আজ দুপুরে খুব ঠান্ডা হিম পুকুরের জলে অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে স্নান করবে সে। পেট পুরে খাবে ভাত, ডাল, অম্বল। হুহুহু করে জ্বর বেড়ে পড়বে বিকেলের দিকে। ভাবতে ভাবতে কুঞ্জ একটু করে হাসে, আর শুকনো ঠোঁট চিরে রক্ত গড়িয়ে নামে।

তেল মেপে পয়সা গুনে নিয়ে তেজেন ফিরে এসে চৌকিতে উবু হয়ে বসে বলে, মাতালের কথা কে ধরছে বলো! কত আগড়ম বাগড়ম বলে! বাজারের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে তোমাকে আর ওর বউকে নিয়ে অত যে খারাপ খারাপ কথা চেঁচিয়ে বলল তা কে বিশ্বাস করছে? তারপর আমার দোকানেই তো সব এল ভিড় করে। হাসাহাসি কাণ্ড।

কাল কি পরশু রাতে ঘটনাটা আমাকে বলিসনি কেন তেজেন? সারা বাজার জানল, কিন্তু আমার কানে কেউ তুলল না।

তেজেন খুব সান্ত্বনার স্বরে বলে, ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামিয়েছে নাকি? রোজই কোনও না কোনও মাতালের মাতলামি শুনছে সবাই। গুরুত্বই দেয়নি কেউ। আর তোমাকে ও সব কথা বলতে লজ্জা না? বলে কেউ? আজ তুমি জিজ্ঞেস করলে বলে বললাম। তুমি ভেবো না, ও সব কেউ মনেও রাখেনি, বিশ্বাস তো দূরের কথা।

কুঞ্জ আস্তে করে বলে, মানুষ ঘেঁটে বড় হলাম রে তেজেন। মানুষের নাড়ি আমি চিনি। ভালো কথা ঢাক বাজিয়ে বললেও মনে রাখে না, মন্দ কথা ফিসফিসিয়ে বললেও মনে গেঁথে রাখে। সবাই না হোক, কিছু লোক কি ভাববে না, হতেও পারে কুঞ্জ এরকম।

দূর দূর! পাগল ছাড়া কে ভাববে অমন কথা? তোমাকে নিয়ে ও সব ভাবা যায়, বলো? কুঞ্জনাথ নামটার মানেই দাঁড়িয়ে গেছে ভদ্রলোক।

কুঞ্জ মাথা নাড়ে। সে জানে। চোখ জ্বালা করে জল আসে তার। মরতেই হবে, তাকে মরতেই হবে। মহৎ এক মৃত্যুর বড় সাধ ছিল কুঞ্জর। হাজার জন জয়ধ্বনি দিতে দিতে নিয়ে যাবে তাকে শ্মশানে। দলের ফ্ল্যাগে ঢাকা থাকবে তার মৃতদেহ। চন্দন কাঠের চিতায় পুড়বে সে। কত মানুষ চোখের জল ফেলবে! রেডিয়োতে বলবে, খবরের কাগজে বেরোবে, জায়গায় জায়গায় শোকসভা হবে। এখন আর তা আশা করে না কুঞ্জ। না, মৃত্যুটা তেমন মহৎ হবে না তার। তবু মৃত্যু তো হবে। সেটা ভেবে বুক থেকে শ্বাস হয়ে একটা ভার নেমে যায়।

তেজেনের দোকান থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকটায় একটু চেয়ে থাকে কুঞ্জ। জমজমাট বাজার। দর্জিঘর, শুকনো নারকোলের ডাঁই নিয়ে বসে আছে ব্যাপারীরা, শীতের সবজির দোকানে দোকানে থলি হাতে লোক। খুব ফটফটে রোদে সব স্পষ্ট পরিষ্কার। তবু এর ভিতরে ভিতরে উইপোকার সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকারের নালি ঘা ছড়িয়ে রয়েছে। বাজার ইউনিয়নের সেক্রেটারি কুঞ্জনাথ তাকিয়ে থেকে বুকভাঙা আর একটা শ্বাস ফেলল। সেই শ্বাস বলে উঠল, ওরা জানে।

জীবনে এই প্রথম মুখ নিচু করে হাঁটে কুঞ্জ। তার শক্ত ঘাড় ব্যথিত হয়ে ওঠে। তবু কুঁজো হয়ে নিজের পায়ের কাছে মাটিতে মিশে যেতে যেতে সে হাঁটতে থাকে।

মাথায় নীল রঙের ক্র্যাশ হেলমেট, চোখ মস্ত গগলস পরা মামাতো ভাই নিশীথ তার নতুন কেনা স্কুটারে বোঁ—চক্কর দিয়ে এসে খবর দিল, মেলা ঘর পড়ে গেছে। অযোধ্যা, অনন্তপুর, নারকেলদা থেকে বহু লোক বউ—বাচ্চা নিয়ে এসে বাজারে থানা গেড়েছে। যাবে না কুঞ্জদা? মাতব্বররা সব তোমার জন্য হাঁ করে বসে আছে যে!

বাইরের ঝড়ে কতটা ভাঙচুর হয়েছে তা ভালো করে দেখতে পায় না কুঞ্জ। সে সারাক্ষণ দেখছে তার ভিতরে মূল সুদ্ধ উপড়ে পড়েছে গাছ, উড়ে গেছে ঘরের চাল। ডিসপেনসারির বারান্দায় বিবশভাবে বসে নিজের ভাঙচুর দেখছিল কুঞ্জ।

চল।—বলে উঠতে গিয়ে কুঞ্জর মাথাটা আবার টাল্লা খায়। ডান বুকের ভিতরে একটা রবারের বল ভেসে উঠছে, ফের নেমে যাচ্ছে বার বার। রোগলক্ষণ চেনে কুঞ্জ। স্কুটারের পিছনে বসে বাজারের দিকে যেতে যেতে বার বার ঝিমুনি আসছিল তার। মনে হচ্ছিল, একটা ঢালুর মুখে গড়িয়ে যাচ্ছে সে।

মেলা কাদা মাখা, জলে ভেজা বিপর্যস্ত মানুষ, বাজারের পুব ধারে নিজেদের রোদে শুকিয়ে নিচ্ছে। শুকোচ্ছে ন্যাংটো আধন্যাংটো বাচ্চারা, কাঁথাকানি, মাদুর, চাটাই পরনের কাপড়, শুকোচ্ছে মেয়েদের তেলহীন মাথার কটাসে রঙের চুল। তেজেনের দোকানঘরে পঞ্চায়েতের মাতব্বররা উদ্বিগ্ন মুখে বসে। কুঞ্জকে দেখে তারা শ্বাস ছাড়ে, ওই কুঞ্জ এসে গেছে! ক্লাবের ছেলেরা জড়ো হয়েছে বিস্তর, কিন্তু

মাতব্বরদের তারা বড় একটা গ্রাহ্য করে না। কী করতে হবে, কার হুকুমে কে চলবে তা নিয়ে কোনও মীমাংসাও হচ্ছিল না।

কুঞ্জ আর নিজের শরীরটাকে টের পেল না অনেকক্ষণ। বাজারে তোলা তুলতে বেরিয়ে পড়ল ছেলেছোকরাদের নিয়ে। একদল গেল নারকেলদা, আর একদল গেল পুবপাড়া, অযোধ্যা, তেঁতুলতলা মুষ্টিভিক্ষা জোগাড় করতে।

বাজারের চালাঘর প্রায় সব ক'টাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। তারই বাঁশ খুঁটি দিয়ে মস্ত উনুনে শ—দেড়েক লোকের আন্দাজ খিচুড়ি চাপাতে বেলা হয়ে গেল বেশ।

মহীনের দর্জিঘরের সামনে আতা গাছের ছায়ায় একটা টুল পেতে বসে কুঞ্জ খুব কষ্টে দম নেয়। পোড়া কাঠের ধোঁয়া আর তেল—মশলা ছাড়া খিচুড়ির ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। অনেক বেলা হবে বটে তবু লোকগুলো খেতে পাবে, এই ভেবে কুঞ্জ এক রকম তৃপ্তি পাচ্ছিল। পপুলারিটির কথাটা ক্ষণে ক্ষণে আজও হানা দিচ্ছে বুকের দরজায়। এই তো ডোল আদায় করতে গিয়ে ঘুরে দেখল, সে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষ এখনও না করতে পারে না। কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ কখনও করে না সে, কারও আঁতে ঘা দিয়ে বা অহংকারে আঘাত করে কথা বলে না, কাউকেই কখনও খামোখা চটিয়ে দেয় না, তোয়াজে সোহাগে সেবা দিয়ে সে মানুষকে অনেকটাই অর্জন করে রেখেছে। তাই আজও কারও কাছে গিয়ে হাত পাততে তার বাধে না। পাতলে পায়ও সে অঢেল। আর এই করে করেই সে কুঞ্জ, এক এবং অদ্বিতীয় কুঞ্জ। হয়তা এখনও তার সবটুকু শেষ হয়ে যায়নি।

ভাবতে ভাবতে দর্জিঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটু চোখ বুজেছিল কুঞ্জ। অমনি যেন কোত্থেকে কেষ্ট এসে সামনে দাঁড়াল। লাল চোখ, উলো—ঝুলো চুল, বিকট মুখ। বলল, তা বটে। তুমি হলে এ তল্লাটের মস্ত মাতব্বর কুঞ্জনাথ। তবে কী জানো, বড় মানুষের দিকেই সকলের চোখ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। নজর রাখে, লোকটা দড়ির ওপর ঠিক মতো হাঁটতে পারছে কি না। নাকি টাল খাচ্ছে, পড়ো—পড়ো হচ্ছে, কিংবা পড়েই গেল নাকি। উঁচুতে উঠলে তাই সবসময়ে পড়ার ভয়। আমাদের মতো মদো মাতাল বদমাশ যত যাই করি লোকে তেমন মাথা ঘামায় না? কিন্তু তুমি হলে কুঞ্জনাথ, তুমি পড়লে লোকে ছাড়বে কেন? বড় মানুষ পড়লে লোকের ভারী আনন্দ হয়। বড় মানুষের গায়ে থুথু দেওয়ার আনন্দ, বড় মানুষের গায়ে লাথি দেওয়ার আনন্দ।

একটা বিলি—ব্যবস্থা হয়েছে দেখে নিশ্চিন্ত মনে মাতব্বররা যে যার রওনা দিচ্ছে। নেতা সাঁপুই এসে কুঞ্জর কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, পোয়াতি বউটা তোমার জন্যই প্রাণে বেঁচে গেল এ যাত্রা! গোপাল ডাক্তারও বলছিল, কুঞ্জ না থাকলে কেষ্টর বউয়ের হয়ে গিয়েছিল।

মড়ার চোখে কুঞ্জ তাকায়। শুকনো ঠোঁটে একটু হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে রক্তের নোনতা স্বাদ ঠেকে জিভে। সবাই জানে, নেত্য সাঁপুইয়ের পোষা ভূত আছে। এ তল্লাটের লোকের যত গুহ্য আর গুপ্ত কথা, যত কেলেঙ্কারি আছে তার সব খবর এনে দেয় নেত্যকে। নেত্য বাতাস শুঁকে টের পায় কোথায় মানুষের পচন ধরেছে, নিশুত রাতে কার ঘরে কে যায়, কোথায় ইধার কা মাল উধার হয়।

কুঞ্জ চোখ নামিয়ে নেয়।

নেত্য আফসোসের গলায় বলে, বাড়ি যাও। কাল সারাটা রাত জেগে কাটিয়েছ।

কুঞ্জ ওঠে। নেত্য সঙ্গ ধরে আসতে আসতে বলে, বউটা রক্ষে পেল সেইটেই এখন মস্ত সান্ত্বনা। তুমি বুক দিয়ে না পড়লে বাঁচত না। গলাটা খাটো করে নেত্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, কাল সাঁঝবেলায় বড় মাঠে নাকি কারা হামলা করেছিল তোমার ওপর! বলোনি তো?

কুঞ্জ উদাস স্বরে বলে, ও কিছু নয়। চোর—টোর হবে, আমাদের দেখে পালিয়ে যায়।

কেষ্টর কোনও খোঁজ পেলে?

খোঁজ করিনি।

নেত্য খুব রাগ দেখিয়ে বলে, খোঁজ নেওয়া উচিতও নয়। পাষণ্ড একেবারে। মুখেরও লাগাম নেই।

শীতটা হঠাৎ ভারী চেপে ধরে কুঞ্জকে। নেত্যর শেষ কথাটায় একটু ইঙ্গিত আছে না? মুখের লাগাম নেই, কথাটার মানে কী?

নেত্য সাঁপুইয়ের মুখের দিকে আর তাকাল না কুঞ্জ, বাঁ ধারে ঢালুতে নেমে যেতে যেতে বলল, চলি নেত্যদা, শরীরটা ভালো নেই।

নেত্য চেঁচিয়ে বলে, এসো গিয়ে।

খালপোলে উঠতে গিয়ে এতক্ষণ বাদে কুঞ্জ আবার তার শরীরটাকে টের পায়। গা ভরে জ্বর আসছে। বুকের ব্যথা চৌদুনে উঠে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। শ্বাসকষ্ট চেপে ধরছে কণ্ঠা। দুপুরের সাদা রোদকে হলুদ দেখাচ্ছে চোখে। পুরো রাস্তাটা হেঁটে পার হওয়া যাবে না। কুঞ্জ সাঁকোর ধারে দুর্বল মাথা চেপে উবু হয়ে বসে পড়ে। সুযোগ পেয়ে কেষ্ট যেন সামনে এসে দাঁড়ায়, দাঁত কেলিয়ে হাসে, বলে, মানুষ পচলে তার গন্ধ বেরোবে না? তোমাকে যে পচায় ধরেছে তা আপনি ছড়িয়ে পড়বে। ও কি ঠেকানো যায়? আমার মুখের কথা বলে লোকে হয়তো প্রথমটায় তেমন বিশ্বাস করবে না, ভাববে কুঞ্জনাথ কখনও কি এ রকম হতে পারে? কিন্তু ধীরে ধীরে পচা গন্ধ ছড়াবে ঠিকই।

সাবিত্রীকে বলে এসেছিল কুঞ্জ, মরবে। মৃত্যুর একটা গহিন গড়ানে ঢালু উপত্যকা এখন তার সুমুখেই। যদি এখন নিজেকে একটু ঠেলে দেয় কুঞ্জ, যদি কোনও কিছু আঁকড়ে না ধরে তবে গড়াতে গড়াতে ঝম করে পড়ে যাবে নীচে, যেখানে মায়ের মতো কোল পেতে আছে শমন। নিজের রোগলক্ষণ চেনে সে। ডান বুকে জল জমছে। ব্যথা জ্বর। আজ ফিরে গিয়ে পুকুরে হিম ঠান্ডা জলে খুব ডুবে ডুবে স্নান করবে কুঞ্জ। ভাত খাবে। রাতে শিয়রের জানালা খোলা রেখে শোবে। নিজেকে একটু ঠেলে দেওয়া মাত্র।

মুখ তুলে সে তনুকে দেখতে পায় মনের মধ্যে। ভারী জলজ্যান্ত দেখতে পায়। বলে, তনু, একদিন তুমিও তো জানতে পারবে কুঞ্জদাকে যা ভাবতে তা সে নয়!

তনু করুণ মায়াভরা চোখে চেয়ে বলে, আমি তো তোমাকে কখনও ভুলিনি কুঞ্জদা। ঘর—সংসারের মধ্যে জড়িয়ে থাকি তবু এক মুহূর্ত আমার মন তোমাকে ছাড়া নয়। তবে তুমি কী করে ভুললে আমাকে? অন্য মেয়ে, পরের বউ তাকে কী করে চাইলে?

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে, সাবিত্রীকে তো আমার মন চায়নি তনু, শরীর চেয়েছিল? আমার শরীর এঁটো হয়েছে, মন নয়। ঠিক তোমার যেমন।

খালধারে মজন্তালির বাড়ি। কুঞ্জকে দেখে বেরিয়ে এল, কী গো, বসে পড়লে যে! শরীর ভালো তো?

কুঞ্জ মাথা নাড়ে, ভালোই।

বলে উঠে দাঁড়ায়। মাথা টলমল করছে। দুপুরের রোদে কাঁচা হলুদের রং দেখছে সে। আর চারদিকটা কেমন যেন থিয়েটারের সিনসিনারির মতো অবাস্তব। কুঞ্জ হাঁটতে হাঁটতে ভাবে সে যেন কল্পনার রঙে ডোবানো অদ্ভুত এক স্বপ্নের মতো জায়গায় ঢুকে যাচ্ছে। চারদিকটা গভীরভাবে অবাস্তব, অপ্রাকৃত, পরীর রাজ্য যেন। ঝিম ঝিম নেশার ঘোরের মতো জ্বর উঠছে তার। ফিরে যাবে নাকি? রিকশা ধরে নিতে পারবে বাজার থেকে কিংবা নিদেন কারও সাইকেলে সওয়ার হতে পারবে।

একটু দাঁড়ায় কুঞ্জ। তারপর ভাবে, নিজেকে সেই গহিন খাদটার দিকে একটু একটু করে ঠেলে দেওয়াই ভালো। সে ফেরে না। বড় মাঠের দিকে এগোতে থাকে।

মস্ত বাঁশবন সামনে। সামনের মেঠোপথে কাঁচা হলুদ রোদে ঝলকানি তুলে কে যেন বাঁশবনের মধ্যে ঢুকে গেল কুঞ্জকে দেখে। চোখের ভুল নয় তো! এক ঝলক দেখা, তবু চেহারাটা কি চেনে না কুঞ্জ? বড় শ্বাসের কষ্ট বুকে। কুঞ্জ একবার বুকটা হাতের চেটোয় চেপে ধরে। বড় করে শ্বাস নেয়। চারদিকে এক অদ্ভুত রঙিন আলোয় অবাস্তব দৃশ্য দেখতে পায় সে। কানে ঝিমঝিম করে ঝিঁঝির ডাক বেজে যাচ্ছে। তবু বাঁশবনের অন্ধকারে ঝরা পাতার ওপর সাবধানী পা ফেলার আওয়াজ ঠিকই শুনতে পায় সে।

মেঠো পথ ছেড়ে কুঞ্জ বাঁশবনের ছায়ায় ঢুকে যায়। সামনে পথ বলে কিছু নেই। রোগা রোগা অজস্র ফ্যাঁকড়া বের করে বাঁশবন পথ আটকায়। কুঞ্জ গুঁড়ি মেরে ঢোকে ভিতরে। ভিতরে চিকড়ি—মিকড়ি আলো—ছায়া। পায়ের নীচে গতকালের বৃষ্টির জল, পচা পাতা। একটা লম্বাটে ছায়া নিচু হয়ে সরে যাচ্ছে পুব দিকে।

রেবন্ত!—চাপা স্বরে ডাকে কুঞ্জ।

ছায়াটা দাঁড়ায়।

কাতর স্বরে কুঞ্জ বলে, দাঁড়া রেবন্ত। চলে যাস না।

বাঁশবনে বাতাসের শব্দ হয় হু হু করে। পচাটে কটু গন্ধ উঠছে।

রেবন্ত গম্ভীর গলায় বলে, কী বলবি?

ধীরে ধীরে বাঁশ গাছের অজস্র কুটিকাটি ডালপালা সরিয়ে এগোয় কুঞ্জ। গালে মুখে চোখে খোঁচা খায়। তার চাদর ধুতি আটকে যায় বার বার। বলে, আমি মরলে কি ভালো হয় রেবন্ত?

রেবন্ত চুপ করে থাকে। তারপর বলে, তার আমি কী বলব?

কুঞ্জ প্রাণপণে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে ছায়াটার দিকে এগোয়। বলে, তুই বড় নষ্ট হয়ে গেছিস রেবন্ত। আমিও। আমরা মরলে কেমন হয়?

রেবন্ত চুপ করে থাকে। প্রায় হাত পনেরো তফাতে রেবন্তকে প্রায় স্পষ্ট দেখতে পায় কুঞ্জ। গায়ে শাল, মুগার পাঞ্জাবি, ধুতি। এলোমেলো চুল। বড় সুন্দর দেখতে।

কুঞ্জ বলে, দাঁড়া রেবন্ত। পালাস না।

রেবন্ত খুব অবহেলাভরে বলে, পাব কেন? তোর ভয়ে?

কুঞ্জ হাসে। বলে, আজ আর আমাকে ভয় পাস না রেবন্ত?

না।

আগে পেতিস না?

কোনওদিনই তোকে ভয় পেতাম না।

কুঞ্জ গর্জন করে ওঠে, পেতিস না? সত্যি করে বল পেতিস না? তোর সব জানি রেবন্ত। সত্যি করে বল!

খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল কুঞ্জ। রেবন্ত মুখ ঘুরিয়ে লম্বা পায়ে একটা ফাঁকা জমি পেরিয়ে আর একটা ঝোপের আড়ালে চলে যায়। বলে, ওইসব ভেবেই আনন্দে থাক। তবে জেনে রাখিস তোকে কেউ ভয় পায় না। ভয় পাওয়ার মতো কী আছে তোর?

কিছু নেই। কুঞ্জ জানে, আর কিছু নেই। থমকে দাঁড়ায় সে। সামনেই যেন কেষ্ট একটা লম্বা বাঁশ বেয়ে নেমে এসে তাকে হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কাঁচকলা দেখায়। বলে, তুমি তো আর দাদা নও। তুমি হচ্ছ আমার বউয়ের নাঙ। লোকে জানবে তুমি আর কিছু পেল্লাদ নও, আমরা পাঁচজন যেমন দোষে—গুণে, তুমিও তেমনি।

দাঁড়া রেবন্ত। শোন!

রেবন্ত দাঁড়ায়।

কুঞ্জ বাঁশবনের মাঝখানটায় ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে। ভারী নির্জনতা। খাড়া রোদ পড়েছে মুখে। ঝোপের আড়ালে রেবন্ত ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে। বলে, বল।

কুঞ্জ ক্লান্ত স্বরে বলে, আমি যদি মরি তা হলে তো দোষ কাটবে! তখনও কি আমার বদনাম করবি রেবন্ত?

রেবন্ত জবাব দেয় না।

কুঞ্জ আর এগোয় না। উবু হয়ে বসে নিজের টলমলে মাথাটা দু'হাতে ধরে থেকে বলে, আমি একটু ভালোভাবে মরতে চাই। দিবি মরতে সেভাবে? একটু সম্মান নিয়ে, একটু ভালোবাসা নিয়ে। সাবিত্রীর কথা রটাস না রেবন্ত। পটলকে বলিস আমি সন্ধের পর বড় মাঠে আসব। তৈরি থাকে যেন।

রেবন্ত জবাব দেয় না। বাঁশবনের ছায়ায় তার লম্বা শরীরটা ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে। ঝরা পাতার ওপর পায়ের শব্দ হয় অস্পষ্ট।

১২

খাওয়ার পর ভিতরের বারান্দায় সাইকেলটা কাত করে ফেলে চাকার ফুটো সারাতে বসেছে রাজু। হাতের কাছে বড় কাঁচি, রবারের টুকরো, সলিউশনের টিউব, রবার ঘষে পাতলা করার জন্য ঝামা, হাওয়া ভরার পাম্প। অভ্যেস নেই বলে কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে না। শুভশ্রী করুণাপরবশ হয়ে এসে বলেছিল, দিন না রাজুদা, আমি সারিয়ে দিচ্ছি। রোজ সারাচ্ছি, আমার অভ্যেস আছে।

রাজু রাজি হয়নি।—না, তুমি বরং দূরে বসে ডিরেকশন দাও।

বাইরের কোনও ছেলে বহুকাল ভিতর বাড়িতে ঢুকে এমন আপনজনের মতো ব্যবহার করেনি। সবিতাশ্রীর মুখে তাই মৃদু একটু স্মিত ভাব। বললেন, আমার জামাই বড় বাবু মানুষ। বিয়ের সময় এই দামি সাইকেল যৌতুক দিয়েছিলুম। বেশি দিনের কথা তো নয়, দ্যাখো কেমন দশা করেছে! একটু কিছু গোলমাল হলেই দোকানে দিয়ে আসে। গাঁধীজি চাইতেন নিজেদের কাজ নিজেরা করতে যেন আমরা লজ্জা না পাই। এই যে তুমি কলকাতার বড় ঘরের ছেলে, কেমন বসে বসে সাইকেল সারাচ্ছ, এই ছবিটাই কী সুন্দর!

রাজু মৃদু হাসে শুধু।

সত্যবাবু তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে দৃশ্যটা দেখছেন অনেকক্ষণ ধরে। সবিতাশ্রী তাঁকে জলের জগ দিয়ে আসতে গেলে তিনি আনন্দের স্বরে বললেন, ছোকরার রোখ দেখেছ! এ জীবনে যে আরও কত উন্নতি করবে! কুঞ্জকে আজ বিকেলেই বলব, বনার সঙ্গে জোড় মেলাতেই হবে।

মা—বাবার মনের ভাব টের পেতে খুব বেশি দেরি হয়নি বনশ্রীর। তাই আর রাজুর সামনে আসেনি লজ্জায়। ঘরে শুয়ে সে একটা খোলা বইয়ের পাতায় চোখ রেখে আছে। কতবার যে পড়ল পাতাটা। একটা অক্ষরেরও মানে বুঝল না।

রবিবারের দুপুর। শুভশ্রী ক্লাবে গেল ক্রিকেট খেলতে। বাবা শুলেন। মা বসলেন সেলাই নিয়ে। রাজুর অদূরে শুধু ডগমগ চোখে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিল চিরশ্রী। সে মুগ্ধ, সম্মোহিত। অবশেষে সেও গঙ্গা—যমুনা খেলতে যায়।

দ্বিধা জড়ানো পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে বনশ্রী। বলে, হল?

রাজু মুখ তোলে। একটু হাসে। মাথা নাড়ে, না।

কী অদ্ভুত মানুষ। ওই সাইকেলটা না হলেই চলছিল না? বাড়িতে দু'—দুটো সাইকেল ছিল যে?

রাজু মৃদু হেসে বলে, এই সাইকেলটার কাছ থেকে আমার অনেক কিছু জেনে নেওয়ার আছে।

বনশ্রী হেসে ফেলে। বলে, মাথায় পোকা।

রাজু গম্ভীর মুখে চায়। ফের মুখ নিচু করে ঝামা দিয়ে রবার ঘষে পাতলা করতে করতে বলে, এই সাইলেকটারও কিছু বলবার আছে। শুনতে জানা চাই। সব জিনিসের মধ্যেই ঘটনাপ্রবাহ, চেতনা আর চিন্তার কিছু ছাপ থেকে যায়। নইলে গ্রামোফোনের নিষ্প্রাণ রেকর্ড কি গান ধরে রাখতে পারত?

বনশ্রী তর্ক করল না। কেনই বা করবে? সে এ রকম কথা জন্মে শোনেনি। এ সব কথার প্রতিবাদ করারও কিছু নেই তো! শুনতে বেশ লাগে। হতেও তো পারে!

বলল, আমাকে শেখাবেন?

রাজু রবারে সলিউশন লাগিয়ে টিউবের ফুটোয় চেপে ধরে বলে, কী?

কী ভাবে সাইকেলের কথা বোঝা যায়।

রাজু ঘাড় কাত করে বলে, শেখাব।

টিউবের ফুটো বন্ধ হয়ে গেল অবশেষে। রাজু সাইকেল দাঁড় করিয়ে হাওয়া ভরে। ক্রমে টনটনে হয়ে ওঠে চাকা। বড় উঠোনটায় সাইকেলটাকে একটা চক্কর দিয়ে এনে বারান্দায় পা ঠেকিয়ে দাঁড় করায় রাজু। বলে,

চমৎকার।

জড়ো করা হাঁটুতে থুঁতনি রেখে চেয়ে স্মিত হাসে বনশ্রী। বলে, সাইকেল কী বলল?

রাজু হাসে একটু।

সাইকেল বলল, রাজু, আজ সকালেও আমি রেবন্তর ছিলুম, এখন তোমার।

বনশ্রী চোখ বড় করে বলে, আপনার মানে? জামাইবাবুকে সাইকেল ফেরত দেবেন না নাকি আপনি?

রাজু মৃদুস্বরে বলে, কথাটা তো আমার নয়। সাইকেলের। সাইকেল হয়তো ভুল বলছে, কিন্তু বলছে।

আর কী বলছে?

রাজু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সব কিছু কি সহজে বোঝা যায়? আরও অনেক কিছু বলার আছে এর। ধীরে ধীরে বলবে।

রাজু আবার ধীর গতিতে সাইকেল ছাড়ে। উঠোনে চক্কর দিতে থাকে আস্তে আস্তে।

বনশ্রী জিজ্ঞেস করে, কী বলছে?

রাজু ভ্রূ কুঁচকে বলে, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি জানতে চাই ভরদুপুরে এই সাইকেলটা কেন আপনাদের বাড়ির চারদিকে চক্কর মারছিল।

বনশ্রীর মুখে ধীরে একটা ছায়া নামে। সে মৃদুস্বরে বলে, আমি জানি না।

রাজু মৃদু হাসে, আপনার কাছে জানতে চায়ওনি কেউ। সাইকেলই বলবে।

বনশ্রী হঠাৎ তার বিশাল চোখে চেয়ে বলে, ওটা অলক্ষুনে সাইকেল। আপনি ওতে আর চড়বেন না। নামুন শিগগির। নেমে আসুন।

আত্মবিস্মৃত বনশ্রী বারান্দার প্রান্তে এগিয়ে আসে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে ঝুঁকে বলে, আর কিছুতেই না। সাইকেলের কথা বুঝবার দরকার নেই আমাদের।

রাজু চেয়ে দেখে, সকালে যে লোকটা আয়নার আলো ফেলার মতো করে নিজেকে দূর থেকে বনশ্রীর মুখে প্রক্ষেপ করছিল বার বার সে লোকটার দম ফুরিয়েছে। রূপমুগ্ধ সেই অন্যমনস্কতা কেটে গেছে বনশ্রীর।

রাজু সাইকেল থেকে নামে। একটু ভেবে বলে, আমারও তাই মনে হয়। সাইকেলের কাছ থেকে আর কিছু না জানলেও আমাদের চলে যাবে।

বেলা ঢলে পড়ছে। গাছগাছালির রূপময় ছায়া উঠোনে নকশা ফেলে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দূর কুয়োয় বালতি ফেলার শব্দ হল ছপ। একটা কোকিল শিউরে উঠল নিজের ডাকে।

সাবিত্রী পাশ ফিরল। বড্ড যন্ত্রণা। আবার ও—পাশ ফিরল। বড্ড যন্ত্রণা।

ডাকল, টুসি! ও টুসি!

কেউ সাড়া দিল না।

বড় অভিমান হল, বড় একা লাগল সাবিত্রীর। শিয়রের জানালায় রোদ মরে এল। মহানিমের গাছে কুলকুল করে পাখি ডাকছে হাজারে—বিজারে।

সাবিত্রী শিয়রের জানালার দিকে তাকায়। ও পাশে কেউ নেই, জানে। তবু খুব কষ্টে উঠে বসে সাবিত্রী। জানালার দিকে চেয়ে বলে, আপনার জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কোথায় আপনি?

বলে কান পেতে থাকে সাবিত্রী। পায়ের দিকের জানালা দিয়ে হু হু করে উত্তুরে বাতাস এসে দক্ষিণের জানালা দিয়ে বয়ে যায়।

সাবিত্রী বলে, এরা কেবল ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে আমাকে। আবার হয়তো এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। কোথায় আপনি?

কেউ নেই।

সাবিত্রীর চোখ ভরে জল আসে। বড় অভিমান। বলে, নিজেকে কক্ষনও খারাপ ভাববেন না। লোকে বলবে লম্পট, চরিত্রহীন। লোকে কত বলে। ওরা তো জানে না! দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি নিজে কখনও নিজেকে ভাববেন না।

উত্তর থেকে বাতাস দক্ষিণে বয়ে যায়। বড় ঠান্ডা হিম বাতাস। একটা জোলো অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। আকাশে একটা দুটো তারা ফোটে।

সাবিত্রী ঘুমিয়ে পড়ার আগে চোখের জল মোছে। শিয়রের জানালার দিকে চেয়ে বলে, মরে গিয়ে আমাদের কারও লাভ নেই। আছে, বলুন? রবার ঘষে ঘষে পেনসিলের দাগ তুলতুম ইস্কুলে। দাগগুলো না হয় বাদবাকি জীবন ধরে তুলে ফেলব দুজনায়। বলছি তিন সত্যি, আর রক্ত—মাংসের মানুষের মধ্যে নামিয়ে দেখব না আপনাকে। দূরে থাকবেন, কিন্তু বলুন বেঁচে থাকবেন।

সাবিত্রী উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে থাকে জানালার দিকে। কেউ জবাব দেয় না। শুধু পাখিদের শব্দ গাঢ় হয়। বাতাস নদীর স্রোতের মতো শব্দ তুলে গাছগাছালির ভিতর দিয়ে বয়ে যায়।

অবসন্ন মাথাটা বালিশে ফেলে সাবিত্রী। আবার একটা ঘুমের ঢল নেমে আসছে।

সাবিত্রী চোখ বোজে। নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। চোখের কোলে জল শুকিয়ে শুকনো নদীর খাতের চিহ্ন আঁকা হয়

কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও বুকে হেঁটে ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড মাঠখানা পার হয় কুঞ্জ। কাঁচা হলুদ রঙের রোদ রক্তের মতো লাল হয়েছিল, তারপর গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেছে চরাচর। আকাশে হাজারও লণ্ঠন জ্বলে ওঠে। কুঞ্জ দেখে, এক মস্ত সমুদ্রের ধারে বিশাল জাহাজঘাটায় আলো জ্বলছে। সে ওইখানে যাবে।

জ্বরের ঘোর গাঢ় মদের নেশার মতো শরীর ভরে দিল। বার বার টলে পড়ে যায় কুঞ্জ। দাঁড়াতে গেলেই মাথা টলে যায়। তাই হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। আবার ওঠে। ভেজা মাটির ওপর কুয়াশার মেঘ ভেসে আছে। ক্রমে কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে দিগবিদিক। পরির জগৎ মুছে যায়। চারদিকে কালো স্লেটে আঁকা এক ভূতুড়ে জায়গার ছবি।

রেবন্তকে কথা দিয়েছিল, সন্ধেবেলায় এই মাঠে থাকবে। কথা রাখল কুঞ্জ। ঠিক যেইখানে রবির টর্চ পড়েছিল কাল সেইখানে এসে দাঁড়াল সে। বলল, পটল, বড় দেরি হল রে! গায়ে জ্বর নিয়ে বাঁশবনের মধ্যে পড়ে রইলুম যে অনেকক্ষণ। বেলা ঠাহর পাইনি। যখন চাইলুম তখন বেলা ফুরিয়েছে। তবু দ্যাখ, কথা রেখেছি। এই তো আমি। দ্যাখ, এই তো আমি। কাজ সেরে ফ্যাল এইবেলা। আর দেরি নয়। কোথায় কোন বাধা হয়, বিঘ্ন আসে।

শুধু বাতাস বইল। চারদিকে লম্বা লম্বা ভূতের ছায়া। আকাশে লণ্ঠন নাড়ে কালপুরুষ। সমুদ্রে অনেক জাহাজ ভেসে যাচ্ছে।

পটল!

কেউ সাড়া দেয় না।

অনেক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কুঞ্জ। বড় হতাশ হয়।

আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবি বাপ! একটা কোপের তো মামলা। এ তো নাটক নভেলের ভ্যানতারা নয় রে! কত জখম আমার শরীরে। টিকটিক করে বেঁচে আছি। তোর হাতও পরিষ্কার। এক কোপে কাজ হয়ে যাবে। আয় রে, তাড়াতাড়ি আয়।

কেউ আসে না। আকাশে লণ্ঠন নড়ে। সমুদ্রে জাহাজ ভেসে পড়ছে একের পর এক। কয়েকটা বাদুড় উড়ে যায় পাগলাটে ডানায়।

বিশাল ভারী মালগাড়ি টানতে যেমন হাফসে যায় পুরনো বুড়ো ইঞ্জিন, তেমনি বড় কষ্টে নিজেকে টেনে এগোয় কুঞ্জ। কোথাও পৌঁছতে চায় না সে। শুধু একটা গড়ানে মস্ত খাদের দিকে নিয়ে যাবে সে নিজেকে।

একটু ঠেলে দেবে শুধু। নীচে গভীর সবুজ উপত্যকা কোল পেতে আছে মায়ের মতো। আজ রাতে শিয়রের জানালা খোলা রেখে শোবে সে, কাল ভোরে পুকুরের হিম জলে ডুবে ডুবে স্নান করবে অনেকক্ষণ। নিজের রোগলক্ষণ সে চেনে।

হিমে ভিজে যাচ্ছে চাদর। মাথায় ঠান্ডা বসে যাচ্ছে। বুকের ডানধারে রবারের বলটা মস্ত হয়ে ফুলে উঠেছে এখন। নিজের রোগলক্ষণ সে চেনে।

হিমে ভিজে যাচ্ছে চাদর। মাথায় ঠান্ডা বসে যাচ্ছে। বুকের ডানধারে রবারের বলটা মস্ত হয়ে ফুলে উঠেছে এখন। বাঘের মতো থাবা দিচ্ছে ব্যথা।

কুঞ্জ বসে। হামাগুড়ি দেয়। উঠে আবার কয়েক পা করে হাঁটে। কত ভূতের ছায়া চারদিকে! আকাশে লাল নীল লণ্ঠন দোলে। কত জাহাজ আলো জ্বেলে চলেছে গাঢ় অন্ধকার সমুদ্রে।

শিরীষ গাছের বিশাল ঘন ছায়া পার হতে গিয়ে একটু দাঁড়ায় কুঞ্জ। খুব ভালো ঠাহর পায় না জায়গাটা। এই কি তেঁতুলতলা? ওই কি পিচ রাস্তা? ওইসব আলো কি ভঞ্জদের বাড়ির?

চারদিকে চায় কুঞ্জ। কত জোনাকি পোকা শেয়ালের চোখের মতো দেখছে তাকে! এইখানে ছেলেবেলায় একটা খরগোশ ধরেছিল না সে? সেই খরগোশ শিখিয়েছিল কিছু জিনিস তার, কিছু তার নয়। বড় ভুল শিক্ষা। আসলে আজ কুঞ্জ শিখেছে, এখানে এই প্রবাসে কিছু তার নয়। পরের ধনে জমিদারি। পরের ঘরে বাস। এই তো কুঞ্জর ঝাটি পাটি গুটিয়ে গেল। যে শরীরটা দেখে কুঞ্জ বলে চিনত লোকে তাও সাপের খোলসের মতো ছেড়ে ফেলার সময় হল। সামনেই গড়ানে ঢাল। মৃত্যুর উপত্যকা কোল পেতে আছে।

গাছের গায়ে ভর রেখে দম নেয় কুঞ্জ। শ্বাসকষ্ট গলায় ফাঁসের মতো এঁটে বসছে ক্রমে।

গাছের ভর ছেড়ে কুঞ্জ টলতে টলতে এগোয়।

ডিসপেনসারির সামনে উপুড় হয়ে থেমে আছে একটা গোরুর গাড়ি। অন্ধকারে দুটো গোরু বড় শ্বাস ফেলে ঘাস খাচ্ছে। একটা ধোঁয়ায় কালি লণ্ঠন জ্বলছ ডিসপেনসরির বারান্দায়। সবই আবছা দেখে কুঞ্জ। কিন্তু দেখতে পায় একটা লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়া। একটা বউ তার মাথার কাছে বসে আছে।

কুঞ্জর কানে ঝিঁঝি ডেকে যাচ্ছে। পৃথিবীর সব শব্দই বড় ক্ষীণ মনে হয়। তবু সে শোয়ানো লোকটার ঘড়ঘড়ে শ্বাস আর ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক ঘঙরঘঙ কাশির শব্দ শুনতে পায়।

আলোর চৌহদ্দিতে পা দেওয়ার আগেই বউটি উঠে দু'পা এগিয়ে এসে আর্তস্বরে ডাকল, বাবু!

কুঞ্জর ঘোলাটে মাথার মধ্যে চিৎকারটা ঢোকে। ঢুকে কিছু কুয়াশা কাটিয়ে দেয় যেন। লোকের সামনে কোনওদিন দুর্বলতা প্রকাশ করে না সে। সে যে কুঞ্জনাথ!

প্রাণপণে নিজেকে খাড়া রেখে গলার ভাঙা স্বর যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে করতে বলে, কে?

আমি বাসন্তী।

কে বাসন্তী?

পটলের বউ। পটল যে যায়। কখন থেকে এসে বসে আছি। গোপাল ডাক্তার জবাব দিয়েছে। বলেছে হাসপাতালে যেতে। সেখেনে নিচ্ছে না।

কুঞ্জ চেয়ে থাকে। কিছুই বুঝতে পারে না অনেকক্ষণ!

বাসন্তী বলে, ও বলছে, হরিবাবুর ভিটেয় নিয়ে চলো। যদি তাঁর আত্মা ভর করে তবে বাঁচব।

টলমল করছিল হাত, পা, মাথা। তবু নিজেকে সোজা রাখতে পারল কুঞ্জ। ফ্যাঁস—ফ্যাঁসে গলায় বলল, কী চাস?

ওষুধ দাও। আর কী চাইব? পটল বলছে তোমার ওপর হরিবাবা মাঝে মাঝে ভর করে।

কুঞ্জ ডিসপেনসারির বারান্দায় উঠে আসে।

ধোঁয়াটে লণ্ঠনের একটুখানি আলোয় ভালো দেখা যায় না। তবু অন্ধকার থেকে যখন আলোর দিকে মুখ ফেরাল পটল তখন সেই মুখ দেখে বুকটা মোচড় দেয় কুঞ্জর। দু'খানা লাল টুকটুকে চোখ, এত লাল যে মনে হয় কেউ গেলে দিয়েছে চোখের মণি। মুখ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। মুখের নাল আর শ্লেষ্মায় মাখামাখি ঠোঁট। কম্বলে কম্ফর্টারে জড়ানো বুক থেকে ঘড় ঘড় শব্দ। হাঁ করে প্রাণপণে বাতাস টানার চেষ্টা করছে দমফোট বুকে। কথা ফুটছে না। তবু অতি কষ্টে বলল, হরিবাবার ছেলে তুমি... সে মড়া বাঁচাত...পারবে না?... ভর হোক... তোমার ওপর ভর হোক...

কুঞ্জ ডিসপেনসারির দরজা খোলে। বাতি জ্বালে। বাসন্তীকে বলে, ভিতরে এনে শুইয়ে দে বেঞ্চিতে।

গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান আর বাসন্তী ধরে ধরে আনে পটলকে। কুঞ্জ আর তাকায় না পটলের দিকে। তাকাতে নেই। মানুষের মন তো! হিংসে আসে, বিদ্বেষ আসে, সংকীর্ণতা আসে। বেড়া হয়ে পড়ে, গণ্ডি হয়ে পড়ে। কোনওদিন কাউকে শত্রু ভাবে না কুঞ্জ। আজই বা ভাবতে গিয়ে নিজেকে ছোট করবে কেন? সে যদি মরে তো মাথা উঁচু করে মরবে একদিন।

আলমারি খুলে হরেক ওষুধের নাম গুন গুন করতে থাকে সে। প্রতিটি লক্ষণ মিলিয়ে আস্তে আস্তে তার বাবা এইভাবে গুন গুন করতেন। ধীরে ধীরে ওষুধের সংখ্যা কমে আসত। তারপর ঠিক একটা অমোঘ শিশির গায়ে হাত পড়ত তাঁর।

চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছিল না কুঞ্জ। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কোন তাকে কোন শিশির পর কোন শিশি আছে তা তার মুখস্ত। একটু দোনো—মোনো করতে করতে একটা শিশির গায়ে হাত রাখে সে।

পটল ওষুধটা খাওয়ার আগে মাথায় ঠেকাল।

ঘণ্টাখানেকের ওপর বসে রইল পটল। তারপর আর একটা ডোজ দিল কুঞ্জ। শিশিটা বাসন্তীর হাতে দিয়ে বলে, নিয়ে যা। মাঝরাতে একবার খাওয়াস।

যাওয়ার সময় পটল কারও ওপর ভর দিল না। নিজে হেঁটে গেল। দরজার কাছ থেকে ফিরে চাইল একবার। অস্পষ্ট স্বরে বলল, হরিবাবা আজ নিজে এসেছিলেন। স্পষ্ট টের পেলুম।

চেয়ারে নেতিয়ে ঝুম হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে কুঞ্জ। বড় শীত। খোলা দরজা দিয়ে হুড় হুড় করে ঠান্ডার ধারালো হাওয়া আসে। কুঞ্জ চোখ বুজেও টের পায়, সামনেই সেই গড়ানে উপত্যকা, কী সবুজ! কী গভীর!

বহুকাল বাদে বাবা যেন ডিসপেনসারিতে এলেন আবার। কুঞ্জর পিছনে অস্ফুট গুন গুন স্বরে ওষুধের নাম বলতে বলতে আলমারি হাতড়াচ্ছেন। বাবা? নাকি রাজু? একবার মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জকে দেখলেন, খুব হেলাফেলার গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই মরতে চাস কেন কুঞ্জ?

না মরে কী হবে?

জীবনটা কি তোর?

তবে কার?

যদি জানতিস কত করে একটা মানুষ জন্মায়, কত কষ্ট, কত খেসারত, কত রহস্য থেকে যায় পিছনে! তুই কি তোর জীবনের মালিক? মানুষের একটা স্রোত, একটা ধারায় তুই একজন। কত কষ্ট হয় গাছের একটা ফল ধরাতে জানিস?

সব জানি, সব জানি। আর কিছু জানার নেই!

তুই যে বড় ভালোবাসতে জানতিস কুঞ্জ!

কুঞ্জ ধীরে ধীরে মুখ ফেরাতে চেষ্টা করে। ডানদিকে ফেরাতে পারে না, শক্ত ঘাড়। তাই অল্প শরীর ঘুরিয়ে তাকায়। ঘোলা চোখে কিছুই স্পষ্ট দেখতে পায় না সে। এখনও চারদিকে অবাস্তব, অপ্রাকৃত, ভূতুড়ে জগৎ। কী প্রকাণ্ড উঁচু দেখায় ওষুধের আলমারিগুলোকে। আলোটাকে মনে হয় গাঢ় হলুদগোলা জলের মতো

অস্বচ্ছ। খুব অস্পষ্ট এক ছায়ার মতো মানুষকে দেখতে পায় সে। ছায়াও নয়, যেন কেউ ঘরের শূন্যতায় নিজের একটা ছাপ ফেলে রেখে চলে গেছে। ও কি বাবা? নাকি রাজু?

কুঞ্জ বলে, তুই কি রাজু? রাজু, ভোর রাতে ঘুমের মধ্যে কত ভয়ের শব্দ, যন্ত্রণার শব্দ করেছিস! কত কথা বলেছিস! তোর কীসের দুঃখ তা তো জানি না রাজু, তবে মনে হয়, কলকাতা শহর তোকে অল্প অল্প করে বিস্কুটের মতো ভেঙে ভেঙে খেয়ে নিচ্ছে। টের পাস না? তোকে যেমন খাচ্ছে শহর, আমাকেও তেমনি।

ছায়ামূর্তি গাঢ় শ্বাস ফেলে বলে, সব শহরই মানুষ খায়। সাপের মতো বাঁকানো দাঁত, একবার ধরলে আর ছাড়তে পারে না। যদি জোর করে ছিনিয়ে আনিস তবে সাপের মুখের ব্যাং যেমন বাঁচে না শহর থেকে ছিনিয়ে আনা মানুষও তেমনি বাঁচে না। কলকাতা একদিন আমাকে খাবে। কিন্তু তুই যে বড় ভালোবাসতে জানতিস কুঞ্জ!

আমাকেও ভালোবাসাই খেয়ে নিচ্ছে। তুমি কি বাবা? নাকি তুই রাজু? শোনো বাবা, আমি যে কুঞ্জনাথ! কুঞ্জনাথের কি কলঙ্ক মানায়?

রাজু নয়, যেন বাবা অলক্ষে জবাব দেয়, কিন্তু তুই যে একশো বছরের কথা বলেছিলি। মনে নেই? একশো বছর পরের কথা ভেবে দ্যাখ, কেউ মনে রাখেনি এ সব। কে কুঞ্জনাথ আর কীই বা তার কলঙ্ক।

কে লোকটা তা বুঝতে পারে না কুঞ্জ। হয়তো বাবা, হয়তো বাবা, হয়তো রাজু। তার কাছে এখন জীবিত বা মৃত দুই জগৎই সমান। বাবা না রাজু তা বুঝতে পারল না কুঞ্জ। অস্পষ্ট লোকটার দিকে চেয়ে বলল, বড় কষ্ট যে।

তুই যে বড় ভালোবাসতে জানতিস কুঞ্জ। কত ভালোবাসা তোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে, আমি বাঁচব না, বড় জ্বর, বুকে ব্যথা, ডান ফুসফুসে জল জমছে হু হু করে।

বাবা বলে, দূর বোকা, ওঠ না। ডান দিকের আলমারির দু'নম্বর তাকে খুঁজে দ্যাখ।

গড়ানে ঢালের মুখে কুঞ্জ থামে। নিজেকে ঠেলে দেওয়ার আগে একবার দেখে নেয় চারদিক। গহিন খাদ। সবুজ উপত্যকা কোল পেতে আছে। টলতে টলতে সে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়।

কুঞ্জ ডানদিকের আলমারির পাল্লা খুলে হাত বাড়ায়। ওষুধের নাম গুন গুন করতে থাকে আপনমনে।

নয়নশ্যামা

বাস থেকে নেমেই শ্যামা নয়নকে দেখতে পেয়েছিল।

বাস যেখানে থেমেছে, সেখানে জাতীয় সড়কের ধারেই হাট বসেছে। ছোট হাট, তবু সেখানে ব্যাপারির ভিড়, ক্রেতাদের আনাগোনা। মুরগির ঝাঁপি সাজিয়ে একজন দোকানি বসে আছে। তার পাশেই একজন বুড়ো চাষি একটা হাড়—বের—করা গোরু নিয়ে দাঁড়িয়ে। এটা গো—হাটা নয়। তবু বুড়ো কী ভেবে তার গোরু নিয়ে এসেছে কে জানে! সেই মুরগির ব্যাপারি আর গোরু—অলা বুড়োর মাঝ বরাবর নিতান্ত বেমানান পাকা জলপাই রঙের দামি প্যান্ট আর গাঢ় হলুদ জামা গায়ে নয়ন দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে উগ্র জ্বালা, ঠোঁটে সিগারেট।

বাস থেকে প্রথমেই শ্যামা নামল, তারপর বাবা আর মা। শ্যামা নামতে নামতেই নয়নকে দেখতে পেল, ভিড়ের মধ্যেও। একপলক দেখা। বুকটা চমকে উঠেছিল শ্যামার। পরমুহূর্তেই অবশ্য নয়ন গা—ঢাকা দিল ভিড়ের মধ্যে। শ্যামা পলকে চোখ ঘুরিয়ে বাবা—মার মুখ দেখে নিল। বাবা—মার মুখ দেখে বোঝা যায় যে তারা নয়নকে দেখেনি।

অনেকদিন ধরেই নয়ন পিছু নিয়ে আছে। সব জায়গাতেই পিছু নেয়। কিন্তু এতটা আসবে, আগে—ভাগে এসে অপেক্ষা করবে তা কল্পনা করেনি। তার ভিতরটায় এতক্ষণ নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে আসার যে আনন্দটা ছিল তা হঠাৎ কেটে গিয়ে ভিতরটা হঠাৎ পোড়োবাড়ির মতো ভয় ভয় ভাবে ছেয়ে গেল। ভয়টা নয়নের জন্যে। যদি বাবা—মা টের পায় নয়ন এখানে এসেছে তবে কী যে হবে!

হেমন্তকাল। কলকাতায় এ সময়ে শীত নেই। দুপুরে এখন পাখা চলে। শ্যামা গরম জামা কিছু আনেনি। কিন্তু সড়কে পা দিয়েই সে বাতাসে চোরা শীতের টান টের পেল। উঁচু জাতীয় সড়কে দিগন্তের হাওয়া এসে লাগছে। ভিতরটা কেঁপে ওঠে শ্যামার। ভয়ে, শীতে।

কাঁধের শালটা বাবা ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে মা—র দিকে ফিরে বলল, বলি নি তোমাকে মফসসলে এ সময়েই শীত পড়ে যায়।

তাই তো দেখছি। ভর দুপুরেও বেশ বাতাস! এই বলে মা ভেলভেটের খাটো স্টোলটা জড়িয়ে নেয়।

বাবা শ্যামার দিকে ফিরে বলে, তুই তো কিছুই আনলি না। ফেরার সময়ে ঠান্ডা লাগিয়ে বসবি। একেই পাকা টনসিল তোর, আমার শালটা নে বরং।

আমার তো গরম লাগছে।

বাবা একটু হাসে, ওসব কম বয়সের কথা। গরম নেই।

মা বলল, আঁচলটা জড়িয়ে নে গলায়।

শ্যামা তাই নেয়। তার শীত করছে ঠিকই। একটু আগে বাসে গাদাই ভিড়ে বসে সে ঘামছিল। মানুষের গায়ের ভাপে একটা গরম আছে তো। এখন খোলা বাতাস বলে, না কি নয়নকে দেখেছে বলে কেন যেন তার শীত করছে, কাঁটা দিচ্ছে গায়ে।

এইখানে দিব্যি হাট বসেছে দেখছি।

বাবা একটুক্ষণ নাবালের হাটটার দিকে চেয়ে দেখে। ততক্ষণ প্রায় শ্বাস বন্ধ করে থাকে শ্যামা। বাবা চোখ ফিরিয়ে বলে, ফ্রেশ ডিম—টিম, মুর্গি শাকপাতা পাওয়া যায়, ফুলকপি—টপিও উঠেছে বোধহয়। ফেরার সময়ে যদি হাতে সময় থাকে তো দেখা যাবে।

থলে—টলে তো আনোনি। মা বলে।

রুমাল আছে, শ্যামার ভ্যানিটি ব্যাগটাও বড়—সড়—

শ্যামা এতক্ষণে একটু হাসে—আমার ব্যাগে শাকপাতা ঢোকাবে নাকি?

শাকপাতা না হোক, ডজনখানেক ডিম এঁটে যাবে। আঁটবে না?

যদি ডিম ভাঙে তো ব্যাগের দফা শেষ। তখন আর একটা কিনে দেবে তো?

অফিস থেকে রিটায়ারমেন্টের সময়ে ফেয়ারওয়েলে পাওয়া চমৎকার বেনারসি লাঠিখানা একবার ওপরে তুলে আবার নামিয়ে বাবা বলে, ওরে ভাবিস না, হাট যখন একটা থলেও ওখানে কিনতে পাওয়া যাবে।

বাবা, সব জায়গায় তোমার কেবল খাই—খাই।

বাবা একটু হাসে, বলে, খেতে আর তোরা দিস কোথায়! নুন বারণ, ফ্যাট বারণ, এত সব বারণে আর খাওয়ার থাকে কী?

ব্লাডপ্রেশার দু'শোর কাছাকাছি ওঠে কেন? তুমি প্রেশার ঠিক রাখো আমরা সব বারণ তুলে নেব।

আর কমেছে। এটাই শেষ রোগ! একটা তো হয়ে গেছে, আর দুটো স্ট্রোক মোটে পাওনা।

শুনে শ্যামা চুপ করে থাকে। চোখ ছলছল করে। মা ধমক দিয়ে বলে, সবসময়ে তোমার অকথা—কুকথা। যে কোনো ভালো কথার মাঝখানেও তুমি কেবল তোমার রোগ—ভোগের কথা তুলে ফেলো। ওটা ভালো নয়।

জাতীয় সড়ক ধরে একটু এগোলেই ঝকঝকে নতুন একটা কংক্রিটের পোল। নীচে ছোট্ট একটা নদী তর তর করে বয়ে যাচ্ছে। পোল পেরোলেই বাঁ ধারে একটা বিরাট আমবাগান। জাতীয় সড়ক থেকে একটা মেটে রাস্তা নেমে আমবাগানে ঢুকে গেছে।

পোলের ওপর দাঁড়িয়ে বাবা তার নকশাকাটা সুন্দর লাঠিগাছ তুলে মেটে রাস্তাটা দেখিয়ে বলে, ওই হচ্ছে রাস্তা। এখান থেকে মাইলখানেক যেতে হবে।

শ্যামা পোলের রেলিং ধরে ঝুঁকে নদীটা একটু দেখে। জল বড় পরিষ্কার। সেই জলে তার ছায়া পড়ে। চারটে নৌকো পাড়ে বাঁধা। জলের নীচে মাছের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে। জল থেকে চোখ তুলে শ্যামা একবার হাটের দিকে তাকায়। কিছুই বোঝা যায় না। কয়েকটা গোরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, চালাঘরের নীচে দোকানে দোকানে মানুষ। রঙচঙে জামাকাপড় ঝুলছে এধার—ওধার। হলুদ জামা আর জলপাই—রঙা প্যান্ট পরা নয়ন কোথাও নেই। শ্যামা একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে, শুনতে পায় মা বলছে, রাস্তা তুমি ভারী চেন কিনা।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে, চেনার কী? এসব গাঁ—গঞ্জ জায়গা, কলকাতার গোলকধাঁধা তো নয়! বাসে তিনজনকে জিজ্ঞেস করে সিয়োর হয়ে নিয়েছি।

তা হোক। তবু এখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করে নাও। সেবার তুমি দেওঘরে বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলে, মনে নেই। বুড়ো বয়সে কী কাণ্ড।

আরে, সে তো কানাওলায় ধরেছিল বলে। নিজের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছি অথচ বাসা চিনতে পারছি না। কানাওলা হচ্ছে একরকমের স্পিরিট।

তা হোক, তবু জেনেশুনে রাস্তায় নামা ভালো।

হাতে একটা ছোট্ট শোলমাছ নিয়ে এক গেঁয়ো হাটুরে হাট সেরে ফিরে যাচ্ছে, বাবা তাকে জিজ্ঞেস করে, মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ির রাস্তা তো ওইটে, না?

ওইটেই। আমবাগানের ভিতর দিয়ে চলে যান। মোনা ঠাকুরের কাছে যাবেন তো! এখান থেকে মাইলখানেক।

আপনিও ওদিকে যাবেন নাকি?

না। আমি যাব বামুনগাছি। সোজা কোশখানেক গিয়ে ডানহাতি।

ওই দিকটায় লোক চলাচল নেই?

আছে, তবে কম। মোনা ঠাকুরের জন্যেই আজকাল লোকজন যায়। হাট ফুরোলে কিছু লোক ফিরবে। কিন্তু একা হলেও ভয় নেই। রাস্তা নিরাপদ।

সাপখোপ?

লোকটা একটু হাসে, দিনের আলো রয়েছে, ভয় কী। লাঠিটা একটু ঠুকে ঠুকে চলবেন। সাড়া পেলে ওরা রাস্তা ছেড়ে দেয়। মানুষকে সবাই ডরায়। চলে যান, ভয় নেই।

শ্যামা নয়নকে আর দেখতে পেল না বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা খিঁচ ধরে রইল। নয়ন খামোকা এতদূর আসেনি। এসেছে যখন কাছে আসার চেষ্টাও নিশ্চয়ই করবে। ও এখন মরিয়া। ওর প্রাণের ভয় নেই।

বাবা একবার গলা খাঁকারি দিয়ে লাঠিটা বার কয়েক রাস্তায় ঠুকে নিল। বলল, চল।

বড় রাস্তা ছেড়ে তারা মেটে রাস্তায় নামল। তারপরই আমবাগানে ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল জাতীয় সড়ক, ওপারের হাট, নয়ন। গো—গাড়ির চাকায় রাস্তা এমনভাবে ভেঙে দুধারে বসে গেছে যে পাশাপাশি হাঁটা যায় না। আপনা থেকেই তারা আগুপিছু হয়ে গেল। সামনে বাবা, তারপর মা, সবশেষে শ্যামা।

বাবা হাতঘড়ি দেখে বলল, মোটে পৌনে দুটো। আমরা আস্তে হাঁটলেও গিয়ে ফিরে আসতে ঘণ্টা তিনেকের বেশি লাগবে না। সন্ধের আগেই বাস ধরতে হবে।

মা একটু বিরক্ত হয়ে বলে, মঠে—মন্দিরে যাওয়ার সময়ে অত ফেরার তাড়া থাকলে হয় না। তুমি বাপু বড্ড ঘরকুনো হয়েছ আজকাল।

বাবা একটু থতিয়ে গিয়ে বলল, তা নয়। আসলে দিনকাল তো ভালো নয়, তোমাদের গায়ে সোনার গয়না—টয়না রয়েছে।

লোকটা তো বলল ভয়ের কিছু নেই।

ওসব লোকের কথা কি ধরতে হয়? বলে দিল ভয় নেই, তা বলেই কি ভয় নেই? দেশে আনএমপ্লয়মেন্ট, খরা, বন্যা। চারদিকে উপোসি অভাবী লোক। এ সময়ে চোর গুন্ডা, বদমাশ দেশে বাড়েই।

তারের যন্ত্র যেমন বাজে তেমনি তীব্র স্বরে গাছে গাছে পাখিদের ডাক বেজে যাচ্ছে। শুকনো পাতা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পায়ের তলায়। শ্যামার বুক কাঁপছে। একটা পাখির শিস কানে এল। উৎকণ্ঠ হয়ে শুনল শ্যামা। নয়ন নানারকমের শিস দিতে পারে।

বাবা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে, কী ঠান্ডা সুন্দর নির্জন জায়গা এসব। কলকাতায় আমরা যে কী নরকে থাকি। শব্দ আর শব্দ।

মা বলে, গাঁ—গঞ্জ তো ঠান্ডা হবেই।

বাবা আবার হাঁটতে হাঁটতে উদাস গলায় বলে, কলকাতার জমিটা বেচে দিয়ে এসব দিকে চলে এলে কেমন হয়। ফ্রেস বাতাস, ভালো তরিতরকারি, ডিম—দুধ মাছ—

মা বলে, ও তোমাদের মুখের কথা। কলকাতা তোমাদের বশীকরণ করে রেখেছে। সেবার দেওঘরে গিয়ে একমাসও থাকিনি। তুমি কী হুড়োহুড়ি শুরু করলে—এখানে সিগারেটের টোবাকো পাওয়া যায় না, এ নেই, সে নেই—কুড়ি দিনের মাথায় ফিরে আসতে হয় তোমার জন্যেই তো! তুমি আবার থাকবে গাঁয়ে।

বাবা হাসে, বলে সে অবশ্য ঠিক। এক সময়ে যখন মফসসলে চাকরি করতাম তখন কলকাতার নামে ভয় ভয় করত। তারপর কলকাতায় একটা বড় সময়ে থেকে কলকাতার সুবিধেগুলোয় এমন অভ্যাস হয়ে গেল, আর কোথাও সে আরামটা পাই না। ধরো গ্রীষ্মকালে যদি কখনও ফুলকপি খেতে ইচ্ছে করে, কিংবা অসময়ে গলদা চিংড়ি—সে কেবল ওখানেই পাবে। অন্য কোথাও—

শ্যামা হাসে, বাবা, আবার?

চারদিক গভীর অরণ্য—ছায়ার কোথা থেকে আবার সেই শিসটা শোনা যায়। পাখির ডাকের মতো, কিন্তু পাখির ডাক কি না, তা শ্যামা বুঝতে পারে না ঠিক। উৎকর্ণ হয়ে শোনে। তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়।

রাস্তার ওপর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিরঝিরে রোদ এসে পড়েছে। দুলছে আলো—ছায়া, দোলে রহস্য। বিচিত্র অচেনা পাখিরা ডাকে। কে জানে সেইসব অচেনা পাখিদের একজন হয়ে নয়ন ডাকে কি না। পিছন ফিরে একবার তাকায় শ্যামা। সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খায়।

সাবধানে আয়। মা হাত বাড়িয়ে বলে।

ঠিক আছে মা।

কদবেলের গন্ধ পাচ্ছ? বাবা জিজ্ঞেস করে।

মা বাতাস শুঁকে বলে, কী একটা গন্ধ যেন চামসে মতন।

বাবা শ্বাস ফেলে বলে, বাঁদরলাঠি, সেই যে লম্বা লম্বা, সেগুলো ভাঙলেও এরকম গন্ধ বেরোয়।

বুনো কুলের ঝোপ পেরোবার সময়ে বাবা শ্যামাকে ডেকে দেখায়, এই কুল দেখ, বড় পুঁতির মতো হয়, পাকলে ভারী মিষ্টি, মানিকপুরের জঙ্গলে কত খেয়েছি।

বাতাস এখানে ভারী পরিষ্কার, সতেজ, বাতাসে বন্য গন্ধ, ভেজা মাটির সোঁদা মিষ্টি গন্ধটি। ছায়ায় কেমন শীত—শীত করে। শ্যামা তার আঁচল গায়ে জড়ায়! ভিতু খরগোশের মতো চারদিকে চায়। টুপ টুপ পাতা এসে পড়ছে গাছ থেকে। জলের ফোঁটার মতো টুক করে একটু শব্দ হয় কি হয় না। এই ছায়াটি, এই নির্জনতা, এই অচেনা জায়গার সৌন্দর্য কী নিবিড় সুন্দর বলে মনে হত হেমন্তের এই গড়ানে দুপুরে! শ্যামার চোখে যদি নয়নের হলুদ জামা আর জলপাই—রঙা প্যান্টটা না ছায়া ফেলত।

আগাছা রাস্তার মাঝখানে হাত বাড়িয়ে রেখেছে। আঁচলে টান পড়তেই শ্যামা কেঁপে ওঠে, তারপর লজ্জিত মুখে গাছের কাঁটা থেকে তাড়াতাড়ি আঁচল ছাড়ায়। জোরে হাঁটা বাবার বহুকালের অভ্যাস। স্বভাবতই বাবা এগিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে তার আর মা—র জন্য। আগু—পিছু তারা চলে।

তোমার ইচ্ছের জন্যই আসা। কিন্তু আমার মন বলে, তন্ত্রে—মন্ত্রে কিছু হবে না। বাবা উদাস গলায় বলে।

মা চুপ করে থাকে। তাদের মাঝখানে একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

শ্যামা স্তিমিত, নরম গলায় বলে, মোনা ঠাকুরের খুব নামডাক।

শুনেছি। কিন্তু আমরা হচ্ছি ঘরপোড়া গোরু। বুকের মধ্যে ভয়টা সব সময়ে থম ধরে থাকে। তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল বেরিলিতে, তাও পাঁচ বছর হয়ে গেছে। পাঁচ বছরে কত কী হয়ে যায় মানুষের, তার ওপর পাগল মানুষ। বলে বাবা বড় করে শ্বাস ছাড়ে।

মা—র পা ধীর হয়ে আসে। তারপর একটু ধরা গলায় বলে, যা হবার তা হয়েছে, তুমিও তো আর জ্যোতিষ নও।

সন্ন্যাসী—ফকিরের পিছনে তো কম ঘোরা হল না।

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ঘুরব। আমরা চোখ বুজলে তখন তার যা হওয়ার হোক।

বাবা মাথা নেড়ে বলে, আমার মনে হয় না যে সে বেঁচে আছে।

বে—ফাঁস কথা। এ কথাটা মা কোনোদিন সহ্য করতে পারে না। দাঁড়িয়ে পড়ে মা হাঁফাতে থাকে। তীব্র স্বরে বলে, তোমার কেবল ওই কথা। কিন্তু সে গেছে বলে যতদিন না জানতে পারছি ততদিন তোমাকেও ঘুরতে হবে। আমাকেও। মা—র কাছে ছেলে যে কী তা কোনোদিন বাবা বুঝতে পারে না।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গিয়ে বলে, আমি তো ঘুরিই। ঘুরি না? বলো!

আবার তারা হাঁটতে থাকে। আগু—পিছু হয়ে। অচেনা পাখিরা ডাকে। গাছের ছায়ায় শীত জমে ওঠে। ঠান্ডা মাটি থেকে শীতলতা উঠে আসে। চারদিকে রহস্যময় আলো—আঁধারি। এর মধ্যেই কোথাও অলক্ষ্যে নয়নও চলেছে সঙ্গ নিয়ে। হয়তো পাখি হয়ে। হয়তো গাছের ছায়া হয়ে। শ্যামার বড় ভয় করে।

এখানকার তাড়িটা ভালোই। নয়ন ঠোঁটের ফেনা মুছে নেয়। এখন ঠিক এই সময়ে তাড়ি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তার। অনেক কাল নেশা—ভাঙ করেনি সে। ছেড়েই দিয়েছে। কিন্তু কে জানত যে এখানে কলকাতা

থেকে মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল দূরে, ভর দুপুরে এমন শীত করবে! নেশাটা সেই জন্যই করা। তবু, যাকে ঠিক নেশা বলে তা হয়নি।

তাড়িটা কিন্তু ভালোই। খারাপ কিছু মেশায়নি। পরিষ্কার গন্ধ, চনচনে স্বাদ। শীত ভাবটা কেটে গেল। ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে বলল, তোমাদের এখানে এত শীত কেন হে?

শীত হয় না এ সময়ে। ক'দিন বৃষ্টি গেল পরের পর। আজ দু'দিন টেনে হাওয়া দিচ্ছে দেখছি। তাড়িওয়ালা যুবকটি বলল।

একটু আগে শ্যামা তার মা—বাবার সঙ্গে নেমেছে। কোথায় যাবে তা নয়ন জানে। তাই পিছু নেয়নি, হাট পেরিয়ে দক্ষিণে গেলে একটা বাঁশের সাঁকো আছে। সেইটে দিয়ে পেরিয়ে নয়ন সর্টকাট—এ আমবাগানের গহীন জায়গাটায় পৌঁছে যাবে। তাড়া নেই। ওরা যে জোর হাঁটবে না—এ তো জানা কথা।

নয়ন হাই তুলে জিজ্ঞেস করে, চাষবাস করো?

আজ্ঞে না। বাবা করে একটু—আধটু, বছরের চালটা উঠে আসে। আমার একটা চায়ের দোকান আছে বল্লভপুরে।

তালগাছ ক'টা?

অনেক। ওইটাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে। বলে হাসে তাড়িওয়ালা।

ঝান্ডাওয়ালারা গাঁয়ে আসে না?

আসে।

কোন ঝান্ডা বেশি আসে?

সব রকমই। সবাই ভালো ভালো কথা বলে।

তোমরা কোন ঝান্ডার দলের?

সে কি বলা যায়? আমরা এখন চালাক হয়ে গেছি।

ভোট—টোট দাও?

দিই মাঝে মাঝে।

নয়ন হাসে। বলে, খুব চালাক হয়ে গেছ তোমরা। ফসল—টসল কেমন হয়?

হয়। এদিকটায় বৃষ্টি বেশ। আমনের ফসল ভালো এবার।

ফসল রাখতে পারো? কেটে নিয়ে যায় না?

নেয়, আবার রাখিও। যে যেমন পারে।

নয়ন লোকটার চোখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। লোকটা চোখ নামিয়ে নেয়। নয়ন হেসে বলে, তোমরা খুব চালাক হয়ে গেছ।

চনচনে খিদে পেয়েছে। নয়ন মাটিতে বসে ছিল, এবার উঠল। উঠতেই টের পেল প্যান্টের পিছন দিকটা ভেজা—ভেজা। বৃষ্টি হয়ে গেছে খুব। মাটির ভিতরে চোরা জল। রসস্থ মাটি। নয়ন কয়েক পা জুতোর হিল চেপে হেঁটে দেখল নরম মাটিতে জুতো বসে যাচ্ছে।

পাশেই তেলেভাজার দোকান। সেখানে বেশ ভিড়। গন্ধটাও ছেড়েছে ভালো। কিন্তু যে লোকটা ভাজছে তার কবজির কাছে একটা শ্বেতীর মতো দাগ দেখে নয়ন আর তেলেভাজা কিনল না। তিনটে কাঁচা মুরগির ডিম কিনে চায়ের একটা স্টলে গিয়ে দু'কাপ চা খেল পর পর। তারপর বাচ্চা ছেলেটাকে ডিম তিনটে দিয়ে খুব অবহেলায় বলল, সেদ্ধ করে দে।

ছেলেটা এক পলক নয়নের চোখে চোখ রাখল। তারপর চায়ের কেটলির পাশেই উনুনের ওপর একটা মগে সিদ্ধ চাপিয়ে দিল।

তিনটে সেদ্ধ ডিমের প্রথমটা খেতেই বিস্বাদে ভরে গেল নয়নের মুখ। নেশার মুখে সেদ্ধ ডিম বড়ই পানসে। কোনোক্রমে আঁশটে গন্ধের দলাটা গিলে সে দুটো ডিম পকেটে রাখল। তারপর ফিরে এল

তাড়িওলার কাছে।

আর এক ভাঁড়।

তাড়িওলা ভাঁড় হাতে দিয়ে বলে, নির্ভয়ে খান। এর নেশা খুব পাতলা। বাবু, আপনার কোন ঝান্ডা?

নয়ন ভাঁড় মুখে দিয়ে কুলকুচো করে মুখের বিস্বাদ তাড়িয়ে বলে, জানলে যদি প্যাঁদাও বাপু!

লোকটা হেসে বলে, ওরেব্বাস রে। কলকাতার বাবু আপনারা, ধমক দিলে হেগেমুতে ফেলি।

খুব চালাক, না? আমার ঝান্ডা লাল, বুঝলে? তবে লালটা অনেকটা রক্তের মতো, অন্য সব ঝান্ডার সঙ্গে মেলে না। আমার নিজের ঝান্ডার রঙকে আমি নিজেই ভয় পাই।

লোকটা হেঁয়ালি শুনে চেয়ে থাকে।

নয়ন দাঁড়ায় না। এবার রওনা হওয়া উচিত। শ্যামা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নয়ন হাঁটতে থাকে। দু'পকেটে দুটো ডিম ফুলে থাকে। নয়ন গ্রাহ্য করে না। লম্বা পায়ে হাটটা পেরিয়ে সে একটা ঢিবির ওপর উঠে আসে। দক্ষিণে সাঁকো, সঠিক জায়গাটা চেনে না নয়ন। এগিয়ে বাঁশঝাড়টা পেরোলে বোঝা যাবে। নয়ন হাঁটতে থাকে। হেমন্তের দুপুরকে শূন্য করে দিয়ে হু হু করে কোকিল ক্ষণেক ডেকে উঠেই চুপ করে যায়। নয়ন ঢিবির উৎরাইটা দৌড়ে নামতে নামতে অবিকল কোকিলের ডাকটা ডাকতে থাকে। কুহু কুহু কুহু...

শ্যামা যতক্ষণ পৃথিবীতে আছে ততক্ষণ ক্লান্তি নেই। সে এখানে এসেছে শ্যামারা আসবার তিন—চার ঘণ্টা আগে। নয়নের হাতে ঘড়ি নেই। থাকলে ঠিক সময়টা বোঝা যেত। ঘড়িটা ইচ্ছে করেই পরেনি নয়ন। যখন শ্যামার জন্য সে কোথাও যায় তখন সে সময়ের পরোয়া করে না। তখন তার কাছে জীবনটাই একটা অখণ্ড, অনন্ত সময়। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কতদূর যেতে হবে তার কোনো ঠিক থাকে না। তবে সবটুকু সময় দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত থাকে। যখন নয়ন এখানে এসেছে তখন হাটটা ভালো করে জমেনি। ব্যাপারিরা আসছে সবে, চত্বরটায় তখনও বিশৃঙ্খলা। জিনিসপত্রের টাল জমছে, চায়ের দোকানের উনুনে তখনও আঁচ পড়েনি। গত তিন—চার ঘণ্টা ধরে নয়ন হাটটাকে জমে উঠতে দেখেছে।

কিংবা বলা যায় নয়ন কিছুই দেখেনি। তার চারধারে পৃথিবীর কিছু অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় মানুষেরা অকারণে ভিড় জমিয়েছে—এইটুকু মাত্র সে টের পেয়েছে। শ্যামা যতক্ষণ আসেনি ততক্ষণ এ জায়গাটার কোনো সৌন্দর্য ছিল না, তাৎপর্য নয়। ততক্ষণ সে অদূরে তাড়ির কলসিটাও লক্ষ করেনি। শ্যামাকেও বাস থেকে নামতে দেখে লুকোবার সময়ে সে গিয়ে প্রায় তাড়িওয়ালার গায়ে হোঁচট খেল। তখনই টের পেল। উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে, এ জায়গাটায় শীত পড়েছে বেশ।

বাঁশ—ঝাড়ের পাশ দিয়ে পায়ের রাস্তাটা ঘুরে গেছে। ঝরা বাঁশপাতায় পুরু গালচের মতো হয়ে গেছে রাস্তা, পা রাখলে নরম লাগে। আরও দু'বার কোকিলের ডাক ডাকল নয়ন।

বাঁশ—ঝাড়টা পেরোলেই দেখা যায় শ্মশান। চাতালটা খাঁ খাঁ করছে। গত রাতে কারা মড়া পুড়িয়ে গেছে, কালো আংরার দাগ ছড়িয়ে আছে, ইতস্তত কাঠকয়লা। ওদের ঘর অনতিদূরে। খোড়ো ঘরের সামনে বসে এক মধ্যবয়সী মেয়েছেলে নিজের রুক্ষ চুলে আঙুল ডুবিয়ে উকুন খুঁজছে।

এ ধারে নদীর ওপর একটা বাঁশের সাঁকো আছে না? নয়ন তাকে জিজ্ঞেস করে।

মেয়েছেলেটা তাকে চোখ ছোট করে একপলক দেখে নিয়ে বলে, সে তো ভেঙে গেছে প্রায়। আরও দক্ষিণে।

পেরোনো যাবে না?

মেয়েছেলেটা উদাস গলায় বলে, কে জানে! লোকে তো এখনও পার হয়।

গত তিন—চার ঘণ্টা উগ্র উত্তেজনায় শ্যামার জন্য অপেক্ষা করছে নয়ন। কিছু খায়নি। চনচনে খিদের মুখে পাতলা তাড়িটা তাকে ধরেছে ভালো। গা জ্বালা করছে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে ভিতরের গেঞ্জি। গলা বুক শুকিয়ে আসছে। কিন্তু এগুলো কিছুই গ্রাহ্য করার মতো ব্যাপার নয়। খিদে—তেষ্টা, শীত—গ্রীষ্ম কোথায় যে উড়ে যায় এসব সময়ে! চারদিকটা নির্জন হয়ে যায় যেন। কেবল নয়ন থাকে, থাকে শ্যামা।

নয়ন জানে, শ্যামা তাকে দেখেছে। দেখে নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে গেছে সে। ওই আমবাগানে আবার তাকে পিছু নিতে দেখলে শ্যামা কী করবে? সেবার পিকনিক গার্ডেনসে তার কলেজের বান্ধবী আর বন্ধুদের সঙ্গে যখন গিয়েছিল শ্যামা তখনও এইরকম ভাবে দেখা হয়েছিল। শ্যামা তাকে দেখেছিল কিন্তু কিছু করেনি। যদি ইচ্ছে করত শ্যামা, যদি নয়নের সেই পিছু—নেওয়ার কথা বলে দিত তার বন্ধুদের তবে সেইসব বন্ধুরা পিষে ফেলতে পারত নয়নকে। কিন্তু শ্যামা অতটা করেনি। শ্যামা সে রকম মেয়ে নয়। নিষ্ঠুরতা তার স্বভাবে নেই। আবার শ্যামার মতো নিষ্ঠুরও হয় না।

বাঁশঝাড়, কাঁটাঝোপ, বন—করমচার ভিতর দিয়ে উঁচু—নিচু পায়ের রাস্তা চলে গেছে। জঙ্গুলে জায়গা, ঘরবাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ ধারে আবাদ দেখা যায় গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে। সিকি মাইল গিয়ে নয়ন বাঁশের সাঁকোটা দেখতে পেল। চারদিকে হেমন্তের পাতাঝরা গাছ। নির্জন শীতলতা। সেই নিঝুমতায় বাঁশের সাঁকোটা বুড়ো জীর্ণ হয়ে ঝুলছে। জলে ছায়া দেখছে নিজের। কাছে গিয়ে নয়ন দেখে, পা রাখার জন্য একটি মাত্র বাঁশ অবশিষ্ট আছে, আর দু'ধারে ধরার বাঁশ নেই। পার হওয়া বেশ শক্ত। কিন্তু ওপারে শ্যামা আছে, নয়নের কিছুই তেমন শক্ত মনে হয় না।

বারবার পা পিছলে গেল, ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পড়তে ঝুলে আবার উঠতে হল, তবু হামাগুড়ি দিয়ে সাঁকোটা ঠিকই পার হয়ে গেল নয়ন। তারপর নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন বনভূমিতে ঢুকল। তারপর কেবল পাখির ডাক, আর ঝিঁঝির শব্দ এবং বন্য গাছের আর ভেজা মাটির গন্ধ। আগাছা, ঝোপ আর ছায়ার ভিতর দিয়ে রাস্তাটা গেছে। কিন্তু এ রাস্তায় যে লোক চলাচল খুব কম, তা রাস্তার অস্পষ্ট চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায়। পায়ে হাঁটা রাস্তার মাঝখানে ঘাস উঠেছে।

পাখির ডাক নকল করতে করতে নয়ন হাঁটে। যত বিচিত্র ডাক শোনে ততই বিচিত্র ডাক সে হুবহু নকল করে। ভরদুপুরে খিদেপেটে তাড়িটা গেঁজে উঠছে। নয়নের চোখের পাতা ভারী ভারী, শরীরের ভিতরটা ঘুম—ঘুম। হাই উঠছে। কোনো গাছের ছায়ায় শরীরটা একবার পেতে দিলে দিনটা নিঃসাড়ে কেটে যাবে। কিন্তু সে কথা নয়ন ভাবতেই পারে না। সে এগুচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে পুবে। শ্যামা এই বনভূমিরই উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে আসছে। রাস্তায় তাদের দেখা হবে। এখন এই আমবাগানের বাতাসে শ্যামার গন্ধ আছে, স্পর্শ আছে। নয়নের হাজার বছর ধরে জেগে থাকতে ইচ্ছে করে।

কিছুদূর গিয়েই নয়ন ভগ্নস্তূপটা দেখতে পায়। বিশাল বাড়ি ছিল কোনোকালে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে বাড়িটার দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ইঁটের ভিতর থেকে, মেঝে থেকে বড় বড় গাছ উঠেছে। চারদিকেই ছড়ানো ইট—পুরনো শ্যাওলায় কালো। পায়ে হাঁটা পথটা ভগ্নস্তূপটা এড়িয়ে ঘুরে গিয়ে অদূরে রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। কিন্তু সে পথে যায় না নয়ন। গেলে রাস্তা থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। সে রাস্তা ছেড়ে ধ্বংসস্তূপটার ভিতরে উঠে যেতে থাকে।

যেখানে ইঁট সেখানেই সাপ। পুরনো বাড়ি, ইঁটের খাঁজ, এ হচ্ছে সাপের প্রিয় আস্তানা। নয়ন তা জানে, তবু সাপের কথা তার মনেই আসে না। আকীর্ণ শ্যাওলায় পিছল ইঁটের খাঁজে খাঁজে পা রেখে, হোঁচট খেয়ে, তাল সামলে সে বাড়িটার দিকে উঠে যায়। ওই বাড়ির উঁচু ভিত থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাবে। দেখা যাবে শ্যামাকেও। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখবে নয়ন। বিপদ—আপদের কথা তার মনেও থাকে না।

ওরা আসছে ঘুর রাস্তায়, আস্তে হেঁটে। নয়ন এসেছে চোরা পথে, অনেক তাড়াতাড়ি। তবু নয়নের হঠাৎ ভয় হয় শ্যামা জায়গাটা পেরিয়ে যায়নি তো। তাড়ির ঘোরে তার হয়তো সময়জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে। সে হয়তো খুব আস্তে হেঁটেছে।

মোটা মোটা কয়েকটা থাম দাঁড়িয়ে আছে। বেশ পুরু দেয়াল। এখন কোথাও কোথাও দেয়ালে পঙ্খের কাজের চিহ্ন দেখা যায়। থামের শীর্ষে কিছু কারুকাজ। একটা লোহার বরগা আড়াআড়ি মাথার ওপর রয়ে গেছে আজও। আগাছা ভেদ করে নয়ন ক্রমে বাড়ির ভিতের ওপর উঠে আসে। চারিদিকে রহস্যময় ফাটল, ভিতরে ভিতরে হাঁ করা জায়গাগুলোতে পাতালের অন্ধকার। চারদিকেই কাঁকড়া—বিছেদের আস্তানা। একটা

পিপাসা, একটা শিরা ছিঁড়ে যাওয়া প্রতীক্ষায় তার শরীরটা টান টান। বুকের ভিতরটা ধক ধক করে, চোখ জ্বলে, ঠোঁট শুকিয়ে আসে, জ্বর জ্বর লাগে শরীর। তাড়িটা না খেলেই পারত সে। শরীরটা এখন কেমন কাঁপছে। খিদে মরে গিয়ে দুর্বল লাগে হাত পা। ঘুম পায়।

নয়ন জানলা—দরজাহীন দেয়ালগুলোর ভিতর দিয়ে এদিকে—ওদিকে একটু ঘুরে দেখে। চারদিকে স্তূপ হয়ে ইঁট, বালি আর রাবিশ পড়ে আছে। ঘুরে ঘুরে সে আসে সামনের দিকটায়। একটা প্রকাণ্ড থাম দেখতে পেয়ে দাঁড়ায়। একটু বসতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু বসে না। হাত বাড়িয়ে থামের গায়ে ভর দেয়। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে ওঠে। তার মনে হয়, ভর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থামটা একটু দুলে উঠল। সে সভয়ে প্রকাণ্ড উঁচু থামের দিকে চায়। তারপর হাসে। ভয়টা কেটে যায়। হয়তো তাড়ির নেশায় ভুল বুঝেছে ভেবে আবার থামটার গায়ে ভর রাখে, আবার মনে হয়—থামটা দুলে উঠল। কিন্তু এবার আর চমকে সরে গেল না নয়ন। ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনে নির্জন রাস্তাটার দিকে চেয়ে রইল। ভাঙাচোরা রাস্তা, দু'ধারে গোরুর গাড়ির চাকার খাদ, সেই খাদে কাদা জমে আছে। সারা বছর ওই কাদা কমই শুকোয়। চারদিকে পাখি ডাকে। কেবল পাখি ডাকে। অন্যমনে বে—খেয়ালে নয়নও ডাকতে থাকে। প্রথমে দোয়েলের মতো, তারপর কুবো পাখির শব্দ করে, তারপর কোকিলের মতো ডাকে।

তারপর ক্লান্তি লাগে। হরবোলা হয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। চাই নিজস্ব একটি শব্দ, নিজস্ব ডাক। নিজের শব্দটা কোনোদিনই খুঁজে পায় না নয়ন। চব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেল। ক্লান্তি লাগে, তবু অভ্যাসবশত সে ডাকে। প্রায় সমস্ত শ্রুত শব্দই হুবহু গলায় তুলে আনতে পারে সে। পাখপাখালির বিচিত্র ডাক, চাঁদের দিকে চেয়ে কুকুরের কান্না, বেড়ালের বিবাদ, ইঞ্জিনের হুইশল, কিংবা এ রকম অনেক কিছু। কিন্তু হরবোলা হয়ে থাকার ক্লান্তি বড় ভীষণ। সে তো ওই সব শব্দের কোনোটারই মূল উৎস নয়! সে পাখি নয়, শেয়াল কুকুর বা রেল ইঞ্জিনও নয়। সে নয়ন রায়। তার নিজস্ব শব্দ কোনটা? কোথায় তার নিজের ডাক? যে ডাক শুনলে শ্যামা সাড়া দেবে?

দূর থেকে একটা মেয়েলি গলার অস্পষ্ট স্বর শুনতে পেল নয়ন। উৎকর্ণ হয়ে রইল। তার গায়ে দিল কাঁটা। একটু শুনেই বুঝল এ শ্যামা বা তার মায়ের গলা নয়। বোধহয় একটা বাচ্চা ছেলে তার বাবাকে ডেকে কিছু বলল, একটা পুরুষের গলা উত্তর দিল। ভগ্নস্তূপের দক্ষিণে বনের মধ্যে তারা কিছু খুঁজছে। গাঁ—গঞ্জের লোকেরাই হবে। নয়ন গা করল না। হাত বাড়িয়ে বুক—সমান আগাছার জঙ্গল থেকে একটা ডাল ভেঙে দাঁতে চিবোতে লাগল। তিতকুটে স্বাদ, গন্ধও বিচ্ছিরি। কিন্তু সেসব তেমন খেয়াল করে না সে। অন্যমনে ডালটা চিবোতে থাকে।

কোনো সুখই কখনো পরিপূর্ণ নয়, বুঝলে। আমাকেই দেখো, চিরকাল ভালো চাকরি করেছি, পয়সা যথেষ্ট পেয়েছি। ছেলেমেয়ের দিক থেকেও সুখীই ছিলাম। একটা ছেলে একটা মেয়ে—সুস্থ সবল। কোথা থেকে কী হয়ে গেল—

তুমি রাস্তা দেখে চলো। হোঁচট খাচ্ছ।

বাবা রাস্তা দেখতে গিয়ে ঝুঁকে লাঠিটা বার কয়েক ঠোকে। তারপর একটা 'হু—উম' শব্দ করে আপনমনেই বলে, কোনো সুখই চিরস্থায়ী নয়।

অদূরে একটা শেয়ালের হাসি শোনা যায়। পরমুহূর্তেই একটা কোকিল হু—হু করে ডেকে উঠেই স্তব্ধ হয়। বাবা থমকে দাঁড়িয়ে বলে, শেয়াল ডাকছে।

মা বলে, তাতে কী। এসব জায়গায় শেয়াল তো থাকবেই।

বাবা চিন্তিত মুখখানা ফিরিয়ে বলে, সে কথা বলছি না। দিনের বেলা শেয়াল বড় একটা ডাকে না।

তোমার বাপু বড় ভয়।

বাবা ভ্রূ কুঁচকে বলে, কোকিলটাই বা হঠাৎ ডেকে উঠে থেমে গেল কেন?

তাতেই বা কী?

কিছু না।

শ্যামার বুকটা খামচে ধরে এক ভয়। শেয়ালের ডাক নয়ন হুবহু ডাকতে পারে তা শুনলে কারও অন্যরকম সন্দেহই হবে না। কিন্তু এ ডাকটা যেন শেয়ালের ডাকের মধ্যে একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে দেওয়া। নয়ন কি তাই করছে? কোকিলের ডাক ডেকেই সে চুপ করে গেল কেন? সে কি শ্যামাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, সে এখানে আছে, অদূরে?

হরবোলা নয়নকে বাবা তো জানে। যদি নয়ন ডাকগুলো ঠিকমতো না ডাকে তবে বাবা বুঝতে পেরে যাবে। বুঝলে কী হবে শ্যামা ভেবে পায় না।

একটা বুনো ঝোপের পাশ দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। সেই বাঁকটা ঘুরতেই বাবা বাহারি লাঠিগাছ তুলে হেঁকে বলল, ওই দেখ, কোনও রাজারাজড়ার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। কী বিরাট বাড়ি ছিল, অ্যাঁ!

দেখছি।

শ্যামাও দেখল। বাঁ ধারে, রাস্তা থেকে দূরে নয়, কয়েকটা থাম গম্বুজ পুরু দেওয়াল মিলিয়ে বিশাল এক বাড়ি। তাতে অশ্বত্থ, বট আগাছার জঙ্গল। কিছু একটা আন্দাজ করে শ্যামা চেয়ে ছিল। হঠাৎ সে দেখল কিংবা তার চোখের ভুলও হতে পারে—বিশাল ভারী একটা থাম যেন খুব সামান্য একটু দুলে গেল। পলকে মুখ সাদা হয়ে গেল শ্যামার। সে কোথাও কাউকে দেখে নি, কিন্তু হঠাৎ খুব নিশ্চিতভাবে তার মনে হল, নয়ন ওইখানে আছে। ওই থামটার আড়ালে। ওইখান থেকেই সে শ্যামাকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপ মেশানো শেয়ালের ডাক ডেকেছিল, কোকিল ডেকে থেমে গিয়েছিল। থামটা কি নড়ল সত্যিই? যা পুরনো বাড়ি নড়তেও পারে। যদি থামটা ভেঙে পড়ে এখন, যদি চাপা পড়ে মরে যায় নয়ন, তবে কি শ্যামা দুঃখ পাবে! ঠিক বুঝতে পারে না শ্যামা।

অনেক নীল আর বেগনে বুনো ফুল ফুটে আছে।

মা, আমি কয়েকটা ফুল তুলি। কী সুন্দর ফুল! শ্যামা বলে।

এসব জঙ্গলে সাপখোপ আছে।

কিছু হবে না। কয়েকটা তুলব।

মা—বাবা দুজনেই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। দাদার কথা উঠলেই তাদের এ রকম হয়।

আমরা দাঁড়াই, তুই তোল। মা বলে।

শ্যামা মাথা নাড়ে, দাঁড়াবে কেন? তোমরা এগোও না। বা আস্তে হাঁটো তোমরা, আমি ঠিক পা চালিয়ে ধরে ফেলব।

দেরি করিস না কিন্তু! এই বলে ব্যাপারটায় আর গুরুত্ব না দিয়ে বাবা আর মা হাঁটতে থাকে। দুজনে এখন দাদার কথা বলবে, শ্যামার জন্য দুশ্চিন্তা এখন অবান্তর।

শ্যামা তা—ই চায়। তার ধারণা, ওই পুরনো ভেঙে—পড়া বাড়ির কোনো ঘুপচিতে ঠিক নয়ন আছে। কোনো যাদুবলে নয়ন ঠিক তাদের আগে আগে এসেছে, অপেক্ষা করছে। এটা ভালো নয়। শ্যামা একবার নয়নের মুখোমুখি হতে চায়। এই নির্জন জায়গায় বিপজ্জনকভাবে পিছু নিয়েছে নয়ন? ঠিক ধরা পড়ে যাবে। বাবা যদি দেখতে পায় নয়নকে। গত মাসেও একবার বাবার প্রেশার দু'শো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। দরকার হলে শ্যামা নয়নের পায়ে ধরে বলবে—ফিরে যাও। শ্যামা তাই বাবা—মাকে এগিয়ে দিতে চায়। এখন একা এই বনভূমিতে বেরিয়ে আসুক নয়ন। শ্যামা মুখোমুখি হবে।

বাবা আর মা এগিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেল। কিছুক্ষণ তাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল দূর থেকে। শ্যামা একটু অপেক্ষা করে রাস্তা ছেড়ে বুনো ঝোপগুলোর কাছে এসে দু'—একটা ফুল তুলল অন্যমনস্কভাবে। ফুলের প্রতি তার তেমন কোনো মোহ নেই। গন্ধহীন এইসব বুনো ফুল দিয়ে কী করবে শ্যামা!

শ্যামা কেবল বারবার প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকায় আর অপেক্ষা করে। নয়ন সমস্ত ব্যাপারটাই দেখেছে। দেখেছে শ্যামার মা—বাবা এগিয়ে গেল শ্যামাকে একা রেখে। দেখেছে, শ্যামা এখন একা। এরকম সুযোগ নয়ন ছাড়বে না নিশ্চয়ই?

কিন্তু অপেক্ষা করে লাভ হল না—সমস্ত বনভূমি নির্জন। কোথাও নয়নের সাড়াশব্দ নেই। তবে কি সত্যিকারের শেয়ালই ওরকম ডেকেছিল? নয়ন নয়? শ্যামা একটু দ্বিধায় পড়ে যায়। বনভূমির কোনো গভীর থেকে দুটো অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পায় শ্যামা। কে যেন কাকে ডাকছে। চারদিকে নির্জন, গভীর ছায়া, শ্যামার গা ছমছম করে। বাতাস দেয়, শীত করে শ্যামার। একটু পিপাসা, জ্বরভাব, একটু ভয়—এইসব মিলে এমন সুন্দর ছায়ায় ঢাকা দুপুরটা অস্বস্তিকর লাগে শ্যামার কাছে।

অনেকটা জমি ফাঁকা ফাঁকা। কয়েকটা বুনো ফল আর কাঁটাঝোপ ছাড়া বাড়িটার সামনের জমিতে কিছু নেই। চারদিকে একসময়ে উঁচুঘেরা—পাঁচিল ছিল। সেই পাঁচিল ভেঙে পড়ে গেছে। কোথাও কোথাও শুধু কয়েকটা অদ্ভুত চেহারার ইটের গাঁথনি দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে দেখার জন্য শ্যামা কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ডাকল নয়ন! নয়ন...

কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু একটু দূর থেকে একটা ঘুঘু পাখির ডাক শোনা গেল। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শুনল। কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই। নয়ন সব ডাকই হুবহু ডাকতে পারে। যখন ডাকে তখন নয়ন সত্যি—সত্যিই পাখি হয়ে যায়, কিংবা জীবজন্তু। মানুষ থাকে না। নয়নের ওই রহস্যময়তা মাঝে মাঝে শ্যামার বুকে ভয় হয়ে থাবা গেড়ে বসে।

চারদিক আকীর্ণ পুরনো বাড়িটার ভেঙে—পড়া ইট, কাঠ আর আবর্জনার ভিতরে শ্যামা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল। ছায়া দোলে, একটা পাথরের ফোয়ারার চারধারে গোল জলাধার দেখা যায়। জল নেই, গাছ গজিয়েছে। ফোয়ারার মুখ কাত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। তার পাশেই একটা গোলাপ গাছ। একটা লাল গোলাপ ফুটে আছে একা। শ্যামা একটু এগিয়ে গোলাপটা তুলে নিল। তারপর ফিরে এল রাস্তায়। আপাদমস্তক শিউরে উঠে দেখল, নয়ন তার মুখোমুখি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে হাসি। কোমরে হাত।

ধক ধক করে শ্যামার বুকের ভিতরটা নড়ে গেল। সে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল নয়নের দিকে। হলুদ জামা আর পাকা জলপাই রঙের প্যান্ট নয়নকে তেমন কিছু ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না। নয়নের উচ্চতা স্বাভাবিক, স্বাস্থ্য মাঝারি, মুখখানা একটু ভাঙাচোরা হলেও কমবয়সের লাবণ্য আছে। গালের দাড়ি এখনও নরম। গোঁফ জোড়া ছাঁটেনি বলে অনেক বড় হয়ে গাল পর্যন্ত পৌঁছেছে। গায়ের রং না ফর্সা, না কালো। একনজরে দেখলে নয়নের ভিতরে দেখবার কিছু নেই। ঘেন্না বা উপেক্ষারও কিছু নেই। বড় বড় চুলে ঘেরা মুখখানায় কেবল চোখ—জোড়াই যা একটু অন্যরকম। শ্যামার দাদার অনেকটা এরকম চোখ ছিল। নয়নের চোখজোড়া খুব নিষ্ঠুর। তাতে সহজে পলক পড়ে না। চোখের তারায় একটু কটা ভাব। মণির মাঝখানে দুটো ছ্যাদা দূর থেকেও দেখা যায়। শ্যামার দাদা বিবেকানন্দর ভক্ত ছিল। খুব ধর্মের বই পড়ত। একা একা ধ্যান করত অনেক রাত পর্যন্ত ঘরে। সাদা দেয়ালে একটা ছোট্ট ফোঁটা বা চিহ্ন দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকত। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, কলিযুগেও মানুষ ইচ্ছে করলে তিন দিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারে। দাদা একবার চেষ্টা করেছিল তিনদিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ার। একদিন সেই চেষ্টায় সকাল থেকে খিল দিয়ে বসল, বহু ডাকাডাকিতেও সাড়া দিল না, দরজা খুলল না। দ্বিতীয় দিনও না। সেদিন পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গেল বাড়িতে, মা কাঁদতে শুরু করে, বাবা অফিসের কাজে বাইরে মফসসলে গিয়েছিল, ফিরে এসে রাগারাগি শুরু করে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে দরজা ভেঙে যখন দাদাকে বের করা হয় তখন তার চোখ ঘোলাটে লাল, মুখে রক্ত ফেটে পড়ছে, ভুল বকছে। সেই ভুল বকা চলতেই থাকল। বড় ডাক্তার দেখে বলল, পাগলামি শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, আপনারা টের পাননি। অনেক পাগল এরকম থাকে, বোঝা যায় না। মানুষের নিষ্ঠুরতার শেষ নেই। যখন বাড়িতে একমাত্র ছেলের জন্য উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় সকলের খাওয়া ঘুম ছুটে যাচ্ছে, তখন অন্যধারে

পাড়ার ছেলেরা দাদাকে দেখতে পেলেই 'ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী' বলে চিৎকার করে ক্ষ্যাপাত। ব্রহ্মজ্ঞানী শব্দটা শুনলেই চনমন করত দাদা, বড় বড় চোখে চারদিকে তাকাত। অবিরল কথা বলতে থাকত। অর্থহীন কথা। বোঝা যেত, সে যা বলতে চায় তা বাক্য হয়ে বেরোচ্ছে না। কিন্তু সে একটা বিশেষ কথা বলতে চায়। তার কিছু বলার আছে। সেই সময়ে দাদার চোখ ছিল অনেকটা নয়নেরই মতো। শ্যামার মাঝে মাঝে নয়নকে ডাক্তারের সেই কথাটা বলতে ইচ্ছে করে—তোমার পাগলামির শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, তা বুঝতে পারছ না নয়ন। কিন্তু তা বলে না শ্যামা। বললে নয়ন বুঝি সত্যিকারের পাগলই হয়ে যাবে।

নয়ন দু'পা এগিয়ে এসে বলে, কার জন্য গোলাপ?

শ্যামা কিছুক্ষণ তার দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে বলে, তুমি কেন এসেছ নয়ন?

আগে বলো গোলাপ কার জন্য?

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলে, নয়ন, তোমাকে দেখলে বাবা কীরকম ক্ষেপে যায় জানো তো! গত মাসেও একবার প্রেশার দু'শো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উত্তেজনা বাবার পক্ষে ভালো নয়। তোমাকে কতবার বলেছি!

নয়ন তার অকপট মুখে হেসে বলে, যখন গোলাপটা তুলছিলে তখন কার কথা তোমার মনে পড়েছিল শ্যামা?

আমার বাবার জন্য তোমার কোনো সিমপ্যাথি নেই। শ্যামা রেগে গিয়ে বলে, কোনোদিন তুমি অন্যের কথা ভাবো না। তুমি খুব বাজে হয়ে গেছ, দিন দিন আরও বাজে হয়ে যাচ্ছ।

কপালের ওপর এসে—পড়া ঝুরো চুলের একটা গুছি টেনে নিয়ে আঙুলে জড়াতে জড়াতে গম্ভীর হয়ে নয়ন বলে, আমি কেবল গোলাপটার কথা জানতে চাইছি শ্যামা। কার জন্য ওটা তুলেছ?

তুমি ফিরে যাও।

শ্যামা, তোমার বাবা আমাকে দেখতে পাবে না, ভয় নেই। আমি তোমাদের রাস্তায় যাব না। আমি যাব জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ছায়ার মতো। পাখির ডাক ডাকতে ডাকতে যাব, তুমি ছাড়া কেউ বুঝবেই না যে আমি আছি।

বলে নয়ন সেই অকপট হাসি হাসে।

শ্যামা রেগে গিয়ে বলে, আমিও তো তোমাকে চাইছি না নয়ন। তোমার একটুও আত্মসম্মানবোধ নেই কেন?

নয়ন অবাক হওয়ার ভান করে বলে, আমাকে চাইছ না। তবে গোলাপটা কার জন্যে?

তুমি নও, সে তুমি নও।

সেই রকম অবাক হওয়ার ভান করে নয়ন বলে, নই? আমি নই? কেন নই শ্যামা?

তোমার কথা আমার মনে থাকে না।

খুব থাকে। বলে নয়ন হাসে, তুমি আমাকে ভয় পাও।

তুমি ফিরে যাবে না?

তুমি আমাকে ভয় পাও কেন? তোমার অতগুলো পুরুষ বন্ধুর কাউকে তো তুমি ভয় পাও না।

তোমাকেও পাই না।

পাও, আমি জানি।

শ্যামা স্তব্ধ হয়ে নয়নের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, ভয় পেলে তোমার জন্য একা দাঁড়িয়ে থাকতাম না।

নয়ন ভ্রূ তুলে চোখ বড় করে বলে, আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলে! তবে ফুলটা তুলবার সময়ে আমার মুখ তোমার মনে ছিল শ্যামা?

ইয়ার্কি কোরো না নয়ন। আমি সিরিয়াসলি বলছি, আমার মন ভালো নেই।

কেন?

তুমি সব সময় কেন আমার পিছু নাও? তুমি তো জানো কোনো লাভ নেই! কায়স্থের সঙ্গে আমার বাবা বিয়ে দেবেন না। তোমাকে দেখলে বাবার প্রেশার বেড়ে যায়।

নয়ন তেমনি অকপট হাসিমুখে বলে, তোমার বাবা জাত মানলেও তো তুমি আর মানো না শ্যামা! তোমার বাবা আর ক'দিন? ততদিন বরং অপেক্ষা করব।

শ্যামা মুখ নামিয়ে অসহায়ভাবে বলে, নয়ন, তুমি বয়সে আমার ছোট।

ছোট!

শ্যামা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, তুমি চলে যাও!

আগে বলো।

বলব না।

মেয়েরা বয়স লুকোয় অন্যের কাছে আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে। আমার কাছে তো তোমার সে ভয় নেই। তুমি তো আমাকে আকর্ষণ করতে চাও না! আমাকে তোমার ডেট অফ বার্থ বলতে ভয় কী?

অনেকক্ষণ পরে শ্যামা এই প্রথম হাসল, বলল, নয়ন, স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমার বয়স চব্বিশ।

নয়ন গম্ভীর মুখে বলে, আমারও তা—ই।

শ্যামা হেসে বলে, না, তোমার আরও কম। তাছাড়া সার্টিফিকেটে আমার বয়স আরও দু'বছর কমানো আছে। আমার এখন ছাব্বিশ।

নয়ন হাসে, আমারও কমানো আছে, তিন বছর। আমার এখন সাতাশ।

না! তোমার এখন বাইশ কি তেইশ।

সাতাশ। বলে নয়ন হাসে। তারপর আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে যায়। ব্যথিত মুখে বলে, জাত বা বয়স কিংবা তোমার বাবার মতামত এর কোনোটাই তোমার প্রবলেম নয় শ্যামা, আমি জানি। তোমার আসল প্রবলেম কী?

শ্যামা ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থাকে, তারপর বলে, তুমিই আমার চারদিকে প্রবলেম তৈরি করছ। তুমি ছাড়া আমার আর কোনো প্রবলেম নেই। তুমি দয়া করে চলে যাও।

নয়ন তার সরল হাসিটি হেসে, শ্যামার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে বলে, শ্যামা, আমি ব্রাহ্মণ, আমার বয়স সাতাশ।

তার মানে?

নয়ন শ্যামার মুখখানা তার কটাসে চোখে পান করতে করতে বলে, জাত বা বয়স দুটোই হচ্ছে ইমাজিনেশন, বেহেড কল্পনা। এক সময়ে সমাজের প্রয়োজনে জাত ভাগ করা হয়েছিল। সেটা ছিল একটা আইডিয়া, সেই সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এখন সমাজ বদল হয়েছে, সেই প্রয়োজন আর নেই। রক্তের বিশুদ্ধতাও আর টিকছে না শ্যামা। মেডিকেল কলেজে যাও, দেখবে, কত কায়স্থ বৈশ্য শূদ্রের রক্ত কত ব্রাহ্মণের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। জাত—ফাত একাকার হয়ে যাচ্ছে।

আমি তোমার মতো ডাক্তারি পড়িনি নয়ন। ওসব জানি না। আমার বাবা—

নয়ন সে কথায় কান না দিয়ে বলে, আর বয়স শ্যামা? বয়স আর একটা ইমাজিনেশন। মানুষের যে রূপান্তর হয়, পৃথিবীর যে পরিবর্তন হয় সেটা দেখেই মানুষ সময় নামে এক আপেক্ষিক কল্পনাকে আবিষ্কার করে। নইলে, সময় বলে যে সত্যিই কিছু আছে, তার কোনো প্রমাণ নেই। ঘড়ির কাঁটার অবস্থানের রূপান্তরই হচ্ছে সময়। যদি রূপান্তরকেই সময় বলে ধরো, যদি পরিবর্তন বা অভিজ্ঞতাই বয়স হয় তবে বলি, আমার পরিবর্তন হয়েছে, অনেক অভিজ্ঞতা, বিপুল—সে হিসেবে আমার বয়স বোধহয় পঞ্চাশ—ষাট।

অত কথা শোনার সময় আমার নেই নয়ন, বাবা—মা আমাকে না দেখে এক্ষুনি অস্থির হবে, হয়তো ফিরে আসবে।

সে কথাতেও কান দেয় না নয়ন। শ্যামার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, সেবার যখন কয়েকজন শুয়োরের বাচ্চা আমাকে ইউনিভার্সিটির পাশের গলিতে ছোরা মারে তখন মেডিকেল কলেজে আমার শরীরে যারা রক্ত দিয়েছিল—আমার সেই চারজন বন্ধুই ছিল ব্রাহ্মণ। আমার শরীরের অর্ধেক রক্তই তাদের দেওয়া। সে হিসেবে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে গেছি।

নয়ন, আমাকে যেতে দাও, তুমি চলে যাও।

শ্যামা, আমি ব্রাহ্মণ। আমার বয়স তোমার চেয়ে বেশি। এ কথা তুমি তোমার বাবাকে বলো।

ওটা তোমার কথা নয়ন, আমার কথা নয়। আমি বাবাকে বলব কেন?

নয়ন একটু হেসে বলে, ঠিক আছে, তবে বোলো না। কিন্তু অপেক্ষা করো শ্যামা, তোমার বাবা বেশিদিন নিশ্চয়ই বাঁচবে না; তার পর—

শ্যামার কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে, রাগে ঘেন্নায় সে প্রায় চেঁচিয়ে বলে, বারবার তুমি বাবার মরার কথা তোলো কেন? নিজের ওপর তোমার ঘেন্না হয় না?

এক পা পিছিয়ে যায় নয়ন, তারপর তার অনাবিল হাসিটি হাসে। বলে, কেউ কি চিরকাল বেঁচে থাকে?

রাগে দুঃখে শ্যামার চোখ ছল ছল করে। অনেকক্ষণ সে চুপ করে চেয়ে থাকে নয়নের দিকে। গলার কান্না সামলায়, ঠোঁটের কেঁপে ওঠা থামায়। তারপর ধীর গলায় বলে, কবে তোমার এই পাগলামি বন্ধ হবে নয়ন?

যে দিন আমার লাশ পড়ে যাবে।

কথাটা শ্যামাকে চমকে দেয়। আস্তে আস্তে বলে, ফিরে যাও নয়ন ফিরে যাও।

আমার কি ফিরে যাওয়ার জায়গা আছে শ্যামা? আমি তো সব ছেড়ে বেরিয়েছি। যে জায়গা থেকে রওনা হই সে জায়গায় কদাচিৎ ফিরে যাই। তুমি আমাকে চলে যেতে বলতে পারো, ফিরে যেতে নয়।

তাই যাও নয়ন চলে যাও।

নয়ন বলে, শ্যামা, তুমি খুব দুশ্চিন্তা কোরো না। আজ হোক, কাল হোক আমার লাশ একদিন পড়বেই। নিশ্চিত। তখন আর নয়ন তোমার পিছু নেবে না। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি শ্যামা, ততদিন আমি তোমার পিছু নেবই।

কেন নয়ন?

কী জানি কেন! তুমি এমন কিছু সুন্দর নও শ্যামা। তোমার রঙ শ্যামলা, নাক চাপা, খুঁজলে আরও কিছু ডিফেক্ট বেরবে, তা ছাড়া তোমার স্যুটার অনেক। তোমার লাবণ্য থাকতে পারে, কিন্তু সে সব আমি লক্ষই করি না। তুমি যা, তোমাকে তার চতুর্গুণ করে দেখতে পাই। যেদিন আমাকে ওরা স্ট্যাব করে, সেদিন অনেকক্ষণ আমি হিন্দু হস্টেলের গেট থেকে কয়েক গজ দূরে গাছতলায় পড়ে ছিলাম। জ্ঞান ছিল, কিন্তু ডিলিরিয়ামের মতো অবস্থা। চারদিকে স্বপ্নের মতো অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, অ্যান্ড ব্লাড ড্রিপিং আউট। টিপ টিপ করে রক্ত পড়ছে তো পড়ছেই। শরীর থেকে নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে রক্ত। তার কুলকুল শব্দ পাচ্ছি। সেই সময়েও, সেই আশ্চর্য রকমের ভয় আর বিকারের মধ্যেও, তোমাকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখছিলাম, একটা নির্জন মেঠো রাস্তা দিয়ে তুমি হেঁটে যাচ্ছ, কিংবা জানালার কাছে বসে চেয়ে আছ বাইরের এক মেঘলা আকাশের দিকে। সব ঠিক মনে নেই, কিন্তু বারবার তোমাকেই দেখছিলাম, মনে আছে। আতঙ্কে চিৎকার করে বলতে চেষ্টা করেছিলাম—শ্যামা, তুমি সাবধানে থেকো, ভীষণ বিপদ, তোমাকে যেন ওরা না পায়। আবার কখন হয়তো বলছিলাম—শ্যামা, আমি মরে যাচ্ছি, তুমি বিধবা হবে তো?

নয়ন তেমনি অনাবিল হাসি হাসে।

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, এ সব আমাকে বোলো না নয়ন, আমার ভালো লাগে না।

তুমি গোলাপটা কার জন্য তুলেছ?

নয়ন, রাস্তা ছাড়ো, আমি অনেক পিছিয়ে পড়েছি। মা—বাবা নিশ্চয়ই আছেন। এক্ষুনি খুঁজতে আসবেন। তুমি চলে যাও। পিছু নিয়ো না।

আমি ছায়া হয়ে যাব শ্যামা, পাখি হয়ে যাব।
দয়া করো নয়ন, তুমি যাও।
দূর থেকে বাবার ডাক শোনা যায়—শ্যামা—আ—
নয়ন রাস্তা ছাড়ে না।
শ্যামা হাতের গোলাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এটা তুমি নেবে? নাও।
নয়ন হাত বাড়ায় না, বলে, নেব কেন? আগে বলো, কার মুখ ভেবে তুলেছিলে, কার নাম ভেবে!
তুমি নাও।
কেন নেব?
নাও। দিচ্ছি।
এই দেয়ার মধ্যে কোনো ইঙ্গিত নেই শ্যামা?
না।
তাহলে নিয়ে কী হবে?
রাস্তা ছাড়ো।
দাঁড়াও। তোমাকেও তাহলে একটা জিনিস প্রেজেন্ট করি। বলে পকেট থেকে ডিম দুটো বের করে নয়ন।
শ্যামা অবাক হয়ে বলে, ডিম? ও দিয়ে আমি কী করব?
খাও।
ডিম খাব কেন?
খাব বলে কিনেছিলাম, খেতে পারছি না। খালি পেটে খানিকটা তাড়ি খেয়ে খিদে মরে গেল। তুমি অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছ, তোমার খিদে পেয়েছে।
শ্যামা কুঁকড়ে গিয়ে বলে, না। ডিম নেব কেন? ডিম কেউ কাউকে প্রেজেন্ট করে নাকি? আমার খিদে পায়নি।
নয়ন একটু স্থির চোখে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, এই ডিম দুটো দিলে এখনও এই দেশে কোথাও কোথাও রাতভর একটা আস্ত মেয়েমানুষের শরীর পাওয়া যায়, জানো?
শ্যামা লাল হয়ে বলে, তুমি...তোমার মুখে কিছুই আটকায় না নয়ন?
নয়ন ধীর স্বরে বলে, মিথ্যে কথা নয় শ্যামা, এই ডিম দুটোর যা দাম তা অনেকের কাছে অনেকগুলো পয়সা। আমি দেখেছি। আমার অভিজ্ঞতার বয়স অনেক।
তুমি বরং মেয়েমানুষের শরীর কিনো নয়ন, আমার পথ ছাড়ো, বাবা এসে পড়বে।
রাগ কোরো না শ্যামা, আমি শুধু ডিম দুটোর আপেক্ষিক দাম বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। দামটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার যা অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এ ডিম দুটোর দাম অনেকের কাছে অনেক, আবার কারও কাছে কিছুই নয়।
শ্যামা হেসে বলে, ফুলের বদলে ডিম?
নয়নও হাসে, ফুলের তুলনায় ডিম অনেক সলিড জিনিস শ্যামা। তুমি জিতে যাচ্ছ। নাও।
শ্যামা একটু ইতস্তত করে। কিন্তু সে জানে, নয়ন বড় দুরন্ত। বাবা এগিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে, তাকে না দেখে ফিরে আসবে। এসে যদি নয়নকে দেখতে পায় বাবা, তাহলে কী হবে। ইতস্তত করেও তাই ডিম দুটো নেয় শ্যামা। ব্যাগে ভরে রাখে। যদি এতে রাস্তা ছাড়ে নয়ন, যদি শ্যামাকে ছেড়ে দেয়!
ফুলটার জন্য হাত বাড়িয়েছিল নয়ন। নির্দোষ হাত, শ্যামা সন্দেহ করেনি কিছু। বাড়ানো হাতে ফুলসুদ্ধ শ্যামাকে ঘাড় কাত করে দেখতে দেখতে বোধ হয় নয়নের ভিতরে কিছু ফুঁসে উঠল। এক পলকে শ্যামার ফুলসুদ্ধ হাত ধরে তাকে টেনে নিল সে। শেকড় সমেত উপড়ে গেল শ্যামা। চারদিকটা যেন ঝোড়ো বাতাসে আবছা ধুলোটে হয়ে গেল, কিংবা একটা কুয়াশা ঘিরে ফেলল তাদের—এরকমই মনে হল তার। পরমুহূর্তেই

সে নয়নের বিশুষ্ক ঠোঁট তার ঠোঁটে—গালে টের পেল। নয়নের গালের দাড়ি ঘষা খেল তার গালে, পরমুহূর্তে ঝুরো চুলওলা নয়নের মাথা তার কাঁধ থেকে গলার কাছে আশ্লেষে ডুব দিতে থাকে। তাড়ির ঝাঁঝালো গন্ধ পায় শ্যামা, সেই সঙ্গে বহুকাল ধরে রোদে পোড়া চামড়ার উষ্ণ গন্ধ, জামাকাপড়ে ঘাম আর ধুলোর সোঁদা গন্ধ। এমনটা এই প্রথম নয়। অন্তত তিন—চার জন পুরুষ তাকে ইতিপূর্বে আক্রমণ করেছে। নয়নও। তবু এই ঝড় ঠেকানোর কৌশল আজও শ্যামা সঠিক জানে না। মেয়েরা বড় অসহায়। তবু দু' হাতে সে নয়নকে প্রাণপণে রুখবার চেষ্টা করে। চেঁচায়। মারে।

নয়ন সহজে থামত না। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা বাচ্চা ছেলে খুব কাছ থেকেই চেঁচিয়ে বলে ওঠে, বাবা, দেখো—

নয়ন শ্যামাকে ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। মারকুটে হিংস্র ভঙ্গিতে। মিথুনের সময়ে বাধাপ্রাপ্ত সাপের মতো। নয়নের সেই সাপের মতো ভঙ্গি দেখে চোখ ফেরাতেই একটা সত্যিকারের সাপ দেখতে পায় শ্যামা।

দৃশ্যটা ভারী অদ্ভুত। ভাঙা, পোড়ো বাড়িটার আগাছার জঙ্গল ভেদ করে দুজন ভাঙা পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একজন একটা বছর সাত—আটেকের বাচ্চা ছেলে, অন্যজন ত্রিশ—পঁয়ত্রিশ বছরের একজন গ্রাম্য চেহারার লোক। হাবার মতো দাঁড়িয়ে। ছেলেটার চোখের পলক পড়ছিল না। লোকটারও তা—ই। অদ্ভুত এই যে, লোকটার ডান হাতে লম্বা একটা জ্যান্ত সাপ। সাপের গলার কাছা মুঠোয় ধরা, সেটা লোকটার হাতে দুটো প্যাঁচ খেয়ে ঝুলছে। আস্ত গোখরো।

শ্যামার বমি পাচ্ছিল হঠাৎ! লজ্জা লজ্জা! বাচ্চা ছেলেটা ওই কাণ্ড দেখেছে, লোকটাও। মথিত গোলাপটা পড়ে আছে রাস্তায়। একপলক দেখল শ্যামা। তারপরই গোলাপটাকে লাফিয়ে পার হয়ে ছুটল সে।

নয়নের মাথার ঠিক ছিল না। যে মুহূর্তে সে শ্যামাকে দু' হাতের ভিতরে পেয়েছে সেই মুহূর্তেই এই বাধা। কত কষ্টে তাকে শ্যামার এত কাছাকাছি আসার সুযোগ করে নিতে হয়। তাই প্রথমটায় রাগে তার ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। হয়তো ছুটে যেত সে, লোকটাকে লাথি মারত, ছেলেটাকে থাপ্পড়, যা নয়নের স্বভাব। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সে লোকটার হাতে ধরা জ্যান্ত গোখরোটাকে দেখে।

নয়নের ভিতরে একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে। যা কিছুর ভিতরে ভয়ঙ্করতা হিংস্রতা আছে তা সে ভালোবাসে। যার মধ্যে বীরত্ব বা বেপরোয়া কিছু আছে সে নয়নকে মুহূর্তের মধ্যে টানে। লোকটার হাতে সাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা খুব অনায়াস দক্ষ সাহসীর ভাব ছিল। নয়নের রাগ বাতাসে উড়ে গেল, ফুলের মতো ঝরে গেল। একটু আগে শ্যামার দেহস্পর্শের আগুন নিভে গেল ভিতরে। সে শ্যামার হাত থেকে স্খলিত ফুলটার দিকে চেয়েও দেখল না। যে শ্যামার জন্য সে এত দূরে এসে রোদে দাঁড়িয়ে তীব্র পিপাসায় অপেক্ষা করেছে তার কথা ভুলেই গেল প্রায়। গালের একটা জায়গায় শ্যামার বাঁ হাতের লম্বা নখের একটা আঁচড় পড়েছে বুঝি! সেই জায়গাটা কেবল জ্বালা করছে।

গালে একবার হাত বুলিয়ে এক পা দু' পা করে লোকটার দিকে হেঁটে গেল নয়ন। লোকটার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা এখনও যায়নি। ছেলেটা এখনও হাঁ করে আছে। কৃতকর্মের জন্য তবু একটুও লজ্জা পায় না নয়ন। কোনও জবাবদিহি করারও চেষ্টা করে না। তার গলার স্বরও ঠিক থাকে।

একটু হেসে সে জিজ্ঞেস করে, সাপটা ধরলেন?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

কোথায় ছিল?

লোকটা পোড়ো বাড়িটার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, এখানে। এখনও বিস্তর আছে।

কামিয়েছেন?

না, সদ্য ধরলাম তো।

জাত গোখরো। দেখি।

লোকটা সাপটা তুলে দেখায়। নয়ন ঝুঁকে খুব কাছ থেকে দেখে। গভীর শ্বাসের শব্দ করে সাপটা। না এখনও কামানো হয়নি। দুটি সূক্ষ্ম দাঁত ঝিকিয়ে ওঠে। নয়ন হাসে।

বিষের থলি মনে হয় ভর—ভরন্ত! নয়ন বলে।

আজ্ঞে।

এটাকে নিয়ে কী করবেন?

লোকটা একটু হাসে। ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। নিজের ছেলের দিকে একটু চেয়ে দেখে। তারপর বলে, ছেড়ে দেব।

না কামিয়ে? বলে ভ্রূ ওপরে তোলে নয়ন।

না কামিয়ে ছাড়লে ব্যাটা রুখে আসবে। কামিয়েই ছাড়ব। তার আগে ক'ফোঁটা বিষ ঢেলে নেব।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কৌতূহল বোধ করে নয়ন। বলে, দেখি, কী করে নেন।

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাবে না? উনি তো এগিয়ে গেলেন!

কে? নয়ন বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।

লোকটা চোখের পাতা নামিয়ে বলে, ওই উনি, যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন!

শ্যামার কথা মনে পড়ে নয়নের। বিদ্যুৎচমকের মতো। কিন্তু এতক্ষণ মনেই ছিল না। একটু হাসে নয়ন। তারপর বলে, এগিয়ে যাক না। ঠিক ধরে ফেলব পা চালিয়ে। মোনা ঠাকুরের কাছে যাবে, বেশি দূর তো নয়।

ও। মনস্কামনা আছে বুঝি!

আছে।

লোকটা উদাস গলায় বলে, অনেকে আসে। মোনা ঠাকুরের খুব বাড়বাড়ন্ত এখন।

চেনেন?

না চিনবার কী? আমি তো কল্পতরু মন্দিরের পাশেই থাকি।

কী করেন? সাপ খেলান?

লোকা হাসে, না। সাপ ধরা শিখেছি অনেক কষ্টে। এ আমার শখ। মাঝে—মধ্যে বিষ বেচি, ওষুধ কোম্পানিগুলো কেনে। বলে ছেলের দিকে চেয়ে বলে, সুকুল, কৌটো—বাউটো বের কর।

ছেলেটার কাঁধে একটা ঝোলা। তা থেকে বড় মুখওয়ালা একটা শিশি বের করে আনে। শিশির মুখে পাতলা বেলুন বা ওই জাতীয় কিছুর একটা রবারের ঢাকনা সুতো দিয়ে টান করে বাঁধা। শিশিটা বাঁ হাতে ধরে লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হেসে বলে, তেমন কিছু কাণ্ড না। দেখুন।

সাপটা হাঁ করেই ছিল, মুখের কাছে শিশিটা আনতেই নড়ে উঠল। দাঁতের কাছে বিষ ঢালার মতো কিছু একটা সে এখন চায়। রাগে আক্রোশে লেজের ঝাপটা মারে। কী সুন্দর সরু ভয়ংকর দাঁত, কী দক্ষতা তার দাঁতে! পাতলা রবার নিঃশব্দে ভেদ করল দাঁত দুটো। লোকটা শিশি সমেত সাপটাকে উঁচু করে দেখাল। নয়ন দেখে, শিশির মধ্যে হালকা রঙের দুটি ফোঁটা পড়ল। লোকটা শিশিটা ছাড়িয়ে নিয়ে নয়নকে দেখায়। বলে, অয়েল প্রোটিন।

নয়ন ওই শব্দ দুটো শুনে বড় চোখে চায়। বলে, আপনি অনেক জানেন দেখছি।

কিছুই না। ও সবাই জানে।

লোকটার হাতে ছেলেটা একটা চাকু ধরিয়ে দেয়। যেভাবে ছেলেরা পেন্সিল কাটে সেরকম অনায়াসে মুখের কাছে সাপের মাথাটা তুলে লোকটা দুটো মোচড়ে দাঁত উপড়ে আনে। ছোট্ট দুটি দাঁত, উপড়ে আনার পর কেমন নিরীহ দেখায়। সুকুল নামে ছেলেটি একটা কাগজে দাঁত দুটো সাবধানে মুড়ে ঝোলায় রাখে। সাপটা ছটফট করে। লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে একটু হাসে। বলে, ওদের দাঁত ওপড়ালে ব্যথা যেমন

পায়, আরামও পায় তেমনি। দাঁত দুটো টন টন করে তো! যত বিষ ওদের দাঁতে। মানুষের কোথায় বলুন তো!

নয়ন উত্তর দেয় না। চেয়ে থাকে।

লোকটা সাপের লেজ আর মাথা দু'হাতে চেপে ধরে কী একটু বিড় বিড় করে বলে। তারপর আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে সাপটাকে ঘাসের ওপরে ছেড়ে দেয়। প্রাণ পেয়েই যেন বিশাল লকলকে গোখরো ফুঁসে উঠে ঘাসময় তার কিলবিলে ভয়ংকর গতি ছড়িয়ে দিয়ে একবার ফণা তোলে। নয়ন এক লাফে পিছিয়ে আসে। লোকটা সাপটার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে। সাপটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফণা নামিয়ে নেয়, তারপর মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে যায়, স্বচ্ছন্দে পার হয় দেয়াল, লম্বা দূর্বাঘাস আর আগাছার জঙ্গলে ঢেকে যায়।

নিঃসাড়ে সাপটাকে দেখছিল নয়ন। চোখ তুলতেই লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সাপটা হাতে ছিল বলেই এতক্ষণ লোকটাকে ভালো করে দেখা হয়নি। এখন চেয়ে দেখল নয়ন, পরনে মোটা কাপড় খাটো করে পরা, গায়ে হাফ—হাতা শার্ট, খালি পা, মাথার চুল যাত্রাওয়ালাদের মতন ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। মুখখানা চৌকো, ভাঙা, কিন্তু তা রুগণ স্বাস্থ্যের জন্য নয়। যারা শরীর খাটায় তাদের শরীরে একরকম মেদহীন রুক্ষতা থাকে। এ লোকটারও তা—ই। নয়নের তুলনায় লোকটা লম্বা, ঘাড়টা মোটা, হাত দু'খানায় শিরা আর পেশি কিলবিল করছে। চওড়া কাঁধ। কিন্তু চোখ দু'খানা বড় নিরীহ, মায়াময়। এতটা স্বাস্থ্য থাকলে মানুষ এমনিতেই একটু মারমুখো হয়। কিন্তু লোকটা তা নয়।

একটুক্ষণ চোখে চোখে চেয়ে রইল নয়ন। কবে যেন নয়নের চোখ ছিল সাধারণ, তাতে আগুন খেলা করত না, তাতে ভাবালুতা ছিল, স্বপ্ন—দেখা ছিল, সেই চোখে মায়া—মমতাভরে চারদিককে দেখার প্রবণতা ছিল তার। কিন্তু সে যেন এক দূর অতীতের কথা। মাত্র চব্বিশ কি তারও কম বয়সে নয়নের কত রূপান্তর হয়ে গেছে। এখন নয়ন জানে, তার চোখে কেউই খুব বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারবে না। আয়নায় নিজের মুখ অনেক দেখেছে সে কিন্তু পরিবর্তনটা কিছুতেই কখনও সে ধরতে পারে না। কিন্তু জানে, জেনে গেছে, তার চোখে একটা বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে। তার মনের ছায়া চোখে পড়ে। সেখানে আগুন খেলা করে এখন। লোকটা কিন্তু চোখ সরিয়ে নিল না। চেয়ে রইল। মনে মনে নয়ন লোকটাকে বলল, সাবাস! প্রায় বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছ হে বাপু, নয়নের চোখে এতক্ষণ কেউ চোখ রাখে না।

মুখে খুব সাধারণ পথ—চলতি কথার মতো জিজ্ঞেস করল, কী করেন?

লোকটা উদাস গলায় বলে, চাষবাস, বললাম তো। আর মাঝে মাঝে সাপ ধরি। বুনো পাতা থেকে ওষুধ তৈরি করি নানারকম। আর ছেলের সঙ্গে খেলা করি। এই যে সুকুল, এ আমার ছেলে।

শেষ কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলে লোকটা, যেন ছেলের পরিচয়টা দেওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি। মানুষের নানা দুর্বলতা থাকে। নয়ন বলে, আপনাদের এ জায়গাটা বেশ।

গাঁ—গঞ্জ জায়গা, ভদ্রলোকের উপযোগী নয়। বেশ আর কী।

ইলেকট্রিক নেই এদিকে?

কী যে বলেন!

অনেক গাঁয়ে আছে।

এদিকে নেই।

বি ডি ও অফিস?

সে অনেক দূর। তিন মাইল পুবে চকখালি, সেইখানে।

থানা?

লোকটা নয়নের দিকে একটু চেয়ে থেকে হেসে বলে, সেও দূর!

এদিকটায় তবে আছে কী?

আছে মোনা ঠাকুরের জাগ্রত কালী, যা দেখতে বহু লোক আসে। আর আছি আমরা, জঙ্গল আছে, সাপ আছে, আর কী থাকবে গাঁয়ে—গঞ্জে। চলুন দেখে আসবেন, বেশি দূর নয়। আপনার লোকও তো এগিয়ে গেল।

অন্যমনস্ক নয়ন জবাব দিল, হুঁ।

কে হয় আপনার?

কার কথা বলছেন? নয়ন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

ওই যে উনি, যিনি সঙ্গে ছিল আপনার!

হয় কিছু। বলে নয়ন একটু হাসে।

কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে লোকটা বলে, উনি ফুলটা ফেলে গেছেন। কুড়িয়ে নেবেন না?

নয়ন রাস্তার ওপর পড়ে থাকা ফুলটাকে একটা লাথি মেরে বলে, ফুলের অভাব নেই দেশে।

লোকটা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, ঠিক কথা, তা ছাড়া ফুলের তেমন বাসও নেই। লতানে গাছের ফুল তো।

নয়ন গম্ভীর হয়ে বলে, হুঁ।

লোকটা বলে, বর্ষাকালের ফুল ফল সবই কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে, জলঢোপা।

এদিকটায় থাকার জায়গা পাওয়া যায়?

যাবে না কেন? মোনা ঠাকুরের কল্পতরুর মন্দিরে অনেক জায়গা। যেখানে—সেখানে পড়ে থাকা যায়। থাকবেন?

নয়ন মুখ তুলে বলে, ভাবছি থাকলে কেমন হয়।

লোকটা হেসে বলে, আপনারা শহর—বন্দরের মানুষ, থাকতে পারবেন না। ওদিকটাই ভদ্রলোকের বাস নেই।

ভদ্রলোকদের মুখে পেচ্ছাপ করি।

ছেলেটা নয়নের কথা শুনে হি হি করে হেসে ওঠে।

কী হল সুকুল? লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

পেচ্ছাপ করবে বলছে। মুখে! হ্যাঁ বাবা! ছেলে হেসে কুটিপাটি।

তুমি পা চালিয়ে চলো তো। আমরা পেছু পেছু যাচ্ছি, দম ধরে তুমি খানিক দৌড়ও। লোকটা তার ছেলের পিঠে আলতো চাপড় মেরে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

আমি তোমাদের কথা শুনব।

তার চেয়ে দৌড়লে কাজ দেবে। বড়দের সব কথায় কান দিতে নেই।

মুখে কী করে পেচ্ছাপ করবে বাবা, অ্যাঁ?

নয়ন ছেলেটার দিকে ঝুঁকে বলে, ভদ্রলোকদের মুখে কী করে পেচ্ছাপ করতে হয় তা আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। তার বদলে তোমার বাবা আমাকে সাপ ধরতে শেখাবেন।

তারা খানিক চুপচাপ হাঁটে। লোকটা একবার নয়নকে সতর্ক করে দেওয়ার ইঙ্গিত করে বলে, সুকুল কিন্তু আমার ছেলে। ওর সামনে—

কথাটা লোকটা শেষ করে না। নয়ন একটু হাসে। তারপর বলে, আমি ভদ্রলোক নই।

নন?

না।

কেন নন?

পোষায় না।

কিন্তু আপনি তো ভদ্রলোকের মতোই দেখতে, শহরের বাবুভেয়েরা যেমনটি হয়।

সে পোশাকে। ভিতরে আমি অন্য মানুষ।

কলকাতা থেকে আসছেন তো?

নয়ন একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, আসছি। কিন্তু সে আমার আগের সাকিন। আসলে আমার জীবন কাটে গাঁ—গঞ্জেই। কলকাতার লোকমাত্রই ভদ্রলোক নাকি!

লোকটা একটু ভেবে বলে, তা অবশ্য নয়। কিন্তু ভদ্রলোকরা যেখানেই থাকুন তাদের জাত যে আলাদা তা দেখলেই বোঝা যায়। সে জাত তো আপনার ঘোচে নি।

ও হচ্ছে গায়ের ঘেমো—গন্ধের মতো, সহজে যায় না।

লোকটা হাসে। ছেলেটাও খি—খি করে হাসে, বলে, ঘেমো—গন্ধ বাবা, কী বলছে দ্যাখো!

আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেবেন?

লোকটা উদাস গলায় বলে, শিখে কী করবেন?

শিখে রাখি। কখনও কাজে লেগে যেতে পারে।

কিছুই কাজে আসে না। আমি শিখেছি বিস্তর কষ্ট করে। সাপুড়েরা তাদের মন্ত্রগুপ্তি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখে। আমি এক ওস্তাদের পিছনে বছরখানেক ঘুরে শিখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা যে অত কষ্টে শিখবার দরকারই নেই।

কৌশলটা কী?

সাপ কোথায় থাকে তার আন্দাজ যে করতে পারে তার অর্ধেক শেখা হয়ে গেল। তার পরেরটুকু হচ্ছে সাপ সম্বন্ধে ভয়টাকে উড়িয়ে দিয়ে একটু সাহস করা। আর ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাতের তেলোয় চেপে ধরা। কই মাছ ধরার মতোই সোজা। সাপের দাঁত তার মুখে, সারা শরীরে তো নয়!

আমাকে শেখাবেন?

শেখাতে পারি।

আমার কিন্তু পয়সা নেই।

লোকটা হাসে, বলে, আমার খাওয়ার সংস্থান আছে, সবকিছু বেচি না।

যদি শেখান তো এদিকটায় ক'দিন থেকে যাই।

সঙ্গের লোকেরা?

ওরা আমার কেউ না।

লোকটা একটু থমকে যায়। কী যেন বলি বলি করেও বলে না। সুকুল চলতে চলতে অজান্তে নয়নের কাছে ঘেঁষে আসে। নয়ন তার দিকে একবার মিটিমিটি করে চায়। তারপর বাপ—ব্যাটাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ কোকিল—ডাক ডেকে ওঠে। কুহু—কুহু করে তার অবিরল এবং অবিকল মিষ্টি ডাকটি উঠে উঠে নেমে আসে হঠাৎ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকটা মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আরে বাঃ। লোকটা বলে।

আমাকে শিখিয়ে দেবে? ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

দেব। তার বদলে তোমরা যদি আমাকে থাকতে দাও।

দেব। আমাদের বাড়িতে অনেক জায়গা। ছেলেটা লাফিয়ে গিয়ে তার বাবার হাত ধরে ঝুলে পড়ে, অনেক জায়গা, না বাবা?

ওরা বাপ—ব্যাটা সামনে হাঁটছে, নয়ন পিছনে। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে একবার নয়নকে দেখে নিয়ে বলল, এখানে থাকতে চান কেন?

এমনিই। জায়গাটা ভালো লেগে গেছে।

কাজকর্ম কিছু করেন না?

না। ডাক্তারি পড়তাম, ছেড়ে দিয়েছি।

ছাড়লেন কেন?

পোষাল না।
এখন তবে কী করে চলে?
চলে যায়। ওসব নিয়ে ভাবি না।
লোকটা একটু ভেবে বলে, এদিকে এসেছিলেন কেন?
চলে এলাম।
ওই মেয়েটা কে?
ও শ্যামা, আমার বহুকালের চেনা। আগে একই বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। এখন দূরে চলে গেছে ওরা। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।
লোকটা তার ছেলের পিঠে হাত রেখে বলে, সুকুল বাবা, তুমি আগে আগে হাঁটো।
সুকুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে হাঁটে। লোকটা নয়নের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে, তাই জঙ্গলের মধ্যে জাপটে ধরেছিলেন?
সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞেস করে, মোনা ঠাকুরের ওখানে বশীকরণ—টশীকরণ হয়?
লোকটা হেসে বলে, হয়।
বশীকরণ করতে কত টাকা লাগে?
ঠিক জানি না।
নয়ন সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে, বশীকরণে কাজ হয় তো? না হলে কিন্তু মোনা ঠাকুরের মন্দির আমি ভেঙে দিয়ে যাব।
লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, মোনা ঠাকুরের মন্দির ভাঙা যায় না।
কেন?
আমি যেমন সাপ ধরি, মোনা ঠাকুর তেমনি মানুষ ধরে। আমি যেমন বিষ নিংড়ে দাঁত ভেঙে ছেড়ে দিই, তেমনি তিনিও মানুষের বিষদাঁত তুলে নেন।
হিপনোটিজম, না?
কে জানে!
আমি নয়ন রায়। মোনা ঠাকুরদের মন্দির ভাঙতেই আমার জন্ম। বলে নয়ন একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসে।
লোকটা বলে, আর যদি মোনা ঠাকুরের বশীকরণে কাজ হয়, যদি মেয়েটাকে বশ করতে পারেন তো কী করবেন?
তাহলেও ভাঙব।
কেন?
নয়ন একটু হেসে বলে, শ্যামাকে বশ করতে যেমন চাই, তেমনি মোনা ঠাকুরদেরও উচ্ছেদ করতে চাই।
লোকটা একটু হেসে বলে, যদি দুনিয়া থেকে সব মোনা ঠাকুরদের উচ্ছেদ করে দেন তাহলে আবার কাউকে বশীকরণ করার দরকার হলে মোনা ঠাকুরকে পাবেন কোথায়?
মোনা ঠাকুররা না থাকলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না। থাকলেই বরং ক্ষতি।
তাহলে শ্যামার কী হবে?
কী হবে?
শ্যামাকে বশীকরণ করবে কে?
কেউ করবে না। তার দরকার হবে না। শ্যামাকে কেড়ে নেওয়ার মতো জোর আমার আছে।
তবে বশীকরণের কথা ভাবছেন কেন?

খুব চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে, ও এমনিই। মোনা ঠাকুরদের ক্ষমতা কতদূর তা একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।

লোকটা হেসে বলে, কিছু ক্ষমতা আছে নিশ্চয়ই। উনি বাণ মারেন, মারণ উচাটন জানেন, বশীকরণ জানেন, কত জজ—ম্যাজিস্ট্রেট এসে ধুলোয় গড়ায়। মাটি থেকে আধ হাত উঁচুতে উঠে শূন্যে বসে জপতপ করেন তিনি। বলে লোকটা নয়নের দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

নয়ন ভ্রূ কুঁচকে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। চিন্তাকুটিল মুখ, খুব অন্যমনস্ক। লোকটার কথা তার কানে গেছে বলে মনে হয় না।

জঙ্গল ক্রমে শেষ হয়ে আসে। আমবাগানের শেষে একটা মাঠ কোনাকুনি পার হয়ে, একটা বড় পুরনো দিঘির কালো জলে নিজেদের ছায়া ফেলে, উত্তরে কয়েকটা ঢিবি, গড়খাইয়ের মতো জায়গা পেরিয়ে সুপুরি বাগান পায় তারা। সেই বাগান পেরোলে একটা শ্যাওলা ধরা পুরনো মন্দির দেখা যায়।

লোকটা নয়নের দিকে ঝুঁকে বলে, দেখেছেন! ওই হচ্ছে মোনা ঠাকুরের আস্তানা। নয়ন গম্ভীরভাবে বলে, হুঁ।

লোকে কয় মাটির পুতলা, কালী আমার মাটির পুতলা। ঢ্যাস করে ফেলে দ্যান জলে, ভুস করে ডুবে যাবে। তো সব ঠিক। কিন্তু মায়ের গলার মালাখানা মোর ঘোরে কেন রে? বন বন করে ঘোরে কেন মালাখানা? হ্যাঁ? বলে মোনা ঠাকুর একটু হাসে।

মন্দিরের পাশে চৌকো ঘরখানা। সামনে বাঁধানো চাতাল। সেখানে কয়েক জোড়া ছাড়া জুতো। চাতালের ওপাশে বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মতো হিলহিলে শরীরের সুপুরিগাছের সারি। ঘেঁটুবন, আশশ্যাওড়া আর ভাটগাছের জঙ্গল। চারদিক কেমন ঠান্ডা, নিঝুম। শ্যামা আঁচলখানা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বসে।

বাঁশের বেড়ার ওপর মাটির আস্তরণ, তাতে চুনকাম করে ঘরের দেয়াল তৈরি হয়েছে। ওপরে টিনের চাল, মেঝে বাঁধানো। ছেঁড়াখোড়া শতরঞ্চি পাতা। কয়েকটা পাটির আসন। শতরঞ্চিতে মোনা ঠাকুর বসে আছে। গায়ের রঙ তামাটে, বড় বড় চুল, গালে ছাঁটা দাড়ি, তাতে সাদা ছোপ ধরে এসেছে। মুখখানা লম্বাটে, ভাঙা, কিন্তু তার একটা কমনীয় সৌন্দর্য আছে। হাসলে মোনা ঠাকুরকে খুব সরল মনের লোক মনে হয়, গম্ভীর হলে মনে হয় চিন্তাশীল। খালি গায়ে পৈতেটা খুব সাদা দেখায়। বুকে, হাতে, কাঁধে, কানে, নাকে প্রচুর লোম। শরীরের বাঁধুনি কৃশ, কিন্তু শক্ত। পরনে পরিষ্কার একখানা ধুতি। পাশে বিড়ির বান্ডিল আর দেশলাই। মোনা ঠাকুরের মুখে বিড়ি নেভে না। একটা ফেলেই আর একটা ধরায়।

মোনা ঠাকুরের একেবারে সামনে দুটো পাটিতে বাবা আর মা বসে আছে। আশেপাশে আরও দু'চারজন গাঁইয়া লোক। তাদের মুখ চোখ হাবাগোবা, চোখে ভয় আর ভক্তি।

দরজার পাশে একটা পাটিতে বসে ছিল শ্যামা। তার মন ভালো নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে সে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে ছিল।

মোনা ঠাকুর একটু দুলে বলে, লোকে বলে মাটির পুতলা। তো তা—ই। তবু কালী আমার হাঁটে—চলে, খায়—দায়, চুল ফেরায়, চান করে, আমার কালীর মন খারাপ হয়, কাঁদে—হাসে। পাগলি।

বাইরে একটা মেঘের ছায়া পড়েছে। চাপ বাঁধা গাছপালা আর জঙ্গল। দিনের বেলায়ও প্রবল ঝিঁঝি ডাকছে। গাছপালাগুলো অন্ধকার সব ছায়া ফেলেছে। ওই আলো—আঁধারির কোথাও নয়ন লুকিয়ে আছে। সারা রাস্তা যত পাখির ডাক শুনেছে শ্যামা, যত দূরাগত শব্দ শুনেছে তত সে চমকে চমকে উঠেছে। মনে হয়েছে, পাখি নয় নয়ন। সব শব্দই করছে নয়ন। সেই হরবোলা তার বিচিত্র সব শব্দ তুলে শ্যামার চারদিকে একটা জাল তৈরি করছে। শ্যামার মন ভালো লাগে না।

মোনা ঠাকুর বাবার দিকে চেয়ে বলে, বাবুমশায়, আপনি কি ছেলের খবরের জন্য এসেছেন?

একটু চমকে ওঠে শ্যামা। লোকটা জানল কী করে? তারা যে দাদার খবরের জন্য এসেছে তা তো বলেনি।

বাবা একটু স্তব্ধ হয়ে তার পর ধরা গলায় বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। আপনি তো অন্তর্যামী।

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে, অষ্টাসিদ্ধির দুটো সিদ্ধি হলেই এসব বলা যায়। কিছু না বাবুমশাই। লোকের চোখে—মুখে সমিস্যের কথা লেখাই থাকে। সেটা পড়ার মতো অক্ষরজ্ঞান থাকলেই হল। ওই মেয়েটি কি আপনারই?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোনা ঠাকুর হেসে বলে, তা মেয়ের মুখ অত ভার কেন? এ জায়গা ভালো লাগছে না মা? ভয় করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে জানায়, না। তারপর একটু হাসে।

ভয় নেই মা, আমার কালীমায়ের আওতায় বিপদ—আপদ নেই। সাপখোপের মুখে আপনা থেকেই বন্ধন পড়ে যায়, চোর—বদমাশরা অসাড় হয়। যাও মা, ঘুরে টুরে জায়গাটা দেখে এসো। পশ্চিমে একটা সুড়ঙ্গ আছে, অনেকটা যাওয়া যায় ভিতরে, দক্ষিণে শিবমন্দির আছে। দাঁড়াও, সঙ্গে লোক দিচ্ছি। বলে মোনা ঠাকুর ভিতর—বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে, তারা, ওরে তারা—

ডাক শুনে উনিশ বছরের একটা লালপেড়ে শাড়িপরা লাজুক মেয়ে এসে ভিতরের দরজায় দাঁড়ায়।

এই মাকে নিয়ে যা তো, সব দেখিয়ে আন। যাও মা, ওই আমার মেয়ের সঙ্গে যাও। কোনো ভয় নেই।

শ্যামা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। উঠে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে তার মন থম ধরে আছে। মুখে কতকগুলি উষ্ণ স্পর্শ এখনও ফোস্কার মতো লেগে আছে। মন ভালো নেই।

কোথায় একটা বেড়াল কাঁদছে। মেয়েটির সঙ্গে বাইরে যাবে বলে পা বাড়িয়েও থেমে গেল শ্যামা। নয়ন! নয়ন নয় তো? আতঙ্কিত মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, ওটা কী ডাকছে?

মেয়েটি মুগ্ধ চোখে তাকে দেখছিল, হেসে বলল, বেড়াল। আমাদের বেড়ালটার বাচ্চা হারিয়ে গেছে, কাঁদছে কাল থেকে।

চাতালে পা দিতেই বাতাস লাগল। বাতাসটা হিম। চারদিকে বেশি গাছপালার জন্যই বোধ হয়।

শ্যামা বলল, তবে যে শুনলাম, মোনা ঠাকুর বললেন, এখানে কোনো অমঙ্গল হয় না। বেড়ালটার বাচ্চা তাহলে চুরি গেল কেন?

মেয়েটি খুবই সাধারণ। গিনি—বান্নির মতো ঢিলে করে ফেরতা ঘুরিয়ে শাড়ি পরেছে। কপালে তেল—সিঁদুরের বড় একটা টিপ। সিঁথি সাদা। মুখে সরলতা আর বিস্ময়। শ্যামার সাজগোজ দেখছে বারবার। প্রশ্ন শুনে চোখ দুটো বড় করে বলে, মানুষকে সাহস দেওয়ার জন্য বাবা অনেক সময় ওরকম সব কথা বলেন। নইলে এখানেও কত ঘটনা হয়। আমারই এক ভাই তো চার বছর আগে কলেরায় মারা গেছে।

তাহলে কি ওসব মিথ্যে কথা?

মেয়েটা ঠিক—ঠাক জবাব দিতে পারে না। কিন্তু সরল মুখে সে খুব হাসে। তারপর বলে, না, বাবা ঠিক মিথ্যে কথাও বলে না। যার বিশ্বাস আছে, তার অমঙ্গল হয় না।

তবে আপনার ভাই মারা গেল কেন? মোনা ঠাকুরের তো বিশ্বাস আছে।

মেয়েটা হেসেই বলে, ওসব আমি ঠিক বুঝি না। বাবা আমাদের সঙ্গে তো বেশি কথা বলে না। কী করে জানব বলুন! আমরা শুধু জানি, বাবার কাছে অনেক লোক আসে, বাবা তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়।

শ্যামা চাতালের সিঁড়িতে পা দিয়ে বলে, কালীর গলার মালা সত্যিই ঘোরে?

মেয়েটা বলে, আমরা তো ওসব দেখতে পাই না। বাবা যখন পুজো করে তখন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। আপনি কিন্তু খুব সুন্দর।

যাঃ, আমি তো কালো।

খুব কালো না। তবে ফর্সা হলে আপনি ঠিক রানির মতো হতেন। আজকাল কলকাতায় গয়না পরার চল নেই, না?

কেন?

আপনি তো পারেননি।

আমার বেশি গয়নাই নেই। তা ছাড়া দিনকাল তো ভালো না, গয়না পরলে যদি চোর—ডাকাত পিছু নেয়?

আপনি যা সুন্দর! চোর—ডাকাত না হোক ছেলে—ছোকরা পিছু নেবেই।

শ্যামা একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

আপনি এটা কী শাড়ি পরেছেন? শিফন?

না, এটা কমদামি শাড়ি। ব্রাসো।

মেয়েটার হাসি তার চোখেও উপচে পড়ে। সে মিটমিটে হাসিচোখে চেয়ে বলে, আমাদের কিন্তু ওসব জোটে না। পুজোর শাড়িই পরি আমরা। এই দেখুন না পরে আছি, লালপেড়ে। তার ওপর আবার খাটো।

বলে খুব হাসে। শ্যামার তক্ষুনি মেয়েটাকে ভালো লাগতে থাকে। সে সমবেদনার গলায় জিজ্ঞেস করে, কেন, ভালো শাড়ি আপনার পরতে নেই?

বাবা পরতে দেয় না, কিনে দেওয়ারও লোক নেই।

গ্রামদেশে ভালো শাড়ি পাওয়া যায় না?

মেয়েটা মাথা হেলিয়ে বলে, খুব যায়। কলকাতায় নতুন শাড়ি বেরোলে তিন দিনের মধ্যেই এদিকে চলে আসে। গাঁয়ের মেয়েরা সবাই পরে। আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে তো, আমাদেরই জোটে না।

মন খারাপ লাগে, না?

লাগবে না? সাজগোজ করার বয়সই তো এটা, নয়?

শ্যামা একটু হেসে বলে, বিয়ে হলে পরবেন, তখন তো আর বাধা থাকবে না।

বিয়ে কে দিচ্ছে!

কেন?

বাবা তার কালী ছাড়া কিছু বোঝেই না। আমি কত বড়টা হয়ে যাচ্ছি কে খেয়াল রাখে! মা ভয়ে বিয়ের কথা তোলে না। এই করেই আমার দিদি একটা বাজে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল।

শ্যামা একটু থমকে গিয়ে বলে, সে কী!

সত্যিই।

শ্যামা একটু হেসে বলে, তবে তো মোনা ঠাকুরেরই সমস্যা অনেক।

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, না। বাবার কোনো সমস্যা নেই।

এগুলোই তো সমস্যা। যার বেড়ালের বাচ্চা মরে যায়, মেয়ে পালিয়ে যায়, সেই তো সত্যিকারের দুঃখী লোক। সে কী করে অন্যের ভালো করবে?

মেয়েটা একটা উদাস গলায় বলে, কিন্তু তবু বাবার কোনো সমস্যা নেই।

কেন?

মেয়েটা মুখে আঁচল দিয়ে হেসে বলে, আসলে আমরা তিন বোন, আমার মা, আমাদের মরা ভাইটা, আমাদের বেড়াল, এরা বাবার কেউ না। বাবা হচ্ছে মোনা ঠাকুর, মস্ত ভক্ত সাধু। আর আমরা, তার পরিবারের লোকেরা হচ্ছি এই আপনাদের মতোই বাইরের লোক, বদ্ধ জীব। বাবার কাছে আপন—পর বলে ভেদ নেই। যেদিন আমার ভাই মারা যায় সেদিন বাবার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। বাবা ওই চালাতে বসে লেবুকাঁটা দিয়ে সেই কাঁটা তুলছিল। দৌড়ে গিয়ে যখন বাবাকে খবর দিলাম তখন কাঁটা তোলা হয়নি। বাবা খবরটা শুনল, তার পর আস্তে আস্তে খুঁটে কাঁটা তুলল, তারপর ভিতর—বাড়িতে গেল।

শ্যামা বলে, সে কী!

মেয়েটা হাসে, বলে, সত্যি বলছি। বাবার কোনো সমস্যা নেই। আপনাদের সঙ্গে যেমন সুরে কথা বলেন, আমাদের সঙ্গেও তেমন করেই কথা বলেন। আমরা বাবাকে মোনা ঠাকুর বলেই চিনি, বাবা বলে নয়।

চাতাল পেরিয়ে একটা মঠ মতো। দক্ষিণে দ্বাদশ শিবের মন্দিরের গা ভেদ করে অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। মন্দিরের গায়ে শ্যাওলা।

এসব মন্দির কি বহু দিনের পুরনো?

কয়েকশো বছর বোধ হয়। শিব মন্দিরে তক্ষক ডাকে। মেয়েটা হেসেই বলে।

সুড়ঙ্গটা কোন দিকে?

পশ্চিম দিকে। দেখবেন? না কি এমনি বেড়াবেন?

শ্যামা মেয়েটির দিকে চায়। সরল সোজা মুখ, অকপট চোখ। কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু টের পাওয়া যায়, এই মন্দির, মোনা ঠাকুর, এসবের ওপর মেয়েটির কোনো টান নেই। মেয়েটা এই মন্দিরের দেবতা বা তার পূজারিকে গ্রহণ করেনি।

শ্যামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনি আপনার বাবার সবকিছু বিশ্বাস করেন না?

মেয়েটা চোখ বড় করে হেসে বলে, করব না কেন? আপনাদের যেমন বিশ্বাস আমাদেরও তেমনই বিশ্বাস। তবে, মেয়েটা চুপ করে থাকে।

তবে কী?

বলছিলাম, আমার ভাই মরে যাওয়ার দিন ওই যে বাবাকে পায়ের কাঁটা তুলতে দেখেছিলাম ওটা কখনও ভুলতে পারি না। একজন মরে যাচ্ছে, আর বাবা কাঁটা তুলছে, কেমন যেন মনে হয়। ঠিক যেন সংসারের একটা কাঁটা বাবা তুলে ফেলছে। এরকম করে ভাবলে ভয় করে।

শ্যামার বুকের ভিতরটা গুড় গুড় করে। সে আস্তে করে বলে, কিন্তু বাবার মুখ দেখে উনি কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন আমরা কার খোঁজে এসেছি।

মেয়েটা কিন্তু কোনো কৌতূহল দেখায় না, কেবল বলে, বাবা তো সবই ঠিক বলে। আমরা জানি। নইলে লোকে আসবে কেন?

অনেক লোক আসে?

অনেক। ছুটির দিন হলে এ সময়টায় লোক গিজ গিজ করে। কলকাতা থেকেই বেশি আসে।

শ্যামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার এক দাদা পাঁচ বছর হল হারিয়ে গেছে।

মেয়েটা উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে হাঁটে। শ্যামার তখন মনে পড়ে, এ মেয়েটার ভাই মরে গেছে, একটা মাত্র ভাই। এর দুঃখ আরও বেশি হওয়ার কথা। তার দাদা বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। এ মেয়েটার ভাই নিশ্চিত ভাবে মারা গেছে।

শিব মন্দিরের পাশে একটা টিউবওয়েল দেখে শ্যামার তেষ্টা পায়। বলে, একটু জল খাব। আমি বাড়ি থেকে এনে দেব?

না, না। ওই তো টিউবওয়েল।

আঁজলা করে খেতে অসুবিধে হবে না?

দূর।

তবে চলুন আমি কল টিপে দিই। এখানকার জল খুব মিষ্টি।

জল খাওয়ার সময়ে নিচু হয়ে শ্যামা হঠাৎ শুনতে পেল, কোকিল ডাকছে। সারা গায়ে কাঁটা দিল তার। মুখ তুলে বলল, কী ডাকছে?

ওমা! কোকিল। মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

শ্যামা স্থির হতে পারে না! প্রশ্ন করে, সত্যিকারের কোকিল?

তা নয় তো কী?

অনেক সময়ে মানুষ কোকিলের মতো ডাকতে পারে।

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে বলে, এখানে কে আবার মানুষ কোকিল ডাকতে আসবে? আমি জন্ম থেকে কোকিলের ডাক শুনছি। এ সত্যিকারের কোকিলের ডাক।

শ্যামা জল খেয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলে, আমি একজনকে জানি যে হুবহু কোকিলের মতো ডাকে। ধরা যায় না যে মানুষ ডাকছে।

মেয়েটা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু এ মানুষের ডাক নয়। ওই শিমুল গাছে কোকিল বসেছে। সারা দিনই ডাকে। আমি চিনি ওই ডাক।

চারদিকে ঝোপ—ঝাড় আর গাছে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ হয়। রোদের মুখ থেকে মেঘ সরে গেছে। তবু এইখানে রৌদ্রের ততদূরে উজ্জ্বলতা নেই। গাছের ছায়ারা পড়ে আছে। শ্যামা তার মুখে গালে নয়নের স্পর্শ ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

সুড়ঙ্গটা দেখবেন? মেয়েটা জিজ্ঞেস করে।

চলুন, দেখি। কখনও দেখিনি।

দেখার কিছু নেই। মেয়েটা উদাসভাবে বলে, আমরা তো জন্ম থেকে দেখছি।

এ সবই কি আপনাদের সম্পত্তি?

না। দেবত্র। এক জমিদার দেবত্র করেছিল। তার আর বংশ নেই। আমাদের কিছু ব্রহ্মত্র জমি আছে। আমরা এই মন্দিরের চার পুরুষের পুরুত।

এখানেই জন্মেছেন?

মেয়েটা হেসে বলে, তবে আর কোথায়?

ভালো লাগে এ জায়গা?

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, একদম না। অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। কেউ যদি নিয়ে যেতে চায় চলে যাব।

শ্যামা হেসে ফেলে। বলে, এ জায়গার ওপর আপনার এত রাগ কেন?

মেয়েটা হেসে বলল, আপনার মতো একটা রঙিন সুন্দর শাড়ি পরতে ভীষণ ইচ্ছে হয়, জানেন।

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে। তারা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাঁটে।

মেয়েটা বলে, খুব সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে। বাসে—ট্রামে—মোটরগাড়িতে চড়তে ইচ্ছে করে, রেডিয়ো শুনতে ইচ্ছে করে।

এখানে কিছু নেই?

মেয়েটা অন্যমনস্ক ভাবে বলে, মাঝে মাঝে অমাবস্যার পুজোয় এই মাঠে সিনেমা দেখানো হয়। যাত্রাওলারা আসে। অনেক বছর আগে একটা সার্কাসও এসেছিল। সেই সার্কাসের একটা লোক খেলা দেখাত, তাকে সিংহ থাবা দেয়। সার্কাসের লোকেরা তাকে এইখানেই ফেলে গেল। সে এখনও আছে। ওই দিকে মন্দিরের উত্তর বাঁশ—ঝাড়টার পিছনে থাকে। বাবা দেখতে পারে না।

কেন পারে না?

এই গাঁয়ের সে—ই একমাত্র লোক যে এ মন্দিরে আসে না।

কেন?

মেয়েটা ম্লান একটু হাসে। বলে, তার একটা ছেলে আছে। তার বউ ছেলের জন্ম দিয়েই মারা যায়। বাবা বলে, ছেলেটা ওই লোকটার নয়! কী ঘেন্নার কথা বলুন। কিন্তু লোকটা বলে যে ছেলেটা তারই। এই নিয়ে ঝগড়া। বলে মেয়েটা আবার হাসে মুখে আঁচল দিয়ে।

তারপর আবার বলে, এখানে কিছু নেই। কেবলই মনে হয়, আমাদের একটা আদ্যিকালের পোড়ো অন্ধকার জায়গায় ফেলে রেখে চারদিকে পৃথিবীটা এগিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে কত লোক আসে, তাদের যত দেখি তত ওই কথা মনে হয়। বাবা তাদের দুঃখের কথা শোনে, আর আমি দেখি তাদের পরনে কত রঙিন কাপড়ের পোশাক, কীরকম ঝলমলে মুখ চোখ, কেমন দূর মাখানো তাদের চেহারায়!

শ্যামা হাসি চেপে বলে, কিন্তু এ তো কলকাতা থেকে খুব দূর নয়।

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, দূর কেন হবে! কত লোক এখান থেকেও চাকরি করতে যায় রোজ, কিংবা সিনেমা দেখে আসে, কেনাকাটা করতেও যায়। কাছেই একটা—দুটো শহরও তো আছে। কিন্তু আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বলেই কোথাও যাওয়া হয় না।

মেয়েটা থেমে গিয়ে বলে, ওই হচ্ছে সুড়ঙ্গের রাস্তা।

একটা উঁচু বেদীর মতো বাঁধানো জায়গা! চারটে থাম, ওপরে সুন্দর একটা চুড়োওয়ালা ছাদ। ছাদের নীচে একটা ছোট্ট ঘর, তার দরজাটা খোলা। মেয়েটা সেদিকে চেয়ে বিস্বাদ মুখে বলে, ওই। যাবেন?

কতদূর গেছে সুড়ঙ্গটা?

বেশি দূর নয়। একটু গিয়েই দেখবেন ছাদ ভেঙে পড়েছে, ইটের ডাঁই, আর আগাছা। বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরীর মন্দিরে এরকম সুড়ঙ্গ আছে, শুনেছি।

সাপখোপ নেই তো?

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে হেসে বলে, কত কী আছে! আমরা ছেলেবেলায় চোর—চোর খেলতে যেতাম ওর ভিতরে। বড় হয়ে আর যাই না। অনেকে গুপ্তধনের লোভে খুব খোঁড়াখুঁড়ি করত একসময়। কেউ কিছু পায়নি।

শ্যামা হেসে বলে, আমরা যদি কিছু পেয়ে যাই?

মেয়েটা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে।

ঘরে ঢুকে প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই শ্যামা থেমে পড়ে। সামনে গভীর অন্ধকারে নেমে গেছে সিঁড়ি। একটা চামচিকে ডেকে ওঠে।

অন্ধকার যে!

কোনো ভয় নেই। আমি আগে যাচ্ছি।

মেয়েটা শ্যামাকে পেরিয়ে আগে নামে। শ্যামা পিছনে। আবার হঠাৎ চামচিকে ডেকে ওঠে। এবার একটু দূর থেকে।

মেয়েটা থমকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম কী?

শ্যামা।

মেয়েটা হাসে, বলে, আমার নাম তারা।

জানি।

আমাদের নামের একই অর্থ।

শ্যামা মাথা নাড়ে। হাসে।

শ্যামার মন্দিরেই আপনি এসেছেন। অন্ধকারকে কি খুব ভয় শ্যামাদি?

শ্যামা অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে, আমরা তো ভাই শহরের মানুষ, অন্ধকারকে একটু ভয় পাই।

তবে থাক, গিয়ে কাজ নেই।

কেন?

আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। অনেকদিন নামি নি কিনা!

গভীর অন্ধকার তলদেশ থেকে হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

তিন—চার ধাপ সিঁড়ি নেমে গলা পর্যন্ত অন্ধকারে দুজনে একটু দাঁড়িয়ে রইল। সামনে তারা, পিছনে শ্যামা।

তারা একটা শ্বাস ফেলে বলল, আপনার কি নামতে খুব ইচ্ছে করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলল, না। বলে সে উঠতে লাগল।

ওপরে এসে, ফাঁকা জায়গায় এবং আলোতে মেয়েটাকে বিমর্ষ দেখাল। শ্যামার দিকে চেয়ে সে বলল, জানেন, আমার সেই ভাইটা মরে যাওয়ার পর থেকেই আমি কেমন যেন ভয়—ভয় পাই। নির্জনে বা অন্ধকারে থাকতে পারি না, কিছু মনে করলেন না তো শ্যামাদি? সুড়ঙ্গটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আপনার।

শ্যামা অন্যমনস্ক ছিল। খুব অন্যমনস্ক। আসল ডাক আর নকল ডাকের পার্থক্য বোঝা যে কী মুশকিল! সে তারার কথার উত্তর দিল না।

এখনও বেলা আছে। সূর্যের আলো আরও কিছুক্ষণ থাকবে। কেবল পশ্চিমের আকাশে একটা ধোঁয়াটে অস্বচ্ছতা ঘুলিয়ে উঠছে। নিবিড় গাছপালার ওপর দিয়ে একটা বিবর্ণ আকাশ দেখা যায়। এই ঋতুতে এ রকম হয়। মাটির তাপ ওঠে, কুয়াশা জমে স্থির বাতাসে ধুলো ভেসে থাকে। সেই অস্বচ্ছতার আড়ালে সূর্যকে পরিষ্কার গোল চাঁদের মতো দেখা যায়। উজ্জ্বলতা নেই তার। চারপাশে আকাশের সেই অস্বচ্ছতা এক রকম ছায়া ফেলেছে।

মোনা ঠাকুর তার আসন ছেড়ে উঠে গেছে। মা আঁচলে চোখ মুছছে। বাবা স্তব্ধ হয়ে বসে। শ্যামা গিয়ে তার মায়ের পাশে বসল।

কী হল মা?

মা বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে ধরল তাকে, যদি সত্যি হয় শ্যামা, তবে আমি কালীর সোনার চোখ গড়িয়ে দেব।

কী হয়েছে বলো না।

মা মোনা ঠাকুরের শূন্য আসনটার দিকে চেয়ে ধরা গলায় বলে, ও নাকি বেঁচে আছে। হৃষীকেশ বা হরিদ্বারের দিকে আছে। সন্ন্যাসী হয়েছে, মাথার অসুখ নেই।

বাবা একটা শ্বাস ফেলে বলে, আমি ডেফিনিট হতে পারছি না।

মা চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে ঝেঁঝে উঠে বলে, আমরা কিছু বলার আগেই উনি কী করে বুঝলেন যে আমরা ছেলের কথা জানতে এসেছি। তুমি তোমার ডেফিনিট নিয়ে থাকো গে। আমি হৃষিকেশ যাব।

বাবা মৃদুস্বরে বলে, এসব বিষয়ে সিওর হওয়া যে কী মুশকিল তা তুমি পুরুষ হলে বুঝতে। এত বছর অপেক্ষা করার পর আশা করতে ভরসা পাই না।

মা বলে, তুমি না পাও আমি পাচ্ছি।

বাবা চুপ করে থাকে।

শ্যামার ভিতরটা মুচড়ে ওঠে ব্যথায়। আবার আনন্দেও। দাদা কি আবার ফিরে আসবে। দাদা কি আর বেঁচে আছে। আবার ফিরে যদি আসে, যদি আবার প্যান্ট—শার্ট পরে। আড্ডা মারতে বেরোয়, যদি আবার খাওয়া নিয়ে মা'র সঙ্গে ঝগড়া নিয়ে বসে! যদি আবার আগের মতো তারা চারজন রাতের খাওয়ার পর লুডো বা তাস নিয়ে বসে! কত চাল চুরি করত দাদা, মা দেখেও দেখত না। আবার কি সে সব হবে ঠিক আগেকার মতো। ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। শ্যামা মনে মনে ধরেই নিয়েছিল, দাদা নেই। কোনো নদীর পাড়ে বা রেললাইনের ধারে, কিংবা বড় মাঠের মধ্যে সেই পাগল মানুষটা শেষ হয়ে পড়ে আছে, এ রকমটাই মনে হত তার, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ধক করে কেঁপে উঠত বুক। বাবা প্রায় সময়েই বলত, দ্যাখো গে, কোথাও ভিক্ষে—টিক্ষে করছে বোধ হয়। মা'র দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দাদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। মায়ের কথা, বাড়ির কথা সে ভুলে গেছে বলেই আসছে না। একদিন ঠিক ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মতো ফিরে আসবে। আবার

'মা' বলে ডাকবে, বিয়ে করবে, চাকরি করবে। শ্যামার ঠিক বিশ্বাস হয় না। এসব তো সিনেমায় হয়, গল্পে হয়, কিন্তু তার দাদার বেলায় হবে কি?

তাকে কাছে টেনে, আদর করে, কপালের চুল সরিয়ে দিয়ে গাঢ় আনন্দের স্বরে মা বলল, শ্যামা, একটু পরেই সন্ধে লেগে যাবে মা, আমরা আরতিটা দেখে যাব।

দেরি হয়ে যাবে না?

হোক গে। এ বড় জাগ্রত দেবতার স্থান! একটু থাকি।

বাবা বিড় বিড় করে বলে, দিনকাল ভালো নয়।

মা বড় চোখে বাবার দিকে চায়। বাবা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

উদাস একখানা মাঠ। শেষ বেলার বালিরঙের আলো পড়ে আছে। একখানা টিনের দোচালার দাওয়ায় বসে বাপ—ব্যাটা।

ছেলে মুখ তুলে বলে, বাবা, দাদুবুড়ো কেমন করে হাঁটে?

দাদুবুড়োর কোমর বাঁকা, কুঁজো হয়ে মাজায় হাত রেখে হাঁটে।

কামড়ায় না?

কামড়ায়।

কেমন লাগে?

লাগে না। দাদুবুড়োর দাঁত নেই তো, কেবল মাড়ি। কামড়ালে কাতুকুতু লাগে।

সুকুল হেসে গড়িয়ে পড়ে। তার বাবা হাসতে গিয়ে দেখে, কোনাকুনি মাঠ পার হয়ে নয়ন আসছে। কোকিল ডাকে। কোকিলের ডাকই নয়নের বেশি প্রিয়।

সে কাছে আসতেই ছেলের বাপ হাসে, বলে, শ্যামাপাখির ডাক পারেন না?

নয়ন খুব গম্ভীর। মাথা নাড়ে। না।

কী হল ওখানে?

কিছু না। এখানে আরতি হবে।

বসুন।

নয়ন দাওয়ার একধারে বসে। সুকুল উঠে তার দিকে চায়।

কোথায় গিয়েছিলে?

কল্পতরু মন্দিরে।

মোনা ঠাকুর ভীষণ রাগী। কামড়ায়।

নয়ন কেবল মৃদু একটু হাসে।

তুমি আমাকে কখন পাখির ডাক শেখাবে?

কাল থেকে শেখাব।

আমি ঘুমোলে চলে যাবে না তো?

না।

সুকুল নিশ্চিন্ত মনে তার বাবার দিকে চেয়ে বলে, বাবা, সিংহটা তোমাকে কেমন করে থাবা দিয়ে মেরেছিল বলো।

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হাসে। বলে, এই গল্প ও কতবার শুনেছে, তবু রোজ শুনবে।

নয়ন ঝুঁকে বলে, কী গল্প?

গল্প না। একটা ঘটনা।

আপনাকে সিংহ থাবা দিয়েছিল?
লোকটা উদাস গলায় বলে, সিংহ কি না কে জানে। আদুবুড়ো বলত, সেটা কেশরী বাঘ।
সেটা কী?
সিংহই আসলে। তবে গাউস সাহেবের গরিব সার্কাসে আর কত বড় সিংহ হবে! আদুবুড়ো বলত—আসলে সিংহ হয় গহিন জঙ্গলে, সেখানে মানুষ যেতে পারে না। গাউস একটা কেশরী—বাঘ ধরে এনে সিংহ বলে চালাচ্ছে। আমাদেরও সেই ধারণাই ছিল।
আপনি সার্কাসে ছিলেন? খেলা দেখাতেন?
দেখাতাম। প্রথম—প্রথম। চুল দিয়ে লোহা তুলতাম, কিলিয়ে পাথর ফাটাতাম। গায়ের জোর ছিল খুব। একদিন তাঁবুর দড়ি খাটাতে গিয়ে পড়ে যাই। মাজা ভেঙে শেষ হয়ে গেলাম। গাউস অবশ্য লোক খারাপ ছিল না। দলে রেখে দিল। ফাই—ফরমাস তামিল করতাম, বাঘ—সিংহকে খাবার দিতাম, হাতির জন্য কলাগাছ কেটে আনতাম। এই সামনের মাঠে একবার গাউস সাহেব তাঁবু ফেলল। নির্জন জায়গা বাঘ—সিংহের ডাকে কেঁপে উঠল। তা এইখানেই সেই ঘটনাটা ঘটে। দুপুরবেলা খাবার দিতে সিংহের খাঁচায় নেমেছি। বুড়ো আধমরা সিংহ, নড়াচড়া করত না বড় একটা, খাঁচায় ঢুকলে হাই তুলে নিরীহ চোখে চাইত। দেখেশুনে মনে হত, আদুবুড়োর কথাই ঠিক। এটা সিংহ নয় বটে, কেশরী বাঘই হবে। সেদিন কী খেয়াল হল, মাংসের একটা বড় টুকরো সিংহের নাকের সামনে নেড়ে সরিয়ে নিচ্ছিলাম। দেখি ব্যাটা করে কী। এইরকম পাঁচ—সাতবার করবার পরও সে ব্যাটা কেবল হাই তুলল, আর চোখ পিট পিট করল। মজা পেয়ে আবার তার নাকের সামনে মাংস দুলিয়ে সরিয়ে নিই। ঠিক বুঝতে পারি না। হঠাৎ বেমক্কা সব আলসেমি ঝেড়ে ফেলে সিংহটা লাফিয়ে উঠল। সে কী ডাক। ভিতরটা আমার ফেটে গেল যেন। সেই ডাক সামলাবার আগেই উপর্যুপরি কয়েকটা থাবা। তারপর এক ঝটকায় আমাকে পেড়ে ফেলে আমার পিঠের ওপর দাঁড়াল সে। পাঁজরার একটা হাড় গেল মট করে ভেঙে। সময়মতো গাউসসাহেব চাবুকের শব্দ না—করলে আজ আর আমাকে সুকুলের বাবা হতে হত না। বলে লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাসতে থাকে।
সুকুল বলে, দেখি দাগ।
লোকটা জামা সরিয়ে পিঠ দেখায়। নয়ন দেখে, সেখানে গভীর এবং লম্বা ক্ষতের চিহ্ন। সে জিজ্ঞেস করে, তারপর কী হল?
কী আবার হবে! একটু দূরে মহকুমার হাসপাতালে মাস চারেক পড়ে রইলাম। ততদিনে গাউস পাততাড়ি গুটোল। আমারও সার্কাস ভালো লাগছিল না বলে পিছু নিলাম না। এই গাঁয়ের একজন লোক তখন আমাকে ধরে ছিল তার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। বিয়ে করলে বিশ বিঘে জমি দেবে, ঘর দেবে, নগদ বিদায়ও দেবে কিছু। মেয়েটাও মন্দ ছিল না। বিয়ে করে থেকে গেলাম। সেই মেয়েই সুকুলের মা। বেশিদিন বাঁচেনি।
লোকটা চুপ করে মাঠের বালিরঙের আলোর দিকে চেয়ে রইল। একটু অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে বলল, বাবা সুকুল, তুমি বই নিয়ে একটু বসো। আমি রান্না চাপাই। ঘরে অতিথি আছে।

ঘরে সবকিছুই সাজানো। একদিকে বাপ—ব্যাটার খাট, অন্যধারে একটা ন্যাংটো চৌকি। চতুর্দিকেই সুকুলের খেলনা। চাল থেকে বেলুন ঝুলছে, দেয়ালে পেরেকে লটকানো ঘুড়ি—লাটাই, কাচের আলমারি বোঝাই পুতুল, খেলনা—পিস্তল, ভেঁপু, লাট্টু, কলের ঘোড়া। আলনায় সুকুলেরই রং—বেরঙের জামাকাপড়। একধারে সুকুলের পড়ার টেবিল, তাতে পড়ার বইয়ের পাশে রাজ্যের ছবির বই। পরিষ্কার করে মোছা একটা ঝকঝকে লণ্ঠন রাখা।
লোকটা নয়নকে ঘরটা দেখিয়ে বলে, এ হচ্ছে সুকুলেরই ঘর। সুকুল যখন বড় হবে, তখন ওর বিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব।

সুকুল ঝাঁপিয়ে গিয়ে বাবাকে ধরে, কিল মারে নীরবে।
লোকটা হাসে, ছেলেকে সামলাতে সামলাতে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, যাব না। তুমি বই খুলে বসো। আমি ভিতরের বারান্দায় বসে রান্না করি।

ভিতরে অন্ধকার উঠোন। তাতে জোনাকি পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নয়ন চুপ করে বসে চেয়ে ছিল। দূরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। তার কান সেইদিকে।
লোকটা ভাত চাপিয়ে এসে পাশে বসে বিড়ি ধরায়।
কিছু হল?
না।
সুড়ঙ্গে নেমেছিলেন নাকি? মাথার চুলে ঝুল লেগে আছে।
নেমেছিলাম। কিন্তু ও নামেনি।
নামল না কেন?
নয়ন ঠোঁট উলটে বলে, কী জানি! বোধহয় আপনাদের মোনা ঠাকুর আগেভাগে সব জেনে ওকে সাবধান করে দিয়েছে।
ঠাকুরকে দেখলেন?
নয়ন মাথা নেড়ে বলে, দেখেছি। দূর থেকে।
কেমন মনে হল?
যেমন হয়।
পারবেন?
কী?
উচ্ছেদ করতে?
নয়ন একটু হাসে। তারপর আস্তে করে বলে, একটা বোমা মারলেই উড়ে যায়।
লোকটা ধীরে ধীরে বিড়িটা টানে। তারপর চিন্তা করে বলে, শত্রুকে দুর্বল ভাবতে নেই।
নয়ন একটু নড়ে। গালে একটা মশা মারে ঠাস করে। পায়ের পাতা খস খস করে চুলকোয়। কান খাড়া করে আরতির ঘণ্টা শোনে। হঠাৎ বলে, আপনার টর্চ আছে?
আছে একটা। আমার নয় সুকুলের। ছোট্ট টর্চ, তেমন জোরালো নয়।
দিন তো। বলেই উঠে দাঁড়ায়।
চললেন কোথায়?
ওদের এগিয়ে দিয়ে আসি।
চিনতে পারবে না?
না। অন্ধকার আছে। টর্চটা নিচু করে ফেলব।
গলার স্বর?
নয়ন হেসে বলে, আমি হরবোলা।
লোকটা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ছোট্ট টর্চটা এনে দেয়। নয়ন কয়েকবার চারদিকে আলো ফেলে দেখে নেয়। বলে, চলবে।
ঘর দিয়ে বাইরে যাওয়ার সময়ে সুকুল তাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, এ কি চলে যাচ্ছ?
না সুকুল। ফিরব।
কখন?

তুমি একটু জেগে থাকো। তোমার ঘুমোবার আগেই ফিরব।

যদি না ফেরো?

নয়ন টর্চটা উঁচু করে দেখিয়ে বলে, তোমার বাতি নিয়ে যাচ্ছি, এটা ফেরত দিতেও ফিরব।

ফিরো কিন্তু। কাল থেকে ডাক শিখব।

আরতির ঘণ্টা এখনও বাজছে। মাঠটা কোনাকুনি দ্রুত পার হতে থাকে নয়ন। জোনাকি পোকার মতো আলো জ্বালে আর আলো নেভায়।

মোনা ঠাকুরের শরীর ছন্দে দুলে যায়। কী সুন্দর তার শরীরের কারুকাজ। যে—কোনো নর্তকের চেয়ে নমনীয় তার শরীর, বেতের মতো। কখনও পিছনে হেলে, কখনও সামনে ঝুঁকে নাচে। আলোয় দেখা যায়, মোনা ঠাকুরের মুখে এক বিহ্বল হাসি, চোখে জল, দৃষ্টি সম্মোহিতের মতো মোহাচ্ছন্ন। তার প্রকাণ্ড ছায়া দেয়াল জুড়ে, এক অপ্রাকৃত ছায়ার সঞ্চার করে। সেই দৃশ্য দেখে শ্যামার ভয় করে! এ যেন এক অন্য জগতে চলে এসেছে সে। ধুনো আর গুগগুলের গন্ধের সঙ্গে ঘষা চন্দন আর ফুলের গন্ধ মিশে গেছে। মন্দিরের বদ্ধ বাতাসে শতাব্দী ধরে সঞ্চিত শীতলতা! এ যেন এই জগৎ নয়।

মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বাবা চোখের জল মোছে। শ্যামার হাত—পা আড়ষ্ট লাগে, পিপাসা পায়। তার মাথা ঝিম ঝিম করে। মনে হয়, সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় আরতির ঘণ্টার সঙ্গে নাচতে নাচতে, কেঁদে হেসে মোনা ঠাকুর কালীর সঙ্গে কথা বলছে। বিপুল কালীমূর্তির দুই চোখে ভয়াল দৃষ্টি, লোল জিহ্বায় আলো পড়ে ঝিকিয়ে ওঠে হিংস্রতা। ঘাম তেল গড়িয়ে নামছে মুখ বেয়ে। শ্যামা চোখ ফিরিয়ে নেয়। অনেকক্ষণ অসাড় লাগে তার মন। মনে হয়, মোনা ঠাকুরের কথার উত্তরে ওই মূর্তি এক্ষুনি হেসে উঠবে, কথা বলবে।

আরতি শেষ হতে হতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। তখনও মোনা ঠাকুর মাটিতে পড়ে আছে। কাঁদছে। তারপর অসাড় হয়ে গেল। মোনা ঠাকুরের রোজ আরতির শেষে ভর হয়।

দৃশ্যটা দেখে বাবা স্তব্ধ হয়ে থাকে! মা শব্দ করে কাঁদে। শ্যামার শরীরে ঘাম দেয়।

ঘোর—ঘোর একটা মানসিক অবস্থা বহু দূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। রওনা হতে হতে পৌনে আট। রাস্তা অন্ধকার। গাঁয়ের লোকেরা কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে এল, তারপর তারা তিনজন। আর কেউ নেই। কেউ কথা বলতে পারছে না এখনও।

আমবাগানের সামনে এসে বাবা থমকে দাঁড়ায়, মুখ ফিরিয়ে বলে, এ যে ভীষণ অন্ধকার! কী করে যাবে?

মা'র এখনও সঠিক জ্ঞান ফেরেনি যেন। মা কাঁদছে এখনও। ধরা গলায় বলে, ভয় কী! চল ঠিক চলে যাব।

যেতে তো হবেই। কিন্তু এই অন্ধকারে খুব রিস্কি। বেলাবেলি চলে গেলে কোনো ঝামেলা ছিল না।

তোমার কেবল পিছু টান। কোথাও তোমার সঙ্গে গিয়ে শান্তি নেই। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার, সেখানে দু'দণ্ড মনটাকে রাখতে হয়, ঘরের চিন্তা করলে কি চলে?

বাবা বিড় বিড় করে বলে, সাপখোপ কত কী আছে হয়তো।

তবু যেতেই হবে। বাবা শ্যামাকে ডেকে বলে, তোকে নিয়েই ভয়, আমরা দুনিয়ার বার। তুই মাঝখানে থাক, সামনে আমি পিছনে তোর মা। বলে বাবা গলা খাঁকারি দেয়। দু'—তিন বার হাতে তালি বাজিয়ে শব্দ করে।

শ্যামা এই সময়েও ওই কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে বলে, ও কী করছ?

দেশ—গাঁয়ে অন্ধকারে এভাবে শব্দ করে হাঁটতাম। জীবজন্তু সব শব্দ পেয়ে সরে যায়।

বাবা বারবার গলা খাঁকরি দিয়ে হাঁটে। সামনের পথ খুবই আবছা। রাস্তা উঁচুনিচু। বারবার পায়ে ঠক্কর লাগে। কয়েক পা হেঁটেই বাবা বলে, কী করে যাবে? হাঁটাই যাচ্ছে না।

চল তো, যা হবার হবে। মা কালী আমাদের দেখবেন। মা ধমকে বলে।

তবু বাবা সাহস পায় না। সাবধানে হাঁটে। পা দিয়ে রাস্তা হাতড়ে।

নয়ন কী চলে গেছে! শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে চারদিককার শব্দ শুনবার চেষ্টা করে। ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। এক—আধটা প্যাঁচার ডাক দূর থেকে শোনা যায়। ওই কি নয়ন? কে জানে।

এদিকে রাতে লোক—চলাচল নেই দেখছি! বাবা চিন্তিত গলায় বলে।

মা ঝংকার দিয়ে বলে, তোমার অত ভয় থাকলে তুমি পিছনে এসো। আমি সামনে যাচ্ছি।

বাবা একটু রেগে গিয়ে বলে, তুমি বড় সাহসী কিনা! মেয়েছেলের এগারো হাতে কাছা হয় না, বড় বড় কথা।

তোমাদেরই কাছা দেওয়া উচিত নয়। ঘোমটা দাও। তখন থেকে কেবল চোর—ডাকাত সাপ—খোপের কথা বলে যাচ্ছ।

তোমাদের আর কী? সঙ্গে পুরুষ মানুষ রয়েছে। সব হ্যাপা সে সামলাবে। তোমাদের গা আলগা দিয়ে থাকলেই হল।

কথা বেশি দূর গড়াল না। সামনের অন্ধকারে জোনাকি পোকা জ্বলছিল। তার মধ্যে একটা জোনাকি যেন একটু বড়। একবার অনেকক্ষণ জ্বলে নিভে গেল। লক্ষ্য করে শ্যামা বাবাকে ডেকে বলে, বাবা, সামনে টর্চ হাতে কেউ যাচ্ছে দ্যাখো।

বাবাও দেখল। বলল, মনে হচ্ছে। তোরা পা চালিয়ে আয় তো!

মা ঝংকার দেয়, কী বুদ্ধি! যদি ছেলে—ছোকরা হয় তবে কি আমরা হেঁটে তাকে ধরতে পারব? ডাকো না লোকটাকে, দাঁড়াতে বলো।

বাবা বিড় বিড় করে একবার বলে, কেমন লোক কে জানে! তারপরই গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করে, ও মশাই, শুনছেন, এই যে—

সামনের বাতিটা থামে। একটা টর্চের মুখ চক চক করে ওঠে। তারা এগোয়।

লোকটাকে দেখা যায় না। টর্চটা নিচু করে ধরা। একটু মোটা ভাঙা গলায় লোকটা বলে, কিছু বলছিলেন আজ্ঞে?

বাবা বলে, কোন দিকে যাবেন? বড় রাস্তা পর্যন্ত?

ওদিকেই।

আমরাও যাব। অন্ধকারে বড় বিপদে পড়েছি।

চলুন না, আমার সঙ্গে চলুন। কোথায় এসেছিলেন, কল্পতরু মন্দিরে নাকি?

হ্যাঁ। বড় জাগ্রত দেবতা। যা দেখে গেলাম ভোলবার নয়। আপনি কি এদিককার লোক? বাবা জিজ্ঞেস করে।

পাশের গাঁ। মোনা ঠাকুরকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি।

কেমন লোক?

কী আর বলি বলুন। তবে উনি আমাদের এই এলাকার গৌরব।

শ্যামা টর্চের আলোর আভায় প্রথমে প্যান্টের রংটা চিনতে পারে। তারপর হলুদ শার্টটার আভাস পায়। গায়ে কাঁটা দেয় তার। শীত করে। নয়ন আড়ালে থাকলে যত ভয়, কাছে এলে এত ভয় করে না শ্যামার। কিন্তু বাবা—মা'র সামনে এভাবে আসা ভীষণ বিপদজনক! যদি ধরা পড়ে যায় নয়ন! হাত—পা শিরশির করতে থাকে তার।

তারা হাঁটে। আগে নয়ন, তার পিছনে তারা তিনজন সারিবদ্ধ।

বাবা নানা কথা বলতে থাকে। নয়ন মোটা ভাঙা গলায় উত্তর দেয়।
এদিকের কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি, না? বাবা বলে।
কোন দিকটারই বা হয়েছে বলুন?
রাস্তাঘাট কেমন এখানে?
যেমন দেখছেন। এই সব রাস্তায় হেঁটেই আমরা বড় হলাম।
বিপদ আপদ?
সাপখোপ আছে।
চোর—ডাকাত?
শুনি না তো বড় একটা।
বাবা একটু গম্ভীর থেকে বলে, চোর—ডাকাত না থাক, অভাব তো আছে। অভাবী মানুষ, দুঃখী মানুষ যত বাড়বে ততই অমঙ্গল। সেই সব মানুষই রং পালটে চোর—ডাকাত হয় কিনা! তা ছাড়া লাশ—ফেলা পলিটিক্স আছে। কাজেই ভয়—ভীতি এখন সর্বত্র।
তা অবিশ্যি ঠিক। তবে এদিকে কখনও কিছু হয়নি। তবে হবে।
কী করে বুঝলেন?
দেশের অবস্থা দেখে বুঝঝি। শিগগির দেখবেন, এদিকেও লাশ পড়ছে।
শ্যামা অন্ধকারে আপন মনে একটু হাসে। কোথায় যেন বুনো ফুল ফুটেছে। তার গন্ধ পায় শ্যামা। মনটা চনচন করে ওঠে। ভালো লাগে। ওই তো টর্চ হাতে নয়ন সামনে চলেছে। এখন আর কোনো ভয় নেই। তারা ঠিক বাস—রাস্তায় পৌঁছে যাবে।

একটা আল টপকে দিলেই মোনা ঠাকুর ফিনিশ। তার মা কালীর পায়ের তলায় শুয়ে রক্ত—বমি করতে করতে চোখের পটল ওলটাবে। নয়ন সব জানে। তবে কিনা নয়নের সঙ্গে মোনা ঠাকুরের কোনো ঝগড়া নেই। কিন্তু লেগে যাবে এক দিন।
মন্দিরের আরতি হয়ে গেছে। শিকের দরজা পড়ে গেছে মন্দিরে। শিকের ফাঁক দিয়ে বিগ্রহ দেখা যায়। কালীমূর্তি বাঙালিমাত্রেরই আজন্ম চেনা। সেই জিভ—বের—করা আধ—ন্যাংটো নৃমুণ্ডমালিনী। কোন ভক্ত যেন সোনার চোখ গড়ে দিয়েছিল, সেই সোনালি চোখে প্রদীপের আলো ঝলসাচ্ছে, আর গায়ের ঘাম তেল! নয়নের কোনো আগ্রহ ছিল না, কেবলমাত্র মন্দিরটার কারুকাজ আর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছু কৌতূহলবশত সে জুতো ছেড়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠে এল। ফুল বেলপাতা ধুনো গুগগল এসব গন্ধ তো আছেই, কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে এক—দেড়শো বছরের ছায়ায় ঢাকা শ্যাওলা—পড়া সেঁতসেঁতে গন্ধ। মন্দিরের বারান্দাটা ঠান্ডা হিম। চামচিকে আর কবুতরের শব্দ পাওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। নয়ন ঝুলন্ত ঘণ্টাটায় একবার টং শব্দ করে, তারপর শিকের দরজাটা নেড়ে দেখে। তালা—দেওয়া বারান্দার দিকে দু'পাট ভারী, লোহার গুল মারা দরজা খোলা রয়েছে, সে দুটো আরও রাতে বন্ধ করে দেওয়া হবে। দুটো শিক দু'হাতে ধরে নয়ন মন্দিরের আধ—অন্ধকার ঘরখানা দেখল। এই ঘরে মোনা ঠাকুরের ভর হয়, দৈববাণীও হয় নাকি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে ভূতের গায়ের গন্ধে ম ম করে চারদিকে। দুটো শিক দু' হাতে চেপে নয়ন কালীর সোনার দুটো চোখের দিকে স্থির চেয়ে রইল একটুক্ষণ। এই চোখে প্রাণসঞ্চার হতে কেউ কেউ দেখেছে। নয়ন চেয়ে থাকে। আলো—আঁধারির ভিতর থেকে দু'খানা সোনার গয়না লক্ষ্য করে নয়ন। বিগ্রহের বেদি পুরোটা রুপো দিয়ে মোড়া। এই হচ্ছে মোনা ঠাকুরের স্টেজ। সঠিক আলো গন্ধে শব্দে রহস্যময় আবহ, দর্শকরা নিরক্ষর গরিব ভবিষ্যৎ—ভিরু মানুষ, এই মঞ্চে মোনা ঠাকুর ভর হওয়া রামকৃষ্ণের অভিনয় করে। দর্শকরা রোমাঞ্চিত হয়। চোখের জল ফেলে। তবু মোনা ঠাকুরের ওপর কোনো আক্রোশ ছিল না নয়নের। কারণ এ

অঞ্চলে সে আজই প্রথম এসেছে। এসেছিল শ্যামার পিছু নিয়ে। শ্যামা কোনোদিনই পাত্তা দিল না তাকে। নয়ন সবই বোঝে। তবু ছাড়তে পারে না। শ্যামা তাকে ভালোবাসে না হয়তো। তাতে নয়নের খুব বেশি কিছু যায় আসে না। হৃদয়ের খেলা পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে। এটা প্রয়োজনের যুগ। কাউকে কাউকে কারও প্রয়োজন হয় মাত্র। যেমন, নয়নের প্রয়োজন শ্যামাকে। যদি সারা জীবনের জন্য নাও হয় ক্ষতি নেই, অন্তত কিছুদিনের জন্য শ্যামাকে তার পেতেই হবে।

ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে। শ্যামা আজ তার মা—বাবার সঙ্গে এইখানে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে আসবে এই খবরটা নয়ন শ্যামাদের বাচ্চা চাকরটার কাছে আজ সকালেই পেয়ে যায়। সময়টা জানা ছিল না। তবু অনেক সকালেই সে জাতীয় সড়কের ধারে বাস থেকে নেমে গাঁয়ের হাটে অপেক্ষা করছিল। তখনই হাটের লোকজনের কাছে সে মোনা ঠাকুরের সব কাহিনি জেনে নেয়। শ্যামারা এসেছিল হেমন্তের বিকেল যখন মানুষজনের ছায়া দীর্ঘতর করেছে, ধানের রূপসি মুখে কনে দেখা আলো তখন। শ্যামাকে সে একবার দেখেছিল মাত্র, তারপরই ভিড়ে ডুব দেয়। কারণ শ্যামার বাবা—মা'র তাকে দেখলে স্ট্রোক হওয়ার ভয় আছে। নয়ন জানত, শ্যামারা যাবে আমবাগানের ভিতর দিয়ে। সেটা দীর্ঘ পথ। নয়ন হাটের লোকজনের কাছে জেনে নিয়েছিল, মোনা ঠাকুরের কালী মন্দিরে যাওয়ার একটা জঙ্গুলে ছোট পথ আছে। ভাঙা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাওয়া যায়। খানিকটা তাড়ি গিলেছিল সে তারপর। যখন হাঁটা দিয়েছে তখনই মাথাটা এলোমেলো, ঠিক মনে নেই, আবছা মনে পড়ে, একটা ভাঙা বিপজ্জনক সাঁকো বুকে হেঁটে পেরিয়ে জঙ্গল ভেদ করে আমবাগানের ভিতর একটা ভাঙাবাড়িতে শ্যামার পথ চেয়ে ছিল সে। পেয়েও ছিল শ্যামাকে। কী সব উলটোপালটা কাণ্ড করেছিল যে! শ্যামার বাবা—মা একটু এগিয়ে গেছে তখন, আর শ্যামা পোড়ো বাড়িটার হাতায় ভাঙা ফোয়ারার পাশে একটা লতানে গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ তুলছিল। সে সময় নয়ন তাকে আক্রমণ করে। উলটোপালটা কী সব বলেছিল যেন, বিয়ে করতে চেয়েছিল শ্যামাকে। তারপর জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সবটাই তাড়ির ঘোরে। নইলে অতটা হয়তো করত না। ঠিক সেই সময়ে একটা লোক তার বাচ্চা ছেলেকে এক হাতে ধরে, অন্য হাতে একটা জীবন্ত গোখরো সাপ নিয়ে তাদের পথে এসে পড়েছিল। ছেলেটা চিৎকার করে ওঠায় তার ওই উন্মত্ত আবেগ কেটে গিয়েছিল।

নয়নের একটা দোষ এই যে কোনো একটা ব্যাপারে তার মন বেশিক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। তার মনটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচবোর্ডের মতো। মুহুর্মুহু লাইন পালটে কানেকশন নেয়। লোকটার হাতে ওই সাপ দেখে সে শ্যামাকে ভুলে লোকটার পিছু নেয়।

এই জায়গার কিছুই নয়ন চেনে না। শ্যামারা শেষ বাসে চলে গেল। শ্যামার বাবা—মা টের পায়নি যে নয়ন এতদূর এসেছিল। সবই ঠিক আছে। কিন্তু এখন বড় একা লাগছে তার। নিঃসঙ্গ অবসাদগ্রস্ত।

কালীর সোনার চোখের দিকে চেয়ে সে খুব গভীরভাবে শ্বাস নিল। দেড়শো বছরের পুরনো একটা গন্ধে ভরে গেল বুক। তাড়ির কিছু নেশা এখনও তার মাথার মধ্যে রয়ে গেছে। টলমল করছে মাথা। ঠিকমতো চিন্তাশক্তি এখনও ফিরে আসছে না। হরবোলা নয়ন দুটো শিস দিল। অবিকল তিতিরের মতো। তারপর পুরনো মন্দিরের গাছ শুঁকে শুঁকে বারান্দায় ঘুরে বেড়াল খানিকটা। অন্ধকার চারদিকে। মোনা ঠাকুরের বাড়ির বাইরের ঘরে লণ্ঠনের আলো দেখা যায়। সে শুনেছে আরতির পর ওই ঘরে একটা ধর্মসভা হয়। গাঁয়ের চাষিরা আসে, সাধারণ মানুষেরা আসে, বুড়ো—বউ—বাচ্চারা ঘিরে বসে। মোনা ঠাকুর তাদের ধর্মের কথা শোনায়। শ্যামারা এখানে কেন এসেছিল তা ঠিক জানে না নয়ন। তবে আন্দাজ করতে পারে, শ্যামার দাদা বছর পাঁচেক আগে পাগল হয়ে নিরুদ্দেশ হয়। বহুকাল ধরেই শ্যামাদের পরিবারের ওই একটা দুঃখ, বহু সাধু—সন্ন্যাসীর কাছে ওরা যায় পাগল ছেলের খোঁজ পাওয়ার জন্য। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শ্যামা নিজেই। রংটাই যা ময়লা শ্যামার, নইলে শ্যামার চটক আছে। ওই কালো রং উপেক্ষা করে পুরুষেরা ওর জন্য পাগল। তাদের কাউকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা শ্যামার নেই। সর্বোপরি রাহুর মতো নয়ন লেগে আছে

পিছনে। শ্যামাকে নিয়েও ওদের ভয় কম নয়। কে যেন কবে টান দিয়ে শ্যামাকে নিয়ে যায়! তার সঙ্গে কবে শ্যামার বিয়ে হবে এটা জানাও ওদের দরকার। সেই কারণেই মোনা ঠাকুরের কাছে আসা।

মোনা ঠাকুরকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববে কি না ঠিক বুঝতে পারে না নয়ন। প্রতিদ্বন্দ্বী তার অনেক, প্রতিদিনই এক—আধজন বেড়ে যায়। মন্দিরের ঘণ্টায় আর একবার টং করে শব্দ করে সে অন্যমনস্কভাবে। মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘর থেকে একটা লোক লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে দূর থেকেই প্রশ্ন করে, কে?

নয়ন উত্তর দেয় না, লোকটা এগিয়ে আসে, জবুথবু বুড়ো একটা লোক। হেমন্তের শীতেই মাথা—মুখ ঢেকে চাদর জড়িয়েছে। কুঁজো হয়ে মাঠটা পেরিয়ে এসে লণ্ঠনটা তুলে ধরে বলে, কে আজ্ঞে?

কেউ না। মন্দির দেখতে এসেছি। আমাকে চিনবেন না।

লোকটা গলায় কফের শব্দ করে বলে, এত রাতে কোথা থেকে এলেন আজ্ঞে?

যেখান থেকেই আসি না, আপনার কী?

লোকটা স্তম্ভিত, এবং ভীত মুখে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ। নয়ন একটা সিগারেট ধরায়, মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়েই লোকটা লণ্ঠন তুলে ধরে আছে। নয়ন লোকটার মুখ দেখে। সর্বভারতীয় মুখ একখানা, পথে—ঘাটে বাজারে হাটে গঞ্জে এরকম একই রকম বৈশিষ্ট্যহীন মুখ যে নয়ন কত দেখেছে। এসব মানুষকে একজনের থেকে আর—একজনকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল।

লোকটা লণ্ঠন নামিয়ে নিয়ে বলে, দেখুন আজ্ঞে। মন্দির দেখতে বাধা কী? মায়ের মূর্তিখানা বুক ভরে, নয়ন ভরে দেখে নিন। তবে কিনা দিনকাল খারাপ।

নয়ন ঝেঁঝেঁ উঠে বলে, কীসের খারাপ?

লোকটা নরম সুরেই বলে, গাঁয়ে অচেনা লোক এলে মানুষের একটু ধন্ধ লাগে। ছেলে—ছোকরারাও সজাগ। গাঁ চৌকি দেয়। আপনি নতুন নাকি আজ্ঞে?

তা দিয়ে আপনার কী?

জিজ্ঞেস করি আর কী! এত রাতে নতুন লোক বলেই বলছি। অচেনা জায়গা।

নয়ন একটু হাসে, তা মায়ের স্থান যখন, ভয় কী?

লোকটা কিছু বলে না। চেয়ে থাকে একটু। তারপর বলে, ঠাকুর তো আসরে বসে গেছেন। যদি যেতে চান তো চলে আসুন।

চকিত লোকটা লাফ দিয়ে নয়ন উঁচু বারান্দা থেকে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে মাঠে নামে। লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, ঠাকুর কে?

মোনা ঠাকুর আজ্ঞে, আর কে হবেন! মনোময় দেবশর্মা তিন পুরুষে এই মন্দিরের পূজারী। ওঁর ঠাকুরদা নরবলি দিতেন। দু' হাতের দশ আঙুলে ওঁদের যা শক্তি তা দিয়ে গ্রহ—নক্ষত্র এধার ওধার করে দেন। নাম শোনেননি?

তাড়ির নেশাটা এখনও ফিকে হয়ে লেগে আছে। নয়ন নইলে একটা উত্তর দিত ঠিক। দিল না। কেবল একটু হাসল। অবশ্য উত্তর দিলেও লাভ ছিল না। এরা যা একবার বোঝে তা সহজে ভোলে না। সে শুধু বলল, মোনা ঠাকুরের কাছে গেলে বশীকরণ করবে না তো?

কী বললেন?

বলি ভেড়া বানিয়ে রাখবে না তো?

লোকটা হাসে, ঠাকুর কত কী করে তার আমরা কী জানি! তবে ভয় পাই না। উনি কাউকে ভয় দেখান না বড় একটা। ক্ষতিও করেন না।

আপনি যান। আমি সময় হলে যাব।

লোকটা বিনীত ভাবে বলে, রাতে ঘণ্টার শব্দ করলে মায়ের বিশ্রাম ভেঙে যায়। মায়ের শয়ন হয়ে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। লোকটা তেমনি কোলকুঁজো হয়ে অন্ধকারে ফিরে যায় লণ্ঠন হাতে।

পকেট থেকে সুকুলের দেওয়া টর্চটা বের করে কুয়াশামাখা অন্ধকারে এধারে ওধারে ফেলে নয়ন। মন্দিরের ওপাশে একটা পুরনো সুড়ঙ্গ আছে। বেশিদূর যাওয়া যায় না। রাস্তা বুজে গেছে। প্রাচীনকালে মানুষেরা সুড়ঙ্গ তৈরি করত। সব প্রাচীন সুড়ঙ্গই বোধ হয় এখন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাচীন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন। নয়ন তা জানে। একটা আলু টপকালে কোথায় যাবে মোনা ঠাকুর!

কিন্তু মোনা ঠাকুরের ওপর তেমন কোনো রাগ নেই তার। বলতে কী একজন মোনা ঠাকুর এখানে আছে বলেই শ্যামারা এইখানে এসেছিল আর এসেছিল বলেই আমবাগানে এক পলকের জন্য শ্যামার দেহের স্বাদ পেয়েছিল সে। অবশ্য মোনা ঠাকুরের সঙ্গে একটা লড়াই শেষ পর্যন্ত তাকে লড়তেই হবে। ধর্মকে উচ্ছেদ করাই হবে শেষ কাজ। মন্দির ভেঙে চৌরস করে যাবে রাজপথ, মসজিদ—গির্জা ভেঙে তৈরি হবে খেত। তাতে সোনার ধানে ঢেউ খেলবে, কিংবা তৈরি হবে শিশুদের জন্য বাগান, যুবক—যুবতীর মিলনক্ষেত্র। কী যে হবে তা নয়ন জানে না। কিছু একটা হবেই। হয়তো সেই সুদিন দেখার জন্য সে বেঁচে থাকবে না।

নয়ন বারান্দাটায় আবার ওঠে। উঁচু হয়ে বসে সিগারেটে শেষ কয়েকটা টান দেয়। তার আজকাল কেন যেন মনে হয়, আর খুব বেশিদিন সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না। তার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

উত্তুরে একটা বাতাস এল হঠাৎ। নয়নের শীত করে ওঠে। সে জবুথুবু হয়ে বসে। চারদিকের নিস্তব্ধ শীতলতা অনুভব করে। আর শ্যামার কথা ভাবে। কালো, সুন্দর এবং দুর্লভ শ্যামার কথা, এই মন্দিরে আজ শ্যামা এইখানে এসেছিল।

থুতু ফেলে নয়ন উঠল। গায়ের পাতলা শার্টটা ভেদ করে বাতাস লাগছে। শ্যামার পিছু পিছু ফিরে যায়নি নয়ন। যায়নি ওই সাপওলা লোকটার জন্য, হয়তো মোনা ঠাকুরের জন্যও। শ্যামাকে ঠিকই পেয়ে যাবে নয়ন, চিন্তা নেই। আপাতত মোনা ঠাকুর আর সাপওলা লোকটার রহস্য ভেদ করে যাওয়াটাই তার কাছে দরকার।

মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘরে কয়েকটা ঝকঝকে লণ্ঠন জ্বলছে। কয়েকজন লোক এধার ওধার বসে আছে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে মোনা ঠাকুর। তেমন কিছু চেহারা নয়। শরীরটা মেদহীন ঝরঝরে, গায়ের রং তামাটে, শুধু চোখ খুব উজ্জ্বল। খালি গায়ে একটা সাদা উড়ুনি মাত্র জড়ানো। হাঁটু দুটো বুকের কাছে তোলা। পাশে বিড়ির বান্ডিল, দেশলাই।

নয়ন খোলা দরজায় দাঁড়াতে মোনা ঠাকুরই তার দিকে প্রথম তাকাল, সেই তাকানোর মধ্যে কোনো বিস্ময় বা কৌতূহল নেই। প্রতিদিনই বহু মানুষ আসে তার কাছে, সুতরাং মোনা ঠাকুর আর বিস্মিত হয় না। কেবল ঘরের অন্য লোকেরা ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। বুড়োটা এসে বোধ হয় তার কথা আগেভাগে বলে রেখেছে।

আসতে পারি? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

মোনা ঠাকুর ঘাড় নাড়ল। উত্তর দিল না।

নয়ন ঘরে ঢুকে চারদিকে একবার তাকায়। তার ভাবভঙ্গি সহজ এবং উদ্ধত। এই লোকগুলোর চেয়ে যে সে সব বিষয়ে উন্নত, এরকম একটা তাচ্ছিল্যের ভাব সে ইচ্ছে করেই ফুটিয়ে তোলে। চারদিকে কয়েকটা ছোট পাটির আসন পাতা। সে একটু পিছনের দিকে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। ঘরে কোনো কথা নেই। সবাই চুপ। যেন তার উপস্থিতিই ঘরের আবহাওয়াকে অস্বাভাবিক করে দিয়েছে। কেউ কথা বলছে না, সবাই অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তার দিকে লক্ষ্য রাখছে। যেন এক্ষুনি কিছু একটা ঘটাবে নয়ন, কিছু অদ্ভুত কথা বলবে। সবাই তাই অপেক্ষা করছে।

মোনা ঠাকুর আস্ত একটা বিড়ি শেষ করে ফেলল। ততক্ষণে কেউ কথা বলল না। নয়ন দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে চেয়ে আছে। আক্রমণ ইচ্ছে করলেই সে করতে পারে, কিন্তু মুড নেই। আপাতত, সে কেবল দেখে

নিচ্ছে। হাটে মানুষজনের কাছে সে শুনেছে মোনা ঠাকুর এ অঞ্চলের প্রধান মানুষ। কয়েকটা গাঁ জুড়ে অখণ্ড রাজত্ব। হাত দেখা, কোষ্ঠী বিচার, সাপের বিষ নামানো, মারণ বশীকরণ সবই মোনা ঠাকুরের হাতের পাঁচ। সম্মোহনবিদ্যায় ওস্তাদ। কলকাতা থেকেও ছুটির দিনে বিস্তর মানুষ আসে তার কাছে।

এরকম কোনো মানুষের কথা শুনলেই নয়ন ভিতরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পাড়ার গুন্ডা কিংবা রাজনৈতিক নেতা কিংবা যে কোনো লাইনেই কেউ প্রধান হয়েছে শুনলে নয়নের ভিতর একটা স্বাভাবিক আক্রমণ করার ইচ্ছে জেগে ওঠে। হাত বাড়িয়ে লোকটাকে তার জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে ধুলোয় পিষে দিতে ইচ্ছে করে। এই পৃথিবীতে তার তুল্য বা তার চেয়ে বড় কেউ আছে, এই চিন্তাটাই সে সহ্য করতে পারে না।

বিড়িটা শেষ করে মোনা ঠাকুর তার দিকে তাকায়। নয়ন একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। চোখাচোখি তাকিয়ে মোনা ঠাকুর নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, বাবুমশাই, জায়গাটা কেমন লাগল?

নয়ন ঘাড়টা পিছনে হেলিয়ে অবহেলায় বলল, খারাপ কী?

এদিকেই কি ক'দিন থাকার ইচ্ছে?

থাকতে পারি। ঠিক নেই।

জায়গাটা ভালোই। তবে কিনা আপনারা শহর—গঞ্জের মানুষ।

আমি শহর—গঞ্জের মানুষ একথা কে বলল?

নন?

নয়ন একটু হেসে বলে, না। আমি সব জায়গার মানুষ। গ্রামেরও।

মোনা ঠাকুর একটু চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলে, আসলে গাঁ আর শহর জুড়েই তো মানুষের জীবন। কোন ঠাঁইয়ে তার বাস তা থেকে বিচার হয় না। তা এখানে উঠেছেন কোথায়?

সাপওলা একটা লোক আছে, তার বাড়িতে রাতটা থাকব।

সাপওলা লোক শুনে আবার সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে।

মোনা ঠাকুরের মুখে কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, সাধারণ গলায় বলে, সাপওলা লোক তো একমাত্র জগদীশ। তা তার সঙ্গে আত্মীয়তা আছে না কি?

থাকলেই কী?

কিছু না। জিজ্ঞেস করলাম। মানুষজনের পরিচয় জেনে রাখাটা আমাদের অভ্যাস। তা হলে আপনি তার আত্মীয় নন?

নয়ন দেয়ালে মাথাটা হেলিয়ে অবহেলায় বলল, না। আমি একটা মেয়ের পিছু নিয়ে এখানে এসে পড়েছিলাম। পথে সাপওলা জগদীশের সঙ্গে আলাপ।

মেয়ের পিছু নেওয়ার কথা শুনে দু'—একজন তার দিকে তাকাল। মোনা ঠাকুরের মুখ তেমনই ভাবলেশহীন। নয়ন গ্রাহ্য করল না।

থাকবেন?

দেখি। আমার কিছু ঠিক নেই।

মোনা ঠাকুর কথার মাঝখানে হঠাৎ অনমনস্ক হয়ে যায়। হাতড়ে বিড়ির বান্ডিল থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরায়। তারপর হঠাৎ একটু হাসে। নয়নের দিকে চেয়ে বলে, সে আমাকে দেখতে পারে না।

কে?

জগদীশ।

নয়ন চুপ করে থাকে।

মোনা ঠাকুর নিজেই বলে, জগদীশ এ গাঁয়ে আসে সার্কাসওয়ালাদের সঙ্গে। তোমার মনে আছে হরিপদ, সিংহের থাবা খেয়ে জগদীশের সেই যে পাঁজর ভেঙেছিল?

লণ্ঠনওলা লোকটা বোধহয় আফিং খায়। উড়নি জড়িয়ে উবু হয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছে। নিজের নাম শুনে মুখটা তুলে গলায় কফের ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ করল মাত্র।

মোনা ঠাকুর নয়নের দিকে চেয়ে বলে, জগদীশ বড় কালীভক্ত ছিল। মায়ের থানে রোজ আসত। আমি একদিন তাকে বলি যে আমি কালীটালি কিছু জানি না। আমি গুরু জানি। আমার পুজো হচ্ছে আসলে গুরুর পুজো। সে তখন উলটে বলল, তা হলে আপনি ভন্ড, কালী মানেন না তো পুজো করেন কেন? আমি উলটে বললাম, তো রামকৃষ্ণদেব পুজো করত কেন? বেদান্ত মানলে তো মূর্তি পুজো চলে না। রামকৃষ্ণ ঠাকুরও আসলে যার পুজো করত সে দক্ষিণা কালী নয় গো, সে হচ্ছে গুরু। ঠাকুর নিজেই বলেছেন, মেয়েরা ততদিনই পুতুল খেলে যতদিন তাদের বে না হয়। সেই থেকে জগদীশের সঙ্গে আমার বখেরা। তা বাবুমশাই, বলেন তো কোনটা ঠিক। এই মূর্তিপুজো না গুরুপুজো?

নয়ন ঠিকমতো শুনছিল না। শুধু বলল, কে জানে। মানুষের কত বাতিক থাকে!

আপনি গুরু মানেন না?

না!

মোনা ঠাকুর একটু, খুব সামান্য মাত্র, একপরদা উত্তেজিত গলায় বলে, আপনি কখনও কারও কাছ থেকে কিছু শেখেননি? এমনকি অ—আ—ক—খও নয়?

নয়ন বিরক্ত হয়ে বলে, শিখব না কেন?

তবে?

তবে কী? কারও কাছ থেকে কিছু শিখলেই সে গুরু হয়ে যায় না কি?

না মানলে হয় না, মানলে হয়।

তা হলে তো আমার গুরু অনেক। যার কাছে যা শিখেছি, সবাই গুরু!

তাই তো। আপনার চেয়ে যার জ্ঞান—গুণের ওজন বেশি সে—ই গুরু। ওজনওলা লোক চাই। যার যেমন ওজন সে তেমন গুরু। আপনার গুরুদের মধ্যে কার ওজন সবচেয়ে বেশি বাবুমশাই?

নয়ন একটু হাসে! তারপর বলে, কার্লমার্কাস।

মোনা ঠাকুর একটুও চমকায় না। বলে, সে তো সে—ই আপনার সবচেয়ে বড় গুরু।

আপনি মূর্তি মানেন না? তবে যে হাটে শুনলাম আপনার কালীমূর্তি নড়ে—চড়ে, কথা কয়?

মোনা ঠাকুর নিভন্ত বিড়িটায় আর একবার আগুন দেয়। নয়নের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, বাবুমশাই, মেয়েটা কে?

নয়ন উদাস গলায় বলে, ওই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব।

শুনে লোকজন নড়ে চড়ে বসে। লণ্ঠনওলা লোকটারও ঝিমুনি চোট খায়।

মোনা ঠাকুর ঠান্ডা গলাতে বলে, ও, তারপর একটু চুপ থাকে, তারপর ধীরে বলে, একটা মেয়ে তার বাপ—মা'র সঙ্গে এসেছিল বটে আজ বিকেলে। শ্যামলা রং, মুখে চোখে শ্রী আছে। সে—ই কী?

সে—ই। ওরা আপনাকে কী বলেছে?

মোনা ঠাকুর একটু অন্যমনস্ক চোখে শূন্যে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, ওই মেয়েটার বড় ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। সে বছর পাঁচেক ধরে নিরুদ্দেশ। মোনা ঠাকুর আবার বিড়ি ধরায়, তারপর বলে, এমনিতে তো সংসারটা সুখেরই হওয়ার কথা ছিল। বুড়ো—বুড়ি, একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে, ঝুট—ঝামেলা কিছু নেই। তবু একটা গাঁট পড়ে গেল। ভারী দুঃখ ওদের।

নয়ন অধৈর্যের গলায় বলে, শুধু ওদের ছেলের কথা জিজ্ঞেস করল? আর কিছু না?

মোনা ঠাকুরের মুখে একটা কুটিল হাসি ফুটে ওঠে, বলে, আর তো মনে পড়ছে না। হাসিটা ঠোঁটে রেখেই মোনা ঠাকুর তার দিকে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ, তারপর বলে, তা পাত্রী তো ভালোই বাবুমশাই। লেগে যান।

বিদ্রূপটা ধরতে কষ্ট হয় না তার। ভিতরটায় দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু তবু বাইরে সে শান্তই থাকে। স্থির ও কঠিন চোখে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে সে বলে, আমাদের বিয়ে কোনো শালা আটকাতে পারবে না।

মোনা ঠাকুর একটু নরম, যেন বা সান্ত্বনার সুরে বলে, আটকানোর কি। করবেন বিয়ে। গরিব—গুরবো, কুঠে—ভিখিরিও বিয়ে করে। ও আর এমন কী? করলেই হয়।

তার মানে?

বললাম বিয়ে তো আখছারই হয়। অঘোন পড়ল তো শানাই ধরল পোঁ। কান ঝালাপালা, বিয়ের মাসে এই মায়ের থানেই কত নতুন বর—বউ আসে। বিয়ে সবাই করতে পারে। কলকাতার ফুটপাতে ভিখিরিদের বিয়ে দেখেননি?

নয়নের ভ্রূ কুঁচকে আসে, ভ্রূর তলা দিয়ে সে মোনা ঠাকুরকে নিরীক্ষণ করে বলে, বিয়ে যে হয় তা আমিও জানি। কিন্তু বিশেষ একজনের সঙ্গে বিশেষ আর একজনের বিয়ে হয় কি না সেটাই সমস্যা।

আপনার বাধা কী?

আমরা তেলি, ওরা বামুন। ওর বাবা—মা এ বিয়ে চাইছে না।

মোনা ঠাকুর সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে বলে, আর মেয়েটা?

সে ও চাইছে না। কিন্তু জাতের জন্য নয়, বাবা—মার জন্য। কিংবা অন্য কারণ থাকতে পারে।

তা হলে?

তা হলেও কিছু যায়—আসে না। আমি ওকে জোর করে কেড়ে আনব। কোনো শালা কিছু করতে পারবে না।

কে কী করবে বাবুমশাই?

নয়ন স্থির দৃষ্টিতে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে বলল, ওরা ওদের ছেলের কথা ছাড়া আর কিছু বলেনি?

কী বলবে?

আমার কথা? বলেনি যে নয়ন নামে একটা লক্কড় ছেলে শ্যামার পিছনে ছায়ার মতো ঘোরে? বলেনি সেই ছেলেটার জ্বালায় ওদের মেয়ে রাস্তায় হাঁটতে পারে না?

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে, না।

নয়ন একটু হাসে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনি বাণ মারতে পারেন?

মোনা ঠাকুর নয়নের চোখে চোখে চায়। তারপর মাথা নেড়ে বলে, ওসব আমি জানি না।

নয়ন অবাক গলায় বলে, জানেন না? কিন্তু লোকে বলে, আপনার বিজনেস—ই হচ্ছে বাণ মারা। সেই যে মাটিতে ছবি এঁকে ছোরা বসিয়ে দিলে যার ছবি আঁকা হয়েছে সে মুখে রক্ত তুলে, পা ছুঁড়ে দাপিয়ে মরে যায়? ওরা আপনাকে বলেনি নয়ন রায়কে বাণ মারতে হবে?

মোনা ঠাকুর দুঃখিত করে বলে, না বাবুমশাই।

নয়ন একটা কৃত্রিম স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে, যাক, বাঁচা গেল।

মোনা ঠাকুর তার দিকে মিট মিট করে চেয়ে থেকে বলে, বাণ মারার চিন্তা করে খুব কি ভয় পেয়েছিলেন বাবুমশাই?

নয়ন কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলে, ভীষণ।

আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না।

কী মনে হয় না?

যে আপনার ভয়—ডর আছে।

নয়ন একটু হাসে। তার পর শান্ত বিদ্রূপের গলায় বলে, আপনি তো ছবিতে বাণ মারেন! কিছু লোক আছে যারা সত্যিকারের মানুষটাকেই বাণ মারে, সামনা—সামনি। আপনার বাণের চেয়ে এই বাণ আরও

বিপজ্জনক। দেখবেন? বলে নয়ন তার শার্টটা কোমরের কাছ থেকে টেনে তোলে, তার পর হাত দিয়ে পেট আর তলপেটের মাঝামাঝি দু'আড়াই ইঞ্চি একটা গভীর ক্ষত দেখায়। কয়েকজন লণ্ঠন তুলে ঝুঁকে পড়ে। দেখে। মোনা ঠাকুর উদাস মুখে বসে থাকে।

বছর চল্লিশ বয়সের ধূর্ত চেহারার একটি লোক ঝুঁকে দাগটা দেখে মুখে চুকচুক শব্দ করে বলে, কী হয়েছিল?

স্ট্যাব। ঠান্ডা গলায় বলে নয়ন।

জোর বেঁচে গেছেন, ছোরাটা ঠিকমতো টানতে পারেনি। পারলে বাঁচতেন না।

মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে নয়ন বলে, যারা আমাকে হিন্দু হস্টেলের পাশের গলিতে এক রাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তারা আপনার চেয়ে অনেক ভালো বাণ মারতে পারে। তাদের বাণে ভুলচুক হয় না। কলকাতায় এবং অন্য জায়গায় এরকম বিস্তর লোক নয়ন রায়কে বাণ মারার সুযোগ খুঁজছে। ভয় পেলে আমার চলে না মোনা ঠাকুর।

মোনা ঠাকুর উত্তর দেয় না। চিন্তিত মুখে অন্যমনস্ক হাতে হাতড়ে বিড়ির বান্ডিলটা খোঁজে। নয়ন তার দিকে চায়। লণ্ঠনওলা বুড়োর ঝিমুনি পুরোপুরি কেটে গেছে, হাঁ করে চেয়ে আছে নয়নের দিকে, গলায় অবিরল কফের শব্দ হচ্ছে ঘড়ঘড়। একজন প্রৌঢ় মানুষ নস্যি রঙের খদ্দরের চাদর গায়ে সামনে বসে আছে, কালো হাতে সাদা একটা ঘড়ি, চোখে চশমা, বোধহয় গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার, নাড়ুগোপালের মতো থলথলে মুখ। লোকটা মোনা ঠাকুরের দিক থেকে ইতিমধ্যেই অর্ধেক ঘুরে বসেছে নয়নের দিকে। মুখে একটা বিস্মিত বোকা হাসি। চল্লিশ বছরের ধূর্ত চেহারার লোকটা নিশ্চিত পঞ্চায়েতের লোক, রোগা রোগা হাত—পা, মাথার চুলে প্রচুর তেল, গায়ে বিয়ের শালটা আধময়লা ধুতির ওপর বেমানান! লোকটা অনেকখানি ঘেঁষে নয়নের কাছাকাছি এসে গেছে। তার চোখে—মুখে চঞ্চল কৌতূহল। মোনা ঠাকুরের বাঁ ধারে আরও দুজন লোক বসে আছে। তারা চাষিবাসি শ্রেণীর, ভাবলেশহীন এবড়ো—খেবড়ো মুখ। চোখে নির্বুদ্ধিতার নিষ্প্রভতা। তারা নয়ন আর মোনা ঠাকুরের চাপান—ওতরটা ঠিকমতো বুঝতে পারছিল না এতক্ষণ। ছুরি—ছোরার কথায় একটু চাঙ্গা হয়ে চেয়ে দেখছে নয়নকে। খুন—খারাপি যে তারা কিছু না দেখেছে এমন নয়, তবে নয়নের চোটপাটের কথাবার্তা যে তারা পছন্দ করছে তা তাদের মুখে সম্ভ্রমের ভাব দেখেই বোঝা যায়। মোনা ঠাকুরের ডান ধারে পুঁটুলির মতো তিন—চার জন মেয়েছেলে। তাদের রি—অ্যাকশন নয়ন এই অল্প আলোতে ঠিক বুঝতে পারল না। তবে এটা ঠিক, মোনা ঠাকুরের দিক থেকে সকলের মনোযোগ নিজের দিকে এনে ফেলেছে। সেটা পেরেছে বলে একটু তৃপ্তি বোধ করে নয়ন। এখন ইচ্ছে করলেই সে মোনা ঠাকুরের আসনটিকে একটি ধাক্কা দিতে পারে, কিন্তু তা দেবে না নয়ন। সময়ের অপেক্ষা করা ভালো। তাছাড়া, মোনা ঠাকুরের ওপর নয়নের যথেষ্ট রাগ হচ্ছে না।

অনেকক্ষণ বাদে মোনা ঠাকুর একটা শ্বাস ফেলে। নয়নের দিকে চায়। তারপর জিজ্ঞেস করে, আপনার কি অনেক শত্রু?

নয়ন আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে, অনেক।

কেন বাবুমশাই?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন হঠাৎ বলে, আপনি আমাকে বাবুমশাই বাবুমশাই বলছেন কেন?

শহরের মানুষ আপনারা, সয়—সম্মান করা ভালো।

শহরের মানুষ কি আলাদা কিছু? আমি শহর গ্রাম আলাদা করে বুঝি না। এই যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যেমন, আমিও তেমনি।

তাই কি হয়! জায়গা বুঝে আমরা মানুষ চিনি।

শহরের মানুষকে আপনারা বেশি সম্মান করেন কেন?

তারা যে তা—ই চায়। গাঁয়ের লোকেরা তাদের সমকক্ষ তো নয়।

ওটা ছেঁদো কথা। আসলে আপনারা নিজেদের খাটো ভাবেন।

তা হোক বাবুমশাই, তা হোক। লোককে শ্রদ্ধা—সম্মান করার শিক্ষা ভালোই। ওতে ক্ষতি হয় না।

নয়ন ধরতে পারে কথাটার দ্বিতীয় অর্থ আছে, যা তাকেই বলা। নয়ন গায়ে মাখল না। কেবল বলল, আমার.....আমার শত্রুর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

আজ্ঞে।

ওই যে যেমন আমি ওই মেয়েটাকেই চাই বলে ওর মা—বাপ আমার শত্রু, তেমনি আমি আরও অনেক কিছু চাই বলে আরও অনেকে আমার শত্রু।

মোনা ঠাকুর চুপ করে বিড়িতে টান দেয়। বিড়ি খাওয়ার একটা নিজস্ব ধরন আছে তার। যেন ধোঁয়া তার বুক পর্যন্ত পৌঁছয় না, গলা থেকেই ফিরে আসে। দু'—একবার ছোট্ট টান দিয়ে বলে, মেয়েমানুষের ক্ষমতা অনেক। মা হয়ে, বউ হয়ে, মেয়ে হয়ে কত খেলা যে দেখায়। পুরুষের জান লবেজান। তা মেয়েমানুষ বাদে আপনি আর কী চান?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে, মেয়েমানুষ চাই বটে, তবে ওই মেয়েটিকেও চাই। ওকে না পেলে আমার খিদে মিটবে না।

কথাটার নির্লজ্জতা সবাইকে স্পর্শ করে। এই নির্লজ্জতারও একটা স্বীকারোক্তির মতো আকুলতা আছে। এর সাহস সবাইকে আকর্ষণও করে। ল্যাংটো কথার জোর বেশি।

নয়ন বলে, আর যা চাই তা হচ্ছে ক্ষমতা মোনা ঠাকুর। এই জায়গায় আপনার যেমন ক্ষমতা, দেশ জুড়ে তেমনি ক্ষমতা চাই। ক্ষমতা পেলে কী করব তার কি কোনো ঠিক আছে? তবে হয়তো আপনাকে এবং আপনার মতো লোকদের উচ্ছেদ করব। মন্দির—মসজিদ—গির্জা ভেঙে তৈরি করব রাস্তা, খেত, শিশুদের জন্য বাগান। বড়লোকদের ধরে চাবকাব তারা বড়লোক বলে, গরিবদের ধরে চাবকাব তারা গরিব বলে। অলস আর চোরদের তাড়িয়ে দেব। কত কী প্ল্যান আছে আমার! দেখবেন।

মোনা ঠাকুর একটু হেসে বলে, মেয়েমানুষদের ধরে চাবকাবেন তারা মেয়েমানুষ বলে আর পুরুষদের তারা পুরুষ বলে।

তা কেন? আমি কি পাগল? মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটো দু'রকম প্রাকৃতিক সৃষ্টি। সেটা তাদের দোষ নয়।

তো গরিব বা বড়লোক হওয়াটা কি দোষের?

নিশ্চয়ই। যে বড়লোক সে পাঁচজনেরটা একা ভোগ করে বলে দোষী, যে গরিব সে নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে পারে না বলে দোষী।

এটা যুক্তি নয়, নয়ন জানে! কিন্তু কুযুক্তির মধ্যেও জোর প্রকাশ করাটা তার স্বভাব। তাতে কাজ হয়।

সবাই চুপচাপ তার দিকে চেয়ে আছে। আত্মতৃপ্তিতে তার ভিতরটা টল টল করে। নয়ন বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরায়। হেডমাস্টার আর গ্রাম—পঞ্চায়েতের লোক দুজন কথা বলছে গুন গুন করে। লণ্ঠনওলা বুড়ো স্খলিত চাদরটা দিয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছে। বাইরে অবিরল ঝিঁঝির ডাক। দূরে একঝাঁক শেয়াল চিৎকার করে। কুকুর কাঁদে। জ্যোৎস্না ফুটেছে নাকি! কুয়াশায় মাখা জ্যোৎস্নার দৃশ্য নয়নের বড় প্রিয়! মলিন পৃথিবীর গায়ে কে যেন ছবি এঁকে দেয়! অলৌকিক ছবি।

উঠে পড়তে যাচ্ছিল নয়ন। ঠিক সেই সময়ে সে মেয়েটিকে দেখল। ভিতরের দরজায় কপাটের আড়ালে ছায়ায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলেও দেখেছিল, শ্যামার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে মন্দিরের মাঠে। মোনা ঠাকুরের মেয়ে। মুখ চোখ খারাপ নয়। শরীরটাও ভালোই। ভোগের চাল—কলা খেয়ে দিব্যি আছে। এমনিতে মেয়েটির প্রতি নয়নের কোনো আকর্ষণ বোধ করার কথা নয়। কিন্তু শ্যামা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে, তার নাগালের বাইরে, এই চিন্তাটা তার ভিতরে একটা আক্রোশ জাগিয়ে তোলে। শোধ নিতে ইচ্ছে হয়। ভীষণ খিদে জেগে ওঠে। এই মেয়েটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে এক ধরনের তৃপ্তিকর অবসাদ আসত তার।

ভিতরটা তার কখনও জুড়ায় না। কখনও না। কেবল যখনই সে কোনো মেয়েকে আক্রমণ করে, উন্মোচন করে ফেলে তার সবকিছু, নিংড়ে নেয় দেহ, কেবল তখনই একটা অবসাদের প্রলেপ পড়ে ভিতরটায়। নইলে সে জ্বলছে, জ্বলছে।

কপাটের ছায়া থেকে মেয়েটির চোখ তারই চোখে পড়ে আছে। সে তা স্পষ্ট অনুভব করে। নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে থাকে! হেডমাস্টার একবার গলা খাঁকারি দেয়, পঞ্চায়েতের লোক নড়ে চড়ে নয়নের আরও কাছে আসে, নয়ন সে সব খেয়ালই করে না। তাকিয়ে থাকে।

মোনা ঠাকুর হয়তো নয়নকে তাকিয়ে থাকতে লক্ষ্য করেই অনুচ্চস্বরে বলে, কপাটের আড়ালে কে রে? তারা?

মেয়েটি আলোর মধ্যে আসে। হাতে চাবি। বলে, বাবা মন্দিরের কপাটে তালা দেব?

দে। উদাস গলায় বলে মোনা ঠাকুর।

পরনে পুজোর খাটো কাপড়, খোলা এলোচুল, মাজা পরিষ্কার শরীর, সতেজ দাঁত। সাজগোজ নেই বলে মেয়েটার সুস্বাদ শরীর তাকে আরও আকর্ষণ করে। তক্ষুনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে নয়ন, হাত—পা নিশপিশ করতে থাকে। তার দাঁতে দাঁত চাপে সে। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে মেয়েটা এক ঝলক চোখ তাকে দিয়ে যায়। আত্মবিস্মৃতের মতো মেয়েটার পিছু নেওয়ার জন্য নয়ন উঠে দাঁড়ায়। সে ইঙ্গিত বোঝে, সে নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছে।

দাদা কি চললেন? বলতে বলতে পঞ্চায়েতের লোকটা তার সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, বলে, আমিও জগদীশের বাড়ির দিকেই থাকি, কুমোরপাড়া, চলুন এগিয়ে দিই।

আমার সঙ্গী দরকার হয় না।

দু'—চারটে কথাও বলব'খন, চলুন না।

'শুয়োরের বাচ্চা'। মনে মনে গালি দিল নয়ন। তার ভিতরটা ঝিমিয়ে এল।

বাইরে জ্যোৎস্না ফুটেছে ঠিকই। কুয়াশার পাতলা আবরণ চারদিকে। একমাত্র এই হেমন্তেই এরকম অপার্থিব ব্যাপারটা দেখা যায়। দরজা থেকে দৃশ্যটা দেখে নিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে মোনা ঠাকুরকে বলে, চলি।

মোনা ঠাকুর ঘাড় নাড়ে, তারপর বলে, বাবুমশাই, আজ সারা বিকেল এ অঞ্চলে খুব কোকিল ডেকেছে, তিতির পাখি ডেকেছে, আরও কত কী পাখি? পাখির ভাষা যারা বোঝে তারা জানে ওসব আসল পাখি নয়। নকল।

নয়ন একটু হাসে। তারপর বলে, আপনি পাখির ভাষা জানেন।

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানে না। মুখে বলে, কিন্তু কেউ কেউ জানে।

লোকজন একটু অবাক হয়ে দুজনকে দেখছিল, সেই হেডমাস্টার লোকটা বলে উঠল, বাস্তবিক ঠাকুরমশাই, আজ কোকিলের ডাক খুব শুনেছি বটে। এ সময়ে এত ডাকে না তো!

নয়ন বা মোনা ঠাকুর কেউ কোনো উত্তর দিল না লোকটার কথায়। কেবল নয়ন বলল, মোনা ঠাকুর, মনে হচ্ছে আপনি পাখির ভাষা জানেন। নইলে ওটা যে নকল ডাক আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারেনি।

মোনা ঠাকুর চুপ করে থাকে।

নয়ন হঠাৎ বলল, কিন্তু মোনা ঠাকুর, মানুষের মানব—কথা যখন পাখির ডাক হয়ে যায় তখন সে ভাষা বুঝবার ক্ষমতা আপনার নেই। ওই নকল ডাকেও কিছু কথা বলা ছিল।

মাঠের রাস্তাটা মন্দির ঘুরে নাবালে নেমে গেছে। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। অক্ষম আক্রোশে দৃশ্যটা দেখলে নয়ন। এমন নির্জনে একাকী ব্যাধ ও হরিণ। পঞ্চায়েতের লোকটা ভালুকের মতো তার গায়ে গা ঘষড়াচ্ছে। কিছু বলছে। নয়ন শুনছে না। মেয়েটার পা সিঁড়িতে ধীর হয়ে এল। শেষ দুটো সিঁড়িতে দুটো পা রেখে মেয়েটা জ্যোৎস্নায় চেয়ে আছে তার দিকে। তারই দিকে। এ—সব সময়ে

কোনো ভাষা ব্যবহারের দরকার হয় না, শরীরই তো কথা, শরীর—গন্ধে শরীর চলে আসে কাছে। বৃথা তখন ভাষার ব্যবহার। নয়ন জ্বলে। হাত মুঠো পাকায়।

পঞ্চায়েতের লোকটা বলে, বুঝলেন?

মাঠ ঘুরে তারা নাবালে নেমেছে। মেঠো পথে একটা মাটির ঢেলায় হোঁচট খেয়ে সামলে নয়ন জিজ্ঞেস করে, কী?

লোকটা সিদ্ধ পুরুষ।

কে?

মোনা ঠাকুর।

ও।

তবে ওঁর ঠাকুরদার আরও ক্ষমতা ছিল। শুনেছি তাঁর চোখের দিকে তাকানো যেত না।

ও।

জগদীশের সঙ্গে আপনার আগে চেনাশুনা ছিল না?

না।

লোকটা বড্ড গোঁয়ার।

নয়ন চুপ করে থাকে। হুঁ হা কিছুই করে না। তবু লোকটা বলে, কী হয়েছিল জানেন? জগদীশ এসেছিল এক সার্কাসওলার সঙ্গে। খেলা—টেলা দেখাত না বড় একটা, বাঘ—সিংহীকে খাবার দিত। একদিন খাবার দিতে গিয়ে সিংহ খেপে থাবা মারে। পাঁজর ভেঙে হাসপাতালে পড়ে রইল আট ন'মাস। সেই সময়ে তার খুব দেখাশোনা করেছিল হারাধন বারিক। জগদীশকে সেই—ই তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বেশ কয়েক বিঘে জমি, নগদ টাকা এসব পেয়ে বিয়ে করে এই গাঁয়েই জমে গেল জগদীশ। বিয়ের সাত মাস বাদে তার ছেলে হল, বুঝলেন? বলে লোকটা খিক খিক করে একটু হাসে।

অন্যমনস্ক নয়ন বলে, বুঝেছি।

কী বুঝলেন?

বিয়ের পর জগদীশের ছেলে হল তো! সকলেরই হয়।

দূর মশাই! ছেলে ঠিক সময়ে হলে তো দশ মাস লাগার কথা। এ তো হল সাত মাসে। কিছু বুঝলেন না! আরও দেখুন, জগদীশের চালচুলো নেই, ভিনদেশি, কেউ চেনেও না তাকে, তবু হারাধনদা তার সঙ্গেই বিয়ে দিল কেন! দু'হাজার নগদ, দশবিঘে জমিও তো সোজা কথা নয়। গাঁয়েও সুপাত্রের অভাব ছিল না। সব যোগাযোগ করে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝে যাবেন।

জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না! অপার্থিব ছবি মলিন পৃথিবীর গায়ে। এই সময়ে কোনো আবর্জনা চোখে পড়ে না নয়নের। সে মুগ্ধ এবং সম্মোহিতের মতো হাঁটতে হাঁটতে বলে, ও।

হারাধনদার মেয়েটা ছেলের জন্ম দিয়ে মরে গেল। বেঁচেই গেল বলা যায়। সত্যিকারের বেঁচে থাকলে পাড়াগাঁ—দেশে বিস্তর কথা শুনতে হত তাকে।

হুঁ।

লোকটা খিক খিক করে একটু হেসে বলে, কিন্তু জগদীশের বিশ্বাস ওই ছেলে তারই। বুকের পাঁজর করে রেখেছে। ছেলের কোষ্ঠী করতে এসেছিল মোনা ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরমশাই কোষ্ঠী করলেন বটে, কিন্তু ছেলের বাপের নাম কোষ্ঠীতে লিখলেন না। জগদীশের সঙ্গে ঠাকুরমশাইয়ের ঝগড়া তখন থেকেই। জগদীশ বলে, আমিই ওর বাপ। মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে, এর ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম। বুঝলেন মশাই, আমাদের মুখ থেকে এসব কথা বেরোলে তা আন—কথা কান—কথা, লোকে দোষ ধরে, বলে কুচ্ছো গাইছি। কিন্তু ঠাকুরমশাইয়ের কথা তো আর ফেলবার নয়! ও তো বাকসিদ্ধের কথা। মোনা ঠাকুরের মুখ থেকে কথাটা বেরোতেই লোকের স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল। গাঁয়ে রটে গেল সব ব্যাপার—স্যাপার, যারা বিশ্বাস করত না

তারাও বিশ্বাস করতে লাগল। জগদীশ সেই থেকে নিজে নিজে একঘরে। পাছে ছেলের কানে কথাটা যায় সেই ভয়ে সে কারও সঙ্গে মেশে না, কারও বাড়ি যায় না, শ্বশুরবাড়ির ছায়াও মাড়ায় না। চাষ—বাস করে, বনে—বাদাড়ে সাপ ধরে বেড়ায়। বলে, আমিই গাঁয়ের লোকদের একঘরে করে দিয়েছি। বুঝুন আস্পদ্দা।

গাছের ছায়ায় জ্যোৎস্নার আঁকিবুকি। কোনো গেরস্তর উঠোন তারা পেরিয়ে যাচ্ছিল। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। এ দেশের কুকুরগুলো পর্যন্ত কাজের নয়, ভাবল নয়ন। মানুষগুলোর মতোই অপদার্থ। উলটাবাগে দুটো লোক হেঁটে আসছে, একজন বলে, কে, দিগিন নাকি?

হয়।

কাল তো সাক্ষী দিতে সদরে যাচ্ছ!

যাব।

আমার ফর্মটা এনো। সঙ্গে কে?

আনব। ইনি জগদীশের বাড়ি এসেছেন।

লোকটা দাঁড়িয়ে যায়, কোন জগদীশ? সাপওলা?

হুঁ।

তার আবার কে এল? তিন কুলে তো তার....

লোকটার কথার উত্তর না দিয়ে তারা হেঁটে যায়। একটা ভেজা উদ্ভিদের গন্ধ উঠে আসছে আশপাশ থেকে। হাওয়া ঝলক দেয় মাঝে মাঝে। এদিকটায় বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। খেজুর গাছের গলায় কলসি। পায়ের পাতা ঘাসে পড়লে টপ টপ জল ঝরছে ঘাসের গা বেয়ে। শুকনো পাতা খসছে গাছের। শীতে নাকে জল সরছে। নয়ন দুটো হাত বুকে চেপে ধরে।

আপনার কথাগুলি কিন্তু বেশ পষ্ট—পষ্ট।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে, মশাই কি পলিটিক্স—টলিটিক্স করেন না কি?

কেন?

জিজ্ঞেস করছি। কার্ল মার্কসের কথা বললেন কিনা!

ও এমনিই।

লাল—ঝান্ডার লোক এদিকেও আছে অনেক। তবে গাঁ—দেশের মানুষ তো সব, ঠিক ঠিক কিছু বোঝে না। আবছা—আবছা ধরে নেয়, ঠিক বিশ্বাসও করে না।

কেন?

সবাই তো গাঁয়ের লোকের ভালোই করতে চায় মশাই, কিন্তু একদলের ভালোর সঙ্গে আর একদলের ভালো যে বনে না। চাষি—বাসি গেঁয়ো লোকের মাথাও তো তেমন শার্প নয়, সব দলের ভালো ভালো কথা তো সেইসব ভোঁতা মাথায় সেঁদোচ্ছে! শেষে মাথার ভিতরে সব ভালো কথা খটাখটি লাগিয়ে তালগোল পাকায়। তখন আবার কথাগুলো ঝেড়ে ফেলতে তারা মায়ের থানে একটা ঢিপ করে নিয়ে যে যার কাজে লেগে যায়।

বলে লোকটা খিক খিক করে হাসে।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা গতি ধীর করে বলে, আমি বাঁ ধারে যাব।

আচ্ছা।

লোকটা গাছের ছায়ায় একটা শুঁড়ি—পথে ঢুকে যায়।

সুকুল জেগেই ছিল। আবজানো দরজা ঠেলে সে ঘরে ঢুকতে—না—ঢুকতেই সুকুল মশারি তুলে বাইরে আসে। উত্তেজিত গলায় বলে, তুমি শেয়াল ডাক ডাকছিলে?

না তো!

তবে যে শেয়ালের ডাক শুনলাম এইমাত্র!

সে সত্যিকারের শেয়াল সুকুল।

সুকুল বলে, একবার ডাকো না।

চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে, এখন শুয়ে পড়ো। কাল সকালে তোমাকে অনেক ডাক শেখাব।

ভিতরের বারান্দায় রান্না করছিল জগদীশ। সাড়া পেয়ে ভিতরে এল। দুর্দান্ত স্বাস্থ্য আর চাষাড়ে চেহারার জগদীশ। কিন্তু তার মুখে নির্বুদ্ধিতা নেই। একটু হয়তো ভালোমানুষি আছে কিন্তু উজ্জ্বল চোখজোড়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় যে চোখ দু'খানা অনেক কিছু লক্ষ করে।

জগদীশ সতর্ক চোখে তাকে লক্ষ করে হঠাৎ চাপা গলায় বলল, অনেক দেরি হল আপনার।

নয়ন জামাটা খুলে কাঠের চেয়ারের পিঠে রেখে বলে, মোনা ঠাকুরের একটা ইন্টারভিউ নিলাম।

কী মনে হয়?

কিছু না ফাঁকা আওয়াজ। একটা আলু টপকালেই.....

জগদীশ মাথা নাড়ল, বলল, মোনা ঠাকুর শক্তিমান লোক।

কীসের শক্তি?

জগদীশ একটুক্ষণ ভেবে বলে, কারও প্রতি খুব ভালোবাসা থাকলে মানুষ একরকমের শক্তি পায়! এই যেমন সুকুলকে ভালোবাসি বলে আমি অনেক কিছু উপেক্ষা করতে পারি, অনেক সইতে পারি। ঠিক সেই রকম। মোনা ঠাকুরের ভালোবাসা তার গুরুর ওপর। ওইখানে মোনা ঠাকুরের ফাঁকি বড় একটা নেই। শক্তিও সেখানে। আপনি বিশ্বাস করেন না?

নয়ন অন্যমনস্ক ছিল, তার চোখের সামনে শ্যামার মুখ। সে বলল, করি।

যদিও মোনা ঠাকুরের সঙ্গে আমার সদভাব নেই।

কেন?

জগদীশ একটু ম্লান হাসে, তারপর বলে, কিছু শোনেননি? গাঁয়ের সবাই তো জানে, আর বলাবলিও করে।

নয়নের খুব খারাপ লাগল হঠাৎ। সুকুল মশারির বাইরে বসে চৌকি থেকে পা দোলাচ্ছে। মুখখানায় শৈশবের সুন্দর হাবলা ভাব। একটু হাঁ মুখ, চোখে অপার কৌতূহল। মাথার চুল অনেককাল কাটা হয়নি বলে চুলের চালচিত্তির মুখখানাকে ঘিরে ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। অবাক চোখে নয়নকে দেখছে সুকুল। ভাবছে, এ লোকটা কী করে অমন পাখির ডাক ডাকে! ইস, ঠিক তো পাখির মতোই!

রাতকানা একটা গুবরে পোকা ভোঁ চক্কর দিচ্ছে। দেয়ালে—দেয়ালে ঠোক্কর খাচ্ছে। সুকুল মুখ তুলে পোকাটা দেখে বলে, বাবা দ্যাখো এরোপ্লেনপোকা।

নয়ন সুকুলের সুন্দর মুখখানা থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

জগদীশ বলল, যে যা—ই বলুক, সুকুল আমারই।

সুকুল তার বাবার দিকে চাইল। বড় বড় দু'খানা চোখে একটা স্বাভাবিক কাজলটানা ভাব আছে। বিষণ্ণ চোখ। জগদীশের দিকে ওর তাকানোর ভঙ্গি এমন আকুল যে নয়নের আবার একটা শ্বাসকষ্টের মতো হয়। সে মুখটা ফিরিয়ে জগদীশকে বলে, ওসব আমি পাত্তা দিই না।

গুবরে পোকাটা চক্কর তো দিচ্ছেই। দেয়ালে—দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে নেমে আসছে। সুকুলের মাথা ছুঁয়ে গেল বুঝি! জগদীশ তড়িৎ পায়ে গিয়ে একটা ঝাপটা মারল। কোন কোণে কোথায় ছিটকে পড়ল পোকাটা।

নয়ন বলল, ও পোকা কামড়ায় না।

জানি। তবু সতর্ক থাকা ভালো।

সতর্কতার কথা শুনে নয়ন একটু হাসে। বলল, আপনি যদি অত সাবধানী তো ছেলেকে নিয়ে সাপ ধরতে যান কেন?

জগদীশ গিয়ে সুকুলের পাশে বসে। বসতেই ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সুকুল। শুয়ে নয়নের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। জগদীশ বলে, ভয়ঙ্করদের নির্বিষ করার শিক্ষা থাকা ভালো। একদিন তো সুকুলকে নিজে—নিজেই চলতে হবে! ওকে তাই তৈরি করে দিচ্ছি।

সুকুল হাই তোলে। জগদীশ আলতো হাতে ওকে চাপড়ায়। মায়ের মতো।

নয়নের দিকে চেয়ে বলে, বারান্দায় বালতিতে জল তোলা আছে, হাত—মুখ ধুয়ে নিন।

নয়ন বাধ্য ছেলের মতো ওঠে।

দরজার পাশেই দড়ির দোলনায় দুটো বেঁটে সাপের ঝাঁপি ঝুলছে। তার পাশে একটা স্ট্যান্ডের ওপর কাচের বাক্স। নয়ন দাঁড়ায়। কাচের বাক্সটার মধ্যে দুটো কেউটে। মাথায় রুইতনের চিহ্ন। শরীর পাক খেয়ে আছে। নিঃসাড়, ঘুমন্ত যেন। ঝুড়ি দুটোর গায়ে একবার হাত রাখল নয়ন। নিস্তব্ধ। একটু হাসল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, জগদীশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কোলে আধ—ঘুমন্ত সুকুলের মুখের দিকে চেয়ে আছে। মৃদুস্বরে গল্প বলছে। বাইরের কুকুর কাঁদছে চাঁদের দিকে চেয়ে।

হাত—মুখ ধুয়ে নয়ন এসে দেখে সুকুল ঘুমিয়ে পড়েছে। তার চারধারে যত্নে মশারি গুঁজে দিয়ে জগদীশ একটা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে কাঠের চেয়ারটায়। দুটো চোখ শূন্য। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় তার আধখানা মুখ আলোকিত, বাকি আধখানা আবছায়। মুখের রেখাগুলো পাথরের মূর্তির মতো স্থির। নয়নের হঠাৎ মনে হয় দুঃখচাপা জগদীশকে যে রকম ভালোমানুষ আর নির্বিষ মনে হয় ততটা সে নয়। খোঁচা খেয়ে ওর ভিতর থেকে প্রবল হিংস্রতা আর সিংহনাদ বেরিয়ে আসতে পারে।

কাচের বাক্সটার সামনে দাঁড়ায় নয়ন। মৃদু আবছা আলোয় তাদের দেখা যায়। সাপ আর সাপিনী। আবছা সরীসৃপ শরীর দুটো বালুর ওপর অনেক রেখা এঁকেছে। তীব্র আগ্রহে নয়ন দেখে। তার শ্বাস গভীর ও দ্রুত হয়। হাত দুটো নিশপিশ করে। কেমন ফুল তোলার মতো অনায়াসে জগদীশ বন—জঙ্গল থেকে তাদের গোপন শরীর তুলে আনে।

হ্যারিকেনটা তুলে আনে নয়ন। কাচের বাক্সটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে। কী চমৎকার সতেজ কালচে শরীর! যখন ছোবল তোলে তখন কী মারাত্মক আকর্ষণকারী সেই আক্রমণের ভঙ্গি। বিষ! বিষ! আর চিন্তাশূন্য আক্রমণ।

বাক্সটার গায়ে ছোট্ট দুটো টোকা দেয় নয়ন। তারপর দুটো জোরে টোকা দেয়।

জগদীশ পিছন থেকে বলে, কী করছেন! ও দুটোর আবার বিষদাঁত উঠেছে, কামাতে হবে। চলে আসুন।

আমি দেখব।

কী?

ওদের....কথাটা শেষ না—করে হাসে নয়ন। বিলোল হাসি।

কী বলছেন? জগদীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

একটা হতাশায় শ্বাস ফেলে নয়ন বলে, কিছু না। চলুন খেয়ে নিই।

জগদীশ বলে, চলুন।

বলে ওঠে।

রাত খুব বেশি হয়নি। কিন্তু পাড়াগাঁ বলে অনেক রাত মনে হয়।

খেতে বসে জগদীশ হঠাৎ বলে, মানুষ কোনো কোনো ব্যাপারে নিয়ম মানে না। কিন্তু জীবজন্তুরও একটা নিয়ম আছে।

কীরকম?

জগদীশ একটু হেসে বলে, আপনি ওই সাপ দুটোর কী অবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন?

নয়নের মুখটা লাল হয়ে যায়, সে তরলভাবে হাসতে থাকে। বলে, ভালোবাসা।

জগদীশ মাথা নেড়ে বলে, বুঝেছি! তাই বলছিলাম যে মানুষ সময় মানে না, দিনক্ষণ মানে না। এ এক আশ্চর্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত সবচেয়ে বেশি প্রকৃতির নিয়ম ভাঙে। সাপ কুকুর বেড়ালও মানুষের মতো এত নির্লজ্জ নয়। তারা নিয়ম মেনে চলে। একজোড়া সাপ আর সাপিনী এক জায়গায় আছে বলেই যে তারা যা—খুশি করবে এমনটা দেখা যায় না। ঠিক সময়টি এলে, খিদে জাগবে, আর তখনই মাত্র আপনি যা দেখতে চাইছেন দেখতে পাবেন। নইলে শতবার ওই বাক্সটা নাড়ালেও লাভ হবে না।

বলে জগদীশ হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলে, মানুষের মতো বেলাজা কেউ নয়। খিদে না পেলেও খাবে! খাওয়া, ভোগ এসবই তার সর্বস্ব।

খেয়ে উঠে জগদীশ সুকুলের বিছানায় শুতে গেল। পাশের ঘরে নয়নের বিছানা। সুন্দর পরিপাটি মশারি টাঙানো, জলের গেলাসটি ঢাকা দেওয়া, কোথাও খুঁত নেই। ঠিক যেন মেয়েলি হাতের কাজ। কার যে কোথায় ভাত মাপা থাকে! নইলে নয়ন তো আজ বিকেল অবদি লোকটাকে চিনতই না, এখনও যে চেনে তা নয়। শুধু জানে লোকটা সাপ ধরে, ছেলেকে (সে নিজের হোক আর অন্যেরই হোক) বড্ড ভালোবাসে। আর জানে, লোকটা গৃহকর্মে নিপুণ।

ছাঁচবেড়ার ঘর। ফুটো—ফাটা আছে। হেমন্তের গড়ানে রাত। টেনে বাতাস দিয়েছে একটা। শুকনো পাতার শব্দ পাওয়া যায়। দুদ্দাড় শেয়াল বা কুকুর দৌড়ে গেল উঠোন ভেঙে। বাতাসের শিস শোনা যায় বেড়ার ফাঁক—ফোঁকর দিয়ে। এতে কোনো অসুবিধে হয় না তার। গত এক বছর তার জীবন এ রকমই কেটেছে। সেবার বুড়ি ঝি সুখিয়ার চোখে ছানি পড়লে সে দেশে গেল। বাড়িতে লোক ছিল না। তখন সুন্দরবনের দিকে বান ডেকেছিল বলে কলকাতার ফুটপাত ভরে উঠেছিল জোয়ানমদ্দ মেয়ে—পুরুষে। কালো কালো চেহারার হাবা মানুষ সব, দিনমানে ভিক্ষে করে, রাতে চুরি। ফুটপাথে ছেঁড়া কাঁথার সংসার বিছিয়ে ছানা—পানা জাবড়া—জাবড়ি করে বসে। ঝাঁকড়া চুলের উকুন মারে, গালাগাল দিয়ে পরস্পর ঝগড়া করে। গা—ছাড়া ভাব। বান হয়েছে তো করব কী, এই রকম গা—সওয়া নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকে কলকাতার রাস্তায়। গাছতলায় বেলাশেষে কুড়োনো কাঠ কাগজ ঠেসে ইঁটের উনুন জ্বেলে মেটে—হাঁড়িতে নাড়ি—ভুঁড়ি, তরকারির খোসা, গরম ভূষি, খুনসেদ্ধ চাপায়! তারই মধ্যে আবার পাথরের টুকরো ফুটপাথে ঘষে মশলা বাটে। সেইসব আধা—মানুষের সমাজ থেকে একটা নোনা মেয়েমানুষ তুলে আনল বড় জামাইবাবু। শাশুড়ি ঠাকরুণের কষ্ট বুঝে ঝি ঠিক করে দিয়ে গেল। নোনা মেয়েছেলেটার গা—গতর যে ভালো তা দিন সাতেক খাওয়া—দাওয়া করার পরই বোঝা গেল। কোল—পোঁছা একটা ছেলে, স্বামী হাজত খাটছে কার বাজারের থলে টেনে দৌড়েছিল বলে। ঝাড়া হাত—পা সেই মেয়েটিকে নয়ন লক্ষ করেছে কখনও—সখনও। লক্ষ একবার করলে নয়নের দেরি সয় না। সন্ধের ঘোরেই বাড়ি নিঝুম। বাবা উকিল মানুষ, বাইরের ঘরে মক্কেল ঠাসা, দম ফেলার সময় নেই। মা হাই ব্লাডপ্রেশার নিয়ে সন্ধের পরই মশারির নীচে চলে যায়, হাতপাখা নাড়ে। ঠাকুর রান্নাঘরে। মেয়েছেলেটা সিঁড়ির নীচে ছেলে ঘুম পাড়াতে গেছে। সেই সময়ে নয়ন গিয়ে তাকে ঠেসে ধরে। চালটায় ভুল ছিল। চেঁচানিতে মক্কেলসুদ্ধু বাবা চলে এসেছিল। বেড়ালের মতো ছুটেছিল নয়ন। কিন্তু মক্কেলদের মধ্যে একজন ছিল দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন। সদরে তাকে জাপটে ধরে ফেলল। পরে অবশ্য উকিলবাবুর ছেলে শুনে সে খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে, কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সেই রাতেই বাবা তাকে বের করে দেয়। সেই মেয়েমানুষটাকেও। সেই থেকে বাইরে—বাইরেই কাটে নয়নের। কোনো কিছুর ঠিক থাকে না। খাওয়া, শোওয়া এইসব অবশ্য ভাববার ফুরসৎই পায় না সে। তারটা দশজনই ভেবে আসছে এক বছর ধরে। নয়ন কেবল শ্যামার কথা ভাবে, বা আর কিছু। বাড়ির সদর বন্ধ হলেও মায়ের জন্য খিড়কিটা এখনও বন্ধ হয়নি। কলকাতায় ফিরলে সে বাড়িতেই থাকে। একটু বেশি রাত করে ঢুকতে হয়, এই যা। বাবা টের পায় হয়তো, দেখি—না—দেখি—না করে এড়িয়ে যায়।

কাজেই এই সুন্দর পরিপাটি বিছানাটিতে তার ঘুম না—হওয়ার কারণ নেই। বলতে কী, জগদীশের আশ্রয় না জুটলে হয়তো—বা মোনা ঠাকুরের মন্দিরের বারান্দায় পড়ে থাকতে হত। এই শীতে, খোলা হাওয়ায়,

গেঞ্জির ওপর একটামাত্র শার্ট সম্বল করে।

ঘুম তবু আসছে না। মাথাটা বড্ড গরম। শরীরও। মোনা ঠাকুরের মন্দিরের কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ সে জেগেই এক মায়া দেখল। কুয়াশায় মাখা সেই অলৌকিক জ্যোৎস্না, মন্দিরের প্রাচীন সাদা সিঁড়ির শেষ দুটো ধাপে বঙ্কিম সুন্দর ভঙ্গিতে শরীর ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। জ্যোৎস্নাতেও দেখা যায়, তার চোখ চেয়ে আছে নয়নের দিকে। বিভ্রম? না। মাথা নাড়ে নয়ন। একথা ঠিক, সে মেয়েদের এখনও চেনে না। চিনবার বয়সও নয়। সে মাত্র চব্বিশ পেরোল। মেয়েদের বুঝতে বয়সও চাই। সে তো এখনও জানে না কেন শ্যামা খেলা করে তাকে নিয়ে, কেন—বা সেই সুন্দরবনের নোনা মেয়েমানুষটিকে চেঁচিয়ে বলেছিল, হারামির বাচ্চা! মেয়েদের না চিনেও নয়নের মনে হয়, ওই মেয়েটি মন্দিরের শেষ দুটো সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ঘাটের পৈঠায় স্নানের আগে মেয়েরা যেমন দাঁড়িয়ে জলে নিজের ছায়া দেখে, তেমনি ছায়া দেখতে চেয়েছিল নয়নের চোখে।

ঘুম হবে না। নয়ন মশারির মধ্যেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে থেকে একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ায় মশারির ভিতরটা ভরে ওঠে। হ্যারিকেনের গন্ধ পায় সে। উঠে বাইরে আসে। পায়চারি করে। শরীর। শরীরই সব। জগদীশ কী একটা তত্ত্বকথা বলছিল। খিদে, ভোগ এ হচ্ছে মানুষের সর্বস্ব। জীবজন্তুরা মানুষের মতো নির্লজ্জ নয়।

নয়ন একটু থমকে দাঁড়ায়। অথচ মানুষ ছাড়া আর কেউ পোশাক পরে না। পোশাক পরে কেন? মানুষ কি জানে না যে পোশাকের ভিতরে তার শরীরটা ন্যাংটো! সব মানুষই জানে মেয়েমানুষের শরীরে কী আছে, কিংবা কেমন করে সেই শরীর ব্যবহার করা যায়। তবে কেন মানুষ পোশাক পরে।

নয়ন একটু হাসে আপনমনে। ক্ষমতা হাতে পেলে সে নিয়ম করবে, পোশাক পরা চলবে না। বেহায়া, নির্লজ্জ, সবাই তো জানো তোমরা, তবে কেন ওই পোশাক? ছেড়ে ফেলো, ছেড়ে ফেলো, উদোম হও, লজ্জার কী আছে? পরস্পরের ন্যাংটো শরীর দেখো, লজ্জা জুড়িয়ে যাবে হে!

সাপদুটো এখন কী করছে? এই মায়াবী জ্যোৎস্নার শীত রাত্রিটি, এই তো সময়। এখনও কি নিস্পৃহ দড়ির মতো শুয়ে আছে? যখন একটি মেয়ে শরীরের অভাবে নয়নের চোখে ঘুম নেই।

দরজাটা ঠেলতেই খুলে যায়। হ্যারিকেনের পলতে নামানো। মৃদু দ্রুত শ্বাস—প্রশ্বাসের শব্দ আসে জগদীশের বিছানা থেকে। নিঃসাড়ে ঘুমোলে সুস্থ মানুষের শ্বাস ওরকম দ্রুত হয়। তাছাড়া গাঁয়ের মানুষ, ঘুমটা গাঢ় হওয়ারই কথা।

নয়ন নিঃশব্দে হ্যারিকেনের কল ঘুরিয়ে আলোটা উস্কে দিল। আলো হাতে কাচের বাক্সটায় ঝুঁকে দেখল, যেমন দেখেছিল খানিক আগে তেমনি দুটো পড়ে আছে। ন্যাংটো কালো শরীর! শীতল। নিস্পৃহ। খুব মৃদু দুটো টোকা দিল নয়ন। তারা নড়ল না।

এভাবে ওদের উত্তেজিত করা যাবে না। শব্দ করলে জগদীশ জেগে যাবে। নয়ন বাক্সটা ভালো করে দেখে। সাধারণ বাক্স। একটা কবজায় পুঁচকে তালা ঝুলছে। পকেট থেকে ভাঁজ করা ছুরিটা বের করে নয়ন। ফলাটা তালার ভিতর ঢুকিয়ে একটু চাপ দিতেই আলগা হয়ে গেল। গা—টা একটু শির শির করে তার। সাপদুটো নড়লও না।

নিঃশব্দে ডালাটা তুলে ফেলল সে। বাক্সের ভিতর থেকে একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ নাকে আসে। সম্ভবত ইঁদুর বা ব্যাঙ খেতে দেওয়া হয়েছিল ওদের, তারই কোনো টুকরো—টাকরা পড়ে পচছে। একটু দূর থেকে সাবধানে উঁকি দেয় নয়ন। ভয়ের কিছু নেই। যদি মাথা তোলে ছপ করে ডালাটা ফেলে দিলেই হবে। আপাতত ওদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে দেওয়া দরকার। নয়ন কখনও সাপদের মিলন দেখেনি। না—ঘুমোনো সময়টাও কেটে যাবে অন্যমনস্কতায়।

বিছানা ঝাড়ার ঝাঁটাটা ঘরের কোণে। একটা শলা খুলে নয়ন সাবধানে বাক্সের ভিতরে একটা খোঁচা দেয়। গায়ে লাগে না। বালিতে গেঁথে যায়। অনভ্যাসের হাত। আবার খোঁচা দেয়। এবার কোণের বিড়ে—পাকানো

সাপটার গায়ে লাগে ঠিকই। কিন্তু সে নড়ে না। কোনটা মাদী, কোনটা মদ্দা তা অবশ্য সে চেনে না। তবু ওটাকে তার মদ্দা বলেই মনে হয়। মেয়েমানুষের রাগ বেশি।

দুটো—তিনটে খোঁচা বৃথা গেল। সাপটা কেবল মাথাটা একটু সরিয়ে নিল, শরীর নাড়ল! নয়ন ডালাটা প্রায় বন্ধ করে ধরে রইল। সাপটা আবার ঝিমিয়ে পড়তেই ডালাটা আবার সাবধানে তুলে ফেলল সে। আবার কাঠিটা স্পর্শ করল শরীরে.....

কালো—বিদুৎ কখনও দেখেনি নয়ন। দেখল। বিশ্বাস হয় না, এত দ্রুত ঘুম থেকে খাড়া দাঁড়িয়ে যেতে পারে কেউ। একটা প্রবল শ্বাসের শব্দ হল কেবল। একপলকের মুগ্ধতায় আর একটু হলেই হাতটা সরিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল সে।

ডালাটা খাড়া তোলা ছিল, কোনদিকে পড়বে সেটা সিদ্ধান্ত নিতে একটুক্ষণ খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে ডালাটা আর একটু হলে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই একটা মসৃণ ছোবল খেয়ে সাপটা বাক্সের কার্নিশ বেয়ে ঝুলে পড়েছে। কিছু করার নেই।

কালো একটা স্রোতের মতো নেমে আসছে। নেমেই আসছে সরীসৃপ চিকন শরীরখানা। ডালাটা পড়েছে কিন্তু হালকা ডালাখানা তাকে চেপে রাখতে পারছে না। স্বচ্ছন্দ শরীরটা বেয়ে আসছে সুন্দর মুক্তির দিকে, প্রতিশোধের দিকে।

নয়ন হ্যারিকেনটা ফেলে এক লাফে পিছিয়ে আসে। পাগলের মতো চেঁচায়, জগদীশবাবু....জগদীশবাবু....

চোখের পলকে মশারি প্রায় ছিঁড়ে জগদীশ বেরিয়ে আসে। হ্যারিকেনটা কাত হয়ে দপ দপ করছে, তেল পড়ছে গড়িয়ে। এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে সব। কালো অন্ধকারে সাপের কালো শরীরটা জগদীশও খুঁজে পাবে না।

কী? কী?—বলে জগদীশ গর্জন করে। ঘুম—লাগা চোখে মাথায় কিছু বুঝতে পারে না।

নয়ন কেবল 'সাপ' কথাটা উচ্চারণ করতে পারল।

জগদীশ এক ঝটকায় আগে হ্যারিকেনটা সোজা করল। সেটা নিভল না। কিন্তু আলো ঘুলিয়ে ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। সাপটাকে দেখতে পেল নয়ন। দরজার দিক থেকে ঘুরে মুখটা তুলেছে। চোখে জ্বালা, মুখে শ্বাস।

জগদীশ মুহূর্তের মধ্যে সাপুড়ে হয়ে গেল। কুঁজো হয়ে দুটি সতর্ক জাগ্রত হাত উদ্যত করে এগিয়ে যাচ্ছে এক পা এক পা করে। মুখোমুখি। নয়ন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখে।

মানুষের ছোবল কত সুন্দর হয় তা দেখল নয়ন। এত সুন্দর কিছু সে কখনও দেখেনি। জগদীশ ঢেউ হয়ে গেল যেন। চকিতে শরীর ঝুঁকল। হাত প্রসারিত হল। এত দ্রুত যে বিশ্বাস হয় না। বাঁ হাতে সাপটাকে ফুলের মতো যেন গাছ থেকে তুলে নিল সে। এত অনায়াসে, যেন যে—কেউ করতে পারে।

ডালাটা খুলে, জগদীশ সাপটাকে ভিতরে ছেড়ে দেয়। সেটা আবার শরীরটাকে পাকে পাকে জড়ায়। মাথা কোলে নিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে।

জগদীশ নয়নের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুক্ষ স্বরে বলে, এটা কী হল?

নয়ন সামান্য একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, ঘুম আসছিল না।

কী দেখতে চেয়েছিলেন?

ওই, সেটা।

দাঁতে দাঁত ঘষল জগদীশ। অস্বাভাবিক ধীর গলায় বলল, এই ঘরে সুকুল আছে,আপনি জানেন না? যদি সুকুলের কিছু হত!

ওটা বেরিয়ে আসবে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু যদি বিছানায় যেত সাপটা? ওখানে আমার সুকুল আছে।

নয়ন বুঝতে পারে, তার অনুমানই ঠিক। বাইরে ওই বিষণ্ণ ভালমানুষির আড়ালে তীব্র হিংস্রতা রয়ে গেছে জগদীশের। রাগে চাপা গলা। সমস্ত শরীরে টান, রগ, শিরা—উপশিরা এই ম্লান আলোতেও দেখা যাচ্ছে।

মজা, না? বলেই জগদীশ আচমকা তার চাষাড়ে হাতে একটা থাপ্পড় কষায়। নয়ন ভাবতেও পারেনি। চড়টা বোমার মতো ফাটল তার কান, গলা, কণ্ঠা জুড়ে। মাথার মধ্যে সাইরেনের শব্দ বেজে উঠল হঠাৎ।

পড়ে গিয়েও টাল সামলে নিল সে। হাত বাড়িয়ে কাঠের চেয়ারটা ধরে দম নিল।

বেইমান! জগদীশ বলে।

মার কিছু কম খায়নি নয়ন। কিন্তু মার দেখলে সে পালায়ওনি কখনও। এ তার জল—ভাত। যেখানে মার সেখানে উল্টে মার দেওয়ার জন্যই সে জন্মেছে। চড়টা সামলেই দুটো হাত তার আপনা থেকেই মুঠো পাকিয়ে গেল।

কিন্তু একটা বিশাল গাছের মতো জগদীশ দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো মাটিতে পোঁতা, দু'খানা চাষাড়ে হাত তাকে বলের মতো ছুঁড়ে লুফে নিতে পারে।

মুঠো শিথিল করে শরীরের ভর চেয়ারের হাতলে ছেড়ে নয়ন জগদীশকে একটু দেখল, বলল, অতিথি নারায়ণ।

বলে হাসল।

জগদীশ গম্ভীরভাবে বলল, অতিথির ভেক ধরে চোর—ডাকাত এলে সে তখন নারায়ণ থাকে না। গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি দরজার বাঠাম দিয়ে দিচ্ছি। ফের কোনো বাঁদরামি করলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।

নয়ন একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। লোকটাকে তার দারুণ ভালো লাগছে এখন। দারুণ।

মসজিদবাড়ির বাইরের ঘেরা—দেয়ালটায় নোনা ধরেছে। গেটটা পাল্লা হারিয়ে হাঁ করে আছে। ভিতরে একটা চমৎকার মাঠ। নির্জন। মসজিদের গায়ে একটা মোটা লতা উঠেছে, অশ্বত্থ গজিয়েছে! ভিতরের মাঠের একটেরে একটা কাঠচাঁপা গাছ। খুব ফুল এসেছে। তলায় বিছিয়ে আছে ফুল। এই ফুলটার তেমন আদর নেই। কেউ কুড়োয় না, ঘর সাজায় না। ফুলের দোকানে এই ফুল বিক্রি হতেও দেখেনি শ্যামা। কিন্তু হলদেটে সাদা রঙের এই ফুলটার চাপা গন্ধ শ্যামার বড় ভালো লাগে। সে একবার চারধারে দেখল। কেউ নেই রাস্তায়, দু'চারজন সাধারণ চেহারায় মানুষ ছাড়া। মসজিদের ভিতরেও লোকজন বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। এই অঞ্চলটায় মুসলমানরা বড় একটা থাকে না এখন। আজান—ধ্বনি শোনা যায় না। আগে যেত, যখন সে খুব ছোট ছিল। তখন একটা পেয়ারাগাছ ছিল এখানে, আর ছিলেন হাজিসাহেব। বদনার জলে ওজু করতে করতে তাদের দুই ভাই—বোনের গাছে চড়া দেখতেন। নমাজের সময়ে বাচ্চারা ছোটাছুটি করলে অসুবিধে হবে বলে ছোকরা মোল্লা কি বুড়ো মৌলবি তেড়ে এলে তিনি আটকাতেন। তাদের ডেকে বলতেন, শব্দ কোরো না। পেয়ারা পাড়ো। য'টা খেতে পারো ততটা। নষ্ট কোরো না।

হাজিসাহেব নেই। কেউই নেই। নিস্তব্ধতা আছে। দু'—একজন কেয়ারটেকার থাকে হয়তো—বা। মানুষ যে কোথায় চলে যায়! বড় হয়ে অবধি বাড়ি থেকে দু'পা দূরে মসজিদের মাঠে কখনও আর আসেনি শ্যামা, ভুলে গিয়েছিল।

আজ বহুকাল বাদে সে নির্জন মাঠটায় ঢুকে পড়ল। সকালের রোদ এখন ঈষদুষ্ণ। ভালোই লাগে। বাতাস দিচ্ছে। 'কিরিচ' শব্দ করে চুল ঘেঁষে চড়াই উড়ে যায়। কী সুন্দর নিস্তব্ধতা! আর গাছগাছালির ছায়া!

কাঠচাঁপা ফুল কয়েকটা কুড়োলো শ্যামা। স্কার্ফের আঁচলে তুলল। একটু ঘুরে দেখল চারদিকে। মসজিদের চাতাল ঝাঁট দেওয়া। মেঝে পরিষ্কার। বাতাস ধূপগন্ধ। মেহেদীর ঝোপে পাখির হুড়োহুড়ি।

হঠাৎ কোকিল ডাকে। চমকে ওঠে সে। কোকিল! না নয়ন?

স্খলিত আঁচল থেকে দু'—একটা ফুল পড়ে যায়।

সেই যে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে যেতে আমবাগানে দেখা হয়েছিল, তারপর আর তাকে দেখেনি সে। ফিরেছে কি নয়ন? কে জানে!

নিমগাছ থেকে একটা সত্যিকারের কোকিল উড়ে গেল। তবে নয়ন নয়, কোকিলটাই ডেকেছিল। শ্যামা নিশ্চিন্তে একটু হাসে। একটা ফুল তুলে গন্ধ শুঁকল। মৃদু গন্ধই তার প্রিয়। বুক ভরে ওঠে না গন্ধে, কেবল স্মৃতির মতো, গত রাত্রির স্বপ্নের রেশের মতো অস্পষ্ট গন্ধ।

গত রাতেও দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে। প্রায়ই দেখে। সকাল থেকে মনটা ভার হয়ে আছে। বাবার জন্য একটা ফুল—হাতা, উঁচু গলার সোয়েটার বুনতে শুরু করেছিল। পান্নাদির বাড়িতে গিয়েছিল প্যার্টান তুলতে। আসলে প্যার্টান তোলাটা ছল। ঘরে থাকতে তার ভালো লাগছিল না। হরিদ্বার যাওয়ার গোছগাছ শুরু হয়েছে, মা—বাবা যাবেই। মোনা ঠাকুর বলেছে, ওইদিকেই কোথাও দাদা আছে সন্ন্যাসী হয়ে। পূর্বস্মৃতি নেই বলে ফিরতে পারছে না। শ্যামার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আশা হয়।

হরিদ্বার কি কোথাও যেতে শ্যামার ইচ্ছে করছিল না এখন। বাবার শরীর ভালো না। মাঝে মাঝে প্রেশার দু'শো ছাড়িয়ে যায়। বিদেশ—বিভুঁয়ে তারা মা আর মেয়ে বাবাকে নিয়ে কোন আতান্তরে পড়ে কে জানে! কিন্তু মা—বাবাকে ঠেকানো যাচ্ছে না, অনেক বুঝিয়েছে সে, বেশি বোঝাতে গেলে ঝগড়া হয়ে যায়।

বাবা হরিদ্বার গিয়ে মারা গেছে—এ রকমই একটা দুঃস্বপ্ন সে দেখেছিল কাল। সকালটা তাই মনের অন্ধকার নিয়ে কাটছিল। পান্নাদির বাড়িতেও প্যাটার্ন তোলা হল না। আজ ছুটির দিন, ওরা পিকনিকে যাচ্ছে কল্যাণীতে। বলল, চল না, মাসিমাকে বলে তোকে নিয়ে নিই। শ্যামা রাজি হয়নি।

রাজি হয়নি অভিমানে। তার কোনো আনন্দ করতে চাই। বাড়িতে অবিরল শোক লেগে আছে গত পাঁচ বছর ধরে। বিরাম নেই। দীর্ঘশ্বাসে বাসার বাতাস ভারী। মাত্র তিনটি প্রাণী তারা। পরিবারটা বড় হলে হয়তো একজনের শোক ভুলে থাকা যেত। মোটে তিনজন বলেই হারিয়ে যাওয়া চতুর্থ জনের কথা ভোলা যায় না। চার পায়া একটা আসবাবের একটা পা ভেঙে গেলে সেই পায়ার দিকেই যেমন ঝুঁকে থাকে আসবাব, তেমনি হারানো দাদার স্মৃতিকে ঝুঁকে আছে তারা। খেতে বসতে কাজ করতে দাদার কথা এসে পড়ে। মা কাঁদে, বাবা সান্ত্বনা দেয়, তারপর নিজে কাঁদে। শ্যামার চোখে তখন জল আসেই, তাই তাদের আনন্দ নেই। গত পাঁচ বছরে বাবা শ্যামার বিয়ের চেষ্টাই করেননি। প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, ছেলেটা নেই, ওই মেয়েটা মাত্র আমাদের সম্বল। অন্ধের নড়ি। ও গেলে থাকব কী করে?

তবু গত পাঁচ বছরে দু'—তিনটে পাত্রপক্ষ দেখেছে শ্যামাকে, পছন্দও হয়েছে। বিয়ে হয়নি বাবা—মার গরজের অভাবে। পাত্রদের মধ্যে একজনকে খুব পছন্দ ছিল শ্যামার। স্নিগ্ধ চেহারার দীর্ঘ ছেলেটি। মুখখানা গম্ভীর। বিলেত—ফেরত ডাক্তার। প্র্যাকটিশ যখন সবে জমে উঠেছে সেই সময়ে লোকটাকে হঠাৎ অল্প বয়সেই ধর্মে পায়। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম। বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর ছেলেটির একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হল। দিনক্ষণ সব ঠিক। বিয়ের দিন গায়ে—হলুদের স্নান করতে গিয়ে মেয়েটির কেঁপে জ্বর আসে। ধূম জ্বর উঠতে—না—উঠতেই গায়ে মায়ের দয়া বেরোয়। ঝেঁপে গুটি উঠেছিল। বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বোকা মেয়েটা যখন বুঝতে পারল যে তার মুখখানার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে তখন তার প্রাণের চেয়ে শরীরের মায়া বেশি হল, প্রায়ই কাঁদত, ও মা গো, এই মুখে তাঁর ঘর করতে যাব? রোগ সারার মুখে মেয়েটা টিক বিষ খেয়ে বাঙ্গুর হাসপাতালে মারা যায়। ছেলেটি সেই থেকে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াত। কী যেন খুঁজত, কাকে যেন। তারপর দেওঘরের এক আশ্রমে থেকে যায়।

আশ্রমবাসী সেই বিলেত—ফেরত ডাক্তারের মা—বাবা হাল ছাড়েন নি। তাঁরা সেই আশ্রমে গিয়ে পড়ে রইলেন। ছেলের গুরুদেব বললেন, বিয়ে করবে না কেন? বিয়ে কর। বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি। বনের সন্ন্যাসী দিয়ে কী হয় রে? কাম দমন করতে চাস নাকি। ওসব জোর করে করতে গেলে মাথার দফা শেষ হয়ে যাবে। পরমপিতাই কাম দিয়েছে, সে তো এমনি নয়, তারও কিছু প্রয়োজন আছে বলেই

দিয়েছেন। ওর দমন ওভাবে হয় না, জোর করতে গেলে উল্টো বিপত্তি। সুষ্ঠু ব্যবহার করো, স্ত্রীর প্রতি কামভাবেই কেবল ভাবিত হোয়ো না, তা হলেই হবে। ভালো ঘর দেখে জাতে কাটে কর।

সেই ডাক্তার নিজেই এসেছিল দেখতে? হাফ—হাতা পাঞ্জাবি পরা, ধুতি, লম্বা, কৃশ কালো চেহারাটি। ভারী বীর। গম্ভীর। ঘরে ঢুকলে ঘরটা থম থম করে। বুকের মধ্যে গুরু গুরু ডাক ওঠে। বাবা কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি এই অল্প বয়সেই কেন সন্ন্যাসী বাবা?

সে উত্তর দিয়েছিল, সন্ন্যাসী কোথায়? আমি তো সংসারীই। কেবল সংসারের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

সেটা কেমন?

ছেলেটা একটু ভেবে বলল, আপনার ঘরের পাশে যদি আবর্জনা থাকে তবে মশা মাছি জীবাণুর উৎপাত বাড়ে। বাড়ে না? নিরাপদে থাকতে গেলে তাই আপনার ঘরের মতোই ওই বাইরের ময়লাও পরিষ্কার করা দরকার! তেমনি নিজের পরিবার—সংসারের ভালোর জন্যই চারপাশটাকে ভালো রাখা দরকার। এই ভালো রাখতে গেলেই সংসারের পরিধি বেড়ে যায়। কেবল নিজের ভালোর জন্য করলেই ভালো থাকা যায় না।

বাবা উত্তরে বলেছিল, তো তার জন্য আশ্রম কেন? ঘরে থেকেও তো হয়।

আশ্রম মানে যেখানে শ্রম করে কাজগুলো হাতে—কলমে শিখতে হয়। শেখা হলেই সংসারে ফিরে আসা! সেকালের ব্রহ্মচারীরা ভালো গৃহী হওয়ার জন্যই ব্রহ্মচর্য করে মনটাকে উদার, শান্ত ও আনন্দিত ও স্থির করে নিত। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বিস্তার, ব্রহ্মচারী মানে বিস্তারে বাস করা। চারপাশটাকে জেনে নেওয়া। এই জানা সংসারে তাকে সাহায্য করে। আমি সংসার—বিমুখ নই।

ধীর স্থির কথা। বিনীত এবং অকপট স্বর।

বাবা তবু মনস্থির করতে পারছিল না। অস্বস্তি বোধ করছিল।

বলল, তুমি কেন গেলে?

ছেলেটা বিষণ্ণ একটু হাসল। কী মায়াময় হাসিটি! অনেকক্ষণ উত্তর দিল না। তারপর আস্তে করে বলল, আর একবার আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তা কি শুনেছেন?

শুনেছি।

ছেলেটা আবার মাথা নিচু করে চুপ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, মেয়েটির যখন বসন্ত হয়েছিল তখন আমি মাঝে—মাঝে তাকে দেখতে যেতাম। ডাক্তার হিসেবেই যেতাম। মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনও পূর্ব—পরিচয় ছিল না, এই যেমন আজ এসেছি আপনার বাড়িতে সেরকমই উপলক্ষে মেয়ে দেখতে গিয়ে তাকে দেখা, সে খুবই সুন্দরী ছিল। বসন্ত হওয়ার পর তার সেই সৌন্দর্য যে কোথায় গেল! একটি সুন্দরী মেয়ের বসন্ত হলে ডাক্তারের খুব একটি প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু রুগি দেখা এক কথা, আর নিজের ভাবী স্ত্রীকে ওই অবস্থায় দেখা আর এক কথা। আমার মন খারাপ হয়ে যেত। তবু মনকে আমি স্থিরই রেখেছিলাম। ওই মেয়েকেই বিয়ে করব। আমি তাকে তাই প্রায়ই দেখতে যেতাম। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখত, কথাবার্তাও বলত না। চুপচাপ তার বিছানার পাশে বসে থেকে চলে আসতাম। একদিন গ্রীষ্মের বিকেলে দেখতে গেছি। পশ্চিমের জানালা খোলা ছিল। তাতে নিমডাল বাঁধা, ঘরে আবছা আলো পড়ছে। মেয়েটি শুয়ে ছিল দেয়ালের দিকে মুখ করে। আমি চেয়ারে বসা। মশারিটা তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে আমি তাকে দেখতে পাই। তিনদিকে মশারি ফেলা, একদিকের মশারি তোলা। ফলে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন থিয়েটারের স্টেজ—এর মতো। সে শুয়ে আছে, শরীরের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা লালচে মারাত্মক গোটায় ভরা। গোটা গলে পুঁজ আর রস চাপটা বাঁধছে। এলোচুল বালিশে ছড়ানো, দৃশ্যটা করুণ, ভয়ংকর। দেখছিলাম। পশ্চিমের জানালার নিমডালের ফাঁক দিয়ে লালচে আলোর কুচি এসে বিছানায় পড়েছে। চৌখুপি আলো কাঁপছে, দুলছে। কোনোদিন সে যা করে না, সেই সময়ে হঠাৎ মুখ ফেরাল। বস্তুত রোগ হওয়ার পর তার মুখ ওরকম স্পষ্টভাবে সে কখনও আমাকে দেখায়নি। মুখখানা ফুলে—টুলে বিশ্রী দেখতে হয়েছে। কিন্তু

তাতে চমকাবার কিছু নেই। আমার মন তো প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখ দু'খানার দৃষ্টি দেখে আমার কেমন লাগল। মানুষের খুব অভিমান হলে চোখে যেমন একটা আলগা আলো আসে ঠিক সেরকম কিছু ছিল তার চোখে। জলভরা, লালচে এবং আগুনের মতো যা এসে ছোঁয়। তক্ষুনি মনে হল, একে পাহারায় রাখা দরকার। চোখে চোখে না রাখলে এ মরবে, এর মরার ইচ্ছে জেগেছে। কিন্তু এ রকম মনে হওয়াগুলো কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, আমাদের কত সময়ে কত কিছু মনে হয়। তার ওপর ঘরটার আলো স্পষ্ট নয়, মশারির মধ্যে একটা ধোঁয়াটে ভাব, আর সেই আলোর চৌখুপিগুলো, সেগুলোর কোনো ছিটেফোঁটা তার চোখে পড়ে ওরকম দেখাচ্ছিল কি না—এ সবই আমি ভাবতে লাগলাম। সেই সময়ে আমি হঠাৎ খেয়াল করি, ঘরে একটা জর্মিসাইডিসের চেনা গন্ধ। আর পোকামারা বিষের গন্ধ। সেই গন্ধ আমার নিত্যসঙ্গী। তবু হঠাৎ সেদিন সেই গন্ধ বুকের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে একটা আকুল ইঙ্গিত করছিল। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কেন আমার মন একটা অস্পষ্ট কিছু বলতে চাইছে। উঠে আসবার সময়ে দেখি, কে যেন পোকামারা বিষের শিশিটা ছোট আলমারির মাথায় রেখে গেছে। চলে আসতে গিয়েও থমকে শিশিটা দেখলাম। একবার হাত বাড়িয়ে ধরলামও, ভাবলাম কাউকে বলি শিশিটা সরিয়ে নিতে। তারপর সচেতন মনে ভাবলাম, থাকগে। কী হবে!

ছেলেটা চুপ করে আবার একটু ভাবল। তারপর ম্লান এবং সুন্দর হাসিটি হেসে বলল, এই হচ্ছে গল্প। মেয়েটা মারা গেল। হাসপাতালে নিয়ে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তার মারার ইচ্ছেটাই ছিল প্রবল। সেটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। চুকে—টুকে গেছে। কিন্তু তারপর থেকেই আমার মনে একটা প্রশ্ন এল। প্রশ্ন এই—আমি কেন সেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম? আর কেন তা উপেক্ষা করেছি? আমি যদি এতই আনাড়ি যে বুঝতে পেরেও সাবধান হতে জানি না তবে তো একদিন আমার অতীত বিদ্যাও সঠিক প্রয়োগ করতে পারব না! সংকট যখন আসে তখন মানুষের সবচেয়ে বড় বিদ্যার পরিচয় হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্থিরভাবে জোরের সঙ্গে যে সিদ্ধান্ত নিতে জানে না, কোন সিদ্ধান্ত সঠিক এ বিষয়ে যার দ্বিধা থাকে সে অবিশ্বস্ত। চিন্তা করতে করতে আমি দেখলাম, মানুষ যত তুচ্ছ ভুলই করুক, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভুলের পিছনে থাকে তার জীবনের যত কাজকর্ম, যত অভ্যাস, যত আচরণ। জল খেয়ে কাচের গেলাসটি টেবিলের ধারে রাখতে গিয়ে ভাবলাম, এখানে রাখছি কারও ধাক্কা লেগে পড়ে ভেঙে যাবে হয়তো! ভাবলাম, তবু আবার রেখেও দিলাম। ভাবলাম, থাকগে, এক্ষুনি ভিতরবাড়ি থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে। তখন পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হাঁটু লেগে টেবিলটা নড়ল। গেলাসটা নড়ে উঠে আবার স্থির হল। ভাবলাম, গেলাসটা পড়ে যাবে। টেলিফোন বাজছে, দৌড়ে গিয়ে ধরি। কে একজন ফোন করে একটা ঠিকানা দিল লিখে রাখতে। টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি এসে ঠিকানাটা লিখে রাখতে যাচ্ছি। ডায়েরিটা খুঁজছি। তখন গেলাসটার কথা ভুলে গেছি। জরুরি ঠিকানাটা লিখে রাখা দরকার, ডায়েরিটা কোথায়? ফাইলের তলায় চাপা ডায়েরিটা পেয়ে 'ইউরেকা' বলে টেনে বার করতে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ কনুই লেগে ফটাস করে পড়ে ভাঙল, ওটা কী? সেই গেলাস!

ছেলেটা বাবার মুখের দিকে ক্লান্ত চোখ দুটো পরিপূর্ণ মেলে দিয়ে বলল, তুচ্ছ একটা ভুল। কিন্তু ভেবে দেখলে এর পিছনে আমার সমস্ত জীবনটাই কাজ করছে। ওই দীর্ঘকালের অভ্যাসজনিত আলস্য। কাজ ফেলে রাখা, অন্যে এসে নিয়ে যাবে—এই পরনির্ভরতা, দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেও উপেক্ষার সর্বনাশা শিথিলতা। জরুরি কাজের সময়ে বিশৃঙ্খলা। সবকিছুকে একযোগে দেখার ক্ষমতা, আর সব মিলিয়ে একটা সাময়িক অন্ধত্ব। যে এরকম ছোট্ট ছোট্ট ভুল করে তার জন্য বড় বড় ভুল অপেক্ষা করে থাকে। মেয়েটি মরে যাওয়ার পর নিজের এই অন্ধত্ব এবং সিদ্ধান্তের অভাব আমাকে পাগল করে দিল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল আমি রুগির সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারব না, ভুল ওষুধ দেব হয়তো, অপারেশন করতে হাত কাঁপবে এবং কোনো মানুষের মুখ দেখে তার সম্বন্ধে কেবলই উল্টোপাল্টা ভেবে যাব। নিজের সম্পর্কে এই বিশ্বাসের অভাব মানুষের মস্ত এক শত্রু। তখনই ঠিক করি ডাক্তারির চেয়ে বড় কিছু শিক্ষা আমার দরকার।

সেই শিক্ষা জীবন যাপনের। ক্ষুদ্র চোখে আমরা যা দেখি তা যথেষ্ট নয়, চাই ব্যাপক দৃষ্টি। কোনো কিছু দেখলে তার সবটা দেখা চাই, কোনো কিছু জানলে তার সবটা জানা চাই। কে শেখাবে আমাকে?

ছেলেটি মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বলল, আমি তখন গুরুর সন্ধানে বেরোই। সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য নয়, সংসারী হওয়ার জন্যই। কিন্তু এমন সংসারী যার ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিমুক্ত। যে স্থির, আত্মবিশ্বাসী, যে ভুল করে না।

বাবা খুশি হয়েছিল হয়তো। অনেকক্ষণ আলাপ করেছিল ছেলেটির সঙ্গে। ছেলেটি এক পলকমাত্র দেখেছিল শ্যামাকে। দ্বিতীয়বার চোখ তোলেনি। কিছু জিজ্ঞেস করেনি। তবু শ্যামা জানত, সে শ্যামাকে পছন্দ করেছিল।

বাবা কেবলই দ্বিধা করতে লাগল। সন্ন্যাসী ছেলে, আশ্রমে থাকে, নিরামিষ খায়! শ্যামা কি পারবে? কয়েকবার শ্যামাকে ডেকে ওই কথা জিজ্ঞেস করেছিল বাবা। শ্যামা উত্তর দেয়নি। মনে মনে সে উন্মুখ ছিল সেই পুরুষটির জন্য। প্রস্তুত ছিল। তার মনের ভিতর শাঁখ, উলুধ্বনি বেজেছিল ঠিকই। কেউ শোনেনি।

বাবার উত্তর না পেয়ে তারা আর আসেনি! কী হল সেই ছেলেটির কে জানে! মানুষ যে কোথায় যায়!

নির্জন মসজিদের চত্বরে শ্যামা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। মনে এক অভিমান। কার ওপর কে জানে! হয়তো দাদার ওপর! কেন পাগল হয়ে চলে গেলি? দ্যাখ তো, আমাদের কী করে রেখে গেছিস! ফিরে আয় লক্ষ্মী দাদা আমার, একটা ঝুঁকে—পড়া দিক তুলে ধর। আমরা চারজন হলে সংসারটার দাঁড়ানো হয়। কেন যে চলে যাস তোরা! কেন যে চলে যায় মানুষ! দূরে যায়! মরে যায়! হারিয়ে যায়! কেন রে! কোথায় গেল মেহেদিরঙা দাড়িওলা হাজিসাহেব? কোথায় সেই কাশীর পেয়ারা গাছ? আর সেই মসজিদের পিছনে দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি দোলনচাঁপা? কী সুন্দর গন্ধ তার! কিছু নেই দ্যাখ। কেন রে হারিয়ে যায় মানুষ? গাছপালা!

মাঝে মাঝে তার অভিমান হয় মা—বাবার ওপরও! কেন তোমাদের অত শোক? উৎসবের মতো শোক তোমাদের। মন খুঁড়ে তোমরা দুঃখ তুলে আনো রোজ। দুঃখই তোমাদের ভালো লাগে। নইলে কেন ভুলতে পারো না? পাছে ভুলে যাও সেই ভয়ে রাত জেগে তোমরা ছেলের কথা বলো, অবসর সময়ে বসে ভাবো ধ্যান করো। কেন? ভালো লাগে বলে? ঘরের বাতাস তোমাদের সেই দুঃখের ভার নিয়ে ভারী হয়ে থাকে। এক কলি গান গাইতে পারি না আমি, মনে হয় বুঝি গান গাইলে বাড়ির ভিতরে দুঃখের পবিত্র মূর্তিটি—যা তোমরা রচনা করেছ, তা বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে! আয়নায় মুখ দেখতে যাই, অমনি মনে হয়, আয়নায় মুখ দেখছিস মুখপুড়ি, তোর না দাদা নেই? যে ছিল তোর খেলার সাথী, প্রিয়জন, সে না নেই!

অভিমান তার নিজের ওপরেও, কেন যে বড় হতে গেলাম! কেন যে বুঝতে শিখলাম, ভাবতে শিখলাম, টের পেতে শিখলাম! কী দরকার ছিল এ সবের? তার চেয়ে জন্মে শিশু হয়ে থাকলাম না কেন? সেই তো ভালো হত সবচেয়ে! অবোধ শিশু হয়ে চেয়ে থাকা! কেবল বিস্ময় আর আনন্দ। খিদে মিটলেই ঘুম। আর আহ্লাদ!

অভিমান আরও অনেক শ্যামার। বুক টই—টুম্বুর করে। এমনই কপাল তার! দেয়াল টপকে নয়ন এসে চিঠি রেখে যায় ঠিক। ভোরবেলা প্রায়ই চিঠি পায় সে। তাদের বাসার দুটো ঘর। সামনের ঘরে বাবা—মা, পিছনের ঘরে সে। তার শিয়রের জানলার পাশ দিয়ে মেথর বা কয়লাওলা আসার একটা গলিপথ। গলিটা বাড়িরই অংশ, উঁচু দেয়াল, সামনে দরজা। কড়াক্কড় করে শিয়রের জানলা বন্ধ করে শোয় শ্যামা। তবু সকালে উঠে যখনই জানালা খোলে, ভোরের প্রথম আলোটি, কি শীতের কুয়াশা কিংবা রুপোলি বৃষ্টি দেখে দিনটা সুন্দর লাগে, মনটা ভালো হয়ে যায়, তখনই দেখতে পায়, জানালার খাঁজে নীল খাম, কিংবা ভাঁজ করা চিঠি। সব চিঠিতেই সেই এক কথা, 'বিয়ে করো, না হলে মরব।' কিংবা 'মেরে ফেলব শ্যামা, জানো তো আমি খুনে।' চিঠি দেখে মনটা ঝাঁৎ করে ডুবে যায়। মা—বাবা দেখার আগেই সে চিঠি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, উনুনে দেয়। চোখে জল আসে। বাইরে কোকিল ডাকলে, মাটির বেহালা বাজলে, বউ—কথা—কও কথা বললে, শ্যামা চমকে ওঠে। নয়ন নয় তো! কপাল!

ইচ্ছে করলেই পিকনিক যেতে পারত সে। হই—হুল্লোড় করে কাটিয়ে আসত। কিন্তু সব ঘটনা মিলে—মিশে একটা গভীর অভিমান বুকে থম ধরে থাকে। নিজেকে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয়। কষ্ট পা শ্যামা, আরও কষ্ট পা। গান গাস নে, কোথাও যাস নে, মুখ দেখিস নে আয়নায়। তোর আনন্দ পেতে নেই!

গাছের ছায়ায় শিশির এখনও শুকোয় নি! পায়ে পায়ে জল ঝরে পড়ছে। হাঁটতে শ্যামার ভালোই লাগে। একা। মসজিদবাড়ির এই পোড়ো ভাবটা তার সঙ্গে মিলে যায়। এখানে সে দাদার সঙ্গে কত খেলেছে! কিছুই ভোলেনি সে। এখানে সে এবার থেকে আসবে। রোজ। বসে থাকবে একা একা। অভিমানটা বিকেল পর্যন্ত রইল।

পাঁচটা নাগাদ তার পিসতুতো দিদি কমলা আর তার স্বামী শঙ্কর ট্যাক্সিতে এসে হাজির। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ভিতরে ঢুকেই হাঁক—ডাক শুরু করল শঙ্করদা, শ্যামা, শিগগির সাজপোশাক করে নাও, সিনেমায় যাচ্ছি। তোমার টিকিট কাটা আছে।

ওর ওইরকম। আগে থেকে খবর দেবে না, হঠাৎ এসে হুড়ো দেবে।

বুঝেছি, কারও টিকিট বাড়তি হয়েছে, তাই আমাকে নিতে এসেছেন! শ্যামার গলায় সকালের অভিমানের রেশ এখনও।

মাইরি না, তোমার মুখখানা মনে করেই কেটেছি।

যদি এসে আমাকে না পেতেন?

তা হলে বেচে দিতাম। হিট ছবি, বেচলে দু'চার আনা বেশিই পেতাম। জলদি করো।

আমি যাব না।

কমলা মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, যাবি না কী? তোর ইচ্ছেয় নাকি! পুজোয় যে পিওর সিল্কটা মামা দিয়েছে সেটা পর আজ। কী যে করিস ভালো শাড়িগুলো দিয়ে। সব জমিয়ে রাখছিস বাক্সে।

ইচ্ছে করছে না রে কমলাদি। মন ভালো নেই।

ওমা। সে আর নতুন কথা কী! তোর আবার কবে মন ভালো থাকে?

যাঃ! কবে মনখারাপ দেখেছ?

শঙ্করদা বলে, ওটা ওর ব্যক্তিত্ব কমলা। অনেক মেয়ে আছে যাদের মনখারাপ থাকলে ভালো দেখায়।

ইয়ার্কি হচ্ছে? শ্যামা হাসে।

মাইরি না, তোমার চোখ দু'খানা যা ঢুলুঢুলু, ওতে হাসি ছ্যাবলামি ভালো খেলে না। মনখারাপ তোমার থাক শ্যামা, কেবল মাঝে—মাঝে একটু মুখোশ খুলো, বাব্বাঃ, মেয়েরা সুন্দর দেখাবার জন্য যে কত কষ্ট করতে পারে! একটা মেয়ে ছিল যাকে বাঁ দিক থেকে বেশি সুন্দর দেখাত, সেই থেকে তার অভ্যাসই হয়ে গেল লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে বাঁ দিকে ফিরে থাকা, ওই ভাবে মেয়েটার একটা দোষ দাঁড়িয়ে গেল, সোজা হয়ে কথা বলতে পারে না, তাকাতে পারে না, বাঁ দিকে কেতরে তাকায়, কথা বলে। ঘাড়ে ক্র্যাম্প হয়ে গিয়েছিল। কী জ্বালা!

আমি সে রকম নই মোটেই।

তোমাদের সেই সন্নিসি ডাক্তার আমাকে বলেছিল, মেয়েটি ভারী দুঃখী মনে হয়। দুঃখীরাই ভালো, তারা ঈশ্বর সকাশে তাড়াতাড়ি যেতে পারে।

কোন সন্নিসি ডাক্তারের কথা বলছ? কমলা জিজ্ঞেস করে।

ওই যে অরিন্দম ব্যানার্জি এম—আর—সি—পি, দেওঘরের আশ্রমে যে আছে সে—ই। আমি তো ওই একটা সম্বন্ধই এনেছিলাম শ্যামার। সবই ফার্স্ট ক্লাস ছিল, একটু ডিফেক্ট ওই সন্ন্যাসটা। ওটা না হলে.....

শ্যামা কথা বলল না, বুকটা একটু চমকাল মাত্র।

ট্যাক্সিতে শ্যামা আর শঙ্কর দু'ধারে বসেছে, মাঝখানে কমলা। পাড়ার মোড়টা পেরোতে গিয়ে একটা চায়ের স্টল আর রক দেখিয়ে শঙ্করদা বলে, শ্যামা, এসব অঞ্চলের ছেলে—ছোকরাগুলো গেল কোথায়! দিন

—রাত আড্ডা দিত, চুরি—ছিনতাই করত, টিটকিরি দিত! সব হাপিস হয়ে গেল না কি?

কী জানি! দেখছি না তো! পাড়াতেও ঘোরে না।

জিভ দিয়ে একটা চুক চুক শব্দ করে শঙ্করদা বলে, হাপিসই হয়ে যাচ্ছে শ্যামা। খুব ধরপাকড় হচ্ছে তো! কিছু পুলিশ নিয়ে গেছে, কিছু মরেছে নিজেদের হাতেই, কিছু পালিয়েছে। সব পাড়াতেই ছেলে—ছোকরা কমে যাচ্ছে। আফসোসের কথা।

শ্যামা হাসে, কেন?

তোমাদের খাঁটি অ্যাডমায়ারার তো এরাই ছিল!

কমলা ধমক দেয়, থাম তো!

থামবার কী! আমার তো মনে হয় তোমার সবচেয়ে বড় অ্যাডমায়ারার ছিল কাবুল, ভুল বানানে প্রেমপত্র লিখত, কিন্তু কী ভালোবাসা! তোমার বিয়ের পরই কাবুল নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, না?

ওকে অ্যাডমায়ারার বলে না।

ওরাই খাঁটি অ্যাডমায়ারার। শ্যামা, তোমারও একজন আছে না? নয়ন না কী যেন নাম!

শ্যামা মুখটা ফিরিয়ে নিল।

সে এখনও বেঁচে—বর্তে আছে তো? না কি হাপিস হয়ে গেছে?

শ্যামা মুখটা ফিরিয়ে বলল, শঙ্করদা, ওকে কিছু করতে পারেন না? বড্ড জ্বালায়।

রিসেন্টলি কিছু করেছে নাকি?

করেছে।

কী?

বাবা—মা'র সঙ্গে ক'দিন আগে একটা মন্দিরে গিয়েছিলাম না? সেইখানেও পিছু নিয়েছিল। একটা মস্ত আমবাগান পেরিয়ে যেতে হয়। বাবা—মা একটু এগিয়ে গিয়েছিল, আমি বুনো ফুল তুলতে দাঁড়িয়েছি, সেই সময়ে আমার রাস্তা আটকেছিল। সাহস বড় বেড়ে গেছে।

কাছে আসার চেষ্টা করেছিল নাকি?

হুঁ!

শঙ্করদা একটু চুপ করে থাকে। কমলা বলে, ভাবিস না। ওরা ওইরকম। কাবুল আমাকে কম জ্বালায়নি।

ও মাঝে—মাঝে আমাকে খুন করবে বলে শাসায়। শাসানিটা মিথ্যে নয়, ও পারে। বলল শ্যামা।

শঙ্করদা চিন্তিত মুখে চুপ করে থাকে একটু। বলে, কী করব শ্যামা, এদের মুকাবেলা করতে হলে একটা প্রস্তুতি দরকার। দুঃখের বিষয় আমার তা নেই। ভদ্রলোক হয়েই গেলাম। দেখি যদি কিছু করা যায়।

উদ্বেগ নিয়ে কমলা বলে, তুমি আবার কী করবে? নয়নকে আমি চিনি। রাসবিহারীতে যারা একজন এস—আইকে মেরেছিল ও তাদের দলে ছিল। ওসব এলিমেন্টের সঙ্গে খবরদার লাগতে যেয়ো না। শ্যামার পিছনে ঘুরছে ঘুরুক। শ্যামার একটা বিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সন্ন্যাসীঠাকুরকে ফিরিয়ে দিয়ে তোমরা ভালো করোনি শ্যামা। মানুষটার মধ্যে একটা ভারী সৎ ব্যাপার ছিল। শঙ্করদা বলে।

শ্যামা মৃদু শ্বাসের স্বরে বলে, আমি কী করব?

কমলাও বলে, ও কী করবে? ওর মতামতের কোনো দাম আছে নাকি! মামা আর মামি কেবল ছেলে—ছেলে করে ক্ষেপে থাকলে ওর কোনোদিন বিয়ে হবে না। ওঁদের মতামত ছেড়ে দিয়ে এবার আমাদেরই কিছু করতে হবে। হ্যাঁরে শ্যামা, নয়ন কি বাড়াবাড়ি করছে খুব? আগে তো কেবল চিঠি—টিঠি দিত, আর কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত?

থমথমে মুখে শ্যামা বলে, এখনও যায়। আমার কিছু ভালো লাগে না কমলাদি।

কমলা মুখ ফিরিয়ে শঙ্করদার দিকে চেয়ে বলে, তোমার খোঁজে আর ছেলে নেই? কত তো আড্ডা দাও বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের মধ্যে কাউকে পাও না? আমি কালই একবার উমার বাসায় যাব তো, আই—সি—আই—এর একজন ইঞ্জিনিয়ার ছেলে আছে ওর পাশের ফ্ল্যাটে, দু'বার বিলেত গেছে...

ওসব বিলেতবাজ পাত্র ছাড়ো। খাঁটি দিশি ছেলে দেখো।

আহা, তোমার সন্নিসিঠাকুরও তো বিলেত—ফেরত।

সে লোকটা বিলেতের গন্ধ মুছে ফেলেছে।

বিলেতের দোষ কী। তোমার যত....

কিছুই না। কিন্তু কমলা ইংরেজ আমলেও বিলেত—ফেরতের এত কদর ছিল না, এখন যতটা হয়েছে। বিলেত—ফেরত নিয়ে এখন হাই কম্পিটিশন, সুবিধে হবে না। তার চেয়ে দিশি পাত্র যোগাড় করা সোজা।

তাই দেখো না। তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার। মামা—মামির উদাসীন ভাব আমার ভালো লাগে না। শেষে দেখো আইবুড়ো থেকে থেকে লাবণ্য ঝরে যাবে, গালে মেচেতা ধরবে, তখন যার—তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। শ্যামা, তুই ভাবিস না রে, কাল থেকেই আমি লাগছি।

শ্যামা ম্লান হাসে।

বিকেলটা তবু ভালোই কাটল। সিনেমার পর রেস্টুরেন্টে খুব খাওয়াল শঙ্করদা।

শ্যামার ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে, সেই ছেলেটার কি বিয়ে হয়ে গেছে? তোমরা অন্য পাত্র খুঁজবে কেন। সেই তো বেশ ছিল। কিন্তু শ্যামার বড় লজ্জা করে।

শঙ্করদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, শ্যামা, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়লে সব মেয়েরই কিছু স্যুটার জোটে। তোমার তেমন কেউ নেই? আমি শুনেছি, তোমার অনেক স্যুটার।

শ্যামা চায়ের কাপে মাথা নিচু করে বলে, ছিল তো।

তাদের কাউকে পাত্তা দাওনি, না?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলে, না। তারপর হাসতে থাকে।

তোমার সবই ভালো, কেবল ওই একটাই ডিফেক্ট। তুমি ভারী ভীতু আর আনস্মার্ট।

কমলাদি ঝংকার দিয়ে বলে, আর স্মার্ট হয়ে কাজ নেই। যা আছে বেশ আছে। যারা নিজে বর খুঁজে বিয়ে করেছে তারা কিছু বেশি সুখে নেই।

তুমি বড্ড সেকেলে। শ্যামা, তোমার মত কী?

শঙ্করদা, আমি কিছু বুঝি না।

কেমন পুরুষ তোমার পছন্দ সে সম্পর্কে কখনও কোনো আইডিয়া করোনি?

আইডিয়া কি ধরা—ছোঁয়া যায়? আইডিয়া আইডিয়াই থাকে।

তবু বলো না।

কমলা রাগ করে বলে, বলে কী হবে। কোনো মেয়েই সে রকম পুরুষ পায় না ঠিক যেমনটি সে চায়, আবার যাকে পায় তাকে নিয়েও তার চলে যায়। ভাবে, আমি এ রকমটিই চেয়েছিলাম।

কমলাদি বেশ গম্ভীর মুখে বলছিল। শুনে শঙ্কর এক চোখে হেসে বলে, তা তুমি কেমন চেয়েছিলে?

কপট শ্বাস ফেলে কমলাদি বলে, তার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না।

যাকে পেয়েছ তাকে নিয়ে চলছে তো?

নিজে বুঝে দেখ।

বুঝেছি।

শ্যামাকে জ্বালিয়ো না। ওকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি, ওর তেমন কোনো পছন্দ—অপছন্দ নেই। ও সত্যিকারের ভালো মেয়ে।

শঙ্করদা শ্যামার দিয়ে চেয়ে বলে, সত্যি? কখনও ভাবী স্বামীর কথা ভাবো না? কখনও না?

শ্যামা একটু হাসে। ম্লান সেই হাসিটি তার। বলে, ভেবেছি।

আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে শঙ্কর, কেমন?

শ্যামা চোখটা একটু বোজে। শীর্ণ, কালো, দীর্ঘ একটি আবছা চেহারা দেখতে পায়। চোখ দু'খানা উজ্জ্বল এবং আবিলতাহীন। আস্তে করে বলে, তেমনি পুরুষ, যে খুব ভালোবাসে। খুব। কখনও দোষ ধরবে না আমার। আর সে নিজে খুব ভালো হবে। আর কিছু না।

শঙ্করদা হতাশ হয়ে পিছনে হেলান দিয়ে বলে, দূর! ও থেকে কিছু কি বোঝা যায়। ভাবলাম কী না জানি সব স্পেসিফিকেশন শুনব। যাঃ। এই বেয়ারা, বিল!

হতাশ হলেন?

হব না? ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার কিংবা স্মার্ট কিংবা সুন্দর—কত কী স্পেসিফিকেশন ছিল। তুমি সত্যিকারের ভালো মানুষ শ্যামা। ভালো মানুষকে আজকাল কী বলে জানো তো?

কী?

লেদ্রু। তুমি পারফেক্ট লেদ্রু।

কমলাদি বলে, ও ঠিক বলেছে। মেয়েদের পছন্দসই পুরুষ হওয়া অত সোজা নয়। ন্যাং ন্যাং করে অনেকেই ঘোরে পেছনে, জোর করে ভালোবাসা আদায় করে। কিন্তু পছন্দসই পুরুষ খুব রেয়ার।

শ্যামা কমলাদিকে ঠেলা দিয়ে বলে, কী যা—তা বকছ কমলাদি! শঙ্করদাও তো বলতে পারে পুরুষদের পছন্দসই মেয়েও আমরা কেউ নই।

কমলাদির চোখ মুখ সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ন হয়ে যায়, স্বামীর দিকে তীব্র চোখে চেয়ে বলে, বলুক না! বলে দেখুক!

সিগারেট মুখে শঙ্করদা হেসে হাতজোড় করে বলে, আমি বলিনি। বলছি না। আমি যেমনটি চেয়েছি তেমনটিই পেয়েছি। শ্যামা, তোমার কমলাদিকে যৌবনের কাননদেবীর মতো দেখতে নয়?

আমি তো দেখিনি। তবে অনেকটা সেইরকম মনে হয়। বলে হাসে শ্যামা।

দেখনি! বলে ভারী অবাক হয় শঙ্করদা, দেখনি কাননদেবীর ছবি?

কী করে দেখব? আমাদের সময়ে সে সব ছবি তো দেখানো হয় না।

একটু গুম হয়ে থেকে শঙ্করদা বলে, বাস্তবিক আমাদের কত বয়স হয়ে গেল! আমরা কৈশোরকালে কাননদেবীর গান গাইতাম, ছবি দেখতাম। তোমাদের সঙ্গে আমাদের জেনারেশন গ্যাপ বোধহয় এইটাই! আমাদের সময়কার ক্রেজ তোমাদের সময়কার বিস্মৃতি! আরে বাঃ!

কমলাদি বলে, ওঠো, আর কথা বাড়াতে হবে না। আমি আমার মতো দেখতে। কারও কৈশোরের হিরোইন হতে চাই না, আমি যেমন ঠিক তেমনি।

সবাই তা—ই কমলা। কিন্তু শ্যামা, তোমাকে ঠিক বোঝা গেল না। কমলাদির সামনে লজ্জা পাচ্ছ বলতে, বুঝতে পারছি। একদিন না হয় আমাকে গোপনে তোমার স্পেসিফিকেশনটা জানিয়ে দিয়ো।

ফেরার সময়ে ট্যাক্সিতেও একবার শ্যামার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেই লোকটা এখন কোথায়! জিজ্ঞেস করল না।

শঙ্করদা কমলাদির ওপাশ থেকে ঝুঁকে বলল, শ্যামা তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হব। তোমার স্পেসিফিকেশন থাকলে বলো, বিশেষ কাউকে পছন্দ থাকলে তা—ও বলো, নেগোশিয়েট করব।

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে কেবল। বলে, বিয়ের চেয়েও আমার একটা চাকরি বেশি দরকার।

কেন?

বাবার একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। আর একটাও বোধহয় শিগগিরই হবে, দাদার জন্য এত উদ্বেগ ইদানীং, মোনা ঠাকুর বলেছে হরিদ্বার বা হৃষীকেশ কোথাও সন্ন্যাসী হয়ে দাদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো আমরাও চললাম

বুনো মোষ তাড়াতে। এই শরীরে বাবার ওই সব দূর দেশে, পাহাড়—টাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে কী যে হবে! আমার সব সময়ে বাবার জন্য ভয়। কাল রাতেও স্বপ্ন দেখেছি। বিশ্রী স্বপ্ন।

ভেবো না শ্যামা।

ভাবনা কি কারও পোষ মানে? ভাবি, বাবার কিছু যদি হয় তবে আমাদের কী হবে! একটা চাকরি থাকলে তবু ভরসা থাকে।

কমলাদি মাথা নেড়ে বলে, চাকরি দিয়ে কী হবে রে মুখপুড়ি! মামার টাকা কিছু কম নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির অ্যাতো টাকা রয়েছে ব্যাঙ্কে, বাড়িটাও তো অনেকটা হয়ে গেছে। তোর চিন্তা কী?

আমার বিয়ে দিতেও তো খরচ আছে।

ওমা! খরচ তো ওই একটাই। মামা—মামির মতো এমন লাইট ফ্যামিলি ক'টা আছে! চাকরির চিন্তা ছাড়, তোর বিয়ে দিয়েও মামার অনেক থাকবে। মামা খুব কেপ্পন ছিল, জমিয়েছে অনেক।

যাঃ!

যাঃ বলিস না শ্যামা। মামার সারা জীবনের সবচেয়ে বড় খরচ ছিল খাওয়ার। খাওয়া—খাওয়া করে চিরকাল পাগল। আমকাতল, চিতলপেটি, ইলিশ ভাপে, মুড়োর ডাল, এইসব নিয়ে সারাটা জীবন খরচ করল, মামির গায়ে একটা গয়না বা দামি শাড়ি দেখলুম না। কেপ্পন বলব না তো কী? তোর বিয়েটাই বা মামা দেব—দিচ্ছি করে দিল না কেন? কত ভালো সব সম্বন্ধ এসেছিল! খরচের ভয় না তো কী?

কী সব বলছ? বলে ধমক দেয় শঙ্করদা।

ঠিকই বলছি। পাগলের কি চিকিৎসা নেই? দিলীপ তেমন পাগল তো ছিল না! একটু আনব্যালান্সড ছিল, তা রাঁচি বা লুম্বিনীতে রাখলে ভালো হয়ে যেত না? মামা গেল কবিরাজি আর হোমিয়োপ্যাথি করতে। মামি কত দুঃখ করেছে। শ্যামা, কিছু মনে করিস না, দিলীপকে খুঁজে পেতে এখন যে খরচ হবে তার অর্ধেক খরচে দিলীপের চিকিৎসা করে ওকে ভালো করা যেত। খাওয়ার খরচ ছাড়া মামা আর কোন খরচটা করেছে! নইলে বাড়িটা.....

শঙ্করদা ব্যগ্রভাবে প্রসঙ্গটা ঘোরায়, খাওয়া ছাড়া বাঙালি যে কিছু বোঝেই না। রোজ ট্রামে—বাসে রাস্তায়—অফিসে যত আলোচনা শুনি সবটাই খাওয়ার। পলিটিক্সের কথা, দর্শনের কথা, সব কথার মধ্যেই বাঙালি ঠিক খাওয়ার কথা তুলে ফেলবে। বাঙালি খাওয়ার চিন্তা নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে, খাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমোতে যায়। মামার দোষ কী?

কথা ঘুরিয়ো না। আমার রাগ হয়।

শঙ্করদা সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে, কার ওপর?

পুরুষ জাতটার ওপর। ভারী নিমকহারাম। আর স্বার্থপর।

শঙ্করদা শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

ওদের বিয়েটা ভালোবাসার নয়। কিন্তু ভালোবাসাটা ক্রমে জন্ম নিচ্ছে। ওদের কাছে গেলে সেই চাপা স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু শব্দ পাওয়া যায়। ওরা গতিময়, বহমান। শ্যামার মন চনমন করে। আলোকলতার শরীরে যখন আঁকশি জন্মায়, ছোট্ট ছোট্ট কোঁকড়ানো বাহুর মতো শূন্যে প্রসারিত হয়ে অবলম্বন ধরতে চায়। তেমনি শূন্যতার মধ্যে শ্যামা একজনকে খোঁজে। প্রকাণ্ড গাছের মতো সে। ঝড়ে—ঝাপটায় স্থির।

দিনটা ভালোই কেটে গেল শ্যামার। আবার কাটলও না। সারাটা রাত বুকের এক ধারটা, মনের এক ধারটা ফাঁকা লাগল। আজ রাতে সে স্বপ্ন দেখল না, কিন্তু ঘুমটাও তেমন হল না গভীর। সকালে খানিকটা বেলায় উঠে তার ক্লান্তি লাগল খুব। শিয়রের জানালা খুলতেই দেখল রোদ আজ বড় তেজি। ফটফটে। জানালার খাঁজ শূন্য। নয়ন বেশ কিছুদিন হল চিঠি রেখে যাচ্ছে না। নয়নের হল কী?

কাকভোর। পাখির ডাক সদ্য শোনা যায়। শিশির—ভেজা মাটির গন্ধ এখন বাইরে। উঠোন হলুদ গাঁদা আলো করে ফুটেছে। শিউলি জমেছে গাছের তলায়। দিনের আলো সব মানুষকেই বাইরে ডাকে।

অবিকল মুরগির ডাক শুনে সুকুলের ঘুম ভাঙল। তড়বড় করে উঠে বসে সে! বাবাকে নেড়ে উত্তেজিত গলায় বলে, বাবা ঘরের ভিতরে মুরগি ডাকছে গো।

জগদীশ পাশ ফিরে ঘুমচোখে সুকুলের দিকে চায়। সুকুলের চোখে—মুখে সব সময়ে একটা অবাক ভাব। নতুন মেলায় গেলে কচি—কাচাদের যেমন হয়, যতই দেখে মেলার বাহার ততই বাক্য হয়ে চেয়ে থাকে, তেমনই সুকুলের চারধারে দুনিয়ার মেলা লেগেই আছে। তার বিস্ময় ফুরোয় না। এই ভোরে বন্ধ ঘরের ভিতরে আবছায়ায় সুকুলের সরল মুখশ্রী দেখলে বুকের ভিতরে যেন ধূপগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আর সব ভুল পড়ে যায়।

জগদীশ মৃদু গলায় বলে, মুরগি নয় বাবা, ও নয়নখুড়ো।

সুকুলের গালের এক ধারে এঁড়ানির দাগ, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। চুল হামলে পড়েছে কপালে, কিছু উঁচিয়ে আছে, ভেঙে পড়েছে কান ঢেকে। সব মিলিয়ে এক যশোদাদুলালের ছবি।

নয়নখুড়ো? দেখি তো!

বলে মশারি তুলে লাফিয়ে নামে সুকুল!

এই ভোরে নয়নের ওঠার কথা নয়। বহুকাল ধরেই ঘুমহীনতার রোগ তার। মাঝেমধ্যে সে ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়। তার প্রিয় বড়ি সোনেরিল। ক্রমশ বড়ির মাত্রা বেড়ে এখন একসঙ্গে তিনটে—চারটে খায়, কখনও—বা তারও বেশি। তারপর একধরনের আচ্ছন্নতা নিয়ে পড়ে থাকে। খুব দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেও হিজিবিজি চিন্তা করে। কখনও সে ডাক্তার দেখায়নি।

জগদীশ সেই রাতের ঘটনার পর মাঝখানের দরজা বন্ধ রাখে। কেউটে দুটোর বিষদাঁতও কামিয়ে ফেলেছে। কিছু দেখার নেই। সারা রাত বিছানায় শুয়ে বসে, ঘরে পায়চারি করে আর সিগারেট খেয়ে কাটায় সে। মাথা অসম্ভব গরম হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। তখন দরজা খুলে উঠোনে যায়। তারা—ভরা আকাশ থেকে হিম ঝরে পড়ে, টুপটাপ পাতা খসার শব্দ। গাছেরা অলক্ষ্যে নিষ্পত্র হয়ে যাচ্ছে। আজকাল দু'—তিনটে দমকা বাতাসে গাছ ন্যাড়া হয়ে যায়। গভীর রাতে তারের যন্ত্রের মতো ডাকে ঝিঁ ঝিঁ, কাঁদে শেয়াল কুকুর, বাদুড় ডানা ঝাপটায়। জ্যোৎস্নায় ভোরের স্বপ্ন দেখে ভুল করে জাগবার ডাক দিয়ে ককিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে পাখি। তখন আকাশের পশ্চিম প্রান্তসীমায় চাঁদ নেমে ঝুলে আছে। নিষ্পত্র গাছের শেষ হলুদ পাতাটির মতো দুল দুল করছে ক্ষয়া ভাঙা চাঁদ, ভোরের প্রথম বাতাসেই খসে পড়ে যাবে। নিঃঝুম দৃশ্যটির দিকে চেয়ে থেকে নয়নের আচমকা মনে হয়, এখানে কেন পড়ে আছি? কী চাই আমি?

উত্তর তার জানা নেই। সে এমন অনেক কাজ করে যা কেন করে তা তার জানা থাকে না। এক রকম নেশারু ঘোরের মধ্যে সে চলে। রেগে যায়, উত্তেজিত হয়। কামুক হয়ে পড়ে। এক সময়ে মনে হয় শ্যামাকে ছাড়া সে আর একদিনও বাঁচবে না। পরমুহূর্তেই মনে হয়, শ্যামাকে দিয়ে কী হবে? তার কাছে চারদিক সব সময়েই আলো—আঁধারি। যেন বা তার জীবনযাত্রা কেবলই এক বনভূমির ছায়ায় ঢাকা আবছায়া পথটি বেয়ে। দিনের আলো আছে, আবার নেইও। কিছুই স্পষ্ট নয় সেখানে। এই অনন্তভূমিটি কোনোদিন ফুরোবে না, মনে হয়।

ভোরের প্রথম পাখিটি যখন ডাকল তখন পুবের আকাশ ছাইরঙা। একা ভূতের মতো নয়ন উঠোনে দাঁড়িয়ে। স্থির ও একাকী। পাখিরা ক্রমে চারধারে ডাকতে থাকে। তারপর ওড়ে। দূরে ব্রাহ্মসময় ঘোষণা করে মুরগির ডাক। সারা ভোর জুড়ে নানা শব্দের আজান ধ্বনিত হয়। তখন হিমে ভিজে গেছে নয়নের চুল, তার গা বরফ, চোখে শীতের অশ্রুবিন্দু। শরীরের বোধ তার নেই। সংবিৎ ফিরে পেয়ে নির্ঘুম, জ্বালা—ধরা চোখ সে একবার হাতের পিঠে মুছে নেয়।

ভোরে এই যে চতুর্দিকে জেগে ওঠা এটা টের পেয়ে নয়নের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক করে নড়ে যায়। যার ঘুম নেই, তার জেগে ওঠাও নেই। এই সুন্দর ভোরবেলাটির সঙ্গে নয়নের নিজস্ব চেয়ে থাকার কোনো মিল নেই। ভারী একা লাগে তার। ভয় করে সে কেন ঘুমোয় না?

ঘরে এসে নয়ন তার পার্সটা আর একবার খোঁজে। কোনায় কী খাঁজে যদি এক—আধটা বড়িও খুঁজে পাওয়া যায়। নেই। সে জানে। কাল রাতেও খুঁজেছে। হতাশ নয়ন আবার পায়চারি করে কিছুক্ষণ।

বিছানার চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়ায় নয়ন, র‍্যাপারের মতো। দরজা টেনে শিকলি দিয়ে বেরোবার আগে অবিকল মুরগির মতো একবার—দু'বার ডাক দেয়। পাশের ঘরে সুকুলের গলার স্বর পায়। বাবাকে ডেকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে সুকুল। জগদীশ উত্তর দিল।

উঠোনটা পার হয়ে সে রাস্তা ধরে। ঝোপঝাড়ের পাশে রাস্তাটা আঁকাবাঁকা কেমন পড়ে আছে। সাদা হাড়ের মতো রং। আবছায়া এখনও। পুবে কেবল ফ্যাকাশে রঙের ওপর লাল একটা ছোপ ধরেছে। গাছপালায় ঝুলে আছে অন্ধকার। পরিষ্কার ঠান্ডা বাতাস শ্বাসে ঢুকে বুক চিরে দিচ্ছে।

কোথাও যাওয়ার নেই। তার পথ সবদিকে খোলা। দূর থেকেই মোনা ঠাকুরের পুরনো মন্দিরের ওপর জাপানি ছবির মতো একটা অশ্বত্থচারাকে আকাশের গায়ে আঁকা দেখা যায়। পৃথিবীর সব মন্দিরের গায়েই বোধহয় অলক্ষ্যে অশ্বত্থচারা জন্মেছে এখন। গভীর শিকড় নেমে যাচ্ছে মন্দিরের অভ্যন্তরে নালী ঘায়ের মতো। মোনা ঠাকুরদের দিনকাল শেষ হয়ে এল। খামোখা আল টপকাবার পরিশ্রম। দরকার নেই। অশ্বত্থের চারাটি মুখ উঁচিয়ে তো বলেই দিচ্ছে, শেষ শুরু হয়ে গেছে। দেরি নেই।

নয়ন নাবাল মাঠটি থেকে মন্দিরের চত্বরে উঠে আসে। নির্জন। কেবল পাখির ডাক, আর পতনশীল পাতার শব্দ। একবার সে মন্দিরটার মুখোমুখি দাঁড়ায়। লোহার গুল বসানো ভারী দুটো কাঠের পাল্লা বন্ধ। প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে।

মাটিতে পড়া ফুলে পুজো হয় না। রাতে তাই শিউলিতলায় কাপড় বিছিয়ে রাখে তারা। সকালে কুড়িয়ে নেয় রাশি রাশি ফুল। শিউলিতেই ভরে যায় সাজি। তারপর স্থলপদ্ম আর জবা।

স্থলপদ্ম এ সময়টায় রাশি রাশি ফোটে। নিচু ডালগুলো শেষ করে তারা আঁকশি দিয়ে উঁচু একটা ডাল নুইয়ে আনছে। ফুলটা এসেও গেছে আঙুলের ছোঁয়ায়। আর একটু...একটু....। টুপ করে একফোঁটা হিম শিশিরের জল তার গালে পড়ল। হাসল তারা। ডালটা ছেড়ে দিয়ে আঁচলে গাল মুছল। শীত করে তার। বড্ড শীত করে। পদ্মটা পাড়ল না তারা। থাক একটা—দুটো পদ্ম। গাছের ফুল গাছে থাক।

কুয়োর পাড়ে জবাগাছটা ভিজে শরীরে দাঁড়িয়ে। ঝুপসি। ফুল তুলবার আগে তারা এই আবছায়া ভোরের আলোতে কুয়োয় ঝুঁকে জল দেখল। জল নীচে নেমে গেছে অনেক। সেই কোন পাতালে একটা গোল আয়না বসানো, তাতে ফিকে ফিরোজা রং। স্থির জলে তারা নিজের ছায়া দেখল। কিছু বোঝা যায় না। না রং, না মুখ—চোখ। একটা ভূত যেন সে। এই ভোরবেলা ঘুম থেকে সদ্য উঠে তাকে কেমন দেখাচ্ছে? কে জানে। তাদের ঘরে একটা বড় আয়নাও নেই যে দেখবে। কাঠের আয়না, তাতে আবার ঝাঁপ ফেলার বন্দোবস্ত আছে। সেই ঢাকনার ওপর ফুল পাতা পাখি আঁকা, লেখা—সুখে থাকো। মরি মরি, কে যে আয়নাটা কিনে এনেছিল! সেই সুখের আয়নার ঢাকনা খুললে ঢেউখেলানো কাচে নিজের মুখখানা দেখে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। আজ পর্যন্ত কম দিনই সে নিজের কোমর পর্যন্ত প্রতিবিম্ব দেখেছে। যদি কখনও দিন পায় সে, একটা বড় আয়না কিনবে। নিজের দিকে চেয়ে বসে থাকবে। নিজের কত কী দেখার থাকে, কেউ বোঝে না।

সবার আগে বাবার গুরুপুজো, চক্রের দিকে চেয়ে ধ্যান, জপ তারপর বিনতি প্রার্থনা। ততক্ষণ বাবা এদিকে আসবে না। তারা নিশ্চিন্তে আবছায়া ছায়াটির দিকে চেয়ে থাকে। ছায়ার পিছনে আকাশ কী উঁচুতে!

সে কি খুব রোগা? ছিপছিপে, না রোগা? কোনটা বলবে তাকে মানুষ? কালো, না শ্যামবর্ণ? মুখখানা কেমন তার?

অনেক পাখি—পক্ষী আর মুরগির ডাক সে শুনছিল এতক্ষণ। এ সময়ে ওরা তো ডাকবেই। চমকায়নি। হঠাৎ শুনতে পেলে, মন্দিরের চাতালে, কী বারান্দায়, কোথায় যেন খুব কাছেই একটা মোরগ ডাকছে।

ডাকার কথা নয়। কাছাকাছি মোরগ পোষে না কেউ। পুষলেও মন্দিরে আসতে পারে বলে ছাড়ে না, বাবা শুনলে...

তারা দুই হাতে তালি দিয়ে বলল, হুশ।

আবার মুরগি ডাকল। পরিষ্কার ডাক। মন্দিরের বারান্দাতেই উঠে এল বুঝি! তারা গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল। ফুলকপি উঁকি মারছে সদ্য, খেতের ঢিবিগুলো পেরিয়ে বেড়ার ধারে এল। বলল, হুশ।

দেখা গেল না। মন্দিরের চাতাল ফাঁকা, বারান্দা শূন্য।

আড়াল থেকে আবার মুরগি ডাকে। আনন্দিত ডাক।

তারা বেড়াটা টপকে পার হয়। পাখির মতো উড়ে আসে মন্দিরের বারান্দায়। হাততালি দিয়ে 'হুশ হুশ' শব্দ করে ছোটে। প্রথমটায় দেখতে পায় না কিছু। কিন্তু মনে হয় গোল বারান্দাটা দিয়ে একটা পায়ের শব্দ মন্দিরের দেয়ালের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা হলুদ জামার অংশ চকিতে দেখা গেল। মিলিয়ে গেল দেয়ালের ওপাশে।

তারা দাঁড়িয়ে সতর্ক গলায় বলে, কে?

উত্তর নেই।

আমি কিন্তু লোক ডাকব।

নয়ন বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে ঘাসে নামে। অন্ধকার আর নেই। উঁচু গাছের মগডালে প্রথম আলোর লাল কণাটি এসে পড়েছে। আলো ফুটবার সময়টি বড় সুন্দর। ফুল যেমন ফোটে। তার পর থেকে শুরু হয় দিন। দিন তারার ভালো লাগে না। মানুষ জেগে উঠলেই পৃথিবীটা নোংরা হয়ে যায়।

নয়ন উঁচু বারান্দার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। মেয়েটার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। শ্বাসের শব্দ। নয়ন অপেক্ষা করে। পিছনে তাকায় না। উদাস চোখে পুব দিকে চেয়ে থাকে। তার শরীরে ঘুমহীনতার জ্বালা। শরীর বুঝি—বা একটু ক্লান্ত। তার খোলা শরীরের ওপর দিয়ে শীত গ্রীষ্ম চলে যায়, চলে যায় দিন রাত। তবু একটুও ঘুম আসে না। সোনেরিল ফুরিয়ে গেছে। আনা হয়নি। ধ্যুৎ তৈরি!

মেয়েটা এগিয়ে আসে। থমকায়।

একটু চুপ। নয়ন ফিরে তাকায় না।

কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

সিগারেটের একটা গোল ধোঁয়া জট খুলতে খুলতে নিথর বাতাস বেয়ে উঠে আসে।

তারা ভয় পায়। কে?

নয়ন ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল। তেলহীন মুখ—চোখ তার, রাতে ঘুমোয়নি বলে শরীরের রস টেনে গেছে। হাসতে গিয়ে নীচের ঠোঁটটা চড়াৎ করে ফেটে গেল। জিভে রক্তের নোনা স্বাদ পায় নয়ন। তার চুল রুক্ষ, চোখের কোলে কালি। মেয়েটার ভয় পাওয়ারই কথা।

সে বলে, আমি নয়ন রায়। সুকুলদের বাড়িতে—

ও। তা এখানে কেন?

মায়ের স্থান। আসতে তো বাধা নেই।

তারা কী বলবে ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বলে, একটা মুরগি ডাকছিল এদিকে, সে কি আপনি?

নয়ন মাথা নাড়ে।
কেন ডাকছিলেন ওরকম। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।
এমনিই। খেয়াল হল।
তারা একটু চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ আঁচল মুখে তুলে 'খুক' করে হেসে ফেলে। সামলে বলে, কাল সুকুল বলছিল বটে একজন হরবোলা এসেছে তাদের বাড়িতে। এতক্ষণে বুঝলাম সে আপনিই তবে।
আমিই।
সকালের আলোতে মেয়েটাকে সাদাসিধে দেখাচ্ছে। তেমন কিছু দেখার নেই। তবে কিনা যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। তাই মেয়েটির শরীর লাউডগার মতো ডাঁটো, চামড়ায় ঘামতেলের মতো চিকচিক। সবচেয়ে সুন্দর তার দীর্ঘ চুল। মস্ত একটা এলোখোঁপায় বেঁধে রেখেছে। নয়ন ঊর্ধ্বমুখে মেয়েটিকে ক্ষুধার্ত চোখে একটু দেখল, বলল, আমি অনেক ডাক ডাকতে পারি।
তারা শ্বাস ফেলল। বলল, ওসব ডেকে কী হয়?
মানুষ চমকে যায়।
এই কথা বলে, একটু অর্থপূর্ণ হাসে।
তারা অস্বস্তি বোধ করে বলে, বাবা এক্ষুনি আসবে।
আসুক না।
তারা আবার কথা হারিয়ে ফেলে। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে একটু। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে, ফুলের সাজি কুয়োপাড়ে ফেলে এসেছি। ওই যাঃ! যদি কাকপক্ষী ছুঁয়ে দেয়!
বলে আবার পাখির মতো উড়ে যায় সে। পালায়।
নয়ন বারান্দায় তেমনি ঠেস দিয়ে সিগারেটটা শেষ করে। বাগানে মেয়েটি এখন একা। চারদিকে ঝোপঝাড়, নির্জনতা। ইচ্ছে করলেই পিছু নিতে পারে নয়ন। কেউ লক্ষ করবে না। লক্ষ করলেই বা কী? নয়ন গ্রাহ্য করে না। শীতের সুন্দর বাগানে মেয়েটিকে জ্বালানো যেত। কিন্তু আজ তার সে রকম কোনো ইচ্ছে নেই। কোনোদিন ঘুমের জন্য দুঃখ করে না সে। না ঘুমোনো তার অভ্যাস। কিন্তু আজ হঠাৎ একটু ঘুমের জন্য তার বড় তেষ্টা পায়। দাঁড়িয়ে সে ঘুমের কথা ভাবে। তার কেন ঘুম নেই?

লোকটা চাষা না ভদ্রলোক বোঝা যায় না। মাল দিয়ে কাপড় পরে খালি গায়ে কেমন মাটি কোপাচ্ছে দেখ। কী তেজ শরীরে, বাঁট পর্যন্ত কোদাল গেঁথে যাচ্ছে মাটিতে। হুবহু চাষার মতো মুখে নাকে হুমুস শব্দ শ্বাস ছেড়ে উল্টে দিচ্ছে গভীর চাপড়া। রোদ এখন তেজি। শরীরটার থাকে—থাকে পেশি সেই রোদে ঝলসায়। উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া ছেড়েছে, বেলা বাড়ল। লোকটার গায়ে ঘাম, থুতনির কাছে এক ফোঁটা দুল দুল করছে। মাটির চাপড়াগুলো রোগা হাতে একটা খুরপি দিয়ে ঠুক ঠুক করে ভাঙছে সুকুল। তার গায়ে পুরোহাতা হলুদ সোয়েটার।
মেহেদির নিচু বেড়াটা ডিঙিয়ে নয়ন জমিতে নেমে আসে। একটু দূর থেকে দেখে। সুকুলের রং ফরসা, নরম—সরম গা, মুখখানা লম্বাটে ছাঁদের, চোখ দুটো দিঘল। জগদীশের সঙ্গে কোনো মিল নেই। জগদীশের শরীর চৌকো, মুখ চৌকো, চোখ গর্তে, গায়ের রং কালোই, তবে মিশমিশে নয়। সুকুল হয়তো তার মায়ের চেহারা পেয়েছে। যদি পেয়ে থাকে তবে বলতে হবে, ওর মা সুন্দরীই ছিল।
নয়নের দীর্ঘ ছায়াটা সুকুলের গা ছুঁতেই সুকুল মুখ ফিরিয়ে চেঁচাল, নয়নখুড়ো।
উম।
সকালে তুমি মুরগির ডাক ডেকেছিলে?
হুঁ!
আমাকে শিখিয়ে দাও।

দেব।

বেড়ালের ঝগড়াটা শিখিয়ে দাওনি কিন্তু। ওই যে দুটো বেড়ালে যখন ঝগড়া হয়, যখন গায়ে জলের ছিটে দিলে একজন আর—একজনকে বলে, তুই আমার গায়ে মুতলি, অন্যটা বলে, তুই আমার গায়ে মুতলি, কী রকম করে বলে যেন? ফ্যাঁ—ও—ফ্যাঁ—অ্যা—ফ্যাঁস ফ্যাঁস—বলো না।

জগদীশ একবার তাকিয়ে তার কাজ করে যায়। কথা বলে না। কেবল সুকুলকে ধমক দেয় একটা, আমার কোপানো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, তোমার চাপড়া ভাঙা পড়ে রইছে। থাক তবে তোমার পালা রোয়া হবে না—

সুকুল তাড়াতাড়ি চাপড়া ভাঙতে ভাঙতে হি হি করে হাসে। বলে, পোড়েলদের বুড়ো কাল বলছিল, কী কাণ্ড বাবু, এই দিনে এমন কোকিল ডাকে কেন রে? এত কোকিলের মচ্ছব লাগল কেন। কী জানি বাবু, কোনো অলুক্ষুণে ব্যাপার। জানে না তো যে, তুমি ডাকো।

জামগাছটার গোড়ায় কিছু ঘাস। গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে নয়ন। একটু অন্যমনস্ক। রোদে পাথুরে লোকটা মাটি উলটে দিচ্ছে। ও রাতে কী নিঃসাড় ঘুমোয়! তবে কি পরিশ্রমই ঘুমের ওষুধ? না কি পুত্রস্নেহ? স্বাস্থ্য নয় তো? একটা শ্বাস ফেলে নয়ন। কী ভাবছে আবোল তাবোল! সবাই—ই তো ঘুমোয়। ঘুম আসে বলে। তার আসে না।

পলকের মধ্যে কাঠা দেড়েক খেত কুপিয়ে ফেলে জগদীশ। এখন খেতের শেষে দাঁড়িয়ে গামছায় ঘাম মুছছে। পায়ের কাছে দাঁড়ানো কোদালখানা। হেসে বলল, হেরে গেলি সুকুল। ঠুক ঠুক করে এখন সারাদিন লেগে যাবে তোর।

গামছায় গা মুছতে মুছতে জগদীশ এসে পাশে বসল। কোমর থেকে বিড়ির বান্ডিল বের করল। আর লাইটার। বলল, কোথায় গিছিলেন?

ঘুরে এলাম।

আলায়—বালায় ঘুরলেন তো অনেক। কী খুঁজছেন আসলে ?

নয়ন বলল, আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেওয়ার কথা ছিল আপনার।

জগদীশ চুপ করে থাকে। সে রাতে নয়নকে চড় মারার পর থেকেই বোধহয় তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। নয়নের সব কথার উত্তর সে দিচ্ছে না দু'দিন। বিড়িটা ধরিয়ে খুব আরামে দীর্ঘ টান দিয়ে ঘন ধোঁয়া আস্তে ছেড়ে দিল। আরামের কাশি কাশল খুক খুক করে।

শিখবেন?

নিশ্চয়ই।

তবে গুরু বলে মানুন।

নয়ন একটু তাকায়, মানে?

জগদীশ হাসে, এসব গুপ্তবিদ্যা, কাউকে শেখানো যায় না অমনি। যদি শিষ্য হয় তবে শেখানো চলে।

নয়ন একটু হেসে বলে, আপনারা সবাই এত গুরু গুরু করেন কেন? মোনা ঠাকুরও গুচ্ছের গুরুতর কথা বলে গেল সেদিন। ব্যাপারটা কী!

জগদীশ দূরের দিকে চেয়ে বিড়িটা শেষ করে। তারপর হঠাৎ একটা শ্বাস ফেলে বলে, শহরের মানুষ গুরুর মর্ম কমই বোঝে। সেখানে সবাই গুরু। গাঁ—গঞ্জের লোকেরা গুরু মানে, কারণ, তারা প্রকৃতির নিয়ম জানে। নিয়মই বলে দেয়, গুরু ছাড়া কিছু হয় না। উটকো লোককে কেউ কিছু শেখায় না। একটা আধবুড়ো নোংরা অশিক্ষিত লোককে গুরু মেনে, একবছর তার পদসেবা করে তবে আমি শিখেছিলাম। সে ভারী কষ্ট। লোকটাকে ঘেন্নাও হত। হেগে কাপড় ছাড়ত না, দাঁত মাজত না, গায়ে চিমসে গন্ধ, চোখে কেতুর, কথায় কথায় মেজাজ নিত, জাতেও জলচল না। তবু লোকটার পিছনে ঘুরতাম নেশাখোরের মতো। মাঠে—ঘাটে ছিল তার সাপের বাগান, যেতে যেতে ফুল তোলার মতো বিষধরদের টুকটাক তুলে নিত ঝাঁপিতে। না—কামানো সাপ বের করে সকাল—বিকেল একা একা খেলত। তার সেই কাণ্ড দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। হ্যাঁ,

গুরু বলে। লোকটার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তবু আমি মাঝে মাঝে পাথরঘাটায় তার কবরের কাছে যাই সুকুলকে নিয়ে। বসে থাকি কবরটার পাশে। বেশ লাগে।

নয়ন চুপ করে থাকে।

জগদীশ একটু হেসে বলল, গুরু মানতে বলায় রাগ করলেন?

নয়ন মাথা নেড়ে বলল, না। তবে আমার গুরু—ফুরুতে বিশ্বাস নেই।

জগদীশ বলে, তা হলে শেখানো চলে না।

কেন?

গুরু না মানলে বিদ্যেটা একদিন অবিদ্যে হয়ে দাঁড়াবে। গুরু যেন রক্ষাকবচ, সে না থাকলে একদিন বিষধরই খাবে আপনাকে। গুরুর দেওয়া নিষেধ বারণ আছে, সে—সবও শ্রদ্ধার সঙ্গে মানতে হবে। নইলে বিদ্যে কিছু না। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি নিয়ম ভাঙতেই জন্মেছেন। আপনি বিদ্যে নিয়ে বিপদ করবেন।

নয়ন একটু হাসে। বলে, তা হলে শেখাবেন না?

জগদীশ মাথা নাড়ে, না। বললাম তো আপনাকে কিছু শেখানো বড় বিপদ। রাতবিরেতে উঠে যদি সাপ—সাপিনীর হরগৌরী দেখতে চান তা হলেই হয়ে গেল।

নয়ন একটা ঢিল ছুঁড়ে বলে, ঠিক আছে। আমি নিজেই শিখে নেব।

জগদীশ অবাক হয়, নিজে শিখবেন! কী করে!

নয়ন হাসে, কায়দাটা খানিকটা বুঝে গেছি। একটু প্র্যাকটিস দরকার। ও হয়ে যাবে।

জগদীশ গম্ভীর গলায় সতর্ক করে দেয়, ও কাজও করতে যাবেন না। ও বড় হীন জীব। ওস্তাদ ছাড়া আর সবাই তার বধ্য। এ কেবল একটা দুটো কায়দা নয়, এ হচ্ছে একটা শাস্ত্র। সর্পচরিত্র জানা কি শুধু একটা—দুটো সাপ ধরতে দেখেই হয়ে যায়?

দেখা যাক।

জগদীশ মাথা নাড়ে, ও হয় না। আপনি না শিখে ধরতে গেলে হয় নিজে মরবেন, নয়তো সাপকে মারবেন। দুটোই খারাপ।

আপনি সাপ মারেন না?

উরেব্বাস রে! মারতে পারি।

কেন, মারলে কী হয়?

যারা শাস্ত্র জানে তারাই জানে মারতে নাই কেন? প্রকৃতির কোনো জীব ফেলনা নয়। মারতে শুরু করলে তো সবই মেরে ফেলতে পারি, তখন মাথায় রক্তক্ষরণের ওষুধ আসবে কোত্থেকে?

ওটা যুক্তি নয়। সংস্কার।

তা হবে। আমি অত ভাবি না। গুরুর নিষেধ আছে, তা—ই যথেষ্ট। জলে ডাঙায় অন্তরীক্ষে জীব চলে—ফিরে বেড়ায় গুরুর দয়ায়। বেড়াক।

তবে ধরেন কেন?

ধরি তাকে জানবার জন্য। চেনা—জানা কী পাপ? যেমন মানুষ চিনি, তেমনি সাপও চিনি, পাখি—পক্ষী চিনি। কত কী জানার আছে পৃথিবীতে। সুকুলবাবা, তোমার কি হাত ব্যথা করছে?

চিকন গলায় সুকুল উত্তর দেয়, না তো।

চলে এসো বরং। বাকিটা বিকেলে কোরো। তোমার তো নরম সরম হাত পা, সইবে না। রোদটাও তেজালো।

সুকুলের সুন্দর মুখখানা তেতে লাল, মুখে হাসি, হাতের চেটোয় রোদ থেকে চোখ আড়াল করে চেয়ে বলল, দাঁড়াও না, কামিনী গাছটা অবধি করি, তারপর এসে নয়নখুড়োর কাছে ডাক শিখব।

জগদীশ মুখটা ফিরিয়ে নয়নকে বলে, শুনছেন?

কী?

ও ডাক শিখবার জন্য আপনাকে গুরু বলে মেনেছে। আপনি কিন্তু সাপ ধরতে শেখার জন্য গুরু মানছেন না।

নয়ন হালকা গলায় বলে, কাউকে গুরু মানা আমার গুরুর নিষেধ।

কে গুরু?

কার্ল মার্কস।

জগদীশ একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে, নামটা চেনা—চেনা লাগছে। শহরে যখন বসত ছিল একসময়ে তখন শুনতাম বটে নামটা। অনেকদিন শুনিনি।

ঠাট্টা কি না ধরবার জন্য নয়ন জগদীশের মুখটা দেখল। তার ভাঙা চৌকো মুখে কোনো ভাব প্রকাশ পায় না। একটা ভালোমানুষি বা বোকামি সেখানে স্থায়ী বাসা নিয়েছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে বলল, তাঁর চেলা একসময়ে আমিও ছিলাম। বঙ্গবাসীতে ছাত্র ফেডারেশন করতে বছরখানেক তাঁরও চেলা ছিলাম। তারপর শরীর ডাক দিল। তখন কোঁৎ পেড়ে বিশাল ওজন তুলতাম, বানরের মতো রিংয়ে ঘুরতাম, অনায়াসে করতাম গ্রেট সার্কেল, উঁচু—নিচু প্যারালাল বার, রোমান রিং, ভল্টিং বক্স, কত কী করতাম! ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন লাহিড়ীদা। গুরু। তিনি ডেকে বললেন, তোমার হবে হে। সব ছেড়ে—ছুড়ে লেগে পড়ো। কাছের গুরু দূরের গুরুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল আমাকে। নইলে মার্কস সাহেবকে নিয়ে একটা তোলপাড় করার ইচ্ছে ছিল আমার।

নয়ন শান্ত গলায় বলে, আমার ইচ্ছেটা এখনও আছে।

ভালো। বিশ্বাস থাকলেই ইচ্ছে জোর পায়। লেগে থাকুন। সাপখোপ নিয়ে ভাববেন না।

নয়ন ঠান্ডা কৌতুকের গলায় বলে, আপনি আমাকে ভয় পান।

জগদীশ অবাক গলায় বলে, ভয় পাই?

নয়ন আস্তে হাত বাড়িয়ে জগদীশের মাংসল প্রকাণ্ড কাঁধে রাখে, পেশিবহুল হাতখানায় হাত বুলিয়ে বলে, এই বিশাল শরীর, শাবলের মতো হাত, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন? সেই রাতে চড় কষালেন, আমি জবাবি কিছু করিনি, চড়টা মেনেই নিয়েছি। আপনিও জানেন আমাকে ওই দু'হাতে পিষে মেরে ফেলা যায়, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন?

প্রকাণ্ড চেহারার জগদীশ কথাটা শুনে কেমন একটু কুঁকড়ে যায়, তার চোখে—মুখে অস্বস্তি স্পষ্ট লক্ষ করা গেল। বিড়িটা নিভে গিয়েছিল, আবার ধরিয়ে বলল, কীসে বুঝলেন?

নয়ন এক ধরনের ঠান্ডা হাসি হাসে। বলে জগদীশবাবু, আপনিও জানেন, আমিও জানি। আপনি চড়টা মারলেও ভয়টা আপনার উড়ে যায়নি।

জগদীশের বিড়িটা ধরেনি। দু'—একবার টিপে—টুপে সেটা ফেলে দিল সে। বলল, ঘরের দরজা বন্ধ রাখি বলে বলছেন? তা আপনার বিদঘুটে কাণ্ড—কারখানাকে ভয় পেতেই হয়। পাগুলে কাণ্ডকে কে না ভয় করে?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে, আর কোনো ভয় নেই?

আবার ভয় কীসের?

ভয় যে কীসের তা কি আমি জানি? তবে লোকে ভয় পায় দেখেছি।

ওটা বাড়িয়ে বলছেন।

হবে। নয়ন উদাস গলায় বলে। তারপর হঠাৎ জগদীশের দিকে চেয়ে বলে, আপনার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে?

না। কেন?

আমার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করে। কতদিন যে ঘুমোইনি।

ঘুমোননি কেন?

ঘুম আসে না। এদিকে তো কোথাও সোনেরিল বড়িও পাওয়া যাবে না।

বকখালিতে ওষুধের বড় দোকান আছে। দেড় ক্রোশ। ওষুধ ছাড়া ঘুম আসে না?

না। ঘুমোতে পারি না। ইচ্ছে করে পড়ে কাঠ হয়ে ঘুমোই। স্বপ্ন দেখব না, চিন্তা করব না, একবার ওরকম ঘুম ঘুমোতে পারলে একটানা কয়েকদিন পড়ে থাকতাম।

জগদীশ একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, তারপর বলে, ঘুমোন না বটে। তাই সারারাত পাশের ঘরে মাঝেমধ্যে পায়ের শব্দ শুনি। জেগে থেকে করেন কী? শরীরে আবল্যি আসে না?

আসে। সারারাত কী যে যন্ত্রণা! বড় একা লাগে। একটা ভয়ঙ্কর কিছু করতে ইচ্ছে করে। রেগে যাই। তাড়ি, বাংলা, সব খেয়ে দেখেছি। ঝিমুনি আসে। কিন্তু সে ঠিক ঘুম না।

আমার কাছে মোদক আছে। খেয়ে দেখবেন?

দেখেছি। যত নেশা সব করেছি। কিন্তু নেশা তো ঘুম নয়।

ভারী মুশকিল দেখছি।

আগে কষ্ট হত না। আজকাল হয়।

দুপুরে অনেকক্ষণ ডাক শিখল সুকুল। বারান্দায় বসে। ক্লান্তিকর, তবু অনেক রকম ডাক ডাকল নয়ন। কুকুর শেয়াল বেড়াল পক্ষী। নানাজনের গলার স্বর নকল করল। সুকুলের চোখ চক চক করল, মুখে—চোখে ভীষণ কৌতূহল।

আরও ডাকো। সে বলল।

সুকুল, একদিন সব শিখতে নেই।

সুকুল জেদ ধরে, ডাকো না, শুনি।

এ সব শিখে কী হয়?

আমি শিখব। আমি হরবোলা হয়ে যাব।

কেন?

রাস্তা দিয়ে অনেক ডাক ডাকতে ডাকতে যাব, তুমি যেমন যাও। লোক বুঝতেই পারবে না যে সুকুল যাচ্ছে। চমকে উঠবে।

লোকে চমকাতে ভালোবাসে না সুকুল। দেখ, আমাকেও কেউ ওই জন্যই ভালোবাসে না।

আমি বাসি। খু—উ—ব।

নয়ন হাসে। হাসতে তার কষ্ট হয়। ঠোঁটে রক্ত জমে আছে। চোখে জ্বালা। সকালে একহাঁড়ি খেজুর রস নামিয়েছিল জগদীশ। অনেকটা খেয়েছে সে। শরীর ঠান্ডা হয়নি। জ্বরের মতো লাগে। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে সে একটু চোখ বোজে।

এই নয়নখুড়ো, ঘুমোচ্ছো যে! চোখ খোলো, বলে সুকুল তার চোখে আঙুল ঢোকাতে চেষ্টা করে। চোখের পাতা ধরে টানে।

নয়নের চোখ খুলতে ইচ্ছে হয় না। বাইরে একটা সাদা চাদরের মতো রোদ আজ। চেয়ে থাকলে চোখ জলে ভরে আসতে চায়।

'সুকুল' বলে বেড়ার আগলের ধার থেকে কে ডাকল। মেয়ে গলা। সুকুল টপ করে উঠে দুদ্দাড় দৌড়ে গেল।

বেড়ার ওপাশে তারা দাঁড়িয়ে। হাতে কলাপাতায় ঢাকা একটা কাঁসার বাটি। স্নানের পর এখন চুল এলো। পরনে একটা লাল টুকটুকে শাড়ি। মোম—মাজা শরীর। বোধহয় কোথাও কোনো ব্রণ বা গোট নেই।

দাঁতগুলো বড় ঝকঝকে। কপালে একটা তেলসিঁদুরের বড় টিপ। চোখে কাজল দিয়ে থাকতে পারে, চোখ দুটো বড় ডাগর দেখাচ্ছে দূর থেকেও।

তারা দাঁড়াল না। সুকুলের হাতে বাটিটা দিয়ে বলল, একসময়ে চুপ করে খেয়ে বাটিটা দিয়ে আসিস।

চলে যাওয়ার আগে একবার সজল বিদ্যুৎ হেনে গেল নয়নের দিকে। এক পলক মাত্র। তারপরই পিছন ফিরে বাঁশঝাড়ের আড়াল হয়ে গেল।

কী সুকুল? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

সুকুল বাটিটা নাকের কাছে তুলে গন্ধ নেয়।

নতুন গুড় গো! দেখ, এখনও গরম। জ্বাল দিচ্ছিল সকাল থেকে। খাবে?

না, তুমি খাও। মেয়েটা মোনা ঠাকুরের মেয়ে না?

সুকুল মাথা নাড়ে, তারা—মা।

মা কেন?

আমি মা ডাকি। তারা—মা ডাকতে শিখিয়েছে। সকলের সামনে ডাকি না তো, আড়ালে ডাকি।

কেন মা ডাকতে শিখিয়েছে সুকুল?

ইচ্ছে। দেখ, তারা—মা কাল পিঠে পায়েস দিয়ে যাবে। যা হয় ওদের সব দিয়ে যায় চুপি চুপি।

কেন?

আমাকে ভালোবাসে তো। পাঁচজনের সামনে দিলে নিন্দে হবে।

নিন্দে হবে কেন?

কী জানি! লোকে বলে বাবা নাকি তারা—মাকে বিয়ে করবে। ধ্যাৎ, বাজে কথা। বাবা বিয়ে করবেই না।

নয়ন একটু হাসে। অন্ধি—সন্ধি একটু—আধটু বুঝতে পারে সে। কোথাও একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে। যেখানে মানুষ সেখানেই ঘোঁট।

ভুঁইচাষ বড় প্রিয় জগদীশের। এ সময়টায় রবিশস্যের চাষ। তা থেকেও কিছু আয় হয়।

চক্ষুলজ্জা বড় জিনিস। সে চাষা নয়, জমির মালিক। আধা ভদ্রলোক। কাজেই, অতএব বর্গাদার রাখতে হয়েছে। ছাতা মাথায় পিছু পিছু ঘুরছে সে।

চাষিটা রোগা—ভোগা বটে। ফাল তেমন গভীরে ঢুকছে না। এই যে ওপরের মাটি এ হল গে একশো বছরের পুরনো। ওপরে হাত—তিনেক পুরু জমি উলটে—পালটে আবহমান চাষ চলে আসছে। এই পুরু আস্তর সরালে নীচে আছে সেই কুমারী। ওপরের এই বুড়ি—বিয়োনি জমি দিয়ে আর কতকাল চলবে! অনাবাদি ফেলে রেখে আর কেমিক্যাল সারে এ জমি পানসে হয়ে আসছে। ফসলের ঢল নেই। গভীর গর্ত খুঁড়ে সেই অনূঢ়া ভুঁইয়ের রূপ দেখতে ইচ্ছে করে তার। উঠে এসো গো কুমারী, দেখি তোমার কালচে সোনা রং, লাঙলের ফলে ঘুচে যাক লজ্জা, ঢল দাও ফসলের। তার ইচ্ছে করে পৃথিবীর ওপর থেকে ওই পুরু বুড়ি—বিয়োনি আস্তরটা তুলে ফেলে। কিন্তু তা হয় না। তত জোর লাঙলের ফালে নাই।

চাষিটা মরকুটে শরীর ভর দিয়ে ঠিকমতো গাঁথতে পারছে না। চাঙড় উপড়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন হচ্ছে না।

তামাক খাওগে। বুঝলে! জিরিয়ে ঠান্ডা হও, আমি দেখছি। বলে হাঁক দেয় সে। গায়ের পিরাণটা খুলে ফেলে, মাল দিয়ে কাপড়টা পরে নেয়, গামছা বাঁধে কপালে। জমিতে নেমে যায়।

জিনিসটা বড় ভালো লাগে তার। লাঙলটা যখন সে মাটিতে গাঁথে তখনই সে মাটির গভীর নরম মায়া টের পায়। ঠিক যেন মেয়েমানুষের শরীর। পায়ের আঙুল উঠে দু'খানা লোহা—হাতে সে চেপে ধরে হাতল। রি রি করে কেঁপে ওঠে মাটি। আনন্দে, যন্ত্রণায়। উপড়ে আসে গভীর শীতল কালচে সোনা মাটি। ভারী এক রকমের তৃপ্তি পায় সে। 'অ—ড়—ড়—ড়' করে বলদ দুটোকে তাড়া করে। তার হু—হুংকারে বলদ দুটো নিষ্পেষিত ঘাড়ে ছোটে।

মেল ছেড়েছে গো! রোগা—ভোগা চাষিটা গাছতলা থেকে হেঁকে বলে। হাসে খুব। জগদীশের গায়ের জোর এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

ঘাম ফুটে উঠতে থাকে। শরীরে ছলাৎ ছল রক্তের শব্দ। দাঁতে দাঁত। লড়াই। উঠে এসো গো কুমারী মা, উঠে এসো। মাটি ওলটায়, তবু জগদীশের মন ভরে না। গভীর, আরও গভীর মাটি চাই, যে মাটিতে মানুষের হাল পড়েনি কখনও। গুপ্তধনের মতো সেই মাটি কোথায় কোন পাতালে এখন? ভারী লাঙলটা একবার তোল্লা দিয়ে ঝাঁকিয়ে বসায় সে। র—য়ে র—য়ে ফেটে যাচ্ছে ভুঁই, চৌচির হয়ে যাচ্ছে, নানা ঢঙের ঢেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। পায়ে মাটির স্বাদ, দু'হাতে মাটির কাঁপন উঠে আসে লাঙল বেয়ে। সুখ। তার সুখ এ রকমই। চাষাড়ে।

দূরে মাথা তোলা দিয়ে আছে মোনা ঠাকুরের মন্দিরের চুড়োর কলস। তার ওপর একটা লাল নিশেন ছিল, এখন নেই। নিশেনের বদলে গজিয়েছে দুরন্ত অশ্বত্থ। বহু দূর থেকেই দেখা যায়। উত্তর দিকে চষবার সময়ে মন্দিরটা চোখে পড়ে। উলটোবাগে ঘুরলে দেখা যায় পৃথিবীর সীমা। সেখানে ছায়ার মতো গাছপালা, শিমুলের বীজ ফেটে তুলো যেমন ওড়ে তেমনই উড়ে যাচ্ছে হালকা আঁশমেঘ। ঘুরলে আবার মোনা ঠাকুরের মন্দির। বাঁশবন আর আমবাগানের মাথার ওপর উঁচিয়ে আছে। মোনা ঠাকুর নিজেও ওরকমই ওঁচানো। সবার ওপর মাথা তুলতে চায়।

মাথাটা নামিয়ে নিয়ে মাটির গভীর খালগুলো দেখে জগদীশ। বিড় বিড় করে কথা বলে, সুকুল আমার ছেলে নয়, সে কি আমি জানি না? হায় গো, এ—সব তো বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারে। বউটার ওপর রাগ করতাম। সে পা চেপে ধরত। সুকুলের বাপের নাম সে কখনও বলেনি। কী করব। পেলে তার বুকে এমনি লাঙল চেপে দু'ভাগ করে দিতাম না।

গভীর গভীরতর ডুবে যেতে থাকে লাঙল। অবিশ্বাস্য চাষ দেখে আধবুড়ো চাষি চেঁচিয়ে বলে, মাটিকে যে জল করে ফেলা হল! আরে বাঃ! বসুন্ধরা গলে যায় যে! বাঃ বাঃ!

চাষের বাহার সে বোঝে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

মাটির গভীর খাঁজে খাঁজে অন্ধকার। জগদীশ চেয়ে থাকে। নোনা ঘাম নেমে আসে ভ্রূ বেয়ে, চোখের কোণ বেয়ে। থুতনি বেয়ে। বিড় বিড় করে বলে সে, বাপ কে? অ্যাঁ! কে বাপ তবে আমার সুকুলের? এ বড় আশ্চর্য কাণ্ড! সুকুল আমার, বাপ ভিন্ন। অ্যাঁ! কত খুঁজেছি আড়ালে—আবডালে! যে—ই হোক। ছেলে আমার। খবরদার কোনো শালা যদি ফের কথা তোলে! সুকুল বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে। বড় ভয়। যদি জানতে পারে? কী লজ্জা! খবরদার তোমরা সব, খবরদার, কথা ওর কানে তোলে যদি কেউ চোয়াল খসিয়ে দেব, জিভ উপড়ে দেব সকলের। সার্কাসে আমি পাঁচ মন লোহা তুলতাম, মনে থাকে যেন!

লেবুকাঁটা দিয়ে চমৎকার একখানা টিপ পরে তারা। সস্তা কুমকুম বড্ড জেবড়ে যায়। লেবুকাঁটা দিয়ে পরলে বড় টিপটার চারধারে ফুটকিগুলো ভারী বাহার দেয়। ঢাকনা—খোলা আয়নাটা একটু একটু দূরে ধরল তারা। আয়নার ছায়ায় ঢেউ খেলছে। খেলুক। তবু বোঝা যায়, এ মেয়ের এখন যৌবনকাল। পোকামাকড় ভিড় করবার সময়। মুখ টিপে সে হাসে। পরমুহূর্তেই এক দুঃখ খেলা করে যায় বুকে। পাউডার নেই, ঠোঁটের রং না, কিছু না। প্রদীপের শিষে কাজললতা উলটে কালি ফেলে একটু কাজল চোখে দেওয়া, তাও চুরি করে দিতে হয়। বাবা দেখলে ঠান্ডা গলায় বলে, কালি কি সাজ! চোখে লোভ আসে। উত্তেজক।

ঢাকনায় লেখা, সুখে থাকো! মরি মরি! কী বা লেখার ছিরি! সুখে থাকো বললেই সুখে থাকে লোক? তারার সুখ নেই। রঙিন শাড়ি, ভালো আয়না, সাজগোজ, সিনেমা থিয়েটার, রেডিয়োর গান, পুরুষ সঙ্গী...কত কী চায় মেয়েরা।

পশ্চিমের জানালায় রোদ সরে এল। নিমগাছের ছায়াটা উঁকি দিচ্ছে মেঝেয়। ওই ছায়াটা হুশ করে অন্ধকার হয়ে যায়। শীতের বেলা বড্ড তাড়াতাড়ি যায়।

সুকুলের বাবা আজ চাষে গেছে। এই তার ফেরার সময়। নাবাল মাঠটা দিয়ে হনহন করে হেঁটে আসে বিশাল মূর্তি, মাঠের মাঝখানটিতে একবার থমকে দাঁড়ায়। দূর থেকে কালীমায়ের মন্দিরের দিকে একবার হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে চলে যায়। মন্দিরে আসে না। তারার বাবা সুকুলের কোষ্ঠীতে বাপের নামের জায়গা খালি রেখেছিল। সেই থেকে রাগ।

কামিনী গাছটার ঝুপসি ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে জগদীশকে প্রায়ই দেখে নেয় তারা। জগদীশ তা জানে। এক—আধদিন দেখাও হয়ে যায় এধারে—ওধারে। জগদীশ গা করে না। তারা কি সুন্দর নয়? নাই হল, সুন্দরী ছাড়া কারও দিকে তাকাতে নেই? তারার কিছুই কি দেখার নেই জগদীশের? পাথর! পাথর! ছেলের জন্য এত ভালোবাসা কোথা থেকে আসে? ওই বুকটা থেকেই তো! একই বুক একজনের জন্য গলে ঘি, অন্যজনের বেলায় পাথর! ভারী আশ্চর্য!

শোনো সবাই, তারা ঠিক করে রেখেছে একদিন গলায় দড়ি দেবে। সেদিন খুব খাবে তারা। মাছের মুড়ো, পাঁঠার ঠ্যাং, পিঠে—পায়েস, চালতার অম্বল। সাজবে খুব। যে বাসন্তী রঙের চকরা—বকরা শাড়িটা দিদি লুকিয়ে দিয়ে গেছে, সেইটে পরবে সেদিন। খোঁপায় ফুল গুঁজবে। চন্দনের ফোঁটা পরবে মুখে। বিয়ের কনেটি সেজে অনেকক্ষণ আয়নায় দেখবে মুখ। সেদিন খুব জ্যোৎস্না ফুটবে। ঋতুটি হবে বসন্ত। দক্ষিণের পেয়ারা গাছটার ডালে ঝুলন ঝোলাবে সে। একা একা রাধা। কৃষ্ণবিরহিনী। সেদিন বিরহই তার মিতা। মরার সময়ে লোকে চিঠি লিখে রেখে যায়, বলে যায়, সে নিজেই মরছে। তারা লিখবে না কিছু। হঠাৎ মরে যাবে। এবার তোমরা খুঁজে বের করো—কেন তারা মরেছে! জগদীশ, সুকুলের বাপ কে এটা খুঁজে খুঁজে হয়রান! তোমাকে আর একটা হয়রানি দিয়ে যাব জন্মের শোধ! তারা কেন মরল! খুঁজে খুঁজে বের করো সারা জীবন ধরে। বেশ হবে! জন্মের শোধ।

কামানোর পর সাপদুটো ঝিমিয়ে গেছে। কাল ওদের দুটো ব্যাঙ দিয়েছিল জগদীশ। গিলেছে! দুটোরই পেট ফুলে আছে! ঢিপির মতো একটা জায়গায়। নিম—খোরাকি! একবার খেলে বহুদিন আর কিছু খায় না। ঝিম মেরে পড়ে থাকে। নয়ন কাচের ভিতর দিয়ে উগ্র চোখে চেয়ে থাকে। লক্ষ্য রাখে! কিন্তু না, ওদের পরস্পরের শরীরের প্রতি বড় নিস্পৃহতা। এ বড় অদ্ভুত। এরকম একটা বাক্সে নয়ন আর শ্যামা থাকলে?

নয়ন একটু হাসে।

এ জীবনে নয়ন আর কোনোদিন ঘুমোবে কি? আশ্চর্য, ঘুমের জন্য তার কোনো চিন্তা ছিল না; কোনোদিন। হঠাৎ আজকাল মাঝে মাঝে ঘুমের কথা তার মনে হয় কেন? এক—দেড় প্যাকেট সিগারেট, দু'—এক ঢোঁক বাংলা, আর চিন্তা—এই নিয়েই তো দিব্যি রাত কেটে যেত। আজ কেন ঘুমের চিন্তা? কে তাকে ঘুম পাড়াবে? শ্যামা? শ্যামা! চোখ জ্বলে যায় তার।

দুটো ঝাঁপি দড়িতে ঝোলানো। ওপরেরটায় হাত দিয়ে স্পর্শ করে নয়ন। ভিতর থেকে একটা শ্বাসের শব্দ আসে। এই ঝাঁপি দুটোয় দুজন গোখরো আছেন। ঠান্ডা মেজাজ। চট করে কামড়ান না। কামানো, নিরাপদ। ঢাকনা খুললে যখন তারা মাথা তুলবে তখন পারবে কি নয়ন সাহস রাখতে? তেমন শক্ত নয়। জগদীশকে দেখেছে মুখের সামনে হাত নেড়ে সরিয়ে নেয়। মাথাটা তখন একটু নীচে ঝুঁকে পড়ে। জগদীশের বাঁ হাত তখন টপ করে পিছন দিক থেকে ধরে মাথাটা। অনেক সময় লেজ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে ফেলে। নিচু মাথা আর তুলতে পারে না। শক্ত নয়। পারবে নয়ন।

ভেবে দেখলে শ্যামাকে তার কিছুই দেখানোর নেই। কত কিছু দেখাতে সাধ যায়! কী ভালোবাসো শ্যামা? মানুষ খুন? সুন্দর পোশাক? বিনীত ব্যবহার? না কি গান শুনতে চাও? উপহার ভালোবাসা? অপহৃত হতে

চাও? কী শ্যামা? তোমার জন্য আমি ফুটবল খেলোয়াড়ও হতে পারি। কিংবা গায়ক। অভিনেতা। যা চাও তাই হব।

ঝাঁপিটার গায়ে আর একবার আলতো হাতে চাপড় দেয় সে। ভিতরে এবার দুটো দ্রুত তীক্ষ্ন শ্বাসের শব্দ হয়। বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। শোনো শ্যামা, কীরকম শব্দ হয়। বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। শোনো শ্যামা, কীরকম শব্দ! ঝাঁপি খুললেই কপিশ বিদ্যুৎ চমকে উঠে দাঁড়াবে। বিদ্রোহী। মুক্তিকামী। কী ভয়ঙ্কর! সম্মোহনের হাত বাড়িয়ে আমি ধরে নেব তাকে। কত খেলা দেখাব। দেখ।

সুকুল জামতলায় খেলছে। অনেক সঙ্গী জুটেছে তার। জগদীশ একঘরে, কিন্তু সুকুল নয়। গাদির কোট পড়েছে মাঠে। সুকুল পাকা ঘুঁটি। চেঁচিয়ে বলছে, আমার কোটে আসিস না, আমি পাকা। দান কেটে যাবে।

খেলা খুব জমে গেছে। সুকুল এখন আসবে না।

ওপরের ঝাঁপিটা সাবধানে দড়ির দোলনা থেকে তুলে আনে নয়ন। বেশ ভারী। সাপ যে এত ভারী হয় তা জানত না। বয়ে নিতে কষ্ট হবে। হোক!

বিছানার পাতলা চাদরটা দিয়ে ঝাঁপিটাকে বাঁধে সে। একটা ঝোলার মতো করে নেয়। ঝাঁপির ভিতর অবিরাম পাক খোলা আর শ্বাসের শব্দ হয়। নয়ন দাঁত টিপে হাসে। না সাপ, না শ্যামা, কাউকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু কী করে তাদের ধরতে হয় তা শিখে যাবে নয়ন।

ঝোলা হাতে নয়ন নিঃসাড়ে মেহেদির বেড়া ডিঙিয়ে জঙ্গুলে জায়গায় ঢুকে পড়ল। রাস্তা দিয়ে যাবে না। গাছের আড়াল—আবডালে গেলেও সে ঠিকই পৌঁছবে। জায়গাটা চেনা হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ শরীর আছড়ে সাপটা এখন নিশ্চুপ। বোঝাটা হাত বদল করে বাঁশঝাড় পেরিয়ে বুকসমান কসাড় জঙ্গল ভেদ করে মোনা ঠাকুরের মন্দিরের পিছনটায় উঠে আসে। মোনা ঠাকুরের বাগান। এটা ঘুরে সে আমবাগানে গিয়ে পড়বে। বাগানের বেড়া ঘেঁষে সে হাঁটে।

মন্দিরটার ডগায় অশ্বত্থচারাটি চোখ তুলে দেখে নয়ন। একটু হোঁচট খায়। গোরুর দড়ি বাঁধার খুঁটি কে যেন উপড়ে নেয়নি। বোঝাটা আবার হাতবদল করে নেয় সে।

নাবাল মাঠটায় আলো ফিকে। পশ্চিমে একটা কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে। সূর্যটা ঘোলাটে। জগদীশ এখুনি ফিরবে। সে ফিরবে মাঠ দিয়ে, ততক্ষণে আমবাগানে ঢুকে যাবে নয়ন। দেখা হবে না। নয়ন একটা শিস দিল। অবিকল দোয়েলের মতো। বড় মিষ্টি ডাক পাখিটার। পরমুহূর্তে শ্বাস আটকে আটকে, পেটে খাঁজ ফেলে, কুঁজো হয়ে সে একবার দু'বার কোকিল ডাকল। তার বড় প্রিয় ডাক।

মোনা ঠাকুরের বাগানের শেষে একটা ঝুপসি কামিনী গাছ ঝুঁকে তার ছায়া ফেলেছে নীচের নাবাল মাঠটিতে। ছায়াটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে।

ওই মাঠ পেরিয়ে সেই আশ্চর্য চাষাটি আসবে। কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে রোজই তাকে দেখে তারা। তারা যে দেখে তা কি ও জানে না? জানে। জেনেও পাথর। পুরুষ নও নাকি? শরীরে তো মাংসের বাহার, মন কোথা? বাসনা কোথা? পুরুষ হবে পুরুষের মতো, গনগনে আঁচ থাকবে তার, থাকবে কামনা। তা নয়, এ হচ্ছে গিয়ে মুক্তপুরুষ। ছেলে থাকলে আর জমি থাকলেই কি হল? মেয়েমানুষ চাই না? বাপু, তুমি হচ্ছ হিজড়ে।

একটু আগেই আজ এসে পড়েছে তারা। বেলা আছে। পশ্চিমে একটু ঘোলাটে ভাব বলে বেলা আন্দাজ পায়নি। কামিনী ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি দেখে। ডাঁস, মশা আর আলোর পোকা উড়ে যাচ্ছে। ঝাঁক বেঁধে পিন পিন করে মশা মাথার ওপরে। কুয়ো থেকে কে জল তুলছে। ভরা বালতি থেকে ছলাৎ করে জল উপচে জলে পড়ল। পিছনে গাছের আড়াল আছে। তবু একটু সেঁটে দাঁড়ায় সে। বুকটা একটু একটু কাঁপে। কিশোরীর হৃদয় কাঁপবেই। মুখে একটু শোষভাব। কণ্ঠমণি ওঠানামা করছে।

এই উত্তেজনাটুকু তার ভালোই লাগে। নাবালের মাঠ দিয়ে মাটিমাখা প্রকাণ্ড মানুষটা রোজ যায়। হাত দশেক তফাত থাকে তারার শরীর থেকে। সেই দশহাত শূন্যতা জুড়ে কত ইচ্ছার ঢেউ তারা বইয়ে দেয় রোজ। সে কখনও ফিরেও দেখে না।

দোয়েলের একটা শিস। তারা চমকায়! এত জোর ডাকল, কাছেই! পরমুহূর্তে তার কানের পরদা ফাটিয়ে একটা কোকিল কাঁদে। ডাক নয়, যেন কান্না। বড্ড বুকভাঙা ডাক। মিতা বুঝি উড়ে গেছে কোথা!

ঝোপের ভিতর থেকে আস্তে মুখ বাড়ায় তারা।

লাফ দিয়ে একটা খন্দ পেরিয়ে হলুদ জামা পরা ছোকরাটা সামনে এল। লুকোবার সময় পেল না তারা। মুখটা টেনে নিল আড়ালে, কিন্তু ও দেখছে ঠিক। দাঁড়িয়ে গেল।

বোঝাটা হাতবদল করে ঝোপের পাশে একটু দাঁড়াল। তারার বুক ঢিপ ঢিপ করে।

একটা শ্বাস ফেলল ছেলেটা। তারপর চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে এল। বলল, দেখে ফেলেছি।

তারা চুপ।

কী হচ্ছে এখানে?

কিছু না। বাগানে দাঁড়িয়ে আছি। তারা অস্ফুট স্বরে বলে।

ছোকরাটা হাসে। বিচ্ছিরি হাসি ওর। বোঝাটা মাটিতে রেখে হালকা পায়ে বেড়ার কাছে আসে। তারা শ্বাস বন্ধ করে থাকে।

বাগানে দাঁড়িয়ে থাকা, না আর কিছু?

আর কী!

আচমকা ছেলেটা লাফ দিয়ে বেড়াটা পার হয়ে আসে। চেঁচাতে গিয়েও চেঁচাল না তারা। কী সাহস ওর।

ছেলেটার পায়ের শব্দ হয় না। বাতাসের ওপর চলে—ফেরে যেন। ঝোপটা ঘুরে মুখোমুখি চলে এল। মুখখানা দেখে আপনা থেকেই একটা ভয়ের চিৎকার গলায় উঠে আসছিল। সেটা সামলাল তারা। পেটের ভিতরটা গুর—গুর করে উঠল।

ছোকরাটার পিঙলে চুল বাতাসে উড়ো—খুড়ো হয়ে আছে। চোখের নীচে বসা কালি, কাটা—ফাটা ঠোঁট, ভাঙা চোয়ালে রগ ফুটে গেছে। চোখ দুটো লালচে, জ্বলজ্বলে। ওপরের পাতাটা আধবোজা। হঠাৎ বুক চমকে ওঠে দেখলে।

তারা এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, কী চান আপনি?

সুকুল তোমাকে মা ডাকে কেন?

তারা ঢোঁক গিলল। কারও জানার কথা নয়। কেবল সুকুল জানে আর সে নিজে। আড়ালে সুকুলকে 'তারা—মা' ডাকতে শিখিয়েছে সে। বোকা ছেলেটা, পেটে কথা রাখতে পারেনি।

তারা বলল, কই না তো!

ছোকরাটা ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলে, তোমরা মেয়েরা মিথ্যেবাদী। তুমি সুকুলকে মা ডাকতে শিখিয়েছ কেন?

শেখাইনি, ও নিজেই ডাকে। তারা ভীষণ ভয় পেয়ে বলে।

মিথ্যেবাদী। চাপা স্বরে বলে ছোকরাটা।

না।

বাবা শুনলে হেঁটোকাঁটা ওপরকাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলবে। তারা তাই কেবল বাতাস গিলল। ছেলেটার পিঙলে চুল ফণা ধরে আছে। মুখে না খেতে পাওয়া ভাব। শরীরটার তামাটে রং থেকে রাগের তাপ আসছে।

সেজে—গুজে কার জন্য দাঁড়িয়ে আছ? জগদীশ?

তারা মাথা নাড়ে। কানের পুঁতির ঝুমকো দুটো গালে এসে ঝাপটা মারে। সে মাথা নেড়ে জানায়, না।

ছোকরাটা একটু হাসে। তারপর ঠান্ডা গলায় বলে, আমি জানি।
কী জানেন?
সব। যদি মোনা ঠাকুরকে বলে দিই তবে জগদীশ উচ্ছেদ হয়ে যাবে।
যা জানেন তা ঠিক নয়।
তোমরা মিথ্যেবাদী। মোনা ঠাকুর যখন বাণ মারে তখন কী হয় জানো তো? মুখে রক্ত তুলে, দাপিয়ে মরে যায় তরতাজা মানুষ। জানো?
তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে।
জগদীশেরও তাই হবে। ছোকরাটা হালকা স্বরে বলে।
না।
কী না? বলে এগিয়ে আসে ছোকরাটা।
বড়দি পালিয়ে গিয়েছিল একটা চামচিকের সঙ্গে। মোনা ঠাকুর হইচই করেনি, পুলিশে খবর দেয়নি, খোঁজেনি। বিয়ের দু'মাসের মাথায় মুখে রক্ত উঠে সেই চামচিকেটা মরেছিল। সবাই বলে, মোনা ঠাকুর বাণ মেরেছে। সেটা মিথ্যেও নয়। বাবা ঠিক বাবা নয় তারার কাছে। অন্য সকলের কাছে যেমন 'মোনা ঠাকুর' তার কাছেও তেমনি। রহস্যময় এক শক্তির অধিকারী ভয়ঙ্কর পুরোহিত। চতুর্দিকে বিস্তৃত তার সম্মোহন আকাশে বাতাসে জাল ছড়িয়ে রেখেছে। অদৃশ্য চক্ষু লক্ষ রাখছে সব দিকে। তারা নিথর হয়ে চেয়ে থাকে। বুকটা জ্বলে যায়। কোনোদিকে পথ খোলা নেই।
ছোকরাটার শ্বাস মুখে পড়তেই চকিতে চটকা ভেঙে মুখ তোলে তারা। কত কাছে এসে গেছে দেখ! মাগো! তারা পিছোতে যাবে ছেলেটা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরল।
পালাচ্ছ?
এটা কী? ছাড়ুন। তারা ছটফট করে।
আমি মোনা ঠাকুরকে বলে দেব।
না।
ছোকরাটা হাসে। তারার হাতখানা নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকে বলে, তোমার গা পরিষ্কার, কোনো গোটা নেই, মোলায়েম!
ঝটকা দেয় তারা। কিন্তু হাত খসে না। সাঁড়াশির মতো ধরে রেখেছে।
ছোকরাটা আপন মনে বলে, প্রচুর ক্লোরোফিল তোমার শরীরে। তাজা ভিটামিন, আর ক্যালসিয়াম। দুরন্ত লিভার, আর হার্ট। তোমার কোনো অসুখ নেই।
ছাড়ুন। আমি চেঁচাব।
না, চেঁচাবে না। খুন করে ফেলব।
বলতেই তার চোখ ঝলসে ওঠে। স্তিমিত গলায় আবার বলে, তোমাকেও। জগদীশকেও! মোনা ঠাকুরের বাণে অনেক সময় কাজ হয় না। কিন্তু আমার বাণে হয়। আমি মানুষ মেরেছি তারা।
তারার চোখে পলক পড়ে না। দুরন্ত মুহূর্তগুলি কেটে যাচ্ছে। শরীরে একটা রক্তের হলকা বয়ে যাচ্ছে।
ছোকরাটা হাতখানার গন্ধ আর একবার শুঁকল। তারপর বলল, তোমাকে আজ আমার একটা গোপন কথা বলে দিলাম। মানুষ মারার কথা। আজ অবধি আর কাউকে বলিনি।
পশ্চিম দিগন্তে একটা মলিন সূর্য ঝুলে আছে। ডুবে যাচ্ছে না। বাতাস বন্ধ। পৃথিবীতে সময় থেমে গেছে হঠাৎ। ছোকরাটা মুখ নামিয়ে আনে কাছে, চাপা গলায় বলে, যাকে একবার গোপন কথা বলে দেওয়া যায় তাকে আর বিশ্বাস করা চলে না। তোমাকে বিশ্বাস করি না আর। বুঝেছ?
আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায় ছোকরাটা। কাঁধে ঝাঁকি দেয়। কাঁপনটা নিজের শরীরেও টের পেল তারা।

আমি আবার আসব। হঠাৎ আসব। তোমাকে পাহারা দিতে। আমার গোপন কথাটা কাউকে বলেছ কি না দেখতে আসব। বারবার। তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেব না। আমি একবার যার পিছু নিই তার শান্তি থাকে না। বলে সে হাসে।

তারা অনেক কষ্টে অস্ফুট গলায় বলে, কী সব বলছেন!

সে কথায় কান না দিয়ে ছেলেটা পৃথিবীর রাজার মতো গলায় বলে, আবার যখন আসব তখন তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব।

কী? ভয়ার্ত তারা জিজ্ঞেস করে।

ক্লোরোফিল, কিংবা ক্যালসিয়াম, ভিটামিন কিছু একটা। ঠিক জানি না। অনেকদিন আগে আমি ডাক্তারি পড়তাম, সেকেন্ড ইয়ারে ছেড়ে দিই। সব ভুলে গেছি। কিছু একটা চাই যা আমাকে ঘুম পাড়াবে। বুঝেছ?

তারা কিছু বোঝেনি। তবু ছাড়া পাওয়ার জন্য মাথা নাড়ল।

আজ আর সময় নেই।

বলে হঠাৎ নিস্পৃহভাবে তারার হাতটা ছেড়ে দিল নয়ন। বলল, জগদীশ আমাকে চড় মেরেছিল একদিন, বুঝলে। আমাকে চড় মেরেছিল। যে আমাকে মারে তার ছাড় নেই! আমি ফিরব! বুঝলে! ফিরব।

ছোকরাটা ঘুরে চটপটে পায়ে আবার বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল। ঝোলাটা তুলে নিল হাতে। একবারও ফিরে না তাকিয়ে জঙ্গল ভেঙে মিলিয়ে গেল।

তারা নিঝুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার নরম হাতখানায় পাঁচ আঙুল বসে যাওয়ার লালচে দাগ। ব্যথা করছে। চোখ ভরে টলটলে জল এল তার। তারপর হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দরগার পিছনের টিবিটা পেরোলে একটা বাঁশঝাড়। সেটা ডাইনে রেখে দু'কদম হাঁটলেই নাবাল মাঠটা দেখা যায়। বাঁয় উঁচুতে মোনা ঠাকুরের মন্দির। মাঠের শেষে রাস্তাটা ঘুরে গেছে।

দূর থেকেই দেখা যায়, রাস্তার বাঁকটাতে সুকুল দাঁড়িয়ে। এত বড় মাঠটা সামনে বলে সুকুলটাকে যে কী ছোট্ট আর একা দেখায়। শেষবেলার আলোয় এখন কুয়াশার ভাব। মাটি থেকে ধুলোটে অস্বচ্ছতা উঠে আসে। বড় আবছা চারদিক। বড় মায়াময়। এ সময়টায় আলো ক্ষয়ে গিয়ে পৃথিবীর ওপর একটা স্বপ্নের সর পড়ে। সত্যি নয় কিছু। আলো ক্ষয় হয় এ সময়ে। দূর থেকে সুকুলকে মনে হয় মাঠের ওপর একটা দাগ মাত্র। বুকটা ফাঁকা লাগে জগদীশের।

মাঠের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে রোজ জগদীশ মন্দিরের দিকে হাতজোড় করে একটা প্রণাম ছুঁড়ে দিয়ে যায়। আজ দূর থেকে সুকুলকে দেখে বুকটা কেমন করল। মাঠখানা বুকে নিয়ে ছোট্ট সুকুল দাঁড়িয়ে। একা। বাবার জন্য চেয়ে আছে। মিথ্যে। বাবা কোথায় সুকুলের? তবে কি সবই এরকম? সাঁঝবেলায় সন্ধের ঝুঁঝকো আঁধার যেমন স্বপ্নের সর তেমনি? বুকটা কেমন করল। জগদীশ আজ মাঠের মাঝখানে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, কাছে যাই না মা, দোষ নিয়ো না। তোমার মন্দিরের চারধারে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া। আমার যা হোক তা হোক, সুকুলকে দেখো। দেখ না, অভাগা ছেলেটা পৃথিবীতে কী রকম একা। মাঠ বুকে করে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো ওর কেউ না। জানে না তাই। এই মোহ চিরকাল রেখো না। জগৎসংসারে মোহ ছাড়া মোয়া বাঁধে না।

কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে সাজপরা একখানা মুখ রোজই চেয়ে থাকে। লক্ষ করেছে জগদীশ। আজও করল। দেখি না দেখি না করে রোজ পেরিয়ে যায় জায়গাটা যেমন পোড়ো জায়গা রামনাম করতে করতে পেরোয় ভীতু মানুষেরা। জগদীশও পেরোয়। বন্ধনকে তার বড় ভয়। বাঁধা বাউন্ডুলে ছিল সে। গাউস সাহেবের দলের সঙ্গে উজেন ভাঁটেন বয়ে যেত দেশ—দেশান্তরে। সেই জগদীশ এখন শিকড় ছেড়েছে মাটিতে। ভুঁই, ঘর, ছেলে। তবু কিছুই তার নয়, সে জানে। সুকুল একটু বড় হোক, হাত—পা ঝেড়ে আবার সে বেরিয়ে পড়বে। সংসারে তার এই স্থিতি চায় না। সংসারে থিতোবার লোক আছে, সে সেই লোক নয়।

পেরিয়েই যেত জগদীশ। কিন্তু বাগড়া দিল কান্নার শব্দটা। তারা কাঁদছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে। সুকুলকে গোপনে 'তারা—মা' ডাকতে শিখিয়েছে মেয়েটা। বোঝে জগদীশ সবই।

কী ভেবে দাঁড়িয়ে গেল জগদীশ। কান্না ব্যাপারটা ভালো না। বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

ঝোপের পাশে অবিরল ফোঁপানি। হেঁচকির মতো শব্দ হচ্ছে।

জগদীশ আস্তে করে বলল, ঠাকুর এসব দেখলে বড় রাগ করে। এ ভালো নয়।

ওপাশটা চুপ। ভীতু খসখসে একটা শব্দ হয়। শ্বাস চাপবার চেষ্টা হচ্ছে। তারপর হঠাৎ ছোট্ট একটা প্রশ্ন উড়ে আসে, কেন?

জগদীশ বলে, মন চাইলেই কি সব হয়?

কেন হয় না? আবার প্রশ্ন উড়ে আসে।

জগদীশ বিষণ্ণ ভাবে মাথা নেড়ে বলে, হয় না। মোনা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কোরো, তিনিই বলবেন, হয় না।

ওপাশটা একটু চুপ করে থাকে, কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ ভারী ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করে, আপনি ব্রাহ্মণ না?

জগদীশ হাসে, বামুন ঠিকই। হালদার বংশ। উপনয়নও হয়েছিল। শরীর খেলাতে গিয়ে সেই যে পইতে ছেড়েছি, আর নেওয়া হয়নি।

তবে বাধা কী?

জগদীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বাধা অনেক। নিচু জাতে বিয়ে করেছিলাম বলে ব্রাত্যদোষ। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কী?

সুকুলের বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে।

সতর্ক এবং বেদনার গলায় বলে জগদীশ। স্বরটা খুব নীচে নেমে আসে। তারপর মুখ তুলে বলে, ওই সন্দেহ নিয়ে যে—ই আমার ঘর করতে আসুক, আমি তাকে সইতে পারব না।

আমি কিছু ভাবি না।

জগদীশ তবু মাথা নাড়ে, গাঁয়ে পাঁচটা কথা উঠবে। লোকে ঘোঁট পাকাবে। গোলমাল হবে। মোনা ঠাকুর খুশি হবে না—

আপনি বাবাকে ভয় পান?

জগদীশ শ্বাস ছাড়ে, বলে, কে না পায়?

তবে কী উপায় হবে?

উপায় দেখছি না। বেঁচে থাকতে গেলে কিছু ছেড়ে—কেটেই থাকতে হয়। অবস্থাটা মেনে নেওয়াই ভালো।

যদি কলকাতায় পালিয়ে যাওয়া যায়?

উরেব্বাস!

কেন, সর্বনাশ হয়ে যাবে নাকি?

হবে। মাটির গন্ধ না পেলে আমি থাকতে পারব না। মাটির বড় মায়া।

আপনার আবার মায়া—দয়া!

একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে আসে।

সুকুল এতক্ষণে বাপকে নিরিখ করেছে। কোনাকুনি ছুটে আসছে এঞ্জিনের মতো। জগদীশ বলল, যাই।

আচ্ছা।

এরকমভাবে থেকো না। লোকে দেখলে কী বলবে?

আমি থাকব। রোজ। আমার ইচ্ছে।

জগদীশ মাঠের শূন্যতায় এগিয়ে গেল। দু'হাত বাড়ানো। শূন্যতাকে ভরে দিয়ে সুকুল আসছে। আসছে।

ভারী সাপটাকে বয়ে আনতে কষ্ট গেছে খুব। পাকাসাপ, থলথলে চর্বি বোধ হয় গায়ে। নয়ন ঝাঁপি খুলে দেখেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিয়েছে। অমনি ভিতর থেকে প্রবল শ্বাসের শব্দ পেয়েছে। দাঁতে দাঁত টিপে একধরনের হাসি হেসেছে সে। ভীতু একটা জ্বালাময় আনন্দ।

সন্ধের বাসটা পেল নয়ন। পায়ের কাছে সারাক্ষণ ঝাঁপিটা সতর্ক পাহারা দিল, যেন পাহারা না দিলে মূল্যবান ঝাঁপিটা কেউ চুরি করে নেবে। মাঝে মাঝে ঝুড়িটায় লাথি মারল। শ্বাসের শব্দ পেল। পাশে বসা একটা মানুষ একবার জিজ্ঞেস করল, কী আছে ওটাতে?

নির্বিকার গলায় নয়ন জবাব দিল, একটা গোখরো সাপ।

সাপ! লোকটা চমকে উঠে পড়ে, বলে, কী সাংঘাতিক!

মানুষজন তার দিকে কৌতূহলে তাকায়। ঝুড়িটা অনেকে উঁকি—ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

দূরপাল্লার বাস বলে সিগারেট ধরালে কেউ কিছু বলে না। নয়ন কাউকে গ্রাহ্য না করে বাইরের দিকে চেয়ে সিগারেট ধরায়। তারপর একমনে সিগারেট টেনে যায়। বাইরে ভিতরে একটা তীব্র ছটফটানি তার। হাত—পা একভাবে রাখতে পারে না। এ পাশ ও পাশ হয়। বিড় বিড় করে নিজেকে বলে, সব প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেলে ঘুম আসবে। ঠিক ঘুম আসবে।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। সদর বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কোনো বাধা নয়। সদর দিয়ে সে কদাচিৎ বাড়িতে ঢোকে। আজও ঢুকল না। গলির দরজা টপকে ঢুকল। ঝাঁপিটার জন্য কষ্ট হল খুব। ঝাঁকুনি খেয়ে ব্যাটা ভিতরে গজরাচ্ছে। কর্কশ দেওয়ালের ঘষাটায় কনুইটা ছড়ে গেল অনেকটা। কিছুই গ্রাহ্য করল না সে। ভিতরের দরজা খুলে দিল রাঁধুনি লোকটা। দরজা খুলে তাকে দেখেই সন্ত্রস্ত ভাবে সরে গেল। গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, বাবুর বড় অসুখ।

কার?

বড়বাবুর।

ও। বলে নির্বিকারভাবে নিজের ঘরে গেল সে। সে থাক বা না থাক তার বিছানা পরিপাটি পাতা থাকে রোজ। খাওয়ার ঘরে খাবার ঢাকা থাকে। এই নিয়ম করে রেখেছে মা। বেশি রাতে ফিরলেও কোনো অসুবিধে হয় না।

ঘরে ঢুকে ঝাঁপিটা যত্নে খাটের তলায় রেখে জামাটা খুলে শুয়ে সে সিগারেট ধরাল। কার অসুখ যেন বলছিল লোকটা!

উঠে আবার খাওয়ার ঘরে এল। বারান্দায় জল আর ঝাঁটার শব্দ হচ্ছে!

কার অসুখ বললে?

বড়বাবুর।

কী হয়েছে?

কী জানি! অজ্ঞান মতো হয়ে আছেন কাল থেকে। মা বলেছে আপনি এলেই খবর দিতে।

দোতলায় সিঁড়ির তলায় একবার দাঁড়াল নয়ন। সিঁড়ির বাতি নেভানো। ওপরটা নিস্তব্ধ। সিঁড়ি ভাঙতে তার ইচ্ছে করছিল না। বাবার জন্য তেমন কিছু উদবেগও বোধ করল না সে। কোনো দিনই করে না।

সিঁড়িতে গোটা দুই বেড়াল শুয়ে। একটুক্ষণ বেড়ালের ঘুম দেখল সে। বাবা এই রাতে মারা গেলে শ্মশান—ফশানে যাওয়ার ঝামেলা অনেক। ভেবে সে একটু বিরক্ত হল। মরে—ফরে যাওয়াটা যে সংসারে কেন আছে! এগুলো উঠে গেলেই ভালো।

আবার ঘরে এসে সে বাতি নিভিয়ে শুয়ে জেগে থাকে। তারপর হঠাৎ উঠে বাতিটা জ্বেলে ঝাঁপিটা বের করে।

একটা কপিশ শরীর পাকে—পাকে জড়িয়ে আছে। দেখলে গা শির শির করে। নিঝুম হয়ে পড়ে আছে সাপটা। হাতটা একবার বাড়াল নয়ন, তার হাতের ছায়া পড়ল সাপটার মুখে। সাহস পেল না সে, হাতটা আবার সরিয়ে আনল।

একটা স্কুটার ছিল নয়নের। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল বলে বাবা কিনে দিয়েছিল। সেই স্কুটারটা নয়ন চালাত ঝড়ের মতো। হালকা জিনিস, চিৎপুরে একবার রাস্তার গর্তে ঝাঁকুনি খেয়ে নিয়ে ওলটায়। দ্বিতীয়বার একটা ট্রামকে টপকে যেতে গিয়ে ভবানীপুরে একটা স্টেটবাসের পিছনে ভিড়িয়ে দেয় নয়ন। তিনবারের বার বর্ষাকালের জলে—ডোবা লাইব্রেরি রোডে সেটা পড়ে যায় আধখোলা ম্যানহোলের ভিতরে। জখমটা গুরুতর হয়েছিল। কালীঘাটের একটা গ্যারেজে দিয়েছিল, সেখানে আজও পড়ে আছে। আনা হয়নি। স্কুটার আর ভালো লাগে না নয়নের। যদি কখনও কেনে একটা স্পোর্টস কারই কিনবে নয়ন। বাবা মরে গেলে কিনতে কোনো ঝামেলা হবে না। একটা সেকেন্ড হ্যান্ড এম জি স্পোর্টস কার দেখেও রেখেছে নয়ন।

স্কুটার যখন চালাত তখনকার একজোড়া চামড়ার দস্তানা আর গগলস আলমারিতে পড়ে আছে। নয়ন উঠে গিয়ে আলমারি খুলে দস্তানা জোড়া বের করে আনল। দস্তানাটা পুরু, দু'পাল্লা চামড়ার মাঝখানে তুলোর গজ ভরা। সে দুটো হাতে পরে নিল সে। তারপর সাপের ঝুড়িটার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। তেমনি নিঝুম পড়ে আছে সাপটা। মাথাটা ছোট্ট দেখাচ্ছে। কী করে ফণাটা মুহূর্তের মধ্যে অতটা চওড়া করে ফেলে!

নয়ন হাতটা বাড়াল। মাথাটার এক বিঘৎ দূরে হাতটা নিয়ে গেল সে। হাতের ছায়াটা নাড়তে লাগল সাপের মুখের ওপর। তারপর চকিতে আঙুল বাড়িয়ে একটা খোঁচা দিল সে। সাপটা নড়ল না। নড়লে কী হবে তা নয়ন ভাবে না। কাছাকাছি জগদীশ নেই, সে একা। তবু নয়ন আবার আঙুলের খোঁচা দিল। আবার।

চমকে মুখ তোলে সাপ। ছোট্ট মাথাটার দু'পাশে ছড়িয়ে যায় হাতের পাতার মতো ফণা। শেকড়ের মতো ছোট্ট জিবটা বেরিয়ে আসে। বারবার। ঘন শ্বাসের শব্দ। একটু দোলে। ছোবল দেবে নাকি?

সাপটার উদ্ধত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিটা দেখে নয়ন। চোখ ভরে দেখে। যা কিছুটা ভয়ঙ্কর তা—ই তার প্রিয়। দস্তানা—পরা হাতটা সন্তর্পণে বাড়ায় সে। কিছু বুঝবার আগেই সাপটা চাবুকের মতো মুখটা আছড়ে ফেলে নয়নের হাতের ওপর। দস্তানা পরা হাত, তাই কিছুই টের পেল না নয়ন। কিন্তু খুব চমকে গেল। সাপ যে কতটা গতিময়, কী মারাত্মক তার চকিত আক্রমণ তা টের পায়, এই গতিটাই নয়নকে ভারী অবাক করে। জগদীশ এর চেয়েও দ্রুতবেগে হাত বাড়ায় এবং হাত সরিয়ে নেয়। নয়নকে শিখতেই হবে।

কিন্তু সাপটা আর ছোবল দেয় না। সে হয়তো নিজের বিষদাঁতহীন অক্ষমতা বুঝতে পারে। তাই মাথাটা নামিয়ে শরীরটাকে জলধারার মতো স্বচ্ছন্দে ঝুড়ির কানার ওপর দিয়ে টেনে মেঝের ওপর দিয়ে আঁকা—বাঁকা হয়ে চলতে থাকে। সাপটা যে কত বড় তা এই প্রথম বুঝতে পারে নয়ন, ফলে তার গায়ে কাঁটা দেয়।

সাপটা নয়নের দিকে ফিরেও তাকায় না। প্রথমে আলনার তলা, তারপর আবার ঘুরে খাটের নীচের অন্ধকারে যেতে থাকে। নয়ন একটু স্তব্ধ থাকে। তারপরই দাঁতে দাঁত টিপে নিজের কাঁপা শরীরকে সামলে হাত বাড়িয়ে খাটের তলার অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। সাপটা আবার পাকে পাকে শরীর জড়াচ্ছে। সন্তর্পণে নয়ন হাত বাড়ায়। সাপটা মুখ তোলে, শ্বাস ফেলার মতো শব্দ করে নয়নকে সতর্ক করে দেয়। নয়ন থেমে যায়। ওর দ্রুতবেগটাকেই নয়নের ভয়।

উদ্যত হাতটা বাড়িয়ে রেখেই নয়ন খর চোখে সাপটাকে দেখে। সাদা বুকটা তুলে, ফণা মেলে সাপটাও দেখে নয়নকে। নয়ন হাসে। তারপর নয়নের হাতটাই সাপটাকে অবিকল সাপের মতো ছোবল দেয়। গলার নীচে চেপে ধরে সাপটাকে হিঁচড়ে নিয়ে আসে সে। ছটফট করে সাপটা, সমস্ত শরীর আছড়ায়। নয়নের হাতটা পাকে—পাকে জড়াতে থাকে।

হঠাৎ সমস্ত বুক পেট জুড়ে একটা বমির ভাব আসে নয়নের। ঘেন্নায় শরীর রি রি করে। সাপের ঠান্ডা শরীরের স্পর্শ তার হাতটাকে হিম করে দেয়। পাগলের মতো সে হাত ছুঁড়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দেয়

ওটাকে, তারপর হাঁফাতে থাকে।

সাপটা মেঝেময় ছড়িয়ে কিলবিল করে। তারপর আবার ঝাঁপিটার পাশ দিয়ে খাটের তলায় চলে যেতে থাকে।

নয়ন দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে, দস্তানা খুলে গলায় আঙুল দেয়। বেসিনে উপুড় হয়ে হড়হড় করে বমি করে। টক—তেতো স্বাদ, শরীরটা কাঁপতে থাকে।

মুখে—চোখে জল দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সে টের পেল, মাথায় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। শরীরটা যেন বাতাস দিয়ে তৈরি, এমন হালকা লাগে।

দেয়াল ধরে ধরে ঘরে এল নয়ন। টেবিল হাতড়ে সোনেরিলের কৌটোটা বের করল। একসঙ্গে তিনটে কি চারটে—না গুনে মুখে নিয়ে জল দিয়ে গিলল। সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট খেল।

একটা ঝিমুনির ভাব আসছে। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। এক—আধবার সাপটার কথা মনে হয় নয়নের। ভাবে উঠে গিয়ে ওটাকে ঝুড়িতে ভরে রাখা উচিত। কিন্তু শ্লেটের ওপর লেখা যেমন মুছে যায় তেমনি নানা হিজিবিজি চিন্তা স্বপ্নের মতো চোখের সামনে এসে যায়। সাপটার কথা খেয়াল থাকে না। হাতটা বিছানার বাইরে এলিয়ে পড়ে আছে, দু' আঙুলে ধরা সিগারেটটার ছাই লম্বা হয়ে ঝুলে আছে, মাথা ভর্তি স্বপ্ন, চোখ জুড়ে আসছে...

ঘুমিয়েই পড়ত নয়ন। দরজার শব্দ শুনে চোখ কষ্টে খোলে সে।

কে রে?

নতুন চাকরটা ঘরে উঁকি দেয়, দাদাবাবু বড়বাবুর অবস্থা খারাপ। মা আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

নয়ন প্রথমটায় বুঝতে পারে না, জিজ্ঞেস করে, কার অবস্থা খারাপ বলছিস?

বড়বাবুর, আপনার বাবা মশাইয়ের।

ও, মাথাটা একটু ঝাঁকায় নয়ন। তারপর উঠে বসে বলে, কী হয়েছে?

কী জানি, অবস্থা কাল থেকেই খারাপ যাচ্ছে। খুব অসুখ।

নয়ন উঠল। খুবই ক্লান্ত লাগছে তার। সোনেরিল খাওয়ার পর শরীরটা একরকম নেশায় ভরে ওঠে। নড়াচড়া ভালো লাগে না। তবু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে বাবার ঘরে এল সে।

খুব মৃদু নীল ঘুম—আলো জ্বলছে ঘরে। প্রকাণ্ড মেহগনির পালংকের ধারে টেবিল, তাতে ওষুধপত্র রাখা। পালংকের নীচে সাদা বেডপ্যান, জলের বালতি। ঘরে ওষুধের গন্ধ। উঁচু বালিশে মাথা রেখে নয়নের বাবা শুয়ে। শরীরটা স্থির নয়। ডান পা—টা ক্রমাগত নড়ছে, ডানহাতটা কপালের কাছে উঠে যাচ্ছে বারবার।

নয়ন দরজা থেকে তিন—চার পা হেঁটে বাবার বিছানার কাছে দাঁড়াল। শিয়রের কাছে মা বসে আছে। মা জিজ্ঞেস করল, খেয়েছিস?

গলাটা ভাঙা। বোধহয় খুব কেঁদেছে মা, নয়তো ঠান্ডা লাগিয়েছে, মা'র কথার জবাব না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে?

কী জানি, পরশু রাতে খাওয়ার আগে বাথরুমে গিয়েছিল, হঠাৎ দৌড়ে ফিরে এল, কী যেন সব আবোল—তাবোল বলল, শুয়ে পড়ল হঠাৎ। ডাক্তাররা তো স্পষ্ট করে কিছু বলে না। তবে শিরা থেকে রক্ত নিয়ে গেছে পরীক্ষা করতে।

নয়ন বলল, জ্ঞান নেই?

না তো। কোনো সাড়া দিচ্ছে না।

নয়ন ভীত চোখে চেয়ে বলে, তবে ডান পা—টা নড়ছে কেন?

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কে জানে! ক্রমাগত নড়ছে। দিনরাত কামাই নেই। কী যে হবে। তুই খাসনি?

না।

খেয়ে নে।

নিচ্ছি, রাতে তুমি জাগবে নাকি।

না, নার্স রাখা হয়েছে। এক্ষুনি এসে পড়বে। তুই খেয়ে নে যা। ঘুম থেকে উঠে কোথাও যাস না সকালে, কখন কী হয়।

নয়ন বাবার দিকে একটু চেয়ে রইল। জ্ঞান নেই, সাড়া নেই, তবু দুটো অঙ্গ নড়ছে। ডান পা, ডান হাত, লক্ষণটা একটু চেনে নয়ন।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, পিত্তের বমি হয়েছিল?

মা একটু থমকে গিয়ে বলে, হয়েছিল।

কখন?

একটু আগে। কেন?

নয়ন মা'র দিকে একটু চেয়ে রইল। আবছা আলোয় ভালো দেখা যায় না। শিয়রের কাছে খাটের বাজুতে পিছনে হেলে বসে আছে মা। শরীরটা মোটা নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। তার ওপর মোটা, ভারী সব গয়না, আঁচলে আধকেজি ওজনের এক থোলা চাবি। এসব নিয়েই একটু পরে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদতে হবে। পরনে চওড়া পাড়ের শাড়ি, সিঁথেয় সিঁদুরের দাগে ঘা...নয়ন বাবার দিকে চেয়ে মনে মনে বলে, গুডবাই স্যার, আর দেখা হচ্ছে না তাহলে!

যাচ্ছি।

মা জিজ্ঞেস করে, ওই বমি হলে কী হয়?

কী আবার হবে?

তবে জিজ্ঞেস করলি কেন?

এমনিই।

তুই তো ডাক্তারি একটু শিখেছিলি, বুঝিস না অবস্থাটা?

আমার বোঝাবুঝি দিয়ে কী হবে, বড় ডাক্তার দেখছে যখন!

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, যা খেয়ে নে।

নয়ন নেমে আসে। রাঁধুনি খাওয়ার ঘরে অপেক্ষা করছে। খাওয়ার টেবিলে আরও একজন বসে খাচ্ছে। কালো মতো একটি মেয়ে। খুব সাধারণ চেহারা, রোগা, না তাকালে কিছু এসে যায় না। মেয়েটা তাড়াহুড়ো করে শেষ কয়েকটি গ্রাস খাচ্ছিল।

নয়ন মুখোমুখি বসল। বলল, ব্যস্ত হবেন না, আস্তে খান।

মেয়েটা মুখ তুলে অপ্রতিভ গলায় বলে, আমি গেলে আপনার মা শুতে যাবেন। ওঁরও শরীরটা...

নয়ন একটু হাসে, শুয়ে আর কী হবে? রাত পোয়াবে না।

নার্স মেয়েটা চুপ করে থাকে।

খান।

মেয়েটা খায়।

রাঁধুনি প্লেটে খাবার সাজিয়ে আনে নয়নের জন্য। নয়ন একটু নাড়াচাড়া করে। দু'এক গ্রাস খায়, মেয়েটা উঠে যাওয়ার আগে একবার সন্তর্পণে নয়নের দিকে তাকাল। নয়ন একটু হাসল। বন্ধুত্বের হাসি।

আঁচিয়ে ঘরে এসে আরও দুটো সোনেরিল গেলে নয়ন। সিগারেট ধরায়। বিছানার দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ তার সাপটার কথা মনে পড়ে। নিচু হয়ে খাটের তলাটা দেখে সে। নিঝুম হয়ে খাটের নীচের আবছায়ায় পড়ে আচে লক্ষ্মীছেলের মতো। নড়েনি।

নয়ন একটা হাই সামলায়। দস্তানা জোড়া খুঁজে হাতে পরে নেয়। তারপর খাটের তলায় হাত বাড়ায়।

বিরক্ত হয়ে ছিটকে ওঠে সাপটা। কিন্তু নির্বিষ অক্ষম তার আক্রোশ। মুহুর্মুহু কয়েকবার সে নয়নের হাতে মাথা কোটে। চুম্বনের মতো তা নয়নের হাত ছুঁয়ে যায়। নয়ন আর ভয় পায় না। দ্বিধা বোধ করে না। হিংস্রতরতায় দুটি হাতে সে গলা টিপে সাপটাকে টেনে এনে মেঝেতে ছেড়ে দেয়।

সাপটা তার ফণা তোলে। নয়নের কোমর সমান বা তার চেয়েও উঁচুতে। নয়ন সেই উদ্যত মুখে ঠাস করে একটা চড় মারে। সাপটা ঢলে পড়ে আবার চিতিয়ে ওঠে। আক্রোশে রাগে হিংস্রতায় তাকে পরপর কয়েকটা চড় দেয় নয়ন। বলে, শুয়োরের বাচ্চা, ঢোক ঝাঁপিতে, ঢোক...তোর বাবা ঢুকবে...

বলে মাথাটা চেপে ধরে নয়ন মেঝেতে ঠুকে দেয়। লেজ ধরে তুলে প্রায় আছাড় মারে। কেন যে এই আক্রোশ তা বুঝতে পারে না সে, কিন্তু তীব্র জ্বালাময় আনন্দ বোধ করে। সাপটা কী বোঝে কে জানে। অবশেষে তাকে ঝাঁপিতে পাকিয়ে রাখে নয়ন। তার শ্বাস, জিব, চোখ—কোনো কিছুকেই গ্রাহ্য করে না।

ঝাঁপিটা বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বাঁধে। তারপর খাটের তলায় সেটা ঠেলে দিয়ে বিছানায় বসে। সিগারেটটা আড় করে খাটের রেলিংয়ে রেখে দিয়েছিল। সেটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে কাঠ ধরে ফেলেছে। রেলিংয়ের কাঠ জ্বলে গেছে অনেকখানি, ধোঁয়াচ্ছে। সিগারেটটা তুলে নিয়ে খাটের পোড়া জায়গাটায় একবার আঙুল ঘষল নয়ন। আধশোয়া হয়ে সিগারেট টানতে লাগল। শরীর জুড়ে ক্লান্তি নেমে আসছে অন্ধকারের মতো।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে নয়নের চোখে স্বপ্ন ভেসে বেড়ায়। সে জগদীশকে দেখতে পায়। একটা প্রকাণ্ড বাগানে ফুল তুলছে। বাঁ হাতে একটা সাজি। ফুল তুলে সাজিতে রাখছে জগদীশ। কিন্তু সাজিতে রাখা ফুল সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে সাপ। সাজি থেকে অজস্র সাপের ফণা উঁচু হয়ে আছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা চলে এল। সোনেরিলের ঘুম।

বিকেলে বেরোবার মুখে শ্যামার বাবা ধুতি—পাঞ্জাবির ওপর শালটা ঘাড়ে নিয়ে, হাতে চমৎকার লাঠিগাছটা একবার নামিয়ে বেরোতে যাচ্ছে সেই সময়ে কাণ্ডটা ঘটল।

বাইরের সিঁড়িতে পা রেখেছে মাত্র, সেই সময়ে দেখা গেল একা লোক সিঁড়ির মুখেই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে হাফশার্ট আপ পরনে খাকি প্যান্ট, পায়ে কেডস। চোখ—মুখ ফোলা ফোলা, চোখ লাল, মাথাটা জুতোমারা মাথার মতো উলোঝুলো, ধুলোটে। চুর চুর—মাতাল লোকটা শ্যামার কাকা তড়িৎ চৌধুরী। বংশের কুলাঙ্গার। পরিবারে এমন কেউ নেই যে তাকে না সমঝে চলে।

শ্যামার বাবা ভূত দেখার মতো চমকে সিঁড়ি থেকে পা তুলে নিল। মাতাল অবস্থায় না থাকলে তড়িৎ চৌধুরীকে ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু এই অবস্থায় তার ভিতরকার সব জমে থাকা কথা ওগরায়। শ্যামার বাবা বুঝল তার ভাই এখন ওগরাবে। সিঁড়ি থেকে পা তুলে ভিতরে চলে এল, সদরটা বন্ধ করতে করতে টের পেল, তার হাত কাঁপছে বুকে বেড়ে যাচ্ছে রক্তচাপ, মাথা ঝিমঝিম। দরজা বন্ধ করতে করতেই শুনল মাতাল হারামজাদা চেঁচিয়ে বলছে, ওই যে শালা সরিৎ চৌধুরী দরজা দিচ্ছে, ওই যে শালা বেওয়া বিধবার জমি খাস দখল করেছে যে ব্যাটা...

চেঁচামেচিটা শুনতে পেল শ্যামাও। সোয়েটারটার শেষ কয়েকটা কাঁটা বোনা এখন বাকি। দিন—রাত ক'দিন ধরে বুনছে শ্যামা। ফুলহাতা সোয়েটার, উঁচু গলা, তার ওপর প্যাটার্নটাও গোলমেলে—বড্ড পরিশ্রম গেছে। পিঠ টনটন করে, চোখে ঝাপসা দেখে, মাথা টিপটিপ ব্যথা করে। তবু শেষ হয়ে আসছে বলে হাত থামায়নি শ্যামা। আজ রাতে বাবাকে পরিয়ে দেখবে। দেয়ালে হেলান দিয়ে নিজের বিছানায় বসে সে বুনতে বুনতে হঠাৎ চিৎকারটা শুনতে পেল। হাত কেঁপে একটা ঘর গেল পড়ে। কাকার গলা। মাসে—দু'মাসে এক—একদিন কাকা এরকম মাতাল হয়ে আসে, বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, রাস্তার লোক পাড়ার লোক জড়ো করে গালমন্দ পাড়ে। সেইসব গালমন্দের কোনো মানে হয় না। কাকা লোকটা হাইকোর্টে ফোলিও টাইপ করে। বাঁধা মাইনে নয়। ফোলিওর ওপর কমিশন পায়। তার বউ থাকে বাপের বাড়িতে, কাকার বিধবা শাশুড়ি

মেয়েকে নিজের বাড়িতে একখানা বারান্দা সমেত ঘর লিখে দিয়েছেন, পাছে সেটা ভাইরা বেহাত করে সেই ভয়ে। তা ছাড়া কাকার সঙ্গেও বনিবনা নেই, সেই বউ স্কুলে চাকরি করে দুটো ছেলেমেয়েকে খাওয়ায়। কাকা গলা পর্যন্ত মদ গিলে যখন দুঃখ বোধ করে তখন দাদার বাড়ির সামনে বা শ্বশুরবাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচায়; শ্যামার বাবার অপরাধ টালিগঞ্জে যে জমিটায় বাড়ি তুলছে সেটা কাকার শাশুড়ির কাছ থেকে সস্তায় কেনা। খাটাল ছিল, সেটা তুলে দিয়েছে শ্যামার বাবা। কাকার বিশ্বাস জমিটা বাবা না কিনলে শাশুড়ি সেটা কাকার নামে লিখে দিত। একসময়ে কাকার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে থাকত শ্যামারা, নয়নদের পাড়ায়। সে সময়ে কাকার সঙ্গে নয়নের খুব ভাব ছিল। আজও আছে কি না কে জানে! শ্যামা পরিষ্কার শুনতে পায় কাকা চিৎকার করে বলছে, আমার বউকে কানমন্তর দিয়ে ভেন্ন করেছে কোন শালা ওই সরিৎ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করুন আপনারা। বুকে হাত দিয়ে বলুক ওই ব্যাটা আমার বউকে বলেছে কি না—বউমা, মাতালটার ঘর কোরো না তুমি! বলেছে কি না...! পাপ করেছে বলেই ওর ছেলে পাগল হয়ে বেরিয়ে গেছে, ওর শান্তি আছে? শালা সাধু—তান্ত্রিকের পেছনে পয়সা ঢালে, মায়ের পেটের ভাই আমি পেটে আলসার হাতে বাত নিয়ে নুলো হয়ে যাচ্ছি, আমাকে একটা পয়সাও ছোঁয়ায় না...

পড়ে—যাওয়া ঘরটা সাবধানে কাঁটায় ফের তুলল শ্যামা। এখন আর বোনটা এগোবে না। কাঁটা মুড়ে রেখে ওঠে শ্যামা। বাইরের ঘরে বাবা চেয়ারে বসে ঘামছে, পাশে দাঁড়িয়ে মা। পাখাটা পুরো জোরে ঘুরছে। রক্তচাপটা বিপজ্জনক সীমানাতেই ঘোরাফেরা করে বাবার। কখন যে সীমাটা ছাড়িয়ে যায় শ্যামার সেই ভয়!

শ্যামা একটু হেসে বলে, বাবা, অমন করছ কেন? কাল তো আমরা মুরগি খাচ্ছিই।

কাকা যেদিন গালমন্দ করে তার পরদিন সকালে মুরগি হাতে এসে বাবার পায়ে পড়ে। তারপর কেটেকুটে বাড়ির পাশের গলিটায় স্টোভ জ্বেলে নিজেই রান্না করে। নুন ছাড়া খানিকটা তুলে রাখে বাবার জন্য। মা খায় না, বাকিটা কাকা আর শ্যামা খায়। এটাও নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কাকা গাল দিলে পরদিন মুরগি হবেই।

আর মুরগি! বাবা অসহায়ভাবে মুখখানা তুলে বলে। শ্বাস ছেড়ে বলে, কী পাপে যে ওর শাশুড়ির জমিটা কিনেছিলাম!

মা ঝাঁঝ দিয়ে বলে, কেন কিনে দোষটা কী করেছ শুনি! ঠাকুরপোর শাশুড়ি জমিটা তো বেচতই।

বাবা লালচে মুখখানা তুলে বলে, বেচত তো বেচত! আমি নিমিত্তের ভাগী না হলেই হত। ভেবে দেখ, আমার বাড়ি করার তো কোনো অর্থ নেই। আমরা বুড়ো—বুড়ি চোখ বুজলে ও বাড়িতে থাকবে কে?

মা হঠাৎ চুপ করে বাবার দিকে সোজা একটু চেয়ে থাকে, তারপর জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে চোখ, খ্যাপাটে গলায় বলে, বাড়িতে থাকবে কে! কেন আমার টোকন ফিরবে না ভেবেছ? তোমার ধারণা কি যে আমার টোকন নেই? অ্যাঁ!

বাবা ইতস্তত করে বলে, সে কথা বলিনি। আঃ, তুমি বড্ড কথা ঘোরাও, বলছিলাম কি—

তোমার কথা আমি সব বুঝি।

শ্যামা নিঃশব্দে গিয়ে সদরের ছিটকিনিটা খুলল। মা—বাবা ঝগড়া করছে, তাই লক্ষ করল না।

রাস্তায় বিকেলের ভরভরন্ত আলো। কাকা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, তার চারধারে লোক জমেছে। ওধারের পার্কে খেলা হচ্ছিল, খেলা ভেঙে এসেছে কয়েকটা ছেলে, জুটেছে কিছু ভবঘুরে, কিছু ঝি—চাকর শ্রেণীর লোক। কাকা শ্রোতা পেয়ে ডিঙ মেরে যতদূর সম্ভব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বলছে, শালা আমার বউকে যেমন ভেন্ন করেছে তেমনি ওর বউ মেয়েও ভেন্ন হবে। আমার শাশুড়িকে ভজিয়ে যে জমি দখল করে বাড়ি তুলছে সেখানে ইঁদুর বাদুড় ঘুরবে, শকুন পড়বে...

কাকা যখন এরকম অবস্থায় এসে চেঁচায় তখন শ্যামাদের বাড়ির কেউই বাইরে বেরোয় না। তাদের ভয় করে। তবু বাবার প্রেশারের কথা ভেবে ক্ষণেকের জন্য শ্যামা ভয় ভুলে গেল। বারান্দার রেলিং থেকে ঝুঁকে ডাকল, কাকা।

কাকা তখন স্বরচিত একটা ছড়ার মতো অনর্গল বকে যাচ্ছে, এই আমি তড়িৎ চৌধুরী ওই শালার মায়ের পেটের ভাই, কিন্তু আমার শালা গো—ভাগাড়ে ঠাঁই। আই হ্যাভ এ পুয়োর বেলি, মনের দুঃখে মদ গিলি। মশাইরা...বলতে বলতে শ্যামার ডাক শুনে তড়িৎ চৌধুরী ব্রেক কষে তাকাল। তাকিয়েই রইল শ্যামার দিকে, মুখখানা একটু হাঁ করে। তারপর বলল, কী বলছিস?

ভিতরে এসো।

না।

না কেন? যা বলার বাবাকে মুখোমুখি বলো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

আলবৎ চেঁচাব। তোর বাবাকে বেরিয়ে আসতে বল।

বলে তড়িৎ চৌধুরী শ্যামার দিকে পিছন ফিরে আবার চেঁচাতে শুরু করে—মশাইরা শুনুন...ওই যে আমার ভাইঝি শ্যামা...ও নয়ন নামে একটা ছেলেকে ভালোবাসে...ডিপ লাভ, ভেরি ডিপ লাভ...কিন্তু চামার সরিৎ চৌধুরী তবু বিয়ে দেবে না। কারণ কি জানেন? ছেলেটা তেলি...হা হা...তেলি। তেলি আবার কী মশাইরা, অ্যাঁ। মানুষ মানুষ, তার আবার তেলি বামুন কিছু আছে নাকি আজকাল? মেয়েটা ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে একদিন মরবে, ছেলেটা আত্মহত্যা করবে দেখবেন। ওই যে আমার ভাইঝি, ওই শ্যামা, ওটার বিয়ে হবে না...

রাস্তার লোকেরা শ্যামার দিকে চেয়ে আছে। সচেতন হয়ে শ্যামা সেটা বুঝতে পারে। লজ্জায়—অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করে তার মুখ। দেওয়ালের আড়ালে সরে আসে শ্যামা। মুখ লুকিয়ে পালিয়ে আসে ঘরে। থরথর করে তার শরীর কাঁপে।

আধঘণ্টাটাক চেঁচিয়ে কাকা চলে গেল। নিঝুম হয়ে গেল বাড়িটা। রাতে তারা কেউ ভালো করে খেতে পারল না। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বাবা জিজ্ঞেস করে, তড়িৎ নয়নের কথা কী বলছিল রে?

শ্যামা মাথা নত করে বলে, কী জানি।

বাবা চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, নয়ন ওকে মদ—টদ খাওয়াচ্ছে হয়তো। শ্যামা, খুব সাবধানে থাকিস। আমি শিগগিরই তোর বিয়ে দিয়ে দেব।

মা ঝংকার দেয়, পাত্র কোথায় যে বিয়ে দেবে?

আমি সেই ডাক্তার ছেলেটার কথা ভাবছিলাম। বাবা বলে, ছেলেটা বড় ভালো ছিল।

আশায়—আনন্দে হঠাৎ ভিতরে ভিতরে শিউরে ওঠে শ্যামা।

মা মুখখানা পাথরের মতো করে বলে, সন্নিসি—টন্নিসির সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না।

শ্যামার বুকটা অন্ধকার হয়ে যায়।

বাবা মিনমিন করে বলে, নয়ন যদি তড়িৎকে হাত করে থাকে তবে বড় ভয়ের কথা। তড়িৎ মদ খেলে তো যা—তা বলে, শ্যামার নামেও বলবে এর পর থেকে। তাই ভাবছি—

তাই বলে যার—তার হাতে মেয়ে গছিয়ে দিতে হবে নাকি।

যে—সে তো নয়। বিলেতফেরত বড় ডাক্তার, মতি ফিরলে একদিন লাখ টাকা কামাবে।

কামাক। তবু বলব, ও ছেলে অপয়া। যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক ছিল সে মেয়েটা দুম করে মরে গেল, সেটা ভুলো না। তার ওপর ভাবের পাগল লোক, ওদের কি বিশ্বাস আছে?

তবে তুমি কী করতে বলো?

মা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, কী বলব? আমার কি মাথার ঠিক আছে। এ সময়ে টোকনটা কাছে থাকলে আমি এত ভাবতাম না।

বলে মা চোখে একটু আঁচল চাপা দেয়। অনেকক্ষণ পর বলে, যার—তার হাতেই যদি মেয়ে দেবে তো বরং নয়নের হাতেই দাও না কেন!

কী বলছ এসব?

ঠিকই বলছি। অনেক ভেবে দেখেছি। জাতে ছোট তাতে আর আজকাল তো কিছু আটকায় না। মেয়ে নিজে থেকে ছোট জাতে রেজিস্ট্রি করে এলে কী করতে? ফেলে দিতে? তাই বলছি, নয়ন তো উকিলবাবুর এক ছেলে, বিস্তর টাকা—পয়সা। ছেলেটা শ্যামার জন্যই কেমন বাউন্ডুলে হয়ে গেল, নইলে সেও তো ছাত্র ভালোই ছিল, ডাক্তারি সেও পড়ত। বিয়ে না দিলে সে ছেলে হাঙ্গামা করবে না? হয়তো বোম কি ছোরা মারবে, কি আরও কত কাণ্ড করতে পারে। তাই বলছিলাম, মেয়ের বিয়ে দিয়ে চলো আমরা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ি টোকনকে খুঁজতে।

শ্যামা পাত ছেড়ে উঠে যায়।

মায়ের কাছে টোকনই সব, শ্যামা কেউ না, এই সত্যটা ভাবতে ভাবতে শ্যামা রাতে বিছানায় অন্ধকার মশারির বাইরে মশার শব্দ শুনতে শুনতে খানিকক্ষণ জেগে রইল। খুব দূরের একজন মানুষ শ্যামার স্মৃতিতে ক্রমে আবছা হয়ে আসছে। সেই মানুষটির জন্য এক উন্মুখ পিপাসা আজও আছে। থাকবে কি?

শ্যামা পাশ ফিরে শোয়। ফাঁকা বিছানার একটা ধারে একদিন একজন মানুষ জায়গা নেবে। কে সে? নয়ন? নয়নের কথা ভাবতেই শ্যামার শরীরটা কেমন কুঁকড়ে যায় অনিচ্ছায়। তবু যদি নয়নই হয়? হায় ঈশ্বর! শ্যামার ভিতরে এক প্রকৃতিদত্ত প্রতিরোধ আর অনিচ্ছা নয়নের প্রতি ফণা তুলে আছে। মায়ের কথাটা ভাবে শ্যামা। অভিমানে চোখে জল চলে আসে।

ভোররাতে শ্যামা শুনতে পায়, বাইরে একটা ময়না পাখি ডাকছে। চমৎকার কথা বলে পাখিটা। প্রথমে 'রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ' বলে ডাকল, তারপর বলল, 'ওঠো, ওঠো, চোর এসেছে,' আধঘুমের মধ্যে আলস্যভরে শুনছিল শ্যামা। চমৎকার ডাক শিখেছে পাখিটা। তারপরই ভয়ঙ্কর চমকে ওঠে সে। শুনতে পায়। পাখিটা তার জানালার কাছ ঘেঁষে ডাকছে—'শ্যামা, শ্যা—মা তোমার চিঠি, তোমার চিঠি...' তারপর পাখিটা চুপ করে যায়।

নয়নপাখি!

শ্যামা উঠল না, কিন্তু সম্পূর্ণ জেগে শুয়ে রইল।

সকালবেলায় শ্যামা নয়নের চিঠিটা পেল শিয়রের জানালা খুলে। জানালার বাইরের খাঁজে সাদা খামের চিঠিটা পড়ে আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামা চিঠিটা হাতে নিল। নয়ন যতক্ষণ বেঁচে আছে, মুক্তি নেই।

চিঠিতে লেখা—চৌরাস্তায় একবার এসো। না এলে সারাদিন বসে থাকব। মনে রেখো। সারাদিন।

শ্যামা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল।

সময় নিল শ্যামা। অনেকক্ষণ। ভাবল খানিক। তারপর বেলা বাড়লে তাঁতের সাদা খোলের একটা শাড়ি পরে, চুলটা আঁচড়ে চটি পায়ে বেরিয়ে পড়ল।

চৌরাস্তায় গাছতলার পশ্চিমার চায়ের দোকানটার পাশে নয়ন দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের ভাঁড়। শ্যামাকে দেখে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে হাসল দূর থেকেই।

ওর ঝাকড়—মাকড় চুলে একটু সবুজ পাতা খসে পড়েছে। আটকে আছে পাতাটা। অদ্ভুত দেখাচ্ছে নয়নকে। তীব্র, তীক্ষ্ন, জ্বালাধরা চেহারা। সুন্দর নয়, কিন্তু ওর দিকে দু'বার তাকাতে হয়। চলন্ত রাস্তা ওর পিছনে, মানুষজন ব্যস্তভাবে যাচ্ছে, একটা ট্যাক্সি উড়ে গেল, বাস দাঁড়াল। সেই চলন্ত দৃশ্যকে পিছনে রেখে নয়ন দাঁড়িয়ে। চুলে সবুজ একটা পাতা। গা—টা শির শির করে শ্যামার। ভয়? হবেও বা।

কী চাও নয়ন?

নয়ন মাটিতে রাখা একটা ঝোলা বাঁ হাতে তুলে নিল। বলল, ওদিকে একটা কবরখানা আছে না?

মসজিদ।

মসজিদই হবে। সেখানে মাঠটা নির্জন। চলো।

কেন?

কথা আছে।
কথা শেষ হয়ে গেছে নয়ন।
নয়ন অকপট হাসি হাসে। বলে, দূর, কথা কি শেষ হয়? শোনো শ্যামা, আমার খুব একটা সময় নেই। বাবা বোধহয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে। মারা গেলে অনেক ঝামেলা। আমাকে দেরি করিয়ো না। বলে নিই। চলো।
শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নেয়। নয়ন হাঁটতে থাকে।
শ্যামা তার পিছনে।
মাঠটা আজও ফাঁকা। রোদ পড়ে আছে।
তোমার বাবার কী হয়েছে নয়ন?
সেরিব্রাল থ্রম্বসিস। আশা নেই।
তা হলে তুমি এখানে কেন? এখন তো তোমার বাড়িতে থাকাই উচিত।
উচিত। ঠিকই তো। কিন্তু তোমার জন্য একটা জিনিস বয়ে এনেছি অতদূর থেকে, না দেখিয়ে যাই কী করে? তা ছাড়া লাভ কী? বাবার জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলেও আমাকে তার কিছু বলার ছিল না, বা আমার কিছু শোনার ছিল না। আমরা একবাড়িতে থাকতাম, এইমাত্র।
তবু তুমি যাও। তোমার মায়েরও তো একজন সহায় চাই এ সময়ে।
তুমি আমাকে যা হোক বলে তাড়াতে চাইছ শ্যামা। আমি তো বলছি, কাজ হলে যাব। আমার বাবার জন্য দুঃখ পেয়ো না শ্যামা, আমি পাই না। যারা মরবার জন্য সবসময়ে প্রস্তুত থাকে তারা কাউকে মরতে দেখলেও স্থির থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যায়।
শ্যামা শ্বাস ফেলে বলে, এ তো যে কেউ নয়। তোমার বাবা।
নয়ন একটু বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি বড় সেকেলে শ্যামা। বাবা বাবা বাবা! বাবা তো কী? বাবা তো একটা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক—চিহ্নিতকরণের অভিধা মাত্র। বেশি কিছু নয়। তাই কেউ বাবা তুলে গাল দিলে আমার কোনো রি—অ্যাকশন হয় না।
নয়ন নিচু হয়ে চাদরের গিঁট খুলল। ঝাঁপিটা বের করে ঘাসের উপর রাখল সযত্নে। শ্যামার দিকে চেয়ে হাসল।
শ্যামা ঝাঁপিটা দেখে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। নয়ন পকেট থেকে চামড়ার দস্তানা বের করে দু'হাতে পরে নিল।
ওটাতে কী আছে নয়ন?
নয়ন খুব খুশির হাসি হাসল, সাপ। একটা গোখরো সাপ শ্যামা।
বলেই চকিতে ঝাঁপির ঢাকনাটা তুলে নিল।
কপিশ একটা শরীর পাকে—পাকে জড়িয়ে আছে। গায়ের ঝকঝকে আঁশে রোদ চলকে ওঠে।
শ্যামা দু'পা পিছিয়ে আসে, নয়ন! বলে আর্তস্বরে ডাকে।
ভয় নেই শ্যামা।
শ্যামা এক অদ্ভুত চোখে নয়নের দিকে তাকায়। পরমুহূর্তে সাপটার দিকে।
তুমি পাগল।
সাপটা একটু অনড় রইল। তারপর আস্তে তার পিচ্ছিল শরীর পাক ছাড়তে থাকে। ঝাঁপির কাণার ওপর দিয়ে মুখ বের করে। তারপর হড়হড় করে নেমে আসতে থাকে ঘাসে, মাটিতে। আসছে তো আসছেই, শরীরের যেন তার শেষ নেই।
শ্যামা একটা চাপা চিৎকার করে প্রথমটায় মুখ ঢাকল, তারপর হঠাৎ ঘুরে দৌড়তে লাগল। কিন্তু পারল না। অভ্যেস নেই তার ওপর শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে।

নয়ন দৌড়ে এসে তার বাঁ হাত চেপে ধরে বলে, দোহাই, ভয় পেয়ো না। আমি তো আছি। দেখো।

বলে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নয়ন দৌড়ে ফিরে গেল। সাপটা ততক্ষণে সর সর করে দেয়ালের ইটের খাঁজের দিকে অনেকটা চলে গেছে। নয়ন দৌড়ে গিয়ে দস্তানা পরা আনাড়ি হাতে সাপটার ঘাড় চেপে তুলে আনল। লকলকে সাপটা মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে ছোবল দিতে চেষ্টা করে। একটুর জন্য পারল না। নয়ন ঝাঁকি দিয়ে সেটাকে নির্জীব করে দিয়েছে।

শ্যামার দিকে চেয়ে নয়ন হাসে, বিষদাঁত নেই।

শ্যামা বিশাল চোখে চেয়ে থাকে।

আর সেই চোখ দু'খানা মুগ্ধ হয়ে দেখে নয়ন। ঠিক এরকমই সে চেয়ে এসেছে এতকাল। এরকম বিস্ময় মাখানো মুগ্ধ চোখে শ্যামা তাকে চেয়ে দেখবে।

ঝাঁপির ভিতরে মুখটা ঢোকাতেই সাপটা আপনা থেকেই অভ্যস্ত পাকে জড়িয়ে নিঃঝুম হয়ে যায়। ঝাঁপিটার ঢাকনা বন্ধ করে দিল নয়ন।

কাল সারা রাত ধরে ওটাকে নিয়ে প্র্যাকটিশ করেছি। শিখে যাব শ্যামা।

শ্যামা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। তারপর জিজ্ঞেস করে, কী শিখে যাবে?

ধরা। কিছু না। জগদীশ খুব চাল নিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা একদম সোজা।

জগদীশ কে?

একজন। সাপ ধরে। ওস্তাদ লোক, কিন্তু শেখাতে চায় না।

তুমি সাপ ধরতে শিখছ? কেন?

তোমার জন্য।

শ্যামা বিস্ময়ে চোখ বড় করে বলে, আমার জন্য?

তোমার জন্যই। তোমাকে চমকে দেব বলে। দিইনি!

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলল, দিয়েছ। অনেকদিন আমি এমন চমকাইনি।

শিশুর মতো খুশিতে হাসে নয়ন। ওর রগ—ওঠা, চোখ—বসা মুখখানা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। তার মাথার চুলে এখনও সবুজ পাতাটা লেগে আছে। সে আস্তে করে বলে, শ্যামা, আমি সব পারি। সব।

নয়ন, তুমি বাড়ি যাও।

কেন?

তোমার বাবার কাছে যাও।

নয়ন একটু চমকে বলে, ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম। যাচ্ছি শ্যামা।

বলে তাড়াতাড়ি চাদরটা দিয়ে ঝাঁপি বাঁধে নয়ন। বাঁধতে বাঁধতেই মুখটা তুলে বলে, শ্যামা, তুমি ঠিক যেমন চাও আমি ঠিক তেমনটি হব। দেখে নিয়ো। আমাকে সময় দাও শুধু।

শ্যামার একটু মায়া হয়। আবার ভয়ও। সেই পুরনো কথা নয়ন আজও বলে যাচ্ছে।

সাপটাকে কোথাও ছেড়ে দিয়ো নয়ন।

নয়ন একটু হাসে, কেন শ্যামা? আমার জন্য ভয় পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

ওটার বিষদাঁত নেই।

গজাবে।

নয়ন একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবে, তারপর বলে, তখন দেখা যাবে।

শ্যামা আস্তে করে বলে, নয়ন, এ রকম পাগলামি করছ কেন? আমাকে চমকে দেওয়ার জন্য এতটা করার কোনো মানে হয় না।

নয়ন হি হি করে হাসে, এবার যদি আমাকে বিয়ে না করো শ্যামা, তবে একদিন তোমার ঘরে এটা চুপ করে ছেড়ে দিয়ে আসব।

তা হয় না নয়ন।

কী হয় না?

তোমার সঙ্গে বিয়ে।

কেন?

আমি তোমাকে ভালোবাসি না।

সে কথা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু তোমাকে বাসতেই হবে।

কাঙালপনা করতে তোমার ঘেন্না হয় না?

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্যামা মনস্থির করে বলে, নয়ন, আমি আর একজনকে ভালোবাসি।

নয়ন চমকে যায়। চেয়ে থাকে। শ্যামা অস্বস্তি বোধ করে চোখ সরিয়ে নেয়।

নয়ন অবাক গলায় বলে, শ্যামা, এরকম কথা আগে কখনও বলোনি। তোমার অনেক ফ্যান, বহু ছেলে ঘুরেছে তোমার পিছনে, কলেজে ইউনিভার্সিটিতে।

নয়ন, আমি সত্যি বলছি।

লোকটা কে?

তুমি চিনবে না, সে দূরের লোক।

তবু শুনি। কী করে সে?

ডাক্তার।

ডাক্তার? নয়ন শুকনো জিব ঠোঁট দিয়ে চাটে। তারপর আকুল গলায় বলে, কয়েকটা বছর সময় আমাকে দাও শ্যামা, আমি ডাক্তারি পাশ করব। দিনরাত পড়ব।

আমি ডাক্তারটাকে ভালোবাসি না। মানুষটাকে।

সে কেমন মানুষ বলো। আমি হুবহু তার মতো হব।

শ্যামা ম্লান একটু হাসে। বলে, বাড়ি যাও নয়ন। বাবার কাছে যাও।

সাপের ঝাঁপিটা হাতে নয়ন দাঁড়িয়ে আছে, দৃশ্যটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় শ্যামা। তারপর ঝাঁপিটার ভিতরে মৃদু একটা শ্বাসের শব্দ হয়।

উকিলবাবুর জ্ঞান আর ফেরেনি।

সাপের ঝুড়ি ঝোলায় নিয়ে যখন ফিরল নয়ন তখন বেলা এগারোটা। বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফুল এবং মালা হাতে কয়েকজনকে দেখা গেল। বাড়িটা খুব নিস্তব্ধ। কেবল ওপরতলায় মা শ্বাসকষ্টের সঙ্গে লড়াই করে একরকম কান্নার শব্দ বের করছে মাঝে—মাঝে।

নয়ন শান্তভাবে তার ঘরে চলে গেল। সাপের ঝুড়িটা সাবধানে রাখল খাটের নীচে, একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বিছানায় পড়ে রইল একটুক্ষণ। কিছুক্ষণ সে তার বাবার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। পারল না। হাল ছেড়ে সে শ্যামার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। আশ্চর্য, তাও পরিষ্কার মনে পড়ল না। শ্যামার বদলে নার্স মেয়েটির মুখখানা ভেসে উঠল চোখে। একটু হাসে নয়ন। ঘুমহীন চোখজোড়া জ্বালা করে। সিগারেটের ধোঁয়া উড়ে আসে চোখে। চোখ বোজে। তারপর ক্লান্তিহর ঘুমের কথা ভাবে কাঙাল নয়ন। সে কবে একটু ঘুমোবে সোনেরিল না খেয়ে?

চাকর—বাকররা উঁকি দিচ্ছে। ডাকতে সাহস পায় না কেউ। নয়ন আধবোজা চোখে দরজার পর্দায় কয়েকটা ছায়ার আনাগোনা দেখল। তারপর উঠল ধীরে—সুস্থে। একবার ওপরে যাওয়া দরকার। শ্মশানে

যেতে হবে। এ সময়টায় সে কলকাতায় না থাকলেই ভালো হত।

ঠাকুরটা ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে। খবরটা নয়নকে দেওয়ার জন্য চোখ—মুখ উদগ্রীব। সব মানুষেরই এই একটা দুর্বলতা থাকে, খবরটা ভালো হোক বা মন্দ হোক, সবার আগে সে খবরটা পৌঁছে দিয়ে সে এক ধরনের তৃপ্তি বোধ করে। যেন একটা কম্পিটিশনে জিতে গেছে। ঠাকুরটার মুখে—চোখেও সেইরকম উত্তেজিত ভাব। নয়ন বেরোতেই সে কাছে এসে বলে, বাবু, বড়বাবু নেই—

নয়ন একটু বিস্ময়ের ভান করে বলে, নেই? কোথায় বেরিয়েছে? এত বেলায়?

চাকরটা খাওয়ার টেবিলে ন্যাতা বোলাচ্ছিল। আসলে ন্যাতা বোলানোটা কাজ নয়, নিজেকে মোতায়েন রেখেছে ওইখানে, নয়ন বেরোলে খবরটা দেবে, কিন্তু নয়নের কথা শুনে চালাক চাকরটা ফিক করে একটু হেসে সামলে গেল, বলল, বেরোননি। মারা গেলেন একটু আগে।

নয়ন গম্ভীর চোখে চাকরটাকে একটু দেখল। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল চাকরটা।

নয়ন ঠাকুরকে ডেকে বলে দিল, আমার ঘরে এর মধ্যে কেউ যেন ঝাঁট—ফাঁট দিতে না যায়, দেখিস। ঘরে আমি একটা গোখরো সাপ পুষছি। কেউ যদি ঢোকে টের পাই তবে জুতিয়ে কিন্তু বাড়ি থেকে বের করে দেব।

ঠাকুরটা সভয়ে ঘাড় নাড়ে।

নয়ন সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। অনেক লোক জমেছে ওপরতলায়। বার লাইব্রেরি থেকে তার বাবার বন্ধুরা এসেছে, মক্কেল এসেছে, আর আত্মীয়স্বজন। ফুল আর ধূপকাঠির গন্ধে টেঁকা যায় না। নয়নকে দেখে মা আর একবার শ্বাসকষ্ট চেপে কাঁদবার চেষ্টা করে। কিন্তু তেমন কোনো শব্দ হয় না। দু'—একজন বুড়ো বয়স্ক আত্মীয় নয়নকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে অনিচ্ছার সঙ্গে। তারা নয়নকে চেনে। দু'—একটা কথা বলে তারা চুপ করে যায়, বৃথা জেনে।

কিন্তু নয়নের মুখে একটা বিষাদের ভাব ফুটেছিল ঠিকই, সে তার ক্লান্তির জন্য। ঘুমহীন জ্বালাধরা চোখের কোলে কালি, ভাঙা মুখে শিরা—উপশিরা, পিঙ্গল এলোমেলো ধুলোটে চুল। নার্স মেয়েটা খাটে শোয়ানো দেহটার মাথা এবং বুক জুড়ে বার লাইব্রেরি থেকে পাঠানো একটা প্রকাণ্ড ফুলের মালা সাজিয়ে রেখে নয়নের কাছে এগিয়ে এল। বলল, আপনি খুব ভেঙে পড়েছেন।

নয়ন একটু হাসতে গিয়ে হাসল না। বলল, মাথাটা বড্ড ধরেছে। আপনার কাছে অ্যাসপিরিন বা ওইরকম কিছু আছে?

না। আমি ওসব রাখি না।

তবে কী আছে?

মেয়েটা একটু ইতস্তত করে বলে, কী চাই বলুন, কাউকে ডেকে আনিয়ে দিই।

নয়ন একঘর লোকের চোখের সামনেই মেয়েটির দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে বলল, অ্যাসপিরিন না থাকে, ক্লোরোফিল বা ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন, কিছু নেই? নাথিং?

মেয়েটা বোবার মতো ঘাড় নাড়ে।

নয়ন দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে বলে, শ্মশান পর্যন্ত হেঁটে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে!

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন নির্ভাবনায় বলে, কেন কষ্ট হবে জানেন? শ্মশানে যাওয়ার সময়ে কেউ আজ কথা বলবে না। একটা ট্র্যাজিক ব্যাপার তো। কিন্তু অতদূর রাস্তা চুপ করে মুখ বুজে যাওয়া ভারী কষ্টের। আমি এখন অনেক কথা বলতে চাই।

মেয়েটার চোখে—মুখে ক্রমশ একটা ভয়ের ভাব ফুটে ওঠে। নয়ন তা লক্ষ করে। আস্তে করে বলে, আপনি যাবেন না শ্মশানে?

আমি! আমি কেন যাব?

গেলে দোষ কী? আমি বরং একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করি। ডেডবডি নিয়ে শ্মশানবন্ধুরা যাবে। আমরা ঘুরপথে অন্য রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাব। শ্মশানে যাচ্ছি বলে মনেও হবে না, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। চলুন না।

না।

মেয়েটা মাথা নাড়ল। তারপর খাটের কাছে ফিরে গেল আবার।

ফ্ল্যাশলাইট লাগানো ক্যামেরা হাতে দুজন লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে বিরক্ত হয়ে নয়ন বারান্দায় বেরিয়ে এল। মরেই গেছে লোকটা তবু তার ছবি কেন যে তুলে রাখে মানুষ। মরা মানুষের ছবিতে মানুষটা চিরকাল মৃতই থেকে যাবে।

বারান্দায় বাতাস আর রোদ খেলা করছে। রেলিংয়ে দুটো চড়াই। 'কিচিক কিচিক' শব্দ করে লাফিয়ে তারা পরস্পরের কাছে আসছে। খেলছে। অন্যমনেই নয়ন আপনা থেকেই শব্দটা গলায় তুলে আনল। ডাকতে লাগল '—কিচিক—চি—র—র—র—কিচিক—'

শ্মশান থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল। নয়ন স্নান করেনি। আদিগঙ্গার এক হাঁটু কাদায় নেমে এক কোষ ময়লা জল তুলে মাথায় চাপিয়েছিল। ফেরার সময়ে ইচ্ছে করেই দলছুট হয়ে একা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে এক কাপ চা আর গোটা কয় সিঙাড়া খেল। তাতেই বুক জুড়ে অম্বল উঠল ঠেলে। শরীরটায় একটা জ্বালাভাব। সারাটা দিনের রোদ, চিতার আঁচ, ধোঁয়া—সব মিলিয়ে চড়চড় করছে গায়ের চামড়া।

বাড়িতে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে ঠান্ডা জলে স্নান করে নয়ন। কোরা কাপড় পরে খাওয়ার ঘরে এসে দেখে নার্স মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ, চুল আঁচড়ানো, পায়ে চটি।

চলে যাচ্ছেন? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটি সামান্য একটু হাসে, বলে, যাচ্ছি। তবে আপনার মায়েরও নার্সিং দরকার, তাই কাল সকালে আবার আসব।

নয়ন হাই তুলে বলে, রাতে নার্সিংয়ের দরকার হয় না বুঝি?

হবে না কেন? রাতের শিফটের নার্স এসে গেছে।

বলে মেয়েটি হাসল, তারপর নয়নকে ভীষণ চমকে দিয়ে বলল, এই নার্সটি কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে।

নয়ন একটু বোকা বনে গিয়েছিল। এতটা আশা করেনি। একটু থমকে গিয়ে বলে, আচ্ছা।

মেয়েটা চলে যায়।

ঘরে এসে নয়ন কয়েকটা ঘুমের বড়ি গিলে পড়ে থাকে।

তার বাবা কত টাকা রেখে গেছে তার হিসেব নয়ন রাখে না। তবে, অনেক টাকা, অনেক। নয়নের বাকি জীবনটা কিছু না করলেও এসে যাবে না। তার বাবা ছিলেন উকিল মানুষ। আয়কর ফাঁকি দিতে ওস্তাদ লোক। ব্যাঙ্কের লকার, মায়ের গয়না, লুকনো টাকা— সবকিছুর হিসেব নয়ন বোধহয় কোনোদিনই বের করতে পারবে না। কলকাতায় আরও একটা বাড়ি আছে তাদের, হাজারখানেক টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাবা মাঝে মাঝে শাসিয়ে বলত বটে, সব সম্পত্তি উইল করে ভারত সেবাশ্রম সংঘকে দিয়ে যাবে, কিন্তু বাস্তবিক সেটা করার মতো যথেষ্ট মানসিক জোর তার ছিল না। নয়ন জানে, তার বাবা তাকেই সব দিয়ে গেছে। তার এক দাদা আছে। দীর্ঘকাল আগে সেই দাদা আপন পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিল ভালোবেসে, বাবা তাই তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল। সেই দাদা বাইরে ভালো চাকরি করে। তাকেও শেষ পর্যন্ত বাবা কিছু দিয়ে গেছে কি না কে জানে। সেই দাদা হয়তো কিছু দাবি—দাওয়া করতে পারে। করুক। নয়নের তাতে কিছু যায় আসে না, সে যে নিজে বেশ কিছু টাকা—পয়সা হাতে পাবে, এই খবরটাই যথেষ্ট।

ভাবতে ভাবতে সোনেরিলের আচ্ছন্নতায় ডুবে যায় নয়ন। তারপর স্বপ্ন দেখে। মোনা ঠাকুরের কালীমূর্তি জ্যান্ত হয়ে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছে। জগদীশকেও দেখা যায়, মাফলারের বদলে গলায় একগাদা সাপ জড়িয়ে খুব কাশছে। এমনি পাগলাটে খ্যাপাটে সব স্বপ্ন।

সোনেরিলের ঘুম নয়নের বেশিক্ষণ থাকে না। ওষুধটা তাকে আজকাল আর তেমন ধরছে না। রোজ খায় বলেই বোধহয়। মাঝরাতে নয়নের ঘুম ভাঙল। ঘরের বাতিটা জ্বলছে, পায়ের দিককার জানালা খোলা। ভীষণ ঠান্ডা আসছে। বিছানার চাদর তুলে নয়ন মুড়ি দিয়ে বসে সিগারেট খেল। রাতটাই অসহ্য, কিছু করার থাকে না।

জানালাটা বন্ধ করে নয়ন সাপের ঝুড়িটা বের করে। দু'হাতে চামড়ার দস্তানা পরে ঢাকনাটা খোলে। সাপটা ঘুমোচ্ছে। দেখে নয়ন ভারী হিংসে বোধ করে। সাপটাকে খোঁচাতে আঙুল উঁচিয়েছিল নয়ন। তারপর আবার সাবধানে ঢাকনাটা চাপা দিয়ে ঝুড়িটা খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর একঘেয়ে এই জেগে থাকা থেকে মুক্তি পেতে সোনেরিলের কৌটোটা টেবিলের ওপর খুঁজতে লাগল। আর হঠাৎ তখনই মনে পড়ল, নার্স মেয়েটি বলে দিয়েছিল, রাতের শিফটের নার্স দেখতে সুন্দর। মনে পড়তেই নয়ন আপনমনে একটু হাসে।

সিঁড়ি বিয়ে বেড়ালের মতোই নিঃশব্দে উঠে আসে নয়ন। মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। সে মৃদু টোকা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মিহি মেয়ে গলায় প্রশ্ন আসে, কে?

দরজাটা খুলুন।

পায়ের শব্দ ভিতরে দরজার কাছে আসে। নয়ন উত্তেজনা বোধ করে।

আপনি কে? প্রশ্ন আসে।

আমি নয়ন।

নয়ন কে, আমি চিনি না।

এ বাড়ির ছেলে। আমার মাকে দেখতে এসেছি।

ও!

পরমুহূর্তেই ছিটকিনির শব্দ। দরজা খুলে যায়।

সুন্দর! না, মোটেই না। ভারী হতাশ হয় নয়ন। বড্ড রোগা মেয়েটি। গায়ের রং ফ্যাকাশে। দেখলেই বোঝা যায়, মেয়েলি রোগে ভোগে। ম্যাল—নিউট্রিশন। ক্যালোরি খায় না। প্রোটিন নেই। ভিটামিন সি—এর অভাব। তবু মেয়ে।

মেয়েটি দরজা ছেড়ে দিয়ে বলে, উনি ঘুমোচ্ছেন।

কে?

নয়ন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

আপনার মা। আপনি তো মাকে দেখতেই এসেছেন।

ওঃ, হ্যাঁ। থাক, ঘুমোচ্ছে যখন ঘুমোক।

চিন্তা নেই। উনি সামলে উঠেছেন।

নয়ন হাসল। বলল, আসলে আমার বাবা আর মা'র মধ্যে রিলেশনটা তেমন ভালো ছিল না। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারত না।

মেয়েটা কথা বলল না। অপ্রস্তুতভাবে চুপ করে রইল।

নয়ন জিজ্ঞেস করে—আপনি কী করছেন?

তেমন কিছু না। অ্যালার্ট থাকছি, যদি কিছু দরকার হয়।

বোরিং লাগছে না?

আমার অভ্যাস আছে।

তা তো আছেই। তবু বড় একঘেয়ে। আমারও ভীষণ ইনসোমনিয়া। একা জেগে থাকতে যে কী কষ্ট!

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন বলে, চা খাবেন?

চা?

চা। আমি নিজে করব, তারপর দুজনে গল্প করতে করতে খাব। আসুন না নীচের খাওয়ার ঘরে।

মেয়েটা ইতস্তত করে।

নয়ন মৃদুস্বরে বলে, মা নিশ্চয়ই ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে ঘুমোচ্ছে?

না। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি।

তবে জাগবে না। নিশ্চিন্তে আসুন।

নয়ন পিছু ফিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চটপট সিঁড়ি ভেঙে নীচে আসে। চায়ের সরঞ্জাম সাজানোই থাকে খাওয়ার ঘরে নয়নের জন্য। ঘুমহীন রাতে সে উঠে কখনও কখনও চা খায়। দু কাপ জল চাপিয়ে নয়ন খাওয়ার টেবিলে এসে বসতে না বসতেই মেয়েটি এল। মায়ের ঘরের অল্প আলোতে স্পষ্ট দেখা যায়নি। এখন দেখল নয়ন, মেয়েটির মুখশ্রী খুব খারাপ নয়। দাঁতগুলো একটু উঁচু, নাক ভোঁতা, তবে চোখ দু'খানা ভালোই। সিঁথিটায় সিঁদুর থাকতে পারে, নয়ন সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মেয়েটি অবাক চোখে নয়নকে দেখছে। হয়তো ভয়ও পাচ্ছে। যে লোকটার বাবা আজ সকালে মারা গেছে তার এমন সহজ ভাব দেখেই হয়তো বিস্ময়।

নয়ন চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে মেয়েটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসে, বলে, বাবার সঙ্গে আমার রিলেশনও ভালো ছিল না। উই ওয়্যার মিউচুয়াল এনিমিজ।

মেয়েটা চুপ করে থাকে। কী বলবে ভেবে ঠিক করতে পারে না।

নয়ন বলে, কিন্তু তবু বাবার কয়েক লাখ টাকা আমিই পাব।

মেয়েটা ভ্রূ তুলে সামান্য কৌতূহলের গলায় বলে, কয় লাখ?

নয়ন ঠোঁট ওল্টায়, কে জানে! বিশ—ত্রিশ লাখ হতে পারে। দশ বারো লাখও হতে পারে। বাবার অঢেল ব্ল্যাক মানি ছিল।

টাকাটা পেয়ে কী করবেন?

নয়ন চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখি বসতেই মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

কী করব! কী আবার, ওড়াব।

ওড়াবেন মানে? ওড়াবেন কেন?

অত টাকা নিয়ে আর কী করা যায়। চাকরি করব না, ব্যবসা করব না, কিছু করার দরকার হবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার বেকার সমস্যা নেই। আমার সমস্যা সময় নিয়ে। আয়ুর লম্বা সময় জেগে থেকে কাটিয়ে দিতে হলে টাকা ওড়ানো ছাড়া কী করা যাবে!

মেয়েটা ঠিক বুঝল না, একটু সময় নিয়ে বলল, জেগে থেকে কেন বলছেন?

আমার ইনসোমনিয়া। বড্ড কষ্ট। ঘুম হয় না। সেই নির্ঘুম সময়টায় আমি চলে যাব রাতের ক্লাবে—যেখানে সারারাত নাচ গান হয়। একটা গাড়ি কিনে সারা রাত ধরে চালাব রাস্তায়—রাস্তায়। মাইনে করা লোক রাখব যারা সারারাত আমার সঙ্গে জেগে থেকে তাস দাবা খেলবে, গল্প করবে। একটা প্রোজেক্টার মেশিন কিনে সারারাত ফিলম ঘুরিয়ে ছবি দেখব। সোনেরিলে আজকাল আর ঘুম তেমন হয় না। সব ওষুধেরই ইমমিউনিটি আছে। ভয় হয়, এরপর আর ঘুমের ওষুধে কাজই হবে না। সারাটা জীবন জেগে থাকতে হবে।

মেয়েটা ডান গালে একটা আঙুল ছুঁইয়ে বসে তাকিয়ে আছে। খুব অবাক দৃষ্টি। একটুও ঠাট্টার ভাব নেই মুখে। সিরিয়াস ধরনের মেয়ে। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে বলল, অনেক সময় সেরেও যায়।

কীরকম?

নয়ন কৃত্রিম আগ্রহ দেখায়।

একটা মেয়েকে চিনতাম যে ঘুমোত না বলে তার স্বামী তাকে সেতার কিনে দেয়। সারারাত ধরে মেয়েটা আলাদা একটা ঘরে বসে সেতার বাজিয়ে সময় কাটাত। প্রথমে টুংটাং করতে করতে আস্তে আস্তে সে সুর বুঝতে শেখে। সেতারের প্রাণটাও সে একদিন ধরতে পারে। সারা রাত ধরে সে সেতারে ডুবে থাকতে শিখল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সে সেতারের শব্দ পার হয়ে সুরের নিস্তব্ধ জগতে পৌঁছে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে সেতার থামিয়ে চুপ করে ঝুম হয়ে বসে থাকত। সে আমাকে বলেছিল, ওই ভাবে বসে থেকে সে এক নিস্তব্ধতার সুর শুনতে পেত। শুনতে শুনতে সে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

নয়ন হাসল, এ তো গল্প।

গল্প নয়। তবে গল্পের মতোই। মেয়েটা সেরে গেছে।

সত্যি?

সত্যি।

টেবিলের ওপরের মসৃণ খয়েরি সানমাইকায় ধীর গতিতে নয়নের হাতটা এগিয়ে যায়। নয়ন লোল হেসে বলে, আমি যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে আমার একটা শর্ত হবে।

কী শর্ত?

সারা রাত তাকে জেগে থাকতে হবে। দিনের বেলায় সে যত খুশি ঘুমিয়ে নিক, কিন্তু রাতে, রোজ রাতে আমাদের বাসর জাগা। কেউ বোধ হয় রাজি হবে না। না?

হতে পারে।

কে হবে! আমি জানি, মেয়েরা রাত বারোটার বেশি জাগতে ভালোবাসে না। তারা বড় ঘুমকাতুরে।

বলতে বলতে নয়ন হাত বাড়ায়। মেয়েটা একটা হাতে মাথার ভর রেখে হেলে বসেছে। নয়ন ভঙ্গীটা দেখল। চওড়া টেবিল প্রায় অতিক্রম করেছে তার হাত। সে হাতখানা তোলে ফণার মতো।

আপনি পারবেন না?

কী?

মেয়েটা চমকে উঠে বলে।

ঝপ করে ছোবল দেয় নয়নের হাত। উত্তপ্ত ব্যাকুল হাতে মুঠো করে ধরে একরাশ বকুলের নরম করতাল। পিষে ফেলে নির্যাস নিংড়ে নিতে নিতে বিকৃত ভয়াল গলায় বলে, আমার সঙ্গে জেগে থাকতে। রোজ। পারবেন না?

লক্ষপতির সঙ্গে জেগে থাকতে কোন মেয়ে রাজি নয়? এ মেয়েটিও হয়তো রাজি হত। কিন্তু নয়নেরই দোষ। সে যা চায় তার জন্য সময় দেয় না। মেয়েটা 'ছাড়ুন ছাড়ুন' বলে চাপা গলায় চিৎকার করে হাত ছাড়িয়ে নেয়। হাঁফায়। চেয়ার—টেবিলের ঘোর শব্দ ওঠে নিশুত রাতে। চাকর—বাকর জেগে যাবে। তাই নয়ন আর চেষ্টা করে না। মেয়েটা দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়।

নয়ন ঘরে গিয়ে সাপের ঝুড়িটা টেনে আনে। ঝাঁপি খুলে দস্তানা পরা হাত এগিয়ে টেনে তোলে সাপটাকে। মুখোমুখি ভয়ঙ্কর দুজন দুজনের দিকে তাকায়। তারপর শুরু হল আক্রমণ। এবং প্রতি—আক্রমণ। রাত ভোর হয়ে আসে।

দিনের বেলায় আবার চমৎকার বোধ করে নয়ন। ঘুমের জন্য তার একটুও দুঃখ হয় না। শরীরটা হালকা লাগে। চায়ের সঙ্গে গোটা দুই অ্যাসপিরিন গিলবার পনেরো মিনিট পর আধকপালে মাথা ধরাটাও ছেড়ে গেল।

খবরের কাগজ অনেকদিন দেখা হয়নি। আজ খাওয়ার টেবিলের ওপর কাগজটা পড়ে আছে দেখে তুলে নিল। বরাবর সে খেলার পাতাটা আগে দেখে। খুলে দেখল, দলীপ ট্রফির একটা আঞ্চলিক খেলা চলছে ইডেনে। আজ দ্বিতীয় দিন।

কিছু না ভেবেই নয়ন পোশাক পালটাল। জলপাই রঙের প্যান্ট, লাল জামা, গলায় রঙিন সিল্কের মাফলার, চওড়া বেল্ট, চোখে রোদচশমা। বেরিয়ে সে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনল। দোকানের আয়নায় নিজের ধারালো চেহারাটা দেখল একটু। দেখতে দেখতে শিস দিল। দু'হাতে চুলগুলো চেপে ঠিক করে নিচ্ছিল, সে সময়ে লক্ষ্য করল দোকানদার মহাদেব তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই মহাদেব বলল, বাবু, কাল তো বড়বাবু মারা গেলেন।

হ্যাঁ মহাদেব। আফসোসের ব্যাপার।

নয়ন গলায় যথেষ্ট দুঃখ ফোটাতে চেষ্টা করে!

তো ইটা আপনার কী পোশাক হল? ই সময়ে কেউ প্যান্ট—শার্ট পরে? নোত্তুন কাপড় পরে তো!

ঝাঁৎ করে ভুলটা ধরতে পারে নয়ন। কখন যে বে—খেয়ালে কোরা কাপড়টা ছেড়ে অভ্যাসবশত রোজকার মতো প্যান্ট—শার্ট পরেছে তা বুঝতেই পারেনি। ভুল হয়ে গেছে বড়। পাড়ার চেনা লোকেরা অবশ্যই দেখেছে নয়নকে এই পোশাকে। নয়ন জিভ কাটল।

ভুলটা শোধরাতে নয়ন তাড়াতাড়ি পাড়ার রাস্তাটা হেঁটে পার হয়ে আসে। অচেনা মানুষজনের মধ্যে এসে স্বস্তি বোধ করে। ট্যাক্সি ধরে বড় রাস্তায়। শোকের পোশাকটা ভুল করে ছেড়ে ফেলেছে ঠিকই। তবু ট্যাক্সিতে বসে ভুলটার জন্য আবার ভালোই বোধ করতে থাকে সে। একজনের মৃত্যুর ঘটনা আর একজনের পোশাকে বিজ্ঞাপনের মতো ঝুলিয়ে রাখার মানে হয় না। নয়নের মুখে তো লেখা নেই যে গতকাল তার বাবা মারা গেছে। স্বাভাবিক পোশাকে সে বরং বেশ সহজ বোধ করতে থাকে।

মাঠে সে সাইট স্ক্রিনের পাশে গ্যালারিতে উঠে বসে। বেশ ভিড়। ভিড়ে কেউ কারও চেনা নয়। নয়ন অলস ভঙ্গিতে বসে খেলা দেখে।

ইস্ট জোন—এর সাত নম্বর খেলোয়াড় সেঞ্চুরি করবে বলে কেউ ভাবেনি। কিন্তু সারাটা সকাল ঠুকে ঠুকে খেলে ছেলেটা নব্বুইয়ে যখন পৌঁছে গেল তখন প্রথম খেলাটায় কিছু উত্তেজনা বোধ করে নয়ন। একটু ঝুঁকে বসে। ছেলেটা একটা ওভার মেডেন দিল। তারপর পর পর দুটো চার মেরে এবং একটা রান নিয়ে পৌঁছল নিরানব্বইয়ে। সারা মাঠে উত্তেজনা, চিৎকার। শক্ত পাল্লার সাউথ জোনের সঙ্গে এমন হাড্ডাহাড্ডি ব্যাটিং কেউ আশা করেনি। নয়ন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল, রান—ওঃ একটা রান....

বসে পড়ুন—পেছন থেকে কে চেঁচাল। তারপর জামা ধরে টানল নয়নের। নয়ন শুধু গায়ে পড়া আরশোলা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে পিছনে হাত নিয়ে অচেনা হাতটা ঝেড়ে ফেলল।

লাঞ্চের আগে শেষ ওভার। পাঁচটা বল পাঁচটা বোমার মতো। সাত নম্বর ব্যাটসম্যান মাঠের চিৎকার শুনে ঘাবড়ে গেছে। স্কোরবোর্ডটা দেখে নিয়ে পর পর পাঁচটা বল ঠেকিয়ে দিল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। খেলছে না। পারছে না।

ওঃ, একটা রান।

নয়ন চেঁচায়। তার দেখাদেখি আশেপাশের হাজার হাজার জন গ্যালারিতে উঠে দাঁড়াতে থাকে। 'বসে পড়ুন' চিৎকার করতে করতে বসা লোকেরা দাঁড়িয়ে ওঠে। মাঠের মাঝখানে একটা রানের জন্য প্রার্থনারত ছেলেটা ছয় নম্বর বলটা খেলতে পারল না। বোল্ড।

খানকির বাচ্চা! শালা!

পাগলের মতো চেঁচাল নয়ন মাথার চুল চেপে ধরে। তারপর আবার চেঁচাল, ইয়ে করগে বাঞ্চোৎ—

বাচ্চা একটা ছেলেকে নিয়ে এক বাবা সামনের বেঞ্চে বসে। ভদ্রলোক নয়নের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকায়। নয়ন সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চোখে তার নিজের চোখ ফেরত দেয়। লোকটা আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে তার টিফিনের বাক্স খোলে।

লাঞ্চ।

নয়ন গ্যালারি থেকে অনেকটা নিচুতে চ্যানেলে লাফ দিয়ে নামে। আধকপালে মাথাধরাটা আবার শুরু হয়েছে। সারাক্ষণ মুখে রোদ, মাথায় উত্তেজনা, নাকে ধুলো। মাথা ধরতেই পারে।

গ্যালারির নীচে ছায়া। বাঁশের বেড়া দেওয়া খাবারের দোকানে ভিড়। এক কাপ চায়ের জন্য নয়ন একটু ঘোরাঘুরি করল। কিন্তু শান্তভাবে, ঠেলাঠেলি না করে কোথাও চা পাওয়ার উপায় নেই। খিদে তেষ্টায় পাগল হয়ে মানুষেরা হামলে পড়ছে।

কিন্তু নয়নের একটু চা বড় দরকার।

বাঁশের চৌখুপি ঘেরা দোকানটার কাছে গেল নয়ন। গায়ে গায়ে লোক দাঁড়িয়ে। হাজারটা হাত দোকানির দিকে বাড়ানো। 'এই আমারটা—আমার এক কাপ চা, দুটো কাটলেট' এই সব চিৎকারে একটা দাঙ্গার মতো ভাব। মানুষেরা ক্ষেপে আছে। তপ্ত, শুষ্ক মানুষ। এক্ষুনি ফাটবে। বাইরের দোকানের চেয়ে দ্বিগুণ দামের খাবার। আর চা—পয়সা বাড়িয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। তিনটে পশ্চিমা দোকানদার নাজেহাল হচ্ছে। দিশেহারার মতো সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে।

নয়ন শান্তভাবে কনুই দিয়ে একটা মাড়োয়ারিকে সরিয়ে বাঁশের বেড়ার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। উঁচু কিন্তু ঠান্ডা গলায় বলল, এক ভাঁড় চা—

কথাটা কোথাও পৌঁছল না, যে লোকটা প্রকাণ্ড কেটলি থেকে চা ঢালছে সে নয়নের কাছ থেকে দু' বিঘৎ দূরে মাত্র। নয়ন আবার আগের মতোই চেঁচিয়ে বলল, চা—

লোকটা শুনল না। পিছন থেকে মাড়োয়ারিটা নয়নকে সরানোর চেষ্টা করছে শরীরটা সামনে এগিয়ে দিয়ে। নয়নের গলার স্বর ডুবে যাচ্ছে চারদিকের চিৎকারে।

নয়ন তৃতীয়বার বলল, চা—আ—আ—

তার বাড়ানো হাত শূন্যে রইল। মাথা ধরাটা ফিরে আসছে। বাড়ছে। মাথার ভিতরে চমকে উঠেছে রগ।

অনেক দিন আগে শিয়ালদায় বিনা টিকিটের যাত্রী বলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একটি ছাত্র ধরা পড়েছিল। সেই থেকে একটা ছাত্র—হাঙ্গামার সূত্রপাত। নয়ন তখন হিন্দু স্কুলে শেষ ক্লাসে পড়ে। হাঙ্গামা শুনে বেরিয়ে এসেছিল। শিয়ালদার কাছে ছাত্ররা রাস্তা আটকে ট্রামে বাসে আগুন দিচ্ছে তখন। পুলিশ ছিল না। নয়ন তখন একদল ছাত্রের সঙ্গে ভিড়ে গেল। এগারোটা ট্রাম সরাসরি দাঁড়িয়ে। তার শেষ দুটোতে আগুন দিয়েছিল নয়ন। একাই লাফিয়ে উঠেছিল ট্রামে, যাত্রীদের শাসিয়ে নেমে যেতে বলেছিল। একভিড় লোক মেড়ার মতো সুড় সুড় করে নেমে গেল। আর নয়ন ব্লেড দিয়ে সিটের খোসা ছাড়িয়ে ছোবড়া বের করে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারপর বেনেটোলা লেনের মুখে দাঁড়িয়ে দেখেছিল—শিয়ালদার আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে যাচ্ছে এগারোটা ট্রামগাড়ি।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ দেখতে পেল নয়ন।

আর একবার একটা ফিলমের রিলিজের দিন ভারতীতে হাউসফুল। লবিতে বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে টিকিট না পেয়ে। যদি কেউ বাড়তি টিকিট বিক্রি করে এই আশায়। সেই সময় একটি চশমাপরা ভালোমানুষ মেয়ে টিকিট ফেরত দিতে এলে একরাশ লোক মেয়েটাকে ছেঁকে ধরে। প্রায় ত্রিশজনের ভিড়ের মধ্যে মেয়েটি দুটো টিকিট মুঠোয় ধরে কান চেপে দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে চেয়ে ছিল। কাকে টিকিট দেবে ঠিক করা তখন তার পক্ষে অসম্ভব। বহু লোক পাঁচ—দশটাকার নোট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চিৎকার করছিল—'আমি দশ দেব', 'আমি পাঁচ' 'আমি আগে ওকে ধরেছি।' নয়ন দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে এগিয়ে যায়। দু'—চারজনকে হিঁচড়ে সরিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে আড়াল করে দাঁড়ায়। তারপর একপলক চিন্তা না করে বিনা দ্বিধায় মেয়েটির কনুই চেপে ধরে একটু জোরের সঙ্গে ভিড়টা কেটে বেরিয়ে আসে। বিশ—ত্রিশজন বোকার মতো চেয়ে দেখে। নয়ন লবির এক কোণে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে যথার্থ দামে টিকিট দুটো নিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছিল। কেউ একটিও কথা বলেনি। বরং দু'—একজন শ্রদ্ধা—প্রশংসার চোখে তার দিকে চেয়ে দেখেছিল।

নয়ন আর চেঁচাল না। চেঁচিয়ে লাভ নেই। চা—ওলা লোকটা এই ভিড়ে নয়নকে আলাদা করে চিনবে না। চেনাতে হলে কিছু করতে হবে। ভিড় ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে নয়ন জানে।

বাঁশের বেড়াটা কেউ ডিঙোয়নি ভদ্রতাবশত। নয়ন এক পলকও দ্বিধা না করে বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল। চোখের নিমেষে চা—ওলার হাত থেকে কেটলিটা কেড়ে নিল। ঝুড়ি থেকে একটা ভাঁড় তুলে চা ঢালতে লাগল।

বাইরে লোকেরা একটু সময় নিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর বুঝল, অরাজকতার ইঙ্গিত, লুটের গন্ধ। পরমুহূর্তেই হাজারটা মানুষ পার হয়ে আসতে লাগল বাঁশের বেড়া। মড় মড় করে বাঁশের বেড়া ভেঙে পড়ার শব্দ। দৌড় পায়ের আওয়াজ, লাফিয়ে পড়ার শব্দ। ইতর একপাল ছেলে কাটলেটের থালাটা কয়েকটা থাবায় উড়িয়ে নিল, চপের ঝুড়ি থেকে কে একমুঠো ছুঁড়ে দিল শূন্যে। কেকের বয়ামটার দিকে বাড়ানো হাতগুলো খাবলা মেরে দলা পাকানো কেক তুলে নিচ্ছে মুঠো ভরে। কে একজন চেঁচিয়ে বলছে, 'শালা হারামিরা তিনগুণ দাম নেয়। লোট শালাদের। মেরে তক্তা করে দে।' তিনটে পশ্চিমা বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর লুট আর লুট।

নয়ন ভিড় ছেড়ে কষ্টে বাইরে এল। এক ভাঁড় চায়ের অর্ধেক তখনও তার হাতে ধরা। একটু দূর থেকে সে লুটের দৃশ্যটা দেখল দাঁড়িয়ে। তারপর ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে গ্যালারির ছায়া পার হয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে এল। খেলা দেখতে আর ইচ্ছে করছিল না তার।

কাকা মুরগি নিয়ে এল ঠিকই, তবে পরদিন নয়। এল দিন পনেরো পর। হাতে প্রকাণ্ড পা—বাঁধা লাল মুরগি, অন্তত এক কেজি মাংস হবে, অন্যহাতে মিষ্টির বড় বাক্স। সঙ্গে ঝাঁকামুটের মাথায় প্রকাণ্ড ঝুড়িতে আনাজপাতি। মহার্ঘ নতুন ফুলকপি, বড় বেগুন থেকে শুরু করে ঘিয়ের কৌটো পর্যন্ত। কাকার পরনে ফিনফিনে ধুতি, পাঞ্জাবি। একেবারে বরকর্তা। মুখে অপরাধী হাসি।

বাইরের ঘরে শ্যামার বাবা বসেছিল। রবিবারের সকাল দশটা। শ্যামার বাবার হাতে খবরের কাগজ, পাশে চা। ছোটভাইকে ঢুকতে দেখে একটু তাকাল। জিনিসপত্র দেখে অবাক হয়ে একবার বলল, এত সব! কী ব্যাপার?

আর কোনো কথা হল না। কোনোদিনই কথাবার্তা তেমন হয় না। হলেও কাকার মাতলামির প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায় বাবা। আজও ব্যাপার দেখে আবার খবরের কাগজে চোখ নামিয়ে নিল।

জিনিসপত্র রান্নাঘরের দরজায় নামিয়ে কাকা মাকে বলল, বউদি, একটা কথা আছে।

কী কথা?

বলছি। বলে কাকা এসে শ্যামার ঘরে উঁকি মারে।

মুখ বাড়িয়ে বলে, উনুনটা ধরা তো শ্যামা।

ঘর গোছাচ্ছিল শ্যামা, মুখ ফিরিয়ে কাকাকে দেখে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, কেন?

তুই ধরা তো। কেন, সে খাওয়ার সময়ে বুঝবি।

শ্যামা মুখখানা ভার রেখেই বলল, এত সব কিনে এনেছ কেন? এমনিতে তো বলো তোমার পয়সা নেই।

কাকা একটু বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলে, নেই তো নেই, তা বলে মাঝে—মধ্যে একটু খাওয়া—দাওয়া করব না! গরিবেরা তো খেয়েই মরে।

শ্যামা একটু খর গলায় বলে, পয়সা পাও কোথায়?

কাকা একটু থমকে যায়। সকলেই জানে, শ্যামা নরম মেয়ে। তার গলায় ঝাঁঝ খুব কম শোনা যায়।

কাকা থমকে থামে একটু, তারপর হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে, যেখান থেকেই পাই তাতে তোর কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

কোথা থেকে পয়সা পাও সেটা আগে বলো, নইলে ওসব ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমরা খাব না।

তুই না খাস খাওয়ার লোক আছে, চেঁচাস না।

আমি চেঁচাব। ওসব এ বাড়িতে কেউ খাবে না, তোমার লজ্জা করে না নিজের দাদা—ভাইঝি সবাইকে জড়িয়ে চেঁচিয়ে পাড়ার লোকের কাছে যা—তা বলে যাও। নিজেকে কী ভাবো তুমি? তোমাকে বাবা—মা ভয় পেতে পারে, আমি পাই না। তুমি ওসব নিয়ে চলে যাও।

কী বললি।

বলে কাকা তড়পাতে চেষ্টা করে, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তড়িৎ চৌধুরীর মুখটা তেমন খোলে না। কথা হারিয়ে যায়। মদ খেলে হুড় হুড় করে কথা আসে। তবু কাকা তোতলাতে তোতলাতে বলে, তোর বাড়ি যে বের করে দিবি? আমার দাদার বাড়ি—

রান্নাঘর থেকে মা উঠে এসে দুজনের মাঝখানে পড়ে। তড়িৎ চৌধুরীর পিঠে হাত রেখে বলে, এসো ঠাকুরপো, আমি তোলা উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি। শ্যামা, তোর না আজ কমলাদের বাসায় যাওয়ার কথা! যা, ঘুরে আয়।

যখন সময় হবে যাব। তুমি কাকাকে চলে যেতে বলো।

ছিঃ, কী সব বলছিস!

তড়িৎ চৌধুরী স্তিমিত গলায় বলে, শুনছেন বউদি শ্যামার কথা। সেই ছোট্ট নরম—সরম শ্যামা আর নেই। আজকাল ভোট—টোট দেয়, বয়স্থা হয়েছে—

বলে একটু ম্লান হাসবার চেষ্টা করে কাকা।

হয়েছিই তো। বেঁচে থাকলে সকলেরই বয়স হয়। একমাত্র তোমারই বয়সবুদ্ধি হয় না। কোন আক্কেলে তুমি রাস্তার লোকের কাছে নয়নের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কথা বললে? আমি তোমার ভাইঝি না? ও বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে, কে বলেছে তোমাকে যে নয়নের সঙ্গে আমার ভাব?

চুপ কর শ্যামা!

মা ধমক দেয়।

কিন্তু শ্যামার চুপ করার মতো অবস্থা নয়। তার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, চোখ বিস্ফারিত, ঠোঁট কাঁপছে। জ্বলজ্বলে চোখে সে মা'র দিকে চেয়ে বলে, তুমি জানো না, এ সবই নয়নের কারসাজি। এত জিনিসপত্র এ সবই নয়ন পাঠিয়েছে। জিজ্ঞেস করো।

নয়ন! ভারী অবাক হয় কাকা, নয়নের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? কী যা—তা বলছিস।

ঠিকই বলছি। তুমি চলে যাও।

মা কাকার পিঠে হাত রেখে ঠেলে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলে, ও পাগল মেয়ে। তুমি চলো তো ঠাকুরপো, কী কথা বলবে বলছিলে যে!

একা ঘরে শ্যামা দাঁড়িয়ে থাকে। নিঝুম।

গোলমাল শুনে বাবা উঠে এসেছিল। আবার ফিরে গিয়ে একটা প্রেশারের ট্যাবলেট খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসল। বাড়িটা আবার চুপচাপ হয়ে যায়। যেন কিছুই হয়নি, সব ঠিক আছে।

শ্যামার জানালার পাশেই বাড়িতে মেথর আসবার গলি। সেইখানে বসে কাকা মুরগি কাটল। ধুতি—পাঞ্জাবি ছেড়ে গামছা পরে নিয়েছে। মুরগিটার 'কঁ—কঁ' ডাক, তারপরই ডানা ঝাপটানোর শব্দ পায় শ্যামা।

গলিমুখো রান্নাঘরের জানালা দিয়ে মা কাকার সঙ্গে কথা বলছে।

শ্রাদ্ধ—শান্তি চুকতে তো দেরি আছে?

মা জিজ্ঞেস করে।

দেরি কী! আজকাল একমাস অশৌচ আর কে মানছে? গতকালই শ্রাদ্ধ চুকে গেল। পনেরো দিনে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তা উকিলবাবু রেখে—টেখে গেল কেমন?

পাঁচ—সাত লাখ তো শুনছি সাদা টাকাই। পাঁচটা ইন্সিওরেন্স থেকে আরও লাখ দুই পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কের লকার টকার তো এখনও খোলাই হয়নি, বাড়িতে স্টিলের আলমারিতেও না হোক আরও দু'—আড়াই লাখ পড়ে আছে। দুঁদে উকিল ছিল, দু'হাতে লুটেছে। দু'খানা বাড়ি—

এরপর মা'র গলার স্বরটা হঠাৎ নেমে যায়।

চোখে জ্বালা। বুকে একটা ভয় বেড়ালের থাবার মতো আলতো বসে আছে। শ্যামা সামান্য সেজে বেরিয়ে পড়ল। বাইরের ঘরে অন্যমনস্কভাবে বসে থাকা বাবাকে কেবল বলে গেল, বাবা, কমলাদির বাড়ি যাচ্ছি। এবেলা ফিরব না।

হুঁ।

বাইরে আজ শীতের বাতাস দিচ্ছে। তার সঙ্গে নরম রোদ। পার্কটা হেঁটে পার হতে ভারী ভালো লাগছিল শ্যামার। বড় রাস্তায় এসে ফাঁকা ট্রামে উঠে বসল।

কমলাদি দরজা খুলেই বলে, কত দেরি করলি। সকালে আসার কথা ছিল। তোর শঙ্করদা তোর জন্যে বসে থেকে থেকে এইমাত্র আড্ডা দিতে বেরোল। আয়।

রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনে চাপানো প্রেশার কুকার। মাংসের গন্ধে ভুর—ভুর করছে চারদিক। ঘরের মধ্যে একটু ঘুরে ঘুরে দেখে শ্যামা। খাট পালং, আলমারি, টেলিফোন সব সুন্দর সাজানো। বেশ আছে ওরা। বাড়িটা ঠান্ডা, শান্ত, ভালোবাসার চিহ্নগুলি চারদিকে ছড়ানো।

শ্যামা, মাংসটা চেখে যা! কমলাদি ডাকে।

যাই।

রান্নাঘরের দরজায় মোড়া পেতে বসে শ্যামা। টুকটাক নানা কথা হতে থাকে।

ঝাল বড্ড কম দিয়েছ। পানসে!

কী করি বল! ওর যে গ্যাসট্রিক। অনেকটা আদাবাটা দিয়েছি।

তোমাদের বড্ড সাহেবি রান্না।

ওর তো এরকমই পছন্দ, সেদ্ধ, নির্ঝাল। আমি মাঝে মাঝে আলাদা ঝাল গড়গড়ে করে রেঁধে নিই। কিন্তু রোজ তো ইচ্ছে করে না, তাই আমারও কেমন এইসব বিস্বাদ রান্নাই অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে করলে পার্সোনালিটি থাকে না, জানিস। কর বিয়ে, বুঝবি।

শ্যামা ঠোঁট ওলটায়, বয়ে গেছে বিয়ে করতে। চাকরি খুঁজছি।

খোঁজ। চাকরি করলে আরও ভালো বিয়ে হবে। আজকাল সবাই চাকরে মেয়ে চায়।

ইস, বিয়ে করলে চাকরি করতে বয়ে গেছে।

ও কথা বলিস না। আজকাল একজনের রোজগারে সংসার চলে নাকি। চললেও শখ—শৌখিনতা কিছু করা যায় না। আমারই মাঝে মাঝে চাকরি করতে ইচ্ছে করে।

আমার ভালো লাগে না। বিয়ে করলে হাত—পা ছড়িয়ে সংসার করব—সেই ভালো। বউকে সুখে রাখতে পারে না যে মানুষ, তাকে বিয়েই করব না!

কমলাদি কপির ডাঁটার চচ্চড়ি বসিয়ে বলে, ভাগ্যিস তোর তবে সেই ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়নি। শুনেছি লোকের দানে তার দিন চলে। কী অবস্থা হত তোর!

শ্যামার বুকের ভিতর কোথায় যেন যন্ত্রপাতি নড়াচড়া শুরু করে। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। ভারী ঝামেলা। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারে না সে। উঠে গিয়ে বেসিনে হাত—মুখ ধোয়।

শঙ্করদা দুপুর পার করে ফিরল। হাসি—ঠাট্টায় খাওয়ার পাট চুকতে গড়িয়ে গেল বেলা। তিনজনে ফিস খেলল খানিকক্ষণ। তারপর গড়াল। খাটে কমলাদি আর শ্যামা, ইজিচেয়ারে শঙ্করদা।

শ্যামা চোখ বুজে শুয়ে ছিল। সেই অবস্থাতেই বলে, শঙ্করদা।

উঁ।

আমার একটা চাকরি দরকার।
কেন?
খুব দরকার।
সিগারেটের প্যাকেটের ওপর একটা সিগারেট লম্বালম্বি ঠুকতে ঠুকতে শঙ্করদা বলে, বিয়ের পর চাকরি কোরো, ডেগমাস্টারি।
বিয়ে করব না।
কে বলল করবে না।
আমিই বলছি।
কিন্তু তোমার জন্য একটা পাত্র যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছি, আজকালের মধ্যেই কথাটা পাড়তে তোমাদের বাসায় আমার যাওয়ার কথা।
শ্যামা একটু হাসে, চোখ দুটো দুই আঙুলে চেপে রেখে বলে, এক পাত্রপক্ষের প্রস্তাব নিয়ে সকালেই কাকা এসেছে।
পাত্র কী করে?
শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলে, কিছু করে না। বাপ বড়লোক ছিল, মরেছে, ফলে ছেলে এখন বড়লোক হয়েছে। বয়েসে ছোট, জাতও এক নয়।
সে কী! শঙ্করদা চমকে বলে, এ কেমন বিয়ের প্রস্তাব তোমার কাকা আনলেন?
কমলাদি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর পিঠের তলা থেকে নিজের আঁচলটা ছাড়িয়ে এনে শ্যামা পাশ ফিরে বলে, আপনার পাত্রটি কেমন শুনি।
শঙ্করদা শ্যামার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়, বলে, এ পাত্র ভালোই। আমাদের বন্ধুর মতো, তবে আমার চেয়ে বয়সে ছোটো। ইঞ্জিনিয়ার। মুশকিল হচ্ছে কিছু দাবি—দাওয়া করবে। হাজার তিনেক নগদ।
শ্যামা চোখ বুজে নিঝুম পড়ে থাকে একটুক্ষণ। তারপর বলে, তার চেয়ে চাকরিটাই ভালো লাগবে আমার। বিয়েটা থাক।
শঙ্করদা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, মাথা হেলিয়ে শ্যামার দিকে চেয়ে। তারপর বলে, শ্যামা।
উঁ।
একটা সত্যিকথা বলবে?
কী?
তুমি কাউকে ভালোবাসো?
দূর।
বাসো, কিন্তু কোনো কারণে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে না। হয়তো সে তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে। সত্যি কি না বলো।
না।
তবে ফ্যাক্টটা কী?
কিছু না।
সেই সন্ন্যাসী ডাক্তারকেই তোমার পছন্দ নয় তো শ্যামা? ভেবে দেখো।
আবার সেই যন্ত্রপাতির নড়াচড়া। তার শরীরের ভিতরে একটা লিভার ওঠে—নামে, হুইল ঘোরে, ধকধক করে স্টার্ট নেয় ইঞ্জিন। শ্যামা তার কেঁপে ওঠা হাত আঁচলে ঢাকে, বালিশে মুখ লুকোয়।
কী হল?
কিছু না।

শঙ্করদা নীরবে সিগারেট খায়। অনেকক্ষণ বাদে বলে, আমি এর মধ্যে আরও ভালো করে খোঁজ নিয়েছি শ্যামা। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তুমি সেই সন্ন্যাসীর ঘর করতে পারবে না সত্যিই।

শ্যামা চুপ করে থাকে।

শঙ্করদা বলে, তার বাঁধা মাইনের চাকরি নয়। লোকের দেওয়া জিনিসে তার সংসার চলবে, তার ধারণা লোকের সেবা করে মানুষের অযাচিত দান পাওয়াই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ব্রাহ্মণোচিত। সে তোমাকে সুখে রাখার চেষ্টাও করবে না। প্রতিদিন তোমার রাত ভোর হবে হাঁড়ির চিন্তায়, ভিক্ষায় চলবে পেট। স্বামীর সঙ্গও পাবে না। সে লোকটা উদয়াস্ত যাজন করে বেড়ায়, ছ'মাস ন'মাস বাইরে বাইরে ঘোরে। বউয়ের দিকে তাকিয়ে দেখবে একটু—এমন স্বভাব নয়। তার জীবনে উন্নতি নেই, প্রমোশন নেই, ইন্সিওরেন্স, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, ব্ল্যাক, মানি—কিচ্ছু নেই। তার কাছ থেকে কোনো উপহারও কোনোদিন পাবে কিনা সন্দেহ। ফুল্লরার বারোমাসের গীত হবে তোমার শ্লোগান। পারবে শ্যামা?

শ্যামার চোখভরে জল আসে। কিছু বলে না।

শঙ্করদা মাথা নেড়ে বলে, পারবে না। ওরকম জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নেবে কে? যার গতি হয় না সে হয়তো নেবে, কিন্তু তুমি নেবে কেন? আজকালকার মেয়ে তুমি, তোমার এতটা সেন্টিমেন্ট থাকার কথা নয়। থাকলে বুঝব তুমি বোকা।

হৃৎপিণ্ড একটা পাম্প মেসিনের মতো ঝলকে ঝলকে জল তুলে আনছে চোখে। বুকটা ব্যথা করে। আস্তে আস্তে কান্নায় শরীরটা কেঁপে ওঠে। পারবে না শ্যামা। জানে, পারবে না। ওই জীবন তার নয়। তবু সেই দূরবর্তী মানুষটার ছবি কেন ছুঁয়ে থাকে তাকে।

শঙ্করদা মৃদু গলায় বলে, আমি অনেক ভেবেছি। মানুষটাকে আমারও বড় ভালো লাগে শ্যামা। লোকটা আমাকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে আমি একসময়ে ওর ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতেও রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু কমলা দিল না। বলল, যদি ওর মতোই তোমারও অবস্থা হয়। সেটা অবশ্য হত না। ওদের আশ্রমের অনেক লোকই ভালো কাজকর্ম করে, বড় চাকরি করে, সংসারও করে। দীক্ষা নিতে ভয় পেলাম। তুমি কেঁদো না, সব শুনে যদি রাজি থাকো, তবে বলো ওর সঙ্গেই বিয়ের ব্যবস্থা করি।

শ্যামা সময় নিয়ে সামলে উঠে বসল। তারপর মাথা নেড়ে বলে, না শঙ্করদা। ওই জীবন আমি পারব না।

আমিও তাই বলি। তা হলে ইঞ্জিনিয়ারের এ সম্বন্ধটা করব কি শ্যামা? তুমি মত দিলে সামনের রবিবার তোমাকে ওরা দেখতে যাবে।

শ্যামা নিজের কোলে মুখ নামিয়ে বসে রইল।

বিকেলের দিকে কমলাদিকে ঠেলে তোলে শঙ্করদা, এই, চা করবে না?

আমি করছি।

বলে শ্যামা উঠে গেল রান্নাঘরে। চায়ের সরঞ্জাম গোছাচ্ছিল যখন তখনই টেলিফোনের রিং শুনতে পেল। সারাদিন আজ টেলিফোনটা বাজে নি। শব্দটা তাই নতুন লাগল শ্যামার কাছে। হঠাৎ দমকলের আওয়াজের মতো। নিশুতরাতে বুক কেঁপে ওঠে।

শঙ্করদা চেঁচিয়ে বলল, শ্যামা, তোমার ফোন।

একটু চমকায় শ্যামা। নয়ন নয় তো?

নয়নই। টেলিফোন তুলেই শ্যামা মিষ্টি একটা পাখির ডাক শোনে। তারপরই নয়ন বলে, শ্যামা।

বলছি।

কী করছ?

কিছু না।

একটা জিনিস শোনো।

কী?
শোনো না। কান পেতে থাকো।
শ্যামা কান পাতল। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারল না, তারপর একটা শ্বাস ছাড়ার মতো বাতাসের শব্দ হয়।
শুনেছ?
কীসের শব্দ?
সেই সাপটা।
শ্যামা হিম হয়ে যায়।
শ্যামা!
বলো!
সাপটার দাঁত উঠেছে। আজ সকালে দেখলাম, ছোটো হুলের মতো দেখা যাচ্ছে।
শ্যামা নিশ্বাস ফেলে বলে, সেটা আমাকে বলে কী হবে?
ইনফর্মেশনটা দিয়ে রাখলাম।
আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি—
ছেড়ো না। তা হলে আবার ফোন করব। তোমার দিদি—জামাইবাবুর কাছে তোমার তা হলে প্রেস্টিজ থাকবে না।
কী বলতে চাও বলো।
আমার বাঁ হাতে টেলিফোন, ডান হাতে সাপের গলা ধরে আছি। ওটা বিড়ে পাকিয়ে আমার কোলে পড়ে আছে। খুব রেগে আছে ইদানীং। দিনরাত আমি ঘুম থেকে টেনে তুলি। খেলা করি। কাজেই সুযোগ পাওয়ামাত্র ও আমাকে কামড়াবে। এক্ষুনি কামড়াতে পারে। পাকা ম্যাচিওরড গোখরো। বিষের থলি ভরভরন্ত—বুঝলে?
শ্যামার হাত কাঁপতে থাকে। বলে, বুঝেছি।
নয়ন বলল, তোমার কাকা একটা খবর দিয়ে গেল এই মাত্র।
কী খবর?
তোমার মা—বাবা রাজি। কাকা রাজি করিয়েছে। তাকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলাম।
শ্যামা আস্তে করে বলে, তাতে কী হল?
কিছুই না শ্যামা, তুমি রাজি না হলে কিছুই না। আমি জানি। তবে তোমার বাবার মত পাওয়া গেছে—সেটাও কম কথা নয়। তুমি ভয় পেয়েছিলে।
আমি রাজি নই।
তোমাকে রাজি করানোর জন্যই এই টেলিফোন। শ্যামা, তুমি রাজি না হলে আমি আমার ডান হাতের মুঠোটা আলগা করে দেব। সাপটা তৈরি আছে। এখন ভেবেচিন্তে বলো। আমি ইয়ার্কি করছি না।
নয়ন!
আত্মবিস্মৃতের মতো নামটা উচ্চারণ করে শ্যামা। এতক্ষণ নামটা উচ্চারণ করেনি পাছে কমলাদি আর শঙ্করদা জেনে ফেলে।
নয়ন ধীর গলায় বলে, বলো শ্যামা, শুনছি।
তুমি কি পাগল?
হতেও পারি। আমি যে কী তা ভেবে পাই না। তবে তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি এত তাড়াহুড়ো করতাম না শ্যামা, অপেক্ষা করতাম। কিন্তু তুমি সেদিন একজন ডাক্তারের কথা বলেছিলে, সেই থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। আমি এক্ষুনি জানতে চাই। বলো।
তা হয় না।

তবে ছেড়ে দিই।

আঃ নয়ন।

ওপাশে একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল। তারপর রিসিভার পড়ে যাওয়ার শব্দ।

শ্যামা খুব সাবধানে টেলিফোনটা রাখল। তারপর টেবিলটায় ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।

কী হয়েছে রে? বিছানা ছেড়ে কমলাদি উঠে আসে।

ওকে বোধ হয় সাপে কামড়াল। উদভ্রান্তের মতো বলে শ্যামা।

কাকে?

নয়নকে।

সে কী! কী বলছিস যা—তা?

কী জানি!

শ্যামা মাথা ঠিক রাখতে না পেরে চারদিকে টালুমালু চেয়ে বলে, ইয়ার্কিও হতে পারে!

তুই এদিকে আয় তো, বিছানায় বোস। ওগো, তুমি পাখাটা আস্তে করে ছেড়ে দাও তো।

ইয়ার্কিই। সাপের শব্দটা টেলিফোনে হুবহু নকল করেছিল নয়ন। শ্যামাকে টেলিফোন করার সময়ে সাপটা তার কাছে ছিলই না।

গতরাতে নয়ন দশটা সোনেরিল খেয়েছিল গুনে গুনে। ঘুম আসে নি। ইমমিউনিটি এসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পৃথিবীর সব ঘুমের প্রতিক্রিয়া একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন অবিরল জেগে থাকবে নয়ন, একটা অস্পষ্ট ভয় বুকের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে।

কাল রাতে একটা ব্যাঙকে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জের ছুঁচে খোঁচার আধমরা করে সাপটাকে খেতে দিয়েছিল নয়ন। খুব খিদে ছিল ওটার। যখন মুখটা তুলে ব্যাঙটাকে ধরল, তখনই নয়ন লক্ষ করে সাপটার সামনের দুটো দাঁত হুলের মতো জেগে উঠেছে। আগে লক্ষ করেনি সে। লক্ষ করে গা—টা একটু শির শির করেছিল তার। নয়নের সব অত্যাচারের কথা ও কি মনে রেখেছে? কে জানে। ঝাঁপিটা সাবধানে আবার চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে সে। খোলেনি।

শ্যামা রাজি হল না। হবে না। জানত নয়ন। দিন আর রাতের দুজন নার্স মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখে নয়ন। উপহার দেয়। সুন্দর সব কথা বলে। ভাড়াটে মেয়েদের কাছেও ঘুরে এসেছে সে এর মধ্যে কয়েকবার। কিন্তু জুড়োয় না নয়ন। শরীরের মধ্যে কী একটা তার নেই। সে কি ক্লোরোফিল? ভিটামিন? ক্যালসিয়াম? ফেলে রাখা মেটেরিয়ামেডিকা, অ্যানাটমির বই খুলে খুলে রাত জেগে দেখে সে। কিছু বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে ভাবে, সে আমেরিকা, ফ্রান্স বা মোনাকোতে চলে যাবে। সেখানে সারারাত ফুর্তি করার অঢেল জায়গা। মদ খাবে, নাচবে, জুয়া খেলবে, মেয়েছেলে পালটে দেখবে রোজ। বিদেশে সারারাত শহর জেগে থাকে। কিন্তু কিছু স্থির করতে পারে না সে।

কয়েকদিন বাইরে ঘুরে আসে সে। তারপর ঘরে ফিরে এক গভীর রাতে সাপের ঝুড়ির ঢাকনাটা খোলে।

প্রস্তুত ছিল না নয়ন। অপ্রত্যাশিত সাপটা ঝাঁপির ঢাকনা খোলা মাত্র লক লক করে জেগে ওঠে। ও বুঝতে পেরেছে কি যে ও এখন সশস্ত্র! একটা চকিত লাফে সরে যায় নয়ন। সাপটা শরীর ক্রমশ উঁচু থেকে উঁচুতে তুলে ধরতে থাকে। নয়নের বুক সমান উঁচু তার তীব্র ফণা। মিটমিটে চোখে নয়নের চোখ আটকে রাখে মায়াবী সম্মোহনে কিছুক্ষণ। তার শিকারের মতো চেরা জিভ দ্রুত নড়তে থাকে। অসম্ভব ফোঁসফোঁসানিতে ভরে যায় ঘর। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নয়ন। তারপর ধীরে ধীরে সাহসভরে অভ্যাসবশত সে তার দস্তানা—পরা হাতটা এগিয়ে দেয়।

আক্রমণ। প্রতি—আক্রমণ। নয়নই জেতে। একসময়ে ছোবল দেওয়ার মুখে ধরে ফেলে ঘাড়। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে হাসে। ধীরে ধীরে ঝাঁপির ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় সাপটাকে। দস্তানা খুলে সিগারেট ধরায়। বিছানায় বসে থাকে জেগে। সারা রাত। কখনও বা মুঠো মুঠো সোনেরিল খেয়ে দেখে। বৃথা।

একদিন শ্যামার কাকা হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিল, নয়ন, শ্যামার বিয়ের কথা চলছে।

নয়ন উদাস গলায় বলে, কার সঙ্গে?

খবর পাইনি। তবে এক পার্টি ওকে দেখে পছন্দ করে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। কিছু একটা করা উচিত, তার মনে হয়। কিন্তু বড় গভীর ক্লান্তি তার আজকাল।

মাঝে—মাঝে এমন হয়, পুরনো ব্র্যান্ডের সিগারেটটা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। তখন মানুষ বিরক্ত হয়ে ব্র্যান্ডটা পালটে নেয়। তেমনই কিছু একটা ভাবল নয়ন, ব্র্যান্ডটা পাল্টে নেবে কি না। তারপর আর সেই ভাবনাটাও রইল না। সম্পূর্ণ শূন্য মাথায় সে বসে রইল।

সে বুঝতে পারে, শ্যামা নয়, কিছু নয়, একটু ঘুম ছাড়া সে আর কিছু চায় না।

সাপটাকে জগদীশের কাছে দিয়ে আসবে ভেবেছিল। কিন্তু দিল না নয়ন। রেখে দিল। থাক। সে আজকাল ইঞ্জেকশন নেয় নিজে নিজে। তারপর ঘুমোয়। একদিন যখন ইঞ্জেকশনের ক্রিয়াও কমে আসবে তখন ভয়ঙ্কর ওই দাঁতগুলো সাপটাকেই জাগাবে সে।

কে জানে ওর দাঁতেই শেষ ঘুমের ওষুধটা রয়ে গেছে কি না!

রক্তের বিষ

কুকুরগুলো বাইরে খ্যাঁকাচ্ছে। সে এমন চ্যাংড়ামি যে মাথা গরম হয়ে যায়।

গগনচাঁদ উঠে একবার গ্যারাজ—ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। লাইটপোস্টের তলায় একটা ভিখারি মেয়ে তার দুটো বাচ্চাকে নিয়ে খেতে বসেছে। কাপড়ের আঁচল ফুটপাথে পেতে তার উপর উচ্ছিষ্ট খাবার জড়ো করেছে। কুকুরগুলো চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে লাগাতার।

গগনচাঁদ একটা ইট কুড়িয়ে নিয়ে নির্ভুল নিশানায় ছুড়ে কুকুরটার পাছায় লাগিয়ে দিল। কুকুরটার বীরত্ব ফুস করে উড়ে যায়, কেঁউ কেঁউ করতে করতে নেংচে সেটা পালায়। সঙ্গে আরগুলো। গগনচাঁদ ফের তার গ্যারাজ—ঘরে এসে বসে। রাত অনেক হল। গগনচাঁদের ভাত ফুটছে, তরকারির মশলা এখনও পেষা হয়নি।

মশলা পিষবার শিল—নোড়া গগনের নেই। আছে একটা হামানদিস্তা। তাইতেই সে হলুদ গুঁড়ো করে, ধনে—জিরে ছাতু করে ফেলে। একটা অসুবিধে এই যে হামানদিস্তায় একটা বিকট টংটং শব্দ ওঠে। আশপাশের লোক বিরক্ত হয়। আর এই বিরক্তির ব্যাপারটা গগন খুব পছন্দ করে।

এখন রাত দশটা বাজে। গ্রীষ্মকাল। চারপাশেই লোকজন জেগে আছে। রেডিয়ো বাজছে, টুকরো—টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে, কে এক কলি গান গাইল, বাসন—কোসনের শব্দও হয়। গগন হামানদিস্তা নিয়ে হলুদ গুঁড়ো করতে বসে। আলু ঝিঙে আর পটল কাটা আছে, ঝোলটা হলেই হয়ে যায়।

গ্যারাজটায় গাড়ি থাকে না, গগন থাকে। গ্যারাজের ওপরে নিচু ছাদের একখানা ঘর আছে, সেটাতে বাড়িঅলা নরেশ মজুমদারের অফিসঘর। কয়েকখানা দোকান আছে তার কলেজস্ট্রিট মার্কেটে। নিজের ছেলেপুলে নেই, শালিদের দু—তিনটে বাচ্চাকে এনে পালে—পোষে। তার বউ শোভারানি ভারী দজ্জাল মেয়েছেলে। শোভা মাঝে মাঝে ওপরের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে, শিল—নোড়া না থাকে তো বাজারের গুঁড়ো মশলা প্যাকেটে ভরে বিক্রি হয়, না কি সেটা কারও চোখে পড়ে না। হাড়—হারামজাদা পাড়া—জ্বালানি গু—খেগোর ব্যাটারা সব জোটে এসে আমার কপালে।

সরাসরি কথা বন্ধ। বাড়িতে একটা মাত্র কল, বেলা ন'টা পর্যন্ত তাতে জল থাকে। জলের ভাগীদার অনেক। গ্যারাজে গগন। রাতে নরেশের কিছু কর্মচারী শোয় ওপরতলার মেজেনাইন ফ্লোরে। সব মিলিয়ে পাঁচজন। ভিতর—বাড়ির আরও চার ঘর ভাড়াটের ষোলো—সতেরোজন মিলে মেলাই লোক। একটা টিপকল আছে, কিন্তু সেটা এত বেশি ঝকাং ঝকাং হয় যে বছরে ন'মাস বিকল হয়ে থাকে। জল উঠলেও বালি মেশানো ময়লা জল উঠে আসে। তাই জলের হিসেব ওই একটা মাত্র কলে। অন্য ভাড়াটেদের অবশ্য ঘরে ঘরে কল আছে, কিন্তু মাথা—উঁচু কল বলে তাতে ডিমসুতোর মতো জল পড়ে। উঠোনের কলে তাই হুড়োহুড়ি লেগেই থাকে। একমাত্র নরেশের ঘরেই অঢেল জল। নিজের পাম্পে সে জল তুলে নেয়। কিন্তু সে জল কেউ পায় না, এমনকী তার কর্মচারীরাও নয়। গগনচাঁদ কিছু গম্ভীর মানুষ, উপরন্তু কলেজ আর তিনটে ক্লাবের ব্যায়ামশিক্ষক, তার বালতি কিছু বড় এবং ভারী। কাউকে সে নিজের আগে জল ভরতে দেয় না। নরেশ মাস আষ্টেক আগে জলের বখেড়ায় গগনচাঁদকে বলেছিল, আপনার খুব তেল হয়েছে। তাতে গগনচাঁদ তার গলাটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে চড় তুলে বলেছিল, এক থাপ্পড়ে তিন ঘণ্টা কাঁদাব। সেই থেকে কথা বন্ধ।

গগন গুঁড়োমশলা কিনতে যাবে কোন দুঃখে। ভেজাল আর ধুলোবালি মেশানো ওই অখাদ্য কেউ খায়? তা ছাড়া হামানদিস্তায় মশলা গুঁড়ো করলে শরীরটাকে আরও কিছু খেলানো হয়। শরীর খেলাতে গগনের ক্লান্তি

নেই।

গ্যারাজের দরজা মস্ত বড়। বাতাস এসে কেরোসিনের স্টোভে আগুনটাকে নাচায়। গগন উঠে গিয়ে টিনের পাল্লা ভেজিয়ে দিতে যাচ্ছিল। নজরে পড়ল আকাশে মেঘ চমকাচ্ছে। গ্রীষ্মের শেষ, এবার বাদলা শুরু হবে। ঠান্ডা ভেজা একটা হাওয়া এল। গগন ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। অন্য ঋতু ততটা নয় যতটা এই বাদলা দিনগুলো তাকে জ্বালায়। গ্যারাজের ভিত নিচু, রাস্তার সমান—সমান। একটু বৃষ্টি হলেই কল কল করে ঘরে জল ঢুকে আসে। প্রায় সময়েই বিঘতখানেক জলে ডুবে যায় ঘরটা। সামনের নর্দমার পচা জল। সেই সঙ্গে উচ্চিংড়ে, ব্যাং এবং কখনো—সখনো ঢোঁড়া সাপ এসে ঘরে ঢুকে পড়ে। তা সে—সব কীটপতঙ্গ বা সরীসৃপ নিয়ে মাথা ঘামায় না গগন। ময়লা জলটাকেই তার যত ঘেন্না। দুটো কাঠের তাক করে নিয়েছে, তোরঙ্গটা তার ওপর তুলে রাখে, কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিলে স্টোভ জ্বেলে চৌকিতে বসে সাহেবি কায়দায় রান্না করে গগন বর্ষাকালে। সে বড় ঝঞ্ঝাট। তাই আকাশে মেঘ দেখলে গগন খুশি হয় না।

এখনও হল না। কিন্তু আবার বর্ষা—বৃষ্টিকে সে ফেলতেও পারে না। এই কলকাতার শহরতলিতে বৃষ্টি যেমন তার না—পছন্দ, তেমনি আবার মুরাগাছা গাঁয়ে তার যে অল্প কিছু জমিজিরেত আছে সেখানে বৃষ্টি না হলে মুশকিল। না হোক বছরে চল্লিশ—পঞ্চাশ মন ধান তো হয়ই। তার কিছু গগন বেচে দেয়, আর কিছু খোরাকি বাবদ লুকিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে।

মেঘ থেকে চোখ নামিয়েই দেখতে পায় ল্যাম্পপোস্টের আলোর চৌহদ্দি ফুঁড়ে সুরেন খাঁড়া আসছে। সুরেন এক সময় খুব শরীর করেছিল। পেটের পেশি নামিয়ে নাম কিনেছিল। এখন একটু মোটা হয়ে গেছে। তবু তার দশাসই চেহারাটা রাস্তায়—ঘাটে মানুষ দু'পলক ফিরে দেখে। সুরেন গুন্ডামি করে না বটে, কিন্তু এ তল্লাটে সে চ্যাংড়াদের জ্যাঠামশাই গোছের লোক। লরির ব্যাবসা আছে, আবার একটা ভাতের হোটেলও চালায়।

সুরেন রাস্তা থেকে গোঁত্তা—খাওয়া ঘুড়ির মতো ঢুকে এল গ্যারাজের দিকে।

বলল, কাল রাত থেকে লাশটা পড়ে আছে লাইন ধারে। এবার গন্ধ ছাড়বে।

গম্ভীর গগন বলল, হুঁ।

ছোকরাটা কে তা এখনও পর্যন্ত বোঝা গেল না। তুমি গিয়ে দেখে এসেছ নাকি?

না। শুনেছি।

ঘরে ঢুকে সুরেন চৌকির ওপর বসল। বলল, প্রথমে শুনেছিলাম খুন। গিয়ে দেখি তা নয়। কোনওখানে চোট—ফোট নেই। রাতের শেষ ডাউন গাড়িটাই টক্কর দিয়ে গেছে। কচি ছেলে, সতেরো—আঠারো হবে বয়স। বেশ ভালো পোশাক—টোশাক পরা, বড় চুল, জুলপি, গোঁপ সব আছে।

হুঁ।—গগন বলল।

হামানদিস্তার প্রবল শব্দ হচ্ছে। ভাত নেমে গেল, কড়া চাপিয়ে জিরে—ফোড়ন ছেড়ে দিয়েছে গগন। সঙ্গে একটা তেজপাতা। সাঁতলানো হয়ে গেলেই মশলার গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ঝোল চাপিয়ে দেবে।

সুরেন খাঁড়ার খুব ঘাম হচ্ছে। টেরিলিনের প্যান্ট আর শার্ট পরা, খুব টাইট হয়েছে শরীরে। বুকের বোতাম খুলে দিয়ে বলল, বড্ড গুমোট গেছে আজ। বৃষ্টিটা যদি হয়!

হবে।—গগন বলে, হলে আর তোমার কী! দোতলা হাঁকড়েছ, টঙের ওপর বসে থাকবে।

সুরেন ময়লা রুমালে ঘাড়ের ঘাম মুছে ফেলল, তারপর সেটা গামছার মতন ব্যবহার করতে লাগল মুখে আর হাতে। ঘষে ঘষে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, তোমার ঘরে গরম বড় বেশি, ড্রেনের পচা গন্ধে থাক কী করে?

প্রথমে পেতাম গন্ধটা। এখন সয়ে গেছে, আর পাই না। চার সাড়ে চার বছর একটানা আছি।

তোমার ওপরতলার নরেশ মজুমদার তো আবার বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে ঝিল রোডে। একতলা শেষ, দোতলারও ছাদ যখন—তখন ঢালাই হয়ে যাবে। এক বার ধরে পড়ো না, নীচের তলার একখানা ঘর ভাড়া দিয়ে দেবে

সস্তায়।

গগন ভাতের ফেন—গালা সেরে ঝোলের জল ঢেলে দিল। তারপর গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলল, তা বললে বোধহয় দেয়। ওর বউ শোভারানি খুব পছন্দ করে কিনা আমাকে। একটু আগেও আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করছিল।

একদিন উঠে গিয়ে ঝাপড় মারবে একটা, আর রা কাটবে না।

গগন মাথা নেড়ে বলল, ফুঁঃ! একে মেয়েছেলে, তার ওপর বউ মানুষ।

বলে হাসে গগন। একটু গলা উঁচু করে, যেন ওপরতলায় জানান দেওয়ার জন্যই বলে, দিক না একটু গালমন্দ, আমার তো বেশ মিঠে লাগে। বুঝলে হে সুরেন, আদতে ও মাগি আমাকে পছন্দ করে, তাই ঝাল ঝেড়ে সেটা জানিয়ে দেয়। মেয়েমানুষের স্বভাত জানো তো, যা বলবে তার উলটোটা ভাববে।

বলেই একটু উৎকর্ণ হয়ে থাকে গগন। সুরেনও ছাদের দিকে চেয়ে বসে থাকে। মুখে একটু হাসি দুজনেরই। শোভারানির অবশ্য কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। ওপরে কোনও বাচ্চা বুঝি স্কিপিং করছে, তারই ঢিপ ঢিপ শব্দ আসছে, আর মেঝেতে ঘুরন্ত দড়ির ঘষা লাগার শব্দ।

নরেশচন্দ্র বড় চতুর বাড়িঅলা। ভাড়াটে ওঠানোর দরকার পড়তেই সে অন্য কোনও বখেড়ায় না গিয়ে বউ শোভারানিকে টুইয়ে দেয়। শোভার মুখ হল আঁস্তাকুড়। সে তখন সেই ভাড়াটের উদ্দেশে আঁস্তাকুড়ের ঢাকনা খুলে আবর্জনা ঢালতে শুরু করে। সে—বাক্য যে শোনে তার কান দিয়ে তপ্ত সিসে ঢালার চেয়েও বেশি কষ্ট হয়। সে বাক্য শুনলে গতজন্মের পাপ কেটে যায় বুঝি। শোভারানি অবশ্য এমনি এমনি গাল পাড়ে না। নতুন ভাড়াটে এলেই তার ঘরদোরে আপনজনের মতো যাতায়াত শুরু করে, বাটি বাটি রান্না—করা খাবার পাঠায়, দায়ে—দফায় গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে। ওইভাবেই তাদের সংসারের হাল—চাল, গুপ্ত খবর সব বের করে আনে। কোন সংসারে না দুটো—চারটে গোপন ব্যাপার আছে! সেই সব খবরই গুপ্ত অস্ত্রের মতো শোভা ভাঁড়ারে মজুত থাকে। দরকার মতো কিছু রং—পালিশ করে এবং আরও কিছু বানানো কথা যোগ করে শোভা দিনরাত চেঁচায়। ভাড়াটে পালানোর পথ পায় না। গগনও শোভার দম দেখে অবাক হয়ে বলে, এ তো হামিদা বানুর চেয়ে বেশি কলজের জোর দেখতে পাই!

একমাত্র গগনেরই কিছু তেমন জানে না শোভা। না জানলেও আটকায় না। যেদিন নরেশকে ঝাঁকি দিয়েছিল গগন, সেদিন শোভারানি একনাগাড়ে ঘণ্টা আষ্টেক গগনের তাবৎ পরিবারের শ্রাদ্ধ করেছিল। বেশ্যার ছেলে থেকে শুরু করে যতরকম বলা যায়। গগন গায়ে মাখেনি, তবে ক্লাবের ছেলেরা পরদিন সকালে এসে বাড়ি ঘেরাও করে। ব্রজ দত্ত নামে সবচেয়ে মারকুট্টা যে চেনা আছে গগনের দোতলায় উঠে নরেশকে ডেকে শাসিয়ে দিয়ে যায়। মারত, কিন্তু গগন ওরকমধারা দুর্বলের গায়ে হাত তোলা পছন্দ করে না বলে মারেনি। তাতে শোভারানির মুখে কুলুপ পড়ে যায়। কিন্তু রাগটা তো আর যায়নি। বিশেষত গগন তখনও ইচ্ছেমতো জল তোলে, কলে কোনওদিন জল না এলে নরেশের চাকরকে ডেকে ওপরতলা থেকে বালতি বালতি জল আনিয়ে নেয়। শোভা রাগ করে হয়তো, কিন্তু জল দিয়ে দেয়। ঝামেলা করে না।

ভেবে দেখলে গগন কিছু খারাপ নেই। কেবল ওই বর্ষাকালটাকেই যা তার ভয়।

লাশটার কথা ভাবছি, বুঝলে গগন!

কী ভাবছ?

এখনও নেয়নি। গন্ধ ছাড়বে।

নেবে'খন। সময় হলে ঠিক নেবে।

ছেলেটা এখানকার নয় বোধহয়। সারাদিনে কম করে দু'—চারশো লোক দেখে গেছে, কেউ চিনতে পারছে না।

এসেছিল বোধহয় অন্য কোথা থেকে। ক্যানিং ট্যানিং—এর ওদিককার হতে পারে।

সুরেন মাথা নেড়ে বলল, বেশ ভদ্রঘরের ছাপ আছে চেহারায়। কসরত করা চেহারা।

গগন একটু কৌতূহলী হয়ে বলে, ভালো শরীর?
বেশ ভালো। তৈরি।
আহা!—বলে শ্বাস ছেড়ে গগন বলে, অমন শরীর নষ্ট করল?
সুরেন খাঁড়া বলে, তাও তো এখনও চোখে দেখোনি, আহা—উহু করতে লাগলে।
ও সব চোখে দেখা আমার সহ্য হয় না। অপঘাত দেখলেই মাথা বিগড়ে যায়। গত মাঘ মাসে চেতলার দিদিমাকে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম কেওড়াতলায়। সেখানে দেখি রাজ্যের কলেজের মেয়ে হাতে বই—খাতা নিয়ে জড়ো হয়েছে। সব মালা আর ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে, একটা খাট ঘিরে ভিড়, শুনলাম কলেজের প্রথম বছরের মেয়ে একটা। সে দেওয়ালির দিন সিন্থেটিক ফাইবারের শাড়ি পরে বেরোতে যাচ্ছিল, আগুন লেগে তলার দিকটা পুড়ে যায়। ওইসব সিন্থেটিক কাপড়ও খুব ডেঞ্জারাস, বুঝলে সুরেন? ওতে আগুন লাগলে তেমন দাউ দাউ করে জ্বলবে না, কিন্তু ফাইবার গলে গায়ের সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে যাবে, কেউ খুলতে পারবে না। মেয়েটারও তাই হয়েছিল, কয়েক মাস হাসপাতালে থেকে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। ভিড়—টিড় ডিঙিয়ে উঁকি মেরে দেখে তাই তাজ্জব হয়ে গেলাম। ঠোঁট দুটো একটু শুকনো বটে, কিন্তু কী মরি মরি রূপ, কচি, ফরসা! ঢল ঢল করছে মুখখানা। বুকের মধ্যে কেমন যে করে উঠল!
সুরেন খাঁড়া বলে, ও রকম কত মরছে রোজ!
গগনচাঁদ ব্যাপারটা 'কত'—র মধ্যে ফেলতে চায় না, বলল, না হে, এ মেয়েটাকে সকলের সঙ্গে এক করবে না। কী বলব তোমাকে, বললে পাপ হবে কি না তাও জানি না, সেই মরা মেয়েটাকে দেখে আমার বুকে ভালোবাসা জেগে উঠল। ভাবলাম, ও যদি এক্ষুনি বেঁচে ওঠে তো ওকে বিয়ে করি। সেই ছেলেবেলা থেকে অপঘাতে মৃত্যুর ওপর আমার বড় রাগ। কেন যে মানুষ অপঘাতে মরে!
সুরেন রুমালে ঘাড় গলা ঘষতে ঘষতে বলে, তোমার শরীরটাই হোঁতকা, মন বড্ড নরম। মনটা আর একটু শক্ত না করলে কি টিকতে পারবে? চারদিকের এত অপঘাত, মৃত্যু, অভাব—এ সব সইতে হবে না?
গগনচাঁদ একটু থমকে গিয়ে বলে, তোমাদের এক—এক সময়ে এক—এক রকমের কথা। কখনও বলছ গগনের মন নরম, কখনও বলছ গগনের মেজাজটা বড় গরম। ঠিক ঠিক ঠাওর পাও না নাকি!
সুরেন বলে, সে তত্ত্ব এখন থাক, আমি লাশটার কথা ভাবছি।
ভাবছ কেন?
ভাবছি ছেলেটার চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে কসরত করত। তুমি তো ব্যায়াম শেখাও, তা তোমার ছাত্রদের মধ্যে কেউ কি না তা গিয়ে একবার দেখে আসবে নাকি!
গগন ঝোল নামিয়ে এক ফুঁয়ে জনতা স্টোভ নিভিয়ে দিল। বলল, ও, তাই আগমন হয়েছে!
তাই।
কিন্তু ভাই, ও সব দেখলে আমার রাতের খাওয়া হবে না।
খেয়ে নিয়েই চলো, আমি ততক্ষণ বসি।
গগন মাথা নেড়ে বলে, তা—ও হয় না, খাওয়ার পর ও সব দেখলে আমার বমি হয়ে যেতে পারে।
সুরেন বলে, তুমি আচ্ছা লোক হে! বলছি তো তেমন ঘেন্নার দৃশ্য কিছু নয়, কাটা—ফাটা নেই, এক চামচে রক্তও দেখলাম না কোথাও। তেমন বীভৎস কিছু হলে না হয় কথা ছিল।
গগনের চেহারায় যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর শান্ত দৃঢ় ভাবটা থাকে সেটা এখন আর রইল না। হঠাৎ সে ঘামছিল, অস্বস্তি বোধ করছিল।
বলল, কার না কার বেওয়ারিশ লাশ! তোমার তা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন? ছেড়ে দাও, পুলিশ যা করার করবে।
সুরেন ভ্রূ কুঁচকে গগনকে একটু দেখল। বলল, সে তো মুখ্যুও জানে। কিন্তু কথা হল, আমাদের এলাকায় ঘটনাটা ঘটে গেল। অনেকের সন্দেহ, খুন। তা সে যা—ই হোক, ছেলেটাকে চেনা গেলে অনেক ব্যাপার

পরিষ্কার হয়ে যায়। পুলিশ কত কী করবে তা তো জানি!

সুরেন এ অঞ্চলের প্রধান। গগন তা জানে। সে নিজে এখানে পাঁচ—সাত বছর আছে বটে, কিন্তু তার প্রভাব—প্রতিপত্তি তেমন কিছু নয়। এক গোটা পাঁচেক জিমনাশিয়ামের কিছু ব্যায়ামের শিক্ষানবিশ আর স্থানীয় কয়েকজন তার পরিচিত লোক। সুরেনের মতো সে এখানকার শিকড়—গাড়া লোক নয়। সুরেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ভালোই, কিন্তু এও জানে, সুরেনের মতে মত না দিয়ে চললে বিস্তর ঝামেলা। সুরেনের টাকার জোর আছে, দলের জোর আছে, নিজেকে সে এ অঞ্চলের রাজা ভাবে। বিপদ সেখানে, এ অঞ্চলে যা ঘটে তার নিজের দায় বলে মনে করে সুরেন। খেপে গেলে সে অনেক দূর পর্যন্ত যায়।

গগন প্যান্ট পরল, জামা গায়ে গলিয়ে নিল। চপ্পলজোড়া পায়ে দিয়ে বলল, চলো।

খেলে না?

না। যদি রুচি থাকে তো এসেই যা হোক দুটো মুখে দেব। নইলে আজ আর খাওয়া হল না।

দুই

গতবার সন্তু একটা বেড়ালকে ফাঁসি দিয়েছিল। বেড়ালটা অবশ্য খুবই চোর ছিল, ছিনতাই করত, মাঝে মাঝে দু'—একটা ডাকাতিও করেছে। যেমন সন্তুর ছোট বোন দুধ খেতে পারে না, রোজ সকালে মারধরের ভয় দেখিয়ে দুধের গেলাস হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়, আর তখন খুব অনিচ্ছায় সন্তুর বোন টুটু এক চুমুক করে খায় আর দশ মিনিট ধরে আগড়ম বাগড়ম বকে, খেলে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই করতে করতে এক ঘণ্টা। ততক্ষণে দুধ ঠান্ডা মেরে যায়, মাছি পড়ে। বেড়ালটা এ সবই জেনে তক্কে তক্কে থাকত। এক সময়ে দেখা যেত, প্রায় সকালেই সে গেলাস কাত করে মেঝেময় দুধ ছড়িয়ে চেটেপুটে খেয়ে গেছে। এটা চুরি। এ রকম চুরি সে হামেশাই করত, আর ছিনতাই করত আরও কৌশলে। পাড়ার বাচ্চাদের খাওয়ার সময়টা কী করে যে তার জানা থাকত কে বলবে! ঠিকঠাক খাওয়ার সময়ে হাজির থাকত সে। মুখোমুখি বসে চোখ বুজে ঘুমোনোর ভান করত, আর সুযোগ হলেই এর হাত থেকে, তার পাত থেকে মাছের টুকরো কেড়ে নিয়ে হাওয়া। ডাকাতি করত মা—মাসিদের ওপর। কেউ মাছ কুটছে, গয়লার কাছ থেকে দুধ নিচ্ছে, কী হরিণঘাটার বোতল থেকে দুধ ডেকচিতে ঢালছে, অমনি হুড়ুশ করে কোত্থেকে এসে বাঘের মাসি ঠিক বাঘের মতোই অ্যাও করে উঠত। দেখা গেছে মা—মাসির হাত থেকে মাছ কেড়ে নিতে তার বাধেনি, দুধের ডেকচিও সে ওলটাতে জানত মা—মাসির হাতের নাগালে গিয়ে। ও রকম বাঁদর বিড়াল আর একটাও ছিল না। বিশাল সেই হুলোটা অবশ্য পরিপাটি দাঁতে নখে ইঁদুরও মেরেছে অনেক। সিংহবাড়ির ছন্নছাড়া বাগানটার একাধিক হেলে আর জাতি সাপ তার হাতে প্রাণ দিয়ে শহিদ হয়েছে। গায়ে ছিল অনেক আঁচড়—কামড়ের দাগ, রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে প্রায়দিনই তার হাতাহাতি কামড়া—কামড়ি ছিল। কুকুররাও, কে জানে কেন, সমঝে চলত তাকে। রাস্তাঘাটে বেড়াল দেখলেই যেমন কুকুর হামলা করে, তেমন এই হুলোকে কেউ করত না। কে যেন বোধহয় রায়েদের বুড়ি মা—ই হবে, বেড়ালটার নাম দিয়েছিল গুন্ডা। সে নামই হয়ে গেল। হুলো গুন্ডা এ পাড়ায় যথেচ্ছাচার করে বেড়াত, ঢিল খেতে, গাল তো খেতই।

সন্তুকে দু—একটা স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমটায় যে স্কুলে সে পড়ত তা ছিল সাহেবি স্কুল, খুব আদব—কায়দা ছিল, শৃঙ্খলা ছিল। সেখানে ভরতি হওয়ার কিছু পরেই সন্তুর বাবা অধ্যাপক নানক চৌধুরীকে ডেকে স্কুলের রেকটর জানালেন, আপনার ছেলে মেন্টালি ডিরেঞ্জড। আপনারা ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। আমরা আর দু'মাস ট্রায়ালে রাখব, যদি ওর উন্নতি না হয় তো দুঃখের সঙ্গে টিসি দিতে বাধ্য হব।

নানক চৌধুরী আকাশ থেকে পড়লেন। আবার পড়লেনও না। কারণ তাঁর মনে বরাবরই একটা খটকা ছিল সন্তু সম্পর্কে। বয়সের তুলনায় সন্তু ছিল বেশি নিষ্ঠুর, কখনো কখনো মার খেলে হেসে ফেলে। এবং এমন সব দুষ্টুমি করে যার কোনও মানে হয় না। যেমন সে ছাদের আলসের ওপর সাজিয়ে রাখা ফুলের ভারী টবের একটা—দুটো মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে নীচের রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। রাস্তায় হাজার লোক চলে।

একবার একটা সন্তুর বয়সি ছেলেরই মাথায় একটা টব পড়ল। সে ছেলেটা দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে যখন ছাড়া পেল তখন বোধবুদ্ধিহীন জরদগব হয়ে গেছে। যেমন সে একবার সেফটিপিন দিয়ে টিয়াপাখির একটা চোখ কানা করে দিয়েছিল। টিয়ার চিৎকারে সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, একটা চোখ থেকে অবিরল রক্ত পড়ছে লাল অশ্রুর মতো। আর পাখিটা ডানা ঝাপটাচ্ছে আর ডাকছে। সে কী অমানুষিক চিৎকার! খাঁচার গায়েই সেফটিপিনটা আটকে ছিল। আর একবার সে তার ছোটবোনকে বারান্দার এক ধারে দাঁড় করিয়ে জোরে গুলতি মারে। মরেই যেত মেয়েটা। বুকে লেগে দমবন্ধ হয়ে অজ্ঞান। হাসপাতালে গিয়ে সেই মেয়েকে ভালো করে আনতে হয়। তাই নানক চৌধুরী অবাক হলেও সামলে গেলেন। তবে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে না—গিয়ে সন্তুকে বাড়ি ফিরে একনাগাড়ে মিনিট পনেরো ধরে প্রচণ্ড মারলেন।

দু'মাস পর ঠিক কথামতোই টিসি দিয়ে দিল স্কুল। দ্বিতীয় স্কুলটি অত ভালো নয়। কিন্তু সেখানেও কিছু ডিসিপ্লিন ছিল, ছেলেদের ওপর কড়া নজর রাখা হত। দু'মাস পর সেখান থেকে চিঠি এল—আপনার ছেলে পড়াশুনায় ভালো, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল, তার জন্য আর পাঁচটা ছেলে নষ্ট হচ্ছে।

এক বছর বাদে সন্তু সেকেন্ড হয়ে ক্লাসে উঠল। কিন্তু প্রমোশনের সঙ্গে তাকে টিসি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অগত্যা পাড়ার কাছাকাছি একটা গোয়ালমার্কা স্কুলে ছেলেকে ভরতি করে এবার নিশ্চিন্ত হয়েছেন নানক চৌধুরী। এই স্কুলে দুষ্টু ছেলের দঙ্গল, তার ওপর গরিব স্কুল বলে কাউকে সহজে তাড়িয়ে দেয় না। বিশেষত সন্তুর বেতন সব সময়ে পরিষ্কার থাকে, এবং ক্লাসে সে ফার্স্ট হয়। নানক চৌধুরীকে এখন সন্তুর ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হয় না, তিনি নিজের লেখাপড়ায় মগ্ন থাকেন।

সন্তু ক্লাস নাইনে পড়ে। স্কুলের ফুটবল টিমে সে অপরিহার্য খেলোয়াড়। তা ছাড়া সে একটা ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম শেখে। গগনচাঁদ শেখায়। সন্তুর খুব ইচ্ছে সে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ব্যায়াম করে। ততে শরীরের পেশি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কিন্তু গগন যন্ত্র ছুঁতেই দেয় না, বলে, ও সব করলে শরীর পাকিয়ে শক্ত জিংড়ে মেরে যাবে, বাড়বে না। গগন তাই ফ্রি হ্যান্ড করায় আর রাজ্যের যোগব্যায়াম, ব্রিদিং, স্কিপিং আর দৌড়। সন্তু অবশ্য সে কথা শোনে না। ফাঁক পেলেই রিং করে, প্যারালাল বার—এ ওঠে, ওজন তোলে, স্প্রিং টানে। গগন দেখলে ঝাপড় মারবে, কিংবা বকবে। তাই প্রায় সময়েই রাতের দিকে জিমনাশিয়ামে যখন গগন থাকে না, দু'—চারজন চাকুরে ব্যায়ামবীর এসে কসরত করে আর নিজেদের চেহারা আয়নায় ঘুরিয়ে—ফিরিয়ে দেখে, তখন সন্তু এসে যন্ত্রপাতি নেড়ে ব্যায়াম করে।

গুন্ডা বেড়ালটাকে গতবার সন্তু ধরেছিল সিংহীদের বাগানে। বাগান বলতে আর কিছু নেই। কোমর—সমান উঁচু আগাছায় ভরে গেছে চারধার। একটা পাথরের ফোয়ারা ভেঙে ফেটে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা পামগাছের গায়ে বহু দূর পর্যন্ত লতা উঠেছে বেয়ে। সিংহীদের বাড়িতে কেউই থাকে না। বছর দেড়েক আগে বুড়ো নীলমাধব সিং মারা গেলেন। হাড়কিপটে লোক ছিলেন। অত বড় বাড়ির মালিক, তবু থাকতেন ঠিক চাকরবাকরের মতো, হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা জামা, পায়ে রবারের চটি। একটা চাকর ছিল, সে—ই দেখাশোনা করত। নীলমাধবের একমাত্র ছেলে বিলেতে থাকে, আর কেউ নেই। অসুখ হলে লোকটা ডাক্তার ডাকতেন না, নিজেই হোমিয়োপ্যাথির বাক্স নিয়ে বসতেন। বাজার করতেন নিজের হাতে। যত সস্তা জিনিস এনে রান্না করে খেতেন। বাগানে কাশীর পোয়ারা, সফেদা, আঁশফল বা জামরুল পাড়তে বাচ্চা—কাচ্চা কেউ ঢুকলে লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। একটা সড়ালে কুকুর ছিল, ভারী তেজি, সেটাকেও লেলিয়ে দিতেন। ছেঁড়া জামা—কাপড় সেলাই করতেন বসে বসে। একটা বুড়ো হরিণ ছিল, সেটা বাগানে দড়ি—বাঁধা হয়ে হয়ে চরে বেড়াত। নীলমাধব পাড়ার লোকজনদের সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না তবে তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে খুশি হতেন, অনেক পুরনো দিনের গল্প ফেঁদে বসতেন। এ অবশ্য নীলমাধবের পৈতৃক সম্পত্তি। নিঃসন্তান জ্যাঠা মারা গেলে দেখা যায় উইল করে তিনি নীলমাধবকেই সব দিয়ে গেছেন। লোকে বলে নীলমাধব এক তান্ত্রিকের সাহায্যে বাণ মেরে জ্যাঠাকে খুন করে সম্পত্তি পায়।

লোকের ধারণা, নীলমাধব তাঁর স্ত্রীকেও খুন করেছিলেন। এ সবই অবশ্য গুজব,কোনও প্রমাণ নেই। তবে কথা চলে আসছে।

সন্তু একবার নীলমাধবের হতে ধরা পড়েছিল। সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

চিরকালই জীবন্ত কোনও কিছু দেখলেই তাকে উত্ত্যক্ত করা সন্তুর স্বভাব, সে মানুষ বা জন্তু যা—ই হোক। তাদের একটা চাকর ছিল মহী। লোকটা চোখে বড় কম দেখত। তার সঙ্গে রাস্তায় বেরোলেই সন্তু তাকে বরাবর—মহীদা, গাড়ি আসছে... এই বলে হাত ধরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিত। এবং মহী কয়েক বারই এভাবে বিপদে পড়েছে। সন্তু তাকে বার দুই নালার মধ্যেও ফেলে দেয়। এ রকমই ছিল তার স্বভাব। তখন সিংহীদের বাগানের বুড়ো হরিণটাকে সে প্রায়ই ঢিল মারত, সিংহীদের বাগানের ঘর—দেয়াল অনেক জায়গায় ভেঙে ফেটে গেছে। টপকানো সোজা। প্রায় দুপুরেই সন্তু দেয়াল টপকে আসত, বাগানে ঘুরত—টুরত, আর বাঁধা হরিণটাকে তাক করে গুলতি মারত। হরিণটার গায়ে চমৎকার কয়েকটা দাগ ছিল, সেই দাগগুলো লক্ষ করে গুলতি দিয়ে নিশানা অভ্যাস করত সে। আর তার লক্ষ্য ছিল, হরিণের কাজল—টানা চোখ। কখনও বা গাছের মতো দুটি প্রকাণ্ড শিংকেও লক্ষ্য করে ঢিল মারত সে। একবার হরিণটাকে দড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে বাগানের উত্তর দিকে একটা গহিন লতানে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে আটকে দেয়।

সন্তু জানত না যে বুড়ো নীলমাধবের দূরবিন আছে। এবং প্রায়দিনই নীলমাধব দূরবিন দিয়ে তাকে খুঁজত। একটা দুষ্টু ছেলে যে হরিণকে ঢিল মারে সেটা তাঁর জানা ছিল। প্রিয় হরিণের গায়ে তিনি দাগ খুঁজে পেতেন।

হরিণকে লতাগাছে আটকে দেওয়ার পরদিনই সন্তু ধরা পড়ে। সন্তু রোজকার মতোই দুপুরে বাগানে ঢুকেছে, পকেটে গুলতি, চোখে শ্যেনদৃষ্টি। চার দিক রোদে খাঁ খাঁ করছে সিংহীবাগান। হরিণ চরছে। গাছে গাছে পাখি ও পতঙ্গের ভিড়। শিরিষ গাছে একটা মৌচাক বাঁধছে মৌমাছিরা। বর্ষা তখনও পুরোপুরি আসেনি। চারধারে একপশলা বৃষ্টির পর ভ্যাপসা গরম।

সফেদা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সন্তু ফল দেখছিল। খয়েরি রঙের কী ফল ফলেছে গাছে। ভারে নুয়ে আছে গাছ। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে এক থোপা ফল ধরেও ফেলেছিল সন্তু। সেই সময়ে পায়ের শব্দ পেল, আর খুব কাছ থেকে কুকুরের ডাক। তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। তিন ধার থেকে তিনজন আসছে। এক দিক থেকে কুকুরটা, অন্য ধার থেকে চাকর, আর ঠিক সামনে একনলা বন্দুক হাতে নীলমাধব সিংহ। একটা লাফ দিয়ে সন্তু দৌড়েছিল। পারবে কেন? মস্ত সড়ালে কুকুরটাই তাকে পেল প্রথম। পায়ের ডিমে দাঁত বসিয়ে জন্তুটা ঘাসজঙ্গলে পেড়ে ফেলল তাকে। পা তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কুকুরটা তার বুকের ওপর খাপ পেতে আধখানা শরীরের ভার দিয়ে চেপে রেখেছে। আর ধারালো ঘাসের টানে কেটে যাচ্ছে সন্তুর কানের চামড়া। ডলা ঘাসের অদ্ভুত গন্ধ আসছে নাকে। বুকের ওপর বন্দুকের নল ঠেকিয়ে নীলমাধব বললেন, ওঠো। চাকরটা এসে ঘাড় চেপে ধরল। সন্তু কোনও কথাই বলতে পারছিল না।

বুড়ো নীলমাধব নিয়ে গেলেন সেই বিশাল বাড়ির ভিতরে। সেইখানে অত ভয়ভীতির মধ্যেও ভারী লজ্জা পেয়েছিল সন্তু দেয়ালে দেয়ালে সব প্রকাণ্ড মেমসাহেবের ন্যাংটো ছবি, আর বড় বড় উঁচু টুলে ওইরকমই ন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথরের মূর্তি দেখে।

সব শেষে একটা হলঘর। সেইখানে এনে দাঁড় করালেন নীলমাধব। মুখে কথা নেই। সিলিং থেকে একটা দড়ি টাঙানো, দড়ির নীচের দিকে ফাঁস, অন্য প্রান্তটা সিলিং—এর আংটার ভিতর দিয়ে ঘুরে এসে কাছেই ঝুলছে।

নীলমাধব বললেন, তোমার ফাঁসি হবে।

এই বলে নীলমাধব দড়িটা টেনেটুনে দেখতে লাগলেন। চাকরটাকে বললেন একটা টুল আনতে। কুকুরটা আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। সন্তু বুঝল এইভাবেই ফাঁসি হয়। কিছু করার নেই।

গলায় সেই ফাঁস পরে টুলের ওপর ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থেকেছিল সন্তু। চোখের পাতা ফেলেনি। অন্য প্রান্তের দড়িটা ধরে থেকে সেই এক ঘণ্টা নীলমাধব বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতাটা খুব খারাপ লাগেনি সন্তুর।

নীলমাধবের পূর্বপুরুষ কীভাবে বাঘ ভালুক এবং মানুষ মারতেন তারই নানা কাহিনি! শেষ দিকটায় সন্তুর হাই উঠছিল। আর তাই দেখে নীলমাধব ভারী অবাক হয়েছিলেন।

যাই হোক, এক ঘণ্টা পর নীলমাধব তাকে টুল থেকে নামিয়ে একটা চাবুক দিয়ে গোটা কয় সপাং সপাং মারলেন। বললেন, ফের যদি বাগানে দেখি তো পুঁতে রাখব মাটির নীচে।

এই ঘটনার পর নীলমাধব বেশিদিন বাঁচেননি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিণটা মারা যায়। সড়ালে কুকুরটাকে নিয়ে কেটে পড়ে চাকরটা। নীলমাধবের পেয়ারের হুলো বেড়ালটাই অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াত পাড়ায় পাড়ায়। বড়লোকের বেড়াল বলেই কি না কে জানে, তার মেজাজ অন্য সব বেড়ালের চেয়ে অনেক কড়া ধাতের। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, গুন্ডামি কোনওটাই আটকাত না।

কে একজন রটাল, নীলমাধব মরে গিয়ে বেড়ালটায় ভর করে আছেন।

বিলেত থেকে কলকাঠি নেড়ে নীলমাধবের ছেলে কী করে যেন বাড়ি বিক্রি করে দিল। শোনা যাচ্ছে, এখানে শিগগির সব বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠবে।

তা সে উঠুক গে। গতবারের কথা বলে নিই আগে। হুলো গুন্ডা বেড়ালকে সিংহীদের বাগানে তক্কে তক্কে থেকে একদিন পাকড়াও করে সন্তু। ডাকাবুকো ছেলে। বেড়ালটার গলায় দড়ি বেঁধে সেই বাড়িটায় ঢুকে যায়। এবং খুঁজে খুঁজে ছাড়াবাড়ির জানালা টপকে ভিতরে ঢুকতেই ফাঁসির হলঘরে আসে। সিলিং থেকে দড়ি টাঙানোর সাধ্য নেই। সে চেষ্টাও করেনি সন্তু।

একটা মোটা ভারী চেয়ারে দড়িটা কপিকলের মতো লাগিয়ে বেড়ালটাকে অন্য প্রান্তে বেঁধে সে বলল, তোমার ফাঁসি হবে। বলেই দড়ি টেনে দিল।

এ সময়ে এক বজ্রগম্ভীর গলা বলল, না, হবে না!

চমকে উঠে চার দিকে তাকিয়ে দেখল সন্তু। হাতের দড়ি সেই ফাঁকে টেনে নিয়ে গলায় দড়ি সমেত গুন্ডা পালিয়ে যায়।

কাকে দেখেছিল সন্তু তা খুবই রহস্যময়। সন্তু কিছু মনে করতে পারে না। সে চমকে উঠে চার দিকে চেয়ে দেখছিল, এ সময় কে তাকে মাথার পিছন দিকে ভারী কোনও কিছু দিয়ে মারে। সন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

সন্ধের পর নানক চৌধুরী এক অচেনা লোকের টেলিফোন পেয়ে সিংহীদের বাড়িতে লোকজন নিয়ে গিয়ে সন্তুকে উদ্ধার করে আনেন। এরপর দিন সাতেক সন্তু ব্রেন ফিবারে ভোগে। তারপর ভালো হয়ে যায়। এবং এ ঘটনার পর গুন্ডাকেও এ লোকালয়ে আর দেখা যায়নি। একটা বেড়ালের কথা কে—ই বা মনে রাখে।

সন্তুর কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, অলক্ষে তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ আছে। সিংহদের বাড়িতে যে লোকটা তাকে মেরেছিল সে বাস্তবিক তার শত্রু নাও হতে পারে। তার বাবা নানক চৌধুরী মানুষটা খুবই নির্বিকার প্রকৃতির লোক। ঘটনার পর নানক চৌধুরী থানা—পুলিশ করেনি। ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করেছে। সন্তুকেও তেমন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। এমনকী কে একজন যে নিজের নাম গোপন রেখে টেলিফোন করেছিল তারও খোঁজ করবার চেষ্টা করেনি। নানক চৌধুরী লোকটা ওইরকমই, প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি আর নগদ টাকা আছে। বিবাহসূত্রে শ্বশুরবাড়ির দিক থেকেও সম্পত্তি পেয়েছে কারণ বড়লোক শ্বশুরের ছেলে ছিল না, মাত্র দুটি মেয়ে। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তি দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। নানক চৌধুরীর শালি, অর্থাৎ সন্তুর মাসির ছেলেপুলে নেই। বয়স অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেছে তার সন্তান—সম্ভাবনা নেই। সেই শালি সন্তুকে দত্তক চেয়ে রেখেছে। সন্তুর মাসি যদি অন্য কাউকে দত্তক না নেয় তবে তার সম্পত্তিও হয়তো একদিন সন্তুই পাবে। মাসি সন্তুকে বড় ভালোবাসে। সন্তুও জানে একমাত্র মাসি ছাড়া তাকে আর কেউ নিখাদ ভালোবাসে না। যেমন মা। মা কোনও দিন সন্তুর সঙ্গে তার বোনকে কোথাও বেড়াতে পাঠায় না বা একা খেলতে দেয় না। তার সন্দেহ, সন্তু ছোটবোনকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। বাবা সন্তুর প্রতি খুবই উদাসীন। কেবল মাঝে মাঝে পেটানো ছাড়া সন্তুর অস্তিত্বই নেই তার কাছে। লোকটা সারা দিনই লেখাপড়া নিয়ে আছে। বই ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

সন্তুর সঙ্গী—সাথী প্রায় কেউই নেই। তার কারণ, প্রথমত সন্তু বন্ধুবান্ধব বেশি বরদাস্ত করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সে কাউকেই খুব একটা ভালোবাসতে পারে না। তৃতীয়ত, সে যে ধরনের দুষ্টুমি করে সে ধরনের দুষ্টুমি খুব খারাপ ছেলেরাও করতে সাহস পায় না। সন্তু তাই একা। দু—চারজন সঙ্গী তার কাছে আসে বটে, কিন্তু কেউই খুব ঘনিষ্ঠ নয়।

কাল সন্ধেবেলা কিন্তু জিমনাশিয়াম থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল, সেই সময়ে কালুর সঙ্গে দেখা। কালুর বয়স বছর ষোলোর বেশি নয়। সন্তুদের ইস্কুলেই পড়ত, পড়া ছেড়ে দিয়ে এখন রিকশা চালায়। তবে রিকশা চালানো ছাড়া তার আরও কারবার আছে। স্টেশনে বাজারে, লাইনের ধারে সে প্রায়ই চুরি—ছিনতাই করে। কখনও ক্যানিং বা বারুইপুর থেকে চাল নিয়ে এসে কালোবাজারে বেচে। এই বয়সেই সে মদ খায় এবং খুব হুল্লোড়বাজি করে। সন্তুর সঙ্গে তার খুব একটা খাতির কখনও ছিল না। কিন্তু দেখা হলে তারা দুজনে 'কী রে, কেমন আছিস রে' বলে।

কাল কালু একটু অন্যরকম ছিল। সন্তু ওকে দূর থেকে মুখোমুখি দেখতে পেয়েই বুঝল, কালু মদ খেয়েছে। রিকশায় প্যাডল মেরে গান গাইতে গাইতে আসছে। চোখ দুটো চকচকে। সন্তুকে দেখেই রিকশা থামিয়ে বলল, উঠে পড়।

সন্তু ভ্রূ কুঁচকে বলল, কোথায় যাব?

ওঠ না। তোকে একটা জিনিস দেখাব, এইমাত্র দেখে এলাম।

কৌতূহলী সন্তু উঠে পড়ল। কালু রিকশা ঘুরিয়ে পালবাজার পার হয়ে এক জায়গায় নিয়ে গেল তাকে। রিকশার বাতিটা খুলে হাতে নিয়ে বলল, আয়।

তারপর খানিক দূর তারা নির্জনে পথহীন জমি ভেঙে রেল লাইনে উঠে এল। সেখানে একটা পায়ে—হাঁটা রাস্তার দাগ। আর—একটু দূরেই একটা ছেলে পড়ে আছে।

কালু বলল, এই মার্ডারটা আমার চোখের সামনে হয়েছে!

ছেলেটা কে?

চিনি না। তবে মার্ডারটা কে করেছে তা বলতে পারি।

কে?

কালু খুব ওস্তাদি হেসে বলল, যে পাঁচশো টাকা দেবে তাকে বলব। তোকে বলব কেন?

তিন

সুরেন খাঁড়া আর গগনচাঁদ রেল লাইনের ওপর উঠে এল। এ জায়গাটা অন্ধকার। লোকজন এখন আর কেউ নেই। সুরেন খাঁড়া টর্চ জ্বেলে চারিদিকে ফেলে বলল, হল কী? এইখানেই তো ছিল!

গগনচাঁদ ঘামছিল। অপঘাতের মড়া দেখতে তার খুবই অনিচ্ছা। বলতে কী রেলের উঁচু জমিটুকু সে প্রায় চোখ বুজেই পার হয়ে এসেছে। সুরেনের কথা শুনে চোখ খুলে বলল, নেই?

দেখছি না।

এই কথা বলতেই সামনের অন্ধকার থেকে কে একজন বলল, এই তো একটু আগেই ধাঙড়রা নিয়ে গেছে, পুলিশ এসেছিল।

সুরেন টর্চটা ঘুরিয়ে ফেলল মুখের ওপর। লাইনের ধারে পাথরের স্তূপ জড়ো করেছে কুলিরা। লাইন মেরামত হবে। সেই একটা গিটঠি পাথর স্তূপের ওপর কালু বসে আছে।

সুরেন খাঁড়া বলে, তুই এখানে কী করছিস?

হাওয়া খাচ্ছি।—কালু উদাস উত্তর দেয়।

কখন নিয়ে গেল?

একটু আগে। ঘণ্টা দুয়েক হবে।

পুলিশ কিছু বলল?—সুরেন জিজ্ঞেস করে।

ফের টর্চটা জ্বালতেই দেখা গেল, কালুর পা লম্বা হয়ে পাথরের স্তূপ থেকে নেমে এসেছে। ভূতের পায়ের মতো, খুব রোগা পা। আর পায়ের পাতার কাছেই একটা দিশি মদের বোতল আর শালপাতার ঠোঙা।

কালু একটু নড়ে উঠে বলে, পুলিশ কিছু বলেনি। পুলিশ কখনও কিছু বলে না। কিন্তু আমি সব জানি।

কী জানিস?

কালু মাতাল গলায় একটু হেসে বলে, সব জানি।

সুরেন খাঁড়া একটু হেসে বলে, হাওয়া খাচ্ছিস, না আর কিছু?

কালু তেমনি নির্বিকার ভাবে বলে, যা পাই খেয়ে নিই। পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই আরাম। জায়গাটা ভরাট রাখা নিয়ে হচ্ছে কথা।

ইঃ, মস্ত ফিলজফার!

কালু ফের মাতাল গলায় হাসে।

পুলিশকে তুই কিছু বলেছিস?—সুরেন জিজ্ঞেস করে।

না। আমাকে কিছু তো জিজ্ঞেস করেনি। বলতে যার কোন দুঃখে?

জিজ্ঞেস করলে কী বলতিস?

কী জানি!

শালা মাতাল!—সুরেন বলে।

মাথা নেড়ে কালু বলে, জাতে মাতাল হলে কী হয়, তালে ঠিক আছে সব। সব জানি।

ছেলেটা কে জানিস?

আগে জানতাম না। একটু আগে জানতে পারলাম।

কে?

বলব কেন? যে ছেলেটাকে খুন করেছে তাকেও জানি।

খুন!—একটু অবাক হয় সুরেন, খুন কী রে? সবাই বলছে রাতে ট্রেনের ধাক্কায় মরেছে!

মাথা নেড়ে কালু বলে, সন্ধের আগে এইখানে খুন হয়। আমি নিজে চোখে দেখেছি। মাথায় প্রথমে ডান্ডা মারে, তখন ছেলেটা পড়ে যায়। তারপর গলায় কাপড় জড়িয়ে গলা টিপে মারে। আমি দেখেছি।

কে মারল?

বলব কেন? পাঁচশো টাকা পেলে বলব!

পুলিশ যখন ধরে নিয়ে গিয়ে পেঁদিয়ে কথা বার করবে তখন কী করবি?

বলব না। যে খুন করেছে সে পাঁচশো টাকা দেয় তো কিছুতেই বলব না।

ঠিক জানিস তুই?

জানাজানি কী! দেখেছি।

বলবি না?

না।

গগনচাঁদ এতক্ষণ কথা বলেনি। এইখানে একটা মৃত্যু ঘটেছে, এই ভেবে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। এবার থাকতে না পেরে বলল, খুনের খবর চেপে রাখিস না। তোর বিপদ হবে।

আমার বিপদ আবার কী! আমি তো কিছু করিনি।—কালু বলল।

দেখেছিস তো!—সুরেন খাঁড়া বলে।

দেখলে কী?

দেখলে বলে দিতে হয়। খুনের খবর চাপতে নেই।—সুরেন নরম সুরে বলে।

কালু একটা হাই তুলে বলে, তা হলে দেখিনি।

শালা মাতাল।—সুরেন হেসে গগনচাঁদের দিকে তাকায়।

কালু একটু কর্কশ স্বরে বলে, বারবার মাতাল বলবেন না। সব শালাই মাল টানে আপনিও টানেন।

সুরেন একটা অস্ফুট শব্দ করল। ইদানীং সে বড় একটা হাঙ্গামা—হুজ্জত করে না। কিন্তু এখন হঠাৎ গগনচাঁদ বাধা দেওয়ার আগেই অন্ধকারে দশাসই শরীরটা নিয়ে দুই লাফে এগিয়ে গেল। আলগা নুড়ি পাথর খসে গেল পায়ের তলায়। ঠাস করে একটা প্রচণ্ড চড়ের শব্দ হল। কালু এক বার 'আউ' করে চেঁচিয়ে চুপ করে গেল। আলগা পাথরে পা হড়কে সুরেন পড়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে কালুকে দেখা যাচ্ছিল না তবে সে—ও পড়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছিল। এই সময়ে কাছেই একটা বাজ ফেটে পড়ল। বাতাস এল এলোমেলো। বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় করে পড়ছে।

সুরেন টর্চটা জ্বালতে গিয়ে দেখে, আলো জ্বলছে না। একটা কাতর শব্দ আসে পাথরের স্তূপের ওধার থেকে। সুরেন একটা মাঝারি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেই শব্দটা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে। বলে, শালা যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

কাতর শব্দটা থেমে যায়।

গগনচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দ পায় সে। আকাশে চাঁদ বা তারা কিছুই নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। খুব দুর্যোগ আসবে। গ্যারাজঘরের অবস্থাটা কী হবে, ভাবছিল সে। বৃষ্টিতে তার বড় বিপদ।

সুরেন দাঁড়িয়ে নিজের ডান হাতের কনুইটা টিপে টিপে অনুভব করছে। বলে, শালা জোর লেগেছে। রক্ত পড়ছে।

আবার বিদ্যুৎ চমকায়। আবার। গগনচাঁদ দেখতে পায়, কালু লাইনের ধারে পড়ে আছে, তার ডান হাতটা রেল লাইনের ওপরে পাতা। মুহুর্মুহু গাড়ি যায়। যে—কোনও মুহূর্তে ওর ডান হাতটা দু—ফালা করে বেরিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতেই খুব ক্ষীণ হলুদ একটা আলো এসে পড়ল লাইনের ওপর। বহু দূরে অন্ধকারের কপালে টিপের মতো একটা গোল হলুদ আলো স্থির হয়ে আছে। গাড়ি আসছে।

গগনচাঁদ কিন্তু ধীর—স্থির। টপ করে কোনও কাজ করে ফেলতে পারে না। সময় লাগে। এমনকী ভাবনা—চিন্তাতেও সে বড় ধীর। কখন কী করতে হবে তা বুঝে উঠতে সময় লাগে।

তাই সে গাড়ির আলো দেখল, কালুর কথা ভাবল, কী করতে হবে তাও ভাবল! এভাবে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় কাটিয়ে সে ধীরে—সুস্থে পাথরের স্তূপটা পার হয়ে এল। গাড়িটা আর খুব দূরে নেই। সে নিচু হয়ে পাঁজাকোলা করে কালুকে সরিয়ে আনল লাইন থেকে খানিকটা দূরে। একটা পায়ে—হাঁটা রাস্তা গেছে লাইন ঘেঁষে। এখানে ঘাসজমি কিছু পরিষ্কার। সেখানে শুইয়ে দিল। এবং টের পেল মুষলধারে বৃষ্টির তোড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড চার দিকে। সব অস্পষ্ট। তাপদগ্ধ মাটি ভিজে এক রকম তাপ উঠেও চার দিকে অন্ধকার করে দিচ্ছে।

সুরেন খাঁড়া বলল, ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না। চলো।

গগনচাঁদ কালুর বুক দেখল। এত বৃষ্টিতে বুকের ধুকধুকুনিটা বোঝা যায় না। নাড়ি দেখল। নাড়ি চালু আছে।

গগনচাঁদ বৃষ্টির শব্দের ওপর গলা তুলে বলল, জ্ঞান নেই। এ অবস্থায় ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

প্রায় নিঃশব্দে বৈদ্যুতিক ট্রেনটা এল। চলে গেল। আবার দ্বিগুণ অন্ধকারে ডুবে গেল জায়গাটা। সুরেনের খেয়াল হল, গাড়িটা ডাউন লাইন দিয়ে গেল। কালুর হাতটা ছিল আপ লাইনের ওপর। এ গাড়িটায় কালুর হাত কাটা যেত না।

সুরেনের গলায় এখনও রাগ। বলল, পড়ে থাক। অনেক দিন শালার খুব বাড় দেখছি। চলো, কাকভেজা হয়ে গেলাম।

গগনচাঁদ দেখল, বৃষ্টির জল পড়ায় কালু নড়াচড়া করছে। গগন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলে, তুমি যাও, স্টেশনের শেডের তলায় দাঁড়াও গিয়ে। আমি আর—একটু দেখে যাচ্ছি।

মাটি ফুঁড়ে বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকে যাচ্ছে এত তোড়। কোনও মানুষই দাঁড়াতে পারে না। চামড়া ফেটে যায়। সুরেন একটা বজ্রপাতের শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে বলল, দেরি কোরো না।

বলে কোলকুঁজো হয়ে দৌড় মারল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির ঝাপটায় কালুর মাথার অন্ধকার কেটে গেছে। গগনচাঁদ অন্ধকারেই তাকে ঠাহর করে বগলের তলায় হাত দিয়ে তুলে বসাল। কালু বসে ফোঁপাচ্ছে।

গগন কালুর মুখ দেখতে পেল না। কেবল অন্ধকারে একটা মানুষের আবছায়া। গগন বলল, ওঠ!

কালু উঠল।

অল্প দূরেই একটা না—হওয়া বাড়ি! ভারা বাঁধা হয়েছে। একতলার ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে, এখন দোতলা উঠছে। পিছল পথ বেয়ে কালুকে ধরে সেখানেই নিয়ে এল গগনচাঁদ।

গা মুছবার কিছু নেই। সারা গা বেয়ে জল পড়ছে। গগন গায়ের জামাটা খুলে নিংড়ে নিয়ে মাথা আর মুখ মুছল। কালু উবু হয়ে বসে বমি করছে, একবার তাকিয়ে দেখল গগন। বমি করে নিজেই উঠে গিয়ে বৃষ্টির জল হাত বাড়িয়ে কোষে ধরে মুখে—চোখে ঝাপটা দিল।

তারপর ফের মেঝেয় বসে পড়ে বলল, শরীরে কি কিছু আছে নাকি! মাল খেয়ে আর গাঁজা টেনে সব ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

গগনচাঁদ সে কথায় কান না দিয়ে বলল, তোর রিকশা কোথায়?

সে আজ মাতু চালাচ্ছে। আমি ছুটি নিয়েছি আজকের দিনটা।

কেন?

মনে করেছিলাম আজ পাঁচশো টাকা পাব।

গগন চুপ করে থাকে। কালুটা বোকা। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে।

গগন বললে, যে ছেলেটা খুন হয়েছে সে এখানকার নয়?

কালু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভেজা গায়ে বসে ছিল। প্রথমটায় উত্তর দিল না।

তারপর বলল, বিড়ি—টিড়ি আছে?

আমি তো খাই না।

কালু ট্যাঁক হাতড়ে বলল, আমার ছিল। কিন্তু সব ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে।

ভেজা বিড়ি বের করে কালু অন্ধকারেই টিপে দেখল, ম্যাচিস থেকে এক কোষ জল বেরোল। সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা অস্পষ্ট খিস্তি করে কালু বলে, সুরেন শালার খুব তেল হয়েছে গগনদা, জানলে?

গগন অন্ধকারে কালুর দিকে চাইল। তেল কালুরও হয়েছে। আজকাল সকলেরই খুব তেল।

গগন বলল, ছেলেটা কি এখানকার?

কোন ছেলেটা?

যে খুন হল?

সে—সব বলতে পারব না।

কেন?

বলা বারণ।—কালু উদাস গলাই বলে।

গগনচাঁদ একটু চুপ করে থেকে একটা মিথ্যে কথা বলল, শোন একটু আগে সুরেন যখন তোকে মেরেছিল, তখন তুই অজ্ঞান হয়ে গেলি। তোর ডান হাতটা রেল লাইনের ওপর গিয়ে পড়েছিল। আর ঠিক সেই সময় গাড়ি আসছিল। আমি তোকে সরিয়ে না আনলে ঠিক তোর হাতটা চলে যেত আজ।

কালু নড়ল না। কেবল বলল, মাইরি।

তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

কালু হঠাৎ আবার উদাস হয়ে গিয়ে বলল, তাতে কী হয়েছে? তুমি না সরালে একটা হাত চলে যেত! তা যেত তো যেত। এক—আধটা হাত—পা গেলেই কী থাকলেই কী!

গগনচাঁদ একটা রাগ চেপে গিয়ে বলল, দূর ব্যাটা, হাত—কাটা হয়ে ঘুরে বেড়াতিস তা হলে! রিকশা চালাত কে?

চালাতাম না। ভিক্ষে করে খেতাম। ভিক্ষেই ভালো, জানলে গগনদা। তোমাদের এলাকার রাস্তাঘাট যা তাতে রিকশা টানতে জান বেরিয়ে যায়। পোষায় না। শরীরেও কিছু নেই।

কথাটা বলবি না তা হলে?

কালু একটু চুপ করে থেকে বলল, পাঁচটা টাকা দাও।

গগন একটু অবাক হয়ে বলে, টাকা! টাকা কেন?

নইলে বলব না।

গগন একটু হেসে বলে, খুব টাকা চিনেছিস! কিন্তু এটা এমন কিছু খবর নয় রে। পুলিশের কাছে গেলেই জানা যায়।

তাই যাও না।

গগনেরও ইচ্ছে হয় এগিয়ে গিয়ে কালুর গলাটা টিপে ধরে। সুরেন যে ওকে মেরেছে সে কথা মনে করে গগন খুশিই হল। বলল, টাকা অত সস্তা নয়।

অনেকের কাছে সস্তা।

গগন মাথা নেড়ে বলে, তা বটে। কিন্তু আমার টাকা দামি।

কালু কাঁধ বাঁকিয়ে বলে, দিয়ো না।

গগন একটু ভেবে বলে, কিন্তু যদি পুলিশকে বলে দিই?

কী বলবে?

বলব খুনটা তুই নিজের চোখে দেখেছিস!

বলো গে না, কে আটকাচ্ছে?

পুলিশ নিয়ে গিয়ে তোকে বাঁশডলা দেবে!

দিক।—কালু নির্বিকারভাবে বলে, এত ভয় দেখাচ্ছ কেন? যে মরেছে আর যে মেরেছে তাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কী? যে যার নিজের ধান্দায় কেটে পড়ো তো। কেবল তখন থেকে খবর বের করার চেষ্টা করছ, তোমাদের এত খতেনে দরকার কী?

গগনচাঁদ ভেবে দেখল, সত্যিই তো। তার তো কিছু যায়—আসে না। কে কাকে খুন করেছে তাতে তার কী? সুরেন খাঁড়া এই ভরসন্ধ্যাবেলা তাকে ভুজুং—ভাজুং দিয়ে না আনলে সে মড়া দেখতে আসতও না। যে মরল সে বিষয়ে একটা কৌতূহল ভিতরে ভিতরে রয়ে গেছে। বিশেষত যখন শুনেছে যে মরা ছেলেটার শরীরটা কসরত করা। ভালো শরীরওয়ালা একটা ছেলে মরে গেছে শুনে মনটা খারাপ লাগে। কত কষ্টে এক—একটা শরীর বানাতে হয়। সেই আদরের শরীর কাটা—ছেঁড়া হয়ে যাবে! ভাবতে কেমন লাগে?

বৃষ্টির তোড়টা কিছু কমেছে। কিন্তু এখনও অবিরল পড়ছে। আধখ্যাঁচড়া বাড়িটায় জানালা—দরজার পাল্লা বসেনি, ফাঁক—ফোকরগুলি দিয়ে জলকণা উড়ে আসছে। বাতাস বেজায়। শীত ধরিয়ে দিল। এধার—ওধার বিস্তর বালি, নুড়িপাথর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কিছু লোহার শিকও। একটা লোক ছাতা মাথায়, টর্চ হাতে উঠে এল রাস্তা থেকে। ছাতা বন্ধ করে টর্চটা এক বার ঘুরিয়ে ফেলল গগনচাঁদের দিকে, অন্যবার কালুর দিকে। একহাতে বাজারের থলি। গলাখাঁকারি দিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে ঘরের দরজায় টিনের অস্থায়ী ঝাঁপ লাগানো। লোকটা ঝাঁপের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। চৌকিদার হবে।

কালু উঠে বলল, দেখি, লোকটার কাছে একটা বিড়ি পাই কি না, বড্ড শীত ধরিয়ে দিচ্ছে!

কালু গিয়ে একটু বাদেই ফিরে এল। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। বলল, সুরেন শালা জোর মেরেছে, জানলে গগনদা? চোয়ালের হাড় নড়ে গেছে, বিড়ি টানতে টের পেলাম। বসে বসে খায় তো সুরেন, তাই গা—গতরে খাসি, আমাদের মতো রিকশা টানলে গতরে তেল জমতে পারত না।

গগন গম্ভীরভাবে বলে, হুঁ।

হঠাৎ উবু হয়ে বসে বসে বিড়ি টানতে টানতেই বোধহয় কালুর মেজাজটা ভালো হয়ে গেল। বলল, যে ছেলেটা খুন হয়েছে তাকে তুমি চেনো গগনদা।

গগন বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ভাবসাব বুঝবার চেষ্টা করছিল। স্টেশনে সুরেন অপেক্ষা করছে। যাওয়া দরকার। কালুর কথা শুনে বলল, চিনি?

হ্যাঁ।

কে রে?

এক বান্ডিল বিড়ি কেনার পয়সা দেবে তো? আর একটা ম্যাচিস?

গগন হেসে বলে, খবরটার জন্য দেব না।

দিয়ো মাইরি।—কালু মিনতি করে, আজকের রোজগারটা এমনিতে গেছে। বিড়ি আর ম্যাচিসও গচ্চা গেল।

গগন বলল, দেব।

কালু বলল, আগে দাও।

গগন দিল।

কালু বলে, ছেলেটা বেগমের ছেলে।

বেগম কে?

তোমার বাড়িওলা নরেশ মজুমদারের শালি। নষ্ট মেয়েছেলে, বাপুজি নগরে থাকে।

ও।—বলে খানিকটা চমকে ওঠে গগন।

ছেলেটা তোমার আখড়ায় ব্যায়াম করত। সবাই ফলি বলে ডাকে। লোকে বলে, ও নাকি নরেশ মজুমদারেরই ছেলে।

জানি। এ সব কথা চাপা দেওয়ার জন্যই গগন তাড়াতাড়ি বলে, আর কী জানিস?

তেমন কিছু না। ছেলেটা বহুকাল হল পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। খুব পাজি বদমাশ ছেলে। ইদানীং ট্যাবলেট বেচতে আসত।

ট্যাবলেট! অবাক মানে গগন।

ট্যাবলেট, যা খেলে নেশা হয়! প্রথম প্রথম বিনা পয়সায় খাওয়াত ছেলে—ছোকরাদের। তারপর নেশা জমে উঠলে পয়সা নিত। অনেককে নেশা ধরিয়েছে।

ড্রাগ নাকি?—গগন জিজ্ঞেস করে।

কী জানি কী! শুনেছি খুব সাংঘাতিক নেশা হয়।

গগন বলল, এ পাড়ায় যাতায়াত ছিল তো, ওকে কেউ চিনতে পারল না কেন?

কালু হেসে বলল, দিনমানে আসত না। রাতে আসত। তা ছাড়া অনেক দিন পাড়া ছেড়ে গেছে, কে আর মনে রাখে! আর চিনতে চায় ক'জন বলো! সবাই চিনি না চিনি না বলে এড়িয়ে যায়। ঝঞ্ঝাট তো।

নরেশ মজুমদার খবর করেনি?

কে জানে? জানলে আসত ঠিকই, নিজের সন্তান তো। বোধহয় খুব ভালো করে খবর পায়নি। বৃষ্টি ধরে এল। এখনও টিপটিপিয়ে পড়ছে। এই টিপটিপানিটা সহজে থামবে না, লাগাতার চলবে। রাতের দিকে ফের ঝেঁপে আসবে হয়তো।

গগন গলা নামিয়ে বলল, সত্যিই খুন হতে দেখেছিস? না কি গুল ঝাড়ছিস?

কালু হাতের একটা ঝাপট মেরে বলে, শুধু শুধু গল্প ফেঁদে লাভ কী! আমার মাথায় অত গল্প খেলে না!

ছেলেটাকে তুই চিনলি কী করে?—গগন জিজ্ঞেস করে।

কোন ছেলেটাকে?

যে খুন হয়েছে, ফলি।

প্রথমটায় চিনতে পারিনি। এক কেতরে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, একটু চেনা—চেনা লাগছিল বটে। পুলিশ যখন ধাঙড় এনে বডি চিত করল তখনই চিনতে পারলাম। নামটা অবশ্য ধরতে পারিনি তখনও। পুলিশের একটা লোকই তখন বলল, এ তো ফলি, অ্যাবসকন্ডার। তখন ঝড়াক করে সব মনে পড়ে গেল। ইদানীং নেশা—ভাং করে মাথাটাও গেছে আমার, সব মনে রাখতে পারি না।

গগন খুব ভেবে বলল, খুনের ব্যাপারটাও মনে না—রাখলে ভালো করতিস। যে খুন করেছে সে যদি টের পায় যে তুই সাক্ষী আছিস, তা হলে তোকে ধরবে!

ধরুক না। তাই তো চাইছি! পাঁচ কানে কথাটা তুলেছি কেন জানো? যাতে খুনির কাছে খবর পৌঁছয়!

পৌঁছলে কী হবে?

পাঁচশো টাকা পাব, আর খবরটা চেপে যাব।

ব্ল্যাকমেল করবি কালু?

কালু হাই তুলে বলে, আমি অত ইংরিজি জানি না।

গগন একটা শ্বাস ফেলে বলে, সাবধানে থাকিস।

কালু বলল, ফলিকে তুমি চিনতে পারলে?

গগন মাথা নেড়ে বলে, চিনেছি। আমার কাছে কিছুদিন ব্যায়াম শিখেছিল। লেগে থাকলে ভালো শরীর হত।

শরীর!—বলে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে কালু। বলে, শরীর দিয়ে কী হয় গগনদা? অত বড় চেহারা নিয়েও তো কিছু করতে পারল না। এক ঘা ডান্ডা খেয়ে ঢলে পড়ল। তারপর গলা টিপে... ফুঃ!

গগন টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল। তার মাথার মধ্যে বেগম শব্দটা ঘুরছিল। শোভারানির বোন বেগম। খুব সুন্দর না হলেও বেগমের চেহারায় কী যেন একটা আছে যা পুরুষকে টানে। এখন বেগমের বয়স বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু চেহারা এখনও চমৎকার যুবতীর মতো। শোনা যায় স্বামী আছে। কিন্তু সেই স্বামী বড় হাবাগোবা মানুষ। কোন একটা কলেজে ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি করে। বেগম তাকে ট্যাঁকে গুঁজে রাখে। আসলে বেগমের যে একজন স্বামী আছে এ খোঁজই অনেকে পায় না। তার বাইরের ঘরে অনেক ছোকরা ভদ্রলোক এসে সন্ধেবেলায় আড্ডা বসায়, তাসটাস খেলে, নেশার জিনিসও থাকে। লোকে বলে, ওইটেই বেগমের আসল ব্যাবসা। আড্ডার নলচে আড়াল করে সে ফুর্তির ব্যাবসা করে। তা বেগম থাকেও ভালো। দামি জামা—কাপড়, মূল্যবান গৃহসজ্জা, চাকর—বাকর, দাস—দাসী তো আছেই, ইদানীং একটা সেকেন্ড—হ্যান্ড বিলিতি গাড়িও হয়েছে।

কয়েক বছর আগে নিঃসন্তান নরেশ আর শোভা বেগমের ছেলেকে পালবে পুষবে বলে নিয়ে আসে। বেগমও আপত্তি করেনি। তার যা ব্যাবসা তাতে ছেলেপুলে কাছে থাকলে বড় ব্যাঘাত হয়। তাই ছোট্ট ফলিকে এনে তুলল নরেশ মজুমদার। লোকে বলাবলি করল যে, নরেশ আসলে নিজের জায়গা মতো নিয়ে এসেছে। হতেও পারে। বেগমের স্বামীর পৌরুষ সম্পর্কে কারওরই খুব একটা উচ্চ ধারণা নেই।

ফলিকে এনে নরেশ ভালো স্কুলে ভরতি করে দেয়। ছেলেটার খেলাধুলোর প্রতি টান ছিল, তাই একদিন নরেশ তাকে গগনচাঁদের আখড়াতেও ভরতি করে দিল। কিছু ছেলে থাকে, যাদের শরীরের গঠনটাই চমৎকার। এ সব ছেলে অল্প কসরত করলেই শরীরের গুপ্ত এবং অপুষ্ট পেশিগুলি বেরিয়ে আসে। নিখুঁত শরীরের খুব অভাব দেশে। গগনচাঁদ তার ব্যায়ামের শিক্ষকতার জীবনে বলতে গেলে এই প্রথম মজবুত হাড়

আর সুষম কাঠামোর শরীর পেল। এক নজর দেখেই গগনচাঁদ বলে দিয়েছিল, যদি খাটো তো তুমি একদিন মিস্টার ইউনিভার্স হবে।

তা হতও বোধহয় ফলি। কিছুকাল গগনচাঁদ তাকে যোগব্যায়াম আর ফ্রি—হ্যান্ড করায়। খুব ভোরে উঠে সে নিজে কেডস আর হাফপ্যান্ট পরে ফলিকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ত। পুরো চত্বরটা ঘুরে ঘুরে গায়ের ঘাম ঝরাত। তারপর ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আসন করাত। বিকেলে ফ্রি—হ্যান্ড। ফলি খানিকটা তৈরি হয়ে উঠতেই তাকে অল্পস্বল্প যন্ত্রপাতি ধরিয়ে দিয়েছিল গগন। খুব কড়া নজর রাখত, যাতে ফলির শরীরে কোনও পেশি শক্ত না হয়ে যায়। যাতে বাড় না বন্ধ হয়। ফলি নিজেও খাটত। আশ্চর্যের বিষয় কসরত করা ছেলেদের মাথা মোটা হয়, প্রায়ই বুদ্ধি বা লেখাপড়ার দিকে খাঁকতি থাকে। মনটা হয় শরীরমুখী। ফলির সে রকম ছিল না। সে লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছিল। খরবুদ্ধি ছিল তার।

শোভারানি অবশ্য খুব সন্তুষ্ট ছিল না। প্রায়ই ওপরতলা থেকে তার গলা পাওয়া যেত, নরেশকে বকাবকি করছে, ওই গুন্ডাটার সঙ্গে থেকে ফলিটা গুন্ডা তৈরি হবে। কেন তুমি ওকে ওই গুন্ডার কাছে দিয়েছ?

ফলির শরীর সদ্য তৈরি হয়ে আসছিল। কত আর বয়স হবে তখন, বড়জোর ষোলো। বিশাল সুন্দর দেখনসই চেহারা নিয়ে পাড়ায় যখন ঘুরে বেড়াত তখন পাঁচজনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখত। আর সেইটেই ফলির কাল হল। সেই সময়ে সে পড়ল মেয়েছেলের পাল্লায়। প্রথমে গার্লস স্কুলের পথে একটি মেয়ে তাকে দেখে প্রেমে পড়ে। সেটার গর্দিশ কাটবার আগেই মুনশিবাড়ির বড় মেয়ে, যাকে স্বামী নেয় না, বয়সেও ফলির চেয়ে অন্তত চোদ্দো বছরের বড়, সেই মেয়েটা ফলিকে পটিয়ে নিল। সেখানেই শেষ নয়। এ বাড়ির ছোট বউ, সে বাড়ির ধুমসি মেয়ে, এ রকম ডজনখানেক মেয়েছেলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ফলি, মাত্র ষোলো—সতেরো বছর বয়সেই। সম্পর্কটা শারীরিক ছিল, কারণ অত মেয়েছেলের সঙ্গে মিশলে বস্তু থাকে না, প্রেম ইত্যাদি ভাবপ্রবণতার ব্যাপারকে ফক্কিকারি বলে মনে হয়।

গগনচাঁদ মেয়েছেলের ব্যাপারে কিছু বিরক্ত ছিল। সে নিজে মেয়েছেলের সঙ্গ পছন্দ করত না। মেয়েছেলে বড় নির্বোধ আর ঝগড়াটে জাত, এই ছিল গগনের ধারণা। এমন নয় যে তার কামবোধ বা মেয়েদের প্রতি লোভ নেই। সেসবই ঠিক আছে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে সারা দিন ধরে মেলামেশা এবং মেয়ে—শরীরের অতিরিক্ত সংস্পর্শ তার পছন্দ নয়। উপরন্তু তার কিছু নীতিবোধ এবং ধর্মভয়ও কাজ করে। প্রথমটায় যদিও ফলিকে এ নিয়ে কিছু বলেনি গগন। কিন্তু অবশেষে সেন্ট্রাল রোডের একটি কিশোরী মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার পর গগন আর থাকতে পারেনি। মেয়েটার দাদা আর এক প্রেমিক এ নিয়ে খুব তড়পায়। কিন্তু ফলিকে সরাসরি কিছু করার সাধ্য ছিল না। কারণ ফলির তখন একটা দল হয়েছে, উপরন্তু তার মাসি আর মেসোর টাকার জোর আছে। তাই সেই দাদা আর প্রেমিক দুজনে এসে একদিন গগনকে ধরল। দাদার ইচ্ছে, ফলি মেয়েটিকে বিয়ে করে ঝামেলা মিটিয়ে দিক। আর প্রেমিকটির ইচ্ছে, ফলিকে আড়ংধোলাই দেওয়া হোক বা খুন করা হোক বা পুলিশের হাতে দেওয়া হোক।

কিন্তু গগন ফলির অভিভাবক নয়। সে ফলিকে শাসন করার ক্ষমতাও রাখে না। সে মাত্র ব্যায়াম—শিক্ষক। তবু ফলিকে ডেকে গগন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ফলির গগনের প্রতি কিছু আনুগত্য ও ভালোবাসা ছিল তখনও। কারণ গগন বাস্তবিক ফলিকে ভালোবাসত। আর ভালোবাসা জিনিসটা কে না টের পায়! কিন্তু ফলিরও কিছু ছিল না। মেয়েছেলেরা তার জন্য পাগল হলে সে কী—ই বা করতে পারে। যত মেয়ে তার সংস্পর্শে আসে সবাইকে তো একার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মাত্র ষোলো—সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করাও কি ঠিক? এ সব কথা ফলি খোলসা করেই গগনকে বলেছিল।

গগন বুঝল এবং সে রাতারাতি ফলিকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

ফলি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যায়। তার ফলে শোভারানি গগনের শ্রাদ্ধ করল কিছুদিন। তার ধারণা, গগনই ফলিকে গুম করেছে। সেটা সত্যি না হলেও ফলির পালানোর পিছনে গগনের যে হাত ছিল তা মিথ্যে নয়। ফলি চলে যাওয়ায় পাড়া শান্ত হল। সেই কিশোরীটির পেটের বাচ্চা নষ্ট করে দিয়ে লোকলজ্জার

ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হল। যেসব মেয়ে বা মহিলা ফলির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তারা কিছু মুষড়ে পড়ল। তবে অনেক স্বামী এবং অভিভাবক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল।

ফলি কোথায় গিয়েছিল তা কেউ জানে না। তবে সে বেগম অর্থাৎ মায়ের আশ্রয়ে আর যায়নি। কেননা সেখানে গেলেও তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে লোকে বলে যে বেগমের সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখে চলত।

কিন্তু গগন আজ এই ভেবেই খুব বিস্ময়বোধ করছিল যে, ফলির মতো বিখ্যাত ছেলের মৃতদেহ দেখেও কেন কেউ শনাক্ত করতে পারল না। ঠিক কথা যে, ফলি বহু দিন হল এ এলাকা ছেড়ে গেছে, তবু তাকে না চিনবার কথা নয়। বিশেষত সুরেন খাঁড়ার তো নয়ই।

রেল লাইন ধরে হেঁটে এসে গগনচাঁদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠল। প্ল্যাটফর্মটা এখন প্রায় ফাঁকা। বুকিং অফিসের সামনে ফলওয়ালা ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে সুরেন সিগারেট টানছে। গগন কিছু অবাক হল। সুরেন খাঁড়া বড় একটা ধূমপান করে না।

তাকে দেখেই সুরেন এগিয়ে এসে বলল, কী হল?

গগন কিছু বিস্মিতভাবেই বলে, তুমি ফলিকে চিনতে পারোনি?

ফলি! কোন ফলি? কার কথা বলছ?

যে ছেলেটা মারা গেছে। আমাদের নরেশ মজুমদারের শালির ছেলে।

সুরেন একটু চুপ করে থেকে বলে, বেগমের সেই লুচ্চা ছেলেটা?

সে—ই। তোমার তো চেনা উচিত ছিল। তা ছাড়া তুমি যে বয়স বলেছিলে, ফলির বয়স তা নয়। কম করেও উনিশ—কুড়ি বা কিছু বেশিই হতে পারে।

সুরেন গম্ভীরভাবে বলল, চেনা কি সোজা? এই লম্বা চুল, মস্ত গোঁফ, মস্ত জুলপি, তা ছাড়া বহুকাল আগে দেখেছি, মনে ছিল না। তবে চেনা—চেনা ঠেকছিল বটে, তাই তো তোমাকে ধরে আনলাম। ও যে ফলি তা জানলে কী করে!

কালুর কাছ থেকে বের করলাম। বিড়ি, দেশলাইয়ের পয়সা দিতে হয়েছে।

সুরেন একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বলল, ব্যাটা বেঁচে আছে এখনও? থাপ্পড়টা তা হলে তেমন লাগেনি।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অত জোরে মারা তোমার উচিত হয়নি সুরেন। ওরা সব ম্যালনিউট্রিশনে ভোগে, জীবনশক্তি কম, বেমক্কা লাগলে হার্টফেল করতে পারে।

রাখো রাখো। বোতল বোতল বাংলা মদ সাফ করে গাঁজা টেনে রিকশা চালিয়ে বেঁচে আছে, আমার থাপ্পড়ে মরবে? এত সোজা নাকি! ওদের বেড়ালের জান।

গগনচাঁদ হেসে বলে, তুমি নিজের থাপ্পড়ের ওজনটা জানো না। সে যাক গে, কালু মরেনি। এখন দিব্যি উঠে বসেছে।

ভালো। মরলে ক্ষতি ছিল না।

গগন শুনে হাসল।

দুজনে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ফিরতে লাগল। কেউ কোনও কথা বলছে না।

চার

সন্তু একবার উঁকি মেরে তার বাবার ঘর দেখল। তার বাবা নানক চৌধুরী ইদানীং দাড়ি রাখছে। বড় পাগল লোক, কখন কী করে ঠিক নেই। এই হয়তো আধ হাত দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল হয়ে গেল। ফের একদিন গিয়ে দাড়ি কামিয়ে, মাথা ন্যাড়া করে চলে এল। তবু নানক চৌধুরীকে নিয়ে কেউ বড় একটা হাসাহাসি করে না। সবাই সমঝে চলে। একে মহা পণ্ডিত লোক, তার ওপর রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ব্রজ দত্ত নামে মারকুট্টা ছেলেকেও একবার লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল নানক চৌধুরী। কারণ ব্রজ দত্ত পাড়ার একটা

পাগলা ল্যাংড়া লোককে ধরে মেরেছিল। সেই পাগলা আর ল্যাংড়া রমণী বোস নাকি বলে বেড়িয়েছিল যে ব্রজ দত্ত আর সাঙাতরা একরকম নেশা করে, তা মদের নয় কিন্তু মদের চেয়েও ঢের বেশি সাংঘাতিক।

সন্তু পরদা সরিয়ে উঁকি মেরে সাবধানে বাবাকে দেখে নেয়। ঘরটা অন্ধকার, কেবল টেবিল ল্যাম্বের ছোট্ট একটু আলো জ্বলছে, আর চৌধুরীর বড়সড় অন্ধকার ছায়ার শরীরটা ঝুঁকে আছে বইয়ের ওপর। পাড়ায় বোমা ফাটলেও নানক চৌধুরী এ সময়ে টের পায় না।

কালু আজ সন্তুর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। কাল রাতে লাশ দেখে ফেরার পথে কালু বলেছিল, সন্তু, খুনটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু ভয় খাই যদি শালা খুনেটা জানতে পারে যে আমি দেখেছি, তো আমাকেও ফুটিয়ে দেবে। তাই তোকে সব বলব, কাল সিংহীদের বাগানে রাত আটটায় থাকবি।

সন্তু বলল, কাল কেন? আজই বল না!

কালু মাথা নেড়ে বলে, আজ নয়। আমি আগে ভেবে—টেবে ঠিক করি, মাথাটা ঠান্ডা হোক। আজ মাথাটা গোলমাল লাগছে।

সন্তু বলল, কত টাকা পাবি বললি?

পাঁচশো। তাতে ক'দিন ফুর্তি করা যাবে। রিকশা টানতে টানতে গতর ব্যথা। পাঁচশো টাকা পেলে পালবাজারে সবজির দোকানও দিতে পারি।

সন্তু ব্ল্যাকমেল ব্যাপারটা বোঝে। সে তাই পরামর্শ দিল, পাঁচশো কেন? তুই এক হাজারও চাইতে পারিস।

দেবে না।

দেবে। খুনের কেস হলে আরও বেশি চাওয়া যায়।

দূর!— কালু ঠোঁট উলটে বলে, বেশি লোভ করলেই বিপদ। আজকাল আকছার খুন হয়। ক'জনকে ধরছে পুলিশ! আমাদের আশেপাশে অনেক খুনি ঘুরে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোকের মতো। খুনের কেসকে লোকে ভয় পায় না।

সন্তু কাল রাতে ভালো ঘুমোয়নি। বলতে কী সে কাল থেকে একটু অন্য রকম বোধ করছে। খুন সে কখনও দেখেনি বটে, কিন্তু বইতে খুনের ঘটনা পড়ে আর সিনেমায় খুন দেখে সে ইদানীং খুনের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে। তার ওপর যদি সেই খুনের ঘটনার গোপন তথ্যের সঙ্গে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে তবে তো কথাই নেই।

রাত আটটা বাজতে চলল। দেয়াল—ঘড়িতে এখন পৌনে আটটা। এ সময়ে বাড়ির বাইরে বেরোনো খুবই বিপজ্জনক। নানক চৌধুরী, তার বাবা, যাকে সে আড়ালে নানকু বলে উল্লেখ করে, সে যদি পায় তো একতরফা হাত চালাবে। নানক চৌধুরী ব্যায়ামবীর বা গুন্ডা—ষণ্ডাকে ভয় পায় না, তা ছেলের গায়ে হাত তুলতে তার আটকাবে কেন?

তবু যেতেই হবে। সেই ভয়ংকর গুপ্ত খবরটা কালু তাকে দিয়ে যাবে আজ।

সন্তু রবারসোলের জুতো পরে আর একটা দুই সেল টর্চবাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সিংহীদের বাড়ির বাগান ভালো জায়গা নয়। পোড়োবাড়ির মতো পড়ে আছে। সেখানে প্রচুর সাপখোপের আড্ডা।

মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। আজ মাস্টারমশাইয়ের আসার দিন নয়। কাজেই সন্তু পড়ার ঘরের বাতিটা জ্বেলে একটা বই খুলে রেখে বেরিয়ে পড়ল। মা যদি আসে তো ভাববে ছেলে পড়তে পড়তে উঠে বাথরুমে বা ছাদে গেছে।

খুব তাড়াতাড়ি সন্তু রাস্তা পার হয়ে খানিক দূরে চলে আসে। সিংহীদের পাঁচিলটা কোথাও কোথাও ভাঙা। একটা ভাঙা জায়গা পেয়ে সন্তু অনায়াসে পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোয়। কালু এসে গেছে কি না দেখবার জন্য এধার—ওধার টর্চের আলো ফেলে। কোথাও কাউকে দেখা যায় না।

শিরিষ গাছের তলায় এসে সন্তু দাঁড়ায়। দু'বার মুখে আঙুল পুরে সিটি বাজিয়ে অপেক্ষা করে। না, কালু এখনও আসেনি। বরং খবর পেয়ে মশারা আসতে শুরু করে ঝাঁক বেঁধে। হাঁটু, হাত, ঘাড় সব চুকোনিতে

জ্বালা ধরে যায়। সন্তু দু'—চারটে চড়চাপড় মেরে বসে গা চুলকোয়। কালু এখনও আসছে না।

চার দিক ভয়ংকর নির্জন আর নিস্তব্ধ। ওই প্রকাণ্ড পুরনো আর ভাঙা বাড়িটায় সন্তু গুন্ডাকে ফাঁসি দিয়েছিল। এই বাড়িতেই মরেছে সিংহবুড়ো। তার ওপর গতকাল দেখা লাশটার কথাও মনে পড়ে তার। ছেলেটার বয়স বেশি নয়, একটা বেশ ভালো জামা ছিল গায়ে, আর একটা ভালো প্যান্ট। ছেলেটার চুল লম্বা ছিল, বড় জুলপি আর গোঁফ ছিল। ওইরকম বড় চুল আর জুলপি রাখার সাধ সন্তুর খুব হয়। কিন্তু তার বাবা নানক চৌধুরী সন্তুকে মাসান্তে এক বার পপুলার সেলুন ঘুরিয়ে আনে। সেখানকার চেনা নাপিত মাথা স্ক্রু—কাট করে দেয়।

সন্তুর যে ভয় করছিল তা নয়। তবে একটু ছমছমে ভাব। কী যেন একটা হবে। ঠিক বুঝতে পারছে না সন্তু, তবে মনে হচ্ছে অলক্ষে কে যেন একটা দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি আস্তে করে দো—বোমার পলতেয় ধরিয়ে দিচ্ছে। এখুনি জোর শব্দে একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ হবে।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে শব্দ ওঠে। সন্তু শিউরে উঠল। অবিকল নীলমাধবের সেই সড়ালে কুকুরটা যেমন জঙ্গল ভেঙে ধেয়ে আসত ঠিক তেমন শব্দ। সন্তুর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। আকাশে মেঘ চেপে আছে। চার দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্তু কেবল প্যান্টের পকেট থেকে তার ছোট্ট ছুরিটা বের করে হাতে ধরে রইল। যেদিক থেকে শব্দটা আসছে সেদিকে মুখ করে মাটিতে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল সে। হাত—পা ঠান্ডা মেরে আসছে, বুক কাঁপছে, তবু খুব ভয় সন্তু পায় না। পালানোর চিন্তাও সে করে না।

একটু বাদেই সে ছোট্ট কেরোসিনের ল্যাম্পের আলো দেখতে পায়। রিকশার বাতি হাতে কালু আসছে। কিন্তু আসছে ঠিক বলা যায় না। কালু বাতিটা হাতে করে ভয়ংকর টলতে টলতে এদিক—ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ মাতাল।

সন্তু চর্টট জ্বেলে বলে, কালু, এদিকে।

কোন শালা রে!—কালু চেঁচাল!

আমি সন্তু।

কোন সন্তু?—বলে খুব খারাপ একটা খিস্তি দিল কালু।

সন্তু এগিয়ে কালুর হাত ধরে বলে, আস্তে। চেঁচালে লোক জেনে যাবে।

কালু বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলে, ওঃ, সন্তু!

হ্যাঁ।

আয়।

বলে কালু তার হাত ধরে টানতে টানতে পোড়ো বাড়ির বারান্দায় গিয়ে ওঠে। তারপর সটান মেঝেতে পড়ে গিয়ে বলে, আজ বেদম খেয়েছি মাইরি! নেশায় চোখ ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সন্তু পাশে বসে বলে, কী বলবি বলেছিলি?

কী বলব?—কালু ধমকে ওঠে।

বলেছিলি বলবি। সেই খুনের ব্যাপারটা।

কোন খুন? ফলির?

হ্যাঁ।

কালু হা হা করে হেসে বলে, আমি পাঁচশো টাকা পেয়ে গেছি সন্তু, আর বলা যাবে না।

কে দিল?

যে খুনি সে।

লোকটা কে?

কালু ঝড়াক করে উঠে বসে বলে, তোকে বলব কেন?

বলবি না?

না। পাঁচশো টাকা কি ইয়ারকি মারতে নিয়েছি?

সন্তু খুব হতাশ হয়ে বলল, তুই বলেছিলি বলবি।

কালু মাথা নেড়ে বলে, পাঁচশো নগদ টাকা পেয়ে আজ অ্যাতো মাল খেয়েছি। আরও অনেক আছে, পালবাজারে সবজির দোকান দেব, নয়তো লন্ড্রি খুলব। দেখবি?

বলে কালু তার জামার পকেট থেকে একতাড়া দশ টাকার নোট বের করে দেখায়। বলে, গোন তো, কত আছে। আমি বেহেড আছি এখন।

সন্তু গুনল। বাস্তবিক এখনও চারশো পঁচাশি টাকা আছে।

বলল, খুনি তোকে কিছু বলল না?

না! কী বলবে! বলল, কাউকে বলবি না, তা হলে তোকেও শেষ করে ফেলব।

পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল?

কালু মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলে, দূর, পাঁচশো টাকা আর কী! এ রকম আরও কত ঝেঁকে নেব। সবে তো শুরু।

সন্তু উত্তেজিত হয়ে বলে, ব্ল্যাকমেল!

কালু চোখ ছোট করে বলে, আমি শালা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, আর তোমরা সব ভদ্রলোক, না?

ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার নয় রে। ব্ল্যাকমেল।

আমি ইংরিজি জানি না ভেবেছিস! রামগঙ্গা স্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম ভুলে যাস না।

সন্তু এতক্ষণে হাসল। বলল, ব্ল্যাকমেল হল...

চুপ শালা। ফের কথা বলেছিস কি...

বলে কালু লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

সন্তু কালুর হঠাৎ রাগ কেন বুঝতে না পেরে এক পা পেছিয়ে তেজি ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে বলল, এর আগে খিস্তি করেছিস, কিছু বলিনি। ফের গরম খাবি তো মুশকিল হবে।

কালু তার বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলল, আহা চাঁদু! গরম কে খাচ্ছে শুনি?

বলে ফের একটা নোংরা নর্দমার খিস্তি দেয়।

সন্তু হাত—পা নিশপিশ করে। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে ছুরিটা টেনে বের করে আনে সে। বেশি বড় না হলেও, বোতাম টিপলে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি একটা ধারালো ফলা বেরিয়ে আসে। সন্তুর এখনও পর্যন্ত এটা কোনও কাজে লাগেনি।

ফলাটা কেরোসিনের বাতিতেও লক—লক করে উঠল।

সন্তু বলল, দেব শালা ভরে!

দিবি?—কালু উঠে দাঁড়িয়ে পেটের ওপর থেকে জামাটা তুলে বলল, দে না!

বলে জিব ভেঙিয়ে দু'হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে থাকে।

সন্তুর মাথাটা গোলমেলে লাগছিল। গতবার সে একটা গুন্ডা বেড়ালকে ফাঁসি দিয়েছিল। শরীরের ভিতরটা আনচান করে ওঠে। সে একটা ঝটকায় কালুকে মাটিতে ফেলে বুকের উপর উঠে বসে। তারপর সম্পূর্ণ অজান্তে ছুরিটা তোলে উঁচুতে। তারপর বিদ্যুদবেগে হাতটা নেমে আসতে থাকে।

কালু কী কৌশল করল কে জানে! লহমায় সে শরীরের একটা মোচড় দিয়ে পাশ ফিরল। তারপর দুষ্টু ঘোড়া যেমন ঝাঁকি মেরে সওয়ারি ফেলে দেয় তেমনি সন্তুকে ঝেড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপর। পাঁচ ইঞ্চি ফলাটা শানে লেগে ঠকাৎ করে পড়ে গেল।

কালু একটু দূরে গিয়ে ফের পড়ল। তারপর সব ভুলে ওয়াক তুলে বমি করল বারান্দা থেকে গলা বার করে।

বিস্মিত সন্তু বসে রইল হাঁ করে। সর্বনাশ! আর—একটু হলেই সে কালুকে খুন করত! ভেবেই ভয়ংকর ভয় হয় সন্তুর।

কালু বমি করে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসল বারান্দার থামে হেলান দিয়ে। মাথা লটপট করছে। অনেকক্ষণ দম নিয়ে পরে বলল, ছুরি চমকেছিস শালা, তুই মরবি।

সন্তু আস্তে করে বলে, তুই খিস্তি দিলি কেন?

কালুর কেরোসিনের বাতিটা এখনও মেঝের ওপর জ্বলছে। সেই আলোতে দেখা গেল, কালু হাসছে। একটা হাই তুলে বলে, ও সব আমার মুখ থেকে আপনা—আপনি বেরিয়ে যায়। কিন্তু গাল দিলে কি গায়ে কারও ফোসকা পড়ে? আমাকেও তো কত লোক রোজ দু'বেলা গাল দেয়। তা বলে গগনদার মতো খুন করতে হবে নাকি।

সন্তু বিদ্যুৎ স্পর্শে চমকে উঠল। গগনদা!

তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তোকে টাকাটা কে দিয়েছে কালু?

বলব কেন?

আমি জানি। গগনদা।

দূর বে!

গগনদা খুন করেছে?

কালু মুখটা বেঁকিয়ে বলে, কোন শালা বলেছে?

তুই তো বললি।

কখন? নাঃ, আমি বলিনি।

সন্তু হেসে বলে, দাঁড়া, সবাইকে বলে দেব।

কী বলবি?

গগনদা তোকে টাকা দিয়েছে। গগনদা খুনি।

কালু প্রকাণ্ড একটা ঢেকুর তুলে বুকটা চেপে ধরে বলে, টাকা! হ্যাঁ, টাকা গগনদা দিয়েছে। তবে গগনদা খুন করেনি!

সন্তু হেসে টর্চটা নিয়ে পিছু ফিরল। ধীরে—সুস্থে পাঁচিলটা ডিঙিয়ে এল সে।

পাঁচ

অন্ধকার জিমনাশিয়ামে গগনচাঁদ বসে আছে। একা। অথর্বের মতো।

কিছুক্ষণ সে মেঘচাপা আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশের রং রক্তবর্ণ। কলকাতার আকাশে মেঘ থাকলে এ রকমই দেখায় রাত্রিবেলা।

এখন রাত অনেক। বোধহয় এগারোটা। কাল রাতে বৃষ্টির পর গ্যারাজ—ঘরটা জলে থইথই করছে। অন্তত ছয়—সাত ইঞ্চি জলে ডুবে আছে মেঝে। জলের ওপর ঘুরঘুরে পোকা ঘুরছে। কেঁচো আর শামুক বাইছে দেয়ালে। ও রকম ঘরে থাকতে আজ ইচ্ছে করছে না। মনটাও ভালো নেই।

অন্ধকার জিমনাশিয়ামের চারধারে এক বার তাকাল গগন। একটা মস্ত টিনের ঘর, চারধারে বেড়া। হাতের টর্চটা এক বার জ্বালল। সিলিং থেকে রিং ঝুলছে, অদূরে প্যারালাল বার, টানবার স্প্রিং, রোমান রিং, স্ল্যান্টিংবোর্ড কত কী! একজন দারোয়ান পাহারা দেয় দামি যন্ত্রপাতি। একটু আগে দারোয়ান এসে ঘুরে দেখে গেছে। মাস্টারজি মাঝে মাঝে এরকম রাতে এসে বসে থাকে, দারোয়ান তা জানে। তবে গগনকে দেখে অবাক হয়নি। জিমনাশিয়ামের ছোট্ট উঠোনটার শেষে দারোয়ানের খুপরিতে একটু আগেও আলো জ্বলছিল। এখন সব অন্ধকার হয়ে গেছে। গগনের কাছে চাবি আছে, যাওয়ার সময়ে বন্ধ করে যাবে। কিন্তু ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না গগনের। পচা জল, নর্দমার গন্ধ, পোকামাকড়। তবু থাকতে হয়। গ্যারাজ—ঘরটার ভাড়া মোটে ত্রিশ টাকা, ইলেকট্রিকের জন্য আলাদা দিতে হয় না, তবে একটা মাত্র পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু নেই।

গগনের রোজগার এমন কিছু বেশি নয় যে লাটসাহেবি করে। এ অঞ্চলে বাড়িভাড়া এখন আগুন। একটা মাত্র ঘর ভাড়া করতে কত বার চেষ্টা করেছে গগন, একশোর নীচে কেউ কথা বলে না। অবশ্য এ কথাও ঠিক, গগন একটু স্থিতু মানুষ, বেশি নড়াচড়া পছন্দ করে না। গ্যারাজ—ঘরটায় বেশ আছে সে। শোভারানি বকাবকি করে, ভাড়াটেদের ক্যাচক্যাচ আছে, জলের অসুবিধে আছে, তবু খুব খারাপ লাগে না। কেবল বর্ষাকালটা বড্ড জ্বালায় এসে। তবু বর্ষা—বৃষ্টি হোক, না হলে মুরাগাছার জমি বুক ফাটিয়ে ফসল বের করে দেবে না। মানুষের এই এক বিপদ, বর্ষা বৃষ্টি গরম শীত সবই তাকে নিতে হয়, সবকিছুই তার কোনও—না—কোনওভাবে প্রয়োজন। কাউকেই ফেলা যায় না। এই যে অঞ্চলে এত মশা, গগন জানে এবং বিশ্বাসও করে যে, এইসব মশার উৎপত্তি এমনি এমনি হয়নি। হয়তো এদেরও প্রকৃতির প্রয়োজন আছে। এই যে সাপখোপ বোলতা—বিছে, বাঘ—ভালুক—ভালো করে দেখলে বুঝি দেখা যাবে যে এদের কেউ ফেলনা নয়। সকলেই যে যার মতো এই জগতের কাজে লাগে।

গগন উঠে জিমনাশিয়ামের ভিতরে এল। মস্ত মস্ত গোটাকয় আয়না টাঙানো দেয়ালে। অন্ধকারেও সেগুলো একটু চকচক করে ওঠে। গগন টর্চ জ্বেলে আয়না দেখে। গত চার—পাঁচ বছরে এ সব আয়না তার কত চেলার প্রতিবিম্ব দেখিয়েছে। কোথায় চলে গেছে সব! আয়না কারও প্রতিচ্ছবি ধরে রাখে না। এই পৃথিবীর মতোই তা নির্মম এবং নিরপেক্ষ। টর্চ জ্বেলে গগন চারিদিক দেখে। ওই রিং ধরে একদা ঝুল খেয়ে গ্রেট সার্কেল তৈরি করেছে ফলি। বুকে মস্ত চাঁই পাথর তুলেছে। বিম ব্যালান্স আর প্যারালাল বার—এ চমৎকার কাজ করত ছেলেটা। শরীর তৈরি করে সাজানো শরীরের প্রদর্শনী গগনের তেমন ভালো লাগে না। বরং সে চায় ভালো জিমন্যাস্ট তৈরি করতে, কী মুষ্টিযোদ্ধা, কী জুডো খেলোয়াড়। সেসব দিকে ফলি ছিল অসাধারণ। যেমন শরীর সাজানো ছিল থরে—বিথরে মাংসপেশিতে, তেমনি জিমন্যাস্টিকেও সে ছিল পাকা। ফলিকে কিছুকাল জুডো আর বক্সিং শিখিয়েছিল গগন। টপাটপ শিখে ফেলত। সেই ফলি কোথায় চলে গেল!

ভূতের মতো একা একা গগন জিমনাশিয়ামে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে এধার—ওধার দেখে। মেঝেয় বারবেলের চাকা পড়ে আছে কয়েকটা। পায়ের ডগা দিয়ে একটা চাকা ঠং করে উলটে ফেলল সে। এক হাতে রিং ধরে একটু ঝুল খেল। প্যারালাল বার—এ উঠে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভালো লাগছে না। মনটা আজ ভালো নেই! ফলিকে কে মারল? কেন ফলি ও সব নেশার ব্যবসা করতে গেল?

আজ সন্ধেবেলা ফিরে এসে গ্যারাজ—ঘরে বসে সে অনেকক্ষণ উৎকর্ণ থেকেছে। না, শোভারানিদের ঘর থেকে তেমন কোনও সন্দেহজনক শব্দ হয়নি! রাত ন'টায় নরেশও ফিরে এল। স্বাভাবিক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল ওপর থেকে। তার মানে ওরা এখনও ফলির মৃত্যুসংবাদ পায়নি। বড় আশ্চর্য কথা! ফলিকে এখানে সবাই একসময়ে চিনত। তবু তার মৃতদেহ কেন কেউ শনাক্ত করতে পারেনি? কেবলমাত্র পুলিশ আর কালু ছাড়া! তাও পুলিশ বলেছে, ফলি অ্যাবসকন্ডার। ফলি ফেরারই বা ছিল কেন?

মাথাটা বড্ড গরম হয়ে ওঠে।

গগনচাঁদের বুদ্ধি খুব তৎপর নয়! খুব দ্রুত ভাবনা—চিন্তা করা তার আসে না। সবসময়ে সে ধীরে চিন্তা করে। কিন্তু যা সে ভাবে তা সবসময়ে একটা নির্দিষ্ট যুক্তি—তর্ক এবং গ্রহণ—বর্জনের পথ ধরে চলে। হুটহাট কিছু ভাবা তার আসে না। গগন বহুকাল ধরে নিরামিষ খায়। সম্ভবত নিরামিষ খেলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কিছু ধীর হয়ে যায়। নিরামিষ খাওয়ার পিছনে আবার গগনের একটা ভাবপ্রবণতাও আছে। ছটফটে জ্যান্ত জীব, জালে বদ্ধ বাঁচার আকুলতা নিয়ে মরে যাওয়া মাছ কিংবা ডিমের মধ্যে অসহায় ভ্রূণ, এদের দেখে তার বড় মায়া হয়। আরও একটা কারণ হল, আমিষ খেলে মানুষের শরীরের স্বয়ং—উৎপন্ন বিষ টকসিন খুব বেড়ে যায়। টকসিন বাড়লে শরীরে কোনও রোগ হলে তা বড় জখম করে দিয়ে যায় শরীরকে। কেউ কেউ গগনকে বলেছে, নিরামিষভোজীরা খুব ধীরগতিসম্পন্ন, পেটমোটা। গগন তার উত্তরে তৃণভোজী হরিণ বা ঘোড়ার উল্লেখ করেছে, যারা ভীষণ জোরে ছোটে। তাদের পেটও মোটা নয়। নিরামিষ খেয়ে গগনের তাগদ কারও চেয়ে কম নয়। গতিবেগ এখনও বিদ্যুতের মতো। জুডো বা বক্সিং শিখতে আসে যারা

তারা জানে গগন কত বড় শিক্ষক। তাও গগন খায় কী? প্রায় দিনই আধ সেরটাক ডাল আর সবজি—সেদ্ধ, কিছু কাঁচা সবজি, দু'—চারটে পেয়ারা বা সময়কালে কমলালেবু বা আম, আধ সের দুধ, সয়াবিন, কয়েকদানা ছোলা—বাদাম। তাও বড় বেশি নয়। শরীর আন্দাজে গগনের খাওয়া খুবই কম। খাওয়া—দাওয়া নিয়ে কোনও দিনই সে বেশি মাথা ঘামায় না। এইসব মিলিয়ে গগন। ধীরবুদ্ধি, শান্ত, অনুত্তেজিত, কোনও নেশাই তার নেই।

মেয়েমানুষের দোষ নেই, তবে আকর্ষণ থাকতে পারে।

যেমন বেগম। ফলি যখন গগনের কাছে কসরত করা শিখত, তখন বহুবার বেগম এসেছে জিমন্যাশিয়ামে। সে বেড়াতে আসত বোনের বাড়ি, সেই তক্কে জিমন্যাশিয়ামে ছেলেকে দেখে যেত। ব্যায়ামাগারটাই ছিল বলতে গেলে ফলির বাসস্থান।

গগনের আজও সন্দেহ হয়, শুধু ছেলেকে দেখতেই আসত কি না বেগম। বরং ছেলেকে দেখার চেয়ে ঢের বেশি চেয়ে দেখত গগনকে। তার তাকানো ছিল কী ভয়ংকর মাদকতায় মাখানো। বড় বড় চোখ, পটে—আঁকা চেহারা, গায়ের রং সত্যিকারের রাঙা। রোগা নয়, আবার কোথাও বাড়তি মাংস নেই। কী চমৎকার ফিগার! প্রথমটায় গগনের সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু গগন বিভিন্ন ব্যায়ামকারীর কাছে ঘুরে ঘুরে নানা জিনিস শেখাচ্ছে, স্যান্ডো গেঞ্জি আর চাপা প্যান্ট পরা তার বিশাল দেহখানা নানা বিভঙ্গে বেঁকেছে, দুলছে বা ওজন তুলবার সময় থামের মতো দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে, এ সবই বেগম অপলক চোখে দেখেছে। বেগমের বয়স বোঝে কার সাধ্য! তাকে ফলির মা বলে মনে হত না, বরং বছর দু'—তিনেকের বড় বোন বলে মনে হত। ফলি একদিন বলেছিল, মা চমৎকার সব ব্যায়াম জানে, জানেন গগনদা! এখনও রোজ আসন করে।

বেগম প্রথমে ভাববাচ্যে কথা বলত। সরাসরি নয়, অথচ যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বলার মতো করে বলত, কত দিন এখানে চাকরি করা হচ্ছে? কিংবা জিজ্ঞেস করত, জামাইবাবুর সঙ্গে কারও বুঝি খুব খটাখটি চলছে আজকাল। পরের দিকে বেগম সরাসরি কথা বলত। যেমন একদিন বলল, আপনার বয়স কত বলুন তো?

বিনীতভাবে গগন জবাব দিল, উনতিরিশ।

একদম বোঝা যায় না। বিয়ে করেছেন?

না।

কেন?

গগন হেসে বলে, খাওয়াব কী? আমারই পেট চলে না।

অত যার গুণ তার খাওয়ার অভাব!

তাই তো দেখছি।

আপনি ম্যাসাজ করতে জানেন?

জানি।

তা হলে আপনাকে কাজ দিতে পারি, করবেন?

গগন উদাসভাবে বলল, করতে পারি।

একটা অ্যাথলেটিক ক্লাব আছে, ফুটবল ক্লাব, খেলোয়াড়দের ম্যাসাজ করতে হবে। ওরা ভালো মাইনে দেয়।

গগন তখন বলল, আমার সময় কোথায়?

খুব হেসে বেগম বলল, তা হলে করবেন বললেন কেন? ওই ক্লাবে গেলে সব ছেড়ে যেতে হবে। হোলটাইম জব। সময়ের অভাব হবে না। আর যদি ছুটকো—ছাটকা ম্যাসাজ করতে চান, পক্ষাঘাতের রুগি—টুগি, তাও দিতে পারি।

গগন বলল, ভেবে দেখব!

আসলে গগন ও সব করতে চায় না, সে চায় ছাত্র তৈরি করতে। ভালো শরীরবিদ, জিমন্যাস্ট, বক্সার, জুডো—বিশেষজ্ঞ। সে খেলোয়াড়দের পা বা রুগির গা ম্যাসাজ করতে যাবে কেন?

কিন্তু ওই যে সে ম্যাসাজ জানে ওটাই তার কাল হয়েছিল। কারণ একবার বেগম নাকি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকায়। খবর এল, ম্যাসাজ দরকার। প্রথমে গগন যায়নি। সে কিছু আন্দাজ করেছিল। কিন্তু বেগম ছাড়বে কেন? খবরের পর খবর পাঠাত। বিরক্ত হয়ে একদিন বাপুজি কলোনির বাড়িতে যেতে হয়েছিল গগনকে।

হেসে বলেছিল, খুব ব্যথা বুঝলেন!

গগন পা—খানা নেড়ে—চেড়ে বলল, কোথায়?

বেগম বলল, সব ব্যথা কী শরীরে? মন বলে কিছু নেই?

তারপর কী হয়েছিল তা আর গগন মনে করতে চায় না। তবে এটুকু বলা যায়, গগনের মেয়েমানুষে আকর্ষণ আছে, লোভ না থাক। বেগমের বেলা সেটুকু বোঝা গিয়েছিল। বলতে গেলে, তার জীবনের প্রথম মেয়েমানুষ ওই বেগম। কিছুকাল খুব ভালোবেসেছিল বেগম তাকে। তারপর যা হয়! ও সব মেয়েদের একজনকে নিয়ে থাকলে চলে না! গগন তো তার ব্যবসার কাজে আসত না। বেগম তাই অন্য সব মানুষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর বেগমের দেহের সুন্দর ও ভয়ংকর স্মৃতি নিয়ে গগন সরে এল একদিন।

আয়নায় কোনও প্রতিচ্ছবি থাকে না। পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে, সব মুছে যায়। অবিকল আয়নার মতো।

ফলির কথাই ভাবছিল গগন। ফলি বেঁচে নেই। তার খুব প্রিয় ছাত্র ছিল ফলি। মানুষ হিসেবে ফলি হয়তো ভালো ছিল না, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ছাত্র হিসেবে ফলি ছিল উৎকৃষ্ট। ও রকম চেলা গগন আর পায়নি।

অন্ধকার জিমন্যাশিয়ামে প্যারালাল বার—এর ওপর বসে গগনের দু'চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল নেমে এল। বিড়বিড় করে কী একটু বলল গগন। বোধহয় বলল, দূর শালা! জীবনটাই অদ্ভুত!

অনেক রাতে গগন যখন গ্যারাজ ঘরে ফিরল তখন সে খুব অন্যমনস্ক ছিল। নইলে সে লক্ষ করত, এত রাতেও পাড়ার রাস্তায় কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করছে। আশপাশের বাড়িগুলোয় আলোও জ্বলছে।

গগন যখন তালা খুলছে তখন একবার টের পেল এ বাড়ি সে বাড়ির জানালায় কারা উঁকি—ঝুঁকি দিয়ে দেখল তাকে। নরেশ মজুমদারের ঘরে স্টিক—লাইট জ্বলছে। এত রাতে ও রকম হওয়ার কথা নয়। রাত প্রায় বারোটা বাজে। এ সময় সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোয়। কেবল অদূরে একটা বাড়ির দোতলায় নানক চৌধুরীর ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে।

গগন ঘরে এসে প্রায় কিছুই খেল না। ঠান্ডা দুধটা চুমুক দিয়ে শুয়ে রইল। বাতি নেভাল না। ঘরে জল খেলছে, কোন পোকা—মাকড় রাতবিরেতে বিছানায় উঠে আসে। বর্ষাকালে প্রায় সময়েই সে বাতি জ্বেলে ঘুমোয়। নরেশ মজুমদারের মিটার উঠুক, তার কী?

ঘুম না এলে গগনচাঁদ জেগে থাকে। চোখ বুজে মটকা মারা তার স্বভাব নয়। আজও ঘুম এল না, তাই চেয়ে থেকে কত কথা ভাবছিল গগন। ভিতর দিকে গ্যারেজ—ঘরের ছাদের সঙ্গে লাগানো, উঁচুতে একটা চার ফুট দরজা আছে। ওই দরজাটা সে আসবার পর থেকে বরাবর বন্ধ দেখেছে। সম্ভবত কোনওদিন ওই দরজা দিয়ে সহজে গ্যারাজে ঢোকা যাবে বলে ওটা করা হয়েছিল। বৃষ্টি—বাদলার দিনে ঘর থেকে নরেশ তার বউ নিয়ে সরাসরি গ্যারাজে আসতে পারত। এখন গ্যারাজে গাড়ি নেই, গগন আছে। তাই দরজাটা কড়াক্কড় করে বন্ধ। প্রায় সময়েই গগন দরজাটা দেখে। হয়তো কখনও ওই দরজা থেকে নেমে আসবার কাঠের সিঁড়ি ছিল। আজ তা নেই। গুপ্ত সুড়ঙ্গের মতো দরজাটাই আছে কেবল। রহস্যময়।

আশ্চর্য এই, আজ দরজাটার দিকে তাকিয়ে গগন দরজাটার কথাই ভাবছিল। ঠিক এই সময়ে হঠাৎ খুব পুরনো একটা ছিটকিনি খোলার কষ্টকর শব্দ হল। তারপরই কে যেন হুড়কো খুলছে বলে মনে হল। সিলিং—এর দরজাটা বার দুই কেঁপে উঠল।

ভয়ংকর চমকে গেল গগনচাঁদ। বহুকাল এমন চমকায়নি। সে শোয়া অবস্থা থেকে ঝট করে উঠে বসল। প্রবল বিস্ময়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

তাকে আরও ভয়ংকর চমকে দিয়ে দরজার পাল্লাটা আস্তে খুলে গেল। আর চার ফুট সেই দরজার ফ্রেমে দেখা গেল, শোভারানি একটা পাঁচ ব্যাটারির মস্ত টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

গগন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবাক চোখে চেয়ে ছিল। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। চোখ বড়।

শোভারানি সামান্য হাঁফাচ্ছিল। বেগমের বোন বলে ওকে একদম মনে হয় না। শোভা কালো মোটা, বেঁটে। মুখশ্রী হয়তো কোনও দিন কমনীয় ছিল, এখন পুরু চর্বিতে সব গোল হয়ে গেছে।

শোভারানি ঝুঁকে বলল, এই এলেন?

হুঁ।—বলে বটে গগন, কিন্তু সে ধাতস্থ হয়নি।

এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

বাইরে।

ঘোরের মধ্যে উত্তর দেয় গগন। ওরা কি তবে ফলির খবরটা পেয়েছে! তাই হবে। নইলে এত রাতে গুপ্ত দরজা দিয়ে শোভা আসত না। শোভারানির মুখে অবশ্য কোনও শোকের চিহ্ন নেই। বরং একটা উদবেগ ও আকুলতার ভাব আছে।

শোভা বলল, লাইনের ধারে যে মারা গেছে কাল সে কে জানেন?

জানি।—একটু ইতস্তত করে গগন বলে।

সবাই বলছে ফলি। সত্যি নাকি?

লুকিয়ে লাভ নেই। বার্তা পৌঁছে গেছে। গগন তাই মাথা নাড়ল। তারপর কপালে হাত দিল একটু।

ফলিকে কে দেখেছে?

গগন বলল, পুলিশ দেখেছে। আর রিকশাওলা কালু।

ঠিক দেখেছে?—তীব্র চোখে চেয়ে শোভা জিজ্ঞেস করে।

তাই তো বলছে।—গগন ফের কপালে হাত দেয়।

শোভারানি ঠোঁট উলটে বলল, আপদ গেছে।

বলেই ঘরে আলো থাকা সত্ত্বেও টর্চটা জ্বেলে আলো ফেলল মেঝেয়। বলল, ঘরে জল ঢোকে দেখছি।

বর্ষাকালে ঢোকে রোজ।—গগন যান্ত্রিক উত্তর দেয়।

বলেননি তো কখনও!

গগন আস্তে করে বলে, বলার কী! সবাই জানে!

শোভা মাথা নেড়ে বলে, আমি জানতাম না।

গগন উত্তর দেয় না। শোভার কাছে এত ভদ্র ব্যবহার পেয়ে সে ভীষণ ভালোমানুষ হয়ে যাচ্ছিল।

শোভা টর্চটা নিভিয়ে বলল, শুনুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

গগন উঠে বসে ঊর্ধ্বমুখে যেন কোনও স্বর্গীয় দেবীর কথা শুনছে, এমনভাবে উৎকর্ণ হয়ে ভক্তিভরে বসে থাকে। বলে, বলুন।

কালু একটা গুজব ছড়িয়েছে।

কী?

ফলিকে যে খুন করেছে তাকে নাকি ও দেখেছে।

গগন মাথা নেড়ে বলল, জানি।

কী জানেন?

কালু ও কথা আমাকেও বলেছে।

কে খুন করেছে তা বলেনি?— শোভা ঝুঁকে খুব আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করে।

গগন মাথা নাড়ে, না। ও পাঁচশো টাকা দাবি করবে খুনির কাছে। বলবে না।

শোভা হেসে বলে, সেই পাঁচশো টাকা কালু পেয়ে গেছে।

শোভারানির হাসি এবং শোকের অভাব দেখে গগন খুব অবাক হয়। ফলির মৃত্যুতে কি শোভার কিছু যায়—আসেনি? বোনপোটা মরে গেল, তবু ও কীরকম যেন স্বাভাবিক!

গগন ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, কার কাছে পেয়েছে?

শোভা অদ্ভুত একটু হেসে বলল, ও বলছে, টাকা নাকি ওকে আপনি দিয়েছেন!

আমি! আমি টাকা দিয়েছি!

খুব আস্তে গগনের বুদ্ধি কাজ করে। প্রথমটায় সে বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা কী। ভেবে ভেবে জোড়া দিতে লাগল। তাতে সময় গেল খানিক।

শোভা বলল, একটু আগে কালুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

গগন তেমনি দেবী—দর্শনের মতো ঊর্ধ্বমুখ হয়ে নীরব থাকে। বুঝতে সময় লাগে তার। তারপর হঠাৎ বলে, আমি ওকে টাকা দিইনি।

শোভা ঠোঁট ওলটাল। বলল, ও তো বলছে!

আর কী বলছে?

শোভা হেসে বলে, খুনির নামটাও বলেছে।

কে?

বলেই গগন বুঝতে পারে তার গলার স্বর তার নিজের ফাঁকা মাথার মধ্যে একটা প্রতিধ্বনি তুলল, কে!

শোভা তীব্র চোখে চেয়ে থেকে বলল, ও আপনার নাম বলছে।

আমি! আমার নাম!—বলে গগন মাথায় হাত দিয়ে বলে, না তো! ও মিথ্যে কথা বলছে।

শোভা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বলল, কালু মদ—গাঁজা খায়। ওর কথা কে বিশ্বাস করে, আহাম্মক ছাড়া! তবে ফলিকে কেউ খুন করে থাকলেও অন্যায় করেনি। আমি তো সেজন্য জোড়াপাঁঠা মানসিক করে রেখেছি।

গগন উত্তর দিতে পারে না। মাথাটা ফাঁকা লাগছে। সে শুধু শোভার দিকে চেয়ে থাকে।

শোভা বলে, শুনুন। যদি ফলিকে কেউ মেরে থাকে তো আমার দুঃখের কিছু নেই। আমার স্বামী কাঁদছেন। তাঁর বোধহয় কাঁদবারই কথা। তিনি ঠিক করেছিলেন, আমাদের বিষয়—সম্পত্তি সব ফলির নামে লিখে দেবেন। উইল নাকি করেও ছিলেন। আমি সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারিনি। ফলির জন্ম ভালো নয়।

গগন উত্তর দিতে পারছিল না। তবু মাথা নাড়ল।

শোভা বলল, আপনি বা যে—কেউ ওকে খুন করে থাকলে ভালো কাজই হয়েছে। পেস্তা নামে যে বাচ্চা মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল, সে এখনও আমার কাছে আসে। তার বোধহয় আর বিয়ে হবে না। ফলির গুণকীর্তির কথা কে না জানে! তবু আমার স্বামীকে কিছু বোঝানো যাবে না। তিনি সম্ভবত পুলিশ ডেকে আজ রাতেই আপনাকে গ্রেফতার করাবেন।

আমাকে!

শোভা সামান্য উষ্মার সঙ্গে বলে, ও রকম ভ্যাবলার মতো করছেন কেন? এ সময়ে বুদ্ধি ঠিক না—রাখলে ঝামেলায় পড়বেন।

গগন হঠাৎ বলল, কী করব?

শোভা বলে, কী আর করবেন, পালাবেন!

গগন দিশাহারার মতো বলল, পালাব কেন?

সেটা বুঝতে আপনার সময় লাগবে। শরীরটাই বড়, বুদ্ধি ভীষণ কম। পুলিশে ধরলে আটক রাখবে, মামলা হবে, সে অনেক ব্যাপার। বরং পালিয়ে গেলে ভাববার সময় পাবেন।

কোথায় পালাব?

সেটা যেতে যেতে ভাববেন। এখন খুব বেশি সময় নেই। এইখান দিয়ে উঠে আসতে পারবেন?

গগন হাসল এবার । সে শরীরের কসরতে ওস্তাদ লোক। গ্যারাজ—ঘরের ছাদের দরজায় ওঠা তার কাছে কোনও ব্যাপার নয়। মাথা নেড়ে বলল, খুব।

তা হলে বাতিটা নিবিয়ে উঠে আসুন। এখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ভালো রাস্তা আছে। কেউ দেখবে না। দেয়াল টপকে ওদিকে এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের কারখানার মাঠ দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠবেন। দেরি করবেন না। উঠে আসুন।

গগন বাতি নিভিয়ে দেয়। শোভা টর্চ জ্বেলে রাখে। গগন পোশাক পরে নেয়। দুটো—একটা টুকিটাকি দরকারি জিনিস ভরে নেয় ঝোলা ব্যাগে। তারপর হাতের ভর দিয়ে দরজায় উঠে পড়ে।

শোভা টর্চ জ্বেলে আগে পথ দেখিয়ে দেয়। মেথরের আসবার রাস্তায় এলে শোভারানি তাকে বলে, এই রাস্তা দিয়ে চলে যান। টাকা লাগবে?

গগন মাথা নাড়ে, না।

শোভা হেসে বলে, লাগবে। সদ্য সদ্য পাঁচশো টাকা বেরিয়ে গেছে, এখন তো হাত খালি!

গগন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে তাকায়।

আর শোভারানি সেই মুহূর্তে তাকে প্রথম স্পর্শ করে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার প্যান্টের পকেটে বোধহয় কিছু টাকাই গুঁজে দেয়। খুব নরম স্বরে বলে, বেগম খারাপ। আমি খারাপ নই। আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি খুন করেছেন। এখন যান। গ্যারাজ—ঘরের ভিতরটা আমি উঁচু করে দেব। সময়মতো ফিরে এসে দেখবেন ঘরটা অনেক ভালো হয়ে গেছে। আর জিনিসপত্র যা রইল তা আমি দেখে রাখব। এখন আসুন তো!

গগন মাথা নাড়ে। তারপর আস্তে করে গিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের পাঁচিল টপকায়। মাঠ পেরোয়।

কয়েকটা টর্চবাতি ইতস্তত কাকে যেন খুঁজছে। গগন মাথা নিচু করে এগোয়। একটা বড় গাড়ি এসে থামল কাছেই কোথাও। গগন বাদবাকি পথটুকু দৌড়ে পার হয়ে যায়। ফের পাঁচিল টপকে বড়রাস্তায় পড়ে।

রাতের ফাঁকা রাস্তা। কোথাও কোনও যানবাহন নেই। কেবল একটা ট্যাক্সি সওয়ারি খালাস করে ধীরে ফিরে যাচ্ছে। গগন হাত তুলে সেটাকে থামায়। সচরাচর সে ট্যাক্সিতে চড়ে না। পয়সার জন্যও বটে, তা ছাড়া বাবুয়ানি তার সয় না। আজ উঠে বসল। কারণ অবস্থাটা আজ গুরুতর। তা ছাড়া শোভারানির দেওয়া বেশ কিছু টাকাও আছে পকেটে।

পৃথিবীটাকে ঠিক বুঝতে পারে না গগনচাঁদ। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মেঘলা করে আসে। গ্যারাজ—ঘরে জল ওঠে আধ—হাঁটু। জীবনটা এ রকমই। মাঝে মাঝে বিনা কারণে এ রকম পালাতে হয়।

অবস্থাটা এখনও ঠিক বুঝতে পারে না গগন। তবু সেজন্য তার চিন্তা হয় না। এখন সে শোভারানির কথা ভাবে। ভাবতে বেশ ভালো লাগছে তার।

ছয়

কালুকে পুলিশ তেমন কিছু করেনি। দু'চারটে ঠোকনা যে না মেরেছে তা নয় কিন্তু সে বলতে গেলে সিপাইদের আদর। পুলিশের আসল ধোলাই কেমন তা খানিকটা কালু জানে।

পুলিশের কাছে কালু কারও নাম বলেনি।

থানার বড়বাবু তাকে জিজ্ঞেস করল, তুই ফলিকে খুন হতে দেখেছিস?

কালু দম ধরে রেখে খানিক ভাবল। ভেবে দেখল, সে অনেককেই ঘটনাটা বলেছে, তাই এখানে মিছে কথা বললে নাহোক ধোলাই হবে। আর পুলিশ যদি মারে তো কোনও শালার কিছু করার নেই। তাই সে চোখ পিটপিট করে বড়বাবুর কোঁতকা চেহারাটা চোখ ভরে দেখতে দেখতে বলল, দেখেছি।

সত্যি দেখেছিস, না কি নেশার ঘোরে বানিয়েছিস?

কালুর সেই তেজ আর নেই, যেমনটা সে সুরেন খাঁড়া, গগন আর সন্তুকে দেখিয়েছিল। পুলিশের সামনে কারই বা তেজ থাকে?
কালু মেঝেয় উবু হয়ে বসা অবস্থায় মাথা চুলকে বলল, নেশাও ছিল, তবে আবছা দেখেছি।
বড়বাবুর বুটসুদ্ধ মোটা একখানা পা তার কাঁকালে এসে লাগল এ সময়ে। খুব জোরে নয়, তবে কালু তাতেই টাল্লা খেয়ে হড়াত করে পড়ে গেল। একদাঁত হেসে সে আবার উঠে বসে।
বড়বাবুর মুখে হাসি নেই, ভ্রূ কুঁচকে বলে, ঠিকসে বল।
অন্ধকার ছিল যে।
সেখানে তুই কী করছিলি?
সাঁজ—বাজারে একটা লোক তাড়ি আনে। রোজ যেয়ে তার কাছে বসি।
বড়বাবু পা ফের তুলে বলে, এটুকু বয়সেই মালের পাকা খদ্দের!
খাই মাঝে মাঝে, তাকত পাই না নাহলে।
এবারের লাথিটা আরও আস্তে এল। লাগল না তেমন।
বড়বাবু বলে, ঠিক করে বল কী করছিলি!
বড় একটা ভাঁড় নিয়ে লাইনের ধারে বসে খাচ্ছিলাম। এ সময় কতগুলো ছেলে এল লাইনের ওধার। কী সব বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে।
কিছু শুনতে পাসনি?
না, খুব আস্তে বলছিল।
ঝগড়া—কাজিয়া বলে মনে হয়েছিল?
না। আপসে যেমন কথা হয় দোস্তদের মধ্যে।
তারপর?
ওরা আমাকে দেখেনি, জায়গাটা অন্ধকার।
ক'জন ছিল?
চার—পাঁচ জন হবে। তাদের একজন খুব লম্বা—চওড়া।
অন্ধকারে বুঝলি কী করে?
বললাম তো আবছা দেখা যাচ্ছিল।
লম্বা—চওড়া লোকটা কে? গগন?
কী জানি!
তবে লোককে বলছিস কেন যে গগনবাবু লাশ নামিয়েছে?
কালু অবাক হয়ে বলে, কখন বললাম?
বলিসনি?—বড়বাবু চোখ পাকিয়ে বলে।
মাইরি না।
এই সময়ে একটা সিপাই পাশ থেকে ঠোকনা মারে। খুব জোরে নয়, তবে তাতে কালুর ডান গালের চামড়া থেঁতলে রক্ত বেরিয়ে গেল, আর কষের একটা দাঁতের গোড়া বুঝি নাড়া খেয়ে আরও খানিক রক্ত চলকে দিল। মুখের রক্ত ঢোক গিলে পেটে চালান দিয়েছিল কালু। থানায় ধরে আনার পর থেকে দাঁতে কুটো পড়েনি। পেট জ্বলছে।
বড়বাবু বলে, সব ঠিকঠাক করে বল।
কালু হাসবার চেষ্টা করে বলে, বলছি তো বড়বাবু, গগনদার কথা কাউকে বলিনি।
খুনটা কেমন করে হল?

সে খুব সাংঘাতিক। হঠাৎ দেখি সেই চার—পাঁচজনের মধ্যে একজনকে সেই জোয়ান লোকটা পিছন থেকে কী দিয়ে যেন মাথায় মারল।

জোরে মারল?

তেমন জোরে নয়, তবে ছেলেটা পড়ে গেল মাটিতে।

তারপর?

তারপর একটা তোয়ালে বা কাপড় কিছু একটা দিয়ে ছেলেটার গলা পেঁচিয়ে সেই জোয়ান লোকটা খুব চেপে ধরল।

কতক্ষণ?

খুব বেশিক্ষণ নয়, ভয়ে আমি শব্দ করিনি।

তারপর কী হল?

লোকগুলো চলে গেল।

তুই খুনিকে চিনতে পারিসনি?

মাইরি না।

তবে তোকে টাকা দিল কে?

টাকা!—কালু খুব অবাক হয়।

তোকে নাকি খুনি পাঁচশো টাকা দিয়েছে?

মাইরি না বড়বাবু—

কালু পা ধরতে যাচ্ছিল, এ সময়ে আর একটা বেতাল ঠোকনা খেয়ে পড়ে যায়। মাথার পিছনে বাঁ ধারে মুহূর্তের মধ্যে একটা আলু ফুটে উঠল। ঝাঁ ঝাঁ করছিল ব্যথায়।

টাকা পাসনি?

কালু দাঁতে দাঁত চেপে ভাবছিল কোন শালা কথাটা ফাঁস করেছে! সন্তু জানে, আর রিকশাওয়ালা নিতাই তার দোস্ত, সে জানে। আর সুরেন, গগন এ রকম দু—চারজনকে সে মুখে বলেছিল বটে যে টাকা পেলে খুনির নাম বলবে। এদের মধ্যেই কেউ ব্যাপারটা ফাঁস করেছে। কালুর সন্দেহ সন্তুকে। ওরকম হাড়বজ্জাত ছেলে হয় না।

না।—কালু চোখের জল মুছে বলে। পুলিশ অবশ্য তাকে ধরে এনে প্রায় উদোম করে সার্চ করেছে। টাকা পায়নি।

মারধর কালুর যে খুব লাগে তা নয়। কিন্তু এটা ঠিক তাকে কেউ গমের বস্তা বলে মনে করলে তার মাথায় খুন চেপে যায়। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে হুজ্জত করার মুরোদ কারই বা থাকে?

বড়বাবু বললেন, দ্যাখ ত্যাঁদড়ামি করিস না, করলে মেরে পাট করে দেব। আজ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু রোজ এসে হাজিরা দিয়ে যাবি। সত্যি মিথ্যে কী বলেছিস তার সব আমরা টের পেয়ে যাব। এটা সত্যিই খুনের মামলা কি না, না কি তুই ব্যাপারটা ঘুলিয়ে তুলেছিস, এ সব জানতে আমাদের বাকি থাকবে না। যদি শালা আমাদের ঘোল খাওয়ানোর চেষ্টা করে থাকো তবে জন্মের মতো খতম হয়ে যাবে।

কালুকে এরপর প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে থানা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

কালু অবশ্য তাতে কিছু মনে করেনি। সে জানে সে একটা রিকশাওয়ালা মাত্র। কাজটা এতই ছোট যে দুনিয়ার কারও কাছে কিছু আশা করা যায় না। ইস্কুলের নিচু ক্লাসে পড়বার সময়েই সে কেন যেন টের পেত যে তার জীবনটা খুব সুখের হবে না। গড়ফায় তার বাবার একটা টিনের ঘর ছিল, উঠোন নিয়ে মোটে চার কাঠা জমি। উদ্বাস্তুদের জবর—দখল জায়গা। সেইখানে ছেলেবেলা থেকেই নানা অশান্তিতে বড় হয়েছে। বাবা রোজ মাকে দা কুড়ুল নিয়ে কাটতে যেত, দিদি বাসন্তী গিয়ে আটকাত। মা আর দিদি দুজনেই ঝি—গিরি করে বেড়াত, বাবা ছিল কাঠের মিস্ত্রি, প্রায় দিনই কাজ জুটত না। তার ওপর লোকটার একটা ভয়ংকর

অর্শের যন্ত্রণা ছিল যার জন্য বেশিক্ষণ উবু হয়ে বসে কাজ করতে পারত না, রোজগার যা হত তাতে দু'বেলা খাওয়া জুটে যেত মাত্র, তা সে যে—ধরনের খাবারই হোক! দিদি বাসন্তীর চরিত্র খারাপ নয় তবে বাসন্তী যার সঙ্গে বিয়ে বসল তার আগের পক্ষের বউ আর চার—চারটে ছেলেমেয়ে আছে। জেনেশুনেই করল। সে লোকটার আবার বাসন্তীকে নিয়ে সন্দেহবাতিক, কোথাও বেরোতে দেয় না। এইসব ছেলেবেলা থেকে দেখেছে কালু। বাবার মৃত্যু দেখেছে চোখের সামনে। অর্শ থেকেই খারাপ ঘা হয়ে গিয়ে থাকবে। রক্ত পড়ত দিনরাত। শেষদিকে ওই রক্তপাতেই দিন দিন ক্ষীণ হয়ে হয়ে একদিন রাতে ঘুমিয়ে সকালে আর ওঠেনি। মা এখন ঝি খেটে বেড়ায়, ছোট বোন হেমন্তীও বেরোচ্ছে কাজে, ছোট ভাই ভুতু আর হাবু সন্ধ্যাবাজারে ডিম বেচে আর চুরি করে বেড়ায়। ক্লাস নাইন পর্যন্ত উঠে কালুকে থামতে হল। পড়তে ভালো লাগত না।

সেই থেকে কালুর সব দুঃখবোধ আর কান্না বিদায় নিয়েছে। কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে সে। মনে কিছু ভুরভুরি কাটে না। গাল খেলে গাল দেয়, মার খেয়ে উলটে মার দেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যস, এই ভাবেই যতদিন বেঁচে থাকা যায়। কালু যে—জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে শিখেছে তা হল টাকা। টাকার মতো কিছু হয় না।

সেলিমপুরে সওয়ারি ছেড়ে রিকশাওয়ালা মগন ফাঁড়ির উলটোদিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বসে ছিল। যাদবপুরে ফিরবে, সওয়ারি পাওয়ার লোভে খানিক অপেক্ষা করছিল।

কালু গিয়ে মগনকে বলল, নিয়ে চলো দেখি মগনদা।

তোর গাড়ি কোথায়?

ছেড়ে এসেছি, পুলিশ ধরে আনল একটু আগে।

মগন ঝুঁকে বলল, পুলিশ। আই বাপ। কী হয়েছিল?

সে অনেক কথা, পরে কোনও সময়ে শুনো।

পেঁদিয়েছে তোকে?

ও শালার সম্বন্ধীর পুতেরা কাকে না প্যাঁদায়?

মগন রিকশার হুড তুলে দিয়ে বলল, চেপে বোস, শালারা আবার টের না পায় যে আমার গাড়িতে উঠেছিস!

মগন রিকশা ছেড়ে জোর হাঁকাল।

কালু কেতরে বসেছিল তার সিটে, মারধর নয়, আসলে খিদেয় পেট ব্যথা করছে। মদের ঝোঁকটা উবে গেছে কখন। এখন পেটে একটা চোঁ—ব্যথা। তবে তার মনটা এই ভেবে খুব ভালো লাগছিল যে পুলিশের হাতে পড়েও সে কারও নাম বলেনি।

এইট—বি বাস স্ট্যান্ডে ছেড়ে দিয়ে মগন বলল, মালিককে তিন দিনের পয়সা দিইনি।

কালু দাঁত বের করে বলল, আমার এক হপ্তার বাকি। কাল থেকে গাড়ি দেবে না। তার ওপর পুলিশ লেগেছে।

দু'দিন জোর বৃষ্টি হলে ভালো সওয়ারি পাওয়া যায়।

ইচ্ছেমতো তো আর বৃষ্টি হবে না।

মগন গাড়ি মালিকের বাড়িতে তুলে রাখতে বিজয়গড় গেল।

কালু স্টেশন রোডের মুখে খানিকটা দাঁড়িয়ে আর—একটা রিকশা খুঁজল। পেল না, হাঁটতে লাগল। বাড়ি না গেলেও হয়। গরফা পর্যন্ত হাঁটতে ইচ্ছে করছে না খিদে পেটে।

স্টেশনের গায়ে একটা তেলেভাজার ঝোপড়ার দোকান আছে। সেটা চালায় বিশে, তার দোস্ত, সেখানে গেলে কিছু খাবার জুটতে পারে। শোওয়ার জায়গার অভাব নেই, স্টেশনে গামছা পেতে পড়ে থাকলেই হল।

বিশে জেগে ছিল, ঝোপড়ায় হারিকেন জ্বলছে। একটা বিদিকিচ্ছিরি কম দামের ট্রানজিস্টারে কোথাকার একটা পুরনো হিন্দি গান হচ্ছে।

তাকে দেখে বিশে দাঁতের বিড়ি ফেলে দিয়ে বলল, পরশু মাল খাওয়াবি কথা ছিল।
কালু বলে, কাল খাওয়াব।
তোর শালা মুখ না ইয়ে।
বেশি মেজাজ লিস না বিশে, আমার কচকচে সাড়ে চারশো টাকা আছে।
যাঃ যাঃ।
কিছু পেটের ব্যবস্থা হবে?
বিশে বলল, শালা রোজ এসে জ্বালালে এবার ঝাপড় খাবি।
তা বলে বিশে ফিরিয়ে দেয় না। মুড়ি, ছোলাসেদ্ধ আর ঠান্ডা বেগুনি খাওয়ায়। তারপর দুই বন্ধুতে বিড়ি ধরিয়ে গিয়ে স্টেশনে শুয়ে পড়ে গল্পগাছা করতে থাকে। বিশের মা ঝোপড়া আগলে রাখে।
বিশে সব শুনে বলে, তুই শালা ঘুণচক্করে পড়বি। খুনখারাবি নিয়ে দিল্লাগি নয় দোস্ত! সত্যি কথা বল তো কাউকে দেখেছিলি?
স্টেশনের শক্ত মেঝের ওপর চট পেতে শোয়া কালু পাশ ফিরে বিশের দিকে চেয়ে বিড়িতে টান মেরে বলে, তুই লাশটা দেখেছিলি?
বিশে বলে, দেখব না কেন? লাইনের ধারে দিনভর পড়ে ছিল। অনেক বার গিয়ে দেখেছি।
চিনতে পেরেছিলি?
বিশে মাথা নেড়ে বলে, খুব। ফলি গুন্ডাকে কে না চেনে? এ সব জায়গাতেই আড্ডা ছিল। সব সময়ে ট্রেনে আসত আর ট্রেনেই চলে যেত।
ট্যাবলেট বেচতে আসত যে আমিও জানি। কিন্তু ট্রেনে আসত কেন বল তো?
মনে হয় পাড়ায় ঢুকতে ভয় পেত। বাসে—টাসে এলে তো বড় রাস্তা বা স্টেশন রোড ধরে আসতে হবে। ও সব জায়গায় ওর কোনও বিপদ ছিল মনে হয়।
কালু আর—একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, লকিয়ে—চুরিয়ে আসত তা হলে!
বিশে গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু ফলিরও দল ছিল। সন্তোষপুর, পালবাজার, স্টেশন রোড এ সব এলাকার বিস্তর মস্তান ছিল ওর দোস্ত। আমার দোকানে এসে ইঁট পেতে বসে কত দিন দিশি মাল আর তেলেভাজা খেয়েছে।
তুই তা হলে ভালোই চিনতি?
বললাম তো।
তুই খুনটা নিজে চোখে দেখলি?
নিজের চোখে।
খুনিকেও চিনলি?
কালু হেসে বলে, নাম বলব না তা বলে। চিনলাম।
বিশে একটা আস্তে লাথি মারল কালুর পাছায়।
তারপর বলল, মালকড়ি ঝাঁকবি?
ঝেঁকেছি, কাল তোকে মাল খাওয়াব।
বিশে ঘুমোয়। কালুর অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। গালটা ফুলে টনটনে ব্যথা হয়েছে। মাজাতেও ব্যথা বড় কম নয়। এপাশ—ওপাশ করে সে একটু কোঁকাতে থাকে।
শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল কালু। উঠতে অনেক বেলা হল। দেখল, বিশে উঠে গেছে। স্টেশন গিজগিজ করছে।
লাইন পার হয়ে কালু পাড়ায় ঢুকে বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে।

দরজায় পা দিতে—না—দিতেই মা চেঁচিয়ে বলে, হারামজাদা বজ্জাত, কার সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলি? কাল রাতে চারটে গুন্ডা এসে বাড়ি তছনছ করেছে। ছেলেদুটোকে ধরে কী হেনস্থা, যা বাড়ি থেকে দূর হয়ে! গুন্ডা বদমাশ কোথাকার!

সাত

নানক চৌধুরীর পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে তাকালে পাড়ার অনেকখানি দেখা যায়।

ঘরে নানক চৌধুরী একাই থাকে। বাড়ির কারও সঙ্গেই হলাহলি—গলাগলি নেই, এমনকী স্ত্রীর সঙ্গে না। নিজের ঘরে বইপত্র আর নানান পুরাদ্রব্যের সংগ্রহ নিয়ে তার দিন কেটে যায়। কাছেই একটি কলেজে নানক অধ্যাপনা করে। না—করলেও চলত, কারণ টাকার অভাব নেই।

টাকা থাকলে মানুষের নানা রকম বদ খেয়াল মাথা চাড়া দেয়। নানক চৌধুরী সেদিক দিয়ে কঠোর মানুষ। মদ—মেয়েমানুষ দূরের কথা নানক সুপুরিটা পর্যন্ত খায় না। পোশাকে বাবুয়ানি নেই, বিলাসব্যসন নেই। তবে খরচ আছে। জমানো টাকার অনেকটাই নানকের খরচ হয় হাজারটা পুরাদ্রব্য কিনতে গিয়ে। ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও নানক প্রত্নবিদ নয়। তাই সেসব জিনিস কিনতে গিয়ে সে ঠকেছেও বিস্তর। কেউ একটা পুরনো মূর্তি কি প্রাচীন মুদ্রা এনে হাজির করলেই নানাক ঝটপট কিনে ফেলে। পরে দেখা যায় যে জিনিসটা ভুয়া। মাত্র দিন সাতেক আগে একটা হা—ঘরে লোক এসে মরচে—ধরা একটা ছুরি বেচে গেছে। ছুরিটা নাকি সিরাজদৌল্লার আমলের। প্রায় ন'শো টাকা দণ্ড দিয়ে সেটা রেখেছে নানক।

দেখলে নানককে বেশ বয়স্ক লোক বলে মনে হয়। দাড়ি—গোঁফ থাকায় এখন তো তাকে রীতিমতো বুড়োই লাগে। কিন্তু সন্তু যদি তার বড় ছেলে হয়, তা হলে তার বয়স খুব বেশি হওয়ার কথা নয়। নানকের হিসেবমতো তার বয়স চল্লিশের কিছু বেশি।

রাত বারোটা নাগাদ নানক তার পশ্চিমধারের জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেখান থেকে পাড়ার বড়রাস্তা দেখা যায়। পাশের বাড়িটা নিচু একটা একতলা। তার পরেই নরেশের বাড়ির ভিতর দিকের উঠোন। উঠোনে আলো নেই বটে, তবে বাড়ির ভিতরকার আলোর কিছু আভা এসে উঠোনে পড়েছে। লোকজন কাউকে দেখা যায় না। এত রাতে আলো বা লোকজন দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। তবে আজকের ব্যাপার আলাদা। ফলি নামে কে একটা ছেলে লাইনের ধারে মারা গেছে, তাকে নিয়ে নানা গুজব। কেউ বলছে খুন। একটা রিকশাওয়ালা খুনির নাম বলেছে গগন। এই নিয়ে পাড়ায় ভীষণ উত্তেজনা। প্রায় সবাই জেগে গুজগুজ ফুসফুস করছে।

গুজব নানকের পছন্দ নয়। সে জানে কংক্রিট ফ্যাক্ট ছাড়া কোনও ঘটনাই গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাস্য নয়। তার নিজের বিষয় হল ইতিহাস, যা কিনা বারো আনাই কিংবদন্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশই কেচ্ছাকাহিনি। তাছাড়া ইতিহাস মানেই হচ্ছে রাজা বা রাজপরিবারের উত্থান—পতনের গল্প। তাই ইতিহাস সাবজেক্টটাকে দু'চোখে দেখতে পারে না নানক। তার ইচ্ছে এমন ইতিহাস লেখা হোক যা সম্পূর্ণ সত্যমূলক এবং সমাজবিবর্তনের দলিল হয়ে থাকবে। ইতিহাস মানে গোটা সমাজের ইতিহাস। কিন্তু পাঠ্য প্রাচীন ইতিহাসগুলো সেদিক থেকে বড়ই খণ্ডিত।

নানক দাঁড়িয়ে চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছিল। চারদিককার পৃথিবী সম্পর্কে সে এখন কিছুটা উদাস এবং নিস্পৃহ। তার সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থটি হল রবিনসন ক্রুশো। এই প্রায়—শিশুপাঠ্য বইটি যে কেন তার প্রিয় তা এক রহস্য। তবে নানক দেখেছে, যখনই তার মন খারাপ হয় বা অস্থিরতা আসে তখন রবিনসন ক্রুশো পড়লেই মনটা আবার ঠিক হয়ে যায়। শুনলে লোকে হাসবে কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

আজ বিকেল থেকে নানকের মনটা খারাপ, তার প্রত্নবিদ বন্ধু অমলেন্দু এসেছিল, ছুরিটা নেড়েচেড়ে দেখে বলেছে, এ হল একেবারে ব্রিটিশ আমলের বস্তু। বয়স ষাট—সত্তর বছরের বেশি নয়। তবে একটু ঐতিহাসিক নকলে তৈরি হয়েছিল বটে। ন'—ন' শোটা টাকা গালে চড় দিয়ে নিয়ে গেছে হে!

নানক চৌধুরী তখন থেকেই রবিনসন ক্রুশো পড়ে গেছে। এখন মনটা অন্যমনস্ক। নানক চৌধুরী নিজেকে সেই নিরালা দ্বীপবাসী রবিনসন ক্রুশো বলে ভাবতে ভারী ভালোবাসে। সে যদি ও রকম জীবন পায় তবে ফ্রাইডের মতো কোনও সঙ্গীও জোটাবে না। এ রকম একা থাকবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে নানক হঠাৎ নরেশের বাড়ির উঠোনে টর্চের আলো দেখতে পায়। সেই সঙ্গে দুটো ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি হলেও চিনতে অসুবিধে নেই। বিপুল মোটা বেঁটে শোভারানিকে অন্ধকারেও চেনা যায়। আর গরিলার মতো হোঁতকা জোয়ান—জোয়ান চেহারার গগনকেও ভুল হওয়ার কথা নয়।

দুজনে করছে কী ওখানে? কোনও লাভ—অ্যাফেয়ার নয় তো!

একটু বাদেই নানক দেখে গগন দেয়াল ডিঙোচ্ছে। শোভারানি টর্চ জ্বেলে ধরে আছে। গগন দেয়ালের ওপাশে নেমে না—যেতে যেতেই পুলিশের গাড়ির আওয়াজ রাস্তায় এসে থামে। ভারী বুটের শব্দ। কিছু টর্চের আলো এলোমেলো ঘুরতে থাকে।

তা হলে এই ব্যাপার!

নানক চৌধুরী লুঙ্গির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঘর থেকে বেরোয়। নিজের ঘরে তালা দেওয়া তার পুরনো অভ্যাস। বাড়ির কারও বিনা প্রয়োজনে তার ঘরে ঢোকা নিষেধ। তালা দিয়ে নানক নীচে নেমে আসে। চাকরকে ডেকে সদর দরজা বন্ধ করতে বলে রাস্তায় বেরোয়।

মুখোমুখি একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা। নানক বলে, কাউকে খুঁজছেন?

অফিসার বলে, হ্যাঁ। গগন নামে কাউকে চেনেন?

চিনি।

লোকটা ঘরে নেই। পালিয়েছে।

নানক বলে, হ্যাঁ। আমি পালাতে দেখেছি।

কোন দিকে?

পিছনের দেয়াল টপকে ল্যাবরেটরির মাঠ দিয়ে। এখন আর তাকে পাবেন না। বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছে।

কখন গেল?

মিনিট দশ—পনেরো হবে। নরেশ মজুমদারের স্ত্রীও ছিল। পালাবার সময় টর্চ দেখাচ্ছিল।

আপনি কে?

নানক চৌধুরী প্রফেসর।

নানক চৌধুরীর পরিচয় পেয়ে পুলিশ অফিসার খুব বেশি প্রভাবিত হননি। শুধু বললেন, পালিয়ে যাবে কোথায়?

এত রাতেও পাড়ার লোকে মন্দ জমেনি চার দিকে। তা ছাড়া চারদিকের বাড়ির জানালা বা বারান্দায় লোক দাঁড়িয়ে দেখছে।

রাস্তার ভিড় থেকে সুরেন খাঁড়া এগিয়ে এসে একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে, মদনদা, তোমরা একটা মাতাল আর চ্যাংড়া রিকশাওয়ালার কথায় বিশ্বাস করে অ্যারেস্ট করতে এলে, এটা কেমন কথা?

পুলিশ অফিসারের নাম মদন। সুরেনের সঙ্গে এ অঞ্চলের সকলের খাতির। অফিসার একটু ভ্রূ কুঁচকে বলেন, অ্যারেস্ট করতে এসেছি বললে ভুল হবে। আসলে এসেছি এনকোয়ারিতে। তা তুমি কিছু জানো নাকি সুরেন?

কী আর জানব? শুধু বলে দিচ্ছি, কালুর কথায় নেচো না। ও মহা বদমাশ। গগনকে আমরা খুব ভালো চিনি। সে কখনও কোনও ঝঞ্ঝাটে থাকে না।

থাকে না তো পালাল কেন?

সে পালিয়েছে কে বলল! পালায়নি। হয়তো গা—ঢাকা দিয়েছে ভয় খেয়ে। মদনদা, তোমাদের কে না ভয় খায় বলো?

পুলিশ অফিসার একটু হেসে বললেন, আরও একজন এভিডেন্স দিয়েছে, শুধু কালুই নয়। গগনবাবুর ল্যান্ডলর্ড নরেশ মজুমদার। আবার এই প্রফেসর ভদ্রলোক বলেছেন, গগনের সঙ্গে একটু আগেই নাকি মিসেস মজুমদারকেও দেখা গেছে। তোমাদের এ পাড়ার ব্যাপার—স্যাপার বেশ ঘোরালো দেখছি।

নরেশ মজুমদার এতক্ষণ নামেনি। এইবার নেমে আসতে সবাই তার চেহারা দেখে অবাক। রাস্তার বাতি, পুলিশের টর্চ আর বাড়ির আলোর জায়গাটা ফটফট করছে আলোয়। তাতে দেখা গেল নরেশ মজুমদারের চোখে—মুখে স্পষ্ট কান্নার ছাপ। চুলগুলো এলোমেলো। গায়ে জামা—গেঞ্জি কিছুই নেই, পরনে একটা লুঙ্গি মাত্র।

নরেশ নেমে এসেই মদনবাবুকে হাতজোড় করে বলেন, ভিতরে চলুন। আমার কিছু কথা আছে।

মদন সুরেনের দিকে ফিরে একটু চোখ টিপলেন। প্রকাশ্যে বললেন, সুরেন, তুমি তো পাড়ার মাথা, তা তুমিও না হয় চলো সঙ্গে।

নরেশ বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

সুরেন খুব ডাঁটের সঙ্গে বলে, নরেশবাবু কথা আপনার যা—ই থাক, বিনা প্রমাণে আপনি গগনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ভালো কাজ করেননি। কাল সন্ধেবেলা গগন জিমনাশিয়ামে ছিল, ত্রিশ—চল্লিশ জন তার সাক্ষী আছে।

নরেশ গম্ভীরমুখে বলে, সব কথা ভিতরে গিয়েই হোক। রাস্তা—ঘাটে সকলের সামনে এ সব বলা শোভন নয়। আসুন।

নরেশের পিছু পিছু সুরেন আর মদন ভিতরে ঢোকে।

নানক চৌধুরী ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। তাকে ওরা বিশেষ গ্রাহ্য করল না। অথচ একটা অতি গুরুতর ব্যাপারের সে প্রত্যক্ষদর্শী।

ঘরের এক ধারে একটা রিভলভিং চেয়ারে বেগম আধ—শোয়া হয়ে চোখ বুজে আছে, কপালে একটা জলপট্টি লাগানো, ডান হাতের দুটো আঙুলে কপালের দু'ধার চেপে ধরে আছে। তার কান্না শোনা যাচ্ছে না, তবে মাঝে মাঝে হেঁচকির মতো শব্দ উঠছে।

শোভারানি ভিতরের দরজায় অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। তার দু'চোখে বেড়ালের জ্বলন্ত দৃষ্টি।

নরেশ মজুমদার যখন তার অতিথিদের এনে ঘরে ঢুকল তখন শোভারানির ঠোঁটে একটা হাসি একটু ঝুল খেয়েই উড়ে গেল।

বেগম এক বার রক্তরাঙা চোখ মেলে তাকায়। আবার চোখ বুজে বসে থাকে।

নরেশ মজুমদার বেগমের দিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে মদনের দিকে চেয়ে বলে, ওই হল ফলির মা, আমার শালি।

মদন গম্ভীরমুখে বলে, ও সব আমরা জানি।

নরেশ মজুমদার এ কথায় একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, এতক্ষণ আমি আমার শালির সঙ্গে আলোচনা করছিলাম।

মদন আর সুরেন দু'টি ভারী নরম সোফায় বসে। সুরেন বলে, অনেক রাত হয়েছে নরেশবাবু, কথাবার্তা চটপট সেরে ফেলুন।

নরেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সুরেনের দিকে চেয়ে বলে, আপনি বলছিলেন গতকাল গগন সন্ধেবেলায় জিমনাশিয়ামে ছিল। আপনি কি ঠিক জানেন ছিল?

আলবত।—সুরেন ধমকে ওঠে।

নরেশ মাথা নেড়ে বলে, না সুরেনবাবু গগন সন্ধেবেলায় জিমনাসিয়ামে ছিল না! সে সন্ধে সাতটার পর ব্যায়াম শেখাতে আসে। তারও সাক্ষী আছে।

সুরেন পা নাচিয়ে বলে, এ এলাকায় গগনকে সবাই চেনে নরেশবাবু। সে দেরি করে জিমনাশিয়ামে এলেও কিছু প্রমাণ হয় না। জিমনাশিয়ামে যাওয়ার আগে সে কোথায় ছিল সেইটাই তো আপনার জিজ্ঞাস্য? তার

জবাবে বলি, যেখানেই থাক লুকিয়ে ছিল না। আপনি গগনের পিছনে লেগেছেন কেন বলুন তো!

এ কথা শুনে বেগম আবার তার রক্তরাঙা চোখ খুলে তাকাল। সোজা সুরেনের দিকে চেয়ে কান্নায় ভেঙে ও ভারী স্বরে বলল, গগনবাবু কাল সন্ধেবেলা কোথায় ছিলেন তা কি আপনার জানা আছে?

না।

তা হলে জামাইবাবুকে খামোকা চোখ রাঙাচ্ছেন কেন? যদি জানা থাকে তা হলে সেটাই বলুন।

মদন কথা বলেনি এতক্ষণ, এবার বলল, ও সব কথা থাক। সাসপেক্ট কোথায় ছিল না—ছিল সেটা পরে হবে। আপাতত আমি জানতে চাই আপনারা কোনও ইনফর্মেশন দিতে চান কি না, আজেবাজে খবর দিয়ে আমাদের হ্যারাস করবেন না। কংক্রিট কিছু জানা থাকলে বলুন।

নরেশ মজুমদার বলল, ফলি কি খুন হয়েছে?

মদন গম্ভীর মুখে বলে, পোস্টমর্টেমের আগে কী করে তা বলা যাবে?

খুন বলে আপনাদের সন্দেহ হয় না?

আমরা সন্দেহ—টন্দেহ করতে ভালোবাসি না। প্রমাণ চাই।

কিন্তু আই—উইটনেস তো আছে!

সুরেন ফের ধমকে ওঠে, উইটনেস আবার কী? একটা বেহেড মাতাল কী বলেছে না বলেছে সেটাই ধরতে হবে নাকি?

শোভারানি এতক্ষণ চুপ ছিল, এবার সামান্য সুর করে নরেশকে বলল, তোমার অত দরদ কীসের বলো তো?

তুমি ভিতরে যাও।

কেন, তোমার হুকুমে নাকি?

নরেশ রেগে গিয়ে বলে, যাবে কি না!

যাব না। আমারও কথা আছে।

কী কথা?

তা পুলিশকে বলব।

মদন হাই তুলে বলল, দেখুন, এখনও কেসটা ম্যাচিওর করেনি। চিলে কান নেওয়ার বৃত্তান্ত। খুন না দুর্ঘটনা কেউ বলতে পারছে না। আপনারা কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?

নরেশ বলল, যদি খুনটাকে দুর্ঘটনা বলে চালানোর ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে?

কিন্তু খুনের তো কিছু কংক্রিট প্রমাণ বা মোটিভ থাকবে!

নরেশ বলল, আপনারা পুলিশের কুকুর আনলেন না কেন? আনলে ঠিক—

মদন হেসে উঠে বলে, কুকুরের চেয়ে মানুষ তো কিছু কম বুদ্ধি রাখে না। আপনার যা বলার বলুন না।

বেগম তার রিভলভিং চেয়ার আধপাক ঘুরিয়ে মুখোমুখি হয়ে বলে, আমাদের তেমন কিছু বলার নেই। তবে আমাদের যা সন্দেহ হচ্ছে তা আপনাদের বলে রাখলাম। আপনারা কেসটা চট করে ছেড়ে দেবেন না বা অ্যাকসিডেন্ট বলে বিশ্বাস করবেন না।

ঠিক আছে। এ ছাড়া আর—কিছু বলবেন?

গগনবাবুকে আপনারা ধরতে গেলেন না?

কেন ধরব?—মদন অবাক হয়ে বলে।

ধরতেই তো এসেছিলেন!

মদন হেসে বলল, হুটহাট লোককে ধরে বেড়াই নাকি আমরা?

তা হলে কেন এসেছিলেন?

আপনার জামাইবাবু আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা ছাড়া কালুও কিছু কথা আমাদের কাছে বলেছে। আমরা তাই গগনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

উনি তো পালিয়ে গেলেন। তাইতেই তো প্রমাণ হয় ওঁর দোষ কিছু—না—কিছু আছে।

সুরেন ঝেঁকে উঠে বলে, না, হয় না।

নরেশ বলে, কালু যে গগনকে দেখেছে নিজের চোখে সেটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন?

এবার পুলিশ অফিসার মদন একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে, নরেশবাবু, কালু কিন্তু কারও নাম বলেনি। আর গগনবাবু যে পালিয়েছেন সেও গট—আপ ব্যাপারটা হতে পারে। কারণ পাড়ার একজন বলছেন যে, একটু আগে আপনার স্ত্রীই নাকি তাকে পালাতে সাহায্য করেছেন।

আট

ট্যাক্সিতে বসে গগন কিছুক্ষণ মাথা এলিয়ে চোখ বুজে রইল। মাথাটা বড্ড গরম, গা—ও গরম। মনের মধ্যে একটা ধাঁধা লেগে আছে।

গোলপার্কের কাছ বরাবর এসে ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাবেন?

কোন চুলোয় যাবে তা গগনের মাথায় আসছিল না। কলকাতায় তার আত্মীয়স্বজন বা চেনাজানা লোক হাতে গোনা যায়। কালীঘাটে এক পিসি থাকে। কিন্তু পিসির অবস্থা বেশি ভালো নয়। ছেলের বউয়ের সংসারে বিধবা পিসি কোল ঘেঁষে পড়ে থাকে, তার কথার দাম কেউ বড় একটা দেয় না। তা ছাড়া আপন পিসিও নয়, বাবার মামাতো বোন।

আর এক যাওয়া যায় ছটকুর কাছে। বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ হয় না বটে কিন্তু ছটকু একসময়ে গগনের সবচেয়ে গা—ঘেঁষা বন্ধু ছিল।

গগনের বন্ধু মানেই গায়ের জোরওলা, পেশিবহুল মানুষ। ছটকু ঠিক তা নয়। আড়ে—বহরে ছটকু খুব বেশি হবে না। সাড়ে পাঁচ ফুটিয়া পাতলা গড়নের ছিমছাম চেহারা। তবে কিনা ছটকু একসময়ে বালিগঞ্জ শাসন করত। আর সেটা করত বুদ্ধির জোরে। মারপিট করতে ছটকুকে কম লোকই দেখেছে। তবে দারুণ তেজি ছেলে, দরকার পড়লে দু'হাজার লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে। ফেদার ওয়েটে ভালো বক্সার ছিল কলেজে পড়ার সময়। গগন যখন কলেজে পড়তে আসে ওই ছটকু ছিল তার ক্লাসের বন্ধু, পরে জিমনাশিয়ামে গায়ের ঘাম ঝরাতে গিয়ে পরিচয়টা আরও গাঢ় হয়।

বক্সিং ছটকু খুব বেশি দিন করেনি, কলেজের প্রথম দিকে খুব লড়ালড়ি করল কিছুদিন। ফোর্ট উইলিয়ামে এক কমপিটিশনে জিতেও গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই পড়াশুনোর তাগিদে সে সব ছেড়ে ভালো ছাত্র হয়ে গেল। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ত। ফার্স্টক্লাস পেল, এম এসসিতেও তাই। কিছুদিন বোম্বাই গিয়ে চাকরি করল। সেখান থেকে গেল বিলেত, বিলেতে নিউমোনিয়া বাধিয়ে কিছুদিন ভুগে ছ'মাস বাদে ফিরে এল। বলল, বিলেত কি আমাদের পোষায়! টাকাটাই গচ্চা।

ছটকু বড়লোকের ছেলে। তার বাবা সরকারি ঠিকাদার, জাহাজের মাল খালাস করার ব্যবসাও আছে। এলাহি বাড়ি, এলাহি টাকা। বিলেত থেকে ফিরে এসে ছটকু কলকাতায় চাকরি নেয়। গগন কিছুদিন অগে খবর পেয়েছে যে ছটকু চাকরি ছেড়ে ব্যাবসা করছে, খুব বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং বউয়ের সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছে না।

কোনও মানুষই নিখাদ সুখে থাকে না। পৃষ্ঠব্রণ একটা না একটা থাকবেই। ভেবে গগন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ট্যাক্সিওলাকে বলল, ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস।

ছটকুদের বাড়িটা এত রাতেও জেগে আছে। পুরোটা জেগে আছে বললে ভুল হবে। দোতলা—তেতলার বেশির ভাগই অন্ধকার। তবু দু'—চারটে জানালায় আলো জ্বলছে। দোতলার বাঁ—দিকের কোণের ঘরটা ছটকুর। তাতে আলো দেখা যাচ্ছে। সদরটা খোলা। দুটো দারোয়ান বসে কথা কইছে।

গগন ট্যাক্সি ছেড়ে নেমে সদরে উঠতেই দারোয়ানদের একজন বলে ওঠে, কাকে চাইছেন?
ছটকু আছে?
আছে।
একটু ডাকবে ওকে? বড় দরকার। বলো গগন এসেছে।
দেখি।—বলে দারোয়ান ভিতরে গেল।
কয়েক মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করতে হল। হঠাৎই পায়জামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ছটকু দরজায় দেখা দিয়ে অবাক হয়ে বলে, তুই কোত্থেকে রে?
কথা আছে। রাতের মতো একটু থাকতে দিবি?
হোল লাইফ থেকে যা না। আয় আয়।
গগন শ্বাস ফেলে বাঁচল। ছটকুর বউকে সে চেনে না। সে মহিলা কেমন হবে কে জানে! যেখানে মহিলারা সুবিধের নয় সেখানে থাকা বড় জ্বালা। তার ওপর ছটকুর সঙ্গে তার বউয়ের বনিবনা নেই বলে শুনেছে। তাই স্বস্তির মধ্যেও একটু কাঁটা বিঁধে রইল মনে। নিখাদ সুখ বলে তো কিছু নেই।
ছটকুর পিছু পিছু দোতলায় উঠে এল গগন। এ বাড়িতে সে আগেও এসেছে। বড়লোকদের বাড়ি যেমন হয় তেমনি সাজানো। যেখানে কার্পেট পাতা নেই সেখানকার মেঝে এত তেলতেলে আর ঝকঝকে যে পা পিছলে যেতে পারে।
ছটকুর ঘর তিনটে। কোণেরটা শোওয়ার ঘর। ঢুকতেই বিশাল একটা বসবার ঘর। বাঁ দিকেরটা স্টাডি। বরাবর তিনখানা ঘর ছটকু একা ভোগ করেছে। এ সব দেখে নিজের গ্যারেজের ঘরখানার কথা ভাবলে গগনের হাসি পায়। মানুষে মানুষে অবস্থার পার্থক্য কী বিপুল আশমান—জমিন!
বসবার ঘরে মেঝে—ঢাকা পুরু উলের গালচে। গাঢ় খুনখারাপি রঙের। দারুণ সব সোফা আর কৌচ, বিশাল রেডিয়োগ্রাম, টি ভি সেট, বুককেস, কাচের শো—বকস। দরজায় পরদার বদলে লম্বা হয়ে ঝুলছে সুতোয় গাঁথা বড় বড় পুঁতির মালা।
ছটকু তাকে বসিয়ে একটা চাকা লাগানো পোর্টেবল রুম এয়ার—কন্ডিশনার কাছে টেনে এনে চালু করল। হিমঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল গগনের শরীরে। বড় ভালো হাওয়াটা।
ক্যাম্বিসের ব্যাগটা মেঝেয় রেখে গগন একটা আরামের 'আঃ' শব্দ করে চোখ বুজে থাকে। মুখোমুখি বসা ছটকু কিন্তু একটা প্রশ্নও করেনি। চুপ করে বসে একটা পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগল, সময় দিল গগনকে।
গগন খানিক বসে থেকে হঠাৎ বুঝতে পারল যে এবার তার কিছু বলা উচিত। ছটকু কী ভাবছে?
গগন বলে, তোর বউ ঘুমিয়েছে?
কেন?—ছটকুর মুখে দুষ্টুমির হাসি।
না, বলছিলাম কী পাশের ঘরে উনি এখন ঘুমিয়ে আছেন আর আমরা কথাবার্তা বলছি, এতে ওঁর ডিসটার্ব হতে পারে।
নিভন্ত পাইপটা আবার ধরিয়ে ছটকু মৃদুস্বরে বলে, ঘুমোয়নি, একটু আগেই কথা হচ্ছিল।
গগন আড়চোখে দেখে পাশের দরজায় ফুটফুটে সাদা জালি পরদা ঝুলছে। ওপাশে যে মহিলা আছেন তিনি গগনকে কী চোখে দেখবেন সেইটাই সমস্যা।
গগন বলল, একটু বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি।
ছটকু হেসে বলে, গগ, বিপদটা একটু নয়। একটু বিপদে পড়ে এত রাতে তুই আসিসনি।
বরাবরই ছটকু তাকে গগ বলে ডাকে। প্রথম জীবনে ছটকু তার নাম দিয়েছিল গগ্যাঁ। গগন থেকে গগ্যাঁ, বিশ্ববিখ্যাত আঁকিয়ে গগ্যাঁর সঙ্গে নাম মিলিয়ে। পরে আর এক আর্টিস্টের নামের সঙ্গে মিলিয়ে গগ বলে ডাকত। ছটকুর ওই স্বভাব, যে কারও নামই খানিকটা পালটে বা বিকৃত করে ডাকবে।

গগন রুমালে মুখ—গলা মুছে বলল, বিপদটা কঠিন বলে মনে হয় না। তবে আমার একজন হিতৈষিণী আমাকে পালানোর পরামর্শ দিয়েছে।

হিতৈষিণীটি কে?

ল্যান্ডলর্ডের বউ। নাথিং রোমান্টিক।

অ। আর বিপদটা?

একটা খুনের ব্যাপার।

খুন!—বলে ভ্রূ তোলে ছটকু।

গগনের হাসি আসে না, তবু দাঁত দেখিয়ে গগন বলে, খুন কি না জানি না। তবে কেউ কেউ বলছে খুন। আর তাতে আমাকে ফাঁসানোর একটা চেষ্টা হয়েছে।

ছটকু কী একটা বলতে গিয়েও হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে সামলে গেল। কিছু একটা টের পেয়েছিল ছটকু। কারণ কথাটা গগন শেষ করার পরপরই শোওয়ার ঘর থেকে একটি মেয়ে বাতাসে ভেসে আসবার মতো এ ঘরে এল। ভারী উদাসীন নিঃশব্দ আর অনায়াস হাঁটার ভঙ্গি।

এত সুন্দর মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। যেমন গায়ের রং, তেমনি ফিগার আর মুখখানা। এইসব মুখের জন্য দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। লম্বাটে, পুরন্ত, ধারালো সুন্দর সেই মুখশ্রী, ভারী দু'খানা চোখের পাতা আধবোজা। অল্প একটু লালচে চুলের ঢল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, পরনে একটা রোব।

ঘরে ঢুকে গগনের দিকে দু'—এক পলক নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকে মেয়েটি। ঘরটা এক সুগন্ধে ভরে যায়।

ছটকু ওর দিকে পিছন ফিরে বসে ছিল। ঘাড় না ঘুরিয়েই বলল, লীনা, এ আমার বন্ধু গগন চৌধুরী।

লীনা কথা বলল না। তবে একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল, নাইস টাইম ফর এ ফ্রেন্ড টু কল!

ছটকু সামান্য বিরক্তির সঙ্গে বলে, লিভ ইট।

লীনা বসবার ঘরের পিছনে বড় পরদার ওপাশে আড়ালে চলে যায়।

ছটকু আবার পাইপ ধরিয়ে বলে, কী খাবি?

খাব?—গগন অবাক হয়ে বলে, খাব কী রে?

না খেয়ে থাকবি নাকি? না কি লজ্জাটজ্জা পাচ্ছিস?

বাস্তবিক গগন লজ্জা পাচ্ছিল। সঙ্গে আবার একটু ভয়ও। এইমাত্র ছটকুর বউ লীনা অ্যায়সা দারুণ অ্যাকসেন্টে ইংরিজি বুলি ঝেড়েছে যে তাতেই গগন থমকে গেছে, ইংরিজিটা তো মেমসাহেবের মতো বলেই, তার ওপর মেজাজও সেই পরদায় বাঁধা। তাই গগন বড় ভিতু—সিতু হয়ে পড়েছে।

ছটকু একটু হাসল। বরাবর ছটকুর মাথা ক্ষুরের মতো ধারালো। টক করে অনেক কিছু বুঝে নেয়। গগনের ব্যাপারটাও বুঝে নিয়ে বলল, ঘাবড়াচ্ছিস? কিন্তু ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার ঘর এটা, আমিই মালিক। তোর কে কী করবে?

গগন বলে, আরে দূর! ও সব নয়। আমার খিদেও নেই।

অত বড় শরীরটায় খিদে নেই কী রে? দাঁড়া, ফ্রিজে কিছু আছে কি না লীনাকে দেখতে বলছি।

এই বলেই বেশ গলা ছেড়ে দাপটে হাঁক দিল ছটকু, লীনা! এই লীনা—

অত্যন্ত ভয়াবহ মুখে লীনা পরদা সরিয়ে দেখা দেয়। চুলের একটা ঝাপটা তার অর্ধেক মুখ ঢেকে রেখেছে, চোখে সাপের চাহনি, মাথাটা এক বার ঝাঁকিয়ে বলে, চেঁচিয়ে কি নিজেকে অ্যালার্ট করতে চাইছ? কী বলবে বলো।

ছটকু সুখে নেই তা গগন নিজের দুঃখ—দুশ্চিন্তার মধ্যেও বুঝতে পারে। মেয়েছেলেরা অ্যায়সা হারামি হয় আজকাল!

ছটকু গম্ভীর মুখে কিন্তু ঠান্ডা গলায় বলে, গগনকে কিছু খেতে দাও।

লীনা খুব অবাক হয়ে গগনের দিকে তাকায়। এত রাতে একটা উটকো লোক এসে খেতে চাইবে এটা যেন কল্পনার বাইরে।

গগন মিন মিন করে বলল, না, না, আমার কিছু লাগবে না।

লাগবে।—ছটকু ধমক দেয়।

লীনা অবাক ভাবটা সামলে নিয়ে খুব চাপা সরু গলায় বলে, তা সেটা আমাকে হুকুম করছ কেন? বেল বাজালেই সামু আসবে। তাকে বলো।

বেলটা তুমিই না হয় বাজালে!

গগন না থাকলে লীনা আরও ঝামেলা করত। সেটা গগন ওর চোখের ঝাঁজালো কটাক্ষেই বুঝল। কিন্তু মুখে কিছু না—বলে দেয়ালের একটা বোতাম একবার টিপে দিয়ে শোয়ার ঘরে চলে গেল।

ছটকু গগনের দিকে তাকিয়ে একটু যেন জয়ের হাসি হাসে। তবে হাসিটাতে বিষ মেশানো। আবার নিভে যাওয়া পাইপ ধরায়। বলে, বেশ আছি।

গগন একটু ঘামে। এয়ারকুলার যথেষ্ট ঠান্ডা হাওয়া দিয়ে তাকে জমিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। তবু গগন ঠান্ডা হচ্ছে না তেমন। পকেটে একগোছা নোট ভরে দিয়েছে শোভা। কেন দিয়েছে, কত দিয়েছে তা ভাববার বা দেখবার সময় পায়নি গগন। তবে দিয়েছে ঠিকই। এই টাকায় গগন বরং গিয়ে একটা হোটেলে উঠলে ভালো করত। এখানে এসে উপরি ঝামেলা পোয়াতে হত না। দুটো মানুষের লড়াইয়ের মাঝখানে পড়ে তখন তার ফাঁপর অবস্থা।

ধোপদুরস্ত পায়জামা আর শার্ট পরা চাকর সামু এল। ছটকুর হুকুমে তক্ষুনি গিয়ে কোত্থেকে খাবার এনে ডাইনিং হলে সাজিয়ে দিল।

ছটকুর তাড়ায় গিয়ে খেতেও বসল গগন। বড়লোকের বাড়ি বটে কিন্তু এরা অখাদ্য ইংরেজি খানা খায়। এক পট সাদা মাংস দেখে সরিয়ে রাখল গগন। মাংস খায়ই না সে। দুটো চিজ স্যান্ডউইচ ছিল মস্ত মস্ত। একখানা কামড়ে তার তেমন ভালো লাগল না। তবে টমেটো আর চিলি সস দিয়ে কোনওক্রমে গিলল সেটা। দ্বিতীয়টা ছুঁল না। এক বাটি সবজি দিয়ে রান্না ডাল ছিল, সেটা খেল চুমুকু দিয়ে।

ছটকু উলটো দিকে বসে তার খাওয়া দেখছে। সামু সম্ভ্রম নিয়ে দাঁড়াল।

গগন বেসিনে হাত ধুয়ে বলল, তুই বুঝছিস না ছটকু, খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা নয়।

ছটকু জবাব দেয় না। গগনকে নিয়ে ড্রয়িংরুম পার হয়ে স্টাডিতে ঢোকে। দরজা থেকেই ফিরে সামুকে হুকুম দেয়, এই সাহেবের বিছানা লাগিয়ে দাও স্পেয়ার রুমে।

স্টাডির দরজা বন্ধ করে ছটকু মস্ত সেকরেটারিয়েট টেবিলটার ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে। টেবিলবাতি জ্বলছিল বলে ঘরটা আবছা। দুটো এয়ারকুলার চালু আছে বলে বেশ ঠান্ডা। নিঝুমও বটে। এত নিস্তব্ধ ঘর গগন আর দেখেনি। মনে হয় খুব ভালোভাবে সাউন্ডপ্রুফ করানো আছে। তা—ই হবে। দেয়ালে ছোট ছোট অজস্র ছিদ্র। রেডিয়ো স্টেশনের স্টুডিয়োতে গগন এ—রকম দেখেছে। একবার আকাশবাণীর বিদ্যার্থী মণ্ডলে সে স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলেছিল, তখন দেখেছে সাউন্ডপ্রুফ স্টুডিয়োর দেয়ালে এ রকম ফুটো থাকে। কথা বললে কোনও প্রতিধ্বনি হয় না।

এখানেও হল না। গগন বলল, তোকে খুব জ্বালাচ্ছি।

ছটকু মাথা নেড়ে বলল, না। বরং এসে আমাকে বাঁচালি। ওই ভ্যাম্পটার কাছ থেকে খানিকক্ষণ সরে থাকতে পারছি।

গগন চুপ করে থাকে। এ প্রসঙ্গটা কটু। না মন্তব্য করাই ভালো।

ছটকু বলল, এবার তোর কথা বল।

গগন কোনও ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো করে না। ও জিনিসটাই তার নেই। যা করে বা বলে তা ভেবেচিন্তে গুছিয়ে। তাই খুব আস্তে আস্তে সে ঘটনাটা ছটকুর কাছে ভাঙতে লাগল।

খুব বেশি সময় লাগল না। মিনিট কুড়ি বড় জোর। ঘটনা তো বেশি নয়।

ছটকু যতক্ষণ শুনছিল ততক্ষণ তার দিকে তাকায়নি, মাথা নিচু করে ছিল। গগন থামতেই চোখ তুলে বলল, সব বলা হয়ে গেল। কিছু বাদ যায়নি তো?

না।—গগন বলে।

ছটকু মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে বলে, ঘটনার দিন খুনের সময়ে তুই কোথায় ছিলি?

গগন এটা ভেবে দেখেনি। তাই তো! কোথায় ছিল? অনেক ভেবে বলল, সন্ধের একটু পরে জিমনাশিয়ামে ছিলাম।

আর তার আগে?

একটু বোধহয় কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম বাজারে।

কোন বাজারে?

গগন একটু চমক খেয়ে বলল, সাঁজবাজার।

সেটা তো স্পটের কাছেই।

গগনের গলা হঠাৎ শুকনো লাগছিল। নাড়ির গতি বাড়ল হঠাৎ। সে কেমন ভ্যাবলার মতো বলল, হ্যাঁ।

ছটকু একটু চিত হয়ে আবার পাইপ ধরিয়ে বলে, আবার ভালো করে ভেবে দ্যাখ। কিছু একটা লুকোচ্ছিস।

না না।—গগন প্রায় আঁতকে ওঠে। আর তার পরই নির্জীব হয়ে যায়।

বলে ফেল গগন।—ছটকু ছাদের দিকে চেয়ে বলে।

ঠান্ডা ঘরে হঠাৎ আরও ঠান্ডা হয়ে যায় গগন। উদভ্রান্ত বোধ করে। বেগমের কথা সে ছটকুকে বলেনি। নিজের চরিত্রদোষের কথা কে—ই বা কবুল করতে যায় আগ বাড়িয়ে।

গগন কথা বলে না।

ছটকু পাইপ পরিষ্কার করতে করতে সম্পূর্ণ অন্য এক প্রসঙ্গ তুলে বলে, তুই তো জানিস না, আমার হাতে এখন কোনও কাজ নেই। মানে বাবা আমাকে কোনও কাজ দিচ্ছে না, মোর অর লেস তাঁর একটা ধারণা হয়েছে যে আমি খুব অপদার্থ, বউয়ের সঙ্গে ইচ্ছে করেই গোলমাল করছি। ফলে বাড়িতে এখন দারুণ অশান্তি, লীনা নাকি টের পেয়েছে যে আমি একজন বিগতযৌবনা ফিল্ম—অ্যাকট্রেসের সঙ্গে শোয়া—বসা করে থাকি। বাড়িতে বলেওছে সে কথা।

গগন নড়ে বসে। সে সাহস পাচ্ছে।

পাইপে তামাক ভরে জ্বালিয়ে ছটকু বলে, কথাটা মিথ্যেও নয়। তবে কিনা সে মহিলাটির যৌবন এখনও যায়নি। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, শরীরের সম্পর্ক হয়নি এমন নয়, তবে কোনও সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট নেই। প্রেম—ট্রেম তো নয়ই। জাস্ট এ সর্ট অফ ফ্রেন্ডশিপ। উঁচু সমাজে খুব চলে এটা। নাক সিঁটকোবার কিছু নেই। তা ছাড়া বিয়ের পর মেয়েটির সঙ্গে দেখা প্রায় হয়ইনি। কিন্তু লীনা সেটাকে ঘুলিয়ে তুলছে।

মেয়েটি কে?

তুই চিনবি না, পঞ্চাশের ডিকেডে ফিল্মে নামত। তেমন নাম—টাম করেনি। যা বলছিলাম, এ সব কারণে আমার অবস্থাটা খুব খারাপ ফ্যামিলিতে। অলমোস্ট জবলেস ভ্যাগাবন্ড, বউয়ের সঙ্গে শুই না। কিছুদিন মদ খাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওটা আমার স্যুট করে না একদম। বদহজম আর অ্যাসিড হয়ে অসম্ভব কষ্ট পাই। একজন বন্ধু জুটে কিছুদিন ড্রাগের নেশা করাল, খুব জমেছিল নেশাটা, বাবা নার্সিংহোমে ভরতি করিয়ে কিয়োর করাল। শেষ পর্যন্ত দেখলাম সুকুমার রায়ের সেই অবস্থা। হাতে রইল পেনসিল। বউয়ের সঙ্গে বনে না, বাপের সঙ্গে বনে না, মদের সঙ্গে বা ড্রাগের সঙ্গেও বনে না, কিছু নিয়ে থাকতে তো হবে।

বলে পাইপটা দেখিয়ে একটু হেসে চোখ টিপে বলে, এর মধ্যে যে টোব্যাকো রয়েছে, তাতে আছে অল্প গাঁজার মিশেল। গন্ধ পাচ্ছিস না?

না!

কিন্তু আছে। আজকাল নানা রকম নেশার এক্সপেরিমেন্ট করি। সময় কাটে না। বুঝলি গগন?

বুঝলাম।

তাই বলছিলাম তোর সব কথা আমাকে বল। তোকে নিয়ে আর তোর প্রবলেম নিয়ে একটু ভাবি। সময় কাটবে।

ছটকুকে গগন খুব চেনে। ও কুকুরের মতো বিশ্বাসী, কম্পিউটারের মতো মাথা ওর। ছটকুকে বক্সিং অভ্যাস করতে দেখেছে গগন। অজস্র মার খেত, মারত। রোখ ছিল সাংঘাতিক। ভিতু নয়, লোভী নয়। ওকে বিশ্বাস করতে বাধা নেই।

কিন্তু গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হাই তুলে বলল, তোকে আমার সব কথা বললাম কেন জানিস? যাতে আমাকে তোর অবিশ্বাস না হয়। বিশ্বাস কর, আমার তোকে হেলপ করতে ইচ্ছে করছে।

গগন চোখ বুজে এক দমকায় বলে উঠল, ফলির মায়ের সঙ্গে আমার প্রেম ছিল।

ঠান্ডা মুখে কথাটা শুনল ছটকু। একটু সময় ছাড় দিয়ে ঠান্ডা গলাতেই প্রশ্ন করে, ফলির মা কে?

ওঃ, সে একজন সোসাইটি লেডি।—গগন আবার চোখ বুজে বলে।

সোসাইটি লেডি? তার সঙ্গে তোর দেখা হল কোথায়?

হয়ে গেল।

হয়ে গেল মানে? তোর কাছ থেকে সে পাবে কী? সোসাইটি লেডি বলতে আমরা অন্য রকম বুঝি। একটু নাক—উঁচু স্বভাবের, সিউডো ইনটেলেক্ট—ওলা মহিলা। এরা জেনারেলি হাই ফ্যামিলির মেয়ে। যেমনটা একদিন লীনা হবে।

গগন নিজের হাতের ঘাম প্যান্টে মুছে বলে, এও অনেকটা সে রকম, তবে হাই ফ্যামিলির নয়, স্বামী সামান্য চাকরি করে।

খদ্দের ধরে পয়সা নেয় নাকি?

না বোধহয়। তবে প্রেজেন্টেশন নেয়, সুবিধে আদায় করে, ধারও নেয়।

ছটকু হেসে বলে, তা হলে হাফ—গেরস্ত বল। ও সব মেয়েকে আমরা তাই বলি। সোসাইটি লেডি অন্য রকম, যদিও জাত একই। তোর কাছ থেকে কী নিত?

কী নেবে? আমার আয় তো জানিস। চাইলেও দিতে পারতাম না। তবে চায়নি।

শুধু শরীর?

শুধু তাই।—গগন লজ্জা পেয়ে বলে।

ছটকু চিন্তিত হয়ে বলে, ও সব মেয়ে তো ভালো তেজি পুরুষ বড় একটা পায় না। যারা আসে তারা প্রায়ই বুড়ো—হাবড়া কামুক, নইলে নভিস। তাই তেমন পুরুষ পেলে বিনা পয়সায় নেয়। নিতান্ত শরীরের স্বার্থে। তারপর কী হল?

কিছুদিন পর ফলির মা বেগম আমাকে রিজেক্ট করে দেয়। গেলে আর খুশি হত না আগের মতো। আমি কিন্তু ওকে দারুণ ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

বুঝেছি।

মনে মনে বেগমের জন্য খুব ছটফট করেছি বহু দিন। এখনও করি। যাই হোক, ফলি যেদিন মারা যায় তার দিন দুই আগে বেগমের একটা চিঠি পাই। তাতে ও লিখেছিল, একটা বিশেষ দিনে সন্তোষপুরের একটা ঠিকানায় গিয়ে যেন দেখা করি ওর সঙ্গে। খুব জরুরি কথা, যেদিনের কথা লিখেছিল সেটা ছিল খুনের তারিখটাই।

বেগমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

না। সে ঠিকানায় গিয়ে আমি বুরবাক। সেখানে বউ—বাচ্চা নিয়ে এক প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার দিব্যি সংসার করছে। বেগমের কথা তারা জানে না।

বেগমের হাতের লেখা তুই চিনিস?

না।

তবে বুঝলি কী করে যে বেগম লিখেছিল?

অবিশ্বাসের তো কিছু ছিল না।

যাক গে। তারপর কী হল?

কী হবে? ওকে না পেয়ে ফিরে এলাম।

কারও সঙ্গে দেখা হয়নি আসবার পথে?

গগন চুপ করে থাকে। বলা উচিত হবে কি? অথচ না—বলেই বা গগন পারে কী করে? এত দূর এগিয়ে আবার পিছোবে?

গগন চোখ বুজে বলে, ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

এ কথায় ছটকুও যেন চমকে যায়। তবে গলার স্বরটা খুবই ঠান্ডা রেখে বলে, কোথায়?

বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছিল। আমাকে দেখে উঠে আসে।

কথা যা হয়েছিল তা মিঠে বা মোলায়েম নয়। একসময়ে সে আমাকে একলব্যের মতো ভক্তি করত, কথায় জান দিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সেদিন সে হুট করে বেরিয়ে এসে আমার রাস্তা আটকে বলল, গগনদা, আপনার সঙ্গে কথা আছে। তার মুখ—চোখ দেখে আর গলার স্বর শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম। একটু যে ভয়ও খাইনি তা নয়। বে—জায়গায় হঠাৎ ও রকম সিচুয়েশন হলে যা হয়। আমতা আমতা করছিলাম, কারণ মনে পাপ। আমি এসেছিলাম ওর মা'র চিঠি পেয়ে দেখা করতে, সেটা তো ভুলতে পারছি না। ও আমাকে একটা দোকানঘরের পিছনে নিয়ে গিয়ে সোজাসুজি বলল, আমার মা'র সঙ্গে আপনার খারাপ রিলেশন আছে আমি জানি, আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। ঠিক এ ভাষায় বলেনি, তবে সেন্সটা এই রকমই। তখন আর গগনদা বলে ডাকছিল না।

মারধর করার চেষ্টা করেছিল?

হ্যাঁ দু'—চারটে কথা চালাচালি হল। আমি দুম করে বলে বসলাম, বেগম কি আমার জন্যই নষ্ট? ওর তো অনেক খদ্দের, খোঁজ নিয়ে দেখোগে। আমি আবার মিথ্যে কথাটথা বানিয়ে গুছিয়ে বলতে পারি না। বেগমের সঙ্গে আমার রিলেশনটা যে অন্য রকম যে কোনও লোক হলে তা দিব্যি বানিয়ে—ছানিয়ে বলত। আমি পারিনি। যা হোক, এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেমক্কা একটা পিস্তল বের করল পকেট থেকে। ওর চোখ দুটো তখন পুরো খুনির। দোকানের পিছনের সেই জায়গাটা আবছা অন্ধকার মতো। সেই আবছায়ায় দু'—চারজন যে গা—ঢাকা দিয়ে দেখছে তা বুঝতে পারছিলাম। তাদেরই একজন এ সময়ে বলে উঠল, ফলি, চালাস না। স্টিল ভরে দে। ফলি তাতে দমেনি। পিস্তলটা তুলে বলল, তোমাকে এইখানে নাকখত দিতে হবে, থুতু চাটবে, জুতো কামড়ে ঘুরবে, তারপর তোমার পাছায় লাথি মারব। বুঝলাম খুন না—করলেও ফলি এবং তার বন্ধুরা আমাকে বেদম পেটাবে। তার আগে নানা রকম ভাবে অপমান করবে। ফলি আর আগের ফলি নেই।

তুই কী করলি?

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অতটা ভয় না পেলে আমি ফলিকে মারতাম না।

মেরেছিলি?

গগন অবাক হয়ে বলে, তুই কি বলিস, মারা উচিত হয়নি?

ছটকু দাঁতে দাঁত চেপে বলে, তা বলিনি। শুধু জানতে চাইছি।

গগন একটু অন্যমনে চেয়ে থেকে বলে, আমিও ভেবে দেখেছি মারাটা উচিত হয়েছে কি না, কিন্তু আমার আর কী করার ছিল? বুঝি যে মায়ের নষ্টামির জন্য ছেলের অপমানবোধ হয়, হতেই পারে। কিন্তু ফলির মাকে তো আমি নষ্ট করিনি, কোনও দিনই আমি মেয়েমানুষের পিছনে ঘুরি না, কিন্তু বেগম আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিল। তার জন্য ফলি খামোখা আমার উপর শোধ নেবে আর আমি দাঁড়িয়ে মার খাব নাকি? তা ছাড়া তখন প্রাণের ভয়।

কী করলি?

ফলি চোখেই দেখতে পেল না কী ওর মুখে গিয়ে দেখল, খুব কুইক ঝেড়েছিলাম ঘুষিটা। ফলি অ্যাই জোয়ান। সহজে কাবু হওয়ার মাল নয়, তার ওপর হাতে পিস্তল ছিল। কাজেই সে ছিল নিশ্চিন্ত। আশেপাশে বন্ধুবান্ধবও রয়েছে। ভয় কী? তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় আচমকা ঘুষি খেয়েই টলে পড়ল সামারসল্ট হয়ে। আমি দুই লাফে বেরিয়ে বাজার ধরে দৌড়ে পালিয়ে আসি।

তাহলে তোকে অনেকে দেখেছিল তখন।

দেখাই স্বাভাবিক। দোকানে লোক ছিল, বাজারে তো তখন গিজগিজ করছে।

কেউ তোর পিছু নেয়নি?

না।

তারপর কী করলি?

সোজা জিমনাশিয়ামে চলে যাই।

ছটকু গগনের চোখে চোখ রেখে চোখাদৃষ্টিতে কী একটু দেখে নেয়। তারপর গম্ভীর মুখেই বলে, ঠিক বলছিস?

গগন ভাবছে, ছটকু শালা কি আমাকেই সন্দেহ করছে? করারই কথা অবশ্য। ঘটনা যা ঘটেছে তার সবকিছুই আঙুল তুলে তাকেই দেখাচ্ছে।

গগন ছটকুর চোখের দিকে আর না—তাকিয়ে বলে, আমি টাকা দিইনি। তবে ঝামেলা এড়ানোর জন্যে হয়তো কখনও কালুকে টাকাটা দেব। যদি তাতে মেটে!

মিটবে না।—ছটকু বলে।

গগন বলে, বিশ্বাস কর, ফলিকে একটা ঘুসি মারা ছাড়া আর—কিছু করিনি। এক ঘুসিতে মরার ছেলে ফলি নয়। পরে আর—কেউ লাইনের ধারে ফলিকে মারে।

ছটকু খুব বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, দ্যাগ গগন, যে মানুষ জীবনে একটাও খুন করেছে তাকে চোখে দেখেই আমি চিনতে পারি। আমার একটা অদ্ভুত ইনস্টিংট আছে। এ ব্যাপারে কখনও ভুল হয় না আমার। তুই যদিও কখনও ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় কাউকে খুন করে থাকিস, তবে তোকে প্রথম দেখেই বুঝতে পারতাম। কিন্তু এটা খুবই সত্যি কথা যে তোর চেহারায় খুনির সেই অবশ্যম্ভাবী ছাপটা নেই।

গগন নিশ্চিন্ত হল কি? বলা যায় না, তবে সে এবার কিছুক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে দম নিল। বলল, আমি যে খুন করিনি তা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে! কিন্তু লোকে কি তা বিশ্বাস করবে? সকলের তো আর তোর মতো ইনস্টিংট নেই।

ছটকু একটু হাসে। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে, ফলি যে লাইফ লিড করত তাতে যে—কোনও সময়ই তার খুন হওয়ার বিপদ ছিল। এ নিয়ে ভাবিস না। কাল থেকে আমি তোর ব্যাপারটা নিয়ে অ্যাকশনে নামব। সকালে ক'টায় উঠিস?

খুব ভোরে। চারটে—সাড়ে চারটে।

ছটকু একটু ভেবে বলে, আমি উঠি ছ'টায়, কিন্তু কাল থেকে আমি তোর মতো সকালে উঠব। মনে হচ্ছে, একটু একসারসাইজ দরকার। সকালে উঠে দৌড়োবি?

নয় কেন?

দৌড়ের পর দুজনে একটু কসরতও করা যাবে, কী বলিস?

গগন হাসে। বলে, ঠিক আছে।

নয়

অনেক রাত পর্যন্ত বেগম অঝোরে কেঁদেছে পুত্রশোকে। নরেশ পাড়ার ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে আনে। বড় ডোজের সেডেটিভ ইনজেকশন দেওয়ার পর বেগম ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক বেলা অবধি সে ওঠেনি।

নরেশ সারারাত ঘুমোয়নি। কখনও কেঁদেছে, কখনও পায়চারি করেছে ঘরে বা ছাদে। শোভা তার তীব্র জ্বালা—ধরা দু'খানা চোখে দেখেছে সবই, সেও ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝে বিছানায় গেছে, আবার উঠেছে, দেখেছে, তারপর আবার শুয়েছে। বিছানা খুব তেতে যাচ্ছিল বারবার। কী এক জ্বালায় তার নিজের শরীর আর শ্বাস এত গরম যে বিছানায় শরীর রাখতে পারছে না। সোফা কৌচে বসতে পারে না। নরেশের সঙ্গে মুখোমুখি কথাও হচ্ছিল না তার। দুজনেই দুজনকে এড়াচ্ছে।

মাঝে মাঝে শোভা গিয়ে ঘুমন্ত বেগমকে দেখেছে। চোখের কোলে এখনও জল বেগমের, চুল উসকোখুসকো, একটু বুড়োটে হয়ে গেছে মুখের শ্রী, তবু এখনও বেগম হাড়জ্বালানি সুন্দরী। শোভার ইচ্ছে করে ওকে বিষ দিয়ে মারতে। চিরকাল খোলাখুলি পুরুষদের নাচাল বেগম। কত মেয়েমানুষের স্বামী কেড়ে নিয়ে সর্বনাশ করেছে। নরেশ হল বেগমের ভেড়ার পালের একজন।

শেষরাতে যখন আকাশের তারা ফিকে হচ্ছে তখন শোভা আর থাকতে না পেরে ছাদের সিঁড়িতে গিয়ে নরেশকে ধরল।

তুমি ভেবেছটা কী, অ্যাঁ?

নরেশ তার দিকে খুব আনমনে চেয়ে রইল। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, তুমি বিছানায় যাও।

কেন যাব? তোমার হুকুমে?

আমার মন ভালো নেই। একা থাকতে দাও।

মন ভালো নেই কেন? ফলির জন্য?

নরেশ বলে, শোভা, তুমি মানুষ নও? ফলি কি তোমার কেউ নয়?

শোভা খুব খনখনে পেতনির হাসি হেসে বলে, ওমা! সে কথা কি বলতে আছে? ফলি যে আমার বুকের ধন, কোলের মানিক! লজ্জা করে না তোমার?

কী বলছ?

কী বলছি বুঝতে পারছ না, ন্যাকা!

পারছি না।

আমি জানতে চাই শালির ছেলের জন্য তোমার অত ভেঙে পড়ার কী? দয়া করে রহস্যটা বলবে, না কি আমার মুখ থেকে শুনবে?

নরেশ গুম হয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, এ সময় রাগারাগি থাক, তুমি শুতে যাও।

আমি শোব না। সত্যি কথাটা তোমার মুখ থেকে আগে শুনি, তারপর কী করব না করব তা আমি জানি।

আমার কিছু বলার নেই।

ফলি কার ছেলে, তাও ঠিক জানো না?

নরেশ চুপ করে থাকে।

শোভা আবার সেই পেতনির হাসি হেসে মোটা শরীরে হিল্লোল তুলে বলে, আমার গর্ভে হয়নি বটে কিন্তু বেগম হারামজাদির পেটে ফলি এসেছিল কী করে তা আজ স্বীকার হও না কেন?

তুমি যাবে?

জবাবটা এল অপ্রত্যাশিত একটা প্রচণ্ড চড় হয়ে।

মোটা হলেও শোভার হাজারটা ব্যামো। হার্ট খারাপ, প্রেশার বেশি, মেয়েমানুষি রোগও অনেক, তাছাড়া আরামে আয়েসে থেকে শরীর অকেজো। চড়টা লাগতেই চার ধাপ সিঁড়ি টপকে অত বড় লাশটা পড়ল সিঁড়ির মোড় ঘোরার চাতালে। বাড়ি কেঁপে গেল তার পড়ার শব্দে।

দশ

বাড়িতে ঢুকেই কালু বুঝতে পেরেছিল, জায়গাটা গরম আছে। তার মতো লোকের ঘরে ঢুকে মস্তানরা যখন হুটোপাটি করে গেছে তখন বুঝতে হবে কেস খারাপ।

মা প্রথম দিকে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, একটু বাদে দম ফুরিয়ে ঘ্যাজর—ঘ্যাজর করতে লাগল।

সেদিকে মোটে কানই দিল না কালু। বলল, ফালতু বাত ছেড়ে কাজের কথাটা বলে লে দিকি। কী হয়েছে কী?

তোকে যমে নেয় না কেন বলবি?

অরুচি বলে নেয় না। কারা এসে হাল্লাক করে গেছে?

সে গিয়ে তোর পেয়ারের লোকদের জিজ্ঞেস কর গে। আমি কি সবাইকে চিনে রেখেছি? নাহ'ক হাবুকে আর ভুতুকে ধরে এই মার কি সেই মার! কেবল জিজ্ঞেস করে, কালু কোথা বল। আমি ঠেকাতে গেলাম তো আমাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কনুই ছ'ড়ে এখনও রক্ত পড়ছে।

হাবু ভুতু কই?

তারা থানায় গেছে।

কালুর মাথাটা ঠিক নেই। বড্ড ঘোঁট পাকাচ্ছে চার দিকে। বলল, কাউকে চিনতে পারিসনি?

হাবু বলছিল একজন নাকি বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। সে সুরেন খাঁড়া না কে যেন!

কালু সময় নষ্ট করল না। সোজা উঠোনে গিয়ে কচুগাছের গোড়ার মাটি খামচে তুলে ফেলল। তলায় একটা প্লাস্টিকের খামে তার টাকা। সেটা তুলে পকেটে পুরে সে গিয়ে মাকে বলে, আমি পাতলা হচ্ছি। খুঁজিস না। বাড়িতে থাকলে শালারা আবার আসবে।

কী করেছিস বল! নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

চেঁচাস না। জানাজানি হলে আমিও যাব, তুইও যাবি।

ভয় পেয়ে মা চুপ করে যায়।

কালু অপথ—কুপথ ঘুরে স্টেশনে চলে আসে। বিশে গনগনে আঁচে বেগুনি ভাজছে। কালু গিয়ে সোজা সেখানে বসে পড়ে বলে, গাড্ডায় পড়ে গেলাম।

বিশে এক খদ্দেরকে বিদেয় করে বলে, আজ মাল খাওয়াবি বলেছিলি।

মাইরি খাওয়াব। আমাকে দু'—একদিন থাকতে দিবি?

বিশে হেসে বলে, থাকার জন্য স্টেশন আছে।

কালু মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক।

গাড্ডা কী?

বাড়িতে হামলা করছে শালারা।

কারা?

আছে।

রামরতন রিকশাওয়ালা চপ কিনতে এসে কালুকে দেখে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে বলে, অ্যাই শালা! তোকে নাকি শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়েছে?

কালুর মেজাজ ভালো নেই। উঠে সটাং করে এক চড় কষাল রামরতনের গালে। বলল, জল ভরে দেব শালা। গেলবারে গুপ্তর দোকানে মাল সরিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ি ঘোরোনি?

রামরতন বেশি ঘাঁটাল না। কালু একা নয়, বিশে আছে। বিশে মহা মারকুট্টা ছোকরা। স্টেশনের ভিখিরিদের দঙ্গলটা দরকার মতো বিশের পক্ষ নেয়। বিশে ওদের ভাজা বেসনের কুঁড়ো আর নিংড়ানো মুড়ি দিয়ে হাতে রাখে। তাই রামরতন গালে হাত বুলিয়ে বলল, খচছিস কেন? আমি শালা ভালো কথা বলতে গেলাম।
কালু আর বসল না। বিশেকে বলল, আমি সাঁজের পর আসব।
বিশে মাথা নাড়ে।
কালু স্টেশন রোড ধরে সোজা হাঁটা দেয়।
ঘুরে—ফিরে কোথাও যাওয়ার নেই দেখে সন্তুদের বাড়ির কাছে চলে আসে কালু। এসে দেখে নরেশবাবুদের বাড়ির সামনে জটলা হচ্ছে। দোতলা থেকে নরেশের মোটা গিন্নির চেঁচানি আসছে, সব জানি, সব জানি। ঢাক পিটিয়ে সবাইকে বলব তোমার চরিত্রের কথা।
সন্তু নীচের তলায় ছিল। কালুর এক ডাকে বেরিয়ে এসে বলল, চল। তোর সঙ্গে কথা আছে।
দুজনে সিংহীদের বাগানে ঢুকে পড়ে।
সবেদা গাছটা ন্যাড়া করে ফল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে পাড়ার ছেলেরা। সেই গাছের তলায় বসে সন্তু গম্ভীর মুখে বলে, তুই এ রকম ডে—লাইটে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?
তাতে তোর বাবার কী?
মুখ খারাপ করিস না কালু।
কালু হেসে বলে, রং লিস না সন্তু। আমি কাউকে ভয় খাই না।
সন্তু কালুর দিকে ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বলে, যখন প্যাঁদানি খাবি তখন বুঝবি।
কালু বলল, ছোড় বে।
সন্তু চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, ঠিক আছে। তোর ভালোর জন্যই বলছিলাম।
আমার ভালো নিয়ে তোর মতো ভদ্দরলোকদের ভাবতে হবে না। আগে বল কী বলতে চেয়েছিলি!
সন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে। তুই পুলিশকে গগনদার নাম বলেছিস?
আমি বলব কেন?
তবে কে বলেছে?
তার আমি কী জানি? গগনদাকে ফাঁসিয়ে আমার কী লাভ?
কিন্তু সবাই জানে তুই গগনদার নাম বলেছিস। গগনদা কাল পালিয়ে গেছে।
কালু এটা জানত না। একটু থমকে গিয়ে একগাল হেসে বলে, লাগ ভেলকি লাগ। খুব জমে গেল মাইরি।
সন্তু একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।
হঠাৎ কালু মুখ গম্ভীর করে বলল, সুরেন শালাকে আমার বাড়ি চেনাল কে বল তো?
তার আমি কী জানি!
জানিস না?
আমি জানব কী করে?
আমার বাড়িতে সুরেন গিয়ে হামলা করেছে কেন তা জানিস?
সন্তু স্পষ্টই অস্বস্তি বোধ করছিল। তবু খুব তেজের গলায় বলে, ও সব আমার জানার কথা নয়।
সুরেন আমার কাছে কী চায় তাও জানিস না?
না।
এর আগেও সুরেন আমাকে একবার মেরেছে। শালা জানে না, কালু রিকশাওয়ালা হলেও মেড়া নয়। শালার দিন ঘনিয়ে এসেছে।
ও সব আমাকে বলছিস কেন?

আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ সুরেনকে আমার বাড়ির পাত্তা লাগিয়েছে। নইলে আমার বাড়ি চেনার কথা ওর নয়।

আমি ঠিকানা দিইনি।

কালু খুব হীন চোখে সন্তুর দিকে চেয়ে বলে, কাল তুই আমাকে ছোরা চমকেছিলি, মনে আছে?

সন্তু জবাব দেয় না। অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

কালু বলে, আমি কিছু ভুলি না।

সে তোকে মারার জন্য নয়। ভয় দেখানোর জন্য!

কালু হাত বাড়িয়ে বলে, ছুরিটা দেখি।

কাছে নেই।

কালু এক্কেবারে আচমকা লাফিয়ে উঠে পটাং করে একটা লাথি লাগাল সন্তুর থুতনিতে। লাথিটা তেমন জোরালো হল না। কালুর শরীরে এখন আর তত তেজ বল নেই। সন্তু শালা ভালো খায়—দায়, গগনের কাছে ব্যায়াম শেখে। শক্ত জান, তবু আচমকা লাথি খেয়ে মুখ চেপে মাটি ধরে নিল।

কালু সময় নষ্ট করে না। পড়ে—থাকা সন্তুর প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে মালটা বের করে ফেলে। বিলিতি ছুরি, কল টিপলে ছ'ইঞ্চি ইস্পাত বেরিয়ে আসে পটাং করে।

সন্তু যখন উঠল তখন কালুর হাতে ফলাটা জমে গেছে। চকচক করছে রোদে। কালু বলল, দেখ শালা, আমার জানের পরোয়া নেই। দরকার হলে আমি লাশ ফেলব। ঠিক করে বল, সুরেনকে কে আমার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে।

দাঁত বসে গিয়ে সন্তুর ঠোঁট ফেটে হাঁ হয়ে আছে। অঝোর রক্ত। হাতের পিঠে ক্ষতস্থান মুছে নিজের রক্ত দেখল সন্তু। তারপর খুব ঠান্ডা চোখে চাইল কালুর দিকে!

কালু কখনও ছুরি চালায়নি, সন্তু জানে। এও জানে, কালুর শরীরে কিছু নেই। তবে রোখ আছে।

হিসেব করতে কয়েক পলক সময় নিল সন্তু। গগনের কাছে সে বিস্তর প্যাঁচ শিখেছে।

সন্তু কী করল তা চোখে ভালো দেখতেও পেল না কালু। কিন্তু হঠাৎ টের পেল তার ছুরির হাতটা মুচড়ে ধরে সন্তু তাকে উপুড় করে ফেলেছে। পিঠে হাঁটু চেপে বসিয়ে মাথাটা ঠুকবার তাল করছে মাটিতে।

কালুর লাগে না। মারধর সে বিস্তর খেয়েছে। প্রায়ই খায়। মুহূর্তে সে হাঁটুতে ভর দিয়ে পটাং করে শরীরটা ছুড়ে দিল উলটোবাগে। সন্তু ছিটকে গেল।

দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে ছুটে আসে পরস্পরের দিকে। কালুর হাতে আধলা ইট, সন্তুর হাতে ছুরি।

এগারো

খুব ভোরেই উঠে পড়তে হল গগনকে। ভোরে ওঠা তার অভ্যাস, তার ওপর এখন প্রবল দুশ্চিন্তা চলছে।

বাথরুমের কাজ শেষ করে এসে যখন বাসি বিছানাটা নিজেই গোচ্ছাচ্ছে, তখন ছটকুর ঘর থেকে অ্যালার্ম বাজার শব্দ এল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ছটকু ফিটফাট হয়ে এসে গগনের দরজায় টোকা মেরে ডাকে, গগ, উঠেছিস?

উঠেছি।

চল।

গগনের মন ভালো নেই। সকালে উঠে শরীর রক্ষার জন্য দৌড়ানো বা ব্যায়াম করার মতো মন এখন তার নয় তবু ছটকুর আগ্রহে যেতে হল।

বড়লোকি সব ব্যাপার। ছটকু তার ফিয়াট গাড়ি চালিয়ে ময়দানে এল। ঘড়িতে সোয়া চারটে। ভিকটোরিয়ার সামনে গাড়ি রেখে দুই বন্ধুতে ধীরলয়ে দীর্ঘ দৌড় শুরু করে। পাশাপাশি।

গগন টের পায়, ছটকু নেশাভাং যাই করুক এখনও ওর প্রচণ্ড দম। প্রায় মাইল দুই দৌড়ের পর বরং গগনের কিছু হাঁফ ধরেছে, কিন্তু ছটকু একদম ফিট।

বাড়িতে ফিরে ছটকু গগনকে নিয়ে গেল তার জিমনাশিয়ামে। ছোটর মধ্যে এত ভালো জিমনাশিয়াম গগন চোখেও দেখেনি। প্রত্যেকটা যন্ত্রপাতি ঝা—চকচকে নতুন আর দামি। বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আনা।

ছটকু বলে, এ সব পড়েই থাকে বেশির ভাগ। আমি মাঝে মাঝে খেয়াল হলে ব্যায়াম করি।

দুজনে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা নীরবে নিখুঁত ব্যায়াম করে যায়। গগন নিজে প্রশিক্ষক, কাজেই ব্যায়ামের খুঁটিনাটি সব তার জানা। কিন্তু সেও অবাক হয়ে যায় ছটকুর নিখুঁত ব্যায়াম দেখে। কোথাও কোনও খাঁকতি নেই।

ব্যায়ামের পর দুজনেই গ্লাভস পরে কিছু সময় ঘুসোঘুসি করে। ছটকু খুবই ভালো লড়ে। ওর বাঁ হাতের ছোবল বিষে ভরা। গগন দুটো ভূতুড়ে ঘুসি খেয়ে গেল ছটকুর হাতে। বলল, তুই এখনও একটি বিচ্ছু আছিস। লড়া ছেড়ে দিলি কেন?

আরে দূর! লড়ে হবে কী?

কিন্তু এখনও তোর ঘুসিতে অনেক ব্যাপার আছে।

ছটকু গ্লাভস খুলে ফেলে উদাস মুখে বলে, কী জানিস! আসলে আমার জীবনটা তো হ্যাপি নয়। চারদিকটার ওপর আমার আক্রোশ। ঘরে একটা কালো সাপ পুষছি। কেউ আমাকে বোঝে না, আমার প্রতি কারও সিমপ্যাথি নেই। সেই সব দুঃখে, রাগ, আক্রোশ সব আমার ঘুসিতে বেরোয়।

গগন বুঝতে পারে। ছটকুর জন্য তার একটু মায়াও হয়। বড়লোকেরাও দুনিয়াতে সুখে থাকে না তা হলে!

গগনের চিন্তা ভাত—কাপড় নিয়ে। অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় তার দিন ক্ষয় হয় রোজ। সে লড়াই ছটকুর নেই। তবু ভগবান ওকেও তো সুখ দেননি।

এলাহি জলখাবারের আয়োজন টেবিলে সাজানো। বেশিরভাগই ইংলিশ খানা। হ্যাম অ্যান্ড এগ, পরিজ, টোস্ট, ফল। গগন মাছ—মাংস খায় না বলে তার জন্য অনেকখানি ছানা দেওয়া হয়েছে। আর বাদামের শরবত।

গগন খুব বেশি খায় না। পেট ভার করে খাওয়া তার ভীষণ অপছন্দ। ছটকুও বেশি খেল না। সাজানো খাবারের অধিকাংশই পড়ে রইল।

ছটকু তার পাইপ ধরিয়ে বলে, তুই তো জুডো শিখেছিলি, না?

হ্যাঁ।

আমিও শিখেছিলাম লন্ডনে।

জানি।

জুডো শেখার সময় যে শপথ করানো হয়, তা মনে অছে গগ?

আছে।

ছটকু হেসে বলে, নিতান্ত আত্মরক্ষার খাতিরে ছাড়া কাউকে আঘাত করা যাবে না।

জানি।

আমার সে নিয়মটা প্রায়ই ভাঙতে ইচ্ছে করে। বুঝলি! আজকাল মাঝে মাঝে আমার মাথা ভিসুভিয়াস হয়ে যায়।

গগন ব্যাপারটা বুঝল না। চুপ করে রইল।

সামু খাবার টেবিল পরিষ্কার করছে। আর একজন উর্দি পরা লোক কফির ট্রে নিয়ে এল।

গগন কফি বা চা খায় না। ছটকু কালো কফি ঢেলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বলে, কাল রাতে আই হ্যাড অ্যানাদার এনকাউন্টার উইথ হার।

গগন চোখ নামিয়ে নেয়। ছটকু এবং তার বউয়ের প্রসঙ্গটা বড় অপ্রীতিকর বলে তার মনে হয়। সে লক্ষ করেছে সকালে জলখাবারের টেবিলে ছটকুর বউ লীনা আসেনি। কিন্তু ভদ্রতায় বলে, আসা উচিত ছিল। তবে গগন নিজেকে খুব সামান্য মানুষ বলে মনে করে, তাই তার প্রতি কেউ তেমন সৌজন্য না দেখালেও সে কিছু মনে করে না।

কিন্তু ছটকুর বোধহয় ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। কফি আর পাইপে কিছুক্ষণ ডুবে থেকে সে হঠাৎ বলল, দুনিয়ার কাউকেই ও মানুষ বলে মনে করে না। কাল রাতে আই হ্যাড টু বিট হার।

গগন ব্যথিত হয়ে মুখ তোলে। বলে, সে কী রে! মারলি?

মারতে হল। প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি। আই অ্যাম এ ফলেন গায়।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে, আফটার অল মেয়েমানুষ তো!

তুই মেয়েমানুষ চিনিস না গগ। চিনলে অত দয়া হত না তোর। মেয়েমানুষকে যারা অবলা বলে তারা অনভিজ্ঞ। ওদের মতো এত নিষ্ঠুর আর নেই।

গগন রাত্রিবেলা কোনও সাড়াশব্দ পায়নি। তার ঘুম চটকা। তার ওপর গতকাল সে ভালো ঘুমোয়নি। তবে কি ছটকুর ঘরটাও সাউন্ড—প্রুফ করা? কিন্তু তা হলে সকালে অ্যালার্মের আওয়াজ এল কী করে?

ছটকু অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল, কিন্তু মেরেও লাভ হয় না। লীনা যেমন—কে—তেমনই থেকে যায়। তেমনি কোল্ড—ব্লাডেড, ক্রুয়েল, সেলফিশ, অ্যামবিশাস।

সামু সবই শুনছে। গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, চল। অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো ছাড়া এখন আমার আর পথ নেই।

ছটকুর ফিয়াট গাড়িটা যখন প্রকাশ্য দিনের আলোয় পাড়ায় ঢুকছে তখন গগনের বুকটা একটু বেশি ধকধক করছিল। গলা শুকিয়ে গেছে।

ছটকু গগনের গ্যারাজ—ঘরের সামনেই গাড়িটা দাঁড় করাল। স্টিয়ারিঙে হাত রেখে গগনের দিকে ফিরে একটু হেসে বলল, দ্যাখ গগ, তুই আর আমি একসঙ্গে বিশটা লোকের মহড়া নিতে পারি। সুতরাং ঘাবড়াবি না। আমার মনে হয় না কেউ তোকে খামোখা ধরপাকড় করতে আসবে।

গগন গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল, তা নয়। তবে আমার লজ্জা করছে। তুই এখানে এলি কেন?

এখান থেকেই কাজ শুরু করব বলে।

বেরোবার আগে ছটকু অনেকক্ষণ টেলিফোনে যাদবপুর থানার অফিসার—ইন—চার্জের সঙ্গে কথা বলেছে। নিজেদের প্রতিষ্ঠার জোরে ছটকু থানা—পুলিশের খাতির পায়। সকলের সঙ্গেই ভালো ভাবসাব।

টেলিফোনে কী কথা হয়েছে তা গগন শোনেনি। কথা বলার পর ছটকু তাকে সংক্ষেপে জানিয়েছে, যাদবপুর থানা থেকে যেটুকু জানবার জেনে গেছি। এখন তোর কোনও ভয় নেই।

গগনের তবু ভয় যায় না।

বেলা বেশি হয়নি। দশটা বোধহয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ চার দিক পোড়াচ্ছে। ছোট্ট গাড়িটা এর মধ্যেই তেতে ভ্যাপসা হয়ে গেছে।

গগনকে একটা রোদ—চশমা ধার দিয়েছে ছটকু। নিজেও একটা পরেছে। ছদ্মবেশ খুবই সামান্য। তবু হয়তো লোকের চোখ থেকে কিছুটা আড়াল করা যাবে নিজেকে।

নরেশের বাড়ির ওপরতলা থেকে শোভার প্রচণ্ড গলার শব্দ আসছে। বোধহয় সে নরেশেরই শ্রাদ্ধ করছিল, মায়ের পেটের বোন না হাতি! ঢ্যামনা কোথাকার! কার হুকুমে তুমি ওকে কোলে করে এনে এ বাড়িতে তুলেছ? বাড়ি আমার নামে।

জবাবে একজন পুরুষ বোধহয় কিছু বলল।

শোভার গলা তুঙ্গে উঠে যায়, বেশ করেছি তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি। একশোবার দেব। নির্দোষ লোকের নামে খুনের নালিশ করেছ, তোমার নরক হবে না!... হ্যাঁ হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার ভাব আছে তো আছে... তোমার ভাব নেই কারও সঙ্গে? ঢলানি মাগিটার সঙ্গে তো লোককে দেখিয়েই শোয়া—বসা করো!

গাড়িটা লক করতে করতে ছটকু মৃদু হেসে চাপা গলায় বলল, আন্যাদার লীনা।

দু'—চারজন লোক তাদের লক্ষ করছিল। আশপাশের জানলা দিয়ে প্রচুর উঁকিঝুঁকিও টের পায় গগন।

ছটকুর তাড়াহুড়ো নেই। ধীরেসুস্থে সে চার দিকে তাকিয়ে দেখে। পাইপ ধরায়। তারপর বলে, চল।

কোথায়?

নরেশের ঘরে। বেগমকে একটু ক্রস করা দরকার।

বেগম? সে এখানে থাকে না।—গগন বলে।

এখন আছে, চল।

গগনের বুক অসম্ভব কেঁপে ওঠে। পিছোনোর উপায় নেই। তবু বলল, তুই যা, আমি অপেক্ষা করি।

ছটকু ভ্রূ কুঁচকে বলে, তাতে লাভ হবে না। বেগমের সামনে তোর প্রেজেন্স খুব দরকার। নইলে ও শকড হবে না। বেগমের লেখা সেই চিরকুটটা কি হারিয়ে ফেলেছিস?

গগন মনে করতে পারল না। বলল, কোথায় রেখেছি কে জানে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছটকু বলল, এমন কিছু এসেনশিয়াল নয়। তুই পিছনে আয়, আমি আগে উঠছি।

দোতলায় নরেশের বৈঠকখানার দরজা খোলাই রয়েছে। ভিতরের কোনও ঘর থেকে শোভার গলা আসছে, সবাইকে বলব ফলির আসল বাপ তুমি। ওই নষ্ট মেয়েটার সঙ্গে তোমার শোয়া—বসা।

ছটকু খুব হাসছে শুনে।

দু'বার কলিংবেল বাজানো সত্ত্বেও কেউ এল না। তিনবারের বার ঝি এসে খোটকা মুখ করে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, কী চাইছ?

ছটকু রোদ—চশমাটা এতক্ষণ খোলেনি। এবার খুলল। মুখটা ভয়ংকর গম্ভীর। চোখে ভীষণ ভ্রুকুটি। ছটকুর চোখ খুবই মারাত্মক। যখন রেগে যায় তখন তার দিকে তাকাতে হলে শক্ত কলজে চাই।

ঠান্ডা গলাতেই ছটকু নির্দ্বিধায় বলল, তোমার বাপকে চাইছি।

ঝিটা কেমনধারা হয়ে গেল। চোখেমুখে, স্পষ্টই ভয়। কথা বলল না, কিন্তু শুকনো মুখে চেয়ে রইল।

ছটকু প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বলল, যাও, গিয়ে নরেশবাবুকে ডেকে দাও।

ঝি চলে গেল। ছটকু নিঃসংকোচে বৈঠকখানায় ঢুকে একটা কৌচে গা এলিয়ে বসে গগনকে ডাকল, আয় গগ।

গগন খুব সংকোচের সঙ্গে ঢুকল, যেন বাঘের ডেরায় ঢুকছে। গরমে এমনিতেই তার ঘাম হচ্ছিল। এখন হঠাৎ তার সারা গায়ে ফোয়ারার মতো ঘামের স্রোত নামছে। পোশাক ভিজে যাচ্ছে, চোখে জিভে নোনতা জল ঢুকছে।

অনেকক্ষণ বাদে নরেশ এল। ভিতরে শোভার চেঁচামেচি একটু থেমেছে। গলার স্বর শোনা যাচ্ছে এখনও, তবে বকবকানির।

নরেশের পরনের লুঙ্গিটা উঁচু করে কোমরে গোঁজা। হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খালি গা, চোখ লাল, চুল উসকোখুসকো, যেন এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরেছে।

ঘরে ঢুকেই নরেশ আচমকা যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে লাফিয়ে উঠল। বিস্ময়ে বোবা। চোখ পটপটাং করে খুলে অবিশ্বাসে তাকিয়ে আছে।

ছটকু উঠে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বিনা ভূমিকায় নরেশের বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরটা লোহার হাতে চেপে ধরে বলল, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। বসুন।

ছটকুর কণ্ঠস্বরে কিছু ভদ্রতা থাকলেও আচরণে নেই। সে নরেশকে ধীরে টেনে এনে একটা সোফায় বসিয়ে দিল।

নরেশ ঝেঁঝে উঠে বলল, হাত ধরছেন কেন?

ছটকু হেসে বলে, লাগল বুঝি?

নরেশ সে কথার জবাব না দিয়ে ছটকুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এ সব কী ব্যাপার?

প্রশ্নটা গগনকে করা। নরেশ ছটকুকে চেনে না।

গগন জবাব দেয় না।

ছটকু কৌচে এলিয়ে বসে পাইপ টানতে টানতে বলে, নরেশবাবু, গগনকে অ্যারেস্ট করতে আপনি পুলিশ ডেকেছিলেন?

নরেশ হঠাৎ বিকট গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, একশোবার ডাকব, শালার গুন্ডার দল! ভেবেছ কী তোমরা? বাড়িতে ঢুকে গায়ের জোর দেখানো হচ্ছে? অ্যাঁ?

বলতে বলতে আচমকাই নরেশ বে—হেড হয়ে লাফিয়ে উঠে একটা জয়পুরি ফুলদানি তুলে তেড়ে এল গগনের দিকে, গুন্ডামির আর জায়গা পাওনি?

ছটকু হাত বাড়িয়ে নরেশের হাত টেনে ধরল এবং নিছক একটি ঝাঁকুনিতে তাকে নিস্তেজ করে আবার সোফায় বসিয়ে দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, মেইনলি আমরা বেগমের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, আপনার সঙ্গে নয়। তবে আপনাকেও দু—একটা জরুরি কথা বলা দরকার। সেটা পরেও হতে পারবে। এখন বেগমকে ডেকে দিন।

নরেশ যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। ভয়ংকর রাগী চোখে সে ছটকুকে দেখল, তারপর বলল, বেগমের সঙ্গে দেখা হবে না, আপনারা বেরিয়ে যান।

ছটকু পায়ের ওপর পা তুলে বসে বলে, বেয়াদপির সময় এটা নয়। গগন আমার বন্ধু। তাকে আপনি না—হক হ্যারাস করেছেন, পেছনে পুলিশ লাগিয়েছেন। আমি আপনার সঙ্গে রসের কথা বলতে আসিনি। বেশি ত্যাঁদড়ামি করলে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে যাব মেরে।

ছটকুর এই গলার স্বর গগনও চেনে না। খুবই ঠান্ডা গলা, কিন্তু তাতে ইস্পাতের মিশেল। যে শোনে সে জানে ছটকু প্রত্যেকটা কথাই মেপে বলছে। একটুও ভয় দেখাচ্ছে না। কিন্তু যা বলছে তা—ই করবে।

নরেশ এবার চোখ নামিয়ে বলল, বেগম ঘুমোচ্ছে।

ছটকু কিছু অধৈর্যের সঙ্গে বলল, তাকে তুলে দিন।

সে অসুস্থ। তার ছেলে মারা গেছে।

সেটা আমিরা জানি। তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে। ভিতরের দরজার পরদা সরিয়ে হঠাৎ শোভা ভিতরে আসে। তার চেহারাটা বড় কিম্ভূত দেখাচ্ছে। চুলগুলো পাগলির মতো উড়োখুড়ো, মুখ ফুলে রাবণের মা, চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি।

গগনের দিকে চেয়ে বলল, আবার এসেছেন? ভালো চান তো পালান। নইলে ওই বদমাশ আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। জানেন না তো, ওর এখন পুত্রশোক।

নরেশ উঠে শোভার দিকে তেড়ে যায়। গগন আটকানোর জন্য উঠতে যাচ্ছিল। ছটকু হাত বাড়িয়ে ইশারা করায় থেমে গেল।

নরেশ তেড়ে গিয়ে শোভাকে মারল না বটে, কিন্তু জাপটে ধরে হিঁচড়ে ভিতরে নিয়ে গেল। দরজাটা সপাটে বন্ধ হয়ে ছিটকিনি পড়ল ভিতর থেকে।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে, ছটকু চল।

ছটকু না—নড়ে বলে, দাঁড়া।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অল্প বাদেই অন্য এটি দরজার পরদার আড়ালে একটা ফোঁপানির শব্দ উঠল, হিক্কা তোলার আওয়াজ। তীব্র হতাশার গলায় কোনও মহিলা বলে উঠলেন, সব গেল রে....!

ঠিক তারপরেই পরদা সরিয়ে খানিকটা টলমলে পায়ে বেগম ঘরে ঢোকে। খুবই করুণ তার চেহারা। সুন্দরী বেগমকে কে যেন চোখের জল আর শোকের শুষ্কতা দিয়ে চটকে মেরেছে। সব রূপটুকু ধুয়ে তার চেহারায় বয়সের ভাঁটা ফুটে উঠেছে এখন।

বেগম তার দু'খানা বিভ্রান্ত চোখে গগনকে চেয়ে দেখল। যেন অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বলল, আমার ফলি কোথায় গেল?

ছটকু খুব নরম গলায় বলে, আপনি বসুন।

গভীর দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে—যাওয়া গলায় বেগম বলে ওঠে, হা ভগবান!

তারপর নিজের অজান্তেই বুঝি সোফায় বসে পড়ে বেগম। চোখ বুজে থাকে। চোখের পাতা ভিজিয়ে জলের ধারা নেমে আসে অঝোরে। দাঁতে দাঁত চেপে থাকে বেগম, শুধু থরথর করে তার রক্তহীন সাদা ঠোঁট কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ছটকু বলে, ফলির মৃত্যুতে গগনের কোনও হাত ছিল না, বিশ্বাস করুন।

বেগম তার রক্তবর্ণ চোখে চাইল। প্রথমে কিছু বলল না। সামলাতে সময় নিল।

কিন্তু সামলে নিলেও সে। আঁচলে চোখ মুছল। অনেকক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থেকে বলল, সেদিন...... কবে যেন?

গগন বলল, পরশু।

বেগম গগনের দিকে স্থির চোখে চায়। তারপর একটু শিউরে উঠে বলে, সেদিন ফলি সন্ধের পর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওর ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছিল। বলল, গগনদা আমাকে মেরেছে। আপনি কি ওকে সত্যিই মেরেছিলেন?

গগন চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ। নইলে ও আমাকে মারত। ওর হাতে পিস্তল ছিল।

বেগম ঝুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলে, জানি। ওর কাছে পিস্তল থাকত। ইদানীং ও খুব বিপদের জীবন কাটাত। আমি ওকে মানুষ করতে পারিনি, সে পাপের শাস্তি পেলাম গগনবাবু।

ছটকু নরম স্বরে বলে, কিন্তু ফলির মৃত্যুর পেছনকার ঘটনাটা আমাদের দরকার।

বেগম মাথা নাড়ে, বুঝেছে।

মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলে, ফলি গগনবাবুকে মারবার জন্য প্ল্যান করেছিল। মারা মানে খুন নয়। উলটে ও নিজেই মার খায়। সন্ধেবেলা যখন আমার কাছে এল তখন ভীষণ ফুঁসছে, ও রকম রেগে যেতে ওকে আর কখনও দেখিনি।

ছটকু হঠাৎ বলে ওঠে, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেনি সেদিন?

বেগম মুখটা নামিয়ে রেখেই বলল, হ্যাঁ। শুধু ঝগড়া নয়, আমাকেও ও মারে।

গগন অবাক হয়ে বলে, মেরেছে?

আমার ওপর ওর ভয়ংকর রাগ ছিল। যতটা ভালোবাসত ততটাই ঘেন্না করত আমাকে। আমার সম্পর্কে ওর কানে কে যেন কিছু খারাপ গালগল্প বলে বিষ ঢেলেছে, সেই দিন ও আমার জবাবদিহি চায়, আমি ওকে যত শান্ত করতে চাই, ও তত রেগে ওঠে। অবশেষে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দেয়, চড়—চাপড় মারে, গালাগাল করতে থাকে। হয়তো আরও মারত, পাড়ার লোক এসে ঠেকায়। তখন ও কার ওপর যেন শোধ নেবে বলে শাসিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি তখন এত দিশেহারা যে ওকে আটকাতে পারিনি। পারলে—

ছটকু জিজ্ঞেস করে, ঝগড়া ছাড়া আপনাদের মধ্যে আর কোনও কথাবার্তা হয়নি?

না। সেদিন গগনবাবুর কাছে মার খেয়ে ফলি রাগে বেহেড হয়ে যায়। কেবল গগনবাবুর নামই করছিল। সেই থেকেই আমার সন্দেহ হতে থাকে—

ছটকু জিজ্ঞেস করে, ঝগড়া ছাড়া আপনাদের মধ্যে আর কোনও কথাবার্তা হয়নি?

ছটকু মাথা নেড়ে বলে, ভুল সন্দেহ বেগম দেবী।

বেগম ছটকুর দিকে স্থির—চোখে চেয়ে থাকে। দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, তা হলে ফলিকে কে মেরেছে?

সেটা অনুমানের ব্যাপার।

ছটকু গম্ভীর মুখে বলে। তারপর পাইপ ধরায়।

অনুমানটা কী?

তার আগে বলুন এ পাড়ায় ফলি আর কার কার কাছে যেত?

আমি তা জানি না। আমার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হত না। তবে শুনেছি আমার জামাইবাবুর কাছ থেকে সে মাঝে মাঝে ধার করে টাকা নিত। কিন্তু বাড়িতে আসত না। গদিতে গিয়ে দেখা করত।

আর কেউ?

বেগম ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। তারপর বলে, না, আর কারও নাম কখনও বলেনি।

আচমকা ছটকু প্রশ্ন করে, আপনার স্বামী কোথায়? তিনি আসেননি?

বেগম অবাক হয়ে বলে, স্বামী? তিনি তো কাজে... মানে বাইরে গেছেন।

তিনি ফলির মৃত্যু—সংবাদ জানেন?

শুনেছেন।

বাইরে কোথায় গেছেন?

বলে যাননি।

তাঁর কলেজের ঠিকানাটা দিতে পারেন?

বেগম একটু গম্ভীর মুখে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, তাঁকে এর মধ্যে না জড়ানোই ভালো। ওর শরীর খারাপ, তার ওপর এই ঘটনা।

ছটকু উঠে পড়ে। বলে, আপনার এই শোকে কিছু বলার নেই। শুধু অনুরোধ, গগনকে খামোকা ঝামেলায় জড়াবেন না। গগন ফলিকে মেরেছিল বটে, কিন্তু সে আত্মরক্ষার জন্য। ও খুনে নয়।

বেগম একবার গগনের দিকে তাকাল। কবে সেই ভালোবাসা মরে গেছে। এখন আছে শুধু কিছু সন্দেহ আর আক্রোশ।

তবু গগন বেগমের চোখে চোখ রেখে কিছু খুঁজল কি?

বারো

মধ্য কলকাতার বিশাল কলেজবাড়ির ভিতরে ফলির বাবা মহেন্দ্রবাবুকে খুঁজে বের করতে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ আর খোঁজখবর করতে হল।

অবশেষে ল্যাবরেটরি থেকে বেয়ারা প্রায় ধরে আনল অ্যাপ্রন পরা বুড়ো মানুষটিকে।

বাঁ চোখের চশমার কাচ ফাটা, মুখে ক'দিনের বিজবিজে সাদা কাঁচা দাড়ি, মোটা গোঁফ ঠোঁট ঢেকে রেখেছে। ক্ষয়া ছোট চেহারা। চোখে সন্দেহের বা কৌতূহলের দৃষ্টি নেই। একটু ভিতু ভাব। পুত্রশোক অবশ্যই তাঁকে স্পর্শ করেনি। নিজেই প্রশ্ন করলেন, আপনারা আমাকে কেন খুঁজছেন?

এঁকে চেনেন?—বলে ছটকু গগনকে দেখিয়ে দেয়।

মহেন্দ্র গগনকে খুব ঠাহর করে দেখে বলেন, দেখেছি। ফলিকে ব্যায়াম শেখাত।

ফলি মারা গেছে, জানেন?

জানি।—মহেন্দ্রর চোখে—মুখে অস্বস্তি।

আমরা ফলির বিষয় কিছু জানতে চাই।

জানার কিছু নেই। অতি বখাটে ছেলে ছিল। মরেছে, তা সে নিজেরই দোষে।

শেষ কবে আপনার ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

মহেন্দ্র ভেবে—টেবে বলেন, কবে যেন! পরশুই হবে।

কোনও কথা হয়নি?

যত দূর মনে পড়ে, ও রেগেমেগে বাড়িতে এসেছিল। কোনও দিনই আমার সঙ্গে বনে না। ওর সঙ্গেও না, ওর মায়ের সঙ্গেও না। আমরা একটা অদ্ভুত পরিবার।

কোনও কথা হয়নি?

তেমন কিছু নয়। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ফলি আমার ছেলে কি না তাও আমি জানি না। ওর মায়ের চরিত্র ভালো নয়।

করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। আশেপাশে বহু ছেলে—ছোকরার যাতায়াত। কেউ হয়তো কথাটা শুনে ফেলতে পারে ভেবে গগন বরং সিঁটিয়ে গেল। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু বেশ স্বাভাবিক গলাতেই বলেন, তাই ও ছেলের জন্য আমার তেমন দুঃখ নেই।

ছটকু হতাশ হয় না। আস্তে করে বলে, কিন্তু আমার এই বন্ধুকে ফলির মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হচ্ছে। এ নির্দোষ।

মহেন্দ্র ফাটা কাচের চশমা দিয়ে গগনের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব নির্দোষ কি?

ছটকু দৃঢ়স্বরে বলল, অন্তত খুনের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই।

তা হবে। সে সব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই!—মহেন্দ্র বললেন।

সংসারে বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যর্থতা আর মূল্যহীনতায় ভুগে ভুগে মহেন্দ্র এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছেন যে, আর কোনও ঘটনাকেই তেমন আমল দেন না। তাঁর মন এখন শক্ত হয়ে গেছে। দুনিয়ায় আর কারও কাছ থেকেই কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই।

ছটকু বলল, আমরা আপনার সাহায্য চাই, করবেন?

মহেন্দ্র একটু হাসলেন। সামনের চার—পাঁচটা দাঁত নেই। হাসিটা ভৌতিক এবং শ্লেষে ভরা। বললেন, আমার কিছু করার নেই। ফলির মা শাস্তি পাচ্ছে, একমাত্র সেটাই সান্ত্বনা! প্রায়শ্চিত্ত যে এখনও করতে হয়, চন্দ্র—সূর্য যে বৃথা ওঠে না, সেটা জেনে বড় ভালো লাগছে।

ছটকু মহেন্দ্রবাবুর কাঁধ হাত বাড়িয়ে ধরে খুব নরম স্বরে বলে, আপনার স্ত্রী সম্পর্কে সবই আমরা জানি। দরকার হলে আমার এই বন্ধু সাক্ষ্য দেবে, আপনার স্ত্রীর চরিত্র ভালো নয়।

মানুষের দুর্বলতা কোথায় কোন সুপ্ত মনের কোণে থাকে কে জানে! কিন্তু ছটকু ঠিক জায়গায় খোঁচাটা মেরেছে। মহেন্দ্রর চোখ হঠাৎ উৎসাহে চিকমিকিয়ে ওঠে। দু'পা হেঁটে মহেন্দ্র বলে, এখানে নয়। চলুন, একটা ঘর আছে।

ল্যাবরেটরির পাশেই একটা ছোট বসবার ঘর। সেখানে অনেক ক'টা কাঠের চেয়ার পড়ে আছে। তাতে ধুলোর আস্তরণ।

মহেন্দ্র গোটাতিনেক চেয়ার একটা ঝাড়নে পরিষ্কার করলেন। সবাই বসলে মহেন্দ্র বললেন, বেগমকে আমি জানি। তাকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করি! তবে আমি শরীরের দিক থেকে খুব পটু ছিলাম না। বেগম বদমাইশি শুরু করল বিয়ের দু'—তিন বছরের মধ্যে। সবই টের পেতাম, তবে তাকে রেড—হ্যান্ডেড ধরতে পারিনি কখনও।

চেষ্টা করেছিলেন?—ছটকু স্বাভাবিক কৌতূহল দেখায় যেন।

না। ভয় করত। মনে হত, রেড—হ্যান্ডেড ধরলে মুখোমুখি ওর লাভারের সঙ্গে লড়াই লেগে যেতে পারে। তা ছাড়া চক্ষুলজ্জা।

অথচ ধরতে চান?

খুব চাই। কিন্তু ধরলেই বা কী করব? থানা—পুলিশ আদালতে যেতে পারব না। তা হলে লোকলজ্জা। নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারব না। কারণ শক্তি নেই। এমনকী দুটো কথা যে শোনাব, তাও বেগমের সঙ্গে গলার জোরে পেরে উঠব না। তাই ধরতে চাইলেও সেটা চাওয়াই থেকে যাবে।

এতকাল ধরে ব্যাপারটা সহ্য করলেন কী করে?

মানুষ সব পারে, পারতে হয়।

স্ত্রীকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে চান না?

মহেন্দ্র হেসে বললেন, শাস্তি ভগবান দিচ্ছেন।

ভগবানের দেওয়া শাস্তিতে কি মানুষের মন ভরে?

আমার মতো দুর্বলের সেইটেই একমাত্র ভরসা।

ছটকু হেসে ফেলে। তারপর পাইপ ধরিয়ে বলে, মহেন্দ্রবাবু, আমি নিজে ভালো বক্সার। গায়ের জোরে এখনও যে—কোনও পালোয়ানের সঙ্গে পাল্লা টানতে পারি। কিন্তু নিজের বউয়ের সঙ্গে আমি আজও এঁটে উঠতে পারিনি। আমি আপনার মতোই দুর্বল। কিন্তু সেটা মনের দুর্বলতা, শরীরের নয়। কাজেই আপনি শরীরের দিক দিয়ে দুর্বল বলেই নিজেকে দুর্বল ভাববেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে গায়ের জোরের অভাবে প্রকৃত সাহসীদের কেউ দুর্বল ভাবেনি।

মহেন্দ্র যেন বহুকাল পর এক ভরসার কথা পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, কথাটা খুব ঠিক। আমার মনের জোর কম নেই। কিন্তু বেগমের মতো মেয়েছেলের সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানেই ফালতু ঝামেলায় জড়ানো। নিজেকে ছোট করতে ইচ্ছে হয়নি।

কিন্তু বরাবর নিজেকে ছোট ভেবেছেন!

মহেন্দ্র প্রসন্ন হেসেই বললেন, কী করা ঠিক হত বলুন তো।

চাবকানো।—পাইপে টান দিয়ে ধীরস্বরে ছটকু বলে।

ওটা পারতাম না।

এবার পারবেন।

মহেন্দ্র গগনের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কি সাক্ষী দেবেন?

গগনের কান—মুখ গরম হয়ে ওঠে। সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছটকুর সব বেহায়া কাণ্ড!

ছটকুই বলে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এই গগনের ফিজিকাল রিলেশন ছিল।

গগন ভেবেছিল মহেন্দ্র এ কথা শুনে ফেটে পড়বে।

কিন্তু তার বদলে মহেন্দ্র চেয়ার আর—একটু কাছে টেনে এনে বিগলিতভাবে বললেন, তা হলে এই প্রথম আমি একটা প্রমাণ পাচ্ছি। একটু বলুন তো এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা!

গগন লজ্জা ভুলে ভীষণ অবাক হয়।

ছটকু সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে বলে, ও কী বলবে? ওর তো দায়িত্ব ছিল না। চেহারাটা ভালো বলে আপনার স্ত্রীই ওকে পিক—আপ করে।

মহেন্দ্র গগনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, চেহারাটা ভালো। আপনারা দুজনেই ব্যায়াম করেন, না।

করি।—ছটকু জবাব দেয়।

আমারও খুব শখ ছিল। হয়নি। অল্প বয়সেই সংসারে ঢুকে গেলাম। আমার স্ত্রী কী রকম করত আপনার সঙ্গে?—গগনকে জিজ্ঞেস করেন মহেন্দ্র।

ছটকু গগনকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, বল না।

গগন টের পায়, মহেন্দ্র খুবই কুৎসিত মনোরোগে ভুগছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেহ—সম্বন্ধ নেই, ঘৃণা আর রাগের সম্পর্ক। কিন্তু স্ত্রীর কাছে তাঁর অবদমিত শারীরিক ক্ষুধা মেটেনি বলেই তা আজ বিকৃতভাবে তৃপ্তি খুঁজছে, স্ত্রীর প্রেমিকের কাছ থেকে তিনি সেই কেচ্ছা—কেলেঙ্কারির বিবরণ চান।

ছটকু আবার ঠেলা দিয়ে চোখের ইশারা করে বলে, বল না।

মহেন্দ্রও বলে ওঠেন, ও কি খুবই কামুক? বাঘিনীর মতো?

গগন অস্পষ্ট স্বরে বলে, হ্যাঁ।

কামড়ে দিত আপনাকে? মারত?

হ্যাঁ।

ছটকু বাধা দিয়ে বলে, আর সব পরে শুনবেন মহেন্দ্রবাবু, আগে কাজের কথাটা হয়ে যাক। সেদিন ফলির সঙ্গে আপনার কী কথা হয়?

মহেন্দ্রকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তবে সে উত্তেজনা আনন্দের। চোখ চকচক করছে, মুখটা উজ্জ্বল, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। উঠে গিয়ে ঘরের পাখাটা চালু করলেন। চারিদিকে ধুলো উড়তে লাগল বাতাসে।

মহেন্দ্র মুখোমুখি বসে বললেন, ফলি কোনও দিনই আমাকে পাত্তা দিত না। বুঝতেই পারছেন, মা যদি সম্মান না করে তার ছেলেমেয়েরাও কোনও দিন বাবাকে সম্মান করতে শেখে না। বেগম কোনও দিন আমাকে মানুষ বলেই মনে করেনি কিনা। তবে ফলি যখন খুব ছোট ছিল, তখন কিন্তু আমাকে ভীষণ ভালোবাসত।

আপনি কী বরাবরই জানতেন যে, ফলি আপনার ছেলে নয়?

মহেন্দ্র ফাটা কাচের ভিতর দিয়ে ভৌতিক দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, ওই একটা বিষয়ে আমি আজও ডেফিনিট নই। ফলি যখন জন্মায় তখনও ওর মা'র সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক ছিল। কাজেই কী করে বলি ও আমারই ছেলে নয়? তবে ওর চেহারা স্বভাব কিছুই আমার মতো ছিল না।

তারপর?

বিয়ের চার—পাঁচ বছর পর ফলি জন্মায়। তখন বেগম খুব বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে। আমি তখন ঝিমিয়ে গেছি। স্বামী—স্ত্রীর সম্পর্ক তখন খুব খারাপ। ফলি সে সময়ে জন্মায়। তার আগে অবশ্য আমি গোপনে ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, সন্তানের বাপ হওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। তাই ফলি জন্মানোর পর আমি তাকে নিজের ছেলে মনে করে খুব ভালোবাসতাম। পরে ও বড় হলে বেগম ওর মন বিষাক্ত করে দেয়। কিন্তু তার ফলে বেগমেরও কিছু লাভ হয়নি। ফলি ওকেও দেখতে পারত না। এক ছাদের তলায় আমরা তিন শত্রু বসবাস করতাম।

ফলির সঙ্গে আপনার ঝগড়া হত?

না, কারও সঙ্গেই আমার মুখোমুখি ঝগড়া ছিল না। তবে মানুষ মানুষকে অপছন্দ করলে সেটা মুখে বলার দরকার হয় না, এমনিতেই বোঝা যায়।

তা ঠিক।

তবে ফলির সঙ্গে আমার কখনো—সখনো কথা হত। ওর গর্ভধরিণীর সঙ্গে হতই না।

সেদিন কী কথা হল?

আমি সন্ধের বেশ কিছু পরে বাড়ি ফিরে দেখি, বাড়িতে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, চেঁচামেচি চলছে। পাড়া—প্রতিবেশীর কাছেই শুনলাম ফলি তার মাকে খুব মেরেছে। শুনে ভারী আনন্দ হল। এর আগেও ফলি কয়েক বার ওর মাকে মারধর করেছে। বড় হয়ে মায়ের গুণের কথা শুনেছে তো! ছেলে হয়ে মায়ের বদমাইশি সহ্য করে কী করে? সে যাই হোক, গোলমাল দেখে আমি আর বাড়ির মধ্যে না ঢুকে বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছু বাদে দেখি ফলি খুব জোরে হেঁটে আসছে। ওর মুখ—চোখ

খুনির মতো। কী যেন হল আমার, ওকে ডাকলাম। ও থমকে দাঁড়াল। প্রথমে ভাবলাম, বুঝি আমাকেও মারে। কিন্তু ও সব করল না। খুব ঠান্ডা গলায় বলল, নিজের বউকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারো না? আমি তার জবাব দিলাম না। মনে মনে জানি, আমাকে মারতে হবে না। মা—ব্যাটায় নিজেরাই খেয়োখেয়ি করে মরবে একদিন! যাক গে, ফলি আমাকে বলল, সিংহীদের বাগানে আমার সঙ্গে রাত আটটা নাগাদ দেখা কোরো! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। তবে রাত আটটার অনেক আগে।

বলে মহেন্দ্র ফাটা কাচের ভিতর দিয়ে নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর সেই দৃষ্টি এমনিতে যতই নির্বিকার মনে হোক, ছটকু টের পেল মহেন্দ্র কিছু একটা বলতে চান। তাই সে নরম স্বরে বলল, কী দেখলেন সেখানে?

ফলির সঙ্গে দেখা হয়নি। একটু আগে আগে পৌঁছে ভাবলাম, জায়গাটা ঘুরে দেখি। বুড়ো সিংহীর অনেক টাকা ছিল। কৃপণ লোক ছিলেন। আমার ধারণা, সিংহীবাড়ির কোনও গুপ্ত জায়গায় বিস্তর লুকোনো টাকাকড়ি বা সোনাদানা আছে। আমার আবার ছেলেবেলা থেকেই গুপ্তধনের শখ। একটা টর্চ ছিল। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ঘরের দরজায় তালা ছিল। তবে একটা জানলার পাল্লা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি সেই পাল্লা খুলে দেখি, লোহার গরাদের একটা শিক ভাঙা। ঢোকা যায় দেখে ঢুকেই পড়লাম। ঘরে ঢুকে দেখি, ধুলোটুলো কিছু নেই। বেশ পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন ঘরদোর। এদিক—ওদিকে ঘুরে একটা ভিতর দিকের ঘরে গিয়ে দেখি, খাটিয়ায় বিছানা পাতা রয়েছে। শতরঞ্চি, মোমবাতি, তাস, সিগারেটের অনেক প্যাকেট আর খালি মদের বোতল। দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই গুন্ডা—বদমাশের আস্তানা। ভয় খেয়েও অবশ্য পালাইনি, ভালো করে চারধারের সবকিছু দেখে নিচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ বাইরে কোথায় চাপা গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে দোতলার সিঁড়ির তলায় গা—ঢাকা দিই। বেশিক্ষণ নয়, একটু বাদেই ফলি আর কয়েকজন লোকের গলা পেলাম। খুব ঝগড়ার গলায় কথা হচ্ছিল। ফলি চিরকালের ডাকাবুকো। শুনলাম সে বলছে, গগনকে আজই খতম করব। তারপর তোদেরও ব্যবস্থা হবে। আমি তাদের কাউকেই দেখতে পাইনি। শুধু গলা শুনেছি।

কোনও স্বর চেনা মনে হয়নি?

না। ফলির গলা ছাড়া আর কারও গলা চিনতে পারিনি। তবে একজনের গলা খুব মোটা। যেন মাইক লাগিয়ে কথা বলছে। সে ফলিকে বলল, গগন তোর মা'র সঙ্গে লটগট করেছে, তাতে আমাদের কী? আমরা খুনখারাবির মধ্যে নেই। একজন বুড়ো মানুষের গলাও পেয়েছিলাম বলে মনে হয়। তবে সে যে কী বলেছিল তা ধরতে পারিনি।

আর কিছু?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন, না, কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা বেরিয়ে গেল। তারপর আমি আর সেখানে থাকবার সাহস পাইনি।

ফলি আপনাকে কী বলতে চেয়েছিল তা আন্দাজ করতে পারেন?— নিভন্ত পাইপে আবার আগুন দিয়ে ছটকু বলে।

না। আপনাদের সঙ্গে পরে আবার কথা হতে পারে। এখন আমার কাজ আছে।—বলে মহেন্দ্র উঠে পড়লেন।

ছটকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ফলির জন্য আপনার কোনও শোক নেই?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন, থাকার কথাও নয়। একে সে আমার ছেলে কি না তাই সন্দেহের বিষয়, তা ছাড়া অতি বদমাশ ছেলে।

তেরো

কী হয়েছিল তা কেউ বলতে পারবে না।

সন্তুর হাতে—মুখে রক্ত চটচট করছে। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। গোঙাতে গোঙাতে সে কয়েকবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওদিকে কালু নট নড়ন—চড়ন হয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর।

সিংহীদের নির্জন বাগান। এখান থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ শুনতে পায় না। সন্তু যখন শেষবার জ্ঞান ফিরে পেল তখন তার শরীর এত দুর্বল যে, বাগানটা হেঁটে পার হয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভাবাই যায় না। চোখে সে সবকিছু সাদা দেখছে। বমি আসছে বুক গুলিয়ে। ওঠার ক্ষমতা নেই। হাঁফ ধরে যাচ্ছে শুধু টানার পরিশ্রমে।

হামাগুড়ি দিয়ে সে কোনওক্রমে বসে। তারপর বহু দিন বাদে তার চোখ দিয়ে হু—হু করে কান্নার জল নেমে আসে।

আর সেই কান্নার আবেগে আর—এক বার সে জ্ঞান হারায়।

জ্ঞান ফেরে আবার। তাকিয়ে দেখে সে একটা ঘরে শুয়ে আছে। তার মাথা—মুখ ভেজা।

চোখ খোলার পরই সে তার বাবাকে দেখতে পেল। দাড়িওলা সেই ভয়ংকর মুখ, তীক্ষ্ন অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি। দয়ামায়া রস—কষহীন এক মানুষ এই নানক চৌধুরী।

ঠান্ডা গলায় বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কালুকে মেরেছ?

এ কথার জবাব সন্তুর মাথায় আসে না। কিন্তু খুব আবছা হলেও তার মনে পড়ে, কালুকে মারবার সুযোগ সে পায়নি। ছুরি নিয়ে ধেয়ে যাওয়ার সময়ে কালুর ইটের ঘায়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তারপরও আবছা মনে পড়ে, কালু ছুটে এসে ইটটা তুলে তার মুখে মাথায় বার বার মেরেছে। তারপরও যদি সে কালুকে মেরে থাকে, তবে তা সজ্ঞানে নয়।

সন্তু বলল, মনে নেই।

নানক গম্ভীর হয়ে বলেন, কালুর পেটে আর বুকে ছুরির জখম। কাজটা ভালো করোনি।

এক ভয়ংকর আতঙ্কে সন্তু চোখ বুজল। খানিক বাদে আবার চোখ খুলল। সে শুয়ে আছে সিংহীদের বাড়িতে। এই ঘরেই একদা তাকে নীলমাধব মেরেছিল। এ বাড়িতেই সে একদিন গুন্ডা বেড়ালকে ফাঁসি দিতে এসে এক রহস্যময় অচেনা লোকের হাতে মার খায়।

সন্তু ডাকল, বাবা!

তার গলাটা কেঁপে যায়।

নানক সামান্য ঝুঁকে বলেন, কী?

এ বাড়িতে কে থাকে?

কে থাকবে?—নানক অবাক হয়ে বলেন, কেউ থাকে না।

সন্তু অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে। তেষ্টায় গলা শুকনো। জিভে ঠোঁট চেটে নিয়ে সে বলে, কেউ থাকে। নিশ্চয়ই থাকে। একবার কে যেন এখানে আমার মাথায় পিছন থেকে লাঠি মেরেছিল।

নানক ঘটনাটা জানেন। চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, জানি না।

সন্তু তার বাবার দিকে তাকায়। বাবার পাঞ্জাবির হাতায় রক্ত লেগে আছে। দাড়ির ডগাতেও তাই। তাকে বাগান থেকে তুলে আনবার সময় বোধহয় লেগেছে। তবু সন্তু তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে নানা কথা উঁকি মারে।

সন্তু হঠাৎ বলল, আমি কালুকে মারিনি।

তুমি ছাড়া কে?

তা জানি না। তবে আমি নই।

নানক চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, সে কথা এখন ভাববার দরকার নেই। ঘুমোও।

আমি বাড়ি যাব।

একটু পরে। এখন তোমাকে নিতে গেলে আরও ব্লিডিং হতে পারে।

সন্তু তার বাবার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে বলে, মা'র কাছে যাব। আমাকে এখানে রেখেছেন কেন?

নানক গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি সময়মতো এসে না—পড়লে এতক্ষণ তুমি বাগানেই পড়ে থাকতে!

সন্তু উঠবার চেষ্টা করে বলে, কালু কি এখনও বাগানেই পড়ে আছে?

নানক ঠান্ডা গলায় বলেন, ও বোধহয় বেঁচে নেই।

কিন্তু আমি ওকে মারিনি। ও একটা মার্ডার কেস—এর ভাইটাল আই—উইটনেস।

এ সব কথা সন্তু ডিটেকটিভ বই পড়ে শিখেছে। সে জানে কালু মরে গেলে ফলির খুনের কিনারা হবে না।

নানক তার বুকে হাতের চাপ দিয়ে ফের শুইয়ে দিলেন। একটু কড়া গলায় বললেন, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। শোনো, কালুর সঙ্গে যে তোমার আদৌ দেখা হয়েছে তা আর কাউকে বলতে যেয়ো না।

কেন?

নানক বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমার ভালোর জন্যই বলছি। এইটুকু বয়সেই তুমি সব রকম অন্যায় করেছ। তুমি ইনকরিজিবল। কিন্তু তবু আমি চাই না, পুলিশ তোমাকে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাক।

কিন্তু কালুকে আমি মারিনি।

সেটা আমি বিশ্বাস করি না, পুলিশও করবে না। কাজেই বেয়াদবি করে লাভ নেই। যা বলছি শোনো।

সন্তু আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবাক হয়ে সে তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

নানক বললেন, তুমি ছাড়া কেউ কালুকে মারেনি।

আমি নই।—সন্তু গোঁ ধরে বলে।

তুমিই। আমি ভাবছি তোমাকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেব। এখানে থাকা তোমার ঠিক হবে না।

সন্তু চুপ করে থাকে। কিন্তু তার মন নিশ্চুপ নয়। সেখানে অনেক কথার বুদ্বুদ উঠছে। সে খুব নতুন এক রকম চোখে তার বাবার দিকে তাকায়। তারপর এত ব্যথা আর যন্ত্রণার মধ্যেও ক্ষীণ একটু হাসে।

গগন আর ছটকু যখন সিংহীদের বাড়িতে ঢুকল তখন বিকেল যাই—যাই। এর আগে তারা আর—একটা মস্ত কাজ সেরে এসেছে। মৃত্যুপথের যাত্রী কালুকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে।

কালুর জ্ঞান ফেরেনি। ফেরার সম্ভাবনাও খুব কম। অক্সিজেন চলছে। ওই অবস্থাতেই ডাক্তাররা তার ওপর অপারেশন চালিয়েছে। জানা গেছে তার ফুসফুস ফুটো হয়েছে, পেটের দুটো নাড়ি কাটা। বাঁচা—মরার সম্ভাবনা পঞ্চাশ—পঞ্চাশ।

ছটকু পুলিশকে ঘটনাটা ফোনে জানিয়ে দিল। তারপর গগনকে নিয়ে বিকেলের দিকে সোজা আবার গাড়ি চালিয়ে সিংহীদের পোড়ো বাড়িতে।

ছটকু জানে। জেনে গেছে।

সদর দরজায় তালা ছিল, যেমন থাকে। ছটকু একটু চার দিক ঘুরে দেখল। পিছনের বাথরুমে মেথরের দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল।

নিঃশব্দে ভিতরে ঢোকে ছটকু। সঙ্গে গগন।

ভিতরে অন্ধকার জমেছে। এখানে—সেখানে কিছু পুরনো আধন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথুরে মূর্তি। শেষ রোদের কয়েকটা কাটাছেঁড়া রশ্মি পড়েছে হেথায়—হোথায়।

বেড়ালের পায়ে এগোয় ছটকু। এ ঘর থেকে সে ঘর।

অবশেষে ঘরটা খুঁজে পায় এবং চৌকাঠের বাইরে চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকে।

ভিতরে সন্তু ক্ষীণ একটু ব্যথার শব্দ করে বলে, আমি বাড়ি যাব বাবা।

যাবে। সময় হলেই যাবে।
ছটকু সামান্য গলাখাঁকারি দেয়।
অন্ধকার ঘরে নানকের ছায়ামূর্তি ভীষণ চমকে যায়।
ছটকু ঘরে ঢোকে। মাথা নেড়ে বলে, কাজটা ভালো হয়নি নানকবাবু।
নানক অন্ধকারে চেয়ে থাকেন।
ছটকু গগনকে ডেকে বলে, তুই সন্তুকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে যা। ওকে এক্ষুনি ডাক্তার দেখানো দরকার।
গগন ঘরে ঢোকে। গরিলার মতো দুই হাতে সন্তুকে বুকে তুলে নেয়। নিজের ছাত্রদের প্রতি তার ভালোবাসার সীমা নেই।
নানক কী একটু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।
গগন সন্তুকে নিয়ে চলে গেলে ছটকু পাইপ ধরায়। তারপর নানকের দিকে চেয়ে বলে, আমি সবই জানি। কালু মরেনি।
নানক কথা বললেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
ছটকু বলল, কিছু বলবেন?
নানক খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, আমার ছেলেটা মানুষ হল না।
আমরা অনেকেই তা হইনি। কালুকে কে মারল নানকবাবু?
বদমাশ এবং পাজিদের মরাই উচিত।
কিন্তু সে কাজ আপনি নিজের হাতে করতে গেলেন কেন?
নানক আস্তে করে বললেন, সন্তুর জন্য। ভেবেছিলাম সন্তুকে চিরকাল একটা খুনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখব। সেই ভয়ে ও ভালো হয়ে যাবে।
নিজের ছেলের স্বার্থে আর—একটা ছেলেকে মারতে হয়?
মাঝে মাঝে হয়।
ছটকু পাইপ টানল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, কালুকে টাকাটা কে দিয়েছিল?
আমি। ভেবেছিলাম, কালুকে হাত করে গগনকে ফাঁসাব। ওর ব্যায়ামাগারটা তুলে দেওয়া দরকার। সেখান থেকে গুন্ডা বদমাশের সৃষ্টি হচ্ছে।
ছটকু হেসে বলে, আপনি সমাজের ভালো চান, ছেলের ভালো চান, কিন্তু আপনার পদ্ধতিটা কিছু অদ্ভুত।
বোধহয়।—শান্ত স্বরেই নানক বলেন।
ছটকু আবার হেসে বলে, আর ফলির ব্যাপারটা?
জটিল নয়। ওকে যে মেরেছে সে অন্যায় করেনি।
কিন্তু কে মেরেছে?
নানককে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু গলার স্বরে ঝাঁঝ ফুটল। বললেন, আপনি কে?
আমি গগনের বন্ধু। গগনকে খুনের মামলা থেকে বাঁচাতে চাই।
অ। তা বাঁচবে। গগন খুন করেনি।
সেটা জানি। করল কে?
আমিই করিয়েছি। ফলি এ পাড়ার ছেলেদের নষ্ট করছিল। ড্রাগের নেশা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তা ছাড়া আমার প্রতিবেশী নরেশ মজুমদারের বাড়িতে থাকার সময়ে সে এক কুমারীর সর্বনাশ করে। নানক একটু থেমে বললেন, আমি সমাজের ভালো চাই। রাষ্ট্র যা করছে না তা আমাকেই করতে হবে।
ছটকু মাথা নেড়ে বলে, বুঝলাম।
বুঝলে ভালো!

ছটকু মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু যে—সব গুন্ডাকে টাকা খাইয়ে আপনি ফলিকে মারার কাজে লাগিয়েছিলেন তারাই কি ভালো? তাদের অবস্থা কী হবে?

তারাও মরবে।

কী করে?

তারা আমার টাকা খায়। এ বাড়িতে তাদের আড্ডা আমি মেইনটেন করি। একে একে সবাই যাবে। দুনিয়ায় খারাপ, লোচ্চা, বদমাশ একটাকেও বাঁচিয়ে রাখব না।

ছটকু নিঃশব্দে বসে রইল। মনটা দুঃখে ভরা।

বাইরে ক্ষীণ পুলিশের বুটের আওয়াজ শুনল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছটকু উঠে দাঁড়ায়।

রঙিন সাঁকো

দুজনের হাতে দুটো সুটকেস। একজন লম্বা ফ্যাকাশে চেহারার যুবক, অন্যজন একটু বেঁটে। মাথার চুল পাতলা, স্বাস্থ্যটা একটু থলথলে।

দুপুরে স্টেশন ফাঁকাই বলা যায়, চেকার—ফেকার কিছু নেই, প্ল্যাটফর্মেও কোনও বেড়া নেই, উদোম প্ল্যাটফর্মটা দুজনে মন্থর পায়ে পার হল। হাতে ধরা টিকিট, কিন্তু টিকিট নেওয়ার কেউ নেই দেখে লম্বাজন টিকিটটা দুমড়ে ফেলে দিল, তারপর দুজনেই প্ল্যাটফর্ম থেকে রেল লাইনে নেমে এল। লাইনের পাশ দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ গেছে, সেটা ধরে হাঁটতে লাগল। পাশাপাশি হাঁটা যায় না, এর সুটকেসে ওর হাঁটু লাগে, তাই লম্বাজন সামনে আর বেঁটেজন পিছনে হাঁটতে থাকে।

লম্বাজন মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করে, সিগারেট আর আছে নাকি রে গনফট?

দাঁড়া, দেখি।

বলে বেঁটেজন পকেট হাতড়ে একটা দোমড়ানো প্যাকেট বের করে, সুটকেস নামিয়ে রেখে প্যাকেটটা খুলে দেখে বলে, মাইরি, ঠিক দুটো আছে, লাস দুটো।

লম্বাজন বাতাসে তার উড়ন্ত দীর্ঘ চুল হাত চেপে ঠিক করতে করতে বলে, কপাল। দে।

দুজনে সিগারেট ধরায়, আবার হাঁটতে হাঁটতে বেঁটেজন বলে, কতদূর রে সিন্ধু?

বলেছি তো মাইলখানেক।

হাঁটবি? না রিকশা নিবি?

লম্বা ফ্যাকাশে জন আপনমনে একটু হাসে, গনফট, কী কথা ছিল?

বেঁটেজন বিড়বিড় করে কী যেন বকে, তারপর বলে, হার্ডশিপ।

তবে ফের রিকশার কথা বলিস কেন?

আমার সুটকেসটার ওজন বেড়ে গেছে। মাইরি, দ্যাখ।

কোনও সোনাদানা এনেছিস?

কিছু না রে, তবু মাঝে মাঝে ওজন বেড়ে যায়।

কী রে?

বওয়ার ক্ষমতা কমে গেলে।

ফ্যাকাশে জন এবার মুখ ফিরিয়ে হাসে, বলে, বুঝেছি। আচ্ছা, রাস্তায় রিকশা পেলে নিয়ে নেব।

সেই ভালো, রিকশা ভাড়া তো কোম্পানিই দিচ্ছে।

ফের? ফ্যাকাশে জন ধমক মারে, কোম্পানি আবার কী? তুই আর আমিই তো কোম্পানি।

ঠিক। তবু খাতায় এন্ট্রি দেখাতে পারব।

দেখালেও লাভ নেই। ইনকাম ট্যাক্স অফিস ঠিক টিক মেরে বাদ দিয়ে দেবে। রিকশাওয়ালা তো ভাউচার দেবে না।

বেঁটে একটু শ্বাস ছেড়ে বলে, সিন্ধু, আমি শালা সাতপুরুষে ব্যবসা করছি বাংলাদেশে, পুরো মেড়ুয়াবাদি, কিন্তু তুই শালা যে বিজনেসে আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিস। হাড়কেপ্পন শালা!

লম্বাজন মুখ গম্ভীর করে বলে, গনফট, তুই আমাকে চার বছরে কিছু চিনলি না। আমার বিজনেসের পলিসিটা হচ্ছে হার্ডশিপ।

বেঁটেজন জিভ কাটে হঠাৎ, এক হাতে কান ধরে বলে, মাইরি, ওই কথাটা আমি বরাবর ভুলে যাই।

ভুলে যাস কেন?

স্মরণে থাকে না। তুই যদি হার্ডশিপ কথাটা বুকে একটা বোর্ড ঝুলিয়ে তাতে লিখে রাখিস তা হলে সবসময়ে চোখে পড়বে।

রেল লাইনটা পেরিয়ে ওরা বালি দুর্গাপুরের রাস্তা ধরল। মফসসলের কাঁচা রাস্তা, দু'ধারে কিছু কিছু বাড়িঘর উঠেছে, দু'—চারটে দোকান চোখ মেলেছে। গমকল, মিঠাই, পান, টেলারিং, মনোহারী, তিন—চার ঘর মুদি। রিকশা, গো—গাড়ি, সাইকেল অনবরত চলছে।

চারদিক দেখে বেঁটেজন বলে, জায়গাটা একদম মফসসল রে সিন্ধু!

ফ্যাকাশেজন অন্যমনস্কভাবে হুঁ দেয়।

লম্বাজনের রকমসকম দেখে বেঁটেজন যেন ভরসা পায় না, সন্দেহের গলায় বলে, রিকশা নিবি না নাকি?

নেব, আর—একটু এগিয়ে ধরব, এখান থেকে ভাড়া বেশি।

তখন থেকে কেন টিকটিক করছিস? সাড়ে পাঁচশো মাইল ট্রেন জার্নি করে এসেছি, রাতে ঘুমোতে জায়গা পাইনি, খেয়াল আছে? চুলে যা কয়লা জমেছে তাতে একটা উনুন ধরানো যায়। দাঁত মাজিনি, স্নান করিনি, ভাত খাইনি—

লম্বাজন উদাস গলায় বলে, সাড়ে পাঁচশো মাইল নয় গনফট, কিলোমিটার।

ওঃ কিলোমিটার, তাতে যেন গদিশটা কিছু কম গেছে! ভাড়া যা বেশি লাগে আমি দেব। এই রিকশা—

বলে বেঁটেজন একটা খালি রিকশা থামায়। রিকশাওয়ালা স্তিমিত চোখে চেয়ে নিষ্প্রাণ গলায় জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

সমবায় পল্লি, কত নেবে?

দেড় টাকা।

দেড়? বলে কী রে সিন্ধু? দেড়?

লম্বাজন ধমক দেয়, তুই দর করতে যাস কেন? বারো আনা রেট আমি বরাবর জানি। উঠে বসবি, গিয়ে পয়সা দিয়ে দিবি, রা করবে না।

কত দিবেন? রিকশাওয়ালা নিরুৎসাহিত গলায় বলে।

তুমি কাটো বাপু, রিকশা ঢের পাওয়া যাবে। লম্বাজন বলে।

উঠুন, লিয়ে যাচ্ছি। চা খাইয়ে দিবেন কিন্তু। আর বারো আনা।

উঠি সিন্ধু? বেঁটেজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

লোকটা হারামি, ঠিক আছে ওঠ। লম্বাজন চাপা স্বরে বলে। তারপর বেঁটেজনের পাশে রিকশার সিটে উঠে বসে। কাঁচা রাস্তায় ঝাঁকুনি খেয়ে রিকশা ধীরে এগোয়।

জায়গাটা দিব্বি সবুজ। তাজা বাতাস বইছে। শীতের এখনও তেমন টান নেই এ দিকে, তবু বাতাসটা দিয়েছে জোর। ডান ধারে একটা বাঁশবন, মড়মড় করে মাথা নুইয়ে দিচ্ছে। একটা ঘাটহীন পুকুরের পাশে অশ্বত্থ গাছ। রাস্তাটা বেঁকে গেছে। রাংচিতার বেড়া, ভাঁটবন, পুরনো পুরনো সব গ্রাম্য বাড়ি, শীতলা মায়ের থান, একটা চণ্ডীমণ্ডপ। বেঁটেজন মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। উত্তর বাংলার যে শহর থেকে তারা এসেছে সেটাতেও এমন ঘন ঝোপঝাড়, সবুজ গাছপালা, পুকুর বা গ্রাম্য বাড়ি নেই।

লম্বাজন যত দূর সম্ভব পিছনে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে ছিল। ওইভাবেই বলল, গনফট, টেন্ডারটা যদি না পাই তবে রাহা খরচটা গচ্চা গেল।

বেঁটেজন চুপ করে রইল খানিক, তারপর আস্তে আস্তে বলল, সিন্ধু, আমার কী মনে হয় জানিস?

কী?

মনে হয় তুই একটা মাড়োয়ারি, আর আমিই বাঙালি।

লম্বাজন হাসে। কিছু বলে না। বেঁটেজনই আবার বলে, ব্যবসার সঙ্গে লাইফটাকে পাঞ্চ করতে শেখ সিন্ধু! তোর বদস্বভাব হচ্ছে এই যে, তোর নেশাটা নিট নেশা, পাঞ্চ করতে জানিস না।

লম্বাজন চোখ বুজে থাকে। ভাবে। তারপর বলে, তোর বদস্বভাব কী জানিস?

কী?

তুই যে একসময়ে কলকাতায় পড়তে এসে নাটক নাটক করে পাগল হয়েছিলি সেইটে ভুলতে পারিস না। বাংলা নাটকের দল করে কালচারাল মুভমেন্ট করে তোর ব্যবসার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে।

গেছে তো গেছে।

মাড়োয়ারি যখন বাঙালি হয় তখন তার বড় ঝামেলা।

আর বাঙালি যখন মাড়োয়ারি হয় তখন?

তখনই তো বাঙালির উন্নতি।

বেঁটেজন অবিরল হাসল। দুলে দুলে। চোখে জল এসে গিয়েছিল, রুমালে চোখ মুছে বলল, তা হলে আয়, আমি তোর বোনকে বিয়ে করি, তুই আমার বোনকে বিয়ে কর। আমাদের পরের জেনারেশনটা খিচুড়ি হয়ে যাক। ও হো, তোর তো আর বোনও নেই!

দূর শালা মেড়ো, থাকলেই তোর হাতে দিতাম নাকি?

ওরে ব্যাটা ভেতো বাঙালি, দিলেও নিতাম নাকি?

লম্বাজন স্মিতমুখে চোখ বুজে ছিল। হঠাৎ দেশলাইয়ের শব্দে চোখ খুলে দেখে বেঁটেজন সিগারেট ধরাচ্ছে। লাফিয়ে উঠে বলে, এই শালা, বললি যে শেষ দুটো সিগারেট ছিল, এখন পেলি কোথা?

কোথায় আবার! রেল লাইনের ওই বাতাসের মধ্যে কেউ সিগারেট খেতে পারে? তাই নখ দিয়ে টিপে নিভিয়ে কানে গুঁজে রেখেছিলাম, সেই আদ্দেকটা খাচ্ছি।

লম্বাজন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলে, গনফট!

উঁ?

তুই মাড়োয়ারিই বটে।

বটেই তো, কে বারণ করেছে? চাস তো দুটো টান দেব'খন।

দিস। শ্বাস ছেড়ে লম্বাজন আবার চোখ বোজে।

কিছুক্ষণ পর বেঁটেজন বলে, সিন্ধু!

উঁ?

তোর দাদা মরতে এ কোথায় বাড়ি করেছে? রাস্তা যে ফুরোয় না।

একটু দূর।

একটু দূর! বলিস কী? তোর দাদা এত দূর থেকে রোজ যায় কী করে?

দাদার সাইকেল আছে।

থাকলেই বা।

লম্বাজন চুপ করে থাকে।

বেঁটেজন আবার বলে, এ—জায়গাটা হাওড়া থেকে কত দূর বললি?

আট কিলোমিটার।

কলকাতার এত কাছে তবু কোনও ডেভেলপমেন্ট হয়নি তো?

হয়নি কী করে বলছিস? চাঁদপুরের উদ্বাস্তুরা যখন কো—অপারেটিভ কলোনি করেছিল তখন পুরো জায়গাটা ছিল জলা আর জঙ্গল। হাসিল করে পত্তন করেছিল। তখনকার চেয়ে এখন তো দশগুণ ডেভেলপড। আরও হবে।

বেঁটেজন সিগারেটের শেষ অংশটা এগিয়ে দিয়ে বলে, হুঁকো করে টানিস।

লম্বাজন বেঁটেজনের কথামতো সিগারেটটা মুখে না—ছুঁইয়ে হাত মুঠো করে টানতে থাকে।

বেঁটেজন, সিন্ধু, তোর দাদা ইচ্ছে করলে কলকাতাতেও বাড়ি করতে পারত। এত দূরে বাড়ি করার মানে হয় না।

লম্বাজন চোখ বুজে বলে, পারত! তবে যে—টাকায় এখানে দশ কাঠা জমি কিনেছে সে—টাকায় কলকাতায় দেড় কাঠাও হত কি না সন্দেহ। তখন দাদার অবস্থা এত ভালো ছিল না।

দশ কাঠা তো অনেক জমি! তোর দাদার তো ছোট্ট ফ্যামিলি।

হলে কী হবে! দাদার বাতিক গোরু পুষবে, খেতখামার করবে, একটা পুকুর কাটারও কথা ছিল, তা সেটা আর হয়নি।

বলতে বলতে লম্বাজন একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তারপর আপনমনে বলে, বুঝলি গনফট, দাদা শেষ পর্যন্ত এদিককারই লোক হয়ে গেল। পরিবারটা আর জোড়া লাগবে না।

কেন, তোর দাদা তো শিলিগুড়িতে যায়।

সে কদাচিৎ অতিথির মতো গিয়ে থেকে চলে আসে। বাবা খুব দুঃখ করে বলে, এত কষ্ট করে বাড়িটা করলাম, তা বড় ছেলেটা সে—বাড়ি ভোগ করল না। পর হয়ে গেল। এ—দিকে জমি—জায়গা করে শেকড় গেড়ে ফেলেছে।

ভালোই করেছে রে সিন্ধু। আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলিতে যা চেঁচামেচি, টেঁকা যায় না।

আমাদের পরিবার তো তোদের মতো নয়। আমরা মোটে দুই ভাই। দু'বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িতে কেবল মা, বাবা আর আমি। বাড়িটা ফাঁকা পড়ে থাকে।

বাঃ, এ—রকমই চিরকাল থাকবে? তোর দাদা বিয়ে করেছে, তুইও করবি, তোদের ছেলেপুলে হবে, তখন ফ্যামিলি বাড়বে, খিটিমিটি হবে, ভাগ—বাঁটোয়ারা নিয়ে কাজিয়া হবে। তার চেয়ে তোর দাদা আগে থেকে আলাদা হয়ে বুদ্ধির কাজ করেছে।

লম্বাজন চোখ বুজে চুপ করে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে, সেই কথা ভেবেই আমি মা—বাবাকে বলে দিয়েছিলাম যে আমি বিয়েই করব না। বাড়ির স্বত্বও ছেড়ে দেব বলেছিলাম। সেটা শুনে দাদা বাবাকে জানাল যে সেও বাড়ির স্বত্ব আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। দুই ভাইয়ে ত্যাগের কম্পিটিশন লাগে আর কী!

বেঁটেজন, তোদের খুব মিল।

লম্বাজন, ছিল। এখন আর তেমন নেই।

কেন?

দাদাটা বদলে গেছে।

দু'দিক থেকে গাছপালার ডাল আর পাতা এগিয়ে এসে রাস্তাটাকে চেপে ধরেছে। রিকশার হুডে ছটছট লাগছে। ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। বুনো গন্ধ।

জায়গাটা মন্দ নয় রে সিন্ধু। তবে দূর। তোর দাদার ইস্কুল তো কালীঘাটে, এখান থেকে যেতে অনেক সময় লাগে নিশ্চয়ই!

তা লাগে। তবে বড্ড কষ্টসহিষ্ণু। একসময়ে তো দাদা কালীঘাটে বাসা করে ছিল। সেই বাড়িওয়ালা দাদাকে তুলবার জন্য রোজ বউকে লেলিয়ে দিত, ছোটলোক বউটা দাদা—বউদিকে না হক খারাপ গালাগাল দিত ওপরতলা থেকে, দাদা তখন কবি মানুষ, দুটো বই ছেড়েছে বাজারে, পত্রপত্রিকায় ওর লেখা ছাপা হয়। আড্ডাবাজ মানুষ, সংসারে মন নেই, টাকাপয়সা চেনেই না, তার ওপর ভিতু, ইমপ্র্যাক্টিক্যাল, কাজেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। কম ভাড়ায় ছিল, বাড়িওয়ালার গুন্ডা ভাইপো দাদাকে প্রায়ই শাসাতে লাগল। ভয় পেয়ে দাদা তখন উঠে যায়, বাসা পাওয়া গেল না, কসবার দিকে একটা প্রায় বস্তির মতো বাড়িতে উঠে গেল। এই ঘটনা থেকেই দাদার পরিবর্তন শুরু হয়, বউদিরও। বাড়িওয়ালার অত্যাচার দেখে দু'জনেই ঠিক করল যেখানে হোক, যেমন করে হোক একটা বাড়ি করবে। বাড়ি বাড়ি করে

দু'জনেই তখন পাগল। না খেয়ে কষ্ট করে একটি—দুটি করে টাকা জমাতে থাকে, দাদা টিউশনি করত, সে—সব ছেড়ে দিল। এক বন্ধুর সঙ্গে ওয়ার্কিং পার্টনার হয়ে তার কোম্পানিতে ভূতের মতো খাটত, তার ওপর ইস্কুল। পেটে খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। দু'বছর বাড়ি গেল না, রেল ভাড়ার টাকা জমাল। কবিতা টবিতা তখন ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে মাথা থেকে। টানা তিন—চার বছর ওইভাবে খেটে গেল দাদা, উড়ু উড়ু উদাসী মানুষটা হয়ে গেল বস্তুবাদী সঞ্চয়ী। সমবায় পল্লিতে ওর দূর সম্পর্কের এক মামাশ্বশুর আছে, সে—ই দাদাকে অবশেষে জমি কিনে দিল। সস্তায়। দাদা বাড়ি করল। গৃহপ্রবেশে আমরা এসেছিলাম, বাড়ি দেখে কান্না পেল, মাটির ভিতরে ইট সাজানো, সিমেন্টের পয়সা কুলোয়নি, টিনের চাল, টিনের বেড়া, তবু দাদা—বউদির মুখে যে কী বিজয়ীর আনন্দ! তারপর দাদা সে—বাড়ি ভেঙে এখন দোতলা তুলেছে। হরিয়ানার গোরু কিনেছে দেড় হাজার টাকায়। গুছিয়ে বসেছে। বন্ধুর কোম্পানিটাও দাঁড়িয়ে গেছে। সি এম ডি এ—র কাজ করে বিস্তর কামায়। ইচ্ছে করলে ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে দিতে পারে, তবু দেয়নি কেন তা ও—ই জানে। তবু বুঝলি গনফট, দাদার এই উন্নতি আমরা কেউ চাইনি।

কেন?

এর চেয়ে সেই দাদাই ভালো ছিল। ধারকর্জ করে সংসার চালাত, বছরে দুটো ছুটিতে বাড়ি গিয়ে হইচই করত, বড় বড় কাগজে দাদার কবিতা বেরোত। কবিতা বেরোলে আমাদের বাড়িতে একটা উৎসব পড়ে যেত। সেই গরিব, উদাসী, কবি দাদা আর কোথায় পাব?

বেঁটেজন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বলে, তবে সিন্ধু, তুই আমাকে খামোকা গাল পাড়িস, আমি ব্যবসাদার নই বলে। আমার মাথায় যে কালচারাল মুভমেন্ট ঢুকেছিল আজও তার ভূত আমাকে ছাড়েনি। আমি আমার বাপ—দাদার মতো হতে চাইছি, পারছি না। কীভাবে ভূতটা তাড়ানো যায়, তোর দাদার কাছে শিখে যাব।

ডান ধারে 'বনমালীর তেলেভাজার দোকান', তারপর একটা মুদিখানা, তারপর আরও দুটো মোড় ঘুরে রিকশা ফাঁকা জায়গায় উঠে এল। হঠাৎ চোখের সামনে প্রকাণ্ড দুটো দিঘি ভেসে ওঠে। দিঘির চার ধার ঘিরে সব বাড়ি জলে ছায়া ফেলে আছে। চমৎকার দৃশ্যটি দেখে বেঁটেজন বলে ওঠে, আরে বাঃ সিন্ধু, এ তো বিলিতি টাউনশিপ!

হুঁ। তবে এখানকার জল পেটে গেলেই আমাশা, আর মশার হোলসেল আড়ত।

জোড়াদিঘির মাঝখান দিয়ে উঁচু রাস্তা বেয়ে রিকশাটা পশ্চিম ধারের একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

দুই

গোরু দোয়ানো হচ্ছে বাড়ির পিছন দিকটায়। সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল কমলা। মুখখানা গম্ভীর, অন্যমনস্ক। কাজ করার বাচ্চা মেয়েটা এসে বলল, বউদি, কে এসেছে দেখো গে!

কে রে?

আমি চিনি নাকি? দুজন, হাতে বাক্স।

যে লোকটা দোয়াচ্ছিল সে বালতি এগিয়ে হাঁটুর গামছা খুলতে খুলতে বলল, এবার দুধ কম হচ্ছে মা। তিন সেরও হবে না। গাহেক কমাতে হবে।

কমলা একটা শ্বাস ফেলল। নিজেদের দুধ একটা আলাদা আলুমিনিয়ামের ডেকচিতে তুলে রেখে বালতি সুদ্ধু দুধে খানিকটা পরিষ্কার জল ঢেলে বাচ্চাটাকে বলে, পুনি, দুধ নিয়ে বেরো। গাঙ্গুলিবাড়ি আর মহলানবিশদের বলিস সামনের হপ্তা থেকে দুধ আর এক সের করে দেওয়া যাবে না।

পুনি গম্ভীর মুখে বলল, কাল মহলানবিশদের বউ আবার বলেছে, তোরা বড্ড জল দিস।

বিরক্ত হয়ে কমলা বলে, তা হলে ছেড়ে দিতে বলিস। অনেক গাহেক আছে।

দোয়ানোর লোকটা হাসল, তবে দুধ যত কম তত ঘন, বটের আঠার মতো। ঢের জল খাবে।

তুমি যাও তো বাপু! সাঁজালটা দিয়ে যেয়ো আর জাবনা।

দুধের ডেকচি রান্নাঘরের মিটসেফে রেখে কমলা সদরে এল। কাউকে দেখতে পেল না। ছেলেমেয়েরা খেলতে গেছে। বাড়িতে কেউ নেই এখন। লোক দুটো কোথায় গেল তা কাকে জিজ্ঞেস করবে ভেবে না পেয়ে বাগানের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেখল কেউ নেই। বাক্স হাতে যখন, নিশ্চয়ই তখন দূরের মানুষ।

ওপরতলা থেকে কে ডাকল, বউদি!

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে কমলা দোতলার বারান্দায় সিন্ধুকে দেখতে পায়। লম্বা চেহারাটা ঝুঁকে আছে রেলিঙের ওপর, মুখে মস্ত হাসি।

ওমা! সিন্ধু এসেছিস? খবর দিসনি তো, যাচ্ছি দাঁড়া।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ? কাউকে না দেখে আমরা দোতলায় উঠে এসে চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছি।

আহা, ঢং! চোরের মতো আবার কী? এটা তোর দাদার বাড়ি না? গোরুটা দোয়াচ্ছিল, সামনে ছিলাম।

গাঁয়ের বধূ হয়ে গেলে বউদি?

কমলা হাসল। মনে একটু মেঘ থেকেই গেল তবু।

উঠে এসে বারান্দায় মুখোমুখি হতে সিন্ধু এসে প্রণাম করে। তার সঙ্গে অচেনা লোক দেখে কমলা একটু জড়সড় হয়ে যায়।

সিন্ধু বলে, ওকে তুমি চেনো বউদি? বাজুরিয়াদের ছেলে গনপত। অনেককাল শিলিগুড়ি যাও না তো, তাই ভুলে গেছ বোধ হয়।

না না, মনে আছে। আয়, জামা—কাপড় ছাড়। ওপরের বাথরুমে জল দিতে বলছি।

বাথরুম! বাথরুম দিয়ে কী হবে? সামনে দুটো প্রকাণ্ড দিঘি থাকতে—

অবেলায় স্নান করবি?

বলো কী! করব না! সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার ট্রেন জার্নির পর শরীরটা কয়লা হয়ে আছে।

বাইরের ঘর পেরিয়ে ভিতরে আরও দুটো ঘর। সব ঘরেই কিছু কিছু ফুলের টব বসানো। সামনের দিকের কোণের ঘরখানায় সবচেয়ে বেশি। নানা বিচিত্র লতাপাতা গাছ ঘরের বাতাস স্যাঁতস্যাঁতে করে রেখেছে। মেঝে ভেজা ভেজা, দরজা—জানালায় বিচিত্র সব পরদা। প্রতিটি ঘরের চার দেয়াল চার রকম রঙের। সিন্ধু হাঁ করে দেখছিল। অনেক পয়সার ব্যাপার। তা ছাড়া সে বুঝতেও পারছিল না ঘরে এত গাছগাছালি কেন!

বউদি, ঘরবাড়ি যে এগ্রিকালচারের শো—রুম হয়ে আছে। কী ব্যাপার?

এমনিই। তোর দাদার শখ।

অনেক টাকার ব্যাপার দেখছি। অনেক নতুন ফার্নিচার—

কমলা অন্য কথা বলে, কী খাবি? লুচি করে দেব?

করো, অনেকগুলো ভেজো, দারুণ খিদে।

ওরা গামছা আর সাবানের বাক্স নিয়ে পুকুরে গেল। কমলা ঘরের বাতি জ্বেলে এক বার চেয়ে দেখল চার দিকে। সব ঘর ঘুরে দেখে নিল। কত দূর অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে তা বিচার করার চেষ্টা করল। অস্বীকার করার উপায় নেই, যে—কোনও বাইরের লোকের চোখে খটকা লাগবেই, তাই আজকাল উপরতলায় কাউকে আনে না কমলা। কেউ এলে নীচের তলায় বসায়।

কিন্তু ঘরে গাছপালা লাগিয়ে, দেয়ালে বিচিত্র রং করেই যদি ক্ষান্ত থাকত সাগর তবে কমলার বিপদ হত না। বাড়ির পিছন দিকে বাগানের এক কোণে সাগর যে—কুটির তৈরি করেছে সেটাতে যখন সাগর বসবাস শুরু করবে তখন সত্যিকারের বিপদে পড়বে কমলা। কী বলবে মানুষকে?

সিন্ধু এক পলক দেখে। এখনও কিছু তেমন লক্ষ করেনি। কিন্তু করবে। সামনের কোণের দিকের ঘরটায় সাগরের আলাদা খাট, তাতে বিল্ট—ইন অ্যাকুরিয়াম, সেই অ্যাকুরিয়ামে ফাইটার, অ্যাঞ্জেল, গোল্ডফিশ এবং আরও বিচিত্র মাছেরা সামুদ্রিক শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু'হাজার টাকা দামের খাট। অনেক খরচ করে ঘরটা সাউন্ড প্রুফ করিয়েছে সাগর, লাগিয়েছে এয়ারকুলার। প্রতি ঘরে

অন্তত সাত—আট রকমের বিচিত্র রঙের খাট। আলোর ডুম। সানমাইকা লাগানো বিশাল একটা লেখার টেবিল কিনেছে সাগর। গোছা গোছা দামি বন্ড কাগজ। পাঁচ—সাতটা মহার্ঘ বিদেশি কলম, চমৎকার কয়েকটা টেবিল—ল্যাম্প। টেবিলের টানায় লুকোনো থাকে দেশি বিলিতি মদের বোতল, পাঁচশো পঞ্চান্ন নম্বরি সিগারেটের গোটাকয়েক প্যাকেট। সিন্ধু সবই দেখবে। এ—সব লুকোনো যায় না।

তোর চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে সিন্ধু। খাওয়ার টেবিলে ওদের খেতে দিয়ে কমলা বলে।

গোগ্রাসে খেতে খেতে সিন্ধু এক বার মুখ তুলে হাসল, আমার ছোট ব্যবসা, বড্ড খাটতে হয়। তার ওপর যেখানে—সেখানে খাই সময়ের ঠিক থাকে না—

ব্যবসাই করবি?

চাকরি দাও না, এক্ষুনি ব্যবসা ছেড়ে দেব।

চাকরি পাস না? তুই তো এল এম ই পাস!

বি ই—রাই বসে আছে তো এল এম ই! আমাদের ব্যাচের ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া তিনজন বসে আছে এখনও।

বিয়ে করবি না?

কে মেয়ে দিচ্ছে! যদি কেউ দেয় খোঁজ রেখো। করব।

গণপতিবাবু বিয়ে করেছেন?

সিন্ধু হেসে বলে, গণপতি নয়, গনপত। আমি ওকে গনফট বলে ডাকি। যে কাজে হাত দেয় সে কাজ হয়ে যায় গন অ্যান্ড ফট।

মানে?

মানে কাজটা বিলা হয়ে যায়। ফ্লপ করে।

কমলা হাসে, বুঝেছি।

গণপত লজ্জা পেয়ে মাথা নামায়, বলে, ওর কথা!

বিয়ে করেছিস কি না বউদিকে বল। সিন্ধু ওকে কনুইয়ের ঠেলা দেয়। গণপত হাসে। সিন্ধু বলে, করেছে, বুঝলে বউদি! তোমার খাটনি বেঁচে গেল। মেড়ো মেয়ে খুঁজতে বিস্তর ঝামেলা হত। বিয়ে করে বেঁচে গেছে ব্যাটা, নইলে ওর বাবা ওকে জুতোপেটা করে বাড়ির বার করে দিয়েছিল প্রায়। ঘরে বউ আছে বলে একেবারে বার করতে পারেনি।

ওমা, কেন?

বাবু একসময়ে কলকাতায় কালচারাল মুভমেন্ট করত যে! নাটকের দলকে ফিনান্স করত। এখনও গোছা গোছা কাগজ খরচ করে নাটক লেখে। অখাদ্য সব লেখা।

না বউদি, ও—সব কথা বিশ্বাস করবেন না। আমি সিন্ধুর কাছে ব্যবসা শিখি।

কমলা মুখে আঁচল তুলে হেসে ফেলে, ওর কাছে শেখেন? ও ব্যবসার কী জানে?

গনপত মুখখানা করুণ করে বলে, কী করব! আমার বাপ—জ্যাঠা—খুড়ো আমাকে ব্যবসায় নেয় না যে। তাই সিন্ধুর সঙ্গে ভিড়ে পড়েছি।

লুচির টাল শেষ করে খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে সিন্ধু বলে, গনফট, কলকাতায় যাবি তো তুই একা যা। আমি নড়তে পারছি না।

গনপত বলে, কে যাবে বাবা! এখন আমি ছাদে গিয়ে চিতপাত হয়ে ভুঁড়ি ভাসিয়ে শুয়ে থাকব। কলকাতা তো পালাচ্ছে না। বরং তোর যদি হার্ডশিপের ইচ্ছে থাকে তো তুই যা।

হার্ডশিপ নিয়ে ঠাট্টা নয় গনফট। টাকা থাক বা না—থাক হার্ডশিপ থাকলে ব্যবসা থাকবে। আমার ব্যবসার মূলধন হল ক্লেশসুখপ্রিয়তা, হার্ডশিপ।

কী বলছিস রে সিন্ধু! কী প্রিয়তা? কমলা জিজ্ঞেস করে।

গনপত উত্তর দেয়, ওর কথা বাদ দেন বউদি। যেখানে কষ্ট করার দরকার নেই, সেখানে ও খামোকা কষ্ট করবে। বালি স্টেশন থেকে এই এক মাইল রাস্তা ও সুটকেস হাতে হেঁটে আসতে চেয়েছিল। ব্যাটা হাড়কেপ্পনও বটে। খাবে না, গাড়ি চড়বে না, পোশাক পরবে না, কেবল কষ্ট করতে করতে দেখুন, ওর শরীরের রক্ত সব জল হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে চেহারা। আমি বলি— মরবি সিন্ধু, খা খুব করে মাংস ভাত পরোটা। খায় না। হাসে।

বটে সিন্ধু! কমলা চোখ কপালে তোলে, এত কৃপণ তুই ছিলি না তো!

ও ব্যাটা বাড়িয়ে বলছে। অতটা না। তবে একটু বুঝে সমঝে চলি। বাড়ির অবস্থা বোঝই তো। একা আমার ওপর সব।

কথাটা বলেই সিন্ধু মুখটা লুকোবার জন্য ঘুরিয়ে নেয়। কথাটা বেরিয়ে গেছে, সে বলতে চায়নি। অন্তত তার দাদার প্রতি কোনও ঠেস দেওয়ার কথা সে কল্পনাও করেনি। তবু বেরিয়ে গেছে।

সিন্ধু লম্বা দুই পদক্ষেপে বাথরুমে ঢুকে যায়।

কমলা একটা শ্বাস ফেলে রান্নাঘরে চলে আসে। পড়ার ঘর থেকে তার দুই ছেলেমেয়ের পড়ার শব্দ আসছে। পুকুরের আঁশটে গন্ধ নিয়ে বয়ে যায় একঝলক বাতাস। গোরুটা গোয়ালে পা দাপিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। খোয়া—ওঠা রাস্তায় ঝপাত করে লাফিয়ে ওঠে সাইকেল, তার শব্দ পায়। চুপ করে বসে থাকে কমলা। মাসে মাসে সাগর মোটে পঞ্চাশটা টাকা পাঠায় বাবার নামে। কমলার শ্বশুর—শাশুড়ি কখনও টাকার কথা লেখেন না। না লিখলেই কী! তাঁদের অবস্থা সাগর বা কমলার অজানা নয়। একা সিন্ধুর ভরসায় তাঁরা সংসার চালান, শ্বশুরের পেনশন কিছু পাওয়া যায়, আর ব্যাঙ্কে রাখা মোট কয়েক হাজার প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা। তা সেই টাকাও সিন্ধুর ব্যবসাতে মাঝে মাঝে তুলে দিতে হয়। সাগর সবই জানে তবু সব ভুলে থাকে। কমলার বুকটা একটু দুরদুর করে। যদি সিন্ধু শিলিগুড়িতে গিয়ে সব বলে দেয়! তার দাদার বাড়িতে কেমন মোজাইক করা ঘর, ঘরে বাগান, দু'হাজার টাকা দামের খাট! বড় লজ্জার কথা হবে সেটা।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ছিল কমলা। চা করে পুনিকে ডেকে পড়ার ঘরে মাস্টার মশাইকে চা পাঠাল। হপ্তা বাজার থেকে বিকেলে বড় মাছ আনিয়েছে। কুটতে বসল। মনটা বুকটা থম ধরে আছে।

দরজার কাছে থেকে সিন্ধু ডাকল, বউদি!

কমলা একটু চমকায়, হাসিমুখে বলে, আয়। একটা চেয়ার টেনে বোস।

সিন্ধু খাওয়ার ঘর থেকে চেয়ার টেনে রান্নাঘরের চৌকাঠ ঘেঁষে বসে।

বউদি, তোমার সামনে সিগারেট খাব?

খা। কত দিন তো বলেছি খেতে। এখন তো আর ছোটটি নোস।

সিন্ধু চওড়া করে লজ্জার হাসি হেসে সিগারেট ধরায়। তারপর বলে, ছাদে গিয়ে শুতে—না—শুতেই গনফটটা ঘুমিয়ে পড়ল। একা লাগছিল বলে নেমে এলাম।

বেশ করেছিস। শিলিগুড়ির কথা সব বল, শুনি।

কী আর শুনবে! বাবার প্রেশার কমে বাড়ে। বাঁ চোখটা কাটাতে হবে ডিসেম্বরে। মা'র বড্ড খাটুনি বেড়ে গেছে, আজকাল বিয়ের জন্য জ্বালায়।

মন্তির ক'মাস চলছে?

কে জানে ও—সব! শুনেছিলাম তো সাত মাস।

নন্দদের যে ভাইটা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে তার খবর পাওয়া গেল?

না। আজকাল যে সংসার ছেড়ে পালায় সে—ই সুখে থাকে। বলে হাসল সিন্ধু।

শরীরটা একদম শেষ করেছিস। আমার কাছে ক'দিন থাক, ভালো করে খাওয়াই তোকে। এমন ফ্যাকাশে লাগে কেন চেহারাটা?

সিন্ধু চুপ করে থাকে, সিগারেট খায়। তারপর বলে, জিয়াডিয়া।

চিকিৎসা করাস না?

করাই মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে কী রে? জিয়াডিয়া সহজে সারে না জানিস?

জানি। ওর ওপর জন্ডিসের মতোও হয়েছিল।

কই, জানাসনি তো! বাবাও তো লেখেনি।

কাউকে জানাইনি। কিছু দিন লুকিয়ে ওষুধপত্র খেলাম, মা ঝাল—তেল ছাড়া রান্না করে দিত। জানিয়ে লাভ কী, বুড়োবুড়ি ভেবে মরবে। আমি এখন তাদের অন্ধের নড়ি। কাছছাড়া করতেই চায় না। কিছু হলে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পড়বেই তো। তুই কাছে—থাকা কোলপোঁছা ছেলে। তোর দাদা তো কবে তাদের পর করে দিয়েছে!

সিন্ধু ব্যস্ত হয়ে বলে, না না, সে—কথা বলিনি।

কমলা ফিরে অকপট চোখে সিন্ধুর দিকে চেয়ে বলে, তুই বলিসনি, আমিই বলছি। কথাটা একটুও মিথ্যে নয়।

দাদা তো বরাবরই কাছছাড়া। পড়াশুনার জন্যে ছেলেবেলা থেকে হস্টেলে থাকত, তারপর চাকরি করতে কলকাতায় এল। দাদার ওপর তার জন্যে কারও রাগ নেই। শুধু মা—বাবা দুঃখ করে স্কুলের বন্ধের সময়ে বাড়ি যায় না বলে। আমি তাদের বোঝাই, স্কুলের চাকরিটা দাদার কিছু না, ব্যবসাটাই আসল। ব্যবসাতে তো ছুটি নেই, তাই আসে না।

কমলা সহসা উত্তর দেয় না। তার চোখের পাতা হঠাৎ ভিজে আসে। বঁটির ওপর মাথা নিচু করে থাকে সে।

সিন্ধু একটা হাই তুলে বলে, দাদা কাছে না থাকায় আমারই যা একটু বিপদ। গত বছর মাদ্রাজে একটা চাকরি পেয়েছিলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসার পর বুড়োবুড়ি আর রাতে ঘুমোতে পারে না। সারা দিন তাদের মুখ শুকনো। কয়েক দিনে চোখের কোল বসে, চামড়া শুকিয়ে কেমন হয়ে যেতে লাগল। মুখে বলত, যাক সিন্ধু চাকরি পেয়েছে, একটা দুশ্চিন্তা কাটল। আমি মনে মনে হাসতাম। দুশ্চিন্তা কাটল না বাড়ল সে আমি ছাড়া ভালো আর কে জানে! বুড়োবুড়ির জন্যই শেষ পর্যন্ত নিলাম না চাকরিটা। কোনওখানে যাওয়ার উপায় নেই ওদের ছেড়ে। দাদা কাছে থাকলে এ—রকমটা হতে পারত না।

কমলা স্খলিত গলায় বলে, এখানে এসেও তো ওঁরা থাকবেন না!

তাই থাকে! তা হলে লঙ্কা গাছের গোড়ায় জল দেবে কে? কাঁঠাল পেঁপে কলা পাহারা দেবে কে? এক ডাঁই দামি বাসনপত্র যদি চুরি হয়। বাড়িটায় যদি আগাছা জন্মায়? বুড়োবুড়ির অনেক সমস্যা বউদি। বাড়ির বড় মায়া। নিজেও তো বোঝো। নইলে আমি তো কত বার বলি, দাদার কাছে গিয়ে পার্মানেন্টলি থাকো, আমাকে ছেড়ে দাও। শোনে না। বলে, তোর কাজে তুই যা না, আমরা একলা থাকব।

তা বলে নিজের ভবিষ্যৎ ভাববি না সিন্ধু?

ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। নিজেকে এখন মা—বাপের বিধবা মেয়ে ভাবি।

ব্যবসা কেমন চলছে তোর?

নর্থ বেঙ্গলে ব্যবসা আর চলে? প্রথম প্রথম কিছু কনস্ট্রাকশনের কাজ হয়েছিল। সেই গন্ধে হাজারটা কন্ট্রাক্টর কলকাতা থেকে গিয়ে মাছির মতো পড়ল সেখানে। তাদের জন্য নতুন নতুন হোটেল খুলল শিলিগুড়িতে, মদের বার বসল, বাঙালি অবাঙালি ব্যবসাদার আর ফড়ে এখনও থিক থিক করছে শহরে। জোর কম্পিটিশন। পঁচিশ—ত্রিশ পারসেন্ট লেস দিয়ে সবাই টেন্ডার ধরছে। আমাদের সেই ক্ষমতা কোথায়? বেকার ইঞ্জিনিয়াররা একটা অ্যাসোসিয়েশন করে কন্ট্রাক্ট নিচ্ছিলাম, কিন্তু জয়েন্ট কোম্পানি চালানোর মতো মাথা আমাদের নয়। ঝগড়াঝাঁটি করে সব আলাদা হয়ে গেল। যে—লোকটা আমাদের কন্ট্রাক্ট ধরে দিত সে

কন্ট্রাক্টের জন্য মোটা কমিশন নিত, এইসব কারণে ঝগড়া। ইলেকট্রিক সাপ্লাই আর ইউনিভার্সিটি যা টুকটাক কাজ দেয় তাইতে এখন চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আসলে চলে না। যা খাটি সে তুলনায় কিছু পাই না।

কমলা অন্যমনস্ক গলায় বলে, কত ছেলেই তো বাইরে চাকরি করতে যায়, তাদের মা—বাবা একা থাকে না? আমার শ্বশুর—শাশুড়িই কেন পারবেন না?

সিন্ধু সিগারেটটা চটির নীচে ঘষে নেভায়। বলে, ঠিক কথা। এ—কথাটা মা—বাবাকে এক বার গিয়ে বুঝিয়ে এসো। তা হলে আমি বেঁচে যাই। অবশ্য মা—বাবা রাজি হলেই যে চাকরি পাব তাও নয়। মাদ্রাজেরটা হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিলাম কপালজোরে। আর কি সে—রকম হবে? তবু যদি বোঝাতে পার বা নিজেদের কাছে এনে রাখতে পার তা হলে বড় ভালো হয়। নইলে বুড়োবুড়ি না—মরা পর্যন্ত বুঝলে—আমি খালাস হচ্ছি না।

বলে সিন্ধু একটু থমকে গেল, বলল, কথাটা খুব ক্রুয়েল হয়ে গেল বউদি, মাঝে মাঝে ফ্রাস্টেশন থেকে বলে ফেলি। নইলে আমি কিন্তু জান দিয়ে বুড়োবুড়িকে ভালোবাসি।

জানি সিন্ধু। কমলা দীর্ঘ একটি শ্বাস ফেলে।

বউদি, তোমার তেল পুড়ে গেল, মাছ ছাড়ো!

কমলা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি রান্না চাপাল।

সিন্ধু হেসে বলে, যতই চেষ্টা করো, মা—বাবাকে পার্মানেন্টলি আনতে পারবে না তোমাদের কাছে। বৃথা চেষ্টা। ওরা দশ—পনেরো দিন কি জোর মাসখানেকের জন্য আসবে, তারপর ঠিক শিলিগুড়িতে ফিরে যাবে। বুড়ো মনে করে ওটাই এখন তার দেশ, তার বাড়ি। নিজের টাকার বাড়ি কী রকম জানো তো!

কমলা ম্লান হাসল। বলল, জানি।

সিন্ধু বলে, কেবল আমারই জানা হবে না।

কেন রে?

নিজের টাকায় বাড়ি! ভাবতে পারি না।

তোর আর বাড়ি দিয়ে কী হবে? শ্বশুরমশাইয়েরটাই তুই নিস!

সিন্ধু হাসে, সেটা তো বাবার টাকায় বাড়ি।

তাতে কী রে হাঁদারাম। বাবা কি তোর পর?

সিন্ধু একটু চুপ করে থেকে বলে, বাবা আমি নই। তফাত থাকেই। এগুলো পুরুষমানুষদের ফিলিং, বিশেষত ফ্রাস্ট্রেটেড পুরুষদের। তুমি বুঝবে না।

বলে সিন্ধু সিগারেট ধরায়।

কমলা একটু দেখে বলে, এত সিগারেট খাস কেন রে? তোর না জিয়াডিয়া, জন্ডিস?

টেনশনের জন্য খাই। সবসময়ে এত চিন্তা আর উদ্বেগ থাকলে একটা নেশা দরকার। তাই বেশি খেয়ে খেয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে। খেলে টেনশন কমে যায়।

টেনশন তো কমে কিন্তু ব্যামো বাড়বে না? আর ওই কড়া সিগারেট, ওগুলো মানুষে খায়? তোর দাদাকে বকে ঝকে ওই হলদে প্যাকেটের বিচ্ছিরি গন্ধের সিগারেট ছাড়িয়েছি। ওগুলো খাস কেন?

সস্তা।

পেটে আলসার—টালসার হবে শেষে দেখিস।

হলে হবে। মানুষ এখন চায় ইমিডিয়েট রিলিফ। মাথা ধরেছে তো অ্যাসপ্রো বা অ্যানাসিন খেয়ে নাও, অম্বল হলেই অ্যালুড্রক্স, জ্বর হলেই নোভালজিন। মানুষ একদম অসুখ—বিসুখ ব্যথা—বেদনাকে সময় দিতে চায় না, সময় নেই, তেমনি টেনশন হলেই সিগারেট। পরে কী হবে—না— হবে তা নিয়ে মানুষ একদম ভাবা ছেড়ে দিয়েছে।

তা হলে কিন্তু সিগারেট খাওয়ার যে অনুমতি দিয়েছি তা ফিরিয়ে নেব!

সিন্ধু একটু হাসল।

পড়ার ঘর থেকে দুদ্দাড় দৌড়ে আসে জয়া আর সৈকত। 'কাকা কাকা' বলে ঘিরে ধরে সিন্ধুকে। তাদের শরীরের সুঘ্রাণ বুকে টেনে নেয় সিন্ধু। শৈশবের গন্ধ কী সুন্দর রোদ বাতাসের গন্ধের মতো শুদ্ধ।

ওই যাঃ বউদি! সিন্ধু বলে, মা ওদের জন্য কী সব তৈরি করে সুটকেসে দিয়ে দিয়েছে দিতে ভুলে গেছি।

সিন্ধু উঠে গিয়ে কৌটো বের করে আনে। নাড়ু, তক্তি, ক্ষীরের ছাঁচ, গোকুলপিঠে নিয়ে ওরা হই হই করতে থাকে। সিন্ধু এসে আবার রান্নাঘরের দরজায় বসে।

বউদি, দাদা কত রাতে ফেরে?

অনেক রাতে। পৌনে দশটা, দশটা, কখনও এগারো—বারোও হয়।

খুব ব্যস্ত, না?

খুব।

ব্যস্ততাই ভালো, আমি হার্ডশিপে বিশ্বাস করি।

কমলা শ্বাস ফেলে। বলে, আমিও করি।

জানি, তোমরা বাড়ি বাড়ি করে দুজনে কম কষ্ট করোনি। আমরা প্রথমে হাসাহাসি করেছি, তারপর ক্রমে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি। দাদা যে এ—রকম হতে পারে তা ভাবতেই পারতাম না। হার্ডশিপ থেকেই আসে সুখ।

কমলা হঠাৎ অপলক চোখে সিন্ধুর দিকে চেয়ে থাকে। তার ফরসা রঙে উনুনের আঁচ লেগে লালচে দেখায় মুখ। সুন্দরী না হোক কমলার শ্রী ছিল, আছে। তবে কমলার শ্রীর মধ্যে বরাবর একটু রুক্ষতা ছিল। জেদও বলা যায়। কিংবা অহংকার কি? সিন্ধু তা সঠিক নির্ণয় করতে পারে না।

কমলা চেয়ে থেকে বলে, তুই কি ভাবিস সিন্ধু, আমি খুব সুখে আছি।

তিন

ক্লাসঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সাগর বাইরের দিকে চেয়েছিল। তিনতলায় ক্লাস, আকাশ অনেকটা দেখা যায়। শরতের কাশফুলি মেঘ ভেসে যাচ্ছে, অনেক উপরে কয়েকটা বিন্দুবৎ চিল, একটা ঘুড়ি একা অনেক উঁচুতে থম ধরে আছে। ঘুড়িটা হলুদ। আচমকা বাতাসের টানে একটা নীল সাদা প্রকাণ্ড বেলুন ধীরে জেগে ওঠে। হিলিয়াম বেলুন, তার সঙ্গে সুতোয় বাঁধা বিজ্ঞাপন—আর্ন মান্থলি ইন্টারেস্ট ফ্রম ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া! কালো লেখাটা ঘন নীল আকাশের গায়ে স্থির হয়ে ভাসে।

ছেলেরা সাগরের দেওয়া টাস্ক করছে। করছে কি না কে জানে! কাটাকুটিও খেলতে পারে কেউ কেউ, গল্পের বই পড়তে পারে। মোটের ওপর চুপ করে থাকে, গোলমাল করে না সাগরের ক্লাসে। টাস্ক না করলে কোনও ক্ষতি নেই। ঘণ্টা পড়ার সময় পর্যন্ত কাটিয়ে দেয় সাগর, টাস্ক দেখে না।

আর্ন মান্থলি ইন্টারেস্ট ফ্রম ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লেখাটার দিকে চেয়ে থাকে সাগর। হিলিয়াম বেলুনটা কত উঁচুতে উঠেছে! ঘুড়িটা সরে যাচ্ছে ডান থেকে বাঁয়ে, তারপর চমৎকার একখানা বাঁক নিয়ে গোঁত্তা খেয়ে আবার ওপরে উঠল। একটা কালো ঘুড়ি কোথা থেকে বেড়ে কাছাকাছি আসে। হলুদ ঘুড়িটা দুটো পাক খায়, এগোয়। লড়বে। সাগর আবার আকাশের গায়ে লেখাটা দেখে। একটা কবিতার লাইন ভেসে আসতে থাকে মনের ভিতর। স্পষ্ট নয়, কেবল গুনগুন একটা ধ্বনি তোলে মাত্র। সে উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শোনে—দীর্ঘ খোয়াই... তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী... রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো... ও পাশে স্বপ্নের বাগান... ছন্দ নেই, একটা দোলাচল আছে শুধু। একটু শব্দের আলোড়ন মাত্র। এখনও কবিতার শরীর স্পষ্ট নয়। সময় দেবে।

স্যার!

উঁ?

হয়ে গেছে।

হ্যাঁ। বোসো।

দেখবেন না স্যার?

দেখব। রেখে দাও।

ছেলেটা বসে পড়ে।

সাগর আবার উৎকর্ণ হয়। গুঞ্জনটা শুনবার চেষ্টা করে। দীর্ঘ খোয়াই...কথাটা হারিয়ে যায়। নীল আকাশের বুকে আবার একটু বাতাসের টানে উঠে আসছে লেখাটা—আর্ন মান্থলি ইন্টারেস্ট... হলুদ ঘুড়িটা ভেসে যাচ্ছে ঢেউয়ের নৌকোর মতো। দীর্ঘ খোয়াই... তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী...

আসছে না। সাগর ক্লাসঘরের দিকে চেয়ে থাকে! নামানো সব মাথা, কালো চুল... রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো...ও পাশে স্বপ্নের বাগান...

ঘণ্টা বাজে। এক, দুই, তিন। সাগর দরজার দিকে ফেরে। হারিয়ে যাওয়ার আগে ক'টা লাইন নোটবইতে লিখে নিতে হবে। তাড়াতাড়ি।

স্যার, দেখলেন না? নাছোড় ছেলেটা উঠে দাঁড়ায়।

পরের দিন দেখিয়ো। সাগর বলে। ফিরে তাকায় না আর। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

থার্ড পিরিয়ডেই সাগরের ক্লাস শেষ হয়ে যায় রোজ। রুটিনে ওই পর্যন্তই তার ক্লাস। গত বছর থেকে নিয়মটা চলে আসছে।

গতবারই সাগর স্কুলকে দু'দফায় হাজার ছয়েক টাকা ডোনেট করেছে। আর ন'হাজার টাকা ডোনেশন তুলে দিয়েছে। একটা চ্যারিটি জলসা আর গোটা দুই ফিল্ম শো করেছিল। গরিব স্কুলটা খানিকটা বেঁচে গেছে। স্যালারি অ্যাকাউন্টের ছ'হাজার টাকারও সংস্থান হত না বলে একসময়ে মাস্টারমশাইরা পুরো বেতন পেতেন না, যা পেতেন তাও দু'তিন দফায়। এখন পনেরো হাজার টাকার একটা ক্যাপিটাল থাকায় মাস—মাইনের ভাবনা নেই। স্কুল তাকে খাতির করে। গত বছর থেকেই তার ক্লাস কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। কেউ কিছু বলে না। টিফিনের এক পিরিয়ড আগেই সে চলে যেতে পারে।

আজ যায় না সাগর। বসে বসে লাইন ক'টা সাজায়। মোটে চারটে পঙক্তি। বেয়ারা এসে পাশে চা রেখে যায় সসম্ভ্রমে, ডিসটার্ব করে না কেউ। লাইন ক'টা নিয়ে বসে থাকে সাগর। একজন মাস্টারমশাই প্রবল কাশি চাপছেন, পাছে সাগরের অসুবিধে হয়। গত মাসেও ওই মাস্টারমশাইটি সাগরের কাছ থেকে একশো টাকা ধার নিয়েছেন। প্রায়ই নেন। প্রায় সবাই এখানে সাগরের অধমর্ণ।

সাগর লাইন ক'টার দিকে চেয়ে থাকে হতাশায়। পুরো কবিতা নয়, ছিন্ন শরীর মাত্র। এই হচ্ছে মুশকিল। কবে যে বাকি অংশটা ধার দেবে তার কোনও ঠিক নেই।

শুদ্ধ কবিতাগুলি নির্মিত হয়েই আছে। হয়তো অন্তরীক্ষে বা আবহমণ্ডলের কোথাও এক রহস্যময় আলো—আঁধারিতে বাস করে কবিতাগুলি। মাঝে মাঝে কদাচিৎ তারই অংশগুলি ধরা দেয়। শুধু কবিতা কখনওই কবির নিজের রচনা নয়, কবি উৎকর্ণ উন্মুখ থাকলেই মাত্র অন্তরীক্ষের ইঙ্গিতগুলি তার কাছে পাখির মতো উড়ে আসে মাঝে মাঝে। সাগরের এ—রকমই ধারণা।

সাগরবাবু, আপনার টেলিফোন! বেয়ারা এসে বলে যায়।

টেলিফোনটা হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে। সাগর উঠে অন্যমনস্ক ভাবে বারান্দা পার হয়।

হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখখানা ভারী আহ্লাদি। ভালোমানুষি এবং নিরীহতায় মাখানো। সাগরকে দেখে হাসলেন, সম্ভ্রম ফুটে ওঠে চোখে। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা হাতে দেওয়ার সময়ে বললেন, মানিকবাবু কথা বলছেন মনে হল।

মানিক রোজই দু'—তিন বার ফোন করে। হেড স্যার গলা চিনে গেছেন।

কে, সাগর?

বলছি।

তোর তো এখন ছুটি! একবার মজুমদারের কাছে যা।
মজুমদার রাজি হয়েছে?
হয়েছে।
দশ হাজার দেবে?
দেবে, তবে বেগরবাঁই করছে। আমরা সবসুদ্ধ ছ'জন টেন্ডারার আছি কর্পোরেশনের ওই অর্ডারটার জন্য। আগামী কাল লাস্ট ডেট। মনে হচ্ছে আর—কেউ টেন্ডার দেবে না, যদি না দেয় তা হলে ছ'জনের মধ্যেই বন্দোবস্ত হবে।
কী রকম বন্দোবস্ত?
জানিসই তো, মজুমদার কী রকম উঁচু রেট দেবে!
সাগর বিরক্ত হয়ে বলে, আঃ, সেটা জানব না কেন? আমি কি বাচ্চা ছেলে? বলছি, মজুমদার অন্য চারজনকেও দশ হাজার করে দিচ্ছে কি না।
না, আমাদেরই দিচ্ছে, সিক্রেটলি। হাতে পায়ে ধরে বলেছে যেন অন্য চারজনকে টাকার পরিমাণটা না জানাই।
বাকি চারজন টেন্ডারার কারা?
বিশ্বাস, কৃষ্ণা কোম্পানি, লিঙ্ক ইন্টারপ্রাইজ আর চক্রবর্তী।
মজুমদার টাকা কবে দেবে?
কাল বেলা বারোটায়। ক্যাশ ডাউন তুই আজ তবু একটু কথা বলে আয়। ও বলছে যদি কালকের মধ্যে নতুন কোনও টেন্ডারার আসে তাহলে অত টাকা দেবে না। নতুন টেন্ডারারকেও খাওয়াতে হবে তো।
সাগর একটু ভেবে বলল, তবু তুই টেন্ডারটা টাইপ করিয়ে রাখ। মনে হয় শেষ পর্যন্ত মজুমদার কষাকষি করবে। যদি করে তো আমরা টেন্ডার সাবমিট করব, প্যাক্টে যাব না।
তবে বাকি চারজনের কী হবে? আমরা যদি শেষ পর্যন্ত টেন্ডার দিই তো ওদের বিট্রে করা হবে। তুই বরং মজুমদারকে আজ একটু বুঝে আয়।
মজুমদারের সঙ্গে যখন প্যাক্ট তখন সবাই নিজের টেন্ডার পকেটে নিয়েই যাবে। ভাবিস না, আজ আমি একটু ব্যস্ত।
কী নিয়ে?
কয়েকটা লাইন মাথায় এসেছে।
ওঃ! কিন্তু কারখানাতেও তোর একবার যাওয়ার কথা ছিল যে। গানমেটালের বুশগুলো ডেলিভারি দেয়নি।
তুই যা।
আমি তো যাচ্ছিই হাওড়ায়। স্লুইস গেটের প্লেট আজ বেন্ডিং হবে, ভুলে গেছিস?
সাগর একটা শ্বাস ফেলল, সেই শ্বাসটা বোধ হয় শুনতে পেল মানিক। হাসল, বলল, আচ্ছা যা, আজ তোকে ছুটি দিচ্ছি; কিন্তু কাল সকালে স্কুলে আসার সময়ে কারখানাটা ঘুরে আসিস। ওদের বড্ড লেবার ট্রাবল। গোলমাল হলে আমাদের কনস্ট্রাকশন পিছিয়ে যাবে। একটা কথা বলি সাগর, স্কুলটা এবার ছাড়।
সাগর ফোনটা কান থেকে সরিয়ে রিসিভারটার দিকে একটু চেয়ে থাকে। কালো টেলিফোনটা থেকে এখনও মানিকের কথা ভেসে আসছে, বুঝলি, বারো লাখ টাকার কাজ, তিন লাখ খাওয়াতে হবে, ওরা বলছে বারো লাখের বিল করবেন, আমরা ছয় কেটে নেব। অর্ডারটা নেওয়া কি ঠিক হবে?
পুরো কথাটা শোনেনি সাগর। তবু তার অসুবিধে হয় না বুঝতে। অভ্যেস হয়ে গেছে। কোনও সরকারি ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাঁকিবাজির কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে। বিনা কাজে টাকা। ফোনটা কানে ধরে বলে, পাগল! ছয় লাখ টাকা খরচ দেখাবি কী করে? ছেড়ে দে।
যদি স্টাফ বাড়াই? এস্টাব্লিশমেন্টের খরচ দেখাই?

দূর বুদ্ধু! অত টাকা ঢোকানো যাবে না। দম—সম হয়ে যাবি। ছেড়ে দে।
ঠিক আছে, তোর কি গাড়ি দরকার? বল তো স্কুলে পাঠাই?
না। তুই হাওড়ায় যা।
আমি আচার্যির গাড়িতে যাচ্ছি।
আমার দরকার নেই।
আচ্ছা। ছেড়ে দিচ্ছি—
মানিক ছেড়ে দিল।
স্টাফরুমে এসে সাগর তার নোটবইটা খুলল। দীর্ঘ খোয়াই... তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম... নদী রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো... ও পাশে স্বপ্নের বাগান। অর্থহীন লাগল লাইন ক'টা কিছুক্ষণ। মজুমদার কাল ডাউন—পেমেন্ট করবে কি না সন্দেহ হতে থাকে সাগরের। হয়তো আরও দু'—একজনকে জুটিয়ে এনে শো দেবে। বলবে, দেখুন, এরাও আজ টেন্ডার দিতে এসেছে। কী করি? ক্যাশ এত টাকা দিচ্ছি, আপনারা ভাগ করে নিন। নতুন লোকগুলো হয়তো মজুমদারেরই ভাইপো ভাগনে কেউ হবে। ভাগের টাকা নিয়ে মজুমদারের বাড়িতেই তুলে দিয়ে আসবে।
নোটবইটা খুলে বসেই রইল সাগর। কলমের মুখটা শুকিয়ে গেল। বুশগুলো এখনও দেয়নি, ইরেকশনটা যদি পিছিয়ে যায়! অনেক চিন্তা। তবু আরও কিছুক্ষণ সাগর হতাশভাবে একটা রঙিন সাঁকোর দিকে চেয়ে রইল। 'বাগান' শব্দটা বড় বেমানান বাজে শব্দ। সেটা বদলে এক বার লিখল 'দেশ'। আবার কাটল। পরের লাইনগুলো আর আসছে না। কিন্তু সাগর স্পষ্টই অনুভব করে অন্তরীক্ষে রহস্যময়তায় অস্পষ্ট হয়ে আছে তারা। নৃত্যপর কয়েকটি পঙক্তি। আসছে না।
আবার ফোন আসে।
ভট্টাচার্য বলছি।
কোন ভটচায?
সমীর।
ও।
আপনি আমাকে একটা অ্যাপার্টমেন্টের জন্য বলেছিলেন, মনে আছে?
হ্যাঁ।
একটা পেয়েছি। আলিপুরে। সত্তর হাজার।
ডাউন পেমেন্ট কত?
আটাশ হাজার। মাসিক কিস্তি তিনশো সত্তর।
ঠিক আছে। কিন্তু বাড়িটা কত উঁচু?
দশতলা। আপনার ক'তলায় চাই? গ্রাউন্ড ফ্লোরটা কেবল গ্যারেজ, ফার্স্ট ফ্লোর থেকে পাবেন।
আমি দশতলায় চাই।
ভটচায চুপ করে থাকে, বলে, দশতলায়?
হ্যাঁ। আরও উঁচুতে হলে আরও ভালো হত।
ভটচায হাসে। বলে, দশতলায় পাবেন। অত ওপরে ডিম্যান্ড কম। যদি বাইচান্স লিফট কোনও দিন গড়বড় করে তবেই কিন্তু মুশকিল!
হোক। আমি দশতলায় চাই। পজেশন কবে থেকে দেবে?
দেরি আছে। আন্ডার কনস্ট্রাকশন। জানাব।
ফোন রেখে দেয় সাগর।

স্টাফরুমে বসে সে কিছুক্ষণ এক অগাধ ক্লান্তি বোধ করে। চোখ বুজে থাকে। শুনতে পায়, বাইরে কারা তার খোঁজ করছে। বেয়ারাটা বলল, বিশ্রাম নিচ্ছেন, একটু ঘুরে আসুন।

আমরা কালও এসে ফিরে গেছি।

সাগর চোখ খুলে বলল, কে রে ভানু? পাঠিয়ে দে।

তিনটি অল্পবয়সি ছেলে এসে দরজায় দাঁড়ায়।

সাগরশঙ্কর চ্যাটার্জি—?

আমিই। কী চাই?

ছেলে ক'টা চটপট পায়ে এগিয়ে আসে। একটা চটি পত্রিকা সাগরের সামনে টেবিলে রেখে বলে, কাগজটা দিতে এসেছি।

কাগজের নাম 'কল্পনালতা'। কবিতার কাগজ। প্রচ্ছদে চমৎকার একখানা স্কেচ। প্রাণবন্ত একটি মেয়ের মুখ। ছবিটা চেনা চেনা লাগে সাগরের। কোথাও এর আগে দেখেছে।

প্রচ্ছদ কার আঁকা?

তিনজনের একজন এগিয়ে বলে, আমার। কেমন হয়েছে?

সাগর ছেলেটার রুক্ষ মুখখানার দিকে তাকায়। কী বলবে সাগর! হুবহু এ—রকম একটা স্কেচ সাগর দেখেছিল। পিকাসোর আঁকা। ভাবল ছেলেটাকে একটু ধমক দেবে। দিল না। এখন আর শুদ্ধতা কার ভিতরে আছে! বলল, ভালোই।

একজন বিনীতভাবে বলে, আপনার কাছে একটা কবিতার জন্য এসেছিলাম। নেক্সট ইসু ডিসেম্বরে বেরোবে—

কবিতা! বলে সাগর একটু চেয়ে থাকে ছেলেগুলোর দিকে। তার বুকে অজান্তে জমে যায় শ্বাস। আস্তে সেই শ্বাসটুকু অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ে সাগর। বুকটা হঠাৎ খালি খালি লাগে। সাগর বলে, আমি তো ভাই এখন আর লিখি না।

কেন লেখেন না? আর্টিস্ট ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

পারি না। হয় না। বলে সাগর অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর রাখা নিজের দু'খানা হাতের দিকে চেয়ে থাকে। ছেলেগুলোর মুখের দিকে না—তাকিয়েই বলে, আমার শেষ কবিতা ছাপা হয়েছিল বছর দুয়েক আগে, তারপর আর বেরোয়নি। আপনারা আমার খোঁজ পেলেন কোথায়?

তৃতীয় ছেলেটি কথা বলেনি এতক্ষণ, এবার সে বলে, আপনার নাম অনেকের মুখে শুনি। একটা সংকলনে পড়েওছি আপনার কবিতা।

তীব্র সন্দেহে সাগর ছেলেটির দিকে তাকায়। একবার ভাবে ছেলেটা মিথ্যে কথা বলছে! ওকে দু'—একটা লাইন বলতে বলবে নাকি সাগর! তার মুখটাতে তীব্র বিদ্রূপ ঝলসায়। কিন্তু সামলে গেল। নিস্পৃহ গলায় বলে, কবিতার কথা থাক। আমি লিখতে পারছি না। আর কিছু দরকার আছে?

যে প্রথম কবিতা চেয়েছিল সেই ছেলেটি বিনীতভাবে বলে, একটা বিজ্ঞাপন যদি দিতেন। জানেন তো লিটল ম্যাগাজিন কী ভাবে চলে!

সাগর ছেলেটার মুখ থেকে সাদা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় চট করে। এটা সে জানত। বহু লিটল ম্যাগাজিনকে সে এখনও মায়াবশে বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দেয়। স্মিতমুখে নিজের আঙুলগুলির দিকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, বিজ্ঞাপন পাবেন। যদিও আমার কোম্পানি ছোট, আর পাবলিসিটির জন্য আমরা কিছু খরচা করি না, তবু দেব। এক দিন আমার ধর্মতলার অফিসে যাবেন সন্ধের পর।

ব্যাক কভারটা রেখে দেব?

সাগর উদাসীনভাবে বলল, রাখবেন।

কবিতা না দিলে কিন্তু ছাড়ছি না। সেই ছেলেটা বলে। তারপর তারা তিনজন পিছোতে থাকে, বলে, চলি তা হলে!

আসুন ভাই।

ক্লান্ত সাগর চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। কবিতা কথাটাই কি মদের মতো? বিদ্যুৎ চমকের মতো ও—কথাটা যত বার শোনে তত বার সে শিহরিত হয়। হতাশ হয়। উত্তেজিত হয়। নেশার ঘোরে এক অপার্থিব আলো—আঁধারি জগতের দিকে মনে মনে চেয়ে থাকে।

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই ছেলেদের দৌড়পায়ের আওয়াজ আর হো হো চিৎকার শোনা যায়। স্টাফরুমে ভিড় বেড়ে যাবে। সাগর উঠল।

দুপুরের আকাশে বাতাসের টানে হিলিয়াম বেলুনটা হেলে আছে। আর্ন মান্থলি ইন্টারেস্ট— লেখাটা শূন্যে শুয়ে আছে। ভেঙে পড়েছে দুপুরের রোদ কলকাতায়। সাগর কিছু দূর হাঁটল, তারপর ট্রামে উঠল। আজকের দুপুরটা মানিক তাকে ছুটি দিয়েছে। কিন্তু আসলে সাগরের ছুটি নেই। এক বার মজুমদারের কাছে যাওয়া খুবই দরকার। শেষ মুহূর্তে লোকটা বেগরবাঁই করতে পারে।

ম্যাঙ্গো লেনে কী করে যে মজুমদার অফিস খুলেছে সেটাই অবাক লাগে সাগরের। ধর্মতলায় সাগরের অফিসটা ছোট্ট আর ঘিঞ্জি। একটা বড় ঘরে তিনটে টিক প্লাইয়ের পার্টিশন দিয়ে তিনখানা অফিস ঘর, তারই একটা বহু কাঠখড় পুড়িয়ে জোগাড় করেছে সাগর আর মানিক। সেখানে তিন—চারজনের বেশি লোক এলে ঠাসাঠাসি হয়। কিন্তু অফিসটা বড় কথা নয় বলে এবং তাদের দুজনের বাইরে বাইরে ঘোরার কাজ বলে তারা অফিস নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু মজুমদার মাথা ঘামিয়েছে। ঢুকতেই অফিসের ছোট্ট কিন্তু বাহারি রিসেপশন রুম। দুটো ডানলোপিলোর কৌচ আছে মেঝেতে দড়ির কার্পেট। দেয়ালে লাগানো শীতলপাটির ওপর পটুয়াদের হাতের কাজ। চমৎকার একখানা কাঠের কাউন্টারের মতো, তার ও—পাশে চলনসই চেহারার রিসেপশনিস্ট মদিরা দত্ত। মদিরার আসল নাম ছিল মন্দিরা, মজুমদার 'ন'টুকু ছেঁটে নিয়ে নামটাকে একটু 'হট' করে নিয়েছে। মন্দিরার পিছনে ঘষা কাচ লাগানো পার্টিশন, স্প্রিং লাগানো ফ্লাশডোর। ওটা মজুমদারের ঘর, মদিরাকে পার না হয়ে মজুমদারের ঘরে ঢোকা যায় না। পার হওয়াটা বেশ শক্ত।

সাগরের মাথার ভিতরে তখনও খোয়াইয়ের শেষে ঝিরঝিরে নদীটি এবং তার ওপর রঙিন সাঁকোর দৃশ্যটা আবছা লেগে আছে, সে মজুমদারের রিসেপশনে ঢুকে মদিরাকে লক্ষ না করে মজুমদারের ঘরে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল।

মদিরা মিষ্টি হেসে বলল, নেই।

সাগর তার লম্বা চুলগুলোর ওপর অন্যমনস্ক হাত বোলাতে বোলাতে মদিরার দিকে চাইল। বাক্সম যাকে বলে মদিরা ঠিক তাই। একটু ভারী চেহারা, চৌকো থুতনি, রংটা খারাপ নয়। ঠোঁট অতিরিক্ত পাতলা বলে মুখ বুজে থাকলে হঠাৎ মনে হয় ওর ঠোঁট বলে কিছু নেই। ঠোঁট না থাক লিপস্টিক আছে ঠিকই, তাতে এইটুকু সুবিধে হয়েছে যে ঠোঁটের অবস্থান বোঝা যায়। চোখ দুটো বোধ হয় একটু গোল ধরনের, তাকে ম্যাসকারা, কাজল, রং দিয়ে দিব্যি বড় আর টানা করে ফেলেছে। ডোনারে বাঁধা খোঁপা। পরনে বম্বে ডাইং—এর চমৎকার ছাপা শাড়ি, হাতে পুরুষদের ঘড়ি। সামনে একটা টাইপরাইটার আর টেলিফোন। বস্তুত কোনও কাজ নেই বলে সারা দিন হাই তোলে, ঝিমোয় আর ভাবে মদিরা। মজুমদারের সঙ্গে লাঞ্চে যায় মাঝে মাঝে। মজুমদারের কাছে দু'রকম পার্টি আসে, দেনেওয়ালা আর লেনেওয়ালা। এক দল মজুমদারকে বিজনেস দেয়, অন্যদল মজুমদারের কাছে পেমেন্ট নেয়। এই দুটো দলকে খুব সতর্কতার সঙ্গে চিনে নিয়েছে মদিরা। সাগর লেনেওয়ালা। কাজেই নেই কথাটাকে বিশ্বাস করবে কি না ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেছে?

মদিরা মিষ্টি হেসে বলে, ইনকাম ট্যাক্সের হিয়ারিং আছে। বসুন না, এসে যাবে।
সাগর কৌচে বসে পড়ল। বলল, চা হবে মদিরা?
বাঃ, নিশ্চয়ই। কলিং বেলটা টিপতেই এক ঝাঁক মিষ্টি ঘুঙুরের শব্দ হল।
সাগর বলে, মজুমদার কলিং বেলটা পর্যন্ত পয়সা খরচ করে করেছে! না মদিরা?
মদিরা হাসে। হাসাটাই কাজ তার। বেয়ারা কোথা থেকে এল কে জানে। ভুঁইফোড়ের মতো সামনে এসে দাঁড়াল মুশকো একটা সাদা জিনের ইউনিফর্ম—পরা লোক। সে চায়ের অর্ডার নিয়ে চলে গেল।
সাগর মদিরার দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল, বলল, অফিসের ডেকরেশনের জন্য মজুমদার এত মাথা ঘামায় কেন বলুন তো?
অনেকে ডেকরেশন পছন্দ করে।
সাগর মাথা নেড়ে বলল, আমরা যে দরের কন্ট্রাক্টর মজুমদারও সেই দরের। খুব বড় কন্ট্রাক্টরের কথা ছেড়ে দিন, আমাদের মতো লোকের একটা ঠিকানা আর একটা টেলিফোন নম্বর হলেই হল। ফর করেসপন্ডেন্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ব্যস। যদি কাউকে কখনও এন্টারটেন করতেই হয় তো তার জন্য হোটেল রেস্টুরেন্ট বার আছে, কিন্তু তবু মজুমদার না হোক হাজার দশেক টাকা ঢেলেছে ডেকরেশনের জন্য। আপনিও অফিস ডেকর মদিরা।
মদিরা তার অদৃশ্য ঠোঁট বিস্তৃত করে হাসে। দাঁতগুলো একটু হলদেটে হলেও বেশ মজবুত, আখের গোড়া কিংবা খাসির ঠ্যাং চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলতে পারবে। চোয়ালও বেশ জোরালো। তবু হাসিটা দেখল সাগর। ওই হাসির আড়ালে মদিরার মনোভাব বুঝবে এমন সাধ্যি কার আছে! মদিরা সাগরের চোখ থেকে লজ্জার ভান করে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, মেয়েরা তো তাই!
কী?
সব জায়গাতেই মেয়েরা ডেকরেশন! ওইভাবেই তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে।
সাগরের এক বার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, মজুমদার আপনাকে কীভাবে ব্যবহার করে? শুধুমাত্র ডেকরেশন! এক বছর আগে মজুমদার তার বউকে ডিভোর্স করেছে, তারপর আর বিয়েও করেনি, এই সিচুয়েশনে আপনাকে কি কেবলমাত্র অফিসে সাজিয়ে রেখেছে মজুমদার বাঁকুড়ার ঘোড়া বা কেষ্টনগরের পুতুলের মতো? ব্যবহার করেনি?
আপনাদের বিজনেস তো দারুণ চলছে, মিস্টার মজুমদারের কাছে শুনি আপনারাই এখন রোরিং! মদিরা তার মুখখানা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে পাশ কেটে তেরছা চোখে সাগরের দিকে চেয়ে বলে।
ওই একরকম।
মদিরা হাসিটা বজায় রেখেই বলল, আপনারা সি এম ডি এ—র অর্ডারটা বড্ড কম রেটে ধরেছেন। আরও টু পারসেন্ট হাই দিলেও অর্ডারটা আপনারাই পেতেন, বেশ প্রফিট থাকত। অত কম দেওয়ার দরকার ছিল না।
সাগর একটু হাঁ করে রইল। মদিরার কাছ থেকে কথাটা আশা করেনি। বলল, ঠিকই। মজুমদার কত রেট দিয়েছিল?
আপনাদের চেয়ে অনেক হাই।
সাগর একটু হাসল, কেন হাই দিয়েছিল জানেন?
কেন?
ফর দিস অফিস অফ হিজ। এস্টাব্লিশমেন্টের খরচের জন্য। ও বড্ড গ্ল্যামার চায়। কম দিলে ওর পোষাত না। আপনার মাইনে, অফিসের ভাড়া, মেনটেনেন্স, ডেকরেশন এ—সব মিলিয়ে ওর খরচ অনেক, তাই মজুমদার সবসময়ে রেট বেশি দেয়, কন্ট্রাক্টও পায় না, আমরা কম রেট দিতে পারি, প্রফিটও করি।
করপোরেশনে আপনারা কত রেট দিচ্ছেন?

অনেক কম। এত কমে মজুমদার কখনও নামতে পারবে না। তাই আমরা হাশ—মানি নিয়ে অর্ডারটা ছেড়ে দিচ্ছি মজুমদারকে।

মদিরা গম্ভীর হয়ে গেল একটু। নিজের নখ দেখল খানিকক্ষণ। সাগর কৌচের ওপর দিয়ে গড়িয়ে মদিরার কাউন্টারের আরও একটু নিকটবর্তী হয়ে বলল, মজুমদারকে বলবেন এস্টাব্লিশমেন্টের খরচ আর—একটু কমাতে। ও যে পাঁচশো টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া দেয় সেটাও বড্ড বেশি টাকা। একা মানুষের অত বড় ফ্ল্যাট দিয়ে কী হবে!

চা এসে গেল, মুশকো লোকটা কাবার্ড খুলে চিনে ডিজাইনের অন্তত দশ—পনেরো টাকা দামের পাতলা পোর্সিলিনের পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে গেল। কাপটির গায়ে সূক্ষ্ম কারুকাজ মুগ্ধ হয়ে দেখল সাগর।

মদিরা হঠাৎ বলল, এটা ওর নেশা।

কোনটা? সাগর চায়ে প্রথম চুমুকটা দিয়ে বলে।

সবসময়ে এই সুন্দর থাকার চেষ্টা, এটাই নেশা। এর জন্য মাঝে মাঝে খুব কষ্ট পায়।

সাগর চুপ করে থাকে। ভাবে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার হঠাৎ খেয়াল হয়, মজুমদারের সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা মিল আছে। নিজের বাড়িতে কত অগাধ টাকা খরচ করে সাগর কত ডেকরেশন করেছে, দেখলে বোধ হয় মজুমদারেরও মাথা ঘুরে যাবে।

সাগর চা শেষ করে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা সবে বের করে নাড়াচাড়া করছে, ঠিক সে সময়ে বাইরে একটা চমৎকার পিঙ্ক রঙের গাড়ি এসে থামল। নতুন স্ট্যান্ডার্ড গাড়ি। পিছনের দরজা খুলে যেতেই প্রথমে এক জোড়া পা বেরিয়ে এল, পায়ে কাথবার্টসনের কম্বিনেশন, তার ওপরে হালকা ধূসর রঙের দামি প্যান্ট, তারও ওপরে একটা বম্বে ডাইং—এর চেকার্ড শার্ট দেখল সাগর। এ—সব সত্যিকারের পয়সায় কেনা জিনসের মোড়কে রয়েছে মজুমদার। নেমে দরজা বন্ধ করে কাকে যেন নিচু হয়ে বাই জানাল মজুমদার, হাতটা তুলল, মুখে পেটেন্ট হাসি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল।

আরে চ্যাটার্জির কী খবর?

সাগর সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল।

মজুমদারের বয়স চল্লিশ সবে পেরিয়েছে। কদিন আগেও পঁচিশ—ছাব্বিশ বলে চালিয়ে দেওয়ার মতো চেহারা ছিল মজুমদারের। মাজা গায়ের রং, অত্যন্ত মোলায়েম ব্রনহীন টান গায়ের চামড়া, মাথায় ঢেউ খেলানো ঘাড় পর্যন্ত চুল, কাটা—কাটা চোখা বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। একটু বেঁটে, কিন্তু তাতে কিছু যায়—আসে না। বেঁটে বলে মজুমদারের বিন্দুমাত্র হীনম্মন্যতা কেউ কোনওকালে দেখেনি। সেই চেহারা এখনও আছে। তবু কোথায় যেন একটা ধস নেমেছে মজুমদারের। চোখের সেই চিকিমিকি বুদ্ধির জোনাকি যেন হঠাৎ নিভে গেছে। চমৎকার লালচে মধু রঙের চুলের রাশিতে ভেসে উঠেছে কয়েকটা রুপো রঙের চুল। একটু অন্যমনস্ক দেখায় মজুমদারকে। আর ঘাড়টায় একটু ঝুঁকে পড়া ভাব। আজকাল মজুমদার পিছন থেকে কেউ ডাকলে টক করে ঘাড় ঘোরায় না।

কথা আছে মজুমদার। সাগর বলল।

মজুমদার মুখের একটু ঝাঁকুনিতে কাচের দরজার ও—পাশে নিজের ঘরটা ইঙ্গিত করে চমৎকার ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়ে দরজাটা ঠেলে ধরে রইল। মুখে সেই হাসিটি। একটু ম্লান, তবু সাদা দাঁতের জন্য হাসিটা এখনও ভালোই দেখায়।

সাগর মজুমদারের ঘরে ঢুকেই শীত তাপনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া আর মৃদু একটা ঘর—সুগন্ধির গন্ধ পেল। লাঙলের মতো আকৃতির বড় গ্লাস—টপ টেবিল, টেবিলের মুখোমুখি ঘন সবুজ নরম গদির চেয়ার। টেবিলের কাচের নীচে আমস্টারডাম, সুইজারল্যান্ড আর কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের রঙিন কয়েকটি ছবি।

মজুমদার তার সুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসল। ফিলটার টিপড গোল্ডফ্লেক ধরাল। তারপর বলল, চ্যাটার্জি, চা?

এইমাত্র খেলাম।

মজুমদার চাবির রিঙের ছোট্ট একটা উকো দিয়ে একটা নখের আগা ঘষে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাতখানা দেখল, একটু অস্বস্তি বোধ করছে সন্দেহ নেই। বোধ হয় মজুমদারের আত্মবিশ্বাস অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। কেমন সুন্দর অকপট সত্যের মতো অনর্গল মিথ্যে কথা বলতে পারত, আর চোখ—মুখে হাসির সিনক্রোনাইজড খেলা দেখাত মজুমদার! ঘোরানো ঘাড়টা আর আজকাল সহজভাবে রাখতে পারে না সে।

সাগর একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

মজুমদার শব্দ করে চাবির গোছা টেবিলে ফেলে দিয়ে একটা শ্বাস ফেলল। বলল, চ্যাটার্জি, বলুন।

সাগর চোখে চোখ রেখে বলল, আমাদের কালকের অ্যাপয়েন্টমেন্টটার ব্যাপার কনফার্ম করতে এসেছি।

ও তো মানিকবাবুর সঙ্গে ঠিক হয়েই আছে চ্যাটার্জি। মুশকিল হচ্ছে আরও দু'—একজন টেন্ডারার নাক গলাতে পারে বলে আন্দাজ করছি।

নাক গলালে কী হবে?

কী হবে আপনি বলুন!

আমরা হাশমানি কার্টেল করব না মজুমদার।

মজুমদার শ্বাস ফেলল। কথা বলল না।

ও কে? সাগর জিজ্ঞেস করল।

মজুমদার নোয়ানো ঘাড়টা তুলবার একটা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তল চোখে সাগরকে দেখে নিল একটু। তারপর আস্তে বলল, চ্যাটার্জি, আপনারা তো আমার অবস্থা জানেন।

সাগর নিষ্ঠুর হাসির সঙ্গে বলল, ইট ইজ এ টাফ ওয়ার্ল্ড মজুমদার।

ইনডিড! মজুমদার নিরাসক্ত উত্তর দেয়। সিগারেটের ধোঁয়াটা বুঝিবা বিস্বাদ লাগে তার। হাঁ করে ধোঁয়াটা ছেড়ে মুখটা বিকৃত করে মজুমদার। তার কপালের ঘাম দামি সাদা রুমালে মুছে নেয় এবং এই প্রথম ঘর—সুগন্ধি আর সিগারেটের গন্ধ ভেদ করে এক ঝলক অ্যালকোহলের গন্ধ পায় সাগর।

সাগর একটু চাপা স্বরে বলে, মজুমদার, আজকাল দুপুর থেকেই মাল চালানো হচ্ছে?

মজুমদার কাঠ—হাসি হাসল, বলল, ইনকাম ট্যাক্সের একটা ছোকরাকে খাওয়ালাম। স্কচ। খাওয়াতে গিয়ে একটু খেতেও হল। সেইটেই বিপদ করেছি, একটু খেলে তেষ্টা বাড়ে।

বলে একটা পেপারওয়েট তুলে নিয়ে টেবিলের কাচের ওপর একটুক্ষণ গড়িয়ে দিল মজুমদার। তারপর হঠাৎ বলল, যাবেন চ্যাটার্জি?

কোথায়?

নিরিবিলিতে কোথাও গিয়ে গেলাস নিয়ে একটু বসি। দি বিল ইজ অন মি!

সাগর একটু দ্বিধা করল। ভরদুপুর, এ—সময়টায় সে কখনও খায় না। নানা রকম পার্টি ভিজিট করতে হয়। দ্বিধাটা বেশিক্ষণ অবশ্য রইল না। হঠাৎ তার মনে পড়ল কবিতাটা আটকে আছে। রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো, ও পাশে স্বপ্নের ... তারপরই রুদ্ধ দুয়ার। কবিতার বদ্ধ অর্গল আর খুলবে না সহজে। কত বার ব্যর্থ করাঘাত করবে সাগর! কিন্তু দূরে অন্তরীক্ষে, যেখানে এক মায়াময় জগতে কবিতার শরীর নির্মিত হয়, সেখান থেকে সাবলীল সরীসৃপের মতো বাদবাকি পঙক্তি ক'টা আর নেমে আসবে না বহু দিন। আধখানা কবিতা কোলে নিয়ে বসে থাকবে সাগর অপেক্ষায়। এই একটানা অপেক্ষা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই সে বলল, চলুন।

খুশি হল মজুমদার। উঠে বলল, দেন লেট আস কল ইট এ ডে!

বাইরে এসে মদিরাকে লক্ষ্য করে মজুমদার সংক্ষেপে বলল, আর ফিরছি না আজ মদিরা, সময় হলে বন্ধ করে চলে যেয়ো। কাল টেন্ডারের দিন, একটু তাড়াতাড়ি এসো।

মদিরা কথা বলল না। কেবল উৎসুক চোখ তুলে দুজনকে দেখে কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করল।

সাগর মদিরার দিকেই অপলক চেয়ে রইল একটু। ও কি মজুমদারের প্রতি একটু...? কে জানে বাবা! এ—সব মেয়েদের হৃদয় বড় একটা থাকে না। নির্মম ঔদাসীন্যে দেহ দান করে। দুর্বল হয় না। কিন্তু মদিরা? সাগর ঠিক বুঝতে পারে না।

বাইরে এসে দুপুরের ফাঁকা একটা ট্যাক্সি ধরে মজুমদার। পিছনের সিটে পাশাপাশি বসে গোল্ডফ্লেক এগিয়ে দিয়ে বলে, আজ মাছের মতো গিলব; বুঝলেন চ্যাটার্জি?

কেন?

এমনিই।

মজুমদার, আপনাকে দেখে একটা ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হয় আজকাল। কেন বলুন তো?

মজুমদার উত্তর দিলে না। একটু চুপ করে থেকে মাথার চুল আঙুল দিয়ে ঠেলে পিছনে টান করতে করতে বলল, কেন মনে হয় চ্যাটার্জি? আমার কি টাক পড়েছে? নাকি চোখের নীচে কাকের পা দেখা যাচ্ছে? বুড়ো দেখাচ্ছে? না তো কী!

কী জানি! শরীর—টরির কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। তবু কী একটা হয়েছে।

মজুমদার ঠোঁটে একটা অবহেলার ভঙ্গি করে বলল, ও কিছু না। দু'দিন ফুর্তি করলেই ঠিক হয়ে যাবে। টেন্ডারের জন্য একটু ভাবতে হচ্ছে তো। ভয়ও হচ্ছে। লাখ দুয়েক টাকার কাজ, হাশমানি চলে যাচ্ছে বিশ হাজার, তারপর খাওয়ানো টাওয়ানো আছে। কী তুলে আনতে পারব কে জানে!

সাগর মাথা নেড়ে বলে, কাজটা নিট। কোনও ঝামেলা নেই। আপনি মাল কিনতে শুরু করুন, দরকার হলে আমরা মাল সাপ্লাই দেব। ভাববেন না।

থ্যাঙ্ক ইউ। বলে মজুমদার। তবু অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে চুলে আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকে। বোধ হয় নিজের অস্তিত্বে ভাঙচুরের শব্দ শোনে। ভেঙে পড়ছে মিনার, স্তম্ভ, দেওয়াল, ভেঙে পড়ছে বিশ্বাস ও ভালোবাসা। সাগর ভাবে।

একটা অখ্যাত বার—রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করল মজুমদার। জায়গাটার একটাই গুণ, নিরিবিলি। একটার পর একটা কেবিন ফাঁকা পড়ে আছে। মজুমদার আর সাগর তারই একটায় মুখোমুখি বসল।

কী খাবেন চ্যাটার্জি?

বিয়ার।

দূর! স্কচ খান। যত খুশি। দি বিল ইজ অন মি!

সাগর হাসল।

স্কচেরই অর্ডার দিয়ে মজুমদার সিগারেট ধরল। বলল, চ্যাটার্জি, একটা কথা বলবেন?

কী?

আমি শুনেছি, আপনি মাস্টারি করেন আর কবিতা লেখেন!

ঠিক।

কিন্তু আবার আপনিই একজন টাফ বিজনেস—ম্যান। কন্ট্রাক্টরির লাইনে আমি আপনার চেয়ে ক্রুয়েল লোক দেখিনি। আপনার মাস্টারি আর কবিতা কি একটা ক্যামোফ্লেজ চ্যাটার্জি?

সাগর ভ্রূ কুঁচকে বলে, আমি ক্রুয়েল?

মজুমদার শ্বাস ফেলে বলে, যারা ক্রুয়েল তারা অনেক সময়ে টের পায় না তারা কতখানি ক্রুয়েল। চ্যাটার্জি, আপনি যখন বিজনেস টার্মসে আসেন তখন কেউ আপনার ওপর এক পয়সা বারগেইন করতে পারে না। আপনার হৃদয় নেই। কী করে হল এই মেটামরফসিস?

স্কচ এসে গেল। নামে স্কচ, আসলে ভেজাল মাল। গেলাসটা মুখে তুলেই বুঝতে পারে সাগর। তবু অনেকটা একেবারে গিলে সিগারেট টেনে আস্তে করে বলে, লোকে আমাকে ও—রকম তৈরি করেছে মজুমদার।

মজুমদার একটু চাপা গলায় বলে, চ্যাটার্জি, আপনার পার্টনার মানিক সেন বিজনেস ভালোই বোঝে। লোকটার সাহস আছে, চটপটে, এফিশিয়েন্ট। কিন্তু ও আপনাকে যমের মতো ভয় পায়, কোনও কাজ আপনাকে না—জানিয়ে করে না। অথচ ক্যাপিটালও ওর, আপনি শুধুমাত্র ওয়ার্কিং পার্টনার ছিলেন।

সাগর গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, ও—সব কথা থাক।

আমি কথাটা অন্য সেন্সে বলছি। আমি জানতে চাইছি, হাউ টু বি ক্রুয়েল লাইক ইউ? আমি কোনওকালে টাফ হতে পারিনি। আমার নেচারটা বড্ড উইক চ্যাটার্জি।

গ্লাসটা হাতের মুঠোয় ঘুরিয়ে সাগরের গ্লাসের গায়ে নিজের সরু আর লম্বা একটা মুখচ্ছবি দেখল। বলল, আমি সত্যিকারের বিজনেসম্যান নই মজুমদার। আমি আসলে বোধহয় একজন ব্যর্থ কবি। আর ব্যর্থ কবিরা খুব ডেঞ্জারাস হয়।

মজুমদার কথাটা ঠিক বুঝল না। কিন্তু হাত নেড়ে মাছি তাড়ানার মতো কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনি এ—লাইনে এলেন কী করে?

সাগর মজুমদারের মুখের দিকে চেয়ে বুঝবার চেষ্টা করল লোকটা ইয়ারকি করছে কি না। না, করছে না। মজুমদারের অর্ধেক মন এখন স্কচের ভিতর ডুবে আছে। আধো—মাতালরা কিছুটা অকপট হয়।

সাগর বলল, আমার বাড়িওয়ালা এক বার আমাকে তুলে দিয়েছিল। যে পদ্ধতিতে তুলে দিয়েছিল সেটা বড্ড মিন। লোকটা খুব একটা খারাপ ছিল না, কিন্তু ওর একটা কালো বেঁটে ঝি টাইপের বউ ছিল। সেই বউটা দিনরাত ওপর থেকে গালাগাল করত। অশ্রাব্য গালাগাল। বউকে বোধ হয় লোকটাই লেলিয়ে দিয়েছিল। যাকগে, বিস্তর ঝামেলা শুরু হওয়ার পর আমি বাড়িটা ছেড়ে দিই। একটা বস্তি ধরনের বাসায় গিয়ে উঠি। আর তখন থেকেই আমি আস্তে আস্তে পালটে যেতে থাকি। আগে কবিতা লিখতাম, টাকা পয়সা সুখ সচ্ছলতা এ—সব চিন্তাও করতাম না। কবিতা সব ভাসিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু এখন কবিতাই ভেসে গেছে।

মজুমদার শুনছিল। একটু হাসল। তারপর বলল, ইজ ইট? তারপর পিছনে হেলে চোখ বুজে একটু ক্লান্ত হয়ে বলল, কিন্তু চ্যাটার্জি, আপনার নিষ্ঠুরতা অর্জিত নয়। ওটা জন্মগত।

সাগর মাথা নাড়ল না। বাড়িওলা ব্যাপারটা শুরু করেছিল, তারপর ক্রমশ ব্যবসায় নেমে আরও অনেক ফড়ে, চিট আর দালালদের পাল্লায় পড়ে আমার স্বভাব পালটেছে। নইলে আমি ভারী ভাবপ্রবণ মানুষ ছিলাম মজুমদার।

মজুমদার আবার অদৃশ্য মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়ল। বলল, আমি ব্যবসাতে আছি আজ বিশ বছর। ফড়ে, চিট আর দালাল আমার নিত্যসঙ্গী। তবু আমি ক্রুয়েল হতে পারি না কেন?

আপনি ক্রুয়েল হতে চান কেন?

মজুমদার দীর্ঘ সময় ধরে মদ্যপান করল নিঃশব্দে। তারপর মুখ তুলে বলল, আই ওয়ান্ট টু টিচ হার এ লেসন!

কাকে?

আমার বউকে?

সে তো কেটে গেছে শুনেছি। এভাবে কথাটা বলে সাগর লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু মজুমদার মাইন্ড করল না।

ইয়াঃ! বলে ম্লান একটু হাসে মজুমদার, বলে, উইমেনস আর এ করাপ্ট রেস চ্যাটার্জি। এতকালের বউ, দশ বছর বিয়ের পর ক্লিন হেঁটে বেরিয়ে গেল একটা কমবয়সি ছোকরার জন্য।

ও—সব কথা থাক না মজুমদার।

আরে দূর, থাকবে কেন? গোপন ব্যাপার তো কিছু নয়, সবাই জানে। ছোকরাটা স্মার্ট ছিল, হ্যান্ডসাম ছিল। অনেক পরিবারেই দেখবেন এ—রকম এক—আধটা ছোকরা আসা—যাওয়া করতে করতে আত্মীয়ের মতো হয়ে যায়। দাদা বউদি বলে ডাকত, ফাইফরমাশ করে দিত। ওদের মধ্যে যে রিলেশন গ্রো করছে তা

অবশ্য আমি বুঝতে পারতাম। বউয়ের চোখই সে—কথা বলে দিত। তবু গা করিনি। কাজকর্ম নিয়ে আছি, বউ যদি একটু এনজয় করে করুক না। আই ডিড নট মাইন্ড! আচমকা বউ ডিভোর্স চাইতেই আমি বোমকে গেলাম। ডিভোর্সের কোনও দরকার ছিল না, বুঝলেন চ্যাটার্জি? ডিভোর্স ছাড়াই চলত। কিন্তু ছোকরাটার বোধ হয় সেন্স অব পজেশন খুব প্রবল, দখলদারি বা স্বামিত্ব চায়। কিন্তু কী যে মুশকিল! ছোট ছেলেটা একটু নুলো মতো, একটু হাবা, আমার ভারী আদুরে ছিল। বড় ছেলেটাও বাপকে ভালোই বাসত। বউ পরের মেয়ে, কিন্তু বাচ্চাগুলো তো আর তা নয়। বউকে অনেক বোঝালাম। বুঝল না। এমনকী আমার শাশুড়ি পর্যন্ত এসে বউয়ের পক্ষ নিল, আমাকে বলল, তুমি মাতাল, মেয়েমানুষের দোষও আছে, আমার মেয়ে যদি আবার বিয়ে করতে চায় তো তাই দেব।

বিয়ে করেছে? সাগর সামান্য কৌতূহল দেখায়।

না, এখনও করেনি। ছোকরাটা ভালো চাকরি করে, প্রচুর ঘুষ পায়। আমার বউ আর শাশুড়ি একটা বাসায় থাকে, সেটার সব খরচা ও দেয়। আমার শ্বশুরবাড়ির তরফটা একটু ইয়ে... বুঝলেন... ছোটলোক আর কী! পয়সা খুব চেনে। শাশুড়িরও এই মেয়ে ছাড়া কাছের মানুষ কেউ নেই, আর—এক মেয়ে দিল্লি না কোথায় যেন থাকে! যাকগে, তারা এখন সেই আলাদা বাসায় আছে। ছোকরাটা খরচ দিচ্ছে, ভালো খাচ্ছেদাচ্ছে, বুঝলেন?

সাগর মাথা নাড়ল।

সেই বাসায় ছোকরা রোজই যায়, সিনেমা টিনেমা দেখে বেড়ায়। বলে একটু চুপ করে ভাবল মজুমদার। তারপর শ্বাস ফেলে বলে, আমিও যাই।

যান? সাগর অবাক হয়।

ওটাই আমার উইকনেস চ্যাটার্জি, বলেছিলাম না কী করে আপনার মতো ক্রুয়েল হওয়া যায়, আমিও হতে চাই! এইজন্যই বলছিলাম। নুলো ছেলেটার জন্য চকোলেট, জামা প্যান্ট কি খেলনা না নিয়ে গিয়ে পারি না। এক বার না দেখলে ভারী খারাপ লাগে। এখনও গেলে বাবা বলে ডাকে, বুঝলেন!

আপনি যে যান, আপনার বউ আপত্তি করে না?

না। এখনও খোরপোশ পাচ্ছে তো, তাই আপত্তি করে না। তবে আমি যে—সময়টায় যাই সেই সময়টায় অর্থাৎ রাত সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা, তখন ও বাসায় থাকে না। শাশুড়ি থাকে, চা করে দেয়, নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে দু'—চারটে কথাবার্তাও বলে।

নাকে আঁচল চাপা দেয় কেন?

মদের গন্ধ পায় যে! আমি ঘণ্টাখানেক আমার ছেলে দুটোর মধ্যে ডুবে থাকি। বুঝলেন চ্যাটার্জি, ছেলেদুটো ছাড়া আমার আর কোনও পিছুটান নেই। সেদিক দিয়ে আমি মুক্তপুরুষ।

সাগর বোধ হয় একঝলক কমলার কথা ভাবল। বিষণ্ণ হয়ে গেল মনটা। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, স্ত্রীর জন্য আপনার কষ্ট হয় না?

মজুমদার একটু ভ্যাবলা চোখে চেয়ে রইল সাগরের মুখের দিকে। তারপর গ্লাস তুলে অনেকক্ষণ ধরে স্কচ খেল। পাঁপড় ভাঙল এক টুকরো, হাতটা কাঁপছে, পাঁপড়টা মুখের কাছে তুলে আবার কী ভেবে অ্যাশট্রের ভিতরে গুঁড়ো করে ফেলে দিল। বলল, চ্যাটার্জি, কেবলমাত্র সেক্সুয়াল রিলেশন থাকলে মেয়ে পুরুষ কখনও সত্যিকারের স্বামী—স্ত্রী হতে পারে না। আমার হয়েছিল তাই। আমাদের রিলেশনটা কেবল ওটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উই নেভার বিকেম রিয়াল হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। কিন্তু তবু বলি, বউটার জন্য একটু কষ্ট কখনও সখনও হয়। মাঝরাতে হঠাৎ নেশা ছুটে জেগে উঠলে, বা যখন শাড়ির দোকানের পাশে হাঁটি বা যখন বন্ধুবান্ধবদের দেখি বউয়ের নামে বাড়ি টাড়ি করছে তখন হয়। কিন্তু সেটা কাটিয়ে ওঠা শক্ত নয়। বউ ছেড়ে চলে গেছে বলে একটা রাগ তো আছেই, সেটাকে চাগিয়ে তুলি মনের মধ্যে, চিড়বিড় করে গাল দিই অশ্রাব্য সব ভাষায়—বেশ্যা ফেশ্যা বা ওই ধরনের সব কথা। রাগটা চাগিয়ে উঠলে কষ্টটা একটু কমে।

রাগের ঝাঁজটা কিন্তু ভারী ডিলিশাস। একা একা বউয়ের ওপর রাগ করে মনে মনে নানা রকম ডায়ালগ তৈরি করে দেখবেন, বেশ সময় কেটে যায়, ভালো লাগে।

সাগর হেসে ফেলল।

ভুল বললাম চ্যাটার্জি?

সাগর মাথা নেড়ে বলে, না। ভুল বলেননি।

বউয়ের ওপর রাগ করতে ভালো লাগে না?

লাগে।

ডিলিশাস।

বলে চুপ করে থাকে মজুমদার। দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে মদ খায়।

মজুমদার একসময়ে হঠাৎ বলে, আমাকে আপনার ঘেন্না হচ্ছে?

ঘেন্না হবে কেন?

আমার জায়গায় আপনি হলে চ্যাটার্জি, আপনি কিন্তু কিছুতেই বউয়ের বাসায় যেতেন না। যেতেন?

না। সাগর তার ভরাট গলায় নিশ্চিত স্বরে কথাটা বলে।

জানতাম, আপনার ক্রুয়েলটিটা ভারী সুন্দর। হিংসে হয়। আমি না—গিয়ে পারি না।

এ—সব ব্যাপারে একটু শক্ত হতে হয় মজুমদার। নিজেকে সহজপ্রাপ্য করে তুললে দাম থাকে না।

জানি চ্যাটার্জি, তবে নিজেকে বদলাবার সময় মানুষের একসময় পেরিয়ে যায়। আমি সোমনাথ মজুমদার আর কোনও দিনই সাগর চ্যাটার্জি হতে পারব না।

বিল মিটিয়ে দিয়ে যখন তারা উঠল তখন বিকেল পড়ন্ত। এ—সময়ে বেলা বড় তাড়াতাড়ি ফুরোয়। সাগরের ঝুমঝুমে একটু নেশা হয়েছে। মজুমদার একটু বেশ অনর্গল কথা বলছে তবে মাতলামি করছে না। সাগর ওর কথায় আর কান দিতে পারছিল না। কবিতার দুষ্প্রাপ্য পঙক্তি তার মাথার ভিতরকার এক গাছকে নাড়া দিচ্ছে। টুপটাপ ফুলের মতো অসংলগ্ন কিছু শব্দ ঝরে পড়ে। কষ্ট হয় সাগরের।

এ—সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। অফিস ভেঙেছে সদ্য। সাগর একটা ওষুধের দোকান থেকে অফিসে ফোন করল। ড্রাইভার মুকুন্দ এ—সময়ে ফোন ধরে। সে—ই ধরল।

গাড়িটা নিয়ে এসো মুকুন্দ।

কোথায় আছেন আপনি?

সাগর জায়গাটা বলল।

তারপর দুজনে কথা বলতে বলতে চতুর্দিকের উলটোপালটা জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

সাগর জিজ্ঞেস করল, কোথায় পৌঁছে দেব মজুমদার? আমার গাড়ি আসছে।

কোথায় যাব? এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব খানিক, তারপর সন্ধে হয়ে গেলে ছেলে দুটোকে দেখতে যাব। একটু রাত হবে। বেরিয়ে এসে আর খানিকটা গিলে বাসায় ফিরব।

আমি আপনাকে কিছুক্ষণ কম্প্যানি দিতে পারি।

মজুমদার একটু চুপ করে থেকে বলে, অলরাইট চ্যাটার্জি, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কালকের পেমেন্টের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই তো?

আপনি তো দিচ্ছেন!

দিচ্ছি, ক্যাশ ডাউন। এই অর্ডারটা না—পেলে আমি টিকে থাকতে পারব না।

তা হলে আর সন্দেহ কী?

চ্যাটার্জি, আর কোনও পার্টি যেন না আসে।

আসবে কেন?

এর আগে সাপ্লাইয়ের অর্ডারটার সময়ে মানিকবাবু কয়েকজন উটকো লোককে ধরে এনেছিলেন টেন্ডারার হিসেবে। ওরা তা নয়, বেকার বন্ধু টন্ধু হবে। কিছু মুফত পাইয়ে দেওয়ার জন্য ওদের ভেড়ানো। ও—রকম কিছু যেন না হয় দেখবেন।

মানিকটার কোনওকালে আক্কেল নেই। ও মাঝে মাঝে দু'—চারজন বন্ধুকে টেন্ডারার বলে চালিয়ে হাশমানি আদায়ের চেষ্টা করে। সাগর ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত চোখে সামনের দিকে চেয়ে রইল একটু। লজ্জা করছিল তার। বলল, হবে না, কিন্তু পেমেন্টের ব্যাপারে যেন কোনও—

মজুমদার হাত বাড়িয়ে সাগরের হাত ধরল, তারপর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, যে—ছোকরাটার জন্য আমার বউ ভেগেছে সেও একজন কবি, বুঝলেন চ্যাটার্জি?

সাগর চমকে বলে, কী নাম?

কিছু একটা হবে। বলে হাস, তারপর বলল, কবিরা খুব ডেঞ্জারাস হয় চ্যাটার্জি। একটা জীবন আমি কবি—টবিদের পাত্তাই দিইনি। কিন্তু এখন কবি শুনলেই আমার ভিতরটা চমকে ওঠে।

বটে?

তাই আজকাল আমি কবিতা পড়ি।

সে কী?

মজুমদার হাসে, মাইরি পড়ি। রাশি রাশি বই কিনেছি। পড়ি, কিছু মাথায় ঢোকে না। শব্দগুলো মাথার ভিতরে খটাখট করে নড়েচড়ে, ঘুঁটির মতো। তবু পড়ি, বোঝবার চেষ্টা করি।

আশ্চর্য। খামোকা অত কষ্ট করেন কেন?

আই ওয়ান্ট টু বি এ পোয়েট চ্যাটার্জি! কবিরা খুব নিষ্ঠুর হয় চ্যাটার্জি।

নতুন একটা সবুজ ফিয়াট সামনে এসে দাঁড়াল, মুকুন্দ দরজা খুলে দেয় ভিতর থেকে।

চলুন মজুমদার। বলে সাগর। দুজনে ওঠে।

চার

রাত গড়িয়ে যাচ্ছে। ন'টার গাড়ির প্যাসেঞ্জাররা এসে গেল। সাগর ফিরল না।

দোতলার বারান্দা থেকে কমলা পুকুরপাড়ের রাস্তায় চলন্ত লোকজন দেখে ঘরে এল।

সিন্ধু ভাইপো—ভাইঝিদের নিয়ে মেঝেয় বসে গল্প ফেঁদেছে, গনপত এখনও ছাদে ঘুমোচ্ছে।

কমলা বলে, তোর দাদা সেই দশটার গাড়িতে আসবে হয়তো। অনেকটা জার্নি করে এসেছিস, তোদের ভাত দিই, খেয়ে শুয়ে পড়।

সিন্ধু মুখ তুলে বলে, খিদেই নেই, খাব কোন পেটে? দাদা আসুক।

কমলার বুক একটু কাঁপছিল। সাগর যদিও কখনও মাতাল হয়ে ফেরে না, তবু মাঝেমধ্যেই আজকাল একটু—আধটু খেয়ে ফেরে। একটু লালচে দেখায় তখন সাগরের মুখ, চোখ জ্বলজ্বল করে, ভলকে ভলকে অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া যায়। সিন্ধু কখনও তো দাদার এ অবস্থা দেখেনি। যদি দেখে তা হলে কী ভাববে! কমলা তাই চায় না আজ রাতে দুই ভাইয়ে দেখা হোক।

বলল, শুধু শুধু বসে থাকবি কেন? নীচের ঘরে বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো যা পারিস খেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়। দাদা তো পালাচ্ছে না।

বড্ড জ্বালাও বউদি, বলছি দাদা আসুক! কতকাল দাদার সঙ্গে দেখা নেই।

আহা, দেখা তো ভারী! তোরা দু'ভাইয়ে তো কথাই বলিস না। দাদার সামনে কেন কাঠ হয়ে বসে থাকিস সিন্ধু, দাদা কি ভালুক?

সিন্ধু হাসল, বলল, আমাদের সম্পর্কটা ও—রকমই দাঁড়িয়ে গেছে। দাদা আমার চেয়ে কত বড় জানো? বারো বছরের। তা বলে ভেবো না যে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নেই!

তা ভাবি না রে, সবই জানি। তোদের সংসারে আমি তো নতুন বউদি নই। আমাদের বাপের বাড়িতে দাদাদের কিন্তু তোদের মতো সম্পর্ক নয়। হই—হুল্লোড় করে, ঠাট্টা—ইয়ারকি করে, ঠিক বন্ধুর মতো। তোরা দু'ভাই যেন দুই আধচেনা ভদ্রলোক, বহুদিন বাদে দেখা।

কমলা আবার বারান্দায় আসে। নীচের রাস্তার দিকে তাকায়। ভয় করে। সিন্ধু তার দাদাকে কত গভীর ভালোবাসে, সেখানে সামান্য মাত্র কোনও আঘাত কমলাও সহ্য করতে পারবে না।

আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট পর সিন্ধু হাই তুলতে লাগল। চোখ দুটো রক্তাভ। জয়া আর সৈকত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বারান্দায় বউদির কাছে এসে সিন্ধু বলে, দাদা বড্ড ঝোলাচ্ছে তো আজকে। কাল সারাটা রাত ঠায় জেগে এসেছি। আর পারা যাচ্ছে না।

গনপতকে ডাক, খেতে দিই।

তাই দাও। কাল সকালেই দাদার সঙ্গে দেখা হবে দেখছি।

কমলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ওরা খেয়ে শুতে চলে গেল।

অবসর পেয়ে আবার অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়াল কমলা। উদ্বেগ নিয়ে চেয়ে থাকে।

এগারোটার ঘণ্টি পড়ল দেওয়ালঘড়িতে। ঝি মেয়েটা খাওয়ার ঘরের মেঝেয় পড়ে ঘুমোচ্ছে। বড্ড মশা কামড়ায়। ঘুম চোখেই চটাং চটাং মশা মারছে।

একটা সাদা আলো বাঁক ফিরে রাস্তায় পড়ল। খুব উজ্জ্বল আলো। ফিয়াট গাড়িটা মোড় ঘুরে বাঁক নিতেই কমলা অনেকক্ষণ চেপে থাকা একটা শ্বাস বুক থেকে ছাড়ে। তারপর গ্রিলের গেটের তালার চাবি নিয়ে নীচে নেমে আসে।

নেশা সামান্য বেশি হলে সাগর গাড়িতে আসে।

গেট খুলে কমলা দাঁড়িয়ে থাকল। সাগর যখন গাড়ি থেকে নামল তখন তীকষ্ন চোখে লক্ষ করল কমলা। না, ভয়ের কিছু নেই। স্বাভাবিকই আছে সাগর। পা টলছে না। গাড়ির জানালায় ঝুঁকে মুকুন্দকে চলে যেতে বলল। গলাটা পরিষ্কার, জড়ানো নয়।

মুখোমুখি দেখা হয়। কিন্তু কথা বড় একটা হয় না। আজও হত না, কেবল কমলা চাপা স্বরে বলল, সিন্ধু এসেছে।

সিন্ধু!

সিঁড়ির আলোটা মাত্র ষাট পাওয়ারের। এ—অঞ্চলে বিদ্যুৎ বড় কমজোরি, তাই সেই আলোতে কারও মুখের ভাবান্তর বোঝা কষ্টকর। তবু কমলা দেখল 'সিন্ধু' উচ্চারণ করেই সাগরের মুখের রুক্ষ রেখাগুলি সহজ নম্রতায় ডুবে যায়। স্নিগ্ধ হয়ে আসে মুখশ্রী।

কোথায়?

ঘুমিয়েছে।

বাড়ির খবর কী?

ভালো।

আর কথা হল না। নিঃশব্দে তারা আবার ওপরে আসে। সাগর পোশাক ছাড়ে। বাথরুমে যায়। খেতে বসে।

সবই অফিসের কাজের মতো নিয়মমাফিক হয়ে যায়।

সারা রাত মোষের মতো ঘুমিয়েছে সিন্ধু। একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোত, কিন্তু পারল না গনপতের জন্য। ভোর ভোর উঠে গনপত আজকাল এক্সসারসাইজ করে ভুঁড়ি কমানোর জন্য। গনপতের দোষ নেই। সিন্ধুই তাকে

বলে ব্যায়াম ধরিয়েছে, বলেছে, গায়ের চর্বি কমা রে মেড়ো, নইলে তোর দ্বারা হার্ডশিপ হবে না। মাড়োয়ারিদের গুণগুলো কিছু পাসনি, দোষগুলো আছে পুরোমাত্রায়।

সে কেমন? জিজ্ঞেস করেছে গনপত।

এই যে তার থলথলে ভুঁড়ি, গায়েগতরে চর্বির থাক, এ—সব হচ্ছে মাড়োয়ারির দোষ। আর মাড়োয়ারির যে ব্যবসার মাথা, কষ্টসহিষ্ণুতা, এ—সব গুণ তোর নেই, একটা কিম্ভূত। পুরো মাড়োয়ারি হতে না পারিস, রোগাভোগা চালাক—চতুর বাঙালি অন্তত হ', নইলে তোকে নিয়ে করব কী?

সেই থেকে গনপতের এই ব্যায়াম। সকালে সে প্রাণপণে শরীর ভেঙে, দাঁড়িয়ে উপুড় হয়ে হাতের আঙুলের ডগায় পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করে। পিছনে হেলে আর্চ করে। আরও নানা রকম কসরত করে। কিন্তু কোনওটাই ঠিকঠাক হয় না। তবু চেষ্টা আছে।

আজও ঘুম ভেঙে সকালে সে এইসব প্রাণপাত ব্যায়াম করছিল। দমফাট হয়ে বিকট শ্বাসের শব্দ তুলে হাঁফাচ্ছে, সেই হ্যাঁদানো শুনেই সিন্ধুর ঘুম ভাঙল। গনপত আবার কোঁকানির শব্দও তুলছিল।

কীরে গনফট?

বেমক্কা কোমরটায় চোট লেগে গেল রে, মট করে গেছে!

একসারসাইজ করছিলি?

তা নয়তো কী? মেলা হার্ডশিপ করাচ্ছিস আমাকে দিয়ে।

সিন্ধু হাসল, উঠে বসে বলল, মেড়ো ভূত, এক দিনে কি দারা সিং হতে চাস? ও—সব সইয়ে সইয়ে করতে হয়। তোর সাতপুরুষে কেউ ব্যায়াম করেনি তা জানিস? তোর শরীরের ধাতই আলাদা।

দেখিস, এক দিন ফিঙে পাখির মতো রোগা হয়ে যাব।

যাস, আর হ্যাঁদাস না। এখন একটু দম নে। ওটা কী পরে আছিস?

স্পোর্টস প্যান্ট। বলে গনপত লজ্জায় একটু হাসে।

সিন্ধু মশারি তুলে গনপতের পোশাক দেখে হেসে বাঁচে না। খাটো প্যান্ট পরা, খালি গা, মোটা গনপতকে এক প্রকাণ্ড চেহারার খোকার মতো লাগছে।

কাপড় পর হারামজাদা। তোর এই পোশাকে বউ তোকে দেখেছে কোনও দিন?

রোজ দেখে তো!

তবু ডিভোর্স করেনি?

দূর শালা, ডিভোর্স করবে কী, এই শরীরের তেজই সামলাতে পারে না।

পাছায় দুটো লাথি কষাব, শিগগির কাপড় পর। হার্ডশিপের দরকার নেই।

গনপত ছাড়া ধুতি পরে নিতে নিতে বলল, মাইরি, কোমরটায় মচাং করে গেছে।

সিন্ধু বাথরুম ঘুরে এল, বলল, চল চায়ের জোগাড় দেখি। সকালের পয়লা কাপ পেটে না গেলে দিনটা আমার শুরুই হয় না।

বাঙালির ওই দোষ। আমাদের সকাল শুরু হয় বড় রুপোর গেলাস—ভরা দুধ দিয়ে। এই পুরু সরওলা দুধ, শরীরে তক্ষুনি তাকত এসে যায়।

তোর তাকত বিস্তর দেখা আছে। বেশি বকিস না, দুধ না—খেয়েও আমি তোর দশ গুণ খাটতে পারি।

জন্ডিস তো বাঁধিয়েছিলে বাবা, চা খেয়ে খেয়ে। বেশি বোকো না।

ওরা ওপরে এসে দেখল বাচ্চারা পড়তে বসেছে বুড়ো একটা মাস্টারমশাইয়ের কাছে, বউদি রান্নাঘরে খুটখাট করছে, দাদা ওঠেনি। খুব বেলা হয়নি এখনও। বড়জোর সাত, সাড়ে সাত।

খাওয়ার টেবিলের ধারে বসতে বসতে সিন্ধু বলে, দাদা কত রাত্রে ফিরেছিল বউদি?

এগোরোটা হবে।

শেষ ট্রেনে?

না। গাড়িতে।
কোম্পানির?
হ্যাঁ।
কাল রাতে মড়ার মতো ঘুমিয়েছি, কিছু টের পাইনি! দাদাকে বলেছ আমরা এসেছি?
বলব না!
দাদা ওঠে কখন?
বেশি রাতে ফিরলে বেলায় ওঠে। তোরা বোস। ওকে আজ আগেই ডেকে দেব।
না না, ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। দাদা ভীষণ খাটে।
কমলা হাসল। করুণ মধুর হাসিটি। দাদা আর ভাইয়ের নীরব গভীর ভালোবাসার কথা সে যে জানে তা তার হাসিতেই প্রকাশ পায়। বলল, তোর দাদা তোর কথা শুনেই কেমন হয়ে গেল। মুখে কেমন যে ভালোবাসা মায়ামমতা ফুটে উঠল। তুই যেমন তার মতো দাদা দেখিস না, সেও তেমনি তোর মতো ভাই দেখে না।
সিন্ধু হাসে। বলে, তা নয়। আসলে আমরা তো মোটে দুই ভাই। তার ওপর দাদার বারো বছর পর আমার জন্ম, তাই একটু বেশি টান আর কী!
কমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তবু ভাই তুই এসেছিস, এবার ওর মুখটা ক'দিন একটু হাসিখুশি দেখব। নইলে আজকাল বড্ড কাঠখোট্টা হয়ে থাকে।
কেন?
কে জানে! ব্যবসা করে করে মানুষটা কেমন হয়ে গেছে। সিন্ধুকে একটু অন্যমনস্ক দেখাল। কিছু বলল না।
গনপত হাই তুলে বলল, বউদি, আমাকে পাতলা লিকারের চা দেবেন। কড়া চা খেতে পারি না।
চা খাওয়ার দরকার কী, বরং এক গ্লাস দুধ খান। বাড়ির খাঁটি দুধ।
গনপত ভারী অবাক হয়ে গেল, অপ্রত্যাশিত দুধের কথায়। বলে, বউদি, আপনি হাত গুনতে জানেন বোধ হয়। আমি বাড়িতে দুধই খাই। চা যদি কখনও—সখনও হয় তো সে মালাই—চা।
সেটা আবার কী? কমলা জিজ্ঞেস করে।
সিন্ধু আগ বাড়িয়ে বলে, সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড বউদি, চায়ের সঙ্গে তেজপাতা সেদ্ধ করে, ঘন দুধ আর চিনি দিয়ে দুধের সরফর মিশিয়ে এলাচ লবঙ্গ দারচিনি দিয়ে এক অখাদ্য হয়। মেড়োরা ছাড়া কেউ খেতে পারে না।
হ্যাঁ, খেতে পারে না। চা আবার একটা খাদ্য নাকি? মালাই—ফালাই না দিলে ও তিতকুটে জিনিস কেউ খায়? গনপত বলে।
কমলা বলে, সিন্ধু, তুই গনপতের পিছনে লাগিস না। অভ্যাস নেই যখন তখন ওকে চা দেব কেন? ও দুধ খাক, তুই বরং ওই চা গুচ্ছের গিলে লিভারের বারোটা বাজা।
সিন্ধু টেবিলের তলা দিয়ে গনপতকে একটা লাথি কষাল। চাপা স্বরে বলল, ব্যাটা, ঠিক ম্যানেজ করলে!
গনপত হাসে। বলে, বউদি, চা খেয়ে খেয়ে ওর চোখ হলদে হয়ে গেছে। তবু খাবে।
কমলা সিন্ধুর দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে, তোমাকেও চায়ের পর গেলাসে করে দুধ দেব। চুপটি করে খেয়ে নেবে। যা চেহারা করে এসেছ।
দুধ—টুধ বহুকাল খাই না, ও কি পেটে সইবে?
দেখা যাক। কিন্তু খেতে হবেই।

* * *

সাগর খুব বেলা করল না। আটটা নাগাদ উঠে পড়ল! চায়ের টেবিলে আসতে আসতে সাড়ে আটটা। পরনে দামি ড্রেসিং গাউন, মুখে চুরুট। মুখশ্রীতে একটা খুশির ভাব।

কিন্তু সিন্ধু লক্ষ করে, দাদার চেহারাটা কেমন কর্কশ আর চোয়াড়ের মতো হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে একরকম হতাশ ভাব। সাফল্যের অভাবজনিত যে—ক্লান্তি নিম্নমধ্যবিত্ত প্রৌঢ় মানুষের চোখে দেখা যায় সেইরকম একটা ক্লান্তি। অথচ সাগর তো অসফল নয়! বরং খুবই খারাপ অবস্থা থেকে এখন সে প্রায় লক্ষপতি। যৌবন এখনও তার যাওয়ার কথা নয়, সিন্ধুর ছাব্বিশ চলছে, সাগরের তা হলে এখন বড়জোর আটত্রিশ বছর বয়স। এ—বয়সে ক্লান্তি আসবে কেন?

সিন্ধু প্রণাম করবার সময়ে পিঠে দাদার হাতখানার মৃদু সস্নেহ ভাবটি টের পেল। উঠতেই দাদা বলে, শরীর—টরীর কেমন রে? রোগা দেখছি!

ও কিছু না।

মা বাবা?

ভালোই।

ক'দিন থাকবি তো?

টেন্ডারের জন্য এসেছি। আর. পি. ডব্লিউ. ডি—র রেজিস্ট্রেশনটা কত দূর কী হল, তা জানতে।

রেজিস্ট্রেশন পাসনি এখনও?

না। ওটা নইলে গভর্নমেন্টের অর্ডার পাওয়া মুশকিল।

সাগর ভ্রূ কুঁচকে একটু কী ভেবে বলে, ভটচাযকে ফোনে বলে রাখব'খন, হয়ে যাবে। একটা চিঠিতে আগে থেকে যদি লিখতিস আমাকে তবে কবে করিয়ে রাখতাম।

ওটার জন্য ফুড কর্পোরেশনের দুটো টেন্ডার দিতে পারলাম না।

আমাকে জানাসনি কেন?

সিন্ধু চুপ করে থাকে। দাদাকে এ—সব ছোটখটো ব্যাপারে সে জড়াতে চায় না। ব্যবসাদার দাদাকে সে মনে মনে পছন্দ করে না তেমন, কবি দাদাই এখনও তার মন জুড়ে আছে, তাই ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সে দাদাকে এড়িয়ে চলে বরাবর।

সাগর গনপতকে চিনতে পারল, বলল, ঘনশ্যামজির ছেলে না তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গনপত উঠে প্রণাম করে।

গণপতি! বাঃ, বেশ বড় হয়ে গেছ। কী করো এখন?

সিন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করছি।

সাগর হাসল। বলল, সবাই ব্যবসাদার এখন!

অন্তত ত্রিশ টাকা কিলো দরের চায়ের সুঘ্রাণে ঘর ম—ম করে ওঠে। বউদি তৃতীয়বার চা করল। গোলাপের মতো সুগন্ধী এমন চা সিন্ধু কখনও খায়নি। দাদার বাড়িতে যে এস্টাব্লিশমেন্ট খরচা বহুগুণ বেড়ে গেছে তা টের পাচ্ছিল সিন্ধু। চতুর্দিকে একটা অপব্যয় এবং বেপরোয়া খরচের চিহ্ন ছড়ানো। সে নিজে অপব্যয় অপছন্দ করে। হার্ডশিপ আর বীজমন্ত্র; সে তাই চতুর্দিকে এত আসবাব, ঘরের মধ্যে বাগান, দামি দামি আলো, দাদার ড্রেসিং গাউন কিংবা খুব দামি চায়ের অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না এবং বুঝতে পারছিল না যে এত সচ্ছলতার মধ্যে থেকেও তার দাদা অত ক্লান্ত কেন!

এলাহি ব্রেকফাস্টের আয়োজন করল বউদি। পুরু মাখন মাখানো টোস্ট, সঙ্গে দুটো করে ডিম সেদ্ধ, কাটা আপেল, ভালো কেক, প্রোটিনেক্স মেশানো দুধ এক গ্লাস। সাগর দিনে বাড়িতে ভাত খায় না, বাইরে স্কুলের পর লাঞ্চ করে কোনও হোটেলে। ব্রেকফাস্টটা তাই একটু ভারী খায়। কিন্তু সিন্ধু অত খেতে পারছিল না। বউদি তাড়া দিয়ে খাওয়াল—না খেলে বেরোতে দেব না, সারা দিন টো টো করে সেই কোন দুপুর হয়ে যাবে ফিরে ভাত খেতে।

স্টেশন প্রায় এক মাইল। সোয়া ন'টায় দাদার মাসিক বন্দোবস্তের রিকশা এসে গেল। সিন্ধু দাদার সঙ্গে এক রিকশায় যেতে একটু সংকোচ বোধ করে, তার ওপর গনপত রয়েছে—একটা রিকশায় হবেও না। সাগর আর—একটা রিকশা ডাকতে ঝি—মেয়েটাকে পাঠাচ্ছিল। সিন্ধু বারণ করে বলল, দুজন হাঁটতে হাঁটতে এটুকু রাস্তা চলে যাব, নতুন জায়গাটা দেখাও হয়ে যাবে। তা ছাড়া, বেরোবও একটু পরে। রাইটার্সের কাজ তো এগারোটার আগে শুরু হয় না।

সাবধানে যাস। কলকাতা আজকাল যা হয়ে উঠেছে। এই বলে সাগর বেরিয়ে যায়।

বেরুবে বেরুবে করেও দেরি করতে থাকে সিন্ধু। খবরের কাগজটা উলটেপালটে দেখে, আর—এক বার চায়ের অর্ডার দেয়। জয়া আর সৈকত এসে বাঙালি আর মাড়োয়ারি কাকুর সঙ্গে একটু হুড়োহুড়ি করে। তারপর স্কুলের বেলা বুঝে স্নান করে খেতে চলে যায়।

বউদি সেই সুগন্ধী চা নিয়ে এসে খাওয়ার টেবিলে রেখে বলে, বেলা যখন করলিই তখন একেবারে স্নান করে খেয়ে যা। রান্না ততক্ষণে হয়ে যাবে।

সিন্ধু বলে, দূর! ফিরে এসেই খাব।

অবেলা হয়ে যাবে। খেয়ে হজম করতে পারবি না। রাতে আবার তোর দাদা কী সব খাবার আনবে, আমাকে রান্না করতে বারণ করে গেছে, সে—সব গুচ্ছের দামি খাবার কে খাবে?

সিন্ধু অবাক হয়ে বলে, কী খাবার আনবে?

বউদি একটু হাসে, বলে, চিনে রেস্টুরেন্টের কী সব যেন আনবে বলেছিল। সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন, ফ্রায়েড রাইস, রোল, রোস্ট আর নকুড়ের মিষ্টি—টিষ্টি। হট—বক্সে ভরে গাড়িতে করে আনে মাঝে মাঝে। আজ তোদের অনারে আমার এক বেলার খাটুনি বেঁচে গেল, মুখটাও বদল হবে।

সিন্ধু মনে মনে একটু হিসেব করল। বলল, সে বেশ অনেক টাকার ব্যাপার বউদি। না?

টাকাকে টাকা মনে করে নাকি তোর দাদা? আজ তোদের জন্য আনছে তাতে কিছু বলার নেই। কিন্তু এ—রকম প্রায়ই করে তোর দাদা, বেশির ভাগ দিন দু'বেলার এক বেলাও বাড়িতে খায় না।

বলতে বলতে কি বউদির চোখ একটু ছলছলে হয়ে এল? গনপত গেছে জয়া আর সৈকতের সঙ্গে পুকুরে হুড়োহুড়ি করতে। বউদি তাই চোখের রাশ টানল না। জলটা একটু পরেই গাল বেয়ে গড়িয়ে নামল।

সিন্ধু একটু অবাক হল। কিন্তু মনের কোন গুপ্ত গভীর সে প্রত্যাশা করছিল, দাদা ঠিক আর স্বাভাবিক নেই। বউদির সঙ্গে দাদার সম্পর্কটা যেন বা এক গোলমেলে হয়ে গেছে।

স্বভাব—চাপা সিন্ধু চুপ করে থাকল একটু। তারপর আস্তে করে বলল, কেঁদো না, বরং যদি কোনও গোলমাল হয়ে থাকে তবে খুলে বলো।

কমলা আঁচলে চোখটা মুখে কান্নাটা সামলে নিয়ে বলে, বাঙালি মেয়েদের কথায় কথায় চোখে জল আসে!

বুঝলাম। কিন্তু ট্রাবলটা কী?

ট্রাবল আবার কী! কিছু না।

ভাঁড়িয়ো না বউদি। বলো।

কমলা অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, সিন্ধু, তোর দাদার ধারণা আমিই তার সর্বনাশ করেছি।

কী রকম?

সে আর কবিতা লিখতে পারছে না। তার বিশ্বাস, আমার জন্যেই পারছে না।

সিন্ধু অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

একসময়ে যখন কেবলমাত্র ইস্কুলমাস্টারি করত, যখন আমাদের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোতে না, তখন সেইসব অভাবের দিনে তোর দাদা বুকে বালিশ চেপে কবিতার পর কবিতা লিখে যেত স্বচ্ছন্দে। খুব

নামডাক তখন তার। বড় বড় সব কাগজে তখন সাগরশঙ্কর চ্যাটার্জির কত সুখ্যাতি বেরোত, সে—সব দিনেই ও ছিল ভালো।

সিন্ধু কি এটাই প্রত্যাশা করেনি? উগ্র আগ্রহে সে জিজ্ঞেস করল, তারপর?

তারপর এক দিন তো কবিতা ছেড়ে তোর দাদাকে ব্যবসায় নামতে আমিই বাধ্য করলাম বলে কয়ে। টাকা ছাড়া যে কিছুতেই এই সমাজে মানুষের মতো বাঁচা যায় না তোর দাদাও বুঝেছিল। নইলে নামকরা একজন তরুণ কবি, যার প্রশংসায় মস্ত মস্ত লোকেরা পঞ্চমুখ, যাকে সাহিত্যসভায় লোকে চেয়ার ছেড়ে উঠে সম্মান দেখায়, তাকে কেন একটা অশিক্ষিত ইতর বাড়িওলা যা নয় তাই বলে অপমান করার সাহস পায়? সেই থেকে তোর দাদা লাগল কবিতা ছেড়ে টাকার পেছনে। টাকা এল বটে কিন্তু কবিতা সেই যে ছেড়ে গেল আর ধরতে পারল না।

কেন বউদি?

তার আমি কী জানি! শুধু তোর দাদাকে দেখে দেখে একটা জিনিস বুঝতে শিখেছি যে, কবিতা লেখা যতটা সহজ বলে লোকে ভাবে তত সহজ ওটা নয়। কবিতার রহস্য বোঝে একমাত্র কবিরাই। তোর দাদা যে কবিতা লিখতে পারছে না তার কারণ কি ওর শব্দ জানা নেই, না ছন্দ মেলাতে পারে না, না কি কবিতার টেকনিক ভুলে গেছে! ও—সব কিছুই নয়। যে—মনটা কবিতা লেখে ওর সেই মনটা হয়ে গেছে ব্যবসাদার। ওর এই পরিবর্তন আমিই ঘটিয়েছি বলে ওর বিশ্বাস। মিথ্যেও নয়, আমি—ই অনেকটা দায়ী। সেই জন্যই ওর কাছে আমি আজকাল বিষ। দু'হাতে এত যে টাকা ওড়ায়, গাছগাছালি, আলো, ফার্নিচারে ঘর যে ভরতি দেখছিস এ—সবের কারণ হল কবিতা। কবিতার মেজাজ আনবার জন্য কত কী করে। এমনকী কিছু দিন পরে নাকি বাড়ি ছেড়ে কুটিরে বাস করবে। আবার বলে দশতলার ওপর একটা ফ্ল্যাট কিনবে যেখানে বসে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কীভাবে কবিতা ওর মনে আসবে তা তো আমি জানি না। কিন্তু এই নিয়েই আমার সঙ্গে যত অশান্তি। আমার মরতে ইচ্ছে করে রে সিন্ধু।

সিন্ধু বেপরোয়াভাবে হেসে টেবিলে চাপড়ে বলল, দূর! এটা কোনও গোলমালই নয়। তুমি একেবারে আনস্মার্ট। দাঁড়াও সব ঠিক করে দিয়ে যাব।

এই বলে সিন্ধু উঠে বলল, ঠিকই বলেছ, বেলা যখন হয়ে গেল তখন ভাতটা খেয়েই বেরোই। কিন্তু সকালে যা খাইয়েছ...

যা পারিস দু'মুঠো খেয়েই যা।

খেতে বসে সিন্ধুকে গনপত বলল, দ্যাখ সিন্ধু, আমি কিন্তু ব্যবসাদার নই তোর মতো। আমাকে বেশি ব্যবসাতে টানবি না, আমি কলকাতায় এসেছি নাটক দেখতে। নট্ট কোম্পানির 'নটী বিনোদিনী', থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'চাকভাঙা মধু', নান্দীকারের 'তিন পয়সার পালা', থিয়েটার গিল্ডের 'যদুবংশ' এ ক'টা দেখে যাবই। পারি তো আরও কয়েকটা। বাগড়া দিবি না। তারপর বউদির দিকে ফিরে বলল, বউদি, আপনি যাবেন নাটক দেখতে?

সিন্ধু যদি যায় তো যেতে পারি। সবাই একসঙ্গে যাব। কতকাল থিয়েটার—সিনেমা দেখি না।

সিন্ধুটা মাড়োয়ারি হয়ে গেছে বউদি। আর্ট—ফার্ট বোঝে না, ব্যবসা একটু—আধটু বোঝে। আমি হয়ে গেছি বাঙালি, ব্যবসা মাথায় ঢোকে না, আর্টটা একটু একটু বুঝি।

বউদি খুব হাসে।

বহুকাল বুঝি এমন হাসেনি।

সিন্ধু বেরোল অনেক বেলায়, দুপুরের খাওয়াটা বড্ড ভারী হয়ে গিয়েছিল, কমলাও ঠুসে ঠুসে খাইয়েছে, খেয়ে উঠে গড়াতে গিয়ে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, দুটো নাগাদ ঘুম ভাঙতেই সিন্ধু তড়বড়িয়ে ওপরে উঠে

এল 'বউদি', 'বউদি' বলে চেঁচাতেই কমলা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেসে বলল, ডাকিনি বলে বকবি তো?

বকবই তো! কত কাজ ছিল, এখন যেতে যেতে সব জায়গার অফিস আওয়ার্স পার হয়ে যাবে।

কমলা বলল, ইচ্ছে করেই ডাকিনি, কী চেহারাটা করেছিস! একটু বিশ্রাম নিলে সারবে ভেবে আর ডাকিনি।

খুব ভালো করেছ, সিন্ধু রাগ করে বলে, আর গনফটটাকেও আমি পার্টনারশিপ থেকে ভাগাচ্ছি। হারামজাদা খাওয়া আর ঘুম ছাড়া কিছু জানে না দুনিয়ার।

মোটা মানুষ, ও অত খাটতে পারে নাকি তোর মতো! তা ছাড়া ওর তো ভাতকাপড়ের তাড়া নেই!

সিন্ধু মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই বলেছ। শালার বাপ—ভাই দেখতে পারে না বটে কিন্তু গাড্ডায় পড়লে খরচাপাতি চালিয়ে নেবে, ব্যাটা এখনও দু'—পাঁচশো টাকা যখন তখন বের করতে পারে। ওর সুটকেস খুঁজলে কম করেও হাজার দুই—তিন টাকা পাবে। ব্যাটা টাকা ওড়াতেই কলকাতায় এসেছে।

তুই ওর পিছনে অত লাগিস কেন?

লাগব না? দেখ গে, এখনও কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে! তিন—চার জোর ঝাঁকি মেরেছি, গোটা দুই লাথি, সব হজম করে ন্যাদসটা তাকিয়া হয়ে পড়ে আছে।

কমলা এলো চুল পিঠের দিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, চা করি? একেবারে চা খেয়ে একটু ঘুরে আয়। কাল থেকে কাজ করিস।

না, না, আজ এক বার বেরোতেই হবে। ছুটি কাটাতে তো আসা নয়, তিন দিন মোট থাকব বলে এসেছি। শিলিগুড়িতেও দু'—তিনটে কাজ পড়ে আছে। নষ্ট করার মতো সময় নেই।

তোরা সবাই এত কাজের হলে আমি কোথায় যাই বল তো! তোর দাদার মুখে কাজ আর কাজ শুনে কাজের ওপর অরুচি ধরে গেল। সিন্ধু, যদি কখনও খুব কাজের মানুষ হয়ে উঠিস তা হলে বিয়ে করিস না। বিয়ে করে পরের মেয়েকে একঘরের মতো করে রাখার মানে হয় না।

বিয়ে! সিন্ধু হেসে বলে, কী ভাবো তুমি বলো তো বউদি! এ জন্মে বিয়ে—টিয়ে আর হল না। আমার জন্য বউয়ের কোনও প্রভিশনই নেই, অ্যালটমেন্ট হয়নি।

কমলা হাসল। তারপর রান্নাঘরে ঢুকল চা করতে।

সেই ফাঁকে সিন্ধু একটু এঘর—ওঘর করে। দাদার লেখার ঘরে ঢুকে সে খুব নিবিষ্টভাবে চারধার দেখে। দেখে অসম্ভব অবাক হয়। দাদা যে কত টাকা আয় করে তার কোনও হিসেব করতে পারে না সে। চারটে দেয়াল চার রঙে এনামেল করা। কী বিপুল দামের একটা খাট! খাটের এক ধারে অ্যাকুয়ারিয়াম ফিট করা, তাতে শ্যাওলা রয়েছে, স্পঞ্জ রয়েছে, একটা পাথরের ব্যাঙ বসে আছে এক ধারে, এক—একবার তার মুখটা হাঁ হচ্ছে আর একটা করে বাতাসের গোলা মুখ থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কাচের ভিতরে নানা রঙের আলোয় দামি মাছেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্য ধারে দাদার লেখার টেবিল। টেবিল বটে, তবে তা সাধারণ টেবিল নয়। সম্ভবত মহার্ঘ্য। বার্মা সেগুন দিয়ে তৈরি। আয়নার মতো ঝকমকে অর্ধচন্দ্রাকার বিশাল সেক্রেটারিয়েট, তার ওপর টেবিল—বাতি, ছাইদানি, কাগজের প্যাড, কলম, সিগারেট সবকিছুই যেন বিদেশের গন্ধমাখা। কী বিশাল অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের তৈরি টেবিল—বাতি, পার্কার পঁচাত্তর, লাইফ—টাইম শেফার, মন্ট ব্লাঁ, চোদ্দো ক্যারেট সোনার পাইলট, পেলিক্যান, এইসব দামি কলম একটা হাতির দাঁতের কৌটায় খাড়া করে রাখা আছে। দাদার লেখার টেবিলের চেয়ারটা রিভলভিং। সিন্ধু বসে দেখল কোনও শব্দ হয় না। কাত হয়ে, চিত হয়ে, ঝুল খেয়ে দেখল, চেয়ারটা সব দিকে অনায়াসে হেলে যায়। টেবিলের ডান দিকে সবচেয়ে তলার ড্রয়ারটা আধ ইঞ্চি খোলা ছিল, সিন্ধু সেটা টেনে আর—একটু খুলল

কৌতূহলবশে, এবং ব্ল্যাক নাইটের বোতলটা দেখতে পেল। বুকটা ধক করে ওঠে তার। বোতলটা তুলে এনে দেখে, তলানি দু' ইঞ্চি পরিমাণ হুইস্কি এখনও আছে। মদ খাওয়া খুব খারাপ বলে কোনও সংস্কার নেই সিন্ধুর। তবু দাদা এ—সব আগে খেত না, এটুকু সে জানে। খুব আদর্শবাদী, একটু গোঁড়া আর দৃঢ়চেতা লোক ছিল দাদা।

বোতলটা সাবধানে যথাস্থানে রেখে সিন্ধু আবার চার ধারে চেয়ে দেখে। দেয়ালে অনেকগুলো তেলরঙের ছবি, কয়েকটা জলরঙে আঁকা। উঠে ঘুরে ঘুরে সে ছবিগুলো দেখল। ছবির ফ্রেমে দাদা আবার ছোট্ট কার্ড এঁটে রেখেছে, তাতে আর্টিস্টদের নাম। যামিনী রায়, হোসেন, গণেশ পাইন, গুজরাল, সুনীল দাস এ—রকম প্রায় আট—দশটা ভারতের বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা আধুনিক ছবি। ছবির দাম সম্পর্কে যেটুকু ধারণা আছে সিন্ধুর তাতে সে আন্দাজ করল, ছবিগুলোর মোট দাম বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা হবে। বেশিও হতে পারে। ছবির ফাঁকে ফাঁকে বিশাল সব বুককেস ভরতি বই। নতুন বা চকচকে বই সব, এখনও অনেক বই ভালো করে বোধ হয় খোলাও হয়নি। মেঝের খাট থেকে দরজা অবধি এক টুকরো আসল পশমের কার্পেট পাতা। টমেটো রঙের কার্পেটটার গায়ে বিলিতি কুকুরের মতো লম্বা নরম লোম। খুব কম করেও ওই এক টুকরো কার্পেটের দাম হাজার দুয়েক হবে।

কেন? এ—সব কেন? এত ঐশ্বর্য দাদার কবে থেকে হল? এ—সব প্রশ্নের কোনও জবাব সিন্ধু জানে না। শুধু এইটুকু জানে, এত টাকা এত অল্প সময়ে কখনওই খুব সাদামাটা উপায়ে হয় না। সিন্ধু নিজেও চাকরি না পেয়ে ব্যবসা করছে। সে জানে, ব্যবসা করতে গেলে একদম সৎ থাকা যায় না। অন্তত এদেশে সৎ ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সে নিজেও কত সময়ে কত অসৎ উপায় নিয়েছে, কিন্তু দাদার এই বড়লোক হওয়ার ব্যাপারটায় কোথায় যেন একটা সৃষ্টিছাড়া কিছু আছে।

সিন্ধু দাদার টেবিলের টানাগুলো খুলে খুলে দেখল একটু, প্রায় সব ক'টাই চাবি দেওয়া। মোট তিনটে ড্রয়ার খোলা গেল। ফের কয়েক বোতল বিদেশি মদ দেখতে পেল। অন্যটায় দাদার পুরনো সব কবিতার ফাইল কপি, কবিতা মুসাবিদা করা খুচরো কাগজের ডাঁই, আর সেই সঙ্গে প্রায় আট—দশ প্যাকেট কেনট রথম্যান, ডানহিল, প্লেয়ার্স থ্রি, বেনসন হেজেস, আবদাল্লা, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, এইসব সিগারেটের প্যাকেট দেখতে পেল, এক প্যাকেট ফাইভ ফিফটি ফাইভ খোলা ছিল। তা থেকে একট ধরিয়ে সিন্ধু আপনমনেই নিজেকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা সিন্ধু, দাদাকে কি তোমার হিংসে হয়?

অনেক ভেবে সে নিজেই উত্তর দিল, না তো, হচ্ছে না।

তা হলে কী হচ্ছে বলো তো। দাদার এই অসম্ভব বড়লোকি দেখে কিছু প্রতিক্রিয়া হচ্ছে নাকি মনে?

হচ্ছে।

কী সেটা?

দাদার জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

বউদি ডাকল, সিন্ধু, কোথায় গেলি? গণপতিকে নিয়ে আয়।

সিন্ধু উঠে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। বউদি ডাইনিং হল থেকে তার দিকে চেয়ে ছিল। একটু যেন কেমন বউদির তাকানো। মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলল, দাদার ঘর দেখছিলি?

হ্যাঁ।

বউদি একটা চাপা স্বরে বলল, ও—ঘর কিন্তু আমার নয়। আমি ওটায় থাকি না।

তুমি কোথায় থাকো?

পাশের ঘরে, ছেলেমেয়ের সঙ্গে। আমরা দু'ভাগ হয়ে গেছি।

কবে থেকে?

চা খা সিন্ধু, গণপতিকে ডাক।

পাঁচ

আজও স্কুলে গিয়েছিল সাগর। ক্লাস—টলাস নিল না, হাজিরা খাতায় সই করে সোজা হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে গিয়ে বলল, একটু কাজ আছে, যাচ্ছি।

হেডমাস্টার মশাই খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওজন্য বলার কী?

বলে হেডমাস্টার মশাই একটু চোখের ইশারা করলেন। সাগর ইশারাটা ধরে একটা চেয়ার টেনে বসল। মর্নিং—এর গার্লস সেকশনের হেডমিস্ট্রেস এখনও যাননি, মস্ত একটা খাতা খুলে কী যেন দেখছিলেন। এক বার চোখ তুলে সাগরকে দেখলেন, একটু হাসলেনও, উনি উঠে না—গেলে ঘরটা ফাঁকা হয় না। আর ফাঁকা না—পেলে হেডমাস্টার মশাই সাগরের সঙ্গে গোপন কথাটাও বলতে পারেন না। সাগর অবস্থাটা একটু ভেবে দেখল। মজুমদারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বারোটায়। ঘড়িতে এখন এগারোটা পাঁচ। ট্যাক্সিতে গেলে মিনিট দশেক সময় লাগবে কর্পোরেশন বিল্ডিঙে পৌঁছতে। একটু সময় হাতে করেই যাওয়ার ইচ্ছে সাগরের। মজুমদার কাল স্কচ খাইয়েছে। অনেক খোলামেলা ব্যক্তিগত কথা বলেছে, বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা করেছে, তবু সাগর জানে যে মজুমদার লোক ভালো নয়। প্যাক্টের টাকা শেষ পর্যন্ত পুরো দিতে চাইবে না। মানিকটাও হাঁদারাম, হয়তো বিশ্বাস করে টেন্ডারটা আনবেই না। নগদ দশ হাজার টাকা মুফতে পাওয়ার লোভে নয়, সাগরের কোথাও হেরে যেতে ইচ্ছে করে না। তার হারের জীবন শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল জয় আর জয়।

হেডমিস্ট্রেস নন্দিতা দাশগুপ্তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, বিয়ে—থা করেননি। সাগর শুনেছে, ভাইদের সংসারে থাকেন। দেখতে খারাপ ছিলেন না, কিন্তু এখন মুখশ্রীতে কেমন এক কুটিলতা এবং ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। খাতাখানা রেখে সাগরের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো শুনি বড় কন্ট্রাক্টর। আমার একটা ভাইপোকে চাকরি দেবেন? খুব ভালো স্বভাবের ছেলে।

সাগর গম্ভীর হয়ে রইল, এ—সব সময়ে ফ্যাক করে হেসে ফেলতে নেই। ভ্রূটা একটু তুলে বলল, কোয়ালিফিকেশন কী?

বি এ পাস।

সাগর এবার খুব ক্ষীণ একটু হেসে বলে, বি এ পাস ছেলেতে দেশ ভরে আছে। কোনও টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন নেই?

না তো। ওর বরাবরই আর্টসে মাথা, ইংরিজিতে বেশ ভালো। দশটা নম্বরের জন্য ডিস্টিংশন পায়নি।

সাগর তেমনি ভ্রূ তুলে বলল, অনার্স নেয়নি কেন?

ইংরিজিতে নিয়েছিল। পরীক্ষার আগে ছেড়ে দিল—ওর চোখটা খারাপ, তাই আমিই ছাড়িয়েছি অনার্স। খুব পড়তে হয় তো—একটু দেখবেন তো ভাই। ওই ছেলেটার একটা গতি হলে স্বস্তি পাই। ওর আবার মা নেই, আমিই পালছি পুষছি।

সাগর মাথা নেড়ে বলল, দেখব।

এক দিন আপনার অফিসে পাঠিয়ে দেব?

দেবেন।

হেডমিস্ট্রেস উঠে যান।

হেডমাস্টার মশাই সাগরের দিকে একটু ঝুঁকে বলেন, লাস্ট মিটিঙে ম্যানেজিং কমিটিতে আপনার বিষয়ে কথা উঠেছিল।

সাগর অবাক হয়ে বলে, কী কথা?

উনি ঈষৎ ম্লান হেসে বলেন, এই আপনার ক্ষেত্রে ক্লাস অ্যালটমেন্ট কম কেন, গত বছর কেন আপনার প্রায় তিরিশ দিন উইদাউট পে হল, পরীক্ষার খাতা আপনি কেন দেখেন না, এইসব।

সাগর গম্ভীর হয়ে রইল। এটা সে আশা করেনি। সে জানে, এই স্কুল তার কাছে নানাভাবে ঋণী।

আপনি কী বললেন? সাগর জিজ্ঞেস করে।

হেডমাস্টার মশাই বিনয়ের সঙ্গে বলেন, আমি যথাসাধ্য ডিফেন্ড করেছি। কিন্তু টিচার্স রিপ্রেজেনটেটিভরাই তো আপনার বিরুদ্ধে। এজেন্ডাতে আপনার প্রসঙ্গ ছিল না। স্কুলের নানা প্রবলেমের কথায় ওঁরা আপনার কথা তুললেন। বিশেষ করে হিমাদ্রিবাবু খুব ড্যামেজিং কথাবার্তা বলছিলেন।

ও। বলে সাগর একটু ভাবে। হিমাদ্রি ঘোষই শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র লোকে যে কখনও সাগরের কাছ থেকে টাকা ধার চায়নি। অল্পবয়সি হিমাদ্রি ঘোষ একটু ঠোঁটকাটাও বটে, একজন মস্ত ট্রেড ইউনিয়নিস্টের ছেলে। বাড়ির অবস্থা ভালো। ছাত্রমহলে বেশ জনপ্রিয়। অবশ্য সাগরের তাতে কিছু যায় আসে না। হিমাদ্রিকে গ্রাহ্য করার তেমন কোনও কারণ নেই। তবু বছরের প্রথমে যখন রুটিন টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন ওই হিমাদ্রিই সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করেছিল বিভিন্ন শিক্ষকের ক্লাসের সংখ্যার সঙ্গে সাগরের চূড়ান্ত অসাম্য দেখে। কিন্তু হিমাদ্রি ছাড়া আর কেউ চেঁচামেচি করেনি। কারণ সবাই সাগরের অধমর্ণ। আর এ—কথাও সবাই জানে যে, সাগরের ধার শোধ না দিলেও কোনও ক্ষতি নেই, সাগর ধার দিয়ে ভুলে যায়।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, অবশ্য ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায়নি। কমিটির প্রেসিডেন্ট নিজেই বললেন, আমরা সাগরবাবুর কাছে নানাভাবে ইনডেটেড। আমাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ডেফিসিট এখনও পঞ্চান্ন হাজার টাকা, ইলেকট্রিক বিল প্রায় দু হাজার বাকি পড়েছে, স্কুল এখনও রানিং থ্রু ক্রাইসিস। এ—রকম অবস্থায় সাগরবাবু আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। সুতরাং তাঁর কেসটা আমরা কনসিডার করব।

সাগর চুপ করে রইল। বুকটা জ্বালা করে। কোথায় যেন একটা হার হয়ে যাচ্ছে।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, অবশ্য এতে কমিটির সবাই খুব খুশি হয়নি। গার্জিয়ানরা জয়েন্ট পিটিশন করবে আপনার বিরুদ্ধে এমন কথাও হিমাদ্রিবাবু বলছিলেন। অলোকবাবুও সাপোর্ট করছিলেন।

অলোক হল আর—একজন শিক্ষক প্রতিনিধি। ছেলেটার ব্যক্তিত্ব নেই, বড্ড বেশি কথা বলে, এবং অধিকাংশই মিথ্যে কথা। অলোক ঘোষাল অবশ্য সাগরের কাছ থেকে ধার নেয়, সিগারেট চেয়ে খায়। তবু ওকে বিশ্বাস করা যায় না।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। সাগর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি না হয় রিজাইন করব।

হেডমাস্টার মশাই একটু চমকে উঠে বলেন, কী বলছেন? আপনার রিজাইন করবার কথাই তো ওঠে না। হিমাদ্রি বা অলোককে কেউ সাপোর্ট করছি না আমরা। সব টিচারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সবাই আপনার পক্ষে। শুধু পরিস্থিতিটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।

মনে মনে সাগর যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিল। স্কুলের চাকরিটা নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। উপরন্তু একটা জরুরি কাজে যাওয়ার সময়ে এইসব গোলমালের কথা মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। বিরক্তিটা বজায় রেখেই সে একটু রুক্ষ গলায় বলল, আমি স্কুলকে যথেষ্ট কাজ দিই না এ তো সবাই জানে। আমার চাকরি ছেড়ে দেওয়া অনেক আগেই উচিত ছিল। আমি কালই রেজিগনেশন লেটার দেব।

হেডমাস্টার মশাই একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। বলেন, আপনি বসুন। আমি ব্যাপারটা আপনাকে আর—একটু খুলে বলি। আপনার রাগ করার মতো কথা নয়। হিমাদ্রির অ্যাটিচুড আমরা কেউ সাপোর্ট করছি না।

সাগর তার ওমেগা হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, আজ তো সময় নেই। কাল—পরশু বরং ব্যাপারটা শুনে নেব। হিমাদ্রির সঙ্গেও একটু কথা বলা দরকার। আমি শুনেছিলাম এর মধ্যে ছাত্রেরা কবে যেন একটা জয়েন্ট পিটিশন করেছিল আপনার কাছে। তাতে আমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল।

হেডমাস্টার মশাই একটু অপ্রতিভ হেসে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে সেই দরখাস্ত তো চেপে দেওয়া হয়েছে, আপনার বিব্রত হওয়ার কারণ নেই। আমি সিগনেটারিদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। এক—একজন করে ইন্টারভিউ নিই। ওরা তাতে খুব ভয় পেয়ে প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে যে ওরা নিজের থেকে দরখাস্ত করেনি। হিমাদ্রি আর অলোকই ওদের দরখাস্ত করতে ইনস্টিগেট করে। আপনার বিরুদ্ধে ছাত্রদের কারওই কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগ নেই।

সাগর গম্ভীর—মুখে বলে, দরখাস্তটা চেপে দিয়ে আপনি ভালো কাজ করেননি। আমাকে তখনই যদি জানাতেন তা হলে আমি নিজের অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক হতে পারতাম।

হেডমাস্টার মশাই মাথা নেড়ে বললেন, এ—সব নেগলিজিবল ব্যাপার নিয়ে খামোকা আপনি ভাবছেন। আমার প্রায় ত্রিশ বছরের সার্ভিস লাইফে এর চেয়ে কত বেশি সিরিয়াস ঘটনা ঘটেছে। আমি বরং হিমাদ্রি আর অলোকের সঙ্গে আজই এক বার কথা বলব।

সাগর উদাস গলায় বলল, বলবেন, দেখা হলে আমিও বলব। তবে কারও বিরাগভাজন হয়ে থাকার ইচ্ছে আমার নেই।

হেডমাস্টার মশাই খুব আন্তরিকভাবে বলেন, আরে না, না। আপনি ও—সব নিয়ে ভাববেন না। প্রেসিডেন্ট আপনার পক্ষে, আর আমিই তো সেক্রেটারি। আপনার কোনও চিন্তা নেই। আমরা তো জানি, আপনার স্কুলের চাকরির কোনও দরকারই পড়ে না। বরং স্কুলের প্রতি মমতাবশেই আপনি আছেন এখনও। আপনার ওপর স্কুল অনেকটা ডিপেন্ড করছে।

সাগর একটা অনিশ্চিত 'আচ্ছা' বলে চিন্তিতভাবে বেরিয়ে এল। সে হিমাদ্রি বা চাকরিটার কথা ভাবছিল না, এমনকী সে মজুমদারের কথাও ক্ষণেক ভুলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে ফুটপাথে নামতেই আজও সে হিলিয়াম বেলুনটিকে দেখতে পেল। থমধরা বাতাসে বেলুনটা বেশ সোজা দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিকে চেয়ে আবার তার দীর্ঘ খোয়াই.....মনে পড়ে।

ফুটপাথে নেমে দাঁড়াতেই বেয়ারা ভানু তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে নেমে বলে, ট্যাক্সি তো। আপনি বসুন গিয়ে ঘরে, আমি ডেকে আনছি।

সাগর তার ঘড়ি দেখে বলে, একটু তাড়াতাড়ি আনিস। সময় কম।

ভানু জোর কদমে বড় রাস্তার দিকে গেল। সাগর এদের প্রায় কিনে ফেলেছে। অজস্র বকশিস পেয়ে এরা এখন সাগরেরই কথা শোনে, অন্য মাস্টারমশাইদের তেমন মানতে চায় না।

সাগর টিচার্স রুমে এসে বসল। ঘরটা ফাঁকাই প্রায়। সবাই ক্লাসে গেছে। শুধু বুড়ো সুবোধবাবু আপনমনে খৈনি বানাচ্ছেন। গত বছরও সিগারেট খেতেন, এ—বছর বাজেটে সিগারেটের দাম বাড়ায় খৈনি খাচ্ছেন আজকাল। সাগর বসে বাংলা খবরের কাগজটা তুলে নিল। খবরের কাগজ দেখার সময় তার বড় একটা হয় না, ইচ্ছেও করে না, তবু নিল, কাগজের দিকে চেয়ে থেকেই তার মনে হল, আজ টিচার্স রুমটা বড় বেশি ফাঁকা। এত ফাঁকা হওয়ার কথা নয়। সবাই ক্লাসে গেলেও বাড়তি অন্তত পাঁচজনের থাকার কথা, বোধ হয় আজ অনেকেই অ্যাবসেন্ট।

সাগর যখন কবি ছিল, যখন তার ব্যবসা এত বড় হয়নি, তখন এই স্কুলে তাকে প্রচুর প্রভিশনাল ক্লাস করতে হয়েছে। রুটিনেও তার সপ্তাহে বত্রিশ—তেত্রিশটা করে ক্লাস থাকত। দিনে সাত পিরিয়ডে সাতটা ক্লাস করে গলা ভার হয়ে উঠত, শরীর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ত, আজ চারজন অ্যাবসেন্ট, তবু সাগর আজ একটাও ক্লাস না নিয়ে চলে যেতে পারে কত অনায়াসে। আগের দিনে পারত না। এখন তার বদলে অন্যেরা প্রভিশনাল ক্লাস করে মরে।

খবরের কাগজে দানা অক্ষরগুলির দিয়ে চেয়ে ছিল সাগর, কিছু দেখছে না। ভাবছে। স্কুলটা তার এখন নৈতিক দিক থেকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত। খামোখা সে একটা চাকরি আটকে বসে আছে। বোধ হয় এই কারণেই হিমাদ্রি বা অলোক তাকে ভালো চোখে দেখে না। সে অবশ্য কলিগদের কারও প্রতিই তেমন মনোযোগ দেয় না আজকাল। কোনও দিনই দেয়নি। যখন কবিতা লিখত তখন নিজেকে এদের চেয়ে অনেক বেশি স্পর্শকাতর আর বুদ্ধিধর বলে জানত, আজকাল সে ভাবে, এরা খুবই তুচ্ছ, অস্তিত্বের লড়াই এদের সপ্রতিভতা কেড়ে নিচ্ছে। এদের পাত্তা না দিলেই হয়। কিন্তু আজ সে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম করে ভাববার চেষ্টা করল।

একটা অত্যন্ত খর পদশব্দে চোখ তুলেই সাগর হিমাদ্রিকে দেখতে পেল, ঘরে ঢুকছে। হিমাদ্রি বেঁটে, রোগা, কালো, চেহারা সাধারণ, তবু ওর চোখেমুখে একটা তুখোড় ভাব আছে। বড্ড বেশি কথা বলার অভ্যাস, ওকে দেখেই সাগরের বুকটা নড়ে ওঠে একটু। আজ একটু অন্য চোখে দেখল হিমাদ্রিকে। প্রায়দিনই কথা বলে না, আজ হিমাদ্রি ঘরে ঢুকে সই করার খাতা খুঁজছে দেখে সাগর নিজের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, এগারোটা একত্রিশ হিমাদ্রিবাবু।

হিমাদ্রি সাগরের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, একটু দেরি হয়ে গেল।

সাগর অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় বলে, তাই দেখছি। লাস্ট রিজোলিশানে আমরা প্রস্তাব নিয়েছিলাম যে এগারোটা ত্রিশের পর অ্যাটেন্ডেন্স চলবে না।

হিমাদ্রি একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, এই স্কুলে সবই চলে। ক্লাস না—করেও অ্যাটেন্ডেন্স হয়। দেখছি তো।

সাগর রেগে যায় না, শুধু মৃদু হাসি সহকারে দাবার আর—একটা চাল দেয় মাত্র। বলে, খাতা হেডমাস্টার্স রুমে চলে গেছে। যান, গিয়ে সই করুন। উনি যদি সই করতে দেন তা হলে আমার আপত্তি কী? কিন্তু আমার পরামর্শ হল, আজ আর সই না—করে বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো।

হিমাদ্রি বোধ হয় একটু সামান্য মাত্র পিছিয়ে যায় মনে মনে। তবু হালকা চালে বলে, আপনার ঘড়িটাই যে ঠিক তা কে বলল?

সাগর বাঁ হাতের কবজিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, ওমেগা ক্রোনোমিটার, বাইশশো টাকায় কেনা। ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুযায়ী আজ সকালেও রেডিয়োর টাইম সিগন্যালের সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় মিলেছে।

হিমাদ্রি সাগরের উলটো দিকের চেয়ারে বসে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরায়। তারপর বলে, ঠিক আছে, আজ না হয় সই না করলাম, আমার ক্যাজুয়াল লিভ এখনও সাত দিন পাওনা আছে।

সাগর মাথা নেড়ে বলে, আমার এক দিনও পাওনা নেই। আমি বড় বেশি ইররেগুলার, আপনার ক্যাজুয়াল লিভগুলোকে আমার হিংসে হয়, কয়েকটা ধার দেবেন?

হিমাদ্রি সাগরের চোখে চোখ রেখে লড়াই বুঝতে পেরে বলে, আপনার ধার নেওয়ার দরকার কী? ম্যানেজমেন্ট তো আপনার সব ছুটিই দরখাস্ত ছাড়াই গ্র্যান্ট করছে। আমরা কেউই আপনার মতো ভাগ্যবান নই।

সুবোধবাবু খৈনির থুথু ফেলে এলেন। চেয়ার টেনে বসবার আগেই হিমাদ্রির কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, হিমাদ্রিবাবু, কাজটা ভালো করেননি, লাস্ট মিটিঙের খবর আমরা পেয়েছি, টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভরা তাদের কলিগের বিরুদ্ধে বলবে, এটা ঠিক না। সাগরবাবুর কেসটা মিটিঙে ডিসকাস করা উচিত হয়নি।

হিমাদ্রি একটু থমকে গেল। তারপর বলল, কারও বিরুদ্ধে বলা তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। স্কুলের ওয়েলফেয়ার দেখতে গেলে এ—সব ব্যাপার তুলতেই হয়। আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই।

ভানু এসে গেছে। দরজার ফাঁক দিয়ে ফুটপাথের কাছ ঘেঁষে ট্যাক্সি দাঁড়ানো দেখে সাগর উঠল। খুব সাদামাটা ভাবে হিমাদ্রির উদ্দেশে বলল, আপনার তো স্কুল করা হল না। চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই। আমি কর্পোরেশনে যাব।

হিমাদ্রি একটু ইতস্তত করে হঠাৎ খুব স্পোর্টসম্যানশিপ দেখিয়ে উঠে বলল, চলুন, বড়লোকদের সঙ্গ করা ভালো।

কামড়টা গায়ে মাখাল না সাগর। ট্যাক্সির কাছে এসে আগে হিমাদ্রিকে উঠতে দিয়ে পরে নিজে উঠল। এক প্যাকেট বিদেশি সিগারেট ছিল পকেটে। নতুন প্যাকেটটা বের করে সেলোফেনের মোড়ক খুলে এগিয়ে দিল হিমাদ্রির দিকে। গ্যাসলাইটারে ধরিয়ে দিল। ট্যাক্সি হাজরা ছাড়িয়ে যাওয়ার সময়ে প্রথম কথা বলল, যাবেন নাকি আমার সঙ্গে? কী ভাবে টাকা রোজগার করতে হয় দেখে আসবেন!

বলে হাসল সাগর।

হিমাদ্রিও হাসে। বলে, আপনি খুব মাইন্ড করছেন বোধ হয়? মিটিঙে কথাটা আমি কিন্তু খুব ক্যাজুয়ালি তুলেছিলাম।

সাগর যেন সে—কথায় কান দিল না। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে করে বলল, আমি একজন খুব অসুখী মানুষ। জানেন? খুব আনসাকসেসফুল।

সাগর কথাটা সাজিয়ে বা বানিয়ে বলেনি, এমনি হঠাৎ যেন তার হৃদয় কথা বলে উঠল। তার খুব একটা ভাবপ্রবণতা নেই, এমনকী সমব্যথী বা সংবেদনশীল মানুষও তার আজকাল আর দরকার হয় না। তবু তার হৃদয় থেকে কথাটা উঠে এল।

হিমাদ্রি একটু ফচকে হাসি হেসে বলে, আপনি যদি আনসাকসেসফুল তবে তো আমরা কোন গভীর গাড্ডায় পড়ে আছি। আর কী চান বলুন তো দাদা, বাড়ি হাঁকড়েছেন, গাড়ি দাবড়াচ্ছেন, ভালো ব্যাঙ্ক—ব্যালান্স, আর কী চাই!

সাগর গম্ভীর হয়ে রইল। বা ঠিক গম্ভীর নয়, যেন বড় চিন্তায় ক্লিষ্ট, অন্যমনস্ক। অনেকক্ষণ বাদে বলল, আমার ব্যর্থতাটা কেউ বোঝে না। সাকসেস বলতে লোকে আজকাল বাড়ি—গাড়ি বোঝে। এটাই একটা প্যারাডক্স।

তা হলে সাকসেস বলতে আপনি কী বোঝেন?

সাগর একটু ভেবে বলে, ধরুন একজন লোক একটি মাটির পুতুল তৈরি করছে। পুতুলটার বাজারদর সে জানে না, কিন্তু অনেক যত্নে অনেক পরিশ্রমে সে ঠিক যেমনটি চেয়েছিল তেমনটিই তৈরি করতে পেরেছে। আর কাজ শেষ হওয়ায় তার এক দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্লান্তির সঙ্গে এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে যখন তার মন কানায় কানায় ভরা সেই সময়টুকুই তার সাকসেস, এরপর পুতুলটা লক্ষ টাকায় বিক্রি হল না দু' পয়সায় তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

ওঃ! বলে হিমাদ্রি সেই ফচকে হাসি হেসে বলে, এ—সব তো রবি ঠাকুর অনেক আগেই বলে গেছেন। ও—সব তো শিল্প—টিল্পর কথা। দেশের বারো আনা লোকেরই ও—সবের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। আমরা পেটের চিন্তা থেকেই সাফল্য আর অসাফল্য বিচার করতে শিখেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনার অসাফল্য কোথায়।

ওইখানেই। ও ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারব না।

আপনি কি কবিতার কথা চিন্তা করে বলছেন?

সাগর মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

ধুস! হিমাদ্রি বলে, কবিতা দিয়ে কী হয়? আমাকে লক্ষ টাকা দিয়ে দেখুন, সব ছেড়ে দিতে রাজি আছি। এমনকী প্রেমিকা বা সিগারেট—যা ছাড়তে বলুন। আমি কিন্তু জগুবাজারের কাছে নেমে যাব দাদা।

সাগর খুব হাসছিল। ড্রাইভারের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, ভাই সামনে রাখবেন একটু।

জগুবাজারের কাছে হিমাদ্রি নেমে গেল। বাকি পথটুকু সাগর একা, গম্ভীর।

কর্পোরেশনের গেটের কাছেই মানিক দাঁড়িয়ে ছিল। বারোটা বাজতে আর পনেরো মিনিট বাকি। সাগর নামতে নামতেই জিজ্ঞেস করল, কী রে? মজুমদার আসেনি?

রোগা লম্বা আর ফরসা মানিককে দেখেই বোঝা যায় যে ও খুব ছটফটে স্বভাবের ছেলে। মুখশ্রী খুব সুন্দর। একমাথা চুল। বড় জুলপি আর ঝোলানো গোঁফ দিয়ে অবশ্য চেহারাটা ঢেকে রেখেছে, চোখে কালো চশমা, গায়ে হলুদ আর টকটকে লাল রঙের ডোরাওলা জামা, পরনে খয়েরি আর বেগুনি চেকওলা বেলবটম, পায়ে উঁচু হিলওলা চিনেবাড়ির জুতো, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কে বলবে! দু—চারটে চুল আর গোঁফ পেকেছে, শুকনো কলপ দিয়ে সে—সব ঢেকে চেপে রাখে। ওর একটা দারুণ সুন্দরী বউ আছে। মানিক নিজে বড়লোকের ছেলে, বউও বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু বউকে বাগে রাখতে পারে না একদম। ওর বউ ছবি সিনেমায় যায়, মার্কেটিংয়ে যায়, এগজিবিশন দেখে বেড়ায়, নয়তো বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে

পুরী, ওয়ালটেয়ার, সিমলা ঘুরে আসে। এবং এ—সব ব্যাপারে মানিকের মতামতের তোয়াক্কা করে না। অর্থাৎ, মানিক তার বউয়ের কাছে নিজের ব্যক্তিত্ব রাখতে শেখেনি। বরং এখন বউয়ের পক্ষ টেনেই ওকালতি করে। সাগর এক দিন ঠাট্টা করে বলেছিল, কী রে, বউ তোকে একা রেখে দেরাদুন চলে গেল! মানিক খুব সমবেদনার সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, আমিই যেতে বলেছি। সারা দিন আমি কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ও খুব লোনলি ফিল করে তো। ব্যবসাতেও মানিকের বুদ্ধি কম, দায়িত্ব—সচেতনতাও তেমন নেই। প্রায় সময়েই ও মানুষকে কথা দিয়ে কথা রাখে না, পেমেন্ট বাকি রাখে, বড় অর্ডার পেলেও গা করে না। তার কারণ, ওর বাবার অনেক টাকা এবং ওর খাওয়া—পরার অভাব নেই, কিছু করতে হয় বলে ব্যবসা করতে শুরু করেছিল। যখন অনেক টাকা লোকসান খেয়ে ব্যবসা গোটাতে বসেছে তখনই এক দিন সাগরকে বলেছিল, আমি ব্যবসাটা ছেড়ে দিচ্ছি, তুই পারলে কর। সাগর তখন শক্ত হাতে ব্যবসার হাল ধরল। সবাই জানে এই ব্যবসাটায় সাগরই আসল লোক, মানিক লোক দেখানোর জন্য আছে। ক্লায়েন্টরা সাগরকেই বেশি চেনে, সাগরের মুখ চেয়েই মহাজনরা মালপত্র দেয়। মানিকও গা ছেড়ে বসে থাকে। তবে সাগরের উদ্যোগে দেখে মানিক ইদানীং কিছু তৎপর হয়েছে। দুজনেই দুজনকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে, ভালো তো বাসেই।

মানিক মাথা চুলকে বলল, বেলা এগারোটায় মজুমদারকে ফোন করেছিলাম। তখনও কনর্ফাম করল যে ক্যাশ নিয়ে আসছে। কিন্তু এখনও যে কেন এল না!

সাগর তার স্বাভাবিক শান্ত গলায় বলে, তুই টেন্ডারটা এনেছিস তো!

মানিক সাগরের চোখের দিকে না তাকিয়ে বলে, ধরকে কাল টেন্ডার রেডি করতে বলে গেছি। আমি তো আজ আর অফিসে যাইনি, বাড়ি থেকে সোজা আসছি। ধরেরও এখানেই আসার কথা। তো সেও এখনও আসেনি! প্যাক্টের অন্য সবাই ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বসে আছে। বারোটা বাজবার পাঁচ মিনিট থাকতে সবাই টেন্ডার সাবমিট করবে বলে শুনলাম।

অন্য কেউ হলে এই পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড রেগে যেত, চেঁচিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ত। সাগর তা করল না। শুধু একটু বিরক্তির 'হুঁ' বলে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল, চল, ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি। মজুমদার হয়তো পিছনের গেট দিয়ে ঢুকে গেছে।

ওরা ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, শেষবারের মতো রাস্তাটা দেখে নিতে গিয়ে সাগরই উঁকি দিয়ে দেখে, একটা ট্যাক্সি উলটো দিকের ফুটপাথের ধার ঘেঁষে থেমেছে, আর ট্যাক্সির জানালা দিয়ে হাত তুলে সাগরকে 'উইশ' করে মজুমদার নেমে আসছে, বাদামি রঙের সুট পরনে, গলায় একটা দারুণ বাহারি আর চওড়া টাই। রাস্তাটা উদভ্রান্তের মতো পেরিয়ে এল সে, হাতে একটা পেটমোটা পোর্টমেন্টো। এ—ধারের ফুটপাথে পা দিয়েই হেঁকে বলল, হ্যালো ভালচারস, আই হ্যাভ কাম টু বি ইটন বাই ইউ, আর সব কোথায়?

মানিক হাসছিল। বিনা পরিশ্রমে মজুমদারের অনেক টাকা খসানো যাচ্ছে। সাগর একটু গম্ভীর হয়ে গেল। 'ভালচারস' শব্দটা তার ভালো লাগেনি।

মজুমদার কাছে আসতেই অবশ্য বোঝা গেল যে সে আজ মেজাজে আছে। কোনও শুঁড়িবাড়ি থেকে কয়েক পাত্র চাপিয়ে এসেছে।

আজও টেনে এসেছেন মজুমদার? মানিক জিজ্ঞেস করে।

মজুমদার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, এত টাকার হাস মানি কি আর নরমাল অবস্থায় পে করা যায়? হুইস্কি দিয়ে ভিতরটা একটু হড়হড়ে করে নিয়েছি, যাতে দেওয়ার সময়ে মেজাজে থাকতে পারি। আর সব শকুনেরা কোথায়?

ভিতরে। মানিক উত্তর দেয়।

অ্যাম আই লেট?

মানিক বলল, একটু।

ঘড়ি দেখে মজুমদার একটা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলে, ইটস জাস্ট দি টাইম।

সাগর ভ্রূ কুঁচকে মজুমদারের দিকে চেয়ে ছিল। মজুমদারকে সঠিক বিশ্বাস নেই। টাকাটা দেবে তো! মানিকটা হাঁদার মতো টেন্ডারটা সঙ্গে আনেনি। মজুমদার টাকা না দিলেও ওদের টেন্ডার জমা দেওয়ার উপায় রাখেনি। কন্ট্রাক্টটা খুবই ভালো। কাজটা করতে পারলে, সাগরের আন্দাজ, লাখ দেড়েক তুলে ফেলা যাবে। কাজটা করারই ইচ্ছে ছিল সাগরের, সে পরিশ্রম দিয়ে রোজগার করতে ভালোবাসে। দাঁতে দাঁত দিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে লড়াই, আর সেই নিজেকে নিষ্পেষিত করে কাজ দিয়ে পয়সা রোজগার, তার স্বাদই আলাদা, কিন্তু মানিক সবসময়ে ফোকটে রোজগার করতে ভালোবাসে, খাটতে চায় না। যে—কাজটা সাগর না দেখে তাই গোলমাল হয়ে যায়। আজকে যে—রকম টেন্ডারটা সঙ্গে আনেনি।

সাগর একটু উঁচু গলায় বলল, মজুমদার, আমাদের পেমেন্ট এখানেই হয়ে যাক। বাকিরা ডিপার্টমেন্টে অপেক্ষা করছে। আমাদের ছেড়ে দিয়ে আপনি ওদের কাছে যান। তাড়াতাড়ি করবেন, দে আর ভেরি মাচ ইগার টু সাবমিট টেন্ডার.....

মজুমদার একটু ভ্যাবলা চোখে সাগরকে দেখল। কোনও কথা বলল না। পোর্টমেন্টোর মুখ খুলে একটু খুঁজে বেছে একটা বাদামি মোটা খাম বের করে আনল, খামের মুখটা সিল করা। যেভাবে ভদ্রলোকেরা নাছোড় ভিখিরিদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দু—দশ নয়া পয়সা তাদের হাতে ফেলে সরে পড়ে, ঠিক সেভাবেই মানিকের বাড়ানো হাতে খামটা তাচ্ছিল্যভরে ফেলে দিয়ে বলল, হিয়ার ইউ আর। গোনা আছে। নিট দশ।

এই বলে মজুমদার আর তাকালও না। চটপটে পায়ে কর্পোরেশনের বিশাল পুরনো ফটক দিয়ে ভিতরের আবছা আলোর ভিতরে হারিয়ে গেল।

মানিক বলল, হুররে! মাইরি, খুলে দেখব ভিতরে নোট আছে না সাদা কাগজ?

সাগর মাথা নেড়ে বলল, দরকার নেই। খামটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নে।

অফিসে এসে সাগর নিস্পৃহভাবে চেয়ারে বসে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে রইল। ও দিকে মানিক আনন্দে আপনমনে মাঝে মাঝে 'শালা' ধ্বনি দিতে দিতে খামটা ছিঁড়ে একগোছা একশো টাকার নোট বের করেছে। সাগর এক বারও না তাকিয়েও শুধু শুনে টের পাচ্ছিল, জিভের জলে আঙুল ভিজিয়ে মানিক টাকা গুনছে। একশোটা একশো টাকার নোট গুনতে বেশি সময় লাগল না।

সাগর জানে, গুনবার দরকার ছিল না। মজুমদার আজ তার কথার খেলাপ করেনি। কথার খেলাপ করার সাহস মজুমদারের আর নেই। ম্যাঙ্গো লেনের অফিসের মেইনটেনেন্স, মদিরা, বউয়ের খোরপোশের টাকা এবং তা ছাড়া মজুমদারের নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু 'ভালচারস' কথাটা সাগর কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার কান দুটো গরম হয়ে আছে সেই থেকে, চোখ দুটো টনটন করছে। অপমান টের পেলে সাগরের এ রকম হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন নোট, স্টেপল করা। মানিক কাগজ কাটা ছুরির ডগা দিয়ে স্টেপলের পিন খুলে টাকা দু'ভাগ করল। সাগরের দিকে একটা ভাগ এগিয়ে দিয়ে বলল, খুব হল আজ, বুঝলি সাগর! মুফত টাকা। কী কিনবি?

সাগর টাকাটা ধরল না। টেবিলের ওপর পড়ে রইল। অফিসটা বন্ধ বলে গরম। তাই পাখা চলছে ধীরে। সাগরের ভাগের টাকার গোছা থেকে নোট উড়ু উড়ু করছে। মানিক একটা পেপারওয়েট চাপা দিয়ে বলে, ফেলে রাখিস না, ঢুকিয়ে নে। কে এসে দেখে ফেলবে।

সাগর বিরক্তির সঙ্গে বলল, লোহার আলমারিতে রেখে দে।

রেখে দেব! খরচ করবি না?

কীসের খরচ?

মানিক বোকা হাসি হেসে বলে, এ—টাকা তো ওড়াবার জন্য। রেখে—টেখে কী হবে? বউকে বলে এসেছি আজ মার্কেটিংয়ে যাব। দেদার ওড়াব টাকা। এটার তো এন্ট্রি দেখাতে হবে না।

সাগর চোখ খুলল, মানিকের দিকে না—চেয়েই বলল, সাধে কি তোকে মাঝে মাঝে আমার লাথি মারতে ইচ্ছে হয়!

কেন? করলামটা কী?

তোর বুদ্ধি কবে হবে মানকে? অর্ডারটা ছেড়ে দেওয়ার বুদ্ধি তোকে কে দিয়েছিল? দশ হাজার হাস মানি পেয়ে লাফাচ্ছিস, আর অর্ডারটা ধরে কাজ করলে কত লাভ হত জানিস?

জানি। কিন্তু তাতে রিসকও ছিল, খাটুনিও ছিল।

সাগর উঠে পড়ে বলল, বিনা পরিশ্রমে টাকা রোজগার করতে লজ্জা করে না বেলাজা কোথাকার?

মানিক বেকুবের মতো হাসছিল, হাসিমুখেই বলল, তুই শালা কেমন যেন অন্য রকম! টাকাটা নিয়ে নে। এর পরে না হয় আর এ—রকম করব না।

সাগর টাকাটা তুলে নিল। একটু ভাবল। 'ভালচারস' কথাটা এই টাকার গায়ে গন্ধের মতো লেগে আছে। মজুমদারের কি খুব কষ্ট হল টাকাটা বের করতে? কাল ও স্কচ খাইয়েছে।

মানিকের মুড দেখে সাগর বুঝতে পারছিল যে আজ আর কাজকর্ম হবে না। গানমেটালের বুশগুলোর ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে পড়ে। মনটা বড় খারাপ। টাকা রোজগার করে এত খারাপ কখনও লাগেনি।

সাত

প্রায় এক মাস হয়ে গেল বুকুন কলকাতায় এসেছে চিকিৎসা করাতে।

সিন্ধু মাঝে মাঝে অথই জলে পড়ে গিয়ে ভাবে কেন বুকুনের সঙ্গে তার চেনা হল! কেন বুকুনের সঙ্গেই।

ছেলেবেলা থেকেই সিন্ধুর এক রোগ, তার মেয়েদের বড় লজ্জা। সে শুনেছে, তার দাদাও খুব লাজুক ছিল অল্পবয়সের কালে। বাড়িতে অচেনা অতিথি এলে দাদা বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াত, পাছে অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়। দাদার সঙ্গে তার খুব মিল। কিন্তু সিন্ধু তা বলে সবাইকে লজ্জা পায় না। একমাত্র মেয়েদেরই লজ্জা পায় সে। অন্য যে—কোনও মানুষের সঙ্গে যে—কোনও পরিবেশে সিন্ধু খুবই অনায়াস। অবশ্য সিন্ধুকে দেখলেও তা বোঝা যায়। বেশ লম্বা, সুন্দর চেহারা। ইদানীং চেহারাটা একটু ভেঙে গেছে। গায়ের বর্ণ তামার মতো পোড়া—পোড়া, হনু আর কণ্ঠার হাড় জেগে থাকে। গাল ভাঙা, চোখের নীচেটা দেবে গেছে অনেক। নানা দুশ্চিন্তা, খাটুনি, অনিশ্চয়তা। তবু তার চেহারার মূল কাঠামোটাই চমৎকার। একটা পৌরুষের ছায়া আছে। তার চোখ—মুখ খুবই বুদ্ধির আলো বিকিরণ করে। সব মিলিয়ে দেখলে তার চেহারায় মেয়ে পটানোর লক্ষণ আছে। লাজুক বা মুখচোরা ভাবের কোনও চিহ্ন নেই। অবশ্য এখন আর ততটা নয়ও সে আগেকার মতো। তবুও সিন্ধুর এই চেহারাটার ভিতরে ভিতরে আসল সিন্ধুটা লুকিয়ে আছে। তাকে শুধু সিন্ধুই চেনে, আর কেউ নয়।

সেই মেয়ে দেখলেই মুখচোরা সিন্ধু কোনও দিনই মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি। বাল্যকাল থেকেই তার কোনও মেয়ের সঙ্গে ভাব হয় না। এক—একজনের একরকম গ্রহের গুণ থাকে। সিন্ধুরও সেই রকম। অথচ এই যৌবন বয়স পর্যন্ত সে খুবই তৃষ্ণার্ত হয়েছিল নারীসঙ্গের জন্য। ঘটেনি কখনও। সে একরকম ভালোই ছিল বুঝি। যখন ভাব হল তখন বুকুনের সঙ্গে।

বুকুনও, আশ্চর্য, সেই রকমই মেয়ে যার সঙ্গে সহজে কোনও ছেলের ভাব হয় না। ভারী একটেরে নির্জন মেয়ে। সে যে এই পৃথিবীতে জন্মেছে, প্রাণ ধরে বেঁচে আছে, তা জানে মাত্র কয়েকজন। সিন্ধু জানত না।

সে বার জলপাইগুড়ির পলিটেকনিকে মেকানিকাল পড়বার সময়ে হস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে শহরের গুন্ডাদের হাঙ্গামা হল খুব। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সোশ্যাল ফাংশনে বরাবরই শহরের মস্তান ছেলেরা এসে হাঙ্গামা করে, মাতলামির চূড়ান্ত সীমায় চলে যায়। তা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে শহরে আসার দূরত্ব অনেকটা। সেই নির্জন রাস্তায় একা দোকা পেলে হস্টেলের ছাত্রদের ভয় দেখিয়ে ছিনতাইও করত মস্তানরা।

এটা দীর্ঘকাল চলে আসছিল। হস্টেলের ছাত্ররা বাইরে থেকে পড়তে গেছে, শহরের মস্তানদের বিরুদ্ধে লাগতে সাহস পেত না। সিন্ধুও শিলিগুড়ি থেকে পড়তে গেছে, হস্টেলে থাকে। বাবা চাকরি করে তখন, টাকা পাঠায়। সিন্ধু বরাবরই বাবার দুঃখ খুব বুঝত। পড়াশুনো যদিও তার ভালো লাগত না, তবু বাবাকে বিপাকে না—ফেলার জন্য সে পরিশ্রম করত। কিন্তু বরাবরই সে কিছু দাঙ্গাবাজ গোছের ছেলে, সহজে ভয়টয় পেত না, দরকারমতো সে বহুবার বহুক্ষেত্রে রুখে দাঁড়িয়েছে।

সে বার কলেজের সোশ্যালে বাইরের আর্টিস্টরা গেছে অনেকে। জমজমাট ফাংশন। যথারীতি শহুরে মস্তানরা ঢুকেছে দর্শকদের জায়গায়। ভালো ভালো সিট থেকে নিরীহ ছেলেদের সরিয়ে দিয়ে সিট দখল করেছে। এ—সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। যা হচ্ছে হোক, প্রতি বারই তো হয়। কিন্তু একজন টপ মস্তান যখন স্টেজে উঠে মাতাল অবস্থায় একজন গায়িকার মুখের সামনে থেকে মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে অকথ্য খিস্তি দিল কয়েকটা তখনই একটা গোলমালের সূত্রপাত হয়। সূত্রপাতটা অবশ্য সিন্ধু করেনি, করেছিল ধূপগুড়ির ছেলে অঙ্কুর সেন। ব্যায়াম—ট্যায়াম করত, আবার সাধারণ ব্যায়ামবীররা যেমন শরীর বাঁচিয়ে চলে সে সে—রকম ছিল না। স্টেজে উঠে সে ছেলেটাকে ঘাড় ধরে নামিয়ে আনল। মুহূর্তের মধ্যে দর্শকদের আসন থেকে উঠে এল মস্তানরা, তাদের হাঁকডাকে বাইরে থেকে জুটে গেল বহু। অঙ্কুর প্রথম রাউন্ডটায় স্টেজের কাছ বরাবর কয়েক বার ঘুঁষি—টুঁষি চালিয়ে ছিল, কিন্তু ঘেরাও মার খেয়ে জমি ধরে নিল দশ মিনিটের মধ্যে। মস্তানরা তখন স্টেজ থেকে তক্তা তুলে, মাইক ভেঙে, চেয়ার আছড়ে পুরো ভন্ডুল লাগিয়ে দিয়েছিল। একা গিয়ে ওদের প্রতিরোধ করার মতো বোকামি দেখায়নি সিন্ধু, কিন্তু ব্যাপারটা মনে রেখেছিল। সেই রাতেই সে নেতৃত্ব নিয়ে হস্টেলের ছেলেদের মিটিং ডাকে। আধ ঘণ্টার মিটিং, কোনও বাদ—প্রতিবাদ হয়নি। সকলেরই রক্ত আগুন হয়ে আছে। শুধু কী করতে হবে তার প্ল্যানটা সিন্ধু বাতলে দিল। সেই ঘটনার পর পুলিশ এল অনেক রাতে। হস্টেলে গিয়ে তারা আহত অঙ্কুরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কেউ কোনও প্রতিবাদ করেনি। পুলিশ চলে গেলে দু'—তিনজন অধ্যাপকও এসে ছেলেদের সঙ্গে দেখা করলেন। সিন্ধু তাঁদের ব্যাপারটা বলল, সিন্ধুর প্ল্যান তাঁরাও ইঙ্গিতে সমর্থন করে যান।

এ—রকম পরিকল্পিত ও ভয়ংকর দাঙ্গা সিন্ধু আর কখনও করেনি। হস্টেল থেকে সিকি মাইল দূরে বড় রাস্তার কালভার্টের ওপর মস্তানদের একটা মদ খাওয়ার আড্ডা ছিল, রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ হস্টেলের চল্লিশজন ছেলে গিয়ে তুলে আনল তাদের। অবশ্যই বিনা প্রতিরোধ নয়। সিন্ধু নিজে অন্তত পাঁচ—ছ'জনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল রড দিয়ে। এতটা নিষ্ঠুর সিন্ধু নয়। যে দশজনকে তারা ধরে এনেছিল তাদের হস্টেলে আনার পর বাকি ছেলেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে একের পর এক এসে তাদের পিটিয়ে যায় প্ল্যান মাফিক। অবশ্য দশজন অনেক আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সেইখানেই অবশ্য ঘটনার ইতি হয়নি। প্রায় একশো জন ছেলের একটা দল নিয়ে সিন্ধু গভীর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত শহরের উত্তর ভাগের বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে কয়েক বারে আরও অন্তত চল্লিশজন মস্তানকে জমি নেওয়ায়। এমন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সেই আক্রমণ যে কেউ ভালো করে আত্মরক্ষাও করতে পারেনি। সিন্ধু কত জনকে মেরেছিল তা সে আজও হিসেব করতে পারেনি। তবে মনে আছে, ভোরবেলা তার হাত ব্যথায় অবশ হয়ে এসেছিল রড চালিয়ে। পরদিন নতুন ব্যাচ গেল শহরে। মস্তানরা কেউ তখন আর প্রকাশ্যে নেই, সবাই গা—ঢাকা দিয়েছে, তবু নিরীহ কিছু ছেলে মার খেল হস্টেলের ক্রুদ্ধ ছেলেদের হাতে।

শহরের পুলিশ এটা আশা করেনি। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে তাদের খানিক সময় গেল। যে—সব অধ্যাপক সিন্ধুর কাণ্ডটা জানতেন তাঁরাই এসে সেদিন সিন্ধুকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, এবার পালাও। না পালালে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। বাড়ি যেয়ো না, অন্য কোথাও চলে যাও।

সিন্ধু পালাল, শিলিগুড়ি রোড থেকে এক ভদ্রলোকের জিপ থামিয়ে সোজা শিলিগুড়ি। বাবুপাড়ায় এক বন্ধু থাকত, মনোজ। সোজা তার বাসায় গিয়ে ঝোড়ো তপ্ত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলল, মনোজ, আমাকে লুকিয়ে রাখ।

মনোজের বাড়িতে নাগাড়ে প্রায় এক মাস লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল তাকে। সেই বাড়িতেই সে বুকুনকে প্রথম দেখে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর পলিটেকনিকের গণ্ডগোলের মূলে যে সিন্ধুই ছিল এটা তত দিনে পুলিশ জেনে গেছে। বার দুই তাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে পুলিশ হানাও দিয়েছে তার খোঁজে। হস্টেলে তো রোজই খোঁজখবর হয়েছে। সিন্ধুর মন তখন ভালো নেই, সবসময় দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পালিয়ে থাকতে তার ভালো লাগছিল না, অপরাধবোধ পেয়ে বসে তাতে। অন্যের বাড়িতে অনাহূত থাকার লজ্জাও আছে। মনোজদের বাড়িতে কেউই যে তার লুকিয়ে থাকাটাকে ভালো চোখে দেখবে না, এ তো জানা কথা। মুখে কেউ কিছু বলত না বটে, কিন্তু সন্দেহের চোখে তাকাত, ফিসফিস করে নানা কথা বলত। উপায় নেই বলেই সিন্ধু পালিয়েছিল, বাড়ির বাইরে খুব একটা বেরোত না, শিলিগুড়ির সবাই তাকে চেনে, মুহূর্তের মধ্যে পুলিশে খবর হয়ে যেতে পারে। এইসব নানা কারণে মনোজদের বাড়িতে সময়টা তার খুব ভালো কাটেনি। কেবল একটাই সুন্দর ঘটনা ঘটেছিল, বুকুনের সঙ্গে চেনা হওয়া।

মনোজের দুটি বোন। বড় বুকুন, ছোট টুকুন। দুজনকেই ধিঙ্গি মেয়ে বলা যায়। বুকুনের বয়স তখন আঠারো—উনিশ, টুকুনের ষোলো—সতেরো। টুকুন ছিল বেশ সুন্দর দেখতে। ফরসা গোলগাল, লম্বা, চোখমুখে চুম্বক আছে। নিজের চেহারা সম্পর্কে সে ছিল খুব সজাগ! অবসর সময়টা টুকুনের কাটত আয়নার সামনে, সাজগোজের নানা রূপ টান নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাজত। সিন্ধু দেখেছে, টুকুন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে একা একা কটাক্ষ করে, হাসে, নিজের সঙ্গে বিড় বিড় করে কথাও বলে। ছেলে—ছোকরাদের সঙ্গে মিশবার একটা তীব্র বেহায়া নেশাও ছিল তার। একটু স্মার্ট বা ভালো চাকরি করে এমন ছেলের দেখা পেলে সে তার সর্বস্ব নিয়ে নেমে পড়ত। ওই অল্প বয়সেই টুকুনের অনেক ভক্ত, গোছা গোছা প্রেমপত্র পায়, রাজরাজেশ্বরীর মতো অহংকার ভরে চলাফেরা করে। সিন্ধুকেও তার ভালোই লেগে থাকবে। বিকেলের দিকে সিন্ধু গিয়ে পৌঁছেছিল মনোজদের বাড়িতে, হা—ক্লান্ত, উত্তেজিত, এবং অবসন্নও। গায়ে হাতে পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, অল্প একটু জ্বরভাব। তাকে নিশ্চয়ই খুব ভালো দেখাচ্ছিল না। বাইরের ঘরে বসে সে মনোজ আর তার বাবাকে পুরো ঘটনাটা বুঝিয়ে বলছিল। সেই সময়ে দুই বোন ইস্কুল থেকে ফিরল। বয়স অনুপাতে ওদের পড়াশুনা বেশ পেছোনো। বড় জন বুকুন, ঘরে ঢুকেই অচেনা লোক দেখে মাথা নামিয়ে ভিতর—বাড়ি চলে গেল। টুকুনের সে—সব নেই, সে বেশ বড় বড় চোখ করে দেখল সিন্ধুকে, বুকুন না চিনলেও টুকুন সিন্ধুকে চেনে। তাই বলল, ইস সিন্ধুদা, দেখাই নেই যে! সিন্ধু একটু হেসেছিল, তখন মেয়েদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো মনের অবস্থা নয়। টুকুন চট করে ভিতরে গিয়ে ইস্কুলের সাদা খোলের শাড়ি পালটে, রঙিন শাড়ি, ফাউন্ডেশন মেক—আপ, কাজলের টিপ দিয়ে সেজে এল, গলায় দার্জিলিঙের মুরগির ডিমের মতো লাল পাথরের মালা। এসে বাবা আর দাদার সামনেই সিন্ধুর মুখোমুখি বসে হাঁ করে চেয়ে রইল। কী বেহায়ার মতো চেয়ে থাকা! ভিতর—বাড়ি থেকে বারবার পরদার আড়ালে এসে ওর মা আর দিদি ডেকে যাচ্ছে, ও টুকুন, খাবি আয়। টুকুন গ্রাহ্যও করছে না, বলছে, দাঁড়াও বাবা যাচ্ছি।

তখনই সিন্ধু বুঝেছিল, এ—বাড়িতে থাকা তার পক্ষে একটু মুশকিল হবে। ওই লোভী চোখ দেখেই সে বুঝে গিয়েছিল যে, টুকুনের ভিতরটা চাকুম—চুকুম করছে। এ—ধরনের মেয়েরা যখন—তখন যা খুশি করে ফেলতে পারে। সিন্ধু কোনও ফাঁদে পড়ে যেতে নারাজ। যেখানেই লোভ সেখানেই সে কিছু সন্দেহপ্রবণ। এই তার স্বভাব; ব্যবসাতেও সিন্ধু তাই কোনওদিনই রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি। স্বপ্ন বা কল্পনা জিনিসটার কিছু খামতি তার কাছে। টুকুনকে দেখে সে মনে মনে সতর্ক হয়ে গেল।

তার সন্দেহ মিথ্যে নয়। ধিঙ্গি মেয়ে—ওলা বাড়িতে অজ্ঞাতবাস করতে গিয়ে তার যে—ভয়টা হয়েছিল সেটা সত্যিকারের ভয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম নয়।

বাড়ির ভিতরে একটা উঠোন, উঠোনকে ঘিরে টানা বারান্দা আর বারান্দার সঙ্গে সারি দিয়ে ঘর। বাড়িটায় কোনও শ্রীছাঁদ নেই, তবে বেশ আলো—বাতাস আছে, বাগান—টাগানও রয়েছে। উত্তর দিককার সর্বশেষে

একটা ছোট ঘরে একটা মাঝারি চৌকিতে সে আর মনোজ শুত। মনোজ একটু ভালোমানুষ গোছের বেকার ছেলে। খুব সোশ্যাল ওয়ার্ক করে বেড়ায়। ফাংশন, বিয়ে, বন্যা, দুর্ঘটনা, সব জায়গাতেই মনোজের হাজিরা থাকে। সংসারের কোনও দায় বা দায়িত্ব তাকে বইতে হয় না। বাবা উকিল, তা ছাড়া চা—বাগানের শেয়ার, জমিজায়গা, ধূপকাঠি তৈরির কারখানা এ—সব থেকে ভালো আয় হয় ওদের। মনোজ একটা মোমবাতি তৈরির ব্যবসা শুরু করবে, সেই নিয়ে খুব ব্যস্ত। 'এ বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করে গেড়ে যা', এই বলে মনোজ সারা দিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত। সিন্ধু একা বইপত্র নাড়াচাড়া করত, শুয়ে সিগারেট খেত, মনোজের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা প্রায় বলতই না। এ—ব্যাপারটায় তার খুব লজ্জা, অচেনা বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সে কথা—টথা বলতে পারে না তেমন। মনোজের মা এসে মাঝে মাঝে গল্প করতে বসতেন। সে—সব সাংসারিক কথা, সিন্ধু শুধু শুনত আর হুঁ দিত। আসত এক বুড়ি দিদিমা, তার ছিল ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ সকলের বিরুদ্ধে। সংসারের অনেক গুহ্য কথা বুড়ি অকপটে সিন্ধুকে বলে দিত। তার ভালো লাগত না।

মনোজের দুই ভাই ছিল, সরোজ আর দাদা পঙ্কজ। পঙ্কজ বাইরে চাকরি করত, সরোজ ইস্কুলে পড়ে তখন। সে বড় কাছে ঘেঁষত না। আর কখনওই তার কাছে আসত না বুকুন। বুকুন যে ও—বাড়ির মেয়ে, ও—বাড়িতেই থাকে তা টেরই পেত না সিন্ধু। কদাচিৎ একটা রঙিন শাড়ির বিলীয়মান আঁচল দেখতে পেত কোনও দরজায় বা বারান্দায় এক ঝলক। এর বেশি বুকুনের অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত না। তার গলার স্বর সিন্ধু তখনও শোনেইনি। কিন্তু প্রায় সময়েই দমকা বাতাসের মতো আসত টুকুন। তার কোনও শারীরিক লজ্জা ছিল না। মনের তো বালাই—ই নেই। সিন্ধুর ঘরে একটা চেয়ার—টেবিল ছিল, তবু টুকুন এসে বিছানায় সিন্ধুর গা ঘেঁষে এসে বলত, গায়ে হাত দিয়ে কথা বলত, মাথায় পাকা চুল খুঁজত, যদিও সিন্ধুর বয়সে কারও মাথায় পাকা চুল থাকার কথা নয়। কিন্তু টুকুন বলত, অনেক ছেলেদের এ—বয়সেই চুল পেকে যায়। ওই অছিলায় সিন্ধুর গা ছুঁয়ে শরীরে গরম শ্বাস ফেলে টুকুন নিজের যৌবনের জানান দিত। এক দিন বিকেলে, কী সাহস, দৌড়ে এল ঘরে। পিছনে বোতামওয়ালা একটা ব্লাউজ পরনে। এবং সেটার নীচের দিকের দুটো হুক তখনও খোলা। এসেই পিঠ ফিরিয়ে বলল দিন তো হুকগুলো লাগিয়ে, কখন থেকে চেষ্টা করছি, পারছি না। সিন্ধু খুব বিব্রত, আবার কিছু আগ্রহও বোধ করছিল, হাত কাঁপছিল, গলা শুকনো, তবু এই অদ্ভুত আবদার রেখেছিল সিন্ধু। হুক লাগিয়ে দেওয়ার পর এক তীব্র গুপ্ত উত্তেজনায় অবশ লেগেছিল তার। টুকুন মুখ ঘুরিয়ে হেসে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, এ—রকম লক্ষ্মীছেলের মতো বরাবর হুক লাগিয়ে দেবেন তো? মনোজের বাড়িতে তখন মাত্র দিন পনেরো কেটেছে, তার মধ্যেই এই ঘটনা। লোকজনে ভরতি বাড়ি, কে কোথায় কী লক্ষ করছে কে জানে। সিন্ধু তাই কাঁটা হয়ে রইল। সে তখন বেশ হিরো হয়ে গেছে। জলপাইগুড়ির সেই ঘটনা খবরের কাগজে ফলাও হয়ে বেরিয়েছে। তার নামের উল্লেখ অবশ্য কাগজে ছিল না। কিন্তু কয়েকজন অধ্যাপকসহ পলিটেকনিকের বহু ছাত্র গ্রেফতার হয়েছে এবং আরও কয়েকজনকে খোঁজা হচ্ছে বলে কাগজে জানিয়েছিল। কিন্তু সবাই জেনে গেছে যে সিন্ধু সেই ঘটনার মধ্যমণি ছিল। টুকুনও জানত। প্রায় সময়েই এসে মুগ্ধ বিহ্বলতায় তাকিয়ে থাকত মুখের দিকে, বলত, আপনি না একটা ডাকাত! কী করে ও—রকম কাণ্ড করলেন বলুন তো! এমনিতে দেখলে তো কিছু বোঝা যায় না, খুব ভালোমানুষের মতো দেখতে। এই বলে টুকুন সিন্ধুর খুব কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করত। সিন্ধুই বা এড়ায় কী করে? বয়সের দোষ তারও কি থাকতে নেই? তবু প্রাণপণে কিছুটা সংযত রাখত নিজেকে। কিন্তু এ—কথা সত্যি যে ইচ্ছে করলে সে যা—খুশি করতে পারত টুকুনের সঙ্গে। যা—খুশি। টুকুন একটুও বাধা দেবে না। এটা বুঝতে পারার পর সে খুবই দুর্বল বোধ করতে থাকে। মেয়েদের শরীর সম্পর্কে যে দুর্লভ অভিজ্ঞতাটা তার কোনওদিনই হয়নি সেই মহার্ঘ্য জিনিস টুকুন যেন ডিসে সাজিয়ে তার মুখের সামনে ধরে আছে। খেলেই হয়।

কিন্তু বাধা ছিল টুকুনের স্বভাব। শুধু সিন্ধুকে নিয়ে থাকলে না হয় বোঝা যেত। কিন্তু গোপনে খবর পেয়ে সিন্ধুর যে—সব অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত তাদের প্রত্যেকের প্রতিই একটা হাঘরে লোভ ছিল তার। বাছাবাছি ছিল না, সিরিয়াসনেস ছিল না। এক দিন দুপুরে সিন্ধু যখন চিতপাত হয়ে পড়ে ঘুমের চেষ্টা করছে তখন টুকুন একটা ইংরিজি কথার মানে জিজ্ঞেস করার অছিলায় ঘরে এসে ইঙ্গিতে পূর্ণ হাসিতে দরজা বন্ধ করে দিল, আর প্রায় সিন্ধুকে চেপে ধরে শ্বাসরোধকারী অবস্থায় বুকে কনুইয়ের ঠেস দিয়ে হেলে বসে বলল, 'বলুন তো ওয়েডলক কথাটার মানে কী!' তখন সিন্ধু খুবই সুবিধাজনক অবস্থায় পেয়েও টুকুনকে চুমু খায়নি। মনে হয়েছিল, ও যা মেয়ে, ঠোঁটটা নিশ্চয়ই বরোয়ারি হয়ে আছে, কত জন না জানি চুমু খেয়েছে ওই ঠোঁটে! ভাবতেই একটা অনিচ্ছা, একটা বিবমিষা তার মনকে দূরে ঠেকিয়ে রাখল। একটা মেয়ে যত ছলবলেই হোক, নিজের থেকে সহজে কোনও পুরুষকে চুমু খায় না বা জড়িয়ে ধরে না। কিন্তু কেউ তাকে খেলে বা ধরলে যে সে খুশি হয় তার জানান দেয় নানাভাবে। সেই দুপুরে টুকুনও বারংবার নানাভাবে তাকে জানিয়েছে। পাগলের মতো তার বুকে কনুই চেপে ধরেছে, মাথার চুল ধরে টেনেছে মুঠো করে, কিল মেরেছে, চিমটি দিয়েছে। সিন্ধু ওকে তাড়িয়ে দেয়নি, আবার গ্রহণও করেনি। মনটা বড় আড় হয়েছিল সেই দুরন্ত দুপুরে। বলেছিল, তুমি এবার যাও, কেউ এসে পড়বে।

অবাক হওয়ার ভান করে টুকুন বলল, এসে পড়লে কী! গোপন কিছু তো করছি না!

সিন্ধু এর কী জবাব দেবে? এত নির্লজ্জতার পরও ওর নাকি গোপন করার কিছু নেই। সিন্ধু হেসে বলল, যা করছ তা দেখলে লোকে তোমাকে পাগল ভাববে।

আপনাকেও ভাববে, পাগল ছাড়া কেউ ও—রকম পাথর হয়ে থাকতে পারে! আপনি খুব বীর, না? ছাই!

বীর কে বলেছে?

লোকে বলে, সিন্ধু খুব জোর ঠান্ডা করেছে জলপাইগুড়ির গুন্ডাদের। আমিও তাই ভাবতাম। এখন দেখছি ভিতুর ডিম।

সিন্ধু এ—সব শুনে পৌরুষবশত এক বার গা—ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। হয়তো ধরত টুকুনকে, একটা কিছু করত।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে খুব সতর্ক নরম গলায় বুকুন ডাকল, টুকুন, চা নিয়ে যা।

দুধে ছানা কেটে গেল, অবস্থাটা পালটে গেল তৎক্ষণাৎ। টুকুন নিঃশব্দে সিন্ধুকে জিভ ভেঙিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে খুব অসংকোচে, একটুও ধরা পড়ার জন্য ঘাবড়ে না—গিয়ে বলল, তুই দিগে যা। আমার বয়ে গেছে।

চা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল বুকুন। টুকুন চলে গেলে সে বাধ্য হয়ে ভিতরে এল। লজ্জায় নতমুখী, সমস্ত শরীর আঁচল ঘুরিয়ে ঢাকা দেওয়া। সেই প্রথম সিন্ধু তাকে ভালো করে দেখল। ম্লান গায়ের রং, ছোটখাটো, রোগা, শুধুমাত্র তার মুখশ্রীটি ভারী সুন্দর ডৌলের। চোখ দুটি মায়াবী লজ্জায় ভরা। মুখে একটা ভয় সংকোচের ছাপ। টেবিলে চা রেখে সে চলে যাচ্ছিল, ভদ্রতাবশে সিন্ধু কিছু বলতে হয় বলে বলল, মনোজ এখনও ফেরেনি বুকুন?

বুকুন কেমন দেখতে তা বিচার করা ভারী মুশকিল। বোধ হয় খুবই সাদামাটা মিষ্টি মুখশ্রী, এর বেশি কিছু বলা যায় না। তার ওপর ছোটখাটো বলে তেমন নজরও পড়ে না ওর দিকে। টুকুনের সঙ্গে তুলনাই হয় না, এর ওপর ও আবার ভীষণ লাজুক ঘরকুনো, নতমুখী। নিজেকে অত লুকিয়ে রাখে বলেই সিন্ধু ওকে এতকাল লক্ষই করতে পারেনি। এখন করল আর এক ধরনের ভালোই লাগল তার। সে যেমন হেমন্তের বিকেল দেখলে একটা উদাস ভালো লাগা ঠিক তেমনি। পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে যেমনটা হয় বয়সকালে, তেমন নয়। বরং মনে হয় আমার যদি এ—রকম নরম—সরম বাধুক একটা বোন থাকত, বেশ হত। অন্তত সিন্ধুর এ—রকমই কিছু মনে হয়েছিল।

দরজার কাছ বরাবর বুকুন থেমে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে সিন্ধুর প্রশ্নের জবাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কথা বলে চমকে দিল সিন্ধুকে। বলল, টুকুনকে অত লাই দেবেন না, ও ভীষণ গায়ে—পড়া।

সিন্ধুর কান গরম হয়ে গেল, বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল। জোর করে একটু হেসে বলল, তাই দেখছি। ওকে তোমরা সামলে রাখতে পার না, না?

না। সবাই ওকে নিয়ে ভাবে। সবসময়ে একটা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে।

সিন্ধু আস্তে করে বলল, যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে তা হলে বরং আমি অশোকদের বাড়িতে চলে যাই। কাল ও বলছিল, ওদের বাসায় থাকবার জায়গা আছে।

বুকুন তখন ফিরে দাঁড়িয়ে তার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলে, বা, তাই বলেছি বুঝি! আমি বললাম, বা রে!

এই বলে বুকুন ভীষণ অপ্রতিভ। গুছিয়ে কথা বলার মতো মেয়েমানুষিও ওর নেই, সিন্ধু বুঝে গেল।

তাই বলল, না, সে—কথা তুমি বলোনি। আমিই ভাবছি।

কেন? ও কি আপনাকে খুব জ্বালাতন করে?

সিন্ধুর মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করল না, অপকটে বলল, করে একটু। ও যে কী চায় তা তো বুঝি না। আমি ভাবছি, আমি তো বড় ছেলে, তোমাদের বাসায় আছি, তোমাদের আবার তার জন্য কোনও বদনাম না হয়।

বুকুন নখ দিয়ে দরজার গা খুঁটছিল। সেই দিকেই চেয়ে বলল, আপনার জন্য বদনাম হবে কেন? টুকুনকে সবাই চেনে। পাড়ায় কেউ ওকে ভালো বলে না। নিজের বোন তবু বলছি। আপনি সাবধানে থাকবেন। সিন্ধুর বেশ অপমান জ্ঞান আছে। এই কথা শুনেও তার ভিতরের অপমান—বোধটা ঠান্ডা হয়নি। বলল, আমি আর কীরকম সাবধানে থাকব বলো! ঘরের দরজায় হুড়কো লাগিয়ে তো আর সবসময় ঘরে থাকা যাবে না। তার চেয়ে আমার চলে যাওয়াই ভালো।

বুকুন দরজা খোঁটা শেষ করে আঁচল আঙুলে জড়াতে থাকে। এগুলো স্মার্টনেসের অভাব থেকে হয়। যারা নিজেদের অক্ষমতা বা অযোগ্যতা নিয়ে সবসময়ে সচেতন তাদের লোকসমক্ষে নানা মুদ্রাদোষের অভ্যাস থাকে। আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে বুকুন বলে, টুকুনকে বরং আমি বকে দেব। আপনি যাবেন না।

সিন্ধু হেসে ফেলল। টুকুনকে যে বুকুন বকবে এ—কথা ভাবতেই তার হাসি পাচ্ছিল। টুকুন মা বা বাবা কিংবা দাদাদের কাউকেই কেয়ার করে না, বুকুনের বকাকেই কি করবে? তা ছাড়া টুকুনকে বকবার মতো ক্ষমতাও তো এই রোগা নরম ভিতু মেয়েটার নেই।

সিন্ধু বলল, না তার দরকার নেই। তা হলে ও ঝগড়া করবে। খুব বিশ্রী সিচুয়েশন হবে। বকতে যেয়ো না।

আচমকা আবার সিন্ধুকে চমকে দিয়ে বুকুন তার দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, আপনি হাসলেন কেন?

প্রশ্নটার মধ্যে কোনও চ্যালেঞ্জ ছিল না, রাগ বা বিরক্তিও ছিল না। বরং যেন খুব অসহায়তা ছিল। যেন হাসি দেখে তার বড় অভিমান হয়েছে কিন্তু প্রতিশোধের সাধ্য তার নেই।

সিন্ধু বলল, তুমি রাগ করলে নাকি! এমনি হাসি পেল। টুকুন তো ভীষণ ঝগড়াটে মেয়ে তাই ওকে বকতে গেলে তুমিই বরং বকুনি খেয়ে আসবে, এই ভেবে হাসলাম।

বুকুন কথাটা শুনল। হাসল না। গম্ভীর থেকেই বলল, মাও বলছিল টুকুনটা সিন্ধুকে খুব জ্বালাচ্ছে। আমাকে মা বলছিল যেন আমি আপনাকে সাবধান করে দিই।

ঠিক আছে সাবধানেই থাকব।

দুপুরবেলা ও অনেকক্ষণ আপনার ঘরে ছিল। মা একটু আগে এসে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে গেছে। গিয়ে বলল, টুকুন ছেলেটাকে রেস্টও নিতে দিচ্ছে না।

সিন্ধু এ—কথা শুনে চমকে উঠল। ভীষণ লজ্জা আর ঘেন্নায় পেল তাকে। টুকুনের মা এসে কোন অবস্থায় তাদের দেখে গেছে, ছি ছি! নিশ্চয়ই তারা খুব সাধু ভঙ্গিতে ছিল না! সারাক্ষণ তো টুকুন তার গায়ে শ্বাস

ফেলেছে আর কনুই রেখেছে বুকে। দুজনেই দেহ স্পর্শ করেছিল দুজনের। এঃ মা!

সিন্ধু আর মুখ তুলতে পারে না লজ্জায়। কোনওক্রমে বলল, বিশ্বাস করো আমি কিছু করিনি।

কথাটা ভুল বলা হল। ওভাবে বলা সিন্ধুর উচিত হয়নি। ওরা তো তাকে দায়ী করেনি যে সাফাই গাইতে হবে।

বুকুন তখন খুব ভালো গলায় বলল, না, না, আপনি করবেন কেন! আমরা তো টুকুনকে জানি। ভীষণ পাজি, বাবা আর মা'র লাই পেয়ে পেয়ে এ—রকম হয়ে গেছে, দাদাও কিছু বলে না।

সিন্ধু তখন মুখ তুলতে পারল, বলল, কেন ওকে সবাই তোমরা প্রশ্রয় দাও?

ও যে সুন্দর দেখতে! পড়াশুনোতেও ভালো, সেই কারণে সবাই ওকে মাথায় তুলে রেখেছে, ও যা করে কেউ কিছু বলার নেই মুখের ওপর। বললেই এমন ঝগড়া করবে।

তোমরা ওকে ভয় পাও?

অপমানকে সবাই ভয় পায়। এক দিন না আবার আপনার সঙ্গেও ঝগড়া লাগিয়ে দেয়! ওকে বিশ্বাস নেই।

সিন্ধু মাথা নেড়ে বলল, আমি ঝগড়া করি না। কারও সঙ্গে করিনি কখনও, ভয় নেই।

বুকুন আবার তাকে চমকে দিয়ে বলে, করেননি, না! তবে কেন পালিয়ে আছেন? সবাই বলছে আপনি জলপাইগুড়িতে দাঙ্গা করে এসেছেন, পুলিশ আপনাকে খুঁজছে।

দাঙ্গা! বলে সিন্ধু অবাক। বলে, দাঙ্গা নয়। সেটা অনেক বড় ব্যাপার।

আপনি তো খুব গম্ভীর আর শান্ত, তবে ও—রকম মারপিট করলেন কেন?

এ পর্যন্ত সেই মারপিটের গল্প কারও কাছে করেনি সিন্ধু। ওই মারপিটের মধ্যে যে তার কিছু বীরত্ব ও সাহসের ব্যাপার আছে তাও তার মনে হয়নি। তাড়া খেয়ে, পালিয়ে থেকে আর দুশ্চিন্তা করে সে সেই ঘটনার মধ্যে তার অসমসাহসী ও মরিয়া কাণ্ডকারখানার ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল। এখন হঠাৎ এই শান্ত মেয়েটির কাছে নিজের বীরত্বের কথা প্রথম তার বলতে ইচ্ছে করল।

এই ইচ্ছেই কি ভালোবাসার বীজ?

সিন্ধু একটু আগ্রহের সঙ্গে বলল, বোসো না ওই চেয়ারটায়।

বুকুন হাসল আর তার সুন্দর ঝিকিমিকি দাঁত দেখে আবার একটু ভালো লাগল সিন্ধুর। বুকুন বলল, দাঁড়ান কথায় কথায় চা—টা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। আবার করে এনে দিয়ে বসছি।

চায়ের কাপ নিয়ে বুকুন চলে গেল। এবং কথা রাখল। ফিরে এসে গরম চায়ের কাপ হাতে দিয়ে চেয়ারে বসল। খরগোশের মতো ভিতু আর উৎসুক চোখের দৃষ্টি। সিন্ধুর ক্রমশই ব্যাপারটা ভালো লাগতে থাকে।

সেই বিকেলে অনেক কথা বলেছিল সিন্ধু। অঙ্কুরের মার খাওয়া থেকে সব। নিজের কাণ্ডকারখানার খুবই ফলাও বিবরণ দিয়েছিল সে। সেই বয়সে গায়ের জোরের গল্প বলতে খুবই ভালো লাগার কথা। বীরত্ব জিনিসটা তখনও তো খুবই সুস্বাদু।

ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বুকুন। একেই তো ছেলেদের সঙ্গে একদম মেশেনি তার ওপর সিন্ধুর মতো ডাকাবুকো ছেলেকে প্রথম দেখেই সে অবাক। একটু প্রশ্রয় পেয়ে সে বুঝি ধন্য হয়ে গেল। ভক্তিভাব ফুটে উঠল চোখে—মুখে।

সবশেষে করুণ মুখ করে বলল, মা গো! ওরা যদি মারত আপনাকে?

সিন্ধু বলল, তা হলে এতক্ষণে হাসপাতাল না হয় মর্গ ঘুরে শ্মশানে গিয়ে ছাই।

ইস, বলবেন না! ভীষণ দুষ্টু আপনি!

সিন্ধু বোকা হয়ে গেল, বলল, হ্যাঁ, একটু দুষ্টুই।

কেন ও—সব করতে গেলেন? এখন যদি পুলিশ আপনাকে ধরে তা হলে কী করবে?

কী আর করবে! জেলে দেবে।

না না, কেন জেলে দেবে! আপনি তো ঠিকই করেছেন।

পুরনো আমলে বিপ্লবীরা এ—রকম অ্যাকশনের পর লুকিয়ে থাকত আর সে—সময়ে তাদের নানা বিপদের মধ্যেও প্রেম—ট্রেম হত, সিন্ধু এ—রকম ঘটনা নভেলে পড়েছে। তারও নিজেকে সে—রকমই একজন মনে হচ্ছিল। খুব হিরো—হিরো লাগছিল নিজেকে। বুকুনের করুণ চোখ তাকে উদ্বেগভরে লেহন করছিল তখন।

তবু দেবে। সিন্ধু বলল।

বুকুন বলে, এইমাত্র খবরের কাগজ দিয়ে গেল, মা পড়ছিল একটু আগে, বলল, জলপাইগুড়ির পলিটেকনিকের ছেলেদের সব ছেড়ে দিয়েছে মুচলেকা নিয়ে।

তাই নাকি? সিন্ধু লাফিয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ।

আপনাকেও দেবে তো?

দেবে দেবে। সিন্ধু অস্থির হয়ে বলে, কাগজটা আনো তো।

মনোজদের বাসায় প্রায় কুড়ি দিন থাকবার পর এইভাবে প্রথম বুকুনের সঙ্গে আলাপ হল, অবশ্য আলাপ করতে বুকুন জানত না, কথা বলার চেয়ে সিন্ধুর কথা শুনবার আগ্রহই তার বেশি ছিল। টুকুনও দখল ছাড়েনি সিন্ধুর ওপর, দামাল হাওয়ার মতো সে যখন—তখন এসে ঢুকত ঘরে, খোলা ব্লাউজ আটকাতে বলেছে কয়েক বার। সিন্ধু দিয়েছেও আটকে। কখনও পড়া বুঝবার নাম করে এসে আজেবাজে প্রেম সংক্রান্ত সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করেছে, শেষ দিকে গোটা দুই চিঠিও দিয়েছিল। যখন টুকুন আসত তখন বুকুন কখনও আসত না। টুকুন বিকেল বা সন্ধ্যাবেলায় থাকত না, তখন খুব ভয়ে ভয়ে এসে উঁকি দিত। ভারী খুশি হত তাকে দেখে সিন্ধু। বুকুন যে বোকা তা নয়। কিন্তু ভারী সরল তার মন। সিন্ধু যা বলত তা সে মধুর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করত। সিন্ধু ভয়ের গল্প বললে তার গায়ে কাঁটা দিত। করুণ কথা বললে চোখে জল আসত তার। প্রথম আলাপের পর আর মাত্র এক সপ্তাহ ছিল সিন্ধু মনোজদের বাড়িতে। ওই সাতটা দিন বড় অদ্ভুত। ওই সাত দিনে সিন্ধু নিশ্চিত বুঝে গিয়েছিল এই বুকুন হচ্ছে তার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। কোথা থেকে যে এই বোধ এল, কেন এল, তা সিন্ধু ভেবে পায় না। হয়তো ওই নরম, নতমুখী, মুগ্ধা ও বিহ্বলাকে দেখে যে—কোনও পুরুষেরই ও—রকম দখলদারি প্রবৃত্তি জেগে উঠবে। ওই সাত দিনে ভিতু মেয়েটা দৌড়ে দৌড়ে সিন্ধুর জন্য নানা কাজ করেছে। ছোট বোনেরা যেমন দাদার জন্য মায়াবশে করে, তেমনই ডাকলেই এসেছে, যা বলেছে সিন্ধু তাই শুনেছে। এত বাধ্য মেয়ে হয় না।

সিন্ধুর বাবা আগেই খবর পেয়েছিলেন যে সিন্ধু মনোজদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। পুলিশ পাছে তাঁকে 'ফলো' করে সিন্ধুর হদিস পেয়ে যায় সেই ভয়ে তিনি মনোজদের বাড়িতে সিন্ধুর খোঁজে আসতে পারেননি। প্রায় পঁচিশ দিন বাদে বাবা এক দিন এলেন। সিন্ধু গিয়ে তাঁকে প্রায় জড়িয়ে ধরল 'বাবা' বলে। আসলে বাবাকে জড়িয়ে ধরার মতো সম্পর্ক বাপ—ছেলের নয়। বাবা সবসময় সম্ভ্রান্ত দূরত্ব রেখে চলেন, ছেলেদের সঙ্গে কখনও সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব রাখতে তাঁর ভুল হয় না। কিন্তু সেই আবেগের মুহূর্তে দূরত্বটা রইল না। সিন্ধুকে তিনিও একটু বুকে চেপে ধরে রইলেন। পরে বললেন, এস—পির সঙ্গে কথা বলে এসেছি। তুমি জলপাইগুড়িতে গিয়ে থানায় সারেন্ডার করো। ওরা একটা মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেবে। তোমার হয়ে আমিও একটা মুচলেকা দিয়ে এসেছি।

মনোজদের বাড়িতে থাকা শেষ হয়ে গেল। সেই দিনই সিন্ধু ও—বাড়ি থেকে চলে যাবে। প্রায় এক বস্ত্রে এসেছিল। সেই বস্ত্রগুলো তখন ধোপাবাড়িতে, সিন্ধু মনোজের জামা—কাপড় কষ্টেসৃষ্টে পরে থাকে। ধোপাবাড়ির জামা—প্যান্টের জন্যই আরও একটা রাত থেকে যেতে হয়। রাতটাই ছিল অদ্ভুত। টুকুন খুব কান্নাকাটি জুড়ে দিল। সে বড় নির্লজ্জ, দাদার বন্ধু চলে যাচ্ছে বলে তার পাড়া জানান দিয়ে কান্নাটা খুবই দৃষ্টিকটু। আর এমন তো নয় যে, তাদের বাড়িতে সিন্ধু অনেক দিন ধরে সম্পর্ক পাতিয়েছে! বুকুন কাঁদেনি প্রকাশ্যে। কিন্তু সন্ধে পার হয়ে যাওয়ার কিছু পর এক নিরালা সময়ে সে তার ম্লান মুখখানা নিয়ে সিন্ধুর ঘরে এল।

সিন্ধু বলল, চলে যাচ্ছি।

বুকুন ছলছলে চোখে চেয়ে বলল, টুকুন কেমন কাঁদছে। ও বড় ভালোবাসত আপনাকে। আমি ওর মতো কাঁদতে পারি না। তাতে আপনি যেন ভাববেন না যে আমার মনখারাপ হয়নি।

সিন্ধু বুকুনের দিকে তাকাল। বাইরে ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। বাড়িটা নিস্তব্ধ। আর ঘরের মধ্যে তারা মাত্র দুজন। বুকের মধ্যে একটা ঢেউ উঠে ভাঙল সিন্ধুর। সে চোখ সরাল না, একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সেইদিন পর্যন্ত সিন্ধু কোনও মেয়ের চোখে ও—রকমভাবে চোখ রাখতে পারেনি দীর্ঘ সময় ধরে। কারও চোখেই সে চোখ রাখতে পারে না, বড় লজ্জা করে, অস্বস্তি হতে থাকে। কিন্তু সেদিন কিছু হল না। নিঃসংকোচে সে তাকিয়ে থাকতে পারল। বুকুন, সেই লুকিয়ে—থাকা—স্বভাবের মেয়েটিও উলটে তাকিয়ে থাকল। সিন্ধু ফের টের পেল যে এই মেয়েটির ওপর তার কবে থেকে বেশ এক অমোঘ—দাবি—দাওয়া তৈরি হয়ে গেছে। এ যেন তার নিজস্ব সম্পত্তি। এটাকে কি ভালোবাসা বলা যায়? কে জানে? তবু ওইরকমই হল একটা ব্যাপার। এ—মেয়েটিকে তার একটুও লজ্জা করল না।

সিন্ধু বলল, বুকুন, কেন এত লুকিয়ে থাকতে তুমি এত দিন? প্রথম যখন তোমাদের বাড়িতে এলাম তখন তুমি সামনেই আসতে চাইতে না।

বুকুন বলল, আমি কারও সামনে যাই না। লজ্জা করে।

কেন, লজ্জা করবে কেন?

আমি তো টুকুনের মতো সুন্দর নই।

সিন্ধু তখন খুব একটা স্মার্ট জবাব দিল, তুমি কেন টুকুনের মতো সুন্দর হবে? তুমি তোমার মতো সুন্দর।

ইস, আমি আবার সুন্দর! আমি তো রোগা, বারোমাস অসুখে ভুগি। আমার বাড়ির লোকেও আমাকে ঠাট্টা করে বলে অমলা।

অমলা কেন?

ডাকঘরের অমল তো অসুখে ভুগত। আমাকে তাই মেয়ে—অমল বলে খ্যাপায়। অমল থেকে অমলা।

তুমি খুব ভোগো নাকি?

ভুগি। আমার তো অ্যাজমা আছে, ব্রঙ্কাইটিসও। টনসিল সেই ছেলেবেলা থেকে খারাপ, দু'বার অপারেশন হয়েছে। আরও দু'—একটা আছে, সে—সব আপনার শুনে কাজ নেই।

শুনে সিন্ধুর একটু মনখারাপ হয়ে গেল। এ—কথা ঠিকই যে বুকুন বারোমেসে রুগি। শীতকালে প্রায়দিনই হাঁফ—এর টান উঠত বলে বিছানা নিত। একটু বেশি স্নান করে ফেললেই সর্দি আর প্রবল কাশি, গলায় কম্ফর্টার আর পায়ে মোজা পরে থাকতে হত। মেয়েলি রোগ ছিল বোধ হয় কয়েকটা। যে—মেয়েটাকে সিন্ধু নিজস্ব বলে চিহ্নিত করেছিল সেই হল কপালের দোষে এইরকম।

তাই সিন্ধু ভাবে, এত মেয়ে দুনিয়ায় থাকতে তার কেন মরতে বুকুনের সঙ্গেই ভাব হল!

সিন্ধু পরদিন তার হস্টেলে ফিরে গেল। পুলিশের ঝামেলা মিটিয়ে সে আবার ক্লাস করতে শুরু করল। কিন্তু তখন সিন্ধুর মধ্যে একটুখানি কী যেন পালটে গেছে। এমনিতে খুব আড্ডাবাজ বলে সে ছুটিছাটায় শিলিগুড়িতে বড় একটা আসত না। কিন্তু বুকুনের সঙ্গে ভাব হওয়ার পর তার শিলিগুড়ির ওপর একটা আলাদা টান জন্মায়। প্রায় শনিবারই সে শিলিগুড়ি রোডে লরি থামিয়ে অল্প পয়সায় চলে আসত শিলিগুড়ি। তেরাস্তার মোড় থেকে ব্যাগ কাঁধে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসত মনোজদের বাড়ি। মনোজ থাক বা না—থাক, টুকুন পাড়া বেড়াতে যাক বা না—যাক, বুকুন ঠিক অপেক্ষা করে থাকত। এমন নয় যে বুকুনের সঙ্গে অনেক কথা তার। বরং সে এলে বাড়ির অন্য লোকই তার সঙ্গে কথাবার্তা বলত। বুকুন এসে চা দিয়ে যেত, ডিমভাজা বা চিঁড়েভাজা যা হোক একটা খাবারও দিত সঙ্গে। দূর থেকে চেয়ে দেখত সিন্ধুর দিকে। সেই চোখের দৃষ্টি ছিল অদ্ভুত উদ্দীপ্ত আনন্দে ভরা। সে বুঝতে পারত প্রায় শনিবারই যে সিন্ধু আসে, তা আসে

তার জন্যই। একটু রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে সিন্ধু বাড়িতে চলে যেত। আবার আসত রবিবার সকালে। আবার সেই লঘু দেখা হওয়া। জলপাইগুড়িতে ফিরে যেতে হত রবিবার বিকেলেই।

এইভাবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওই রুগণ মেয়েটার সঙ্গে শক্ত—সমর্থ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সিন্ধুর কী করে যে সম্পর্ক হল তা ভগবান জানেন। কিন্তু হল। দু'খানা মস্ত চোখ আর সুকুমার মুখশ্রী ছাড়া বুকুনের মেয়েমানুষের যৌবনোচিত শরীর বলতে তেমন কিছু নেই। আর সেই মুখশ্রী আর চোখের দৃষ্টি দিয়েই সিন্ধুর বুকের মধ্যে একটা কোমল বঁড়শি সে গেঁথে দিতে পেরেছিল। কিন্তু বুকুনের শরীর প্রায়ই ভালো যায় না। সারা বছর মুড়িমুড়কির মতো ট্যাবলেট খেয়ে বেঁচে ছিল।

যে বছর সিন্ধু এল.এম.ই. ফাইনাল দিয়ে পাকাপাকিভাবে চলে এল শিলিগুড়ি। চাকরির তখন বড় আকাল। প্রথম কয়েক ব্যাচের এল.এম.ই—র ছাত্ররা মোটামুটি ভদ্রগোছের চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বহু পলিটেকনিক থেকে প্রতি বছর ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্র বেরোচ্ছে, অত ছেলেকে চাকরি দেবে কে? সিন্ধু প্রথম দিকে খুব দরখাস্ত পাঠাত এখানে—সেখানে, রাজ্যের রেফারেন্স আর সার্টিফিকেট জোগাড় করা ছিল। ইচ্ছে ছিল চাকরি পেলে সে বুকুনকেই বিয়ে করবে, আর বিয়ে করেই খুব ভালো করে একটা থরো ট্রিটমেন্ট করাবে তার, আর খুব ভালোবাসা দিয়ে ধীরে ধীরে তাকে সুস্থ করে তুলবে।

চাকরিই পেল না সিন্ধু। না, কথাটা ঠিক হল না। মাদ্রাজে একটা পেয়েছিল। গেল না। অত দূর যাবে বুড়োবুড়ি মা—বাবাকে ছেড়ে! আর রোগা বুকুনও বুকভাঙা কান্না কেঁদেছিল যে। এইসব মেয়েমানুষি সেন্টিমেন্ট দেখলে সিন্ধু বড় বিচলিত হয়ে পড়ে। তার মন বড্ড নরম। তাই শিলিগুড়িতে সে ঠিকাদারির ব্যবসা শুরু করবে। ব্যবসা ভালো চলে না। সিন্ধু হাল ছাড়ে না কখনও! তার দায়দায়িত্ব বেশি নয়। বাবার পেনশনে সংসারটা টেনেটুনে চলে যায়, তার হাতখরচটা উঠে আসে ব্যবসা থেকে। বাড়িটা নিজেদের বলে নিরাশ্রয় হওয়ার ভাবনা নেই। তবু জীবনটা তো শুধু কোনওরকমে বেঁচে থাকা নয়। কত স্বপ্ন দেখে সিন্ধু। আর স্বপ্নভঙ্গের নৈরাশ্য থেকে তার শরীরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। মনটা ধূসরতার রঙে ভরা। বুকুনও নিজের শরীরের বৈরিতায় বন্দি হয়ে থাকে ঘরে। সিন্ধুর জীবনে সেও পারেনি তার হৃদয় ঢেলে দিতে। শুধু বড় বড় চোখে সিন্ধুর দিকে চেয়ে থাকে।

এই তো কিছু দিন আগে বড় বাড়াবাড়ি হয়েছিল বুকুনের। ক'বছর ধরেই কথা হচ্ছে একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে বড় ডাক্তার দেখানো হবে, এবং দরকার হলে ট্রপিক্যাল বা কোনও নার্সিং—হোমে রাখা হবে কিছুকাল। হবে—হবে করে হচ্ছিল না। এইবার সত্যিই হল। আসবার সময়ে বুকুন বারবার সিন্ধুকে বলেছে, এই যে যাচ্ছি, আর ফিরব না দেখো।

কেন, তোমার তো তেমন কিছু অসুখ নয়! অত ভাবছ কেন?

আমার অসুখ কী তা আমিই জানি।

আমিও জানি!

বলো তো আমার কী অসুখ?

তোমার অসুখের নাম সিন্ধু চ্যাটার্জি।

খুব হেসেছে বুকুন। বলেছে, মাগো! তুমি যা মজা করো না! কিন্তু তুমি কেন আমার অসুখ হতে যাবে? আমার যখন খুব শরীর খারাপ থাকে তখন তোমাকে দেখলেই আমার অসুখ অর্ধেক যেন কমে যায়। সত্যি বলছি।

বোকা মেয়ে। ওইসব কথা বলত বলে সিন্ধুর বড় বেশি মায়া। প্রেম বা ভালোবাসা কীরকম তা তো জানে না সিন্ধু। টুকুনের প্রতি যেমন আলটপকা এক বার আকর্ষণ জন্মেছিল সিন্ধুর, কিংবা সুন্দরী মেয়ে দেখলে যেমন শরীর—গন্ধে মন নেচে ওঠে, বুকুনকে দেখলে তেমন হয় না, বরং খুব একটা মায়া হয়, মনটা 'আহা' বলে ওঠে।

সিন্ধুকে একা রেখে বুকুন চলে এল কলকাতায়। তারপর থেকেই সিন্ধুর মনটা বড় আনচান করে। বারবার মনে হয় যাই, গিয়ে বুকুনকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলে আসি।

একটা টেন্ডার দেওয়ার দরকার পড়ল, সাপ্লাইয়ের জন্য কিছু ভালো কোম্পানির রংও কিনতে হবে, পি ডবলিউ ডি—র রেজিস্ট্রেশনটার জন্যও একটু চেষ্টা করা দরকার—এ—রকম কয়েকটা কারণই জুটে গেল কলকাতায় আসার। নইলে বাস্তববাদী সিন্ধু এককাঁড়ি গাড়ি—ভাড়া দিয়ে কলকাতায় আসত না। কলকাতা এমনিতে ভালোও লাগে না তার। বড় ভিড়। বড্ড বেশি গাড়ি—ঘোড়া, আর কী ভয়ংকর গোলমালের শব্দ চার দিকে। শিলিগুড়ির নিরিবিলির শান্ত—শ্লথ জীবন থেকে এখানে এলে হঠাৎ যেন বড় দিশেহারা আর বোকা লাগে নিজেকে। দু'দিনেই হাঁফ ধরে যায়। কী করে যে তার দাদা কবি সাগর এ—রকম একটা হিজিবিজি শহরের প্রেমে পড়ে গেল কে জানে!

যেদিন এল সিন্ধু তার পরদিন বিকেলে সে একা বেরিয়ে পড়ল। শরৎকালের বিকেল, আলো মরে আসছে খুব তাড়াতাড়ি। বেরোনোর সময়ে কমলা বারবার বলছিল, এখন বেরোচ্ছিস, ফিরতে তোর রাত হয়ে যাবে দেখিস। আজ না হয় না গেলি!

সিন্ধু মাথা নেড়ে বলে, না, তাড়াতাড়ি কাজগুলো সেরে নিই। বেশি দিন থাকা যাবে না।

কমলা বলে, কাজ তো অফিসের কাজ! এই বিকেলে কোন অফিসটায় যাবি শুনি?

সিন্ধু হেসে বলে, এই রকম করে রোজ যদি আটকাও তো এ—যাত্রা খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে।

যাবিই, তা হলে তাড়াতাড়ি ফিরিস। তোর দাদা রাজ্যের চিনে খাবার এনে বসে থাকবে।

ফিরব।

বালি স্টেশন থেকে গাড়ি ধরে হাওড়া আসতে খুব বেশি ধকল পেল না। কেবল এক মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে স্টেশনে আসাটা যা একটু কষ্টের। কিন্তু হাওড়ায় এসে সেই গোলমেলে অব্যবস্থা চার দিকে। কোথায়, কোন দিকে যে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বাস পাওয়া যাবে কে জানে! এত লোকের উলটোপালটা স্রোতে দম আটকে আসে।

বহুকষ্টে সে একটা পনেরো নম্বর বাস ধরল। বাড়ির নম্বর টুকে এনেছে, বুকুন আছে তার এক মাসির বাড়িতে। কিন্তু কোথায় নামলে বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না, কোনও গলিঘুঁজিতে ঢুকতে হবে কি না এ—সব কিছুই সে জানে না। কাঠ হয়ে বাসের মধ্যে বসে রইল।

কন্ডাক্টরকে বলে রেখেছিল দীনেন্দ্র স্ট্রিটে এলে যেন বলে দেয়। তবু সংশয়ে হাওড়া ব্রিজ পেরোতেই কয়েক বার সিট ছেড়ে উঠবার উপক্রম করল সে। পাশের ভদ্রলোক বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবেন?

সিন্ধু বলে, দীনেন্দ্র স্ট্রিটে।

সে এখনও দেরি আছে। আমি বলে দেব।

তবু সন্দেহ যায় না। যা গোলোকধাঁধা শহর। তার ওপর এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। গনফটটার ঘুমের বায়নার জন্য এটা হল।

দীনেন্দ্র স্ট্রিটে নেমে সে নম্বর খুঁজতে থাকে। অনেক হাঁটা অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর বড় রাস্তা থেকে একটু গলির মধ্যে ধোঁয়াটে অন্ধকারে বাড়িটার খোঁজ পাওয়া গেল। গলির মুখেই একটা মস্ত দোকানে এক কড়াই দুধ জ্বাল হচ্ছে। সিন্ধুর খিদে পেয়েছিল, এক ভাঁড় দুধ কিনে চায়ের মতো চুমুক দিয়ে দিয়ে খেল। দুধ তার ভালো লাগে না, কিন্তু পেটটায় একটা চিনচিনে ব্যথা উঠছে। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছে যেন কখনও খালি পেটে না থাকে, আর প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর কিছু খেতেই হবে। সে অবশ্য খায় না, অনিয়ম করে। কিন্তু এখন পেটের ব্যথাটা উঠতেই এক কড়াই দুধ দেখে সামলাতে পারল না। তা ছাড়া দুধওলা পশ্চিমা লোকটাই বাড়ির হদিস দিয়ে দিল তাকে।

সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলা। বন্ধ দরজা। সিন্ধু ভয়ে ভয়ে কড়া নাড়ে। যদি এ—বাড়ি না হয়? যদি চোর বলে তাকে পুলিশে দেয়? কলকাতা বড় ভয়ংকর শহর, কেউ কারও আপন নয়।

দরজা খুলে একটি শাড়ি—পরা মেয়ে মুখ বার করল। মুখে একটা স্বভাবজাত হাসি। বেশ স্বাস্থ্য তার। লম্বার ওপর চাবুক চেহারা। মুখশ্রীর মধ্যে ব্রনহীন অল্প বয়সের লাবণ্য। লম্বা চুলের মস্ত বেণিটা বাঁ বুকের ওপর ঝুলছে। সেই বেণিটারই শেষটুকুতে রিবন বাঁধছিল।

সিন্ধু বলল, আমি শিলিগুড়ি থেকে এসেছি, মনোজের বন্ধু। ওর বোনের সঙ্গে দেখা করে যাব।

বুকুনদি?

হ্যাঁ।

মেয়েটি যেন একটু বিব্রত হয়ে হঠাৎ বলল, আচ্ছা ক'টা বাজে বলুন তো!

সিন্ধু ঘড়ি দেখে বলল, পৌনে ছয়।

এঃ! তা হলে তো সময় নেই। আমরা আজ সিনেমায় যাচ্ছি। তবু আসুন ডেকে দিচ্ছি।

খুব অপ্রস্তুত লাগছিল সিন্ধুর। অসময়ে এসে পড়েছে সে। কিন্তু সে তো জানত না যে ওরা সিনেমায় যাবে!

সামনের ঘরটা বড্ড ছোট। তার মধ্যে গাদাগাদি একটা খাটের বিছানা, দুটো বহু পুরনো গদিআঁটা চেয়ার, টেবিল, বুক কেস, মেহগনি কাঠের আলনা—সব রয়েছে। একটা মস্ত আলমারিও। মনে হয় এরা বহু বছর ধরে এ—বাড়িতে আছে। কয়েক পুরুষ ধরে। আর এ—সব জিনিসও পুরুষানুক্রমের পুরনো। বুকুন আসবে। বহু দিন বাদে বুকুনকে দেখবে সিন্ধু। বুকটার মধ্যে একটু এলোমেলো হাওয়া পাক খেল।

সেই সুন্দর মেয়েটা ভিতরে চলে গিয়ে একটু বাদে তাড়াতাড়ি ফিরে এল। খাটের ওপর থেকে দুটো ফেলে—রাখা সেফটিপিন খুঁজে নিয়ে চলে যাচ্ছে। শাড়িতে গা ঢাকা। তবু পাতলা শাড়ির ভিতর দিয়ে দেখতে পেল সিন্ধু, মেয়েটার পিঠের দিকে ব্লাউজ হাঁ হয়ে আছে, ব্রেসিয়ারের সাদা স্ট্র্যাপ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটার শরীরের গঠন অদ্ভুত সুন্দর। গায়ে এক বিন্দু বাড়তি চর্বি নেই। কোমর সরু, অন্যান্য জায়গা চমৎকার সুডৌল, উন্নত। গায়ের ত্বক মসৃণ চিক্কণ। তাকিয়ে দেখলে বেশ ভালো লাগে।

বহুকালের পুরনো আসবাবে সাজানো পুরনো ঘরটায় বসে সিন্ধু নানা কথা ভাবে। এরা সিনেমায় যাচ্ছে, বড় অসময়ে এসে পড়েছে সে। লজ্জাও করছে একটু একটু। বুকুন ছাড়া এ—বাড়িতে সে কাউকে চেনে না। আর বুকুনের সঙ্গেও তো তার সম্পর্কটা অন্য রকম। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না তো? এই মেয়েটা কে? বুকুনের মাসতুতো বোন কি? ভারী সুন্দর দেখতে তো।

ভিতরের ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ আসে। স্পষ্ট নয়। কারণ পরদার আড়ালে দরজা ভেজানো রয়েছে। তবু সিন্ধু শুনতে পায়, উচ্চকণ্ঠে কে একটা মেয়ে বলল, যাও না বুকুন, তাড়াতাড়ি দেখা করে এসো, বেশি কিন্তু সময় নেই। গল্প করতে বসে যেয়ো না আবার, ভদ্রলোককে বিদেয় করে চলে এসো।

আর—একটা মেয়ে বলল, কে গো বুকুনদি?

এবার বুকুনের গলা শোনা গেল, সে দরজার কাছ থেকেই বোধ হয় মৃদুকণ্ঠে বলল, শিলিগুড়ির ছেলে, দাদার বন্ধু।

এই বলতে বলতে বুকুন ঘরে এল।

এ—ঘরে জোরালো আলো নেই। একটা কম পাওয়ারের বালব জ্বলছে। এ—বালবটাও বোধ হয় খুবই পুরনো। আলোর মধ্যে মাকড়সার জালের মতো আঁকিবুকি। সেই আলোতে যেটুকু বুকুনকে দেখা গেল তাতে চমকে উঠল সিন্ধু। একেই বুঝি রূপান্তর বলে! যেন গুটিপোকা থেকে মথ বেরিয়ে এসেছে। না, এতটা নয় ঠিকই। এ যে বুকুন তা চেনা যাচ্ছে, কিন্তু সেই রোগা রুগণ ভাসা—ভাসা—চোখের বুকুন তো এ নয়! অল্প ক'—দিনেই কলকাতার জল আর গঙ্গার হাওয়ায় একটা বুকুন দুটো বুকুনের সমান মোটাসোটা হয়েছে। অসম্ভব সেজেছেও। সিনেমায় যেতে হলে অত সাজে মেয়েরা? পুরনো কিন্তু ভীষণ দামি খয়েরি রঙের একটা বেনারসি পরেছে, শাড়িটার সর্বাঙ্গে এক বিঘত বড় বড় জরির কলকা আর বুটি। এত বেশি জরি যে জমি

প্রায় দেখাই যায় না। বুকুনের চোখে লেপটানো কাজল, মস্ত ভুয়ো খোঁপা, গলায় বকলসের মতো সেঁটে আছে সোনার চৌখুপিওলা চিক। ভ্রূ নিশ্চিত প্লাক করেছে, নইলে ওর ভ্রূ তো অত সরু আর টানা—টানা ছিল না? বাঁ কবজিতে ঘড়ি, নখে ন্যাচারাল কালারের পালিশ।

সিন্ধু এত অবাক হয়েছিল যে কথা বলতে পারল না।

বুকুন একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল, কবে আসা হল?

ভাববাচ্যে কথা। 'তুমি'ও না 'আপনি'ও না। সিন্ধু একটু সতর্ক হয়ে বলল, এই তো কাল।

আমি কিন্তু এর মধ্যেই একটু মোটা হয়েছি, না?

একটু? সিন্ধু মাথা নেড়ে বলে, আয়না দেখ না?

ঘরের মধ্যে আরও কয়েক পা এগিয়ে এল বুকুন, খাটের কানা ধরে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, ক'দিন থাকা হবে?

ঠিক নেই। সিন্ধু বলল, কাজে এসেছি, কাজ মিটলেই ফিরে যাব। তোমার অসুখের কী হল?

হচ্ছে। তবে হাসপাতালে ভরতি হতে হয়নি।

একটা অপারেশন হওয়ারও কথা ছিল না?

বুকুন অত সাজগোজে আড়ষ্ট হয়ে আছে, না সিন্ধুকে লজ্জা পাচ্ছে এত দিন পরে দেখে তা বোঝা গেল না। কিন্তু খুব কাঠ হয়ে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে এক ধরনের নিস্পৃহ গলায় বলল, দরকার হয়নি। ওরাল ট্রিটমেন্টেই কাজ হয়েছে। সামনের মাসে মাসিদের সঙ্গে চুনার যাব।

সিন্ধু যেন শুনে খুশি হল না। খবরটা তো ভালোই। বুকুনের অপারেশন হবে না, শরীর সেরে যাচ্ছে, এ—সব তো ভালো খবরই। তবু যেন মনে ভয় আসে, যে—বুকুনকে সে নিজের সম্পত্তি মনে করত সে বুঝি এ নয়। এ—বুকুনকে সে কি ও—রকম নিজের মেয়েমানুষ বলে বোধ করতে পারে!

সিনেমায় যাচ্ছ? সিন্ধু বলল।

হ্যাঁ। এমন সময়ে তুমি এলে—

তাতে কী? দেখে গেলাম, শিলিগুড়ি গিয়ে বলব।

রোজ সিনেমা আর থিয়েটার! একটু ভ্রূ কুঁচকে বুকুন বলল, যেন বা তার এত ফুর্তি ভালো লাগে না।

বেশ মজায় আছো তা হলে।

মজা মনে করলে মজা।

তোমার ভালো লাগে না?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বুকুন হঠাৎ বলে, টুকুনের সঙ্গে দেখা হয় বুঝি রোজ?

সিন্ধু হেসে ফেলল। খুব ছেলেমানুষ ছাড়া এভাবে কেউ জিজ্ঞেস করে?

সিন্ধু বানিয়ে বলল, হয়।

বলে সিন্ধু উঠল। বলল, আজ তো সিনেমায় যাচ্ছ, দেরি করিয়ে দিয়ে গেলাম।

আবার কবে আসবে?

এ—যাত্রায় বোধ হয় আর নয়। সময় হবে না। তুমি কি শিলিগুড়ি ফিরবে শিগগির?

বুকুনের মুখটা একটু ম্লান হয়ে গেল। বড় লাজুক অপ্রতিভ মেয়ে। মাথা নত করে বলল, এখান থেকে ফিরতে দিচ্ছে না কেউ। কথা চলছে, আমার বিয়ে ঠিক করে এখান থেকেই বিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে।

সিন্ধুর বুক চমকে উঠল। সে এ—দিকটা কখনও ভাবেনি, কিন্তু ভাবা উচিত ছিল না কি!

মুখে জোর করে একটু হাসি ফুটিয়ে সে বলল, ভালোই তো। বাঃ, বেশ! সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে?

বুকুন একঝলক তাকাল, বলল, হচ্ছে। শোনো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক জরুরি কথা আছে। পরশু বিকেলে এক বার আসবে?

কী কথা বুকুন?

সে—কথা বলার সময় তো এখন নেই। পরশু আসবে?

উদাস হয়ে সিন্ধু বলে, দেখি।

আজ চা—ও খেয়ে গেলে না!

পরশু যদি সময় হয় তো আসব। তখন চা খেয়ে যাব। কিন্তু যদি আসতে না পারি, তবে ধরে নিয়ো আর দেখা হল না।

না, ও—সব বুঝব না। আসতে হবেই। খুব জরুরি কথা।

সিন্ধু অন্যমনস্কভাবে একটা 'হুঁ' দিয়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসেও অনেকক্ষণ ঘোর—ঘোর লাগছিল তার। এত অন্যমনস্ক যে চারপাশে ভালো দেখতে পাচ্ছিল না। তার মন থেকে একটা কুয়াশা উঠে চারপাশ ঘিরে রেখেছে। এত যে বুকুনকে নিজের বলে ভেবেছিল সিন্ধু, সেটা যে সত্যি নয় তা যেন বিশ্বাস হয় না। প্রেম কিংবা ভালোবাসা কী রকম সিন্ধু তা জানে না। সে জানে কেউ কারও জন্য হয়তো জন্মায়। যেমন বুকুন। বুকুনের সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল সে।

আবার সিন্ধু ভাবল, রোগাভোগা ছিল বলেই বুঝি বুকুনকে খুব সহজলভ্য ভেবেছিল সে। এখন বুকুন কেমন সুন্দর হয়েছে, বিশ্বাস হতে চায় না বুকুন বলে। এখন এই সুন্দর বুকুনের জন্য সিন্ধুর চেয়ে ঢের যোগ্য ছেলে জুটে যাবে।

লড়াইটা কি বোকার মতো হেরে গেল সিন্ধু?

আট

সাগর তার পোর্টম্যান্টো পাশে রেখে ট্যাক্সির পিছনের সিটে ঘাড় এলিয়ে বসে ছিল। চোখ বোজা। খুব ক্লান্ত লাগে আজকাল। যেন অনেক পথ হাঁটা হয়েছে। বহু দূর এসে পড়েছে সে। এবার কখন হয়তো ফিরতে হবে।

কোথায় ফিরবে সাগর?

জবাবটা বড় অস্পষ্ট। ঠিক বুঝতে পারে না। তবু ক্ষীণ মনে হয়, বড় দীর্ঘ পথ চলে এসেছে বিপথে, এবার ফিরতে হবে। ফেরা দরকার।

ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে ওয়েলিংটনে এসে পড়তেই সাগর ট্যাক্সি ডাইনে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে ঢোকাল। একটু এগিয়েই থামে। এখানে খালাসিটোলায় পার্থ রায়, অবনী চৌধুরীরা আড্ডা মারত। এখনও কি আসে ওরা? মাঝে—মধ্যে ওদের সঙ্গে আসত সাগর। এক গেলাসের ওই সব ইয়ার—দোস্তরা ছিল তার কবিবন্ধু। কী বিপুল কবিতার স্বপ্ন তারা একদিন দেখেছিল। সাগর জানে, পার্থর তিনটে কবিতার বই বেরিয়েছে। অবনীর বোধ হয় পাঁচটা। অবনী খুব গভীর কবিতা লিখত। সাগরের সবচেয়ে প্রিয় সমকালীন কবি অবনী এখন ভয়ংকর নাম করে ফেলেছে। বিখ্যাত কবি, বিখ্যাত মাতাল। অনেক দিন দেখা হয়নি। বছরখানেক আগে এক বার এসে দেড়শো টাকা ধার নিয়ে চলে গিয়েছিল সাগরের অফিস থেকে, আর আসেনি।

দুপুরে খালসিটোলায় ভিড়ভাট্টা কম। মস্ত ঘরটায় কিছু নিঝুম ধ্যানমগ্ন লোক বসে আছে। তারা অধিকাংশই বয়স্ক মানুষ। নিম্নশ্রেণীর। কাউন্টারের কাছে দুজন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। একজনকে সাগর চেনে। তুলু সেন। তুলু একসময়ে ভালো ছবি আঁকত। এখন একটা মস্ত কোম্পানির আর্ট ডিরেক্টর। অল্প বয়সে অসম্ভব উন্নতি করেছে।

তুলু সাগরকে চিনল। মাথা নেড়ে বলল, কী খবর?

খুবই আলগা প্রশ্ন। কোনও আন্তরিকতা নেই।

সাগর বলল, ভালো।

নগদ পাঁচ হাজার টাকার গর্ভবতী পোর্টম্যান্টেটা কাউন্টারে রেখে সাগর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একটা একনম্বরি বোতল কিনল! মনটা আজ একদম ভালো নেই। কোথায় যেন ফিরতে হবে। কত দূর যেন যাওয়ার আছে।

দীর্ঘ খোয়াই....তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী...রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো পার হয়ে যাই এক স্বপ্নের উদ্যানে।

সাগর গেলাসটা রাখল। এক গেলাস অল্প সোডা মেশানো তীব্র দিশি মদ তার ভেতরে হাঁচোর—পাঁচোড় করছে। মাথাটা চাঁই করে পাক মারল। উত্তেজনাবশে সে বড় তাড়াতাড়ি পান করেছে। আরও একটু সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে খাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি খাওয়ার দরুন শরীরে ও মাথায় যে ঘুলিয়ে—ওঠা ভাব সেই মন্থনে একটা লাইন চলে এল। পার হয়ে যাই এক স্বপ্নের উদ্যানে! লাইনটা ভালো না যাচ্ছেতাই তা এ—অবস্থায় বুঝতে পারল না সাগর। কিন্তু লিখে ফেলতে হবে। নইলে যদি নেশা কাটলে লাইনটাও হারিয়ে যায়!

পোর্টম্যান্টো খুলে সাগর তার নোটবই আর ডটপেন বার করতে গিয়ে পাঁচহাজারি প্যাকেটটা দেখতে পেল। ফালতু পাঁচ হাজার। এক পয়সার পরিশ্রম নেই, ট্যাক্স নেই, ঝুঁকি নেই। মজুমদার বলেছিল 'ভালচারস'। কথাটা এখনও সাগরের মধ্যে বিঁধে আছে।

মাথাটা টাল খাচ্ছে। তবু সাগর কাউন্টারে নোটবই রেখে লাইনটা লিখে ফেলল। একটু আঁকাবাঁকা আর ঢেউ—ঢেউ হল লেখাটা। হাতটা কেঁপে যাচ্ছে।

তুলু এগিয়ে এসে বলল, ইন্দ্রাণীর খবর জানেন?

অন্যমনস্ক সাগর মুখ তুলে বলল, কে ইন্দ্রাণী?

ইন্দ্রাণী ঘোষাল। আপনার ফ্যান ছিল, মনে নেই?

সাগরের মনে পড়ল বটে, কিন্তু ভারী অবাকও হল সে। ইন্দ্রাণী বার তিনেক বিয়ে করেছিল, কোনও বারই বিয়ে টেঁকেনি। কিন্তু বিস্ময়কর হল, ইন্দ্রাণী প্রথমবার বিয়ে করেছিল এই তুলুকেই।

হতভম্ব ভাবটা সামলে সাগর বলে, কী হয়েছে ইন্দ্রাণীর?

তুলু খুব জোরে একটা 'হাঃ' শব্দ করে কাউন্টারে ভর দিয়ে একটু হেসে বলে, স্যাড! দিন দুই আগে ঘুমের বড়ি খেয়েছিল, হাসপাতালে পড়ে আছে এখনও। ডিপ কোমা, আশা নেই।

সাগর আবার অনেকটা দিশি গেলাসে ঢেলে অল্প একটু সোডা মিশিয়ে খেতে যাচ্ছিল। তুলু বলল, অতটা কনসেন্ট্রেটেড খাবেন না। আর—একটু ডাইলিউট করুন। দূর থেকে দেখছিলাম, খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছেন। কী হয়েছে?

আমি এ—রকমই খাই।

বলে সাগর দুটো বড় চুমুক মারল। আর—একটা গেলাস চেয়ে নিয়ে তুলুর দিকে বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, খান।

তুলু ঢেলে নিয়ে মেশানো শেষ করে গেলাস তুলে বলে, চিয়ার্স!

চিয়ার্স! বলে সাগর।

পরমুহূর্তেই মনে হয়, চিয়ার্স! চিয়ার্স মানে কী? চিয়ার্স কেন? এই এখন ইন্দ্রাণীর খবর শুনবার পর আনন্দিত হওয়ার কিছুই তো নেই। মদ্যপান করার সময়ে সহপায়ীকে চিয়ার্স বলার যে বিদেশি রেওয়াজ এখন চালু হয়েছে সেটাকে কুসংস্কার বলা যায় না কি? আর এই যে লোকটা তার সঙ্গে মদ খাচ্ছে এর তো আনন্দিত হওয়ার কোনও কারণই নেই। শত হলেও ইন্দ্রাণী একসময়ে এর বউ ছিল। তারপর ছেড়ে গিয়ে পর্যায়ক্রমে আরও দুজনকে বিয়ে করেছিল ঠিকই, তবু তো বিবাহের কিছু স্মৃতি, কিছু বিষণ্ণতা থাকবে।

তুলুর মুখে কিছুই লেখা নেই। না হর্ষ, না বিষাদ, না কোনও ভাবের প্রকাশ। তুলু বড় বেশি মদ খায়, জানে সাগর। এত বেশি মদ খায় বলে ওর মুখে কি একটা ভ্যাবলা ভাব! না কি ওর বোধ—বুদ্ধি কম? এই কথা মনে হতেই সাগর নিজের মুখটাও মনে করার চেষ্টা করে। তার মুখও কি ওই তুলুর মতোই বোধ ও বুদ্ধিহীন হয়ে গেছে? সেও তো খুব মদ্যপান করে। আজকাল বড় বেশি খায়। মনটা ভালো লাগে না।

সাগর বলল, ইন্দ্রাণীর কথা একটু বলবেন?

তুলু গালে হাত রেখে বসেছিল, নীচের ঠোঁটটা ঝুলে গেছে একটু। অন্যমনস্কভাবে চেয়ে ছিল, বলল, ওর তো এ—রকমই কিছু হওয়ার কথা ছিল, আমি বরাবরই এ—রকম কিছু এক্সপেক্ট করতাম। শেষ পর্যন্ত বাদল ঘোষকে বিয়ে করেছিল। কোম্পানি ডিরেক্টর, চেনেন নাকি?

চেনে সাগর। অর্ডারের জন্য মাঝে মাঝে গেছে। খুব স্মার্ট চেহারার লোক বাদল। কিন্তু ওই বুদ্ধিমান চেহারার ভিতরে বরাবরই একটা পিছল শয়তানি চাপা আছে, এটা ওর চোখ দেখলেই টের পাওয়া যেত। সাগর মাথা নাড়ল।

তুলু বলে, বাদলকে বিয়ে করার পরও আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ওদের বাসায় এই সেদিনও গিয়ে ড্রিঙ্ক করেছি। ইন্দ্রাণী অনেক ঠাট্টা করল পুরনো সব কথা নিয়ে। বাদলকে খুব স্পোর্টিং লাগছিল।

সাগরের মাথাটা ভালো লাগছিল না। সে যেন ঠিক বুঝতে পারছিল না তুলুর কথা। বলল, ইন্দ্রাণীর কাছে যেতেন?

যাব না কেন?

ঠিকই তো। যাবে না কেন? সাগর ভাবল, সে বুঝি বেশ মাতাল হয়ে পড়েছে। মাথাটা ঝাঁকাল। তারপর খুব ক্ষীণ শুকনো গলায় বলল, আজ উঠে পড়ি।

আর—একটু খান। আমি একটা বোতল নিচ্ছি।

না, আর নয়। কাজ আছে।

আমারও অফিসে ফেরার কথা। কিন্তু আর যাব না। ইন্দ্রাণীর সম্মানে আজকের দিনটা হাফ—ডে নিয়েছি। অনেকক্ষণ ড্রিঙ্ক করব। সিরিয়াস ড্রিঙ্কিং।

তবে কি একটা দুঃখু—টুঃখুও হচ্ছে তুলুর? সারা দিন ড্রিঙ্ক করবে কেন তবে ইন্দ্রাণীর সম্মানে? না কি এ—সবই ওর চরিত্রগত ফেরেব্বাজি। ফেরেব্বাজ কিছু কম দেখেনি সাগর। তার লাইনে ফেরেববাজ গিজগিজ করছে। তুলু বোধ হয় প্রায়ই সারা দিন ড্রিঙ্ক করার জন্য এ—রকম একটা অছিলা খুঁজে নেয়। তাই ইন্দ্রাণীর সম্মানে ওর ড্রিঙ্ক করাটাকে সাগর তেমন গায়ে মাখতে পারল না।

কিন্তু উঠে চলেও যেতে পারল না সাগর। উঠতে যাবে, মাথাটা ফের এক বার চাঁই করল। বড্ড তাড়াতাড়ি মদটা খেয়েছে সাগর। কাজটা ঠিক হয়নি। না কি স্ট্রোক—ফোকের পূর্বলক্ষণ?

মাথাটা চেপে সে একটু বসে থাকে।

তুলু বোতল নিল। সাগরের বোতলেও একটু ছিল। দুটো গেলাসে তুলুই সোডা মিশিয়ে মনের মতো করে মদটা তৈরি করে একটা গেলাস এগিয়ে দিয়ে বলল, চ্যাটার্জি, এই যে অ্যালকোহল জিনিসটা এটা কে আবিষ্কার করেছিল বলুন দেখি? তার জবাব নেই। এ—জিনিসটা না থাকলে কবে দুঃখ চাপা পড়ে মরে যেতাম।

সাগর গেলাসটা তুলে নিয়ে একটু একটু করে খেতে লাগল। সঙ্গে বেশি টাকাকড়ি থাকলে সাগর কখনওই বেশি মদ্যপান করে না। মাতালদের ট্যাঁকের টাকা প্রায়ই হাপিশ হয়ে যায়। কিন্তু এখন তার সে—খেয়াল রইল না। বুকটা খামচে আছে একটা দুটো তিনটে অস্পষ্ট দুঃখে।

সাগর আরও দশ বছর আগে বেশ নামকরা কবি ছিল। তখন সাগরের ছিল ভাত—কাপড়ের টানাটানি অভাবের সংসারে কমলা আর সে দুজনে মিলে—সয়ে—বয়ে থাকত। সেই অভাববোধটা সাগরকে কখনও মলিন করেনি। অহংকারী তরুণ কবি সাগরশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তখন যেখানে যেত সেখানেই অল্প—বেশি সম্মান পেত। অবশ্য কবিতা লিখে তেমন খ্যাতি, দেশজোড়া নাম আর ক'জনের হয়? সাগরেরও তেমন নাম ছিল না, কিন্তু কবিমহলে সে একসময়ে রাজার সম্মান পেয়েছে। তরুণ কবিরা ঈর্ষা করত, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে প্রতি বছরই একদল সাহিত্যপাগল ছেলেমেয়ে আসে—তারা সাগরের দিকে সমীহ—ভরা চোখে চেয়ে দেখত। ইন্দ্রাণী ছিল বাংলার এম—এ—র ছাত্রী। কফি হাউসে ইন্দ্রাণী অনেক প্রেমিক নিয়ে বসে থাকত, মাঝেমধ্যে তার কিছু কিছু ছদ্ম দুঃখে ভরা কবিতা কয়েকটা লিটল ম্যাগাজিনে বেরিয়েও ছিল।

ইন্দ্রাণীর প্রেমিকদের মধ্যে একজন ছিল সাগরের চেনা, সে—ই এক দিন ইন্দ্রাণীর কাছে বুঝি ডাঁট নেওয়ার জন্যই সাগরের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়।

বড্ড বেশি চোখা চালাক মেয়ে ইন্দ্রাণী। মেয়েদের অত চালু ভাব সাগরের পছন্দ ছিল না। ঠোঁটকাটা ইন্দ্রাণী যখন—তখন যৌনপ্রসঙ্গ তুলে আলোচনা করত। ছেলেদের সঙ্গে ছিল তার জলের মতো মেলামেশা। তার চেহারাটা ছিল একটু ভারী, ফরসা, বেশ লাবণ্যে ভরা মুখ, আহ্লাদ তার সমস্ত শরীরের পাত্রে উপচে পড়ত, চুল ঈষৎ রুক্ষ, বড় বড় চোখ, চমৎকার দাঁত। বোম্বাইয়ের এক চিত্রতারকার সঙ্গে মুখের আদল ছিল বলে তাকে সবাই গীতাবালি বলে ডাকত। সাগর একনজরেই তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল বুঝি। কিন্তু ইন্দ্রাণীর প্রেমে রোজ এত লোক পড়ত যে সাগর সেই প্রেমটা হজম করে যায়। পরিচয় হওয়ার কিছুকাল পরেই সাগর এর—তার মুখে শুনতে পায় ইন্দ্রাণী বলে বেড়াচ্ছে, আমি সাগর চ্যাটার্জির প্রেমিকা!

অবশ্য নিতান্তই প্রতীক অর্থে বলা। সাগরের প্রেমিকা অর্থে তার কবিতার প্রেমিকা। তবু সংবাদ শুনে সাগরের হৃৎপিণ্ড কিছু বেশি রক্ত তুলে ফেলে। ঝাঁ করে ওঠে সর্ব অস্তিত্ব। ও—রকম সুন্দর আর বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে নিজেকে তার প্রেমিকা বলে প্রচার করছে।

উৎসাহভরে ঘটনাটা কমলাকে শুনিয়েছিল সাগর, কিন্তু তার ফল ভালো হয়নি। একটু গ্রাম্য—স্বভাবের কমলা ঘটনাটার মধ্যে অন্য রকম গন্ধ পেয়ে রাগারাগি করে। সেই রাগের উত্তাপ মরে যেতে—না—যেতেই একটা করুণ ও নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে যায়। ইন্দ্রাণীর মধুচক্রে যারা রোজ বসত তাদের মধ্যে ইদানীং কিছু লোফার ছেলেরও আনাগোনা শুরু হয়েছিল। তারা রূপসুধা পান করা বা ইন্দ্রাণীর কথামৃত শুনে ঠান্ডা থাকার ছেলে নয়। তাদের মধ্যেই তিনজন এক দিন ঘোর সন্ধেবেলা ইন্দ্রাণীকে ট্যাক্সিতে তুলে জোর করে নিয়ে গিয়ে তিলজলার দিকে কোন ফাঁকা বাড়িতে বলাৎকার করে। দিন দুই আটকেও তাকে রেখেছিল তারা, তারপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পালিয়ে যায়।

ইন্দ্রাণীদের মতো মেয়ের জীবনে যে—কোনও সময়েই এ—রকম ঘটনা ঘটতে পারত। এত দিন যে ঘটেনি সেটাই আশ্চর্য। সেই ঘটনার পর অল্প কিছু দিন নার্সিং হোমে কাটিয়ে ইন্দ্রাণী দিল্লি চলে যায়। কিছুকাল থেকে ফিরে আসে। কফি—হাউসে আসত না, কিন্তু প্রায় সময়েই ধর্মতলার দিকে একটা খুব চালিয়াত বড় রেস্টুরেন্টে বসে কফি বা ওয়াইনের সঙ্গে সিগারেট খেত বলে শোনা গেছে। সেই সময়ে ইন্দ্রাণীকে এক—আধবার দেখেছে সাগর। মুখ খুব রুক্ষ, পুরুষের মতো একটা কঠিন ভাব এসে গেছে চেহারায়।

এক দিন দুপুরবেলা ইন্দ্রাণী কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে বসে ছিল। সঙ্গে যথারীতি কিছু ছেলে। কয়েকটা মেয়েও। হঠাৎ কোত্থেকে তুলু এসে ঢুকল। সোজা ইন্দ্রাণীর কাছে গিয়ে বলল, কতগুলো ভেড়ার সঙ্গে সবসময়ে বসে থাকতে তোমার লজ্জা করে না? চলো, আজ তোমাকে বাঘ দেখাব।

সবাই হেসে অস্থির। তুলু গ্রাহ্য করল না, ইন্দ্রাণীর হাত চেপে ধরে টেনে তুলে ফেলে বলল, চলো। যেতেই হবে।

এ—রকমধারা পুরুষ হয়তো ইন্দ্রাণীর মতো মেয়েদের বেশ পছন্দ। এদের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক বন্য প্রেমের গন্ধ আছে। তুলু তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে হাজির, বিয়ের ফর্মে সই করিয়ে তবে ছাড়ল।

বিয়েটা দু'—তিন বছর টিকেছিল হয়তো বা। পরের খবর সাগরের অত ভালো জানা নেই। তবে সেদিন তুলু যে ইন্দ্রাণীর ভক্তদের কাছে ঈর্ষণীয় হিরো হয়ে উঠেছিল সে—বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সেই হিরো এই এখন সাগরকে কাতরভাবে মদ খাওয়াচ্ছে।

একটা আধমাতাল রিকশাওয়ালাকে দিয়ে তুলু বাইরে থেকে এক ঠোঙা ঝালবড়া আর ঘুঘনির চাট আনাল। বলল, খান।

সাগর ছুঁল না। গেলাস ঠোঁটে ঠেকিয়ে রেখে মদের মধ্যে শ্বাস ছেড়ে বলল, ইন্দ্রাণীকে কি আপনি শেষ পর্যন্ত ভালোবাসতেন?

তুলু কথাটা বুঝতে পারল বোধহয়। বলল, অফ কোর্স! ডাইভোর্সের পরে আরও বেশি ভালোবাসতাম। তারপর ও যেমন বিয়ে করেছে আবার, আমিও তেমনি করেছি। দ্যাট ডাজনট ম্যাটার।

ঠাট্টার সুরে নয়, খুব আকুলতার সঙ্গেই যেন সাগর জিজ্ঞেস করল, ভালোবাসা কাকে বলে, একটু বুঝিয়ে দেবেন?

তুলু ভাবল ঠাট্টা। খুব হাসে সে। বলে, ভালোবাসা হল শরীরের ভিতরে একটা কেমিক্যাল সিক্রেশন। হরমোন—টরমোন কিছু একটা হবে, তার সঙ্গে খানিকটা হার্ট—ট্রাবল, উইথ এ মেন্টাল অ্যানরম্যালসি।

ভুল বকছে মাতালটা।

সাগর পোর্টম্যান্টোটা আঁকড়ে ধরে খুব সাবধানে আস্তে উঠে পড়ল। পা টলছে, মাথাটা একপাক চাঁই করে থেমে গেল, তবু টলমল করছে। চোখের দৃষ্টি তেমন স্বচ্ছ নয়। তবু সাগর তুলুকে এক বার 'যাই' বলে বেরিয়ে আসতে পারল।

বিস্তর খেয়েছে সাগর। দুপুরেই এত খাওয়া ঠিক হয়নি। 'বুশ'গুলোর জন্য একটু তাগাদা দিতে যাওয়ার কথা ছিল। সে আজ আর হবে না। চুলোয় যাকগে কাজ। এখন নিজেকে সামলানোই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

কাউন্টারে খানিকটা ভর রেখে, খানিকটা অবলম্বনশূন্য জায়গায় টলে পড়ে যেতে যেতে সাগর বাইরে এল। শরীরটা এ—রকম করছে বটে, কিন্তু সে যে মাতাল হয়নি এখনও তা বুঝতে পারছিল সাগর। বুদ্ধি এখনও ঘুলিয়ে যায়নি, মাথাটা হালকা হয়ে মত্ততার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি এখনও।

সাগর ট্যাক্সি খুঁজছিল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কষ্টে একটা পেয়ে গেল। আজ আর কোনও কাজ হবে না। কাজ তো নেই কিছু। বাড়ি ফিরে যাবে? কিন্তু বাড়ি গিয়ে হবে কী? এই অবস্থায় ছেলেমেয়ের সামনে যেতে তার রুচি হয় না। মাতাল হলে সে রাত করে ফেরে। তা ছাড়া এখন সিন্ধু আর তার বন্ধু গনপত রয়েছে বাড়িতে। সিন্ধু তার দাদার এ—চেহারাটা দেখেনি কখনও। আজ দেখলে হতভম্ব হয়ে যাবে। সেখানে ফেরা অসম্ভব। কিন্তু এ—অবস্থায় আর কোথাও যাওয়ারও নেই!

ট্যাক্সি নিয়ে সে এল ম্যাঙ্গো লেনে। কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। মজুমদারের কাছ থেকে পাঁচ হাজার পাওয়ার পর থেকেই মনটা এ—রকম বেচাল হয়ে আছে।

বাইরের ঘরে মদিরা নিজের প্রস্তরমূর্তি হয়ে বসে আছে। এতটা স্থির ও গম্ভীর সে কখনও ছিল না। একটু তাকায়, একটু হাসে। গলার পাথরের মালা দাঁতে কামড়ে তলচোখে চায়—এ—সবই তার অভ্যাসজাত। কাকে কীভাবে রিসিভ করতে হয় তা তার জানা আছে। তাই আজ তার স্থির ও বিষণ্ণ চেহারাটা ও—রকম দেখাল।

দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সাগর মদিরাকে অকপট চোখে দেখছিল। নিজের শরীরের ভারসাম্যহীনতার দরুন ঘরের অবলম্বনহীন মেঝে পেরিয়ে সোফার কাছে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল আর মদিরার মুখ থেকে কিছু পড়ে নেওয়ার চেষ্টাও করছিল। না, সে মাতাল নয়। তবু শরীর যখন টাল খাচ্ছে, বোধবুদ্ধিও একটু টাল খাচ্ছে। মদিরাকে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?

মদিরা তাকিয়ে সাগরকেই দেখছিল। বলল না—আসুন।

সাগরই বরং একটু অস্বস্তির হাসি হেসে জড়ানো অস্পষ্ট গলায় বলল, মজুমদার আছে?

মদিরা আরও একটুক্ষণ জবাব না দিয়ে দেখল তাকে। তারপর হঠাৎ মাথাটা একধারে অল্প একটু নেড়ে জানাল, আছে।

খুব একটা নিশ্চিন্ত হল সাগর। মজুমদার আছে এটা যেন এক মস্ত শুভ সংবাদ। অথচ সে জানেও না মজুমদারের কাছে এই আসার মানে কী?

এক পা দু' পা টাল খেয়ে সাগর আবার একটু স্বাভাবিকভাবে পা ফেলতে পারল। সোজা গিয়ে মজুমদারের দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঢুকল ভিতরে। ভিতরে সুন্দর গন্ধ, আধো অন্ধকার, এক শূন্যগর্ভ আভিজাত্য। মজুমদার তার চেয়ারে চিত হয়ে পড়ে আছে, চোখ বোজা।

সাগর বসল।

অনেক দূর চলে এসেছে সাগর, বিপথে। এখন আবার কোথায় যেন ফিরে যেতে হবে।

এ—রকমই সব মনে হয় আজকাল।

সাগর ডাকল, মজুমদার!

মজুমদার ঝুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করল। বসে থেকেও শরীরটা সোজা রাখতে পারছে না।

বলল, অ্যাঁ?

আপনার কী হয়েছে?

কোনও শালা আমাকে স্পেয়ার করে না। সবসময় আমাকে লোকে খাবলাচ্ছে। খাবলে কী হবে বাবা! আমার সব চুলোয় গেছে।

সাগর একটা শ্বাস ফেলে চুপ করে রইল খানিক। তার তেমন নেশা হয়নি। হলেও শরীরে যে—প্রতিক্রিয়া তা মনটাকে কবজা করতে পারেনি। মাথা পরিষ্কার আছে।

সাগর বলল, প্যাক্ট তো আপনিই করেছেন মজুমদার। আমরা তো প্রোপোজ করিনি।

মজুমদার মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গি করে বলল, সব শালা ভিখিরি। আপনারা সব আউটরাইট বেগারস। আপনাদের কোনও অফিস নেই, ডেকরেশন নেই, স্ট্যাটাস নেই। লোটা—কম্বলওয়ালাদের মতো নাঙ্গা হয়ে ব্যবসা করে বেড়ান। সেইজন্যই আপনাদের কস্টিং অত কম, টেন্ডারে যাচ্ছেতাই লো রেট দিয়ে পেয়ে যান। আই হেট ইউ পিপল। যাদের আত্মমর্যাদা নেই, আভিজাত্য নেই এখন তাদেরই যুগ। আমার এ—রকম ভিখিরি ভালো লাগে না। আই লাইক স্ট্যাটাস, আর লাইক ডেকরেশন। তাই আমি ভিখিরিদের মতো কম রেট দিতে পারি না। সেটা কি আমার দোষ? তাই আপনাদের মতো ভালচারদের সঙ্গে প্যাক্ট করতে হয়।

সাগর রাগ করতে পারছে না। রাগ আজকাল খুব সহজেই হয় সাগরের। তবু এই ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাওয়া ফোঁপরা লোকটাকে তার ঘেন্না হয় না।

সাগর বলল, আই অ্যাডমিট।

মজুমদার সম্পূর্ণ বেহেড নয়। মদ খাওয়ার দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আজকাল তারও বোধহয় তেমন নেশা হয় না। শরীর টলে বটে কিন্তু মাথা সাফ থাকে। একটা বোতল আর দুটো গেলাস বের করে হুইস্কি ঢেলে সাগরকে দিল মজুমদার। নিজেও চোঁ চোঁ করে খেতে লাগল অনন্ত পিপাসায়।

মজুমদার বলল, আপনাদের সেলফ—রেসপেক্ট নেই কেন? আফটার অল ইউ ওয়্যার এ পোয়েট। কবিদের সম্মানবোধ তো খুব টনটনে হয় বলে শুনেছি।

হায়! মজুমদার কেন তার কবিত্বের কথা তোলে! ফড়ে, দালাল, ব্যবসায়ীরা কেন কবিতা শব্দটা উচ্চারণ করে! ওতে কবিতার শুদ্ধতা নষ্ট হয়, সতীত্ব আঘাত পায়। পৃথিবীতে অলিখিত নিয়ম আছে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কবিতা আর কারও জন্য নয়। কেবলমাত্র ঈশ্বরের চিহ্নিত কয়েকজন রোগা, জীর্ণ প্রেমে প্রত্যাখ্যাত, অসফল মানুষই জানে কবিতার গুপ্ত সৌন্দর্য। তার শব্দের সম্মোহন। তবে কেন মজুমদার বারবার কবিতার কথা তোলে?

সাগর বলল, কবিতার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই মজুমদার। আমি যখন ব্যবসা করি তখন পুরো ব্যবসাদার, যখন কবিতা লিখি তখন কবি।

মজুমদার বোধহয় কেঁদেছিল একটু আগে। ঘরের কম আলোটা চোখে সয়ে যাওয়ার পর সাগর মজুমদারের মুখের খুঁটিনাটি দেখতে পাচ্ছে এখন। ফোলা—ফোলা, সজল, লাল, গলাটাও সামান্য বসা।

মজুমদার সাগরের কথা শুনতে পেল বলে মনে হল না। বলল, চার দিকে শেয়াল আর শকুন। একটা মানুষ মরে যাচ্ছে শুনলে সব চার দিকে ঘিরে এসে বসে থাকে আর ঠোঁট চাটে। যখন পুরোটা মরে যাব তখন খুবলে খুবলে খেয়ে নেবে।

সাগরের তবু রাগ হয় না। আশ্চর্য, আজকাল দমকা রাগের বাতাসে সে যেমন প্রায়ই নড়ে ওঠে তেমন হচ্ছে না কেন?

সাগরের বড় সাধ, সে একটা চমৎকার দেশ তৈরি করবে? সেখানে থাকবে কেবল কবি আর শিল্পীরা। ভাত—কাপড়ের আলোচনা সেখানে নিষিদ্ধ, ব্যবসা অচল, কোনও ফড়ে দালাল ব্যবসাদার রাজনীতির লোক সেখানে থাকবে না। যে কবিতার লোক নয় তার সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই। সেখানে গাছে গাছে কবিতা টাঙাবে সাগর, সেখানকার নদীর স্রোতেও কবিতারই শব্দ বয়ে যাবে। বাতাস এসে বলে যাবে কবিতার নতুন নতুন জন্মের কথা। সেখানে ডাকপিয়ন ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে কবিতার খবর।

নেশাটা কি এতক্ষণে ধরেছে তাকে?

আই হেট পোয়েটস। মজুমদার হঠাৎ বলল।

সাগর বলল, গেট আউট।

তারপরই তার মনে হল, মজুমদারকে সে বেরিয়ে যেতে বলে কোন অধিকারে? এটা তো মজুমদারেরই অফিস, তার নিজের অফিস তো এটা নয় যে বের করে দেবে।

কিন্তু মজুমদার সে—সব কথা খেয়াল না করে থমথমে মুখে বলল, না, আমি বেরোব না। আপনি ইচ্ছে করলে দারোয়ানকে ডাকতে পারেন, কিন্তু আমাকে জোর করে বের না করলে আই ওনট গো।

সাগর টেবিলে একটা চাপড় মেরে বলল, ইউ মাস্ট।

যদিও তখনও সাগর বুঝতে পারছিল যে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কোথায় যেন প্রোটোকলের ভুল হচ্ছে।

মজুমদারেরও সেই ভুল। খুব কাঁদো—কাঁদো মুখে বলে, ডোন্ট ইনসাল্ট মি চ্যাটার্জি। আমাকে বের করে দিলে আমি কোথায় যাব? সবাই কী ভাববে?

সাগর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেন আই শ্যাল কিক ইউ আউট।

ওঃ নো। বসুন চ্যাটার্জি। কফি খাবেন?

না। ভবিষ্যতে যদি তুমি ফের কবিতার নাম মুখে আনো তবে জুতো মেরে, বলে সাগর বসে পড়ে ফের।

প্রচণ্ড রেগে যাচ্ছে সাগর এখন। ঝলকে ঝলকে রাগ আসছে। আমাকে যা খুশি বলো, কবিতা নিয়ে ইয়ারকি কেন? হু হ্যাজ গিভেন ইউ দ্য রাইট টু টেল অন পোয়েটস? অ্যাঁ! তা হলে তো ঠেলাওয়ালারাও এর পর জীবনানন্দের সমালোচনা করবে!

মজুমদার ভয় খেয়ে কলিং বেল টেপে। মদিরা খুব আস্তে দরজা খুলে চিত্রার্পিত হয়ে দাঁড়ায়। কথা বলে না।

মজুমদার তার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলে, শোনো মদিরা, চ্যাটার্জি আমাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। বলছে, জুতো মারবে। তুমি লালবাজারে একটা ফোন করো তো!

মদিরা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। সাগর ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে চেয়ে বলে, হ্যাঁ, ফোন করুন। তাদের বলবেন যে মজুমদার মাতাল অবস্থায় কবিতা নিয়ে কথা বলছে। বলছে, ও নাকি কবিদের ঘেন্না করে। টেল দেম, অ্যান্ড দে উইল টেক প্রপার অ্যাকশনস।

মদিরা খুব ক্লান্ত স্বরে বলে, কফি আসছে। আপনারা বরং কিছুক্ষণ চোখ বুজে ঠোঁট বন্ধ করে বসে থাকুন।

মজুমদার অবাক হয়ে বলে, কেন? বসে থাকব কেন? উই ক্যান ডান্স।

সাগরেরও কথাটা পছন্দ হল। হ্যাঁ, কফি আসছে। ততক্ষণ চুপচাপ বসে না থেকে খানিকটা নাচলেও তো হয়। নাচা তো উচিতই। সব মানুষেরই দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ খুব মনের আনন্দে নাচা উচিত।

ভেবেই সাগর উঠতে উঠতে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসে থাকার মানেই হয় না। চলুন একটু নাচি। মদিরা, চলে আসুন। জয়েন আস।

মজুমদারও উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, হু উইল গিভ দ্য মিউজিক?

হেভেন উইল সেন্ড দ্য মিউজিক। নাচ শুরু করুন, দেখবেন অন্তরীক্ষ থেকে বাজনার শব্দ আসছে।

এই বলে সাগর নাচ শুরু করতে যায়। মজুমদারও দুই পাক বেহেড নাচ নাচতে চেষ্টা করে। তারপর দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

মদিরা স্থিরচোখে দৃশ্যটা দেখে দাঁড়িয়ে। খুব গম্ভীর। সশব্দ একটা শ্বাস ফেলে সে বলল, দেখবেন, মারপিট করবেন না। তা হলে কাচ ভাঙবে।

এই বলে সাবধানে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয় সে।

নয়

গনপত নাটক দেখে বেড়াতেই এসেছে। কাজকর্মে তার বড় গা নেই। সেই দেখে সিন্ধু বলে, তুই বরং নাটকের একটা দল খোল। আজকাল নাটকের ব্যবসাতেও পয়সা আছে।

গনপত রাগ করে বলে, ধ্যুৎ শালা, তুই আর্টের সঙ্গে পয়সা গুলিয়ে ফেলিস, খুব পয়সাখোর হয়েছিস সিন্ধু। আর্ট পেটের জন্য নয় রে!

তবে কীসের জন্য?

মগজ আর হৃদয়ের জন্য। তুই পয়সা—ফয়সা করে চিমড়ে মেরে গেছিস, এ—সব তুই বুঝবি না।

তোর মগজ আছে বলে জানতাম না তো। কখনও টের পাইনি এতকাল কাছাকাছি থেকেও। মগজটা কবে স্মাগল করে আনালি? সিন্ধু বলে।

গনপত হাসে। বলল, গেলি না তো কাল। 'চাকভাঙা মধু' দেখলে তোরও তাক লেগে যাবে। 'তিন পয়সার পালা' আগে তিন বার দেখে গেছি, ফের যাচ্ছি, জবাব নেই।

সিন্ধু একটা শ্বাস ফেলে বলল, তুই নাটক দেখে বেড়াবি, আর আমি এদিকে কেবল এ—অফিসে টেন্ডার সেই অফিসে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ঘুরে বেড়াব, খুব চালাকি পেয়েছ মেড়ো ভূত! আজ গলায় গামছা দিয়ে তোকে আমার সঙ্গে দৌড় করাব।

গনপত হাঁ—হাঁ করে উঠে বলে, বলিস কী, আজও আমার টিকিট কাটা আছে। তুই তো জানিস বাবা, আমি কোনও জায়গায় গিয়ে ভালো করে কথা বলতে পারি না, কেউ ইংরিজি বললে ভয়ে ভিরমি খাই। আমাকে এ—সবের মধ্যে রগড়াচ্ছিস কেন? তুই স্মার্ট আছিস, লড়ে যা। আমাকে একটু আর্টের জলে ঘুরে বেড়াতে দে।

সিন্ধু গনপতের মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, গনফট, তোর কোনও প্রবলেম নেই, না?

সকাল পৌনে আটটা বাজে। এ—সময়টায় গনপতের মেজাজ ভালো থাকে। তবু সে খুব ভয়ে ভয়ে সিন্ধুর মনোভাব আঁচ করার চেষ্টায় তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, হুঁঃ, প্রবলেম তুই কাকে শিখাচ্ছিস? আমার বলে সমুদ্রে শয়ান!

ফের লাথি খাবি শালা। সমুদ্রে শয়ান। ইঃ! টাকার নয়, প্রেমের নয়, কাজকারবারে নয়, তোর কোনও একটা প্রবলেম আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না। পেট ভাসিয়ে খাওয়া, পাথরের মতো ঘুমোনো, নাটক দেখা, আর মাঝে মাঝে মেড়ো বাংলায় নাটক লেখার হাস্যকর চেষ্টা—তোর প্রবলেম কী?

আছে বাবা, সে—সব তুমি বুঝবে না।

সদ্য ঘুম থেকে উঠে দুজন প্রাতঃকৃত্য সেরেছে। গনপত অবশ্য কিছু আগেই উঠে ব্যায়াম সেরে নিয়েছে। এক্ষুনি চা খেতে ওপরে যাবে। এই অবসরে বসে কথা হচ্ছিল।

ওপর থেকে বাচ্চা ঝিটা এসে বলল, চা কি নীচে দেব?

সিন্ধু মুখ তুলে বলে, দাদা উঠেছে রে?

মেয়েটা হঠাৎ একটু যেন হাসি চেপে বলল, না। তানার উঠতে এখনও দেরি হবে।

সিন্ধু গম্ভীর হয়ে যায়। খানিকটা বুঝতে পারে। কোথায় যেন একটা মস্ত গোলমাল চলছে দাদার। কাল রাতেও দাদা অনেক দেরিতে ফিরেছে। সিন্ধুর মন কাল রাতেও খুব খারাপ ছিল। কেন যে এত বুকুনের কথা মনে পড়ে! ভাবছিল বলে ঘুম আসেনি।

অনেক রাতে একটা রিকশা এসে থামল। রিকশায় বসে দাদা খুব গান গাইছে, শুনেছিল সিন্ধু। মাতাল গলা চিনতে ভুল হয় না। রিকশা থামতে—না—থামতেই গ্রিলের গেট খুলে বউদি গিয়ে দাদাকে ধরল। একটা চাপা ধমক দিয়ে বলল, কী হচ্ছে! সিন্ধু রয়েছে, ভুলে যেয়ো না।

সিন্ধু! বলে দাদা একটু থমকে গিয়েছিল ঠিকই। তারপর বউদির কাঁধে ভর দিয়ে রিকশা থেকে নেমে হঠাৎ বলল, কমলা, কেন তুমি আমার এমন সর্বনাশ করলে?

কী করেছি? আমি তোমার কী করেছি? বলে বউদিও বুঝি কেঁদে ফেলে।

দাদা বউদিকে ধরে ধরে সিঁড়ি বেয়ে যখন ওপরে উঠছিল তখন কয়েকবার কাতরতার শব্দ করেছিল। কী গভীর ব্যথাবেদনা থেকে মানুষ ও—রকম শব্দ করে! সিন্ধু লজ্জাবশত উঠে যায়নি দাদার কাছে। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছিল। সিন্ধু বিছানা ছেড়ে উঠে এল জানালার কাছে, তারপর গভীর রাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে।

অনেক রাত পর্যন্ত ওপরে নানারকম শব্দ হয়েছে। কে যেন আসবাবপত্র টানাটানি করছে। বউদির একটা নাতিউচ্চ চিৎকারও শুনেছিল সে, যেন বউদি বলল, আঃ, ওগুলো পুড়িয়ো না! তারপর একটা কাচভাঙার বিকট শব্দ হয়েছিল, আর অনেক জল গড়ানোর। ওপরে কীরকম নাটক অভিনয় হচ্ছে তা বড় জানতে চাইছিল সে। কিন্তু এ যেন তার পরের বাড়ি। এদের গুহ্য সংসারজীবনের মধ্যে তার প্রবেশ করতে নেই, এ—রকমই মনে হয়েছিল তার। তাই যায়নি।

মন ভালো নেই বুকুনের জন্য, দাদার জন্য।

চল রে গনফট!

বলে সিন্ধু উঠল। গনপতকে নিয়ে উঠে এল ওপরে। বুকটা কাঁপছিল একটু। ওপরে উঠে কী দেখবে কে জানে!

সামনের ঘরটা স্বাভাবিকই আছে। বউদি রান্নাঘর থেকে বলল, তোরা বোস।

বউদির মুখটা একঝলক যা দেখল সিন্ধু তাতে বুঝল, কালকে ঘটনা মুখটায় খুব গভীর ছাপ রেখে গেছে। রোজই বোধ হয় আজকাল এ—রকম সব ঘটনা ঘটছে। বউদির চেহারায় তাই একটা লাবণ্যহীন রুক্ষ ছাপ পড়েছে।

সিন্ধু যখন বিয়ে করবে তখন বউকে কষ্ট দেবে না। তাদের মধ্যে খুব সুন্দর বোঝাপড়া থাকবে। বউ কে হবে সিন্ধুর!

এই প্রশ্নের একটাই অমোঘ উত্তর আছে। বুকুন। কেন বুকুন তা বোঝা যায় না। কিন্তু এ যেন গতজন্ম থেকে ঠিক হয়ে আছে। এ যেন প্রকৃতির নিয়ম যে বুকুন সিন্ধুর বউ হবে। এ ঠিক বুকুনের সঙ্গে তার প্রেম—ভালোবাসার ব্যাপার নয়। তারা যেন পরস্পরের স্বামী—স্ত্রী হওয়ার জন্যই জন্মেছে। বউয়ের কথা ভাবলেই বুকুন বা বুকুনের কথা ভাবলেই বউ মনে পড়ে।

অথচ তা তো হওয়ার নয়। সিন্ধু যদি উপযুক্ত পাত্র হত তো কথা ছিল না। কিন্তু এখনও সিন্ধুর ব্যবসা দাঁড়াল না। কোনও স্থির আয় নেই। কোনও মাসে দু'হাজার টাকা লাভ হল তো বাকি ছ'মাস বসে থাকা। কোথাও কেউ চাকরি দেওয়ার জন্য বসে নেই। একটা মাঝারি চাকরি পেলেও সে বিয়ের কথা ভাবতে পারত।

ওদিকে মনোজদের বাড়ির লোকেদের উচ্চাশা বলবতী। তারা হেঁজিপেঁজি পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার কথা ভাবতেও পারে না। সেই জন্যই বুকুনের অসুখ সারাতে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। শরীর সারলে কলকাতায় কোনও অতি সুপাত্রের সঙ্গে অনেক খরচ করে তার বিয়ে দেবে তারা। বলতে নেই বুকুনের শরীর সেরেছে। বিয়ের ফুলও ফুটল বুঝি এবার। সিন্ধু কে? সিন্ধুর কথা তারা ভাববে কেন?

খাওয়ার টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে মাথা নত করে বসেছিল, সিন্ধু। আজ বড় অন্যমনস্ক সে। মনটা বড় খারাপ।

জলখাবার খেয়ে গনফট হুশহাস শব্দ করে গরম দুধ খাচ্ছে। সিন্ধু খাবারের প্লেট ছোঁয়নি।

সিন্ধু বিস্বাদ মুখে চা শেষ করল। অত দামি চা, তবু সে তেমন স্বাদ পেল না। একবার দু'বার কয়েকবার চেয়ে দেখল, দাদার ঘরের দরজাটা পাথরের মতো বন্ধ হয়ে আছে। বারবারই দরজাটা তার চোখকে টানে। বড় মায়া হয়। একবার দাদার ঘরে যেতে ইচ্ছে করে।

দুধ খেয়ে গনফট বলল, যাই এক বার খোলা হাওয়ায় চক্কর মেরে আসি। বউদি যাবেন নাকি আজ নাটক দেখতে? আমি তিনটে টিকিট কেটে রেখেছি।

বউদি উঠে আসে, বলে, ওমা, গনপত তো দিব্যি তার জলখাবার খেয়ে ফেলেছে। সিন্ধু খাসনি যে বড়!

ও ওইরকম। গনপত বলে, চা ওর অমৃত। চায়ে কারও দেহে রক্ত হয় বলে শুনেছেন? ওর হয়।

সিন্ধু বলল, তুই যা তো গনফট, হেঁটে হেঁটে খিদে বাড়াগে যা। যারা বেশি খায় তাদের বুদ্ধি মোটা হয় জানিস?

তোমার সূক্ষ্ম বুদ্ধি তো বাবা শরীরের রসকষ টেনে নিচ্ছে। এরপর বিছানায় পড়ে যখন চিঁচিঁ করবে তখন তোমার বুদ্ধি বোধহয় তুঙ্গে উঠবে। বউদি, ওর কথা ছাড়ুন। চলুন আজ নাটকটা দেখে আসি।

কমলা বলল, এই আমার নাটক দেখার সময় বটে! আপনি টিকিট ফেরত দিয়ে দেবেন। নাটক এমনিতেই কত দেখছি!

গনপত অত বুঝল না। বলল, আচ্ছা।

তারপর বেরিয়ে গেল।

সিন্ধুর মুখ তুলে বউদির দিকে তাকাতে লজ্জা করছিল। কমলা অবশ্য দাঁড়াল না, রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে যেতে শুধু বলল, খাবার খেয়ে নে সিন্ধু। বেলা হল।

অস্ফুট স্বরে সিন্ধু বলল, দাদা উঠুক।

সে আজ কখন ওঠে ঠিক নেই।

বউদি চলে গেলে সিন্ধু অনেকক্ষণ একা বসে থাকে। সামনে টোস্ট, ডিম, প্রোটিনেক্স দেওয়া দুধ, কাটা আপেল, খুব ঐশ্বর্যবানেরা এ—রকম খায়। এই ঐশ্বর্যের একশো ভাগের এক ভাগ থাকলেও সে বুকুনকে বিয়ে করতে পারত। নয় কি?

সিন্ধু ফের নিজেকে নিজেই একটা প্রশ্ন করে, দাদাকে কি তোমার হিংসে হয় সিন্ধু?

নিজেই উত্তর খুঁজে পায়, না তো, মোটেই না।

তবে দাদাকে দেখে, দাদার এত উন্নতি দেখে কেমন লাগছে?

দাদার জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি সবসময়ে মনে মনে একটা কথা ভাবি।

কী কথা সিন্ধু?

ভাবি, দাদার অবস্থা পালটে যাক। ও আবার আগের মতো হয়ে যাক। তখন ও বড় সুখী হবে। আমরাও দাদাকে ফের ফিরে পাব।

তাই কি হয়?

হয় না? কেন হয় না? এই যে দাদা ঘুমোচ্ছে, এই ঘুম থেকে উঠেই ও যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। যেন ওর টাকার কথা, ব্যবসার কথা আর মনে না পড়ে। তখন যেন ও কেবল কবিতার কথা ভাবতে পারে।

একটু পরে কমলা এসে মুখোমুখি বসে। কিছু বলে না প্রথমে, চুপ করে থাকে। সিন্ধু কালকের ঘটনা টের পেয়েছে কি না তার আন্দাজ করার চেষ্টার বুঝি করে একটুক্ষণ।

তারপর বলে, কাল তোর দাদার ফিরতে অনেক রাত হল। আজ উঠতে দেরি করবে। তুই বরং খেয়ে নে, তোকেও তো আবার বেরোতে হবে।

সিন্ধু বলল, খেতে ইচ্ছে করছে না বউদি, এ—সব তুলে নিয়ে যাও। আমাকে বরং আরও এক কাপ চা দাও। সকালের দিকে তরল জিনিস ছাড়া কিছু গলা দিয়ে নামে না।

কমলা বাচ্চা ঝিটাকে চা করতে বলে এসে আবার বসে। বলে, সিন্ধু, দাদার ঘরে ঢুকে কাল কী দেখলি?

সিন্ধু মুখ তুলে চেয়ে বলে, অনেক কিছু। দেখাটা বোধহয় উচিত হয়নি বউদি, না?

তা কেন, সব নিজে দেখেশুনে যা। নইলে পরে পরের মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপবে। মা—বাবাকে কিছু বলিস না, কিন্তু নিজের চোখে দেখে যাবি না কেন?

বলতে বলতে কমলার চোখে জল এল।

চোখ মুছে সে বলল, আমরা কীরকম হয়ে গেলাম রে সিন্ধু! কবিতার জন্য মানুষের যে এত বড় সর্বনাশ হয় জানতাম না তো। জানলে কখনও ভুলেও কি ওকে টাকা রোজগার করতে তাগাদা দিতাম?

তুমি তো অন্যায় কিছু করোনি।

সে আমাদের ন্যায়—অন্যায়ের সঙ্গে কি ওর মেলে? তোর—আমার হিসেব দিয়ে কি ওর ভালোমন্দ মাপা যায়? যখন ও মাস্টারি করত তখন কত আমুদে ছিল। ঘরে ফিরে কত হইচই করত। এক—আধদিন মদ—টদ খেত বটে, কিন্তু এসে পায়ে ধরে ক্ষমাও চাইত। আমার পুজোর শাড়ি কিনতে পারত না, নিজের অনেক ধারকর্জ ছিল, কত কষ্টে সংসার চালাতাম, তবু যেন খুব বেঁচে ছিলাম তখন, সুখে না থাকলেও। কিন্তু এটা কী হল রে?

সিন্ধু একটু অধৈর্যের গলায় বলে, দাদাকে ডাকো বউদি, একটু কথা বলে যাই।

ডাকব? বলে কমলা অবাক। তারপর ধাতস্থ হয়ে বলে, কাকে ডাকব? আয় দেখে যা!

বলে উঠে গিয়ে সাগরের ঘরের দরজা আস্তে ঠেলে খুলে দিয়ে বলে, আমিই ভেজিয়ে রেখেছিলাম তোদের চোখে পড়বার ভয়ে। আয় এখন দেখে যা।

সিন্ধু স্বপ্নোত্থিতের মতো ওঠে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সে দেখে, ঘরময় জল গড়াচ্ছে। জলের মধ্যে কয়েকটা রঙিন মাছ মরে পড়ে আছে মেঝেয়। সারা ঘরে সেই সব লাল, রামধনুরঙা, নীল, সাদা মাছ ছড়ানো। মৃত। তার ওপর এখানে—সেখানে অনেক অনেক আধপোড়া একশো টাকার নোট ছড়িয়ে আছে। নোট—পোড়া—ছাই জলে মিশে গলে যাচ্ছে। এ—সবের মাঝখানে টম্যাটো রঙের ভেজা কার্পেটটার ওপর সাগর শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। গায়ে এখনও বাইরের পোশাক। মুখের কাছে মাছি ভনভন করছে।

এত সবের মধ্যে মেঝের মৃত মাছগুলোই বড় বেশি চোখে পড়ল সিন্ধুর। কেন অ্যাকরিয়াম সাগর ভেঙেছে, কেন টাকা পুড়িয়েছে এ—সব জানতে চাইল না সে। জানার দরকার নেই। সিন্ধু জানে এ—সবের পিছনে রয়েছে কবিতা আর কবিতা।

সাগরের ডান হাতটা কেটে গেছে কাচে। রক্ত জমাট, শুকনো। হাতের তেলোটায় এখনও রক্ত জমা বলে ক্ষতটার পরিমাণ বোঝা যাচ্ছে না।

সিন্ধু গিয়ে সাগরের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। হাতটা তুলে দেখল, থকথকে হয়ে রক্ত জমে আছে।

বউদি, তুমি দেখনি দাদার হাতটা কতখানি কেটে গেছে?

কমলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিন্ধুকে দেখছিল। বোবা দৃষ্টি। বলল, না তো! বোধ হয় কাল যখন অ্যাকুরিয়ামটা রাগ করে ভাঙল তখন কেটেছে।

কমলা গিয়ে ডেটল, তুলো আর স্টিকিং প্লাস্টার নিয়ে এল। সিন্ধু রক্ত মুছে দেখে এখনও ক্ষতস্থানে কাচের টুকরো বিঁধে আছে। সেই বেঁধা কাচের টুকরোয় নাড়া পড়তেই যন্ত্রণায় অতল ঘুমের মধ্যেও ককিয়ে ওঠে সাগর। এক বার রক্তাভ চোখ দুটো খুলে বুঝি সিন্ধুকে চিনতে পারল। অস্ফুট জড়ানো গলায় বলল, ছেড়ে দে।

অ্যাকুরিয়ামটা খাটের সঙ্গে লাগানো ছিল। বিল্ট ইন। সেটা ভেঙে যাওয়ায় সারা বিছানা ভিজে সপ সপ করছে। বিছানা চুঁইয়ে খাটের নীচে এখনও ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। কমলা গিয়ে জানালাগুলো খুলে দিল। ঘরটার মধ্যে প্রলয়ের চিহ্নগুলি আলোতে দেখা গেল ভালো করে। কত মৃত মাছ পড়ে আছে চারধারে!

সাগরের সারা শরীর ভিজে সপ সপ করছে। সিন্ধু সাগরকে পাঁজাকোলা করে তুলল, বলল, বউদি, তোমাদের ঘরের বিছানায় দাদাকে শোওয়াতে হবে। দৌড়ে গিয়ে বালিশ—টালিশ ঠিক করো।

কমলা গেল।

সিন্ধু আবার সাগরকে শুইয়ে দিয়ে গায়ের ভেজা জামাকাপড়গুলো খুলল। আন্ডারওয়ারটা শুধু ভেজেনি, সেটা খুলল না। সাগর যে—ধারে কাত হয়ে শুয়ে ছিল সে—ধারের শরীর জলে অনেকক্ষণ ভিজে ছিল বলে সাদা। শরীরটা ঠান্ডা হয়ে আছে।

সিন্ধু ইচ্ছে করে কাঁদেনি, কিন্তু হঠাৎ তার দুই চোখ বেয়ে অবিরল ধারা নামল। আন্ডারওয়্যার পরা সাগরকে আবার পাঁজাকোলা করে তুলল সিন্ধু। সাগরের সামান্য চেতনা ফিরে এল, এক বার মাথাটা তুলবার চেষ্টা করে, সিন্ধুর কাঁধটা ধরতে হাত বাড়ায়। তারপর ফের অবশ হয়ে শরীর ছেড়ে দেয়।

কমলা খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেডকভার তুলে দুটো বালিশ দিয়ে বিছানা করে ফেলেছে। সিন্ধু সাগরকে শুইয়ে দেওয়ার সময়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেন যে কাঁদছিল!

কাঁদিস কেন সিন্ধু? বলতে গিয়ে কমলা নিজেও সিন্ধুর মতোই কাঁদতে লাগল।

সারাদিন সিন্ধুর খুব খাটুনি গেল। গনপত সঙ্গে নেই, একা সিন্ধু এ—অফিস সে—অফিস করে বেড়াল। টেন্ডার জমা দিতে গিয়ে বুঝল, এ—অর্ডারটা তার পাওয়ার আশা নেই। প্রায় এক লাখ টাকার অর্ডার, পেলে বেশ কিছু মার্জিন থাকত। কলকাতার ঠিকাদাররা অনেক বেশি সুলুকসন্ধান জানে। শিলিগুড়ি থেকে এসে তার কস্টিং যা পড়বে সেইমতো রেট দিয়েছে সিন্ধু। অনেক হাই রেট!

একই সময়ে টেন্ডার জমা দিতে এসেছিল তারই বয়সের আর—একটি ছেলে। ছেলেটির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। কথায় কথায় সিন্ধু জিজ্ঞেস করে, কী রকম রেট দিয়েছেন?

এ—সব ব্যাপার সবাই গোপন রাখে বা ইচ্ছে করে বেশি রেট বলে। এ—ছেলেটা সে—রকম নয়। বলল, মার্কেট প্রাইসের থেকে টু পারসেন্ট বেশি। আপনি?

সিন্ধু তেতো মুখে বলল, ফাইভ পারসেন্ট।

রেজিস্ট্রেশনের খোঁজ করতে রাইটার্সেও গেল সিন্ধু। কিন্তু কাজ হল না। আজকের দিনটাই খারাপ। তার ছোট্ট ঠিকাদারি কোম্পানির অনেক পয়সা শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা যাতায়াতে খরচ হয়ে গেল। আজকাল সিন্ধু খুব হিসেব করতে শিখেছে। কারও পাওনাগন্ডা বাকি রাখে না, ইনকাম ট্যাক্স যত কমই হোক ঠিকমতো দেয়। বেশ কিছু টাকা ঘুষ বাবদ দিতে হয় একে—ওকে, সে—টাকা সিন্ধু ব্যবসার খাতাপত্রে অন্য খাতে এন্ট্রি দেখাতে বড় লজ্জাবোধ করে। এই কারণেই সে হার্ডশিপে বিশ্বাসী। সে জানে, সততা বজায় রেখে চলে যদি বড় হতে হয় তবে হাড়ভাঙা শ্রম ছাড়া কিছু হওয়ার নয়। আর সেই কারণেই সে খুব হিসেবি। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে কৃপণ। বলুক গে! সিন্ধুকে নিজের মতো করেই বেঁচে থাকতে হবে তো।

বিকেলের দিকে কাজ শেষ হয়ে গেলে সে বাবার জন্য ফুটপাথ থেকে একটা গামছা কিনল। বাবার গামছাটা ছিঁড়ে গেছে দেখে এসেছে। মায়ের চটিটা বড্ড পুরনো হয়েছে, মা বলে দিয়েছিল—যদি পয়সায় কুলোয় তবে একজোড়া ফুটপাথের চটি আনিস। দোকানের দামি জিনিস আনিস না যেন। তাই কিনল সিন্ধু।

মা'র পায়ের মাপ আনা হয়নি, চটিটা ঠিকমতো পায়ে লাগবে কি না কে জানে? আরও দু'—একটা জিনিস কেনার ইচ্ছে ছিল সিন্ধুর। স্টেনলেস স্টিলের কয়েকটা গেলাস, একটা অ্যালুমিনিয়ামের স্টোভ, বাবার একটা পাঞ্জাবির কাপড়। এগুলো কেউ ফরমাশ দেয়নি, কিন্তু সিন্ধু নানা সময়ে সংসারের নানা কথা থেকে প্রয়োজন আন্দাজ করতে পারে। ভেবেছিল কিনবে। চাঁদনিতে আর গ্র্যান্ট স্ট্রিটে ঘুরে দরদস্তুর জানল। বড্ড দাম। পয়সার কথা ভেবেই শেষপর্যন্ত কিনল না।

অফিস—ভাঙা ভিড়ে উপচে পড়ছে ট্রাম—বাস। এ—সব যানবাহনে এভাবে ওঠার অভ্যাস তার নেই। চাঁদনির সামনে দাঁড়িয়ে সে অসহায়ভাবে ভিড় দেখল কিছুক্ষণ। আজ কি একবার বুকুনের সঙ্গে দেখা করবে?

তার ভিতরকার এক মহৎ সিন্ধু তাকে ডেকে বলল থাকগে, যেয়ো না। বুকুনের যদি অন্য কারও সঙ্গেই বিয়ে হয় তবে কেন ও তোমার স্মৃতি নিয়ে অন্যের ঘর করতে যাবে? ওকে বরং সেই বিপদে ফেলো না। কেউ কারও জন্য জন্মায় না সিন্ধু, পৃথিবীতে কেউ কারও নিজস্ব জিনিস নয়।

সিন্ধু খুব একটা বড় গভীর শ্বাস ছাড়ল। ঠিক কথা! তবু তার মন কেবলই বলে, বুকুন আমার ছিল, কেন অন্য কারও হবে?

সিন্ধু নিজেই উত্তর দিল, বুকুনকে তুমি তো ভালোবাসো সিন্ধু, তবে কেন তার সুখের কাঁটা হবে? যত বার তোমাকে দেখবে বুকুন তত বার তার মনখারাপ হয়ে যাবে। নিজেকে সরিয়ে নাও সিন্ধু। বুকুনকে ছাড়াও তুমি বেঁচে যাবে। হয়তো মাঝে মাঝে স্মৃতির ভয়ংকর শীত বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠবে তুমি চোখে জল আসবে, বুক ভার হবে। তবু এইটুকু মেনে নাও।

সিন্ধু গেল না। বহুদূর হেঁটে হেঁটে হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেন ধরল।

সাগর আজ বেরোয়নি।

সিন্ধু দোতলায় উঠতেই কমলা সদর দরজায় তাকে ধরল। তার চোখ—মুখ অস্বাভাবিক। চাপা গলায় বলল, সিন্ধু, তোর দাদা ঘরে বসে ভীষণ মদ খাচ্ছে। আমি বারণ করতে গিয়েছিলাম, তেড়ে এল। তুই এক বার যা। অত খেলে ও মরে যাবে।

সিন্ধু মাথা নাড়ল।

সাগরের ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখল, একটা ঘোর লালরঙের বাতির আলোয় ভূতের মতো বসে আছে দাদা। টেবিলে গেলাস, ব্ল্যাকনাইট আর সোডার বোতল। ঘর ম ম করছে অ্যালকোহলের গন্ধে। সাগরের সামনে খোলা পড়ে আছে প্যাড আর কলম।

সিন্ধু ডাকল, দাদা!

সাগর প্রথমবার শুনতে পেল না। দ্বিতীয়বার ডাকতে খুব আস্তে মুখ ঘোরায় সাগর। তার ঠোঁটে একটা প্রায় নিঃশেষিত নেভানো সিগারেট ঝুলছে।

সাগর বলে, কে তুই?

আমি সিন্ধু!

ও! সাগর অস্ফুট একটা কাতর শব্দ করে বলে, আয়।

সিন্ধু চার দিকে তাকায়। ঘরটা গোছানো হয়েছে। বিছানা নতুন করে পাতা, কার্পেট নেই, মৃত মাছ বা জল নেই। শুধু খাটের সঙ্গে লাগানো অ্যাকুরিয়ামের জায়গাটা ফাঁকা ও ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

সিন্ধু এগিয়ে গিয়ে বলে, কী করছ দাদা?

সাগর বলে, ফিরে যাচ্ছি।

কোথায়?

সে অনেক দূর। যত দূর এসেছি তত দূর ফিরে যেতে হবে। সে—সব তুই বুঝবি না। মা—বাবাকে দেখে রাখিস সিন্ধু। আমি তো তাদের ভালো ছেলে নই।

সাগর হাসল। আর তখন সিন্ধু টেবিলের ওপর বোতলের পাশে একটা ছোট্ট শিশি দেখতে পেল। শিশিতে অনেকগুলো ট্যাবলেট। মনে পড়ে, এ—শিশিটা সাগরের কোনও ড্রয়ারে সে যেন পড়ে থাকতে দেখেছে। ওটা কি ঘুমের ওষুধ?

খুবই সন্দেহ হতে থাকে সিন্ধুর। এখন দাদার কোনও মানসিক ভারসাম্য নেই। যা খুশি করে ফেলতে পারে।

সিন্ধু টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। ঘোর লাল আলোয় সবকিছুই বড় অবাস্তব কাল্পনিক দেখায়।

সিন্ধু এগিয়ে এসে প্যাডের কাগজে একটা কবিতার কয়েকটা লাইন লেখা আছে দেখল, কিন্তু এ—আলোতে পড়া গেল না।

কোথায় ফিরে যাবে দাদা?

সাগর মাতাল হাসি হাসল। তারপর জড়ানো গলায় বলে, সে একটা ভারী রংচঙে সাঁকো। এ—পৃথিবী থেকে ও পারে গেছে, সেখানে স্বপ্নের বাগান। আমি আগে কত বার সাঁকোটা পেরিয়ে গেছি। সাঁকো ধরে ছোটাছুটি করেছি। এখন সাঁকোটা অনেক দূরে সরে গেছে। দেখতে পাই, কিন্তু কিছুতেই কাছে যেতে পারি না। কত বার চেষ্টা করি, ঠিক দেখি আমার রাস্তা সাঁকো থেকে বহু দূরে গিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। কী যে কষ্ট না!

সিন্ধু তার চতুর হাতে শিশিটা তুলে নিল। সাগর দেখতে পেল না।

সিন্ধু বলল, দাদা, আমি কাল চলে যাব।

সাগর উদাস গলায় বলল, সবাই তো চলে যায়, মা—বাপ, ভাই, বউ, ছেলেমেয়ে, টাকা, কবিতা। কেউ থাকে না। আমিও যাব।

সাগর তার গেলাস শেষ করে কিছুক্ষণ লাল আলোর ধাঁধার ভিতর দিয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। বিড়বিড় করে বলে, সব ছেড়ে যাব। বহু দূর। সেখানে আশ্চর্য রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো, ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী, ও পাশে স্বপ্নের বাগান....

সিন্ধু একটু কেঁপে ওঠে। শিশিটা মুঠোয় নিয়ে বেরিয়ে আসে আস্তে আস্তে। দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

দশ

দুপুর পার করে সাগর ঘুমিয়ে উঠল।

একা ঘরে ঘুম ভেঙে খুব ভ্যাবলার মতো চেয়ে রইল সামনের দিকে, মাথা চিন্তাশূন্য, মন ভাবলেশহীন। এত নিস্তরঙ্গ লাগে নিজেকে তার যে সন্দেহ হয়, সে বুঝি বেঁচে নেই। মাথাটা এক টন লোহার মতো ভারী, চোখের ডিমে টনটনে ব্যথা। শরীরে প্রত্যেকটা হাড়ের জোড়ে খিল ধরে আছে। জেগে বিনা আয়াসে তার গলা থেকে গভীর ব্যথা সহ্য করার কোঁকানি উঠে আসছিল।

সেই শব্দে কমলা ঘরে এল, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইল খানিক, ঠান্ডা হাতের তেলোয় কপালটা চেপে ধরল একটু।

ক'টা বাজে? সাগর জিজ্ঞেস করে।

দেড়টা। তুমি উঠবে না? ওঠো, স্নান করে খাও। কাল রাত থেকে কিছুই খাওনি।

সাগর মুখ বিকৃত করল খাওয়ার কথায়। জিভটা খসখসে, কাঁটা—কাঁটা, বিস্বাদ। পেটে একটা গোঁতলানি। বলল, একটা অ্যাসপিরিন—টিরিন দাও। ভীষণ ব্যথা।

কমলা একটা ট্যাবলেট আর জল এনে দিল, সাগর খুব কষ্ট করে উঠে ওষুধ খেল। বলল, আর আধঘণ্টা রেস্ট নিতে দাও।

কমলা মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

খুবই ভালো ব্যবহার করছে কমলা। এত ভালো ব্যবহার এ—সব অবস্থায় সাধারণত করে না। আবার কালকের মতো এত বেহেড নেশা সাগর কখনও করেনি। স্মৃতি অন্ধকার হয়ে আছে, মাতাল হওয়ার পর সে কী করে বাড়ি এল তা তার একদম মনে পড়ছে না।

কমলা তাকে শুইয়ে দিয়ে কপালে হাত রাখল, বসল পাশে। বলল, শোনো, আমি সিন্ধুর সঙ্গে শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছি।

সাগর চোখ খুলে কমলার দিকে তাকায়, চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ। সিন্ধু নিয়ে যেতে চাইছে। আমিও মত দিয়েছি।

কেন?

একটু বাইরে যাওয়া ভালো।

ক'দিনের জন্য?

সে কি বলতে পারি? শ্বশুরবাড়িতে কিছুদিন থাকব, তারপর একটু বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে আছে। অনেক দিন যাই না।

আমাকে জিজ্ঞেস না করে মত দিলে?

দিলাম। তোমার অনুমতি নেওয়ার কথা মনে হয়নি। তুমি তো আমাকে সহ্যই করতে পারো না।

তার মানে তুমি আর ফিরে আসতে চাও না!

না। তোমার এভাবে নিজেকে শেষ করা চোখে দেখবার জন্য এখানে থাকব নাকি? আমি যখন তোমার ভালো করতে পারলাম না, তোমার কবিতার সর্বনাশ করলাম, তখন আর আমার এখানে থাকার মানেও হয় না।

সিন্ধু কোথায়? ওকে ডাকো।

ও বেরোবে, তৈরি হচ্ছে।

ওকে ডাকো।

কমলা উঠে গেল। একটু বাদে বাইরে যাওয়ার প্যান্ট—শার্ট পরে সিন্ধু ঘরে আসে।

দাদা, ডাকছ?

সাগর চোখ খুলে ভাইকে দেখে বলে, তোর বউদি যাচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ। তুমি যদি বলো তো ক'দিনের জন্য নিয়ে যাই।

সাগর একটু ভাবল। তার মনখারাপ লাগছিল না একটুও। বলল, নিয়ে যা। কিছু দিন থাকুক শিলিগুড়িতে।

আচ্ছা।

সকলের জন্য ফার্স্ট ক্লাসে রিজার্ভেশন করে নিস। টাকা নিয়ে যা।

ফার্স্ট ক্লাসে কেন?

সে—কথার উত্তর না দিয়ে সাগর বলে, কবে যাবি?

যেদিন গাড়িতে রিজার্ভেশন পাব সেদিনই।

আচ্ছা। বলে সাগর চোখ বুজল।

দিন দুই পর বেলভিউ ক্লিনিকে বিকেলের দিকে ইন্দ্রাণীকে দেখতে গেল সাগর। দুপুরে ফোন করে জেনেছিল, ইন্দ্রাণী বেঁচে আছে, তবে জ্ঞান নেই। অবস্থা সংকটজনক।

ইন্দ্রাণীকে কেন দেখতে এল সাগর তা সে নিজেও সঠিক জানে না। বহুকাল দেখা হয়নি। সম্পর্কও কিছু নেই। তবু খুব একটা ইচ্ছে হচ্ছিল মনে মনে।

সাততলার সুইটে ইন্দ্রাণীকে রাখা হয়েছে। সুইটের ভিতরে ঢুকতেই প্রবল গোলাপ, রজনীগন্ধা আর চন্দনের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসার জো। সামনের ঘরটাতেই রাশি রাশি ফুলের তোড়া সেন্টার টেবিলে রাখা। অল্পবয়সি নার্স একটা সুগন্ধি স্প্রে করছে ঘরে।

ডান দিকের বিছানায় শুয়ে আছে ইন্দ্রাণী, নাকে অক্সিজেন, চোখ বোজা। বিছানার পাশে তিন—চারজন পুরুষ ও মহিলা চেয়ারে বসে। তাদের একজন বাদল ঘোষ, ইন্দ্রাণীর বর্তমান স্বামী।

বাদল ভ্রূ তুলে তাকে দেখে বলল, আরে! কী খবর?

সাগর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, ইন্দ্রাণীকে দেখতে এলাম।

বাদল একটু বিস্ময়ের সুরে বলে, ওকে চিনতেন নাকি?

চিনতাম, অনেককাল হয়ে গেল।

বলেননি তো কখনও। বলে হাসল। বউয়ের এই মর্মান্তিক অবস্থায় যে স্বামী ও—রকম স্মার্ট হাসি হাসতে পারে তা জানা ছিল না সাগরের।

বাদল ঘোষের সাজগোজও চমৎকার। বাদামি চেকার্ড সুট পরে আছে, গলায় সরু জুতোর ফিতের মতো টাই। দাড়ি নিখুঁত কামানো। চেহারাটা একদম ফিল্মের স্টারের মতো। লম্বা, ফরসা, স্বাস্থ্যবান, বয়সও চল্লিশের অনেক নীচে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন।

বাদল উঠে ইন্দ্রাণীর পাশে বিছানায় বসল। সাগর লক্ষ করে, বিছানার ও—পাশে একটি ছলবলে সুন্দর মেয়ে বসে আছে। বয়স বেশি না, খুব হাসছে সে নানা কথা বলে। পোশাক দেখলেই বোঝা যায়, উচ্চবিত্ত সমাজের মেয়ে। দামি খদ্দরের এক্সক্লুসিভ প্রিন্টের শাড়ি পরেছে, গায়ে ব্লাউজের বদলে ওই প্রিন্টেরই একটা চওড়া কাঁচুলির মতো কিছু পরা, সেটা আবার পিঠের দিকে গিঁট দেওয়া। কাঁধ, হাত সব নগ্ন। নাভির অনেক নীচে কাপড় নামানো। আঁচল খসে যাচ্ছে বারে বারে।

আরও দুজন একজিকিউটিভ চেহারার লোক বসে আছে ঘরে। সবাই ইংরিজিতে মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছে। একবার লন্ডন আর নিউইর্য়ক শব্দ দুটো সাগর শুনতে পেল।

আচমকা সাগর জিজ্ঞেস করল, ও কি বাঁচবে?

একটা শ্বাস ফেলে বাদল বলে, চান্স আছে, তবে রিমোট। কেন যে সেন্টিমেন্টাল হতে গেল! ম্যাড।

ঘুমের ওষুধ পেল কোথায়?

বাদল ভ্রূ তুলে বলে, পাবে আর কোথায়! ঘরেই অজস্র রয়েছে, প্লেন্টি। সেডেটিভ না খেলে আমাদের কারওই ঘুম হয় না। নার্ভ—টেনশন!

ডাক্তাররা কী বলছে? সুইসাইডের চেষ্টা?

বটেই তো। একটা নোট লিখেছিল—আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় গোছের। খুব সেন্টিমেন্টাল নোট। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামাতে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলে চিঠিটা দেখে দৌড়ে ওর ঘরে গিয়ে দেখি, ডিপ কোমায় পড়ে আছে।

সেই মেয়েটা ও—পাশ থেকে করুণ মুখ করে বলল, কী সুইট ছিল ইন্দ্রাণী, না বাদল?

সুইটেস্ট! আমি তো রোজ নতুন করে ওর প্রেমে পড়তাম। সাগর হঠাৎ খুব গেঁয়োর মতো জিজ্ঞেস করল, তবে কেন ও ঘুমের ওষুধ খেতে গেল?

ওই তো বললাম, বড্ড সেন্টিমেন্টাল ছিল। মে বি শি হ্যাড—এ লাভার, কিংবা কোনও ব্যাপারে ডিসগাস্টেড হয়ে পড়েছিল। কী করে বলব বলুন! শি লেড হার ওন লাইফ। আমি তো ওর ব্যাপারে কোনও দিন ইন্টারফিয়ার করিনি যে জানব। আই অ্যাম নট এ নোজি পার্কার। চার মাসের জন্য স্টেটসে গিয়েছিলাম, ফিরে আসার এক মাসের মধ্যেই এই স্যাড ব্যাপার। এখন এই চার মাসে কী ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল তা কে জানে! ও আমাকে কিছু বলেওনি। তবে ইদানীং খুব ডিপ্রেসড থাকত।

সাগর ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে ছিল। আগে যেমন মোটাসোটা ছিল ইন্দ্রাণী এখন আর তেমন নেই। হয়তো স্লিমিং করে রোগা হয়ে গেছে। তার ওপর তীব্র বিষ এখন ওর শরীর জুড়ে। খুব সাদা, ফ্যাকাশে চেহারা। ঠোঁট শুকনো। নীল শাড়িতে জড়ানো শরীর প্রায় নিস্পন্দ। চেয়ে রইল সাগর। ইন্দ্রাণী কি আর কোনও দিন কথা বলবে?

বাদল মেয়েটাকে নিয়ে সামনের ঘরটায় গিয়ে বসল। নিচু স্বরে কথা বলছে ওরা। এ দিকের একজিকিউটিভ দুজন উঠল। বাদলকে উইশ করে চলে গেল। ঘর ফাঁকা, মৃত্যুপথযাত্রী ইন্দ্রাণীর মুখোমুখি

বসে রইল সাগর। বহুকাল আগে ইন্দ্রাণী বলত, আমি সাগরশঙ্কর চ্যাটার্জির প্রেমিকা।

সেই কথাটাই আজ এত দিন বাদে সাগরকে টেনে এনেছে ইন্দ্রাণীর কাছে।

সুগন্ধে দম আটকে আসছে। সাগর তাই উঠল। দেয়াল জোড়া মস্ত জানালা, পরদা সরানো। এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্তব্ধ উঁচুতলার ঘর থেকে দেখা যায়, নীচে ছবির মতো সাজানো মিন্টো পার্ক। মাঝখানে চৌকো পুকুর। পুকুরের এক ধারে একটা রঙিন কাঠের নৌকো বাঁধা। আর বহুদূর পর্যন্ত কলকাতাকে কী সুন্দর দেখায় ওপর থেকে। এ—রকম বা এর চেয়ে আরও উঁচু একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকবার শখ সাগরের অনেক দিন ধরে। অত উঁচুতে থাকলে কবিতার বীজাণুরা বাতাসে বাহিত হয়ে আসবে ঘরে। কবিতার পরাগ সঞ্চারিত হবে মাথার গর্ভকোষে। অন্তরীক্ষে অদৃশ্য কবিতার পাখি উড়ে এসে বসবে সাগরের ডালপালায়।

চললেন? বাদল জিজ্ঞেস করে।

সাগর অন্যমনস্ক চোখ ফিরিয়ে তাকে দেখে বলল, ডাক্তার কী বলছে? বাঁচবে না?

বাদল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, ডেফিনিট কিছু নয়। আর বাঁচলেও শি উইল নট বি দি সেম এগেইন। থ্যাঙ্ক ইউ ফর কামিং। সো কাইন্ড অফ ইউ।

মাথা নেড়ে সাগর বেরিয়ে এল। লিফটে নীচে নেমে সে রিসেপশনের পেছনে চমৎকার ওয়েটিং হল—এর একটা সোফায় বসে রইল একটু। শরীরটা ভালো লাগছে না। প্রায় তিন দিন সে মদ খায়নি। না খেলে এ—রকম হয় আজকাল। বসে একটা সিগারেট ধরাল।

সিগারেট শেষ হয়ে এল যখন, হঠাৎ দেখতে পেল সেই ছলবলে মেয়েটা রিসেপশনের পাশ দিয়ে একা বেরিয়ে যাচ্ছে।

সাগর হঠাৎ উঠে এল। খুব জোর কদমে হেঁটে সে ফ্লাইওয়ের মাঝামাঝি সঙ্গ ধরে ফেলল মেয়েটির। কাছে গিয়ে বলল, এক্সকিউজ মি, আপনি বাদল ঘোষের কে হন?

মেয়েটা একটু অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে হেসে বলল, ওঃ, আপনি! আপনি না কিছুক্ষণ আগেই চলে এলেন?

যাইনি। শরীরটা খারাপ লাগছিল বলে রিসেপশনে বসেছিলাম।

মেয়েটা বিনা দ্বিধায় বলল, বাদল আর আমি—উই আর ফ্রেন্ডস। ইন্দ্রাণীও আমার বন্ধু ছিল।

ছিল? এখন নেই?

এখনও আছে। বলে হাসল মেয়েটি, বলল, দেয়ার ইজ নো মিস্ট্রি। ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড দ্যাটস অল।

আপনি ভিজিটিং আওয়ার শেষ করে এলেন না?

না, আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে। বাদল ইন্দ্রাণীর কাছে তো রয়েছেই। আপনি কি ইন্দ্রাণীর ফ্রেন্ড?

ও—রকমই। আপনাকে একটা কথা বলি, বাদল ঘোষ ভালো লোক নয়।

মেয়েটা থমকে গেল। মুখটা কিছু কঠিন, থমথমে। বলল, দেখুন—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সাগর বলে, ইন্দ্রাণীও ভালো মেয়ে ছিল না। শি ইজ পেয়িং হার পেনাল্টি। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এখনও আপনার জীবন অনেকখানি বাকি। সে—জীবনটা বাদলকে দেবেন না। ইন্দ্রাণীর পরিণতি মনে রাখবেন।

লঘু পায়ে সাগর বেরিয়ে এল। তার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। উঠে মুকুন্দকে গাড়ি ছাড়তে বলল। মনটা একটু হালকা লাগল তার।

তিন দিন মদ খায়নি, আজ একটু খাবে নাকি? বুকে একটা ব্যথা খোঁচা মারছে। শরীরটা ভালো নেই।

সিদ্ধান্তটা নিয়েই ভুল করল সাগর। এসপ্ল্যানেডে একটা পুরনো মদের আড্ডায় গিয়ে সবে একটা বড় হুইস্কি নিয়ে বসে গোটা—দুই চুমুক দিয়েছে, আচমকা বুকের কপাটে জোর ধাক্কা লাগল। ব্যথা নয়, কিন্তু একটা প্রবল থরথরানি। তারপর আর কিছু মনে রইল না তার।

এগারো

অনেক রাত পর্যন্ত সাগর এল না। সাগর রাত করেই ফেরে, তাই কেউ চিন্তা করছিল না। কিন্তু রাত প্রায় এগারোটার সময়ে মুকুন্দ গাড়ি করে একা এসে হাজির। খবর দিয়ে গেল—সাগরবাবুর স্ট্রোক হয়েছে। মেডিকাল কলেজে ভরতি করা হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।

তক্ষুনি সে—গাড়িতে উঠে কমলা যাবে। মুকুন্দ বলল, বউদি, এত রাতে তো ঢুকতে দেবে না হাসপাতালে। সকালে যাবেন। ভয়ের কিছু নেই, আমি নিজে গিয়েছিলাম, মানিকবাবু গিয়েছিলেন। ভালো ডাক্তার দিয়ে দেখানো হয়েছে।

সিন্ধু এসে কমলাকে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল, বলল, ভেবো না বউদি, রাতটা পোয়াতে দাও।

কমলা অঝোরে কাঁদল। ঘুমোতে গেল না। সিন্ধুও বসে রইল ওপরের খাওয়ার ঘরে, কমলার কাছাকাছি। বুকে অজানা ভয়, অদ্ভুত এক মৃত্যু—অনুভূতি।

খুব ভোরের ট্রেন ধরে কমলা আর সিন্ধু এল কলকাতায়। মেডিকাল কলেজে ভিজিটিং আওয়ার্স তখনও শুরু হয়নি। দুজনে হাসপাতালের চত্বরে বসে রইল অসহায়ের মতো। অনেকক্ষণ। একটু বেলায় জেনারেল ওয়ার্ডের অজস্র বেডের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে যখন সাগরের বিছানা খুঁজে পেল তখন সাগর কাউকে চিনতে পারছে না। মুখটা বাঁ দিকে বেঁকে গেছে খানিকটা, বাঁ চোখটার পলক নেই, শরীরে অসাড় ভাব। একটা গোঙানির শব্দ করছিল থেমে থেমে। শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। পাশের বেডে একটা লোক ভোররাতে মারা গেছে, তার সর্বাঙ্গ কম্বল দিয়ে ঢাকা, চার দিকে একটা পরদার আড়াল এইমাত্র দিয়ে গেল লোক এসে। আত্মীয়রা এসে কান্নাকাটি করছে দূরে দাঁড়িয়ে।

কমলা কত কষ্টে যে সচেতনতা ধরে রেখেছে, কেন যে এখনও অজ্ঞান হয়ে যায়নি তা কেউ বুঝতে পারবে না। সাগরের পাশটিতে বসে বুকের ওপর মাথা রেখে সে বলল, কেন চলে যাচ্ছ এত তাড়াতাড়ি? আমার টাকাপয়সা কিছু চাই না, শুধু তুমি থাকো।

সাগর গোঙায়।

সিন্ধু বউদিকে সরিয়ে আনে সাগরের বুক থেকে। বাস্তব জ্ঞান থেকে সে জানে বুকে ভার পড়া সাগরের পক্ষে ক্ষতিকর। কমলা সাগরের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে রইল।

একজন কমবয়সি নার্স এসে বলল, পেশেন্টকে ডিস্টার্ব করবেন না। উত্তেজনা ওঁর পক্ষে ক্ষতিকর।

সিন্ধু সাগরের মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। এ—রকম কিছু একটা সে প্রত্যাশা করছিল। দাদা বড় বেশি টেনশনে আছে, বড় ভেঙে পড়েছে ইদানীং। গরিব অবস্থা থেকে এত তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়া তার উচিত হয়নি। এই বিশাল রূপান্তরটা কোনও দিনই সাগরের সহ্য হয়নি।

তারা আসবার পনেরো—বিশ মিনিট বাদেই এল মানিক। মানিকের সঙ্গে তার বউ ছবি। এই সকালেও দুজনেই খুব ফিটফাট সেজে এসেছে। মানিকের পরনে স্ট্রেচ—এর বেলবটম, জাপানি ছাপা বুশ শার্ট গায়ে। ছবির পরনে সামু সার্টিন শাড়ি, নাকে হিরের নাকছাবি, ইন্টিমেট সেন্টের গন্ধে জায়গাটা মাত হয়ে গেল। একগোছা রজনীগন্ধা বিছানার পাশে রাখল ছবি। মানিকের পিছনে পেতলের দু'বাটির টিফিন ক্যারিয়ার আর ফ্লাস্ক হাতে মুকুন্দ এল। বলল, সাগরবাবুর ব্রেকফাস্ট।

ছবি নাক কুঁচকে বলল, এ কোথায় সাগরদাকে রেখেছ? শিগগির নার্সিং—হোমে ট্রান্সফার করো। এ—রকম নোংরা ওয়ার্ডে তো ভালো লোকই অসুস্থ হয়ে যায়।

মানিক বলে, আজই ব্যবস্থা হবে, কাল ডাক্তার পালিতের সঙ্গে কথা বলে গেছি, উনিই ব্যবস্থা করবেন। সাগর অসুস্থ হয়ে পড়লে মুকুন্দ বুদ্ধি খাটিয়ে এখানে ভরতি করে, তারপর আমাকে ফোন করেছিল। তখন সন্ধে হয়ে গেছে, কিছু করার ছিল না।

ছবি নিচু হয়ে কমলার গায়ে হাত দিয়ে বলল, বউদি উঠুন তো। আপনার কর্তা বড্ড দুষ্টু হয়েছেন আজকাল, কোনও বাধানিষেধ মানেন না। একটু শাসন করবেন তো! ডাক্তার বলেছে, ভয় নেই।

মানিক সিন্ধুর দিকে চেয়ে বলল, তুমি সিন্ধু না?

হ্যাঁ।

তুমি এ—সময়ে কলকাতায় থাকায় ভালোই হয়েছে। এ—সময়টায় লোকজন দরকার। এখন কয়েক দিন থাকতে হবে কলকাতায়।

থাকব। বলে সিন্ধু চুপ করে থাকে।

কমলা উঠে বসেছে এখন, বলল, মানিকবাবু, ওঁকে খুব ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে। দরকার হলে আমার সব গয়না বিক্রি করে দেব।

শুনে মানিক হেসে বলল, গয়না! আরে দূর, আমরা এত ভিখিরি হয়ে গেছি নাকি? গয়না—টয়নার দরকার নেই বউদি, ও—সব নিয়ে ভাববেন না। আজ বিকেলেই সাগরকে নার্সিং—হোমে নেওয়ার ব্যবস্থা হবে। রোগটা বাধিয়ে সাগর বড় ঝামেলায় ফেলল আমাকে। ব্যবসা আমার চেয়ে ও ঢের ভালো বোঝে। ও পড়ে থাকলে একা আমি কী যে করব!

একটু বাদেই সাগরের বিছানার চারপাশ ভরে গেল। ডাক্তার নার্স তো বটেই, অনেক ক্লায়েন্ট, সাপ্লায়ার, দু'—চারজন সরকারি লোকও এসে ভিড় করল। তিন—চারজন পুরনো বন্ধু।

ডাক্তার রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করে মানিককে বললেন, একটু সময় লাগবে। তবে আজ নার্সিং—হোমে নিতে পারবেন।

কমলা বলল, কত দিন লাগবে?

এক মাস বা দু' মাস। ইট ডিপেন্ডস—বলে ডাক্তার হেসে যোগ করলেন, ভয়ের কিছু নেই। মাইলড স্ট্রোক। কিন্তু এরপর ডিসিপ্লিনড না হলে মুশকিল। একবার স্ট্রোক হয়ে গেলে আর নরমাল—এ ফেরা যায় না।

দুপুরের রোদ মাথায় করে ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে সমবায় পল্লিতে ফিরে এল কমলা আর সিন্ধু। কমলা আসতে চায়নি, বলেছে, বিকেলে পর্যন্ত থেকে যাই, অত দূর থেকে যদি আসতে ফের দেরি—টেরি হয়, গাড়ি যদি বন্ধ থাকে!

সিন্ধু সে—কথায় কান দেয়নি। জোর করে নিয়ে এসেছে।

এসে দেখে গনফট বাচ্চাদের নিয়ে খুব খেলছে। জয়া আর সৈকত জানে ওদের বাবার খুব অসুখ। কিন্তু শৈশব বয়স দুঃসংবাদ বহন করতে পারে না। বাবার অসুখের কথা ভুলে ওরা মোটা—কাকুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

বাবাকে একটা চিঠি দেওয়া দরকার আজই। খেয়ে উঠে চিঠিটা লিখেও ফেলল সে। দাদার স্ট্রোকের খবর দিল না, শুধু লিখল, দাদার শরীর ভালো নয়। আমি ক'দিন পরে যাব।

প্রায় পনেরো দিন নার্সিং—হোমে রইল সাগর। তারপর ডাক্তারের মত নিয়ে কমলা আর সিন্ধু মিলে সাগরের অফিসের গাড়িতে করে নিয়ে এল তাকে। এখনও হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই, কথা স্পষ্ট হয়নি, বাঁ চোখের পাতা ভালো করে বোজাতে পারে না সাগর। খুব অল্প বয়সেই তার স্ট্রোক হয়ে গেল।

বাড়ির ব্যবস্থা একটু পালটানো হয়েছে। সাগরের ঘরের মস্ত খাটে এখন সৈকত আর জয়া শোয়, মেঝেয় বিছানা পেতে পুনি। কমলার ঘরে রাখা হয়েছে সাগরকে। সেখানে কমলা দিনরাত যক্ষীর মতো তাকে পাহারা দেয়। ঘরসংসার এখন খানিকটা শ্রীহীন। পুনিই রান্নাবান্না করে। বাগানে আগাছা জন্মেছে খুব। গোয়ালে বাছুরটা প্রায়ই ছাড়া পেয়ে গোরুর দুধ খেয়ে ফেলে।

ইস্কুল থেকে সাগরের সহকর্মীরা এসে এক দিন দেখে গেল। চাঁদা করে তারা কিছু ফুল ফল নিয়ে এসেছে। মানিক প্রায়ই গাড়ি করে আসে, সঙ্গে বড় ডাক্তার। কমলার হাতে সে প্রায়ই কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে যায়। সে অনেক টাকা। এক—এক বারে তিন হাজার, চার হাজার। এক মাসেই প্রায় বিশ হাজার টাকা এসে

গেল কমলার হাতে। সাগরের রোজগার যে এত বেশি, অংশীদারী ভাগ যে মাসে কত হয় তা আগে জানা ছিল না কমলার। ভয়ে তার বুক টিপটিপ করে।

টাকাটা লোহার আলমারিতে লুকিয়ে রাখে কমলা। বুঝতে পারে, এত টাকাই ছিল ওর সর্বনাশের মূলে। ভগবান জানেন, এত টাকা কমলা কোনও দিন চায়নি। সে সচ্ছলতা চেয়েছিল, একখানা নিজস্ব ছোট বাড়ি চেয়েছিল, দু'—একটা বড়লোকি জিনিস চেয়েছিল। তা বলে রাশি রাশি টাকার বৃষ্টি নয়। বেশি টাকার মধ্যে অভিশাপ থাকে।

সাগর আজকাল একটু—আধটু চলাফেরা করতে পারে। প্রায় সময়েই সিন্ধুকে ডেকে দাবা খেলতে বসে। খেলাটা নতুন শিখেছে সিন্ধুর কাছে। একটা বোর্ড আর ঘুঁটি কিনে আনা হয়েছে। দুই ভাই মিলে খেলে। কখনও বা বই পড়ে সাগর। বহুকাল বইপত্র পড়ার সময় ছিল না। কখনও বা একটা প্যাড আর কলম কোলে নিয়ে বসে।

এক দুপুরে তেমনি বসে ছিল সে। কমলা বেদানার রস করছিল মেঝেয় বসে। তখন কমলা বলল, শোনো, তোমার শেয়ারের অনেক টাকা মানিকবাবু আমার হাতে দিয়ে গেছেন।

সাগর গম্ভীরভাবে বলল, হুঁ।

কত টাকা বলো তো! কমলা হেসে জিজ্ঞেস করে।

সাগর প্যাডে চোখ রেখেই বলে, কত আর হবে! হাজার বিশ—ত্রিশ!

ঠিক বলেছ তো। ত্রিশ নয়, কাল গুনে দেখলাম তেইশ হাজারের কিছু বেশি। তোমার প্রতি মাসে অত রোজগার হয়?

সাগর একটু বিরক্ত হয়ে বলে, হয়, কেন?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম। রাগ করলে?

এখন টাকার কথা শুনতে ভালো লাগছে না।

তবে আর বলব না। রসটুকু খেয়ে নাও তো।

সাগর তেতো মুখ করে রসটা গিলে কাপ ফিরিয়ে দিয়ে বলে, কমলা, তুমি নামে লক্ষ্মী!

তাই তো।

সেইজন্য টাকার কথা তোমার মুখে মানায় না।

এটা হয়তো একটা ভালোবাসার কথা। এই ভেবে কমলা খুশি হল।

তখন আচমকা সাগর বলে, আমি কিন্তু লক্ষ্মীর চেয়ে সরস্বতীকেই বেশি চেয়েছিলাম।

কোলের ওপর খোলা প্যাড আর হাতে কলম নিয়ে সাগর অন্য মনে বসে থাকে অনেকক্ষণ। এক অক্ষরও লেখে না, লিখতে পারে না। আড়াল থেকে কমলা দেখে যায়, সিন্ধু দেখে যায়।

বারো

বুকুনের কথা সিন্ধুর কি মনে হয় না?

খুব হয়। কিন্তু সিন্ধুর চরিত্রে একটা খুব জোরালো কপাট আছে, যেটা সে বন্ধ রাখতে পারে। ভাবপ্রবণতার হাওয়া তাকে বড় একটা ভাসিয়ে নিয়ে যায় না কাটা ঘুড়ির মতো। আর আছে তার প্রবল আত্মসম্মান বোধ।

সাগর কিছু সুস্থ হয়ে উঠলে এক দিন সিন্ধু ভাবল, যাই তো, বুকুনকে এক বার দেখে আসি!

বিকেলের আলো থাকতে থাকতেই একদিন সিন্ধু দীনেন্দ্র স্ট্রিটের সেই বাড়িতে এল। আশ্চর্য, দরজা খুলল সেই মেয়েটাই যে আগেরবার খুলেছিল। সাদা খোলের একটা শাড়ি পরনে, লাল ব্লাউজ, এলোচুলের অন্ধকারের মাঝখানে মুখখানা ফুলের মতো ফুটে আছে। এক পলক তাকালেই মন ভালো হয়ে যায়।

বুকুন নেই?

মেয়েটা সিন্ধুর দিকে একটু তাকিয়ে একটু চেনা—অচেনার দ্বন্দ্বে পড়েছিল বোধহয়। সিন্ধুকে দেখেছে, কিন্তু মনে করতে পারছে না।

বুকুনদি? ওঃ, আপনি সেই শিলিগুড়ির, না?

হ্যাঁ।

আসুন।

সিন্ধু গিয়ে সেই ঘরটায় বসল। মেয়েটা চলে গেল ভিতরে।

অনেকক্ষণ কেউ এল না। বাড়িটা খুব নিস্তব্ধ লাগছে। একা বসে থাকতে সিন্ধুর খুব অস্বস্তি লাগছিল। আর বারবার সে কেন যেন যে—মেয়েটি দু'দিন তাকে দরজা খুলে দিল তার কথাই ভাবছে। বড় শ্রীময়ী মেয়েটি।

অনেকক্ষণ বাদে পরদার আড়াল থেকে আচমকা বুকুন একদম সামনে এসে দাঁড়াল। কোনও শব্দ হয়নি, তাই বড় চমকে গিয়েছিল সিন্ধু।

এত দিন পরে এলে? বুকুন কেমন এক স্বরে বলল। যেন ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে তার জীবনে, সিন্ধু বড় দেরিতে এসেছে।

সিন্ধু মুখ তুলে অবাক। বুকুন আরও কি সুন্দর হয়েছে দেখতে! হলুদে মাখানো চমৎকার গায়ের রং হয়েছে তার। হয়তো রোজ স্নানের সময়ে হলুদ মাখে। স্বাস্থ্য ঝলমল করছে। সেই রোগা মেয়েটাকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়াই যায় না।

সিন্ধু বলে, দাদার খুব অসুখ গেল বুকুন। আমি সেই থেকে কলকাতায় আছি। কিন্তু আসবার সময় হয়নি।

অসুখ! বলে ভ্রূ কুঁচকে যেন একটু ভাবল বুকুন। তারপর বলল, আমার যা হওয়ার তা হয়ে গেল।

একটা হতাশ ভাবে মাখানো এই কথা শুনে সিন্ধুর বুকটা এক বার চমকে ওঠে। সে বলল, কী হয়েছে?

শুনতে চাও? বলে ম্লান হাসল বুকুন। বলল, সে একটা গল্প!

বলো, শুনি!

তুমি রাগ করবে না বলো?

কী জানি? তবু বলো, রাগ আমি চেপে রাখতে পারি বুকুন। কিন্তু আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি কি অন্য কারও সঙ্গে ইনভলভড হয়ে গেছ?

বুকুন মুখটা নামিয়ে নিল। খাটের বিছানায় বসে রইল নতমুখী। তারপর আঁচল তুলে চোখ মুছে অস্পষ্ট গলায় বলল, আমার খুব দোষ নেই। সবাই এমন করে রাজি করাল।

কী হয়েছে বুকুন?

আমার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল ক'দিন আগে।

সিন্ধু থমকে যায়। এমনটা সে আশা করেনি। হয়ে গেল! অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলল, কার সঙ্গে?

এ—বাড়িতে আসত ও। পারিজাত রায়। একসঙ্গে সিনেমায় গেছি, বেড়িয়েছি। ওর ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। এম বি বি এস পাশ করেছিল দু' বছর আগে, এখন এফ আর সি এস করতে যাচ্ছে। ওর মা—বাবার ইচ্ছে বিয়ে করে যায়। ও তাই এক দিন আমাকে সব খুলে বলল। বিশ্বাস করো, আমি রাজি হইনি। কিন্তু কথাটা উঠতেই এ—বাড়ির সবাই হই হই করে ধরল আমাকে। সকলের বিরুদ্ধে যেতে আমি কি পারি? সোশ্যাল ম্যারেজের সময় ছিল না, মলমাস পড়ে গেছে। তাই রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। এক বছর বাদে এসে সামাজিক মতে বিয়ে করে নিয়ে যাবে আমাকে।

বুকুনের গলায় যথেষ্ট দুঃখের ভাব ছিল, চোখে জল ছিল, একটা অসহায়তাও ফুটে উঠেছিল ওর মুখে। তবু সিন্ধুর কেবলই মনে হয়, ভিতরে ভিতরে বুকুনের একটা আনন্দের বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। সিন্ধুর বুকটা অন্ধকার হয়ে গেল।

তবু হেসে বলল, বাঃ, এ কেমন বিয়ে! খাওয়ালে না তো!

বুকুন জলভরা চোখ তুলে বলে, ঠাট্টা করছ? করো। তোমার তো ঠাট্টা করারই কথা।

সিন্ধু কাঠ—হাসি হেসে বলে, বুকুন, আমার তো এমনিতেও চান্স ছিল না। যাকগে, ভেবো না। আজকাল কেউ এ—সবের জন্য গলায় দড়ি দেয় না। আজ উঠি।

বলে উঠতেই যাচ্ছিল সিন্ধু, ঠিক এ—সময়ে পরদাটা সরিয়ে সেই মেয়েটা ঘরের মধ্যে আসে। মনে হয় এতক্ষণ পরদার ও—পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। ঘরে এসে সিন্ধুকে বলল, একটু বসুন। চা আনছি।

না, তা দরকার নেই।

মেয়েটা সামান্য হেসে বলল, ওমা, আপনি কি আমাদের ওপর রাগ করেছেন?

সিন্ধুর ভিতরে তৎক্ষণাৎ এক হিংস্রতা জেগে ওঠে। সে ফুঁসে উঠে রুক্ষ গলায় বলল, কেন, রাগের কী দেখলেন?

দেখছি, খুব রেগে গেছেন। আগের দিন যখন এসেছিলেন তখন আমরা ভালো আপ্যায়ন করতে পারিনি বলে রাগ করেননি তো?

সিন্ধু তার রাগী চোখে চেয়ে থাকে একটু।

মেয়েটা ভয় পায় না। বলে, আপনার রাগের গল্প অনেক শুনেছি। জলপাইগুড়িতে এক বার নাকি ভীষণ কাণ্ড করেছিলেন।

সিন্ধু নিভে যায়। বসে বলে, ওঃ, সে—সব বলেছে বুঝি বুকুন?

হ্যাঁ। আরও অনেক কথা বলেছে। আমি কিন্তু ভীষণ দুঃখ পেয়েছি বুকুনদির ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায়।

সিন্ধু কিছু বলল না। এই মেয়েটা বড্ড পাকা।

বুকুন একটু সামলে নিয়ে বলে, সিন্ধুদা, এ হচ্ছে আমার মাসতুতো বোন গৈরিকা। পার্ট টু দিচ্ছে। ভালো নাচতে জানে। সি—এল—টিতে একসময়ে—

গৈরিকা বলল, যাঃ!

বলে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই এক প্লেট মিষ্টি আর চা হাতে এসে বলল, বুকুনদি তেমন স্ট্রং—মাইন্ডেড নয়। ওর জায়গায় আমি হলে এ—বিয়েতে কেউ রাজি করাতে পারত না। কিন্তু বুকুনদি কেঁদে কেটে, ভয় খেয়ে কীরকম যেন হয়ে গেল। অবশ্য পারিজাত খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে!

সিন্ধু এ—সব ঘটনার অর্থ জানে। বুকুনের যে ব্যক্তিত্বের জোর নেই এটাও কি সে আগেই জানত না?

সিন্ধু খাবারের প্লেট ছুঁল না। কয়েক চুমুক চা খেয়ে সে উঠে পড়ল। জীবনটাকে এবার অন্য এক রকম করে গড়তে হবে। বুকুনকে ঘিরে সে জীবনের একটা ছক তৈরি করেছিল। এখন বুকুন তার জীবনে রইল না। ছকটা না পালটে কী করে সিন্ধু! তার খুব ইচ্ছে করছে শিলিগুড়ি ফিরে যেতে। গনফট রোজ তাগাদা দিচ্ছে। ওর বাড়ি থেকে চিঠি আসছে রোজ।

বাড়িতে ঢুকবার সময়ে সিন্ধু দেখে ওপরের বারান্দায় দাদা বসে আছে বেতের চেয়ারে। মুখ নিচু করে বোধহয় কোলের ওপর প্যাডে কিছু লিখছে গভীর মনোযোগে। তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। দাদা আলো না জ্বেলে এই প্রায়ান্ধকারে লিখছে কী করে?

সিন্ধু উঠে এল ওপরে। বারান্দায় এসে আলোটা ফট করে জ্বালতেই চমকে উঠে সাগর বলে, কে?

আমি।

সাগর মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল একটু। বলল, আলোটা নিভিয়ে দে।

সিন্ধু নিভিয়ে দিল। সাগর আর তার দিকে চেয়েও দেখল না। বেশ জমাট অন্ধকার নেমে আসছে। তবু সাগর একমনে প্যাডে কী লিখে যাচ্ছে।

সিন্ধু দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল একটু। বহুকাল আগে দাদা এইভাবেই লিখত। হাঁটু তুলে বসে, কোলে প্যাড নিয়ে। বাহ্যজ্ঞান থাকত না। বউদি কত বকে বকে সংসারের কাজে পাঠাত, বাজার করতে বা লন্ড্রির কাপড় আনতে।

সিন্ধু ঘরে এসে দেখল বউদি নিঃসাড়ে চলাফেরা করছে। সিন্ধুকে দেখে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নিচু গলায় বলে, সিন্ধু, চুপ! ও আজ লিখছে।

কী লিখছে?

কবিতা। বলে খুব উজ্জ্বল হাসি হাসল কমলা।

সিন্ধুর ভারী মজা লাগে। সাগর কবিতা লিখলে আগে কোনও দিন খুশি হত না কমলা। আজ ভিন্ন পরিস্থিতিতে দান উলটে গেছে।

লিখছে মানে? সিন্ধু জিজ্ঞেস করে কবিতা আসছে তো? নাকি পরে আবার কবিতা হল না বলে পাগলামি করবে?

না রে, ওর মুড আমার চেয়ে কেউ ভালো চেনে না। কবিতা যখন ওর মাথায় আসে তখন এ—রকম নিঃঝুম পাথরের মতো হয়ে যায়। বহুকাল এ—রকম মুড দেখিনি ওর। এতকাল কেবল কবিতার পাগলামি করেছে। কিন্তু আজ ও অন্যরকম, ঠিক সেই আগের মতো।

সিন্ধু একটু তাকিয়ে থাকল কমলার দিকে। হঠাৎ বলল, বউদি, আগের মতো সব কিছু কিন্তু নেই। তুমি খুব পালটে গেছ।

কী বলছিস!

শোনো, দাদা কবিতা লিখছে বলে তুমি অমন কাঁটা হয়ে থেকো না। দাদা যদি টের পায় যে তোমরা দাদার কবিতা লেখার জন্য সবই শ্বাস বন্ধ করে আছ তবে আবার ওর মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে। ওর কবিতাকে প্রকাশ্যে অত ইমপর্ট্যান্স দিতে যেয়ো না। বরং মাঝে মাঝে ওকে ডিস্টার্ব কোরো। কবিতার মাঝখানে গিয়ে এক—আধটা ফরমাশ করে দেখো, তাতেই ও আগের মেজাজটা ফিরে পাবে।

একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়ে কমলা বলে, বলছিস!

হ্যাঁ, বউদি। একটু ভয় করছে তোমার, তবু ও—রকম করাটা দাদার পক্ষে দরকার।

কমলা ভাবল।

সন্ধের পর সাগর বারান্দায় বাতি জ্বেলে নিবিষ্ট হয়ে বসে আছে কবিতার খাতা নিয়ে। তখন কমলা এসে বলল, ওগো, যাও তো ইলেকট্রিক মিস্তিরিকে একটু ডেকে আনো। হিটারটা গোলমাল করছে!

সাগর একটা বিরক্তির 'আঃ' করল। রাগী চোখে তাকাল কমলার দিকে।

যাও না গো! কমলা বলে। ভিতরে ভিতরে ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ করে।

সাগর উঠে পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে মিস্তিরি নিয়ে ফিরে আবার লিখতে বসে গেল। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সে যেন খুশি হয়েছে। সে যেন কিছু একটা খুঁজে পাচ্ছে জীবনের মধ্যে। খুব চিকমিক করছে চোখ। সমস্ত মুখে বিষয়চিন্তার যে রেখাগুলি পড়েছিল তা মুছে গিয়ে এক কোমল কল্পনাপ্রবণতার লাবণ্য ফুটে উঠেছে।

কমলা একটা খেলা খুঁজে পেয়েছে। পরদিনও সে সাগরের কবিতা লেখার মাঝখানে তাকে ডেকে মাছ কিনতে পাঠাল।

সাগর আজকাল চলাফেরা করতে পারে। তা ছাড়া বাঁধা রিকশা এসে নিয়ে যায়।

মাছ এনে সাগর লিখতে বসে।

কমলা এসে বললে, ইস্কুলে কবে থেকে যাবে?

কেন?

বাঃ, চাকরি না করলে, কাজ না করলে সংসার কি এমনিতে চলবে?

ঠিক এ—রকম করে কতকাল কমলা কিছু বলেনি। সাগর বিরক্তির সঙ্গে বলে, বলো তো আজই যাই। পরে শরীর খারাপ করলে কাঁদতে বোসো না।

না, না, আজ নয়। কমলা ভয় পেয়ে বলে। তারপর হেসে বলে, তার চাকরিটা ছেড়ো না যেন।

আচ্ছা। বলে সাগর দ্রুত লিখতে থাকে। সিগারেট ধরায়।

সাগরের ঘর থেকে সিন্ধু চুপিচুপি ভালো আসবাবপত্র সরিয়ে দিয়েছে নীচের ঘরে। পুরনো খাট, ডেস্ক দিয়ে নতুন করে সাজিয়েছে। অবশ্য এ—ঘরে এখন সাগর থাকে না। থাকে জয়া আর সৈকত। সাগর কমলার ঘরে শোয়।

সিন্ধু কমলাকে বলেছে, বউদি, এই সিস্টেমই বজায় রেখো। ছেলেমেয়েরা ওই ঘরেই থাকবে। তুমি দাদাকে আলাদা থাকতে দিয়ো না।

কমলা সিন্ধুর দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলল, বলল, তুই এত পাকা মাথার লোক কবে থেকে হলি সিন্ধু! সেদিনের পুঁচকে ছেলে, কিন্তু যেন জ্যাঠামশাইয়ের মতো সব বুঝে গেছিস!

আমি কবি নই বউদি। নিতান্তই প্রোজ।

তোর খুব ভালো হবে সিন্ধু, দেখিস। খুব ভালো হবে তোর।

সিন্ধু ঠাট্টা করে বলে, যে ভালো করেছ কালী, আর ভালোতে কাজ নাই....

টানা পনেরো দিন সাগর অজস্র কবিতা লিখল। যেন পাথর কাটিয়ে নির্ঝরিণীর মুক্তি ঘটেছে। তার জলধারার শেষ নেই। এই পনেরো দিন কমলা কবিতার মাঝে মাঝে এসে ফরমাশ করেছে, বাইরে পাঠিয়েছে সাগরকে। সাগরের মুখে সেই সম্মোহিত কবিতামুগ্ধতা আবার ফিরে এল বুঝি।

তারপর সাগর ইস্কুলে যাওয়া শুরু করল। ব্যবসার দেখাশুনোও আবার শুরু হল।

এক দিন রাত্রিবেলা কমলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে সাগর বলল, শোনো কমলি, আর আমি কিন্তু রাশি রাশি টাকা রোজগার করব না।

কেন?

ব্যবসা ভাগ করে নিলাম। এখন মানিক আর আমি আলাদা। মানিকের ক্যাপিটালে ব্যবসা করতাম। টাকা রেখে আর টাকা চেখে লোভ বড় বেড়ে গিয়েছিল। এখন ব্যবসা করব ছোট্ট করে, কম টাকায়। সারা দিন টাকা রোজগার করার মানেই হয় না। কবিতা লেখার সময়ও তো চাই।

ঠিক কথা। এত দিনে সেটা বুঝলে!

তবু তো বুঝলাম। কমলি, আমার কবিতা আবার ছাপা হচ্ছে। একটা বই বেরোবে।

কমলা গাঢ় গলায় বলে, শোনো, সিন্ধুকে কেন ব্যবসা ছেড়ে দাও না! ওর মতো পাকা মাথা তোমারও নেই। তুমি আগের মতো মাস্টারি আর কবিতা নিয়ে থাকো।

সাগর অবাক হয়ে বলে, এ কী বলছ? তোমার মুখে এই কথা?

নয় কেন? অনেক কষ্ট পেয়ে তো বুঝেছি আমার টাকার চেয়ে তোমাকে অনেক বেশি দরকার।

সাগর উঠে বসল উত্তেজনায়। বলল, সিন্ধুটার কথা কখনও মনে হয়নি। ঠিক বলেছ তো। আমি তো ওকেই পার্টনার করে নিতে পারি।

নেবে?

নিশ্চয়ই। ওকে এক্ষুনি ডাকি।

আজ থাক না। সকালে বরং—

না, না। এক্ষুনি। সিন্ধু! সিন্ধু! বলে ডাকতে ডাকতে সাগর মশারি থেকে বেরিয়ে গেল।

বড় সুখে শুয়ে চেয়ে থাকে কমলা। সেই পাগলাটে, খ্যাপাটে সাগর আবার ফিরে এসেছে তার কাছে! যখন যা মনে হবে তখনই তার করা চাই। এক বার জ্যোৎস্নায় বসে ভাত খেয়েছিল, রাত বারোটার পর কমলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল অন্য বার। সেই লোকটা মাঝখানে খুব হিসেবি হয়ে গেল, বড়লোক হল, ঠান্ডা মেরে গেল। ভগবান আবার সেই কবি স্বামীটিকে তার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

কমলা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে। এত সুখের কান্না কোনও দিন কাঁদেনি।

শূন্যের উদ্যান

গেরো! শালার মিছিল!

গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এ রাস্তায় গাড়ি যাবে না দাদা।

পিছনের সিটে মুখে উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে চশমা—পরা মোটাসোটা গোলগাল যুবকটি। মুখে ঘেমো ভাব। চশমাখানা পিছলে নাকের ডগার দিকে নেমে এসেছে। খুবই বোকাটে আর অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। ফরসা মুখখানায় লালচে আভা। মানুষের যে কত রকমের বিপদ আছে! এ ছেলেটার কীরকম বিপদ কে জানে! গৌরহরি অতশত জানে না। জানার দরকারই বা কী! সব মানুষই চলেছে নিজের গলির গলিপথে। সে সব প্রাইভেট গলিপথ। সব মানুষের জীবনই প্রাইভেট গলিপথ, সেখানে গৌরহরির ট্যাক্সি ঢোকে না।

ছেলেটা বলল, তাহলে কী হবে! আমার যে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।

দেখছেন তো মিছিল! এর ল্যাজা মুড়া কোথায় কে জানে! সামনেটা হয়তো কলেজ স্ট্রিট পেরোচ্ছে, পিছনটা বোধহয় শ্যামাবাজারের পাঁচমাথা পেরোয়নি।

কিন্তু আমার ভীষণ তাড়াতাড়ি দরকার!

গৌরহরি বিড়বিড় করে আপনমনে হিন্দিতে বলে, তব ক্যা করুঁ! উড়কে যাঁউ!

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে, দেখুন যদি গাড়িটা ঘোরাতে পারেন। সারকুলার রোড দিয়ে আরও নর্থে গেলে বোধহয় মিছিলটা এড়ানো যাবে।

গ্রে স্ট্রিটে এখন গায়ে গায়ে গাড়ি জমে আছে। ভিড়ের মধ্যে বদ ছোকরারা যেমন মেয়েদের গায়ে গা ঘষে সেরকমই গা ঘষটাচ্ছে গাড়ি। একটা লম্বা প্লিমাউথ গৌরহরির ট্যাক্সির ডানদিকে এসে দাঁড়াল, দরজা খোলারও জায়গা রইল না।

এই প্রাইভেট! গৌরহরি চেঁচাল, এটা কী হচ্ছে অ্যাঁ! এটা কী ধরনের ইন্টারফিয়ারেন্স!

ইংরিজি শব্দটা গৌরহরি উচ্চারণ করল ঠিক যেমন ঢাকার ইংলিশ স্কুল সেন্ট অ্যাণ্টনিজ—এর ফাদার ইভান্স উচ্চারণ করত। আজও যখন গৌরহরি মাঝেমধ্যে এক আধটা ইংরিজি বলে তখন সমঝদার মানুষ তাকে একটু চেয়ে দেখে। এ সব উচ্চারণ সেই ইংলিশ স্কুলে শেখা, পাক্কা সাহেবদের কাছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেন্ট অ্যাণ্টনিজ—এর শেষ ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছয়নি গৌরহরি। পরপর দু'বছর টাইফয়েড আর পোলিও তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। টাইফয়েড নিয়েছিল গৌরহরির মগজটাকে, পোলিও নিল বাঁ—হাত আর বাঁ—পা। এখনও উত্তেজিত হলে গৌরহরির মাথার মধ্যে কেমন ঝমঝম একটা শব্দ হয়। পাগল—পাগল লাগে। টাইফয়েডের পর সে যখনই বইপত্র নিয়ে পড়তে বসেছে, তখনই কিছুক্ষণ একটানা পড়ার পর মাথায় কোথাকার কোন সাজঘর থেকে দু'খানা নূপুর—পরা পা তার মাথার মঞ্চে চলে আসত নাচতে নাচতে। কীরকম রিমঝিম রিমঝিম, দু'খানা নাচের পা ঘুরছে, উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম দিচ্ছে গুলিয়ে। সেই শব্দে তার সব বোধ ডুবে যেত। তার বাবা বগলাপতি ডাইসাইটে ব্যবসাদার, টিকাটুলিতে সাহেবের বাড়ির মতো বাড়ি করেছিলেন। সব ছেলেকে বিলেত ঘুরিয়ে আনবেন, এরকম সংকল্প ছিল তাঁর। বড় দুই ছেল সেন্ট অ্যাণ্টনিজ পার হল, কিন্তু গৌর পারল না। গিরি ডাক্তার, সাহেব ডাক্তার, কলকাতার স্পেশালিস্ট, কেউই সেই শব্দটাকে বন্ধ করতে পারল না। বগলাপতি আপনমনে অনেক গাল দিলেন ছেলেকে, ডাক্তারদের এবং নিজের ভাগ্যকে। অসাধ্যসাধন থেকে মুক্তি দিলেন। বাড়িতে মাস্টারের কাছে গৌর পড়ত একটু—আধটু। পড়ার কোনও চাপ দেওয়া হত না। পরের বছরই পোলিও। আবার দীর্ঘকাল বিছানা নিতে হল তাকে। অনেক চিকিৎসার পর মেহের কালীবাড়ি থেকে এক তান্ত্রিক এসে বলল, সারিয়ে দিতে পারি,

তবে খুঁত থেকে যাবে। থাক খুঁত, সারাও। কীসে সেরেছিল কে জানে। তবে সেরেছিল ঠিকই। কেবল বাঁ—হাত আর বাঁ—পা শুকিয়ে কাঠি হয়ে রইল। অবশ্য সে দুটো একেবারে অকেজো নয়। একটু কমজোরি, এই যা। নাহলে গৌরহরি তাদের দিয়ে সব কাজই করিয়ে নেয়। মেয়েমানুষকে আদর করা পর্যন্ত।

গৌরহরির ইংরিজি কথাটা শুনে প্লিমাউথের জানালা দিয়ে কালো চশমাপরা একজোড়া চোখ তাকে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল। প্লিমাউথের জন্যই জ্যাম হয়ে গেল রাস্তাটা। ঘোরানোর জায়গা নেই। একটু পিছু হটবার চেষ্টা করল সে, পিঁ পিঁ করে অমনি পিছন থেকে আর্তনাদ করল একটা ফিয়াট। গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটাকে বলল, দেখছেন তো গাড্ডা! ডানদিকের প্রাইভেটটাই ঝামেলা করেছে। এ জট ছাড়াতে এখন কত সময় লাগে কে জানে!

ছেলেটা চশমা—জোড়া ঠেলে তুলে চারদিকে চেয়ে দেখল টালমাটাল। বলল, নেমে যদি মিছিলটা ক্রস করে ওপাশ থেকে ট্যাক্সি ধরতে পারি তবে বোধহয়—

তাই করুন।

মিছিলটা কি খুব বড় মনে হচ্ছে?

গৌরহরি হাসে, ভুখা মানুষ, বেকার মানুষ সমস্ত দেশে ভর্তি। তা মিছিল তো একটু বড় হবেই। এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুন না, ল্যাজ দেখা যাচ্ছে কিনা।

ছেলেটা দরজা খুলে নেমে একটু এগিয়েই ফিরে এল, ও বাব্বাঃ, ওদিকটা লালে লাল। আরও মাইল খানেক আছে বোধহয়।

এই বলে ছেলেটা মিটার দেখে পয়সা দিয়ে দেয়। গৌর বলে, মিছিলটা ক্রস করতে পারবেন তো?

বলে কয়ে চলে যাব। আমার বড় জরুরি দরকার। ওরা দেবে না ক্রস করতে?

তাই দেয়? পেরোতে গেলে ঝাড় লাগাবে।

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে, তাহলে?

গৌর হাসে, লাইনে ঢুকে মিছিলে শামিল হয়ে যান। কয়েক পা হেঁটে দু'—একটা স্লোগান ঝেড়ে লাইন পালটে ওপাশের লাইনে চলে যাবেন। আবার স্লোগান ঝাড়বেন কয়েকটা, তারপর টুক করে কেটে পড়বেন। মিছিল ক্রস করার ওই হচ্ছে কায়দা।

ছেলেটা চলে গেল। ওই রকম গোল চশমা—পরা মোটাসোটা বোকাটে ছেলে এ—যুগে অচল। ভাবে গৌর, আর হাসে। বলতে কী, একসময়ে সবাই মনে করেছিল যে গৌরহরিও অচল। এ সংসারে দুটো শুখো হাত—পা আর মগজে নাচের শব্দ নিয়ে কিছুতেই বেশিদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় না। বগলাপতি তাই ভাবতেন আর বিড়বিড় করে গাদ্দল দিতেন। মুখটা বড় খারাপ বগলাপতির। ছেলেদেরও শালা—শোরের বাচ্চা বলতে আটকায় না। তা গৌরহরি ছিল তাঁর ছেলেদের মধ্যে এক্কেবারে অচল মুদ্রা। বড় দুই ছেলে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে পাস করল, তারপর গেল কলকাতা, তারপর গেল বিলেত। তৃতীয় গৌরহরি হয়ে রইল অর্ধেক তৈরি করা পুতুলের মতো। যেন বা কোনও কারিগর গড়তে গড়তে হঠাৎ হাত থামিয়ে উঠে গেছে, তাই গৌরহরির মূর্তিখানা আর শেষ হয়নি।

বগলাপতি দেশভাগের সময়ে বিস্তর বুক চাপড়ে ভিতরে ভিতরে মাল পাচার করলেন কলকাতায়। তখনও দুই ছেলে বিলেত থেকে ফেরেনি। কেবল অপদার্থ গৌরহরি তাঁর সহায়—সম্বল। বগলাপতি একা—একাই অতবড় ব্যবসা গোটালেন বিড়বিড় করতে করতে। বউ আর আধা—ফিনিশ ছেলেকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। একটা বাড়ি কিনলেন বালিগঞ্জে গোপনে। আর প্রকাশ্যে খানিকটা জায়গা দখল করলেন যাদবপুরে রিফিউজি কলোনিতে। সে সময়ে খবর এল, তাঁর বড় ছেলে মেম বিয়ে করেছে। সে আর ফিরবে না। বগলাপতি ভয়ংকর ভেঙে পড়লেন। গৌরহরি তখন যুবাপুরুষ, কিন্তু অপদার্থ। তবু হাতের মুঠোর মধ্যে থাকা ছেলে। বগলাপতি বরাবরই গৌরকে একটু বিশ্রী প্রশ্রয় দিতেন, সে অসুস্থ এবং নিরীহ বলে। বড় ছেলের খবর পেয়ে তিনি আরও আঁকড়ে ধরলেন গৌরকে। কিন্তু গৌর তো অপদার্থ, হাফ—ফিনিশ। চলে

—ফেরে, খায়—দায়, কথা বলে, কিন্তু তাকে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, তার দ্বারা কিছু হবে। বগলাপতিরও হল না। তিনি বড় ছেলেকে চিঠি লিখলেন, বিধিমতো মেমকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আইস। তোমার আবার বিবাহ দিব। উত্তরে ছেলে লিখল, তা সম্ভব নয়। আমার আশা ত্যাগ করুন। তখন থেকেই গৌর জানে, সে বাপের সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। বগলাপতি তাকে গড়িয়াহাটায় একটা দোকান করে বসিয়ে দিলেন। গৌরহরি দোকান করতে লাগল। বিক্রিবাটা মন্দ ছিল না। কিন্তু ঝামেলা হত দিনের শেষে, যখন দোকান বন্ধ করে গৌর হিসেব করতে বসত। হিসেবের অঙ্ক তার কাছে বরাবরই ভয়াবহ। কাজেই টাকা—আনার হিসেব শুরু করলেই সে স্পষ্টই টের পেত তার মাথার মধ্যে সেই অনভিপ্রেত নর্তকী তার সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ঝমঝম করে, এক্ষুনি নাচ শুরু হবে। বগলাপতি আবার চিন্তায় পড়লেন। গৌরকে ডেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, কী করবি গৌরা? কী করতে তোর ইচ্ছে করে? বসে বসে তো আর খেতে পারবি না, পাঁচভূতে লুটে খাবে। একটা কিছু কর।

গৌর খুব ভাবত। কিন্তু ভেবে কিছু পেত না। বস্তুত তার মাত্র দু—একটা বিষয়ই প্রিয় ছিল। ময়দানে ফুটবল খেলা দেখা, সিনেমা আর ঘুম। এইসব, আর চিন্তাভাবনাহীন, উদ্বেগহীন হালকা দিন—কাটানো। কোনও কাজের কথা ভাবলেই তার বুকের ভিতরটা দুরদুর করত, আমি ব্যাটা হাফ—ফিনিশ, ফিফটি পারসেন্ট মানুষ, আমি শালা কী করব?

কিন্তু তারপরও একটা কয়লার ডিপো তাকে দিয়ে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন বগলাপতি। সেটা ফেল মারল তো নিজের সঙ্গে নিয়ে ঘুরলেন এদিক ওদিক। বগলাপতির ব্যবসা ছিল নানারকম জটিল—কুটিল পথে, সেগুলো বোঝবার মতো চিন্তাশক্তি গৌরের ছিল না। বগলাপতি ক্রমেই হতাশ হতে হতে একদিন ভীষণ রেখে গিয়ে বললেন, যাঃ শুয়োরের বাচ্চা, কিছুই যখন পারবি না, তখন যা, গিয়ে ড্রাইভারি শেখ। শিখে আমার গাড়ি চালাবি। প্রতি মাসে কেন পরের ছেলেকে দেড়শো টাকা করে ধরে দিই! অর্থাৎ সোজা কথা, বগলাপতি ছেলের বসে খাওয়া সইতে পারতেন না। কিছু না পারো তো বাপের সোফারি কর।

পুরনো একখানা ডজ গাড়ি ছিল তাদের। সেটা চালাত হরিপদ। রোগাটোগা ভালোমানুষ ছেলেটা। হাফ—ফিনিশ গৌরহরি গাড়ি চালানো শিখবে জেনে সেও খানিকটা হাঁ করে রইল। বলল, গাড়ির যে অনেক ব্যাপার রে! ক্লাচ, ব্রেক, অ্যাকসেলেটার, গিয়ার, স্টিয়ারিং, তুই সব সামলাতে পারবি?

গৌরহরি উদাস গলায় বলল, তা আমি কী করব? আমি কি চেয়েছি শিখতে? বগলু ছাড়ছে না যে!

আড়ালে—আবডালে গৌরহরি বাপকে আদর করে বগলু বলে উল্লেখ করত। ফলে কতবার বকুনি খেয়েছে।

তারপর বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি, অর্থাৎ বগলুর পোলা পৌরা পুরনো আমলের ডজ গাড়িতে ভালোমানুষ হরিপদর পাশে বসে অবরে সবরে গাড়ি চালানো শিখত কলকাতার নির্জন রাস্তা—ঘাটে।

আরে বাঃ! প্রথম দিনেই ভালো লেগে গেল গৌরহরির। গাড়ির যন্ত্রপাতিগুলো খুব একটা জটিল না তো! কিংবা হয়তো জটিলই, কিন্তু তার কাছে এই প্রথম একটা কাজ এল যে কাজ তার 'পারব না' বলে মনে হল না। ব্যাপারটা এরকমই হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে অপদার্থ লোকটারও একটা না একটা বৈশিষ্ট্য মাফিক কাজ আছে, সেটা খুঁজে পেলে বিস্তর বখেরা চুকে যায়। গৌরহরি তার দুটো রুখো—শুখো হাত—পা আর মগজের ঝমঝম নিয়েও মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতির মধ্যে সম্পূর্ণ সেঁধিয়ে গেল। কেমন যেন নেশা পেয়ে বসল তাকে। একমাসে সে গড়—গড় করে গাড়ি চালাতে লাগল। পিছনের সিটে বসে তার কাণ্ড দেখে বগলাপতি হেসে খুন, আরে বাপ্পোত, খুব শিখেছে তো! অ্যাঁ! আরে বাঃ! এ যে মোলায়েম ব্রেক মারে! ডাইনে বাঁয়ে হাত দেখিয়ে বাঁক নেয়! অ্যাঁ! এ যে দিব্যি স্পিডও মারছে!

বাবা আর মাকে কয়েকদিন সে দক্ষিণেশ্বর, বেলুন, পানিহাটি ঘুরিয়ে আনল। মাস চারেক পর হরিপদকে বিদায় দেওয়া হল। যাওয়ার সময়ে হরিপদ আড়ালে ডেকে বলল, ছোটবাবু, তুমি মাইরি এক নম্বরের

টিকরমবাজ। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি তোমার মতো হাফ—ফিনিশ লোক ব্যাপারটা কোনওকালে শিখতে পারবে। ভাবলে কি শেখাতুম! ঠিক গোলেমেলে হরিবোল করে দিতুম।

ডানদিকে প্লিমাউথ, পিছনে ফিয়াট, বাঁদিকে পার্ক করা কয়েকটা অ্যামবাসাডার, সামনে মিছিল, বিচিত্র গাড্ডা। ভিতরে বসে বাতাসহীনতায় ঘামতে লাগল গৌরহরি। ছেলেটা নেমে যাওয়ার পর সে লাল শালুর টুকরোটা দিয়ে মিটার ঢেকেছে। এখন নো সোয়ারি বিজনেস। বগলাপতির ছেলে গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা কি কারও সার্ভেন্ট? ইজ হি? এই বলে গৌর গাড়ির ছোট চৌকো আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল। সদ্বংশের ছেলেদের মুখে কিছু কিছু চিহ্ন থাকে। তার মুখেও আছে। এই যেমন তার কপালখানা,কেমন গড়ানে, মাঝখানে মাথার চুল ছুঁচোলো হয়ে নেমে এসেছে। কিংবা, যেমন তার দু'খানা কান, দুটিতে বুদ্ধদেবের মূর্তির কানের মতো ভারী ভারী বড় লতিতে কানদুটো বাহারে দেখায়। নাকখানাও চোখা। আর কিছু লক্ষ করার মতো নেই অবশ্য। গাল ভাঙা চোয়াড়ে চেহারা, গালে কয়েকদিনের দাড়ি। রুখু চুল। একটু গোঁফ আছে গৌরের। সেখানে আজকাল চিকমিকে দু'—একটা পাকা রোঁয়া মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শালা প্রাইভেটটা যদি ডানদিকে না থাকত তবে এতক্ষণে দাশ কেবিনে গিয়ে টিফিন করত গৌরহরি। সে ঘড়ি দেখল। হ্যাঁ, এখন গৌরবাবুর টিফিন টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে। গৌরবাবুর খিদে পেয়েছে আর এ শালারা রাস্তা আটকে এ সব কী টিকরমবাজি শুরু করেছে! অ্যাঁ! গৌরবাবুর খিদে পায় না নাকি? ডানদিকের ওই শালা প্রাইভেটটা! কালো চশমা—পরা লোকটা থুতনিতে হাত দিয়ে ঝিমোচ্ছে। খিদে পেলে গৌরের ঘুম আসে। বাবুদের বাড়ির ছেলে, খিদে তেষ্টা সে একদম সইতে পারে না। সে হল গে টিকাটুলির ডাকসাইটে বগলাপতির ছেলে গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা, খিদে তেষ্টা সইতে নারে—ছা—রা—রা—রা—রা, গুনগুন কর গান গাইল গৌর। আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে গাল দিল দুনিয়ার সব প্রাইভেটদের, আর মিছিল করা যাবতীয় ভুখখা পার্টির লোকদের। গৌরবাবুর গাড়ি আটকে শালাদের যত আশনাই!

একটা টেরিলিন পরা লোক জানালায় ঝুঁকে বলল, গাড়ি যাবে নাকি?

কোথা দিয়ে যাবে দাদা? উড়ে?

মিছিল তো শেষ হয়ে এল। রাধা সিনেমার কাছে পুলিশের গাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওই তো শেষ!

গাড়ি যাবে না দাদা, আমার টিফিন হয়নি।

লোকটা একটু শ্বাস ফেলে বলে, আপনি মালিক, আপনাদের দয়া।

বলে সরে গেল।

মালিক! আলবত মালিক। গৌরবাবুর টিফিন হয়নি আর গাড়ি যাবে বললেই যাবে! কে না জানে বিশ্বসংসারে যে, বিকেল সাড়ে চারটেয় চা না পেলে গৌরবাবুর ঘুম পায়! স্টিয়ারিং—এর ওপর মাথা ঝুঁকে আসে! তখন নিজেকে কত কাকুতি মিনতি করে গৌর, ওঠো গৌরবাবু, ওঠো, অমন হেঁদিয়ে পড়লে কি চলে? ওঠো বাবা, গৌর, ওঠো। চোখ মেলে তাকাও তো বাপধন। নইলে যে কখন লাল আলো পেরিয়ে যাবে। কোন গাড়ির পিছনে ভিড়িয়ে দেবে, আর ধরবে এসে পুলুসবাবা। ওঠো হে বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি। জেগে থাকো হে বগলুর ছাওয়াল,

তবু শালার ঘুম পায়! আড়মোড়া আসে। দাশ কেবিনের চা কড়া, গৌরের চা আরও কড়া করে দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে বিস্তর কাঁচা লঙ্কার কুঁচি মেশানো রগরগে গরম অমলেট আর টোস্ট। শালার টোস্টে মাখনের বদলে লাড লাগানো। এইসব খায় গৌর, আর বলে, খেয়ে নে বাবা গৌর, এই শেষ খাওয়া রে। এই অমলেট ভেজেছে মবিল অয়েলে, পাউরুটিতে চর্বি, আর শুকনো চোতরাপাতার ক্বাথ দিয়ে হয়েছে এই চায়ের লিকার, আফিমের জল মিশিয়ে। খেয়ে নে বাবা গৌর, তোর শেষ খাওয়া।

তারপর রুমালে মুখ মুছে মৌরি চিবিয়ে আবার নিজেকে বলে, না বে, মরবি না। তোর ঠাকুদ্দা খেত মুক্তাভস্ম, তোর বাবা খেত স্বর্ণসিন্দুর, তোরা রুপোর গেলাসে জল খেয়ে বড় হয়েছিস। বিস্তর সোনারুপো

মুক্তো হজম করা পেট তোর, সেই পেটের কী করবে রে শালার চোতরাপাতার ক্বাথ, কিংবা চর্বি, কিংবা মবিল অয়েল? সব হজমে দে শালা, সব হজমে দে, যা খাবি সব হজমে দিয়ে বসে থাকবি, কেউ যদি এসে 'বাতাপী' বলে ডাক দেয়। ঘাবড়বার কিছু নেই, বাতাপী আর বেরোবে না।

মিছিলের লেজ ভেসে যাচ্ছে। পিছনে পুলিশের কালো গাড়ি। তারপর রাস্তা ক্লিয়ার। স্টার্ট, গৌরবাবু। মাথাটা সত্যিই ঘুমে ভরে আসছে। ঘুম যেন ঠিক জলের মতো, টল টল করে আর তার মধ্যে নানা টুকরো—টাকরা স্বপ্ন মাছের মতো ঘাই মারে। যখন এরকম হয় তখনই গৌরহরির সামনে উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে নানা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেতে থাকে। গৌর দেখে, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে ট্রাফিক পুলিশটা বুড়িগঙ্গার ধারের সেই কামানটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কখনও বা হঠাৎ গৌর আচমকা ব্রেক চেপে ধরে বলে, আরে সাবাস, এখানকার রাস্তাটা কেটে কবে খাল বানিয়েছে শালারা! তারপর চোখ কচলে দেখে, কোথায় খাল, রাস্তাই তো! কিংবা কখনও বা দেখে সামনের রাস্তায় অনেক রঙিন বল ভাসছে, লোকজন উড়ে যাচ্ছে। রাস্তাটা হঠাৎ যেতে যেতে আকাশমুখো খাড়া উঠে গেছে। ঘুম পেলে গৌরহরির এরকম সব হয়। তখনই দাশ কেবিনের সেই চোতরাপাতার ক্বাথ না হলে, ওরা কি বাস্তবিক আফিঙের জল মেশায় নাকি! নইলে গৌরের এরকম হবে কেন? কলকাতার যেখানেই থাকুক গৌর, একটা না একটা সময়ে, প্রায়ই বিকেলের দিকে ওই অদ্ভুত ঝিমুনি আসতে থাকে তার। আর এলেই পাগলের মতো সে লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তারপর ভোঁ ভোঁ করে চালিয়ে দেয় দাশ কেবিনের দিকে। পৃথিবীর এক এবং অদ্বিতীয় দাশ কেবিন।

ও বাবা পুলুস, ও পুলুসবাবা!—গৌর নরম গলায় বিড়বিড় করে ডাকে, হাতটা একনাগাড়ে তুলে রাখলে যে ভেরে যাবে বাবা। হাতটা একটু নামাও। আমরাও তো যাব বলেই রাস্তায় বেরিয়েছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার পিছনখানা দেখলে তো চলবে না বাবা, গৌরবাবু যে এখনও চা খায়নি, তার যে টিফিন টাইম, রাস্তাটা একটু ছাড়ো বাবা পুলিশ।

অবশেষে ট্রাফিক পুলিশ হাত নামায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তা খুলে দেয়।

আই বাবা পুলুস, তোমার পায়ে পায়ে দণ্ডবৎ। দরগায় শিন্নি, বাবার গির্জেয় মোমবাতি, এই মৌতাতটার সময়ে আর আটকে রেখে মেরো না।

এই ট্যাক্সি।

গেরোর পর গেরো। শালা সার্জেন্ট।

গৌর গাড়ি থামায়। কোমরে পিস্তল—ওলা সার্জেন্টটা এগিয়ে আসে। খামোকা হাত বাড়িয়ে বলে, লাইসেন্স দেখি।

এসব ফালতু বদমাইশি।

কী করতে হবে স্যার, বলুন না।

সার্জেন্টটা ধমক দেয়, বদমাইশির আর জায়গা পান না! শিগগির ওই লাল কাপড় খুলুন। এই ভদ্রলোক পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছেন ট্যাক্সির জন্য। শিগগির খুলুন।

খুলছি পুলুসবাবা, খুলছি। কিন্তু আমার যে টিফিন হয়নি। মিছিলের হুজ্জতে হড়কে গেছে টিফিন টাইম। গৌরবাবু যে হেঁদিয়ে পড়ছে বাবা পুলুস!

গৌর বিড়বিড় করে লাল কাপড় খুলে নেয়। বুড়োমতো লোকটা সবিনয়ে দরজা খুলে গাড়িতে ঢোকে। জানালা দিয়ে মুখ বার করে সার্জেন্টকে বলে, ধন্যবাদ, আপনি না থাকলে কিছুতেই ট্যাক্সি পেতাম না। সবেতে লাল কাপড়। নয়তো মিটার ডাউন। আচ্ছা চলি।

সার্জেন্টটা হাসে তৃপ্তির হাসি। জানালায় ঝুঁকে গৌরকে বলে, ঠিকমতো নিয়ে যাবেন। রাস্তায় যেন আবার ব্রেকডাউন না হয়। আমি কিন্তু নম্বর টুকে রেখেছি।

দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, শালার পুলুস যেন না ছোঁয় গৌরবাবুকে। নিয়ে যাবে, পুলুসবাবা, ঠিক নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন যেন কেমন রাস্তাগুলো খালের মতো লাগে, ঢাকার কামানটা এসে বসে থাকে

চৌরাস্তায়, রঙিন বল ভাসে বাতাসে, মানুষগুলো উড়তে থাকে, রাস্তা উঠে যায় আকাশমুখে খাড়া হয়ে, গৌরবাবুর চায়ের টাইম যে হড়কে গেছে বাবা!

কোথায় যাবেন?

পি জি।—বুড়োটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, তবু ভালো, দক্ষিণে। যদি উত্তরে হত। আর যদি দাশ কেবিন থেকে আরও দূরে কোনও গাড্ডায় বেঘোরে নিয়ে ফেলত বগলাপাতির ব্যাটা গৌরহরিকে, বগলুর পোলা গৌরাকে!

রাস্তাগুলো এমন সব জলে ডোবা, আবছা আবছা, রঙিন রঙিন গোলার মতো বল ছুঁড়ে দিচ্ছে ঢাকার সেই কামান। চৌরঙ্গির ট্রাফিক পুলিশ আড়বাঁশিতে পূরবী ধরেছে, দুটো পা কদমতলায় শ্রীকৃষ্ণের কায়দায় ক্রস করা, চারপাশে মুগ্ধ গাভীর মতো ভিড় করে এগিয়ে আসছে গাড়ির পর গাড়ি, গৌর চোখ মুছে নেয়। কোথায় যেন যাচ্ছে সে? ওঃ হ্যাঁ, পি জি। পিছনের সিটে বুড়োটা আছে তো ঠিকমতো? বুড়ো মানুষদের বিশ্বাস কী! কখন আছে, কখন নেই। সার্জেন্টটা নম্বর টুকে রেখেছে।

গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, আপনি ঠিক আছেন তো স্যার? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

অসুবিধে!—বুড়োটা খ্যাঁক করে ওঠে, অসুবিধে!

গৌর ভারী মুশকিলে পড়ে। সত্যিই তো, অসুবিধে কীসের! ল্যান্ডমাস্টারের গভীর গদি। চারদিকে শরতের রোদ মজা বিউটিফুল বিকেল, চৌরঙ্গির মতো জায়গা দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, তবে আর অসুবিধে কীসের? অসুবিধে যা, তা তো গৌরের। এই শালা রিয়্যালিটির সঙ্গে কে যেন স্বপ্নের ভেজাল দিয়ে দিচ্ছে, চামচে নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছে এমন যে আর আলাদা করা যাচ্ছে না, কোনটা শালার রিয়্যালিটি, আর কোনটা ড্রিম।

সে একটু আমতা আমতা করে বলে, অসুবিধে আর কী! আপনার বয়সটাই যা একটু গোলমেলে। এই বয়সে বুঝলেন, যখন তখন যা তা হয়ে যেতে পারে।

কী রকম!

গৌর একটু ইতস্তত করে বলে, এই কয়দিন আগেও আপনার মতো এক বুড়ো মানুষকে তুলেছিলুম। মাঝরাস্তায় ডাইরেকশন জিজ্ঞেস করতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, ঘাড় লটকে নেতিয়ে আছে। থ্রম্বসিস। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হল, তাই বলছিলুম কোনও অসুবিধে ফিল করলে বলবেন।

পিঁ, পিঁ, প্যাঁ, প্যাঁ গাভীর ডাক। চলো বাবা গৌর, পুলুসবাবা হাত দেখাচ্ছে। চোখে সবুজ মারছে ট্রাফিকের আলো। চলো হে বগলাপতির ব্যাটা পি জি। মনে থাকে যেন সার্জেন্ট শালা নম্বর টুকে রেখেছে, দেবে'খন ঠুকে!

কোথায় যেন যাবেন স্যার!

বললাম যে পি জি!

আই। ঠিক। পি জি। চলো বাবা গৌর। বুড়োর গল্পটা সে সম্পূর্ণ বানিয়ে বলল। এমনিই। আসলে বুড়োটাকে সাবধান করে দিল, যেন তার গাড়িতে বসে হঠাৎ বুড়োর মরার শখ না হয়।

যখন কখনও গৌরহরি একা একা তার ট্যাক্সি নিয়ে বসে থাকে, প্রায়ই দুপুরের দিকে হঠাৎ হঠাৎ তার কেমন অদ্ভুত ব্যাপার সব মনে হয়। মনে হয় পিছনের সিটে একটা মৃতদেহ বসে আছে। মাঝেমধ্যে অনেক রাতে নাইট শো—র ট্রিপ মেরে গ্যারাজ করার সময়ে তার সুস্পষ্ট মনে হয় রাস্তার টালে গাড়ি লাফিয়ে উঠতেই লাগেজ বুটে কী যেন নড়ল। সে যেন এক মৃত মানুষের শরীর। কে যেন কখন অলক্ষিতে মালটি তার ঘাড়ে পাচার করে গেছে। কত দিন এমন হয়েছে। গৌর গাড়ি থামিয়ে সত্যিই লাগেজ বুট খুলে দেশলাই জ্বেলে খুঁজে দেখেছে। খুঁজেছে পিছনের সিটে, মেঝেয়। কোথাও কিছু নেই। তবু মাঝে মাঝে দুপুরে কি নিশুত রাত্রে গাড়ি চালাতে চালাতে তার এই রকম আজও মনে হয়। একটা মৃত লোক বসে আছে পিছনের সিটে ঘাড় লটকে, লটপট করছে দুলুনিতে। কিংবা কারা লোড করে দিয়ে গেছে লাগেজ বুটে হাত

পা বাঁধা ডেডবডি। তখন যে মৌতাতের সময় তা নয়। এমনিতেই সহজ স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছে। গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছে পিছনের সিট। গাড়ি থামিয়ে খুঁজে এসেছে লাগেজ বুট।

তাই গাড়ি চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে গৌর। বুড়োটা বসে আছে বাইরের দিকে চেয়ে। খুব বুড়ো নয় লোকটা, তবু মরার কি কোনও বয়স আছে? মরলেই হল।

গৌর মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, পি জি—তে কী ব্যাপার স্যার! কারও অসুখ?

আমার মেয়ে। ডেলিভারি কেস।

বাঃ বাঃ। কী হল! নাতি না নাতনি?

হয়নি। আজকালের মধ্যেই হওয়ার কথা। পেইন উঠেছে কাল বিকেল থেকে।

আজকালকার বাচ্চা তো! জন্মের আগে থেকেই জ্বালাতে শুরু করে, শেষ জীবন তক জ্বালায়।

আসলে এসব কথার কোনও মানে নেই। খামোখা বলে যাচ্ছে গৌরহরি। তার সন্দেহ, বুড়ো মানুষটা যদি হঠাৎ টেঁসে যায় স্ট্রোক—ফোক হয়ে, আর সে হয়তো টেরও পেল না, ওদিকে সার্জেন্টের কাছে তার নম্বর টোকা, তাই কথায় কথায় সে বুড়ো মানুষটার বেঁচে থাকার প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকে।

গাড়িটা সে কিনেছিল এক পাঁইয়ার কাছ থেকে। সেই পাঁইয়ার কাছেই গাড়িটার দোষ ধরেছিল। কোনও অপঘাত ঘটেছিল গাড়ির মধ্যেই। তারপর থেকেই এ গাড়িতে একটা ভৌতিক ব্যাপার চলেছে। কেবলই ওই মৃতদেহ টের পায় গৌর। শালার পাঁইয়া পোড়ো গাড়ি ঠকিয়ে বেচে গেল ন' হাজারে, কিনল বগলুর পোলা গৌরা।

ডজটা পেলে এসব ঝামেলা হত না। সেটাতেই সে শিখেছিল গাড়ি চালানো।

হরিপদ চলে যাওয়ার পর বাবা বগলাপতি ছেলে গৌরহরিকে দেড়শো টাকায় সোফার রাখলেন। গৌর আপত্তি করল, হরিপদ তো রাত্রে থাকত না। আর আমি চব্বিশঘণ্টার ড্রাইভার।

শালার টনটনে বুদ্ধি দেখ! আচ্ছা যা, একশো পঁচাত্তর পাবি, তার বেশি কিছুতেই না। বলেছিলেন বগলাপতি, বগলু, গৌরের বাবা।

গৌর একশো পঁচাত্তর পেত, প্লাস খাওয়া—দাওয়া, জামা—কাপড়, ঘরদোর। মা কেবল দুঃখ করে বলত, এ রকম কাণ্ড জন্মে শুনিনি, ছেলে নাকি বাবার চাকরি করে!

বাবা বগলাপতি বলত, তবুও তো বাবার চাকরি করে। তাতে মানসম্মানের হানি হয় না। যা ছেলের সুরত তোমার, অন্য জায়গায় হলে কী কাণ্ড যে হত!

তা গৌর গাড়ি চালাত। বাবাকে নিয়ে যেত এখানে সেখানে। ব্যবসাপত্রের নানা ধান্ধায় ঘুরতেন বাবা। আস্তে আস্তে জমিয়ে নিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে তাকে ডেকে বলতেন, তোর হাতে গাড়ি থাকলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বেশ তো চালাস রে! অ্যাঁ! বেশ তো হাত তোর! দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছিস কলকাতার রাস্তাঘাটে। অ্যাঁ! পাকা হয়ে গেছিস বেশ।

এ সবই গ্যাস। গৌরহরি বুঝত। কেননা পিছনের সিটে বসে বাবা বিস্তর টাকাপয়সার লেনদেন করতেন নানা পার্টির সঙ্গে। গোছা গোছা নোট বেহাত হত। আসত তার বাবার পোর্টমান্টোতে। খুশি হত গৌর। বড়দা কেটেছে। এখন যা আসবে একদিন তার অর্ধেক বখরা পাবে সে, যদি না ইতিমধ্যে মেজদাও কাটে। গৌর সেইসব টাকাপয়সার হিসেব বুঝত না। কিন্তু ছোট্ট আয়নাটা দিয়ে টাকার ছবি সে দেখেছে বিস্তর। বাবা বগলাপতি সেটা বুঝতে পেরে গৌরকে অন্য কথায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু গৌর তখন টাকা চিনেছে। অঙ্কের হিসেব না বুঝলেও এটুকু জানা ছিল যে টাকা নিয়ে বিস্তর কাজ হয়। টাকার শক্তি অসম্ভব।

তাই সে মাঝে মাঝে বাপ বগলাপতির দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হাসত। একটু টেরছা হাসিটি, চোখদুটি মিটমিট করত, গরগরে একটা শব্দ হত গলায়। এইসব দেখে বগলাপতি সাবধান হয়ে যেতেন। বলতেন, এ সবই তো তোদের জন্য। বড়দা উচ্ছন্নে গেল, এখন তোদের দুটোকে যদি একটু রেখেটেখে যেতে পারি।

গভর্নমেন্টের কন্ট্রাক্টর বগলাপতি। তখন বিস্তর বালি মেশাচ্ছেন সিমেন্টে। না মিশিয়ে উপায়ও নেই। গভর্নমেন্টের লোকেদের খাওয়াতে খাওয়াতে কিছুই থাকে না প্রায়। বগলাপতি ব্যবসা জানতেন হাতের উলটোপিঠের মতো। কলকাতার বাজার ছিল নখদর্পণে। কোন মালের কত স্টক আছে বাজারে, কতদিনের মধ্যে সেই মালের চালান আর আসবে না, এসবই প্রাচীন কবিরাজের নাড়িজ্ঞানের মতো টনটনে ছিল তাঁর। একবার ইচ্ছে করেই একটা মালের টেন্ডারে উঁচু রেট দিলেন। তারপর বাজারের সব মাল কিনে মজুত করলেন গুদামে। তারপর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন আপনমনে। আয়নায় গৌরহরি সেই হাসি দেখত। মাঝে মাঝে আপনমনে বলতেন, বুঝলি গৌর, মালটা বছর খানিকের মধ্যে আর আসছে না বাজারে। গৌরকে সম্বোধন করে বলা, কিন্তু আসলে বলা নিজেকেই। টেন্ডার বগলাপতি পেলেন না বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে পেল সে বাজার ঘুরে মাথায় হাত দিয়ে বসল। গভর্নমেন্টের কন্ট্রাক্ট, সিকিউরিটির টাকা জমা দেওয়া আছে, পিছোবার উপায় নেই, ওদিকে মাল নেই এক কণাও। মাল কোথায়! মাল কোথায়! লোকটা যখন পাগল পাগল, ঠিক সেই সময় বগলাপতি তার কাঁধে হাত রাখলেন, আছে, মাল আছে। তবে লোকসানে তো দিতে পারি না। এটা আমার রেট। বলে রেট দেখালেন। লোকটা ডজ গাড়ির পিছনের সিটে বসে বগলাপতির পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে বলল, দাদা, আর একটু কমান। আমি যে গভর্নমেন্টকে ওর চেয়ে চার আনা কম রেট দিয়েছি। লাখ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট, এত লস হলে চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাব। বগলাপতি হাসেন, তবু তো জেল থেকে বাঁচবে! অবশেষে বগলাপতি রেট কমিয়েছিলেন। লোকটা প্রতি ইউনিটে দু'পয়সা ক্ষতি করে মাল নিল। বগলাপতি কয়েক লাখ কামালেন। একা একা পিছনের সিটে বসে গৌরকে ডেকে বললেন (আসলে নিজেকেই বলা), বুঝলি গৌরা, বাঘকে যদি ধরতে না পারিস, ঘোগকে ধরিস। বাজারটাকে হাতের মুঠোয় না রাখলে কি ব্যবসা চলে?

গৌরের মাইনে বেড়ে দুশোয় দাঁড়াল। সে সারাদিন গাড়ি নিয়ে থাকত। ইঞ্জিনটা সে খুব ভালো চিনত, যেমন বাজার চিনতেন বগলাপতি। ইঞ্জিনের একটু সর্দিকাশি, একটু ফ্যাঁস শব্দ থেকেও গৌর তার গোলমাল বুঝে নিত। সারাদিন সে গাড়িখানার পিছনে খাটত। মাটিতে শুয়ে ইঞ্জিনের তদবির করত সারাদিন। গাড়ি ধোয়াত, মুছত। ঝকঝকে রাখত সবকিছু। বগলাপতি দূরে দাঁড়িয়ে ঘাড় এধারে ওধারে কাত করে পুরনো গাড়িখানার শোভা দেখতেন। আর বলতেন, বাহাঃ রে গৌর, বাহাঃ! প্রশংসাটুকু খুব উপভোগ করত গৌরহরি। এতদিন বাদে সে এমন একটা কাজ পেয়েছে যে কাজ তার উপযুক্ত। যে কাজ তাকে মানায়। সে তাই জান লড়িয়ে দিয়েছিল। ওই গাড়িখানার যত চমক—ঠমক ততটাই তার হাতযশ ততটাই তার গুণ। গৌরহরি পুরনো ডজখানাকে জড়িয়ে ধরে লতিয়ে উঠেছিল। সে যখন গাড়ি চালাত তখন মন—প্রাণ দিয়ে। কোনওদিন তার হাতে গাড়ি ঘষাটাও খায়নি। স্টিয়ারিং—এ বসলেই তার হাত পা মগজ চোখ সব ধীরে ধীরে অধিকার করে নিত গাড়ির যন্ত্রপাতি। সে হয়ে যেত গাড়িটা স্বয়ং। তখন গৌরহরি না গাড়ি, তা বোঝাও যেত না।

তা গৌরহরি মাঝে মাঝে গাড়ি হয়ে যায়। তখন আর সে মানুষ থাকে না। ভুলেই যায় যে সে গৌরহরি, বগলাপতির ব্যাটা, অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা।

বগলাপতি তখন স্টোরিং এজেন্ট। বিস্তর ঝামেলার কাজ। অনেক বখেরা। ঠিকমতো চালাতে পারলে লাভও বিস্তর। বগলাপতির তখন হাই—ব্লাডপ্রেশার। সহায়—সম্বল বলতে হাফ—ফিনিশ গৌরহরি আর কর্মচারীরা। মেজো ছেলে রাখোহরি বিলেতে যা পড়তে গিয়েছিল তা শেষ না করে আর একটা কী পড়তে লেগেছে। আসলে পড়ার নাম করে বাপের পয়সায় ফালতু কিছুদিন বিলেতে থেকে যাওয়া। ইতিমধ্যেই সে টাকার বরাদ্দ কয়েকবার বাড়িয়ে নিয়েছে। ফুর্তি লুটছে খুব। বড় ছেলে থাকোহরি সে সব কথা মাঝে মাঝে জানাত। সে নিজেও ফুর্তি লুটেছিল। তাই রেখে—ঢেকে লিখত। যেটুকু লিখত না বুদ্ধিমান বগলাপতি আন্দাজ করে নিতে পারতেন। গভর্নমেন্টের স্টোরিং এজেন্সি পেয়ে বগলাপতি যখন ফ্যাসাদে পড়লেন তখন বিস্তর পয়সা খরচ করে তার করলেন মেজো ছেলেকে গৌরহরির নামে, ফাদদার সিক, কাম শার্প।

রাখোহরি চলে এল। পুরোদস্তুর সাহেব। বিলেতে সে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট শিখেছে কয়েক বছর। পাস করেনি, কিন্তু যা পড়েছে তার দাপটেই ম্লান হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বিশাল জাল ছড়াল চারদিকে। আসলে জালটা টাকার। রাখোহরির বুদ্ধিটা যে খুব খারাপ ছিল তা নয়। অমনিতে সে ছিল মিষ্টভাষী, বিনয়ী এবং ছোটখাটোর মধ্যে সুপুরুষ, নেভি ব্লু স্যুট আর বো পরলে তাকে বড় সুন্দর দেখাত। কতবার ফার্পো কি গ্র্যান্ড কি মোকাম্বোর পার্টিতে ডজে চড়িয়ে তাকে নিয়ে গেছে গৌর। অল্প ক'দিনেই গৌর রাখোহরির ভক্ত হয়ে পড়েছিল। রাখোহরির যোগাযোগটা ছিল মিনিস্টার আর সেক্রেটারিদের লেভেল—এ। অল্প কয়েকদিনেই সে এজেন্সির ব্যাপারে বিস্তর সুবিধে আদায় করে নিল। তার পক্ষে এবং পিছনে বড় বড় মহারথী দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যাদের সঙ্গে দৈনিক কাজ—কারবার সেইসব ইন্সপেক্টর, ঠিকাদার, দারোগা ইত্যাদিকে একদম গ্রাহ্য করত না সে। তাদের ওপর দিয়ে চলত। রাখোহরির বিশাল বিশাল লোকের সঙ্গে ভাব দেখে তারাও সহ্য করত মুখ বুজে। বগলাপতির আমলে তারা কিছু পয়সাকড়ি রোজগার করেছিল, রাখোহরির আমলে দেখা দিল উলটো, তাদের চাকরির ভয়। কিংবা বদলির। বগলাপতি রাখোহরিকে বোঝানোর চেষ্টা করত, বাবা, এরা সব খুদে দেবতা, এদেরই সঙ্গে কাজ কারবার, এদের একেবারে পায়ে ঠেলো না। মিনিস্টার, সেক্রেটারির বদল হয় কিন্তু এদের হয় না। কারবারে ঘুরেফিরে এদের সঙ্গেই দেখা হবে। ছোট মানুষ সব, তোমাকে ভয়ও পায়, কিন্তু জোট বাঁধলে তোমাকে আমাকে দেশছাড়া করবে। রাখোহরি তখন গরম। বাপের টাকায় তখন ব্ল্যাঙ্ক চেক কেটে দেওয়া আছে তার নামে। স্টোরিং—এ বিস্তর ডিমারেজ দেখিয়ে সে মাল পাচার করছে। ইন্সপেক্টর, ঠিকাদার, দারোগা সবাই হাঁ করে দেখছে। সবাই ওরকম করে, কিন্তু তারা ভাগ পায়, রাখোহরির আমলে তাদের ভাগ নেই। রাখোহরি ফুড স্টোরিং—এর প্রায় একরারনামা পেয়ে গিয়েছিল! অ্যান্টিকরাপশান তার পিছনে ঘোরে, তার নামে রিপোর্টও যায়। কিন্তু তা সব চাপা পড়ে থাকে। বগলাপতি নীরবে একা ঘরে বুক চাপড়ান। রাতারাতি উন্নতি দেখে তিনি ভেঙে পড়েন, আর বলেন, বুঝলি গৌরা, ভিত না গেঁথে বাড়ি উঁচু করার অনেক বিপদ। ভিতটাই যে কাঁচা। এ ছেলেটা যে বোঝেই না দারোগাকে খাতির করা দরকার। ইন্সপেক্টরকেও পান—তামাক দিতে হয়। আমরা ছেলেবেলা থেকে এসব শিখেছিলাম। বিপদে—আপদে এরা যে কত কাজে আসে।

রাখোহরি তখন একটার পর একটা কন্ট্রাক্ট নিচ্ছে। প্রায় সবই সরকারি। তখন আলাদা মেজাজে চলে। কিন্তু তখনও ডজ গাড়িটার বশংবদ ড্রাইভার হয়ে পরমানন্দে গাড়িখানা চালায় গৌরহরি। সে উন্নতি ভালো বোঝে না, কেবল আনন্দ বোঝে। রাখোহরি যখন মোকাম্বোর ভিতরে স্বপ্ন—আলোয় নাচে গায়, গ্র্যান্ডে পার্টি দেয়, তখন গৌরহরি সযত্নে পালকের ঝাড়নে ডজ গাড়িখানা বার বার মুছছে আর মুছছে। ওই তার আনন্দ, সুখ, সম্পদ। অল্প একটু মাতাল হয়ে বেরিয়ে আসে রাখোহরি, ইংরিজিতে কথা বলে বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে, বিদায় নেয়। গৌরহরি গাড়ির দরজা খুলে ধরে থাকে। সযত্নে গাড়ি চালিয়ে রাখোহরিকে নিয়ে আসে। বগলাপতি জেগে অপেক্ষা করে থাকেন। গৌরহরিকে ডেকে রাখোহরির গতিবিধির খবর নেন, ব্যবসাপত্রের অবস্থা বুঝাবার চেষ্টা করেন। গৌরহরি বুঝতে পারে, একটা গোলমাল পাকাচ্ছে। কিন্তু সেটা কেমন গোলমাল তা তার মাথায় আসে না, সে যা দেখে তাই বলে দেয় বগলাপতিকে। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকেন। মাঝে মাঝে বলেন, বড়গাছে নৌকো বাঁধবার চেষ্টা। গৌরা, এবার তোর জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করতেই হচ্ছে। সবংশে রাখোহরি যদি ডোবায়, তুই কেন মরবি? তুই আলাদা ব্যবস্থা করে নে। তোর জন্যই রাতে আমার ঘুম নেই।

পি জি—তে গাড়ি ঢোকাল না গৌর। বাইরেই ছেড়ে দিল বুড়ো লোকটাকে। লোকটা খুব সাবধানি। ভিতরের পকেটে হাত চালিয়ে নোট বের করল, ঝুলপকেট থেকে খুচরো। যা ভাড়া টায়ে—টায়ে তা—ই দিল, খুচরো ফেরতের কোনও ঝামেলা রাখল না। একজ্যাক্ট ফেয়ার। বাহাঃ রে বাহাঃ!

স্যার, ওই সার্জেন্ট কি আপনার কেউ হয়? হলে নম্বরটা কেটে দিতে বলবেন। আমি তো ঠিকমতোই পৌঁছে দিয়েছি আপনাকে! দিইনি?

বুড়োটা খ্যাঁক করে ওঠে, সার্জেন্ট আমার বাবাকেলে আত্মীয় হয় আর কি! নম্বর টুকেছে তো আমি কী করব? তোমাদের বদমাইশি কে না জানে? দেয় যদি ঠুকে তো ঠিকই করবে। উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার। লোকে বিপদের সময়ে ট্যাক্সি পায় না, আর তোমরা নানা কাজে ট্যাক্সি ভাড়া খাটাও। গভর্নমেন্টের পুষ্যিপুত্তুর সব!

বুড়োটা বকবক করতে করতে কাটল।

শালা! গৌরবাবুর টিফিন টাইম হড়কে দিয়ে আবার গরম খাওয়া হচ্ছে!

শালার ওই সার্জেন্ট না ধরলে গৌরবাবু কবে পিছলে বেরিয়ে যেত, তখন কী করতে বাবা বুড়ো মাল!

বিড়বিড় করতে করতে গৌরহরি আবার লাল কাপড়ে তার মিটার বাঁধে। একটা মেয়েছেলে দূর থেকে আঙুল দেখাচ্ছে, এই যে, এই ট্যাক্সি!

আর না বাবা। আরনা। এবার দাশ কেবিন। সোজা নাক বরাবর। একচুল এধার ওধার হয়েছে তো গৌরহরির নামই গৌরহরি নয়। কারও সার্ভেন্ট নাকি বগলাপতির ছেলে? অ্যাঁ! তোমাদের পকেট গরম বাবা, সেতো বুঝতেই পারছি। মাসের প্রথম দিকটা তো, জানি। কিন্তু বাবা, আমি কারও পয়সায় কেনা চাকর নই। এই ল্যান্ডমাস্টার এখন প্রাইভেট প্রপার্টি। বগলাপতির ডজ গাড়িটার মতো। হ্যাঁ, আলবত, লাল কাপড়ে মিটার ঢাকার পর এখন এটা আমার প্রাইভেট। ফোটো সবাই, ফুটে যাও সব সোয়ারি। গৌরবাবুর টি—পার্টি আছে দাশ কেবিনে। ছাড়ো রাস্তা।

বদর—বদর। দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, বাবা পুলুসে যেন আর না ধরে। পুলুসে ধরলে আঠারো ঘা।...অই দ্যাখো, শালাদের কারবার। রসা রোডটা বেমালুম গায়েব করে দিয়ে নদী বানিয়েছে! কেমন ঢেউ দিচ্ছে দেখো। কেমন কুলকুল শব্দ ঢাকার বুড়িগঙ্গার মতো। দোতলা একতলা স্টিমলঞ্চ যাতায়াত করছে দিব্যি। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে জল—পুলুস। লাল—নীল সবুজ বলগুলো উড়ে আসছে, উঠছে নামছে। দু'—একটা এসে ধীরে ধীরে বসল গৌরবাবুর গাড়ির বনেটে। সেই বুড়ো লোকটা উড়ে আসছে পি জি হাসপাতালের দিক থেকে, চেঁচিয়ে বলছে, এই ট্যাক্সিওলা, আট আনা পয়সা বেশি চলে গেছে ভাড়ার সঙ্গে, পালিয়ো না, নম্বর টোকা আছে, সাবধান!

গৌর চোখ কচলে নেয়, কেমন ঘুমের আঁশ জড়িয়ে আছে চোখে। মাথার মধ্যে রিমঝিম শব্দ। ঠাহর করে সে রাস্তাঘাট বুঝবার চেষ্টা করে। নাঃ, রসা রোড রসা রোডের মতোই দেখাচ্ছে আবার। কেবল ওই রঙিন বলগুলো ঝামেলা করছে। উড়ে উড়ে আড়াল করছে উইন্ডস্ক্রিনটা, ওই তো পুলিশটার কাঁধে একটা নীল বল চেপে বসল।

নাঃ, ওটা গ্রিন লাইট। চলা হে গৌরবাবু।

গৌর তার খুদে ল্যান্ডমাস্টার একটা ডবলডেকারের গা ঘেঁষে উড়িয়ে নিল। দাশ কেবিন। আফিং মেশানো চোতরাপাতার ক্বাথ না হলে আর এখন গৌরবাবুর নার্ভ কাজই করবে না, পুরোটা ব্রেক ডাউন হয়ে বডি পড়ে যাবে।

গৌড় ওড়ে। সত্যিই ওড়ে। তার স্পষ্টই মনে হয়, মাটির ছ'ইঞ্চি ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে তার গাড়ি, রাস্তার টালগুলো আর চাকায় লাগছে না। ভারী ভালো লাগে গৌরহরির। নিরন্তর রাস্তা আঁকড়ে চলতে কাঁহাতক ভালো লাগে রোজ? মাঝে মাঝে এই উড়ে যাওয়া কীরকম ভালো! গৌর খুশিতে শিস দেয়। তার গাড়ি উড়ছে, উড়ে যাচ্ছে।

সামনের আয়নাটা ঠিক করে নেয় গৌর। পিছনের ফাঁকা সিটটা নজরে রাখে। শালার ডেডবডিটা আছে ওখানে ঠিকই। কেবল সবসময়ে ওটাকে ঠাহর করা যায় না এই যা। মগন সিং—এর কাছে যখন ছিল তখনই শালা কোনও হুজ্জতে গাড়িটার গ্রহদোষ ঘটে গেছে। সেই অপঘাতের মড়া এখন সবসময়ে বসে

আছে পিছনের সিটে। নয়তো নড়ছে লাগেজ বুটে। নড়বি ত নড় শালা, আমার কী! আমি তোরটা খাই, না পরি! আমি হচ্ছি গে বগলাপতির অর্থাৎ কিনা বগলুর ছেলে গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা গৌরা। আমি শালা কার সার্ভেন্ট। লাল কাপড়ে মিটার ঢাকলেই এ আমার প্রাইভেট প্রপার্টি। এই দেখ, আমি গৌরা, নিজের প্রাইভেট গাড়িতে চলেছি দাশ কেবিনে। চা খাব। তুই মরা মানুষ, মরা মানুষের মতো থাকবি, নো ইন্টারফিয়ারেন্স। মড়াদের সঙ্গে জ্যান্তদের নো বিজনেস। মাগনা ট্যাক্সি চড়ছিস, এই ঢের। খবরদার যদি গৌরবাবুকে কখনও ভয় দেখিয়েছিস!

ভবানীপুর, কালীঘাট পেরিয়ে গেলে দাশ কেবিন আর খুব দূরে নয়। তবু, দেয়ার আর মেনি এ স্লিপস। ফুটপাথে রং—বেরঙের মানুষের ভিড়। খালি ট্যাক্সি দেখলেই শালারা হাত ওঠায়। মোড়ে লালবাতিতে দাঁড়িয়েছ কি, যেতে চাও বা না চাও, দরজা লক করা না থাকলে নিজেরাই খুলে ঢুকে পড়বে। একশো কারণ দেখালেও কাকুতি—মিনতি করতে থাকবে, বড় দরকার দাদা, একটু কাইন্ড হয়ে নিয়ে যান। বাড়তি পয়সা দেব। দেখছেন তো সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে। গৌর খেয়াল করে চলতি গাড়িতেই পিছনের দরজা দুটো হাত বাড়িয়ে লক করে দিল। এখন দাশ কেবিন ছাড়া কোথাও যবে না গাড়ি। কেবল যদি ধরে বাবা পুলুসে তকে অন্য কথা। পুলিশকে বরাবর ডরায় গৌরহরি, যেমন ডরাত তার বাবা বগলাপতি। কত দারোগা যে তাদের বাড়িতে পাঁঠা খেয়ে ঢেকুর তুলে আশীর্বাদ করে গেছে। গৃহদেবতার মতো তাদের খাতির ছিল। যেদিন দারোগা খেত, সেদিন বগলাপতির ছিল সকাল থেকে বাঁধা উপোস। সেই সব ভয়—ভীতি থেকেই তাদের উন্নতি। সেটা কোনওকালে বুঝল না রাখোহরি। সে এসে দারোগাদের দাবড়তে লাগল, ইন্সপেক্টরদের সঙ্গে চাকর—বাকরের মতো ছিল তার ব্যবহার। এই যেমন এখন গৌরহরির গাড়িখানা উড়ছে, ঠিক তেমনই উড়ত রাখোহরি। পুরনো দারোগা সমাদ্দার মাঝে মাঝে বগলাপতির কাছে দুঃখ করে যেত, তোমার ছেলের কাছে আর আমাদের পদমর্যাদা বলে কিছু রইল না হে বগলা। বগলাপতি তাকে হাত কচলে বলতেন, ও আমার ছেলে না। আমার রক্তের ধাতই নয়। ও ব্যাটা পেয়েছে ওর মামাবাড়ির ধাত। আমার শ্বশুরবাড়িটার ওই দোষেই কিছু হল না। ও শালা ওর মায়ের ছেলে, আমার না।

চুলকে ঘা করা। রাখোহরি তাই করেছিল। তার দূরের খুঁটির জোরে সে আশেপাশের সবাইকে মাটির ঢেলার শামিল করে দিয়েছিল। চুরি—চামারি যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। বাড়িতে এল রেডিয়োগ্রাম, রেফ্রিজারেটার, বগলাপতির ঘরে লাগানো হল এয়ারকুলার। তারপর ডজ গাড়িটা বেচতে চেষ্টা করতে লাগল রাখোহরি।

সেবার উত্তরবাংলায় বন্যার পর স্টোরিং এজেন্টদের খুব রবরবা দেখা দিল। হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য মজুত হতে লাগল এজেন্টদের মারফত। রাখোহরির ছোটাছুটি গেল বেড়ে। সে কেবল গুদাম ভাড়া করে, আর মজুত করে মাল। লোডিং আনলোডিং—এর দরুন শস্যের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার একটা হিসাব ধরে শস্যের পরিমাণ বাদ দেয় সরকার। ধরে—করে সেই পরিমাণটা বাড়িয়ে নিয়েছিল রাখোহরি। সেটা ছিল হাতের মুঠোর আইনসঙ্গত ইনকাম। তার ওপর কমিশন আর হ্যান্ডলিং। এইসব নিয়ে রাখোহরি যখন ভীষণ ব্যস্ত তখন একদিন বগলাপতি গৌরহরিকে ডেকে পুরনো ডজ গাড়িটা বের করতে বললেন। তারপর সাজ—পোশাক পরে বেরোলেন। গৌরহরি গাড়ি চালিয়ে দিল। না, পুরনো ব্যাবসাপত্রের জায়গায় আর গেলেন না তিনি। তাঁর নির্দেশে গাড়ি এসে থামল মগন সিং—এর গ্যারেজে। সেইখানেই ল্যান্ডমাস্টারখানা ছিল। প্রথমদিককার মডেল, খুব চালু গাড়ি। বগলাপতি ন'হাজারে কিনলেন গাড়িখানা। গৌরকে ডেকে বললেন, বুঝলি গৌরা, তোকে যা দেব ভেবেছিলাম তা আর বুঝি হল না। তা এই গাড়িখানা দেবই, এটায় তোর সারা জীবন চলে যাবে হয়তো বা, যদি ভাগ্যে থাকে। রাখোহরি সর্বনাশ আনল বলে। তা তুই অবোধ প্রাণী, সে গর্দিশে তোর কষ্ট পাওয়ার দরকার কী? যার যেমন গুণ তার তেমনি প্রাপ্য হওয়া উচিত। তোকে লাখ টাকা দিলেও তো গুনে—গেঁথে হিসেব করে চলতে পারবি না। ওই রাখোহরিই তোর মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে

নেবে। তার চেয়ে এই ট্যাক্সিখানা চালা। চালাবিও ভালো, থাকবি আনন্দে, খেয়ে—পরে। খুব বেশি লোভ—টোভ করিস না বাবা।

তারপর সেই গাড়ি সাদা—হলুদ রং করে, সিট—টিট পালটে, মেরামত কর, কালীঘাটে নিয়ে মায়ের পুজোর ফুল—সিন্দুর ঠেকিয়ে লাইসেন্স পারমিটের ঝামেলা মিটিয়ে একদিন ট্যাক্সি হয়ে রাস্তায় বেরোল। মা দৃশ্য দেখে বুক চাপড়ালেন, ছেলেটাকে চাকরের অধম করেছ। এতদিন ছিল ড্রাইভার, তাও না হয় বুঝতাম। এখন কিনা ট্যক্সিওয়ালা।

দূরদর্শী বগলাপতি কপালে ভাঁজ ফেলে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, লজ্জার কী! এখন ওর স্বাধীন ব্যবসা। ওর যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী ওকে স্বাধীন করে দিলাম। এখন ও নিজেকে চালিয়ে নিতে পারবে। ভাইদের হাততোলা হয়ে থাকলে আমাদের চোখ বুজবার পর ও সত্যিই চাকর—বাকর হয়ে যেত। বাপ—মা মরলে ভাইতে আর তালুইতে তফাত কী?

মা তবু ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলেন, তা দিলেই যদি তবে নতুন আর ভালো গাড়ি দিলে না একখানা? বিশ—ত্রিশ হাজার টাকার দামি গাড়ি হলেও না হয় বুঝতাম!

দূরদর্শী বগলাপতি আবার কপালে ভাঁজ ফেলে কী একটু ভাবেন, তারপর বলেন, সামনে বড় দুর্দিন, বুঝলে বড় বউ! সেই দুর্দিনে একখানা দামি গাড়ি যদি গৌরের কাছে থাকে তবে রাখোহরি কি ছেড়ে দেবে? সেটা একটা অ্যাসেট বলে কেড়ে নেবে হয়তো বা। তা নতুন ল্যান্ডমাস্টার একটা দিতে পারতাম বটে, কিন্তু তার জন্য বসে থাকতে হবে। এই বয়সে এখন আর আমার দেরি সইছে না। নতুন না হোক গৌরাই জানে যে গাড়িখানা খুব চালু, পচামাল দিয়ে ওকে ঠকাইনি। আমারই তো ছেলে, ওর ভবিষ্যৎ ভেবেচিন্তে ঠিক জিনিসখানাই দিয়েছি, এখন ইবলিশের বাচ্চা নিজের কপাল যদি নিজে না ভাঙে তো সংসারে চালু থাকবে।

দক্ষিণের রাস্তাগুলোই ভালো। না আছে মিছিল, না জ্যাম। পুলিশও নয় নর্থের মতো টিকরমবাজ। গৌরহরি ট্যাক্সির মিটার ঢেকে এখন মালিকের মতো গাড়ি চালাচ্ছে। মিটার খুললেই ট্যাক্সিওয়ালা। মিটার ঢাকলেই গৌরবাবু। তার ঘুমটা এখন মাথা থেকে বেরিয়ে একটা মাছির মতো চারধারে ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। সুযোগ পেলেই আবার ঢুকে পড়বে মাথায়। অমনি আবার আবছা হয়ে যাবে রাস্তাঘাট, রিয়্যালিটির সঙ্গে ড্রিম মিশে যেতে থাকবে। সেইসব বল ওড়াউড়ি করছে। ধীর গতিতে গড়াচ্ছে, ভাসছে, এসে বসছে বনেটের ওপর। মাঝে মাঝে সামনের রাস্তা উঠে যাচ্ছে উঁচুতে। এক—আধজন মানুষ চলতে চলতে হঠাৎ উড়ে যাচ্ছে কোথায়! ভুস করে। ঠিক থাকো গৌরবাবু, ঠিক থাকো। আর একটু দূরেই দাশ কেবিন। এইতো প্রায় এসে গেছি বাপধন। আর একটু মাথাখানা পরিষ্কার রাখো তো বগলুর ছাওয়াল।

পিছনের সিটে মচ করে একটা শব্দ হয়। পরিষ্কার শব্দ। কোনও ভুল নেই। গৌরহরি আয়নায় চোখ রাখে। ওই শালা ডেডবডিটা। বস্তুত ডেডবডিটাকে দেখা যায় না কখনও । কিন্তু শালা আছে ঠিকই। যখনই গৌর গাড়িতে একা তখনই শালার নড়াচড়া শুরু হয়। বিনা পয়সার সোয়ারি শালা, ধরতে পারলে ঘাড় ধরে ঝাঁকার দিত গৌর। বগলুর ছাওয়ালের সঙ্গে চিটিংবাজি। শালা ডাকটিকিটের মতো অন্যের জিনিসে সেঁটে থাকা। কিন্তু ওই একটা অসুবিধে। জ্যান্তদের সঙ্গে তবু ট্যাকল করা যায়, যতই জাঁহাবাজ হোক। কিন্তু মড়াগুলোকে কিছুতেই কিছু করা যায় না। এই ডেডবডিটাকে আজ পর্যন্ত কিছু করতে পারল না গৌর। শালা বগলুর ব্যাটাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে দিব্যি ল্যান্ডমাস্টারখানা বিনিপয়সায় ভোগ করে যাচ্ছে। দেখছে কলকাতা। ফোর টুয়েন্টি কোথাকার!

বিস্তর হাত উঠছে ভিড় থেকে তার ল্যান্ডমাস্টার লক্ষ্য করে। লোকে চেঁচাচ্ছে, ট্যাক্সি, ই, ই,

মাছিটা ভোঁ ভোঁ করে উড়ছে মাথার আশেপাশে। এক্ষুনি নাক কি কানের ফুটো দিয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। গৌর বিড়বিড় করে, আর একটু বাবা গৌর, আর একটু। শালারা ভেবেছে ভাড়ার গাড়ি। দেখছে না শালা যে লাল কাপড়ে মিটার ঢেকেছি! এখন শালা এ গাড়ি আমার প্রাইভেট। ওই ডেডবডিটা ছাড়া আর কোনও সোয়ারি নেই। এখন আমি ফ্রি। এখন আমার টিফিন টাইম।

ফাদার ফ্রান্সিস যখন খেলা শেখাত, তার সঙ্গে শেখাত উচ্চারণও। সেন্ট অ্যান্টনিজ—এর ঘেরা মঠে ফাদার ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে ডাকত, হে গৌরঅরি, ফ্যাস দি বল।

গৌর চেঁচিয়ে বলত, পাস দি বল।

সে ফ্যাস ফ্যাস, নট পাস।

গৌর হেসে কুটিপাটি, ফ্যাস ফ্যাস, আই ওনট ফ্যাস দি বল ফাদার, আই উড লাইক টু পাস।

ডুষ্টু ছেলে গৌরঅরি, অ্যাও, বালো ওবে না।

আই! অবিকল ফাদার ফ্রান্সিস লাল নীল বলগুলোকে ঠেলে দিচ্ছেন এধার ওধার। সারা চরাচর জুড়ে ভাসছে সেইসব রঙিন গোলা। ফাদার চেঁচিয়ে বলছেন, এই গৌরঅরি, ফ্যাস ইট, ফ্যাস ইট।

আই ফাদার,—গৌরহরি বিড়বিড় করে, আই উড লাইক টু ফ্যাস ইট ফাদার। আই উড ভেরি মাচ লাইক টু—

ফাদার ফ্রান্সিস চরাচর জুড়ে খেলা করেন। তাঁর সঙ্গে খেলে স্বপ্নের শিশুরা।

উড়ন্ত মানুষেরা বল ধরে এগিয়ে দিচ্ছে ফাদারের পায়ে। গৌরের গাড়ি আবার মাটি ছেড়ে উড়তে থাকে। গৌর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা লাল বল ধরার চেষ্টা করে। পারে না। হেসে গড়িয়ে পড়েন ফাদার, গৌরঅরি, অ্যাও গৌরঅরি, গুড ফর নাথিং!

রাসবিহারীর মোড়ে তার গাড়ি আবার মাটিতে নামে ঝং করে। গৌরহরি চমকে ওঠে। চমকায় পিছনের সিটের সেই ডেডবডি।

গৌরের জানালায় দুটো মুখ ঝুঁকে পড়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, যাবেন দাদা! আমরা বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

দেখছেন তো মিটার ঢাকা রয়েছে।

একটু দয়া করুন।

দয়! কীসের দয়া! কোন পুলুসটা দয়া করে বগলুর ব্যাটাকে! কোন ম্যাজিস্ট্রেট! কোন সোয়ারি কথা না শুনিয়ে ছাড়ে! অ্যাঁ! পুলুস ডেকে যখন ট্যাক্সি ধরে, তখন! না, হবে না। কে বলেছে এটা ট্যাক্সি? এটা গৌরবাবুর প্রাইভেট।

দাশ কেবিনে কি পৌঁছনো যাবে শেষ পর্যন্ত? কে জানে! রাস্তাটা যে অফুরান লাগছে গৌরহরির। এখনও মনে হচ্ছে হাজার হাজার মাইল রয়ে গেছে। মোড়ে জ্বলছে লালবাতি, গৌর যে আর পারে না, বগলুর পোলার প্রাণটা যে গেল! দাশ কেবিনের সেই চোতরাপাতার ঘন ক্বাথটি, যার নাম কিনা চা, সেইটি সিস্টেমে না ঢাললে যে এখন ড্রিমে আর রিয়্যালিটিতে চামচে—নাড়া হয়ে যাচ্ছে, আমে—দুধে মিশে যাচ্ছে বাবা!

মচ করে পিছন থেকে আবার শব্দ হয়।

চোপ!—বলে ধমক মারে গৌরহরি। শালা ডেডবডিটা। বিনিপয়সার পার্মামেন্ট সোয়ারি। হাফ—ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট গৌর না হলে শালা তোমার দম বের করে দিত।

গ্রিন লাইট।

গৌর শ্বাস ছেড়ে গাড়ি ছাড়ে।

দাশ কেবিন থেকে যখন বেরোল গৌর, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল সে। শরীরের ভিতরটায় বাতাস বইছে, চাঁদ উঠেছে সেখানে, বাগান আলো করে ফুল ফুটেছে। শরীরের ভিতরে এইসব হচ্ছে এখন। গৌর মৌরি চিবোতে চিবোতে একটা শুখো আর একটা ভালো পায়ের ওপর একটু টেরছা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শরীরের ভিতরকার সেই জ্যোৎস্না, সেই বাগান, সেই বাতাস অনুভব করল কিছুক্ষণ। গৌর কোনদিনই কারও সার্ভেন্ট নয়। ওই সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার ল্যান্ডমাস্টার, মিটারে লাল কাপড় জড়ানো প্রাইভেট। গৌর যখন খুশি খুলবে কাপড়, যখন খুশি প্রাইভেটকে

ভাড়াটে গাড়ি বানাবে। কোনও শালার কিছু বলার নেই। এখন দাশ কেবিনের গরম অমলেট, চা আর টোস্ট তার পেটে গিসগিস করছে। ঠিক যেন বাতাসে, চাঁদের আলোয় একখানা ফুল—ফোটা বাগান। ইচ্ছে করলে, যতক্ষণ খুশি শরীরের ভিতরকার সেই দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারে বগলুর পোলা গৌরা, কোনও শালার কিছু বলার নেই। বাপ বগলাপতিই তাকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছে। লোকটার ফোর—সাইট ছিল বটে।

স্টোরিং এজেন্সিটা যখন ফুলেফেঁপে একটা বিশাল আকার নিয়েছে তখনই বলতে কী রাখোহরি তার ভুল বুঝতে পারছিল। কারবারটা এত ছড়ানো তার ঠিক হয়নি। বিস্তর দৌড়ঝাঁপ এবং তদবির করতে হচ্ছিল। সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল বিবিধ ফুটোফাটা। ওদিকে বড়কর্তাদের রদবদল শুরু হয়ে গেছে। পালটে গেছে মিনিস্টার। নতুন করে এসেছে রাখোহরি, তখন তাদের জো। তারা ওঁত পেতেই ছিল। কোনও গুদামেই মাপমতো মাল থাকে না। একথা কে না জানে! রাতারাতি মাল এদিক ওদিক হয়, ওজন ম্যানেজ হয়, বড়কর্তারা পান—তামাক খেয়ে ব্যাপারটা চেপে যান। কিন্তু সেবার বড়কর্তাদের পান—তামাকের বন্দোবস্ত তখনও করে উঠতে পরোনি রাখোহরি। উত্তরবাংলার গর্দিশে আটকে গিয়েছিল। এক রাতে ইন্সপেক্টর আর দারোগা তার দুটো গুদাম দিল সিল করে! রাখোহরি প্রথমে চোখ রাঙাল, তারপর লোভ দেখাল, তারপর বসল মাথায় হাত দিয়ে। ফুডের সেক্রেটারি রিটায়ার করেছে, মিনিস্টার পেয়েছে অন্য পোর্টফোলিও। রাখোহরি করে কী?

প্রথমে বগলাপতি ব্যাপারটা জানতেও পারেননি। একা—একাই ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছে রাখোহরি। অবশেষে বেগতিকে দেখে এসে পড়ল বগলাপতির কোলে, বাবা, বাঁচাও।

বগলাপতি চুপ করে সব শুনলেন। বুঝলেন, শুধু দারোগা বা ইন্সপেক্টর নয়, অন্য ব্যবসায়ীরাও আছে এই চক্রান্তে। প্রফেশনাল জেলাসি। বিলেতে ম্যানেজমেন্ট শেখা রাখোহরি মূলেই গণ্ডগোল করে বসে আছে। তবু বগলাপতি শেষ চেষ্টা করতে বেরোলেন। কিন্তু বৃথা। ব্যাপারটা নালি ঘায়ের মতো চাউর হয়ে গেছে তখন। পাবলিক গেছে খেপে। কাগজেও ছোট্ট করে খবর বেরিয়ে গেল। পাবলিকের দুর্ভিক্ষের খাবার নিয়ে কালোবাজার। দেশদ্রোহ, মানবতার শত্রুতা! তার ওপর রাখোহরি বোকার মতো নিজের দোষ ঢাকতে সিল করা গুদামের টিন লোক লাগিয়ে রাতারাতি ফুটো করে চুরি দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা টিকল না। রাখোহরি আর বগলাপতি, দু'জনকেই পুলিশে ধরল। বালিগঞ্জের বাড়িটাতে তখন মা আর হাফ—ফিনিশ গৌরা।

গৌরা অতশত বোঝে না। মা সারাদিন কান্নাকাটি করে। গৌরা সকালে ল্যান্ডমাস্টার নিয়ে বেরোয়। সারাদিন কলকাতার সোয়ারি এধার ওধার করে, রাতে টাকা আর খুচরো একগাদা নিয়ে মায়ের কোঁচড়ে ফেলে। মা কেঁদে আকুল হয়, ও আমার গৌরা! শেষে তুই খাওয়াবি আমাকে, একথা কে ভেবেছিল বাপ আমার? তোর যে বাঁচার আশা ছিল না। টিক টিক করে টিকে আছিস এই যে আমার ভাগ্যি।

ধীরেসুস্থে মিটারের লাল কাপড়টা খোলে গৌর। অমনি তৎক্ষণাৎ একজোড়া ছেলেমেয়ে এসে গাড়ির দরজার হাতল ছুঁয়ে বলে, আমরা একটু গঙ্গার ঘাটে যাব।

গঙ্গার ঘাট। মৃদু হাসে গৌর। মন্দ কী? দাশ কেবিনের পর এখন গঙ্গার ঘাট ভালোই লাগবে গৌরের।

চলুন।—বলে সে লক খুলে দেয়।

ছেলেমেয়ে দুটো কলকল করতে করতে পিছনে উঠে পড়ে।

তাদের কথার মাঝখানে মাঝখানে একটু—আধটু ফিসফিসানি শুনতে পায় গৌর। মেয়েটা বলে, লোকটার একটা হাত দেখেছ। কেমন শুকনো কাঠের মতো?

ছেলেটা বলে, একটা পা—ও তাই।

ওমা! তাই নাকি? কী করে তবে গাড়ি চালায় গো? অ্যাকসিডেন্ট করবে না তো!

দূর। গাড়ি তো অভ্যাসে চলে।

গৌর হাসে। আহা, বগলুর পোলা গৌরা, হাফ—ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট, ছা—রা—রা—রা—রা—

জামিনে খালাস পেয়ে বগলাপতি যখন বেরোলেন তখন তাঁর চেহারা রোঁয়া—ওঠা কাকের বাচ্চার মতো। মুখের চামড়া কী এক রোগে কালো হয়ে গেছে অর্ধেক। চামড়া দুল দুল করে ঝোলে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট লালবাতি দেখাচ্ছে। বাড়ি মর্টগেজে। ডজ গাড়িটা ছ'হাজারে বিক্রি করেছে রাখোহরি। কেস চলতে লাগল। সে কী চলা! তার ব্রেক নেই, ইঞ্জিন গরম হয় না, ড্রাইভার টিফিন খায় না। কেস চলে তো চলেই। সেই কেসই আস্তে আস্তে শুষে নিল তাদের সংসার। বগলাপতি ঘন ঘন দুটো স্ট্রোক সামলালেন। তৃতীয় স্ট্রোকে হড়কে গেলেন দুনিয়া থেকে। তার দু'মাস পর মা। তখন বিলেত—ফেরত ম্যানেজমেন্ট শেখা রাখোহরি লুঙ্গি পরে রকে বসে বিড়ি খায়। বিলেত থেকে ফিরে অনেক কাণ্ড করার পর বিয়ে করেছিল। গুষ্টি বেড়েছে। মাঝেমধ্যে গৌরের ল্যান্ডমাস্টারটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করে, এটার যেন কত দাম পড়েছিল রে?

গৌরহরি সতর্ক হয়ে বলত, হাজার চারেক বোধহয়। এখন দু'হাজারেও বিকোবে না।

বিক্রি করতে করতে অস্থাবর সবকিছুই ফিনিশ করেছিল রাখোহরি। এক কথা ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না। মাঝে মাঝেই ধার বলে পয়সা নিত গৌরের কাছ থেকে। বিনিপয়সায় তার ট্যাক্সিতে এধার ওধার যেত। বাপের যা ছিল তার এক পয়সাও ছোঁয়াল না গৌরকে। দূরদর্শী বগলাপতি তা জানতেন। ল্যান্ডমাস্টারখানা নিয়ে গৌর তাই সুখেই আছে।

তা গৌরা তেমন চিন্তা—ভাবনা করতে পারে না কোনওদিনই। করলেই মলপরা দুটি পা মাথার মধ্যে চক্কর মারতে থাকে। সে এমন চক্কর যে গৌর ছোটাছুটি করে, শব্দ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, গায়ে ঘাম দেয়, চোখ—মুখ ফেটে পড়তে থাকে। কিন্তু সেই নাচুনে মাগির নাচ আর শেষই হতে চায় না। শেষে সেই ঝমঝম মাথা থেকে তার সমস্ত শরীর ছড়িয়ে পড়ে। তার রক্ত, হাড়, মজ্জা সব সেই ঝমঝমের সঙ্গে তাল দেয়। বড় নেতিয়ে পড়ে গৌরহরি। তার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। বগলাপতি দুনিয়া থেকে হড়কে গেলে তার স্থাবর—অস্থাবর সব যা ছিল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিল রাখোহরি। রিফিউজি কলোনির বাড়িতে উঠে গিয়ে বালিগঞ্জের বাড়িতে ভাড়াটে বসাল। কেবল ছুঁল না কম দামের ল্যান্ডমাস্টারটা। তার আর একটা কারণ বোধহয় এই যে গৌরহরির আয় থেকে সে নিয়মিত ভাগ বসাতে পারত। এই সব যে করল রাখোহরি, তার এত যে কায়দা কৌশল এই সব গৌরহরি বুঝতে পারত, কিন্তু বেশি বুঝতে গেলেই মাথার মধ্যে নানা জটিল চিন্তা দেখা দিত। আর তার সঙ্গে ওই নাচুনে মাগির বেহদ্দ নাচ। তাই চিন্তাভাবনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে গৌর। কেবল মাঝে মাঝে ভাবে, আমি শালা গৌরহরি বগলাপতির ছাওয়াল, এই দুনিয়ায় আমি কি খুব ঠকে গেলুম! এই যে রুখো—শুখো দুটো হাত—পা, মগজে এই যে এত ঝমঝম, এত সব নিয়ে কতদূর কী করছি দুনিয়ায়? কী করার ছিল আমার? আর কী—ই বা করেছি? তবে কি আমার সারাজীবনের একমাত্র কাজ একখানা পুরনো ল্যান্ডামাস্টারে সারা কলকাতা চষে এধারকার মানুষ ওধারে নেওয়া! এই করতে করতেই কি শালা কোনও মানুষ পারফেকশানে পৌঁছাতে পারে! অ্যাঁ? বগলুর পোলার কপালে শেষে কি এইটুকু মাত্র পারফেকশান লেখা ছিল? বিলেত না, বিদেশ না, পয়সাকড়ি না, বউ না, না ছেলেপুলে, কেবল একটা ল্যান্ডমাস্টার, আর দাশ কেবিনের চোতরাপাতার ক্বাথ, আর শালা পুলুসবাবা, লাল নীল আলো, ঝুটঝামেলা, গঙ্গার ঘাট থেকে পগেয়াপট্টি, টেরিটিবাজার থেকে সাউথ সিঁথি, আর মাঝে মাঝে মৌতাতের সময় বয়ে গেলে ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাডমিকশ্চার!

একটা বাজে মেয়েমানুষ আছে চৌরঙ্গির। তাকে জুটিয়েছিল আর এক ট্যাক্সিওয়ালা মদনা। মদনাই ধরে দিয়েছিল তাকে মেয়েমানুষটা। সেই মেয়েমানুষটারও সোয়ারি আছে। সোয়ারি জুটলে গৌরের ট্যাক্সি ডাকায়। ডাকিয়ে চক্কর দেওয়ায় ময়দানে। একটু অন্ধকার মতো হয়ে এলে গঙ্গার ঘাটে নির্জনে কোথাও গাড়ি দাঁড় করাতে বলে। গৌরহরি তখন নেমে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়, আর দেখে দূর থেকে, তার গাড়ির পিছনের কাচে দুটো ছায়া পরস্পর লেপ্টে গেল। তারপর আর তাদের দেখা যায় না। গৌরহরি চোখ ফিরিয়ে নেয় লজ্জায়। ঘণ্টাখানেকের এইসব ব্যাপারের জন্য ত্রিশ—চল্লিশ টাকা আয় হয় তার। আর সেই সঙ্গে

কখনও সেই মেয়েমানুষটার শরীর একটু—আধটু ছোঁয়া যায়। সেটুকু ভালো লাগে না গৌরের। কেবল বদরক্ত বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা রিমঝিমে ক্লান্তি আর ঘুম আসে। জীবন থেকে সে মাত্র এইটুকু পাচ্ছে, এইটুকু পারফেকশান। তার বাপের কিনে দেওয়া ল্যান্ডমাস্টারে এইসব পাপের কাজ হয় বলে মাঝে মাঝে মরমে মরে থাকে গৌরহরি। তার আর উন্নতি হয় না। সে যা ছিল তাই রয়ে গেছে।

রাখোহরির সংসার বিস্তর টেনেছিল গৌর। এক এক সময়ে মাসের পর মাস। কেস চলছিল। তিনটে কেস। কপাল ভালোই রাখোহরির। একের পর এক কেস জিতে গেল। কী করে জিতল, কোন গলিঘুঁজির পথে, কে জানে! তবে জিতল ঠিকই। ফিরে গেল বালিগঞ্জের বাড়িতে। আবার গাড়ি কিনল। দাবড়ে শুরু করল বাবা বগলাপতির ব্যবসা। রিফিউজি কলোনির বাড়িটাতেই রয়ে গেল গৌর। তার আর উন্নতি হল না। রাখোহরি বগলাপতির কথার মতোই এখন তার তালুই।

বিচিত্র গাড্ডা। এ নিয়ে যে সে ভাববে তারও উপায় নেই। কোনও সুন্দর সকালে সে রাখোহরির কাছ থেকে বাবা বগলাপতির কিছু বিষয়—সম্পত্তি ঝেঁকে আনবে এমনটা সে ভাবতেই পারে না। লড়াকু ছেলে রাখোহরি। বিপরীত ভাগ্যকে নিজের কোলে টেনে এনেছে আবার। মদনা গৌরকে পরামর্শ দিয়েছিল, মামলা কর।

আই বাপ! বাপের দেওয়া ল্যান্ডামাস্টারখানা আর রিফিউজি কলোনির দু'খানা টিনের ঘর ছাড়া তার কিছুই নেই। মামলার খুরে খুরে তাও চলে যাবে। তার ওপর রাখোহরির মতো লড়াকু।

গাড়িটা চমকাচ্ছে। ইঞ্জিন টানছে না তেমন। গৌর বিড়বিড় করে গাল দেয়, শালা, তুই কি হিউম্যান বিয়িং যে চমকাচ্ছিস। আর একটু চল বাবা, গঙ্গার হাওয়া খাওয়াব।

গাড়ির ভিতরের অন্ধকারে পিছনের সিটে ছেলেটা আর মেয়েটা বসে আছে। পিছনের আবছা কাচে তাদের ছায়া দুটোকে দেখা যায়, লেপ্টে আছে। একটু আগেও কলকলাচ্ছিল। এখন চুপ, চুমকুড়ি কাটছে বোধহয়। আঠা দেখ শালার। কাটে কাটুক। তাতে গৌরের কী! গৌর হাত বাড়িয়ে আয়নাটা ঘুরিয়ে দেয় একটু।

রেসকোর্সের গা ঘেঁষে চমৎকার একখানা বাঁকে গাড়িখানা উড়ে যাচ্ছে। গঙ্গার বাতাস ঝাপটা মারে। নিয়োনের আলোয় তারার গুঁড়ো ঝরে পড়ছে। ওই দেখা যায় জাহাজের হলুদ মাস্তুল, জিরাফের মতো উঁচু গলার ক্রেন। আলোয় আলো বন্দর। চওড়া রাস্তায় ধুলোর কণা মেলে না প্রায়। যতবার এই ঘাটে এসেছে গৌর ততবার মনে হয়েছে, এই তো বিদেশ! এই তো শালার লন্ডন, যেখানে একদা ল্যান্ড করেছিল তার দুই দাদা, রাখোহরি আর থাকোহরি। গৌরও করত। স্বভাবের নিয়মে সব চললে আজ তারও হয়তো মেম বউ। বেগড়বাঁই বাধালো মগজের ওই ঝমঝম শব্দ, আর দুটো রুখো—শুখো হাত—পা।

ভাবতে ভাবতে শ্বাস টানে গৌর। গঙ্গার বাতাসে তার ফুসফুস পালের মতো ফুলে ওঠে। কলকাতা পার হয়ে লন্ডনের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড়—করায় গৌর।

ওমা! এসে গেছি!— মেয়েটা চমকে গিয়ে বলে।

আড়চোখে আয়নাটা দেখে গৌর। ছায়া দুটো আবার আলগা দিয়েছে। শালা ভুখখা পার্টি! ঘরদোরে জায়গা পায় না, তাই ট্যাক্সিতে চড়ে যত আশনাই। গৌরবাবুর ল্যান্ডমাস্টারখানাকে কী পেয়েছিস তোরা? ফুলশয্যার বিছানা, না হানিমুন কটেজ?

ছেলেটা নেমে মিটার দেখল না, জিজ্ঞেস করল, কত?

গৌরও মিটার দেখল না, কেবল একটু আলস্যের সঙ্গে বলল, চার টাকা দশ পয়সা।

ছেলেটা ভ্রূক্ষেপও করল না। দিয়ে দিল। তারপর ছেলেটা আর মেয়েটা গঙ্গার ঝোড়ো বাতাসে এলোমেলো চুল হাতে সামলাতে সামলাতে আলো থেকে অন্ধকারে কোথায় চলে গেল।

গৌর নেমে মিটার ঘুরিয়ে দেয়। সত্যিকারের কত উঠেছিল তা দেখার চেষ্টাও করে না। সঙ্গে মেয়েছেলে থাকলে ডাঁটিয়াল ছেলেরা মিটার—ফিটার দেখার ঝামেলা করে না। গৌরেরই বা কী দায় পড়েছে! সেও আন্দাজি মারে। বগলুর পোলা গৌরা, প্রেস্টিজে সে কম যায় কীসে?

বনেটটা খুলে দেয় গৌর। খা বাবা ল্যান্ডমস্টার, গঙ্গার হাওয়া খেয়ে নে। মিটারটা আবার লাল শালুকে ঢাকে গৌর।

তারপর বগলুর ব্যাটা গৌর গাড়ির গায়ে বসে পেচ্ছাব করে, থুতু ফেলে। তারপর নির্জন ঘাটের কংক্রিটের রেলিং ধরে এসে দাঁড়ায়। সামনেই হলুদ একখানা জাহাজ। তার সর্বত্র উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। উঁচু মাস্তুল পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় ধু—ধু করছে। জাহাজের বিশাল খোল দেখে গৌর, দেখে তার সাদা কেবিন, আর শুনশান ডেক। কোনওখানে কোনও মানুষ নেই। এমন নির্জন আলোকিত জাহাজ কখনও দেখেনি গৌর। সে হাঁ করে দেখে আর দেখে। জাহাজটা খুব ধীর লয়ে দোলে। কোন কোন মুলুকে চলে যাও হে জাহাজবাবা! বগলুর ছাওয়াল পড়ে আছে কোন গাড্ডায়! ফিফটি পারসেন্ট বলে গৌরার সব ফুর্তিই বিলা হয়ে গেল। নইলে বাবা জাহাজ, তোমার এই ডেকের রেলিং ধরে ঝুঁকে আমি সমুদ্র দেখতুম। অ্যালবাট্রসের ছায়া দেখতুম, আমার টাই ফুরফুর করে উড়ত হাওয়ায়। জাহাজবাবা, হাফ—ফিনিশ গৌরার লাইফটায় কী আছে বলো তো! ওই ভূতুড়ে ল্যান্ডমাস্টার, দুটো রুখো—শুখো হাত—পা, মগজে এক বেহদ্দ নাচুনে মাগির ঝমাঝম। কলকাতার সওয়ারি এধার ওধার করে কেটে যাচ্ছে জীবন। বাবা জাহাজ, সাত ঘাটের জল খাও তুমি। সমুদ্রের জলে তোমার ছায়া পড়ে, সেই ছায়ায় খেলা করে স্বপ্নের পৃথিবী। নোনা হাওয়ায় কোন কোন মুলুকের গন্ধ ভেসে আসে। আর গৌরা!

মার শালা ভূতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারের মুখে তিন লাথি, তিন লাথি কলকাতার সোয়ারিদের, আর তিন লাথি লাগা গৌরার কপালটায়। ফিফটি পারসেন্ট হাফ—ফিনিশ গৌরা এইসব ভাবে, আর বিভোর হয়ে দেখে হলুদ জাহাজখানা।

ল্যান্ডমাস্টারটা হাঁ করে হাওয়া খাচ্ছে, গাঁই গাঁই করে ডেক—এ বাতাস বইছে ঝড়ের মতো। গৌরার লম্বা চুল ওড়ে। বিদেশি বাতাসে ভরে ওঠে বুক। গৌরার ফিরতে ইচ্ছে করে না, জাহাজখানা দেখতে দেখতে গৌর এক অদ্ভুত ওয়্যারলেস শুনতে পায়। বাতাসের ডাকের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা ভাষা ভেসে আসে। জাহাজটা গৌরকে কী যেন বলে। আই! জাহাজখানা হাফ—ফিনিশ গৌরাকে ওয়্যারলেসে ডাকে, বলে, বুয়েনস এয়ারিসের মতো সুন্দর শহর বড় একটা নেই। আমি সেখান থেকে এলুম। যাচ্ছি টোকিও, ফিরব লন্ডনে, যতদিন চালু আছি ততদিনই জীবনটা সুন্দর। জল আর স্থলের জীবন দু'রকম বাবা গৌর। যেমনই হোক, চালু থাকাটাই আসল কথা। জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে চালু থেকো হে বগলাপতির ব্যাটা, বগলুর ছাওয়াল। সংসারে চালু থাকাটাই সাকসেস।

অবিকল এইরকম কথা বলতেন বগলাপতিও। ইবলিশের বাচ্চা যদি নিজের কপাল না ভাঙে তবে এই ল্যান্ডমাস্টারটার জোরেই সংসারে চালু থাকবে। বগলুর ফোর—সাইট ছিল বটে। আজও যে সংসারে চালু আছে গৌর তা ওই ল্যান্ডমাস্টারটার জোরেই। ওই যে শালা হাঁ করে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছে ওই ভূতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারটার জোরেই। ওই যে শালা হাঁ করে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছে ওই ভূতুড়ে ল্যান্ডমাস্টার, মগন সিং—এর গ্যারাজ থেকে যেটাকে ন'হাজারে কিনেছিলেন বগলাপতি। সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি বলে রাখোহরি ছোঁয়নি ওটাকে। গৌর চালু আছে ল্যান্ডমাস্টারটার জোরে, তবু কখনও—সখনও গঙ্গার ঘাটে এলে নীল সাদা হলুদ জাহাজগুলো অনেকক্ষণ দেখে গৌর। তখন তার ইচ্ছে করে ভূতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারটাকে তিন লাথি, তিন লাথি কলকাতা আর কলকাতার সোয়ারিদের আর তিন লাথি নিজের কপালটায় মারতে।

জাহাজবাবা, আমার বাবা বগলুও বলত এরকম কথা তোমার মতো। সংসারে চালু থাকাটাই আসল কথা। তবু মাঝে মাঝে জাহাজ কি উড়োজাহাজ দেখলে, কিংবা হাওড়া কি শেয়ালদা থেকে দূরের রেলগাড়ি ছাড়ার সময়ে হঠাৎ বুকে বড়শি বিঁধে যায়। কোন অচেনা দূর যেন আমায় কলকাতার ঘোলা জল থেকে টেনে তুলে নিয়ে যেতে চায় জাহাজবাবা। আমি তো জানি, আমি হচ্ছি গে ঢাকার টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা, হাফ—ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট গৌরা, খুব বেশিদূর যাওয়া আমার নেই। কলকাতাই আমার লিমিট। ঘুরে ঘুরে সেই কলকাতা, ঘুরে ঘুরে ফের কলকাতা। বাবা হলদে জাহাজ, আমি যখন মুরগিহাটার সোয়ারি বাগবাজারে

খালাস করি, তখন তুমি বুয়েনস এয়ারিস ছেড়ে চলেছ টোকিও, কিংবা ফিরতি পথে লন্ডনে। নীল পাহাড়ের ওপর বাতিঘরের আলো দেখো তুমি, দেখো সমুদ্রের ঝড়। ইটালির জলপাইয়ের বনের ঝড় এসে লাগে তোমার মাস্তুলে। বাবা জাহাজ, বুকের বড়শিটা মাঝেমাঝে জোর টান মারে। কলকাতার ঘোলা জলে গৌর চমকায়, ঠিক যেমন ইঞ্জিন গরম হলে মাঝে মাঝে চমকায় তার ল্যান্ডমাস্টার। হাফ—ফিনিশ বলে গৌরা যে কোনও কিছুই পায়নি জাহাজবাবা!

খুব জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে গৌর, সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সে নিজেই চমকে ওঠে। আই! বগলুর দুই ব্যাটা বিস্তর জাহাজ দেখেছিল, দেখেছিল সমুদ্র, বিদেশ, দেখেছিল বিস্তর মেয়েছেলে। কিন্তু বগলুর তিন নম্বর ব্যাটা আটকে গেছে এক ভূতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারের বগলতলায়। ছাড় নেই। তাই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গৌর আবার ল্যান্ডমাস্টারের কাছে ফিরে আসতে থাকে।

মিটারের লাল শালুটা অন্যমনস্কভাবে খোলে গৌর, বনেট বন্ধ করে। ড্রাইভিং সিটে বসে চাবিটা বের করে, তারপর হঠাৎ আগাপাশতলা চমকে উঠে বুঝতে পারে, তার পিছনে সিটে কে যেন বসে আছে। আয়নায় দেখা যায় পিছনের কাচের গায়ে একটা মাথা একটু হেলে আছে। এলানো একটা শরীরের ছায়া দেখা যায়। দরজাটা ঠেলে এক লাফে বেরিয়ে আসে গৌর। শালা ডেডবডিটা!

কয়েক পা নেংচে নেংচে দৌড়ে যায় গৌরহরি। তারপর থামে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের ল্যান্ডমাস্টারটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। বাস্তবিক ল্যান্ডমাস্টারটা কোনওদিনই সেন্ট পারসেন্ট গৌরহরির না। ওর ফিফটি পারসেন্ট ওই শালা ডেডবডিটার, এটা গৌর মাঝে মাঝে টের পেত। এখন ডেডবডিটার আবছা অবয়ব দেখে গৌরহরি বুঝতে পারে, শালা ভূতেরাও দাবি—দাওয়া ছাড়ে না। কবে মরে—হেজে গেছিস, তবু একটা পুরনো ল্যান্ডমাস্টারের মায়া কাটাতে পারলি না, বাবা ডেডবডি! মানুষের কত কিছু চলে যায়। আমার বাপ বগলু সাতটা জাহাজডুবির শোক পেয়েছিল। আর আমি সেই বগলুর তিন নম্বর ব্যাটা, দ্যাখ এই হাফ—ফিনিশ আমার জীবনটা, টিকাটুলির ডাকসাইটে বগলাপতির ছাওয়াল আমি, তবু আমার কপালে কেবল অবশিষ্ট আছে ওই ল্যান্ডমাস্টারটা, যার ফিফটি পারসেন্ট ভূতের কবজায়। বাবা ডেডবডি, গৌর কি কখনও ইন্টারফিয়ার করেছে তোমাদের ব্যাপারে? তবে তুমি কেন বাবা, হাফ—ফিনিশ গৌরার ল্যান্ডমাস্টারে? ল্যান্ডমাস্টারটা ছাড়া গৌরের যে আর কিছুই নেই বাবা!

গৌর দূরে দাঁড়িয়ে তার ল্যান্ডমাস্টারটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে, আর বিড়বিড় করে। তারপর চমকায়।

গাড়ির পিছনের জানালা দিয়ে আস্তে আস্তে একটা মাথা বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ গৌরকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে, হেই! কাম হিয়া—

অমনি গৌরের মাথার ধোঁয়া কেটে যায়। গাড়ির দরজা লক করা ছিল না। মাতালের পো উঠে বসে আছে। ভারী রেগে যায় গৌরহরি। নেংচে নেংচে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলে সেন্ট অ্যান্টনিজের পাক্কা ইংরিজিতে বলে, এখানে কী হচ্ছে! অ্যাঁ? বেরোও, বেরিয়ে যাও!

লোকটা তবু দিব্যি গা ছেড়ে বসে থাকে, মাথাটা পিছনে হেলানো। ডান হাতখানা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে নেড়ে গৌরের ধমক—ধামক উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে, টেক মি টু স্যু।

স্যু ফু আমি জানি না। তুমি বেরিয়ে এসো।

মাতাল লোকটা তবু হাত নেড়ে বলে—দেন টেক মি টু এ গুড উম্যান মেট।

বগলাপতির ছাওয়াল কি মেয়েছেলের দালাল? ইজ হি?— চোস্ত ইংরিজিতে গৌর বলে, মাতাল আর মেয়েছেলেদের আমি ঘেন্না করি! তুমি কেটে পড়ো।

গৌরের ইংরিজি শুনেই বোধহয় লোকটা একটু থমকে যায়। ইতস্তত করতে থাকে। গৌর লক্ষ করে, লোকটা বেঁটে—খাঁটো, বছর চল্লিশ—পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স। জুলপিতে পাক ধরে একগোছা চুল সাদা হয়ে আছে। গায়ের রং রোদে জলে খেয়ে গেছে বলে বোঝা যায় না কোন দিশি। তবে জাহাজি বলেই মনে

হয়। বাতাস যদিও ওড়াচ্ছে সবকিছু, তবু গৌর একঝলক মদের গন্ধ পায়। মাতালদের গাড়িতে তোলে না গৌর। শালাদের কখনও কোনও স্থির ডেস্টিনেশন থাকে না। তার ওপর মাঝে মাঝেই শরীরের ক্বাথ হড়হড় করে ঢেলে দেয় গাড়িতে। ধোয়ামোছা করতে গৌরের দম বেরোয়।

নামবে কি না বাপু, না কি পুলিশ ডাকব?—গৌর ইংরিজিতে বলে।

গৌরের সেন্ট অ্যান্টনিজের নির্ভুল ইংরিজি শুনে লোকটা সত্যি ভড়কে যায়। নামবে কি না ইতস্তত করে, ঠোঁট চাটে, চুলে হাত বোলায়, উদভ্রান্ত চোখে চারদিকে চায়।

উত্তেজনার মধ্যেও লোকটার হাবভাব দেখে গৌর তৃপ্তি পায়। আই জাহাজির পো, শুনে লে ইংরিজি কাকে বলে! বগলাপতির এক ব্যাটা বিলেতে রয়ে গেছে, আর এক ব্যাটা বিলেত ফেরত, তিন নম্বর যদিও হাফ—ফিনিশ তবু ইংরিজি শিখেছিল ফাদার ফ্রান্সিসের কাছে। শুনে লে বাবা জাহাজি।

লোকটা অসহায়ের মতো বিড়বিড় করে বলে, আমাকে স্যু—র কাছে যেতেই হবে। আমাকে পৌঁছে দাও। দয়া করো।

বলতে বলতে লোকটা একটু কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে একগোছা দশ টাকার নোট বের করে গৌরকে দেখায়, বলে, আমার টাকা আছে, চিন্তা নেই। একটু আগে আমি একটা ঘড়ি বিক্রি করেছি, আর একটা স্পাই ক্যামেরা। এই দেখো কত টাকা।

টাকা দেখাচ্ছে! টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি, যে কিনা ডজ গাড়িটার আয়না দিয়ে বিস্তর রাজার মাথা আর তিন সিংহের মূর্তির ছবি দেখেছে, তাকে কিনা দেখাচ্ছে ফুটো পকেটের জাহাজি! ভারী রেগে যায় সে। ভালো হাতখানা বাড়িয়ে সে জাহাজির হাত ধরে টান মারে, চেঁচিয়ে বলে, নামো, নামো, টাকা আমি বিস্তর দেখেছি।

গৌর টানে। লোকটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে ভিতরে সেঁধোতে থাকে। পা দু'খানা সিটের ওপর তুলে গোঁজ হয়ে পুঁটলি পাকিয়ে বসে, বলে, দয়া করো।

অসুবিধে এই যে গৌরের একটা হাত আর একটা পা কমজোরি। আর লোকটা সেন্ট পারসেন্ট হাত—পাওলা, গৌর সুবিধে করতে পারে না। যত টানে, তত লোকটা সিট আঁকড়ে শুয়ে পড়তে থাকে। গৌর রেগে বাংলায় বলে, ফোট শালা বেজন্মা। আজ তোরই একদিন কি আমারই!

শুনে, শুয়ে থেকেই জাহাজিটা বড় বড় চোখ করে চায়। বলে, আরে বাঃ, তুমি বাঙালি দেখছি!

লোকটাকে গৌর সাহেব ভেবেছিল অনেকক্ষণ ধরে। এখন তার মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে চমকাল খুব। হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলল, তুমি সাহেব নও?

লোকটা সিট আঁকড়ে আধাশোয়া অবস্থাতেই বলে, আরে দূর! আমি তোমাকেই সাহেব ভেবেছিলাম। যা ইংরিজি বলছিলে! মাইরি, শিখলে কোত্থেকে অমন ইংরিজি?

গৌর একটু দম নিয়ে বলে, সেন্ট অ্যান্টনিজ, ঢাকা। তুমি কোত্থেকে শিখেছ?

লোকটা যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, এমনভবে সহজ ভঙ্গিতে উঠে বসে, হাত—টাত ঝেড়ে বলে, আমি শিখেছি জাহাজে, সাত ঘাটের জল খেয়ে।

গঙ্গার বাতাসে গৌরের রাগ উড়ে গেল। বাঙালির মুখে ভালো ইংরিজি শুনলে গৌরের এরকম হয়। তবু সে বলে, আমার গাড়িটা মাতালদের জায়গা না।

লোকটা ভয়ে ভয়ে মিটমিট করে তাকায়, বলে, আমি শুধু একটু বিয়ার খেয়েছি। মুখ শুঁকে দেখো। হাই!

লোকটা হাঁ করে এগিয়ে আসে। গৌর পিছোয়। পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। গাড়ি খুলে আমি দেখি একটা ভূত বসে আছে।

লোকটা হাসে। একটা সোনালি দাঁত চিকমিক করে। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলে, আজ বিকেল থেকেই আমার মনটা খুব খারাপ, বুঝলে! খুব খারাপ।

মাতালদের দুঃখের কথা সহজে শেষ হয় না। গৌর জানে। তাই সে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, বুঝেছি। এখন গাড়িটা ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

লোকটা আতঙ্কিতভাবে দরজার হাতলটা আঁকড়ে ধরে ভয়ের চোখে গৌরের দিকে চায়।

তাকে ভয় পায় এমন লোক বড় একটা দেখেনি গৌর। বরং সারাটা দিন গৌরই বিস্তর লোককে ভয় পায়। কখন কোন পুলুসবাবা ধরে, কোন সোয়ারি কোন গাড্ডায় নিয়ে ফেলে, কখন ল্যান্ডমাস্টারের ভূতটা শব্দ করে ওঠে। সারা দিনটা ভয়ে ভয়েই কাটে গৌরের, তাই এখন একজন তাকে ভয় পাচ্ছে দেখে গৌরের একটু মায়া হয়। সে নরম গলায় বলে, তোমার মতলবখানা কী?

লোকটা মিনতি করে, আমাকে নামিয়ে দিয়ো না। স্যু—র কাছে পৌঁছে দাও। আমি বড় দুঃখী লোক, বুঝলে, সারা সন্ধে একটাও ট্যাক্সি আমাকে নেয়নি।

বলতে বলতে লোকটা হেঁচকি তোলে। কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে এক প্যাকেট রথম্যান সিগারেট বের করে গৌরের দিকে বাড়িয়ে দেয়, এই নাও সিগারেট।

গৌর মাথা নাড়ে, না।

লোকটা মিনতি করে, নাও মেট। খুব ভালো সিগারেট। পুরো প্যাকেটটাই তুমি নিয়ে নাও।

গৌর মাথা নাড়ে, না।

লোকটা করুণ চোখে চেয়ে বলে, আমার জাহাজের জাহাজিরা সব যে যার মেয়েমানুষের কাছে চলে গেছে, ফুর্তি লুটছে সবাই। আর আমি শেষ জাহাজিটা সারা সন্ধেবেলা চেষ্টা করছি, কোথাও যেতে পারছি না। মাইরি!

জাহাজিটা ওয়ার্নিং না দিয়ে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। টপটপ করে চোখের জল পড়তে থাকে।

গঙ্গার এই হুড় বাতাসটাই খারাপ। গৌরের মনটাকে দুবলা বানিয়ে দিয়েছে। সে যথেষ্ট বদমেজাজি হওয়ার চেষ্টা করেও পারছে না। তার ওপর লোকটা কাঁদতে শুরু করতেই সে কেমন কেবলে যায়। মায়েদের মতো 'ষাট ষাট' করতে ইচ্ছে করে।

তা না করে গৌর লোকটার সিগারেট নেয়।

বলে, স্যু কে?

লোকটা নীরবে খানিকটা চোখের জল মোক্ষণ করে রুমালে চোখ মোছে। একটু চুপ করে থেকে আবার দাঁত দেখায়। সোনালি দাঁতটা চিকমিক করে। সযত্নে সে একটা দামি গ্যাসলাইটার বের করে গঙ্গার বাতাস থেকে নিপুণ হাতের তেলোয় আড়াল করে আগুন জ্বালে। গৌরের সিগারেট ধরিয়ে দেয়, নিজে ধরায়। অন্ধকারে ভিতরে সরে গিয়ে গৌরের জন্য জায়গা করে দিয়ে বলে, বোসো।

বনেটটা আবার খুলে দেয় গৌর। গঙ্গার হাওয়া খেয়ে লে বাবা ল্যান্ডু। লাল শালুতে আবার মিটারখানা ঢাকা দেয় সে। এসে পিছনের সিটে বসে দরজাটা খোলা রেখে, গঙ্গার হুড় বাতাস বিদেশের গন্ধ উড়িয়ে আনে। তছনছ করে দিয়ে যায় মানুষের মন।

লোকটা নরম গলায় বলে, দেশের মাটিতে যখন জাহাজ ভেড়ে তখন জাহাজিরা নামে লাফ দিয়ে, তারপর দৌড় লাগায়। আত্মীয়স্বজনকে আঁকড়ে ধরে, হাগিং কিসিং, কত আদর ভালোবাসার কথা হয় না? বুঝলে, ওরকম হত, কলকাতায় জাহাজ ভিড়লে। বাচ্চাবেলায় পালিয়ে গিয়ে জাহাজে চাকরি নিই। মা কান্নাকাটি করত, বাপ দুশ্চিন্তা করত, আমারও জাহাজে সময় কাটত না। কলকাতা—মুখো জাহাজ মুখ ফেরালে দুনিয়ার রং পালটে যেত। মা বাপ ছোট্ট ভাইটার জন্য আনতাম রাজ্যের জিনিস, কত আদর হত আমার, কলকাতায় কয়েকটা দিন উড়ে যেত ফুঁয়ে। তারপর বুড়ো হয়ে বাপ মরল, মা মরল। দু'বার দুনিয়া চক্কর দিয়ে এসে দুটো সংবাদ পেয়ে মন ভেঙে গেল খুব। কলকাতার ওপর টান কমতে থাকল। ছোট ভাইটা ছিল, তার কাছে আসতাম। কিন্তু সে ব্যাটা বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে হল প্রফেসর, আর আমি লেখাপড়া শিখিনি, জাহাজের খালাসি। আমাকে ব্যাটা ভালো চোখে দেখত না। তাছাড়া বাপের কয়েক কাঠা জমি—বাড়ি সে

ভোগদখল করছে। আমি এলে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত। তাই বউ বাচ্চা পর্যন্ত আমাকে পছন্দ করে না। এটা বুঝবার পরই হঠাৎ একদিন কলকাতার ওপর আমার টানটা ঝড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল, জাহাজের টানে যেমন জেটির মোটা কাছি ছিঁড়ে যায়। তখন কলকাতা—মুখো জাহাজ চললেও মনে হত বিদেশেই যাচ্ছি, যেমন লন্ডন বা টোকিওয় যাই। তা এই রকম যখন অবস্থা তখন একদিন চলন্ত জাহাজের ডেক—এ দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, আরে, আমার যে কোনও পিছুটান নেই। আমি যে কেবল যাই, কোথাও ফিরি না। অন্য জাহাজিরা দুনিয়ার সর্বত্র যায়, আবার দেশে ফেরে। আমার দেশ নেই বলে যে ফেরাও নেই। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল, বুঝলে। ছেলেবেলা থেকেই আমার ভাবনা—চিন্তার অভ্যাস নেই। বেশি চিন্তা করলে আমার মাথায় ঝাঁইঝাঁই শব্দ হত, ওই শব্দের জন্যই আমার পড়াশুনো হয়নি।

গৌর চমকে জিজ্ঞেস করে, কেমন শব্দ বললে?

ঝাঁইঝাঁই। অনেকটা বড় কত্তালের মতো।

গৌর শ্বাস ছাড়ে। বলে, আমার হত ঝমঝম। অনেকটা নূপুরের মতো।

আই।—লোকটা বলে, তা চিন্তা—ভাবনা করতে করতে যখন মাথা ঝাঁইঝাঁই করতে শুরু করল তখন আর এক জাহাজি পরামর্শ দিল, বিয়ে করো। ঘরসংসার হলে তোমার ফেরার জায়গা হবে। তা আমি বিয়ে করলাম, সানফ্রান্সিসকোতে। আমার বউ বেশ সুন্দরীই ছিল, খুব আদুরে। তার আর আমার টাকা—পয়সা যোগ করে আমরা তিন—চার মাসের লম্বা হানিমুন কাটালাম আমেরিকার নানা জায়গায়। সে কী ফুর্তি! কিন্তু সুখের দিন যায়। সেবার হানিমুনের শেষে অস্ট্রেলিয়া হয়ে জাপান যেতে হল, লম্বা টুর। ফিরতে ফিরতে বছর গেল ঘুরে। শেষে ক'মাস বউয়ের চিঠি পাইনি। জাহাজ আমেরিকা—মুখো হতেই আমার মন আনন্দে হাততালি দিল, এতদিন বাদে আমি ফিরছি। আমার ফেরা আছে। জাহাজ ডাঙার দিকে এগোয় আর আমি উৎকণ্ঠায় সাত—আট ফুট লম্বা হয়ে তীর দেখার চেষ্টা করি। অবশেষে পৌঁছে দেখলাম, বউ জাহাজঘাটায় আসেনি। খানিক দূরে এক ছোট্ট টিলার নীচে আমাদের বাসা ছিল, সেখানে গিয়ে দেখি, বাসায় অন্য লোক। বাড়িওলা বুড়ো অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বলল, খুবই দুঃখের কথা, সে মেয়েটি তো আবার বিয়ে করে নিউইয়র্ক চলে গেছে। বুঝলাম, বউ ভেগেছে। সেই দুঃখে জমি নিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলে তার দোষ দেওয়া যায় না। মেমসাহেবরা বেশিদিন একা একা থাকতে পারে না। আমি আবার ভেসে পড়লাম, একা একা ফাঁকা ডেক—এ দাঁড়িয়ে থাকি, বিয়ার খাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমার কেবল যাওয়া আছে, ফেরা নেই। বয়স বাড়ল। বুড়ো হয়ে যাওয়ার ভয় ঢুকল মনে। সেবার অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজ ভিড়লে আবার গাড্ডায় পড়লাম। আর একটি মেয়ে। আমাকে দুঃখী দেখে ভালোবেসে ফেলল। বুঝলে, মেমসাহেবরা চট করে ভালোবেসে ফেলে। আমারও বয়স বাড়ছে, মনে হাঁকুপাঁকু। তাই প্রথম বিয়ের কথা গোপন করে বিয়ে করে ফেললাম আবার। আমার এ বউ গরিব অরফ্যান। ভাবলাম, গরিবের মেয়ে হয়তো বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। যথাসাধ্য টাকা—পয়সা খরচ করলাম তার জন্য, একটা বাসা করে দিলাম বন্দরের কাছাকাছি। মাস দুই হানিমুনে কাটালাম। তা আমার এ বউ টিকল। কয়েকবার টুর সেরে তার কাছে ফিরেছি। ফিরে যত্ন আদর পেয়েছি, দেশে ফেরার আনন্দ পেয়েছি। আস্তে আস্তে মন বসে যাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ায়। ভাবলাম, জাহাজের চাকরি ছেড়ে ওখানেই জমিজিরেত কিনে বসবাস করব। পোলট্রি, ফার্মিং করব। তা সেবার লম্বা টুরে বেরোনোর সময়ে মনে মনে ঠিক করলাম, এটাই শেষ টুর, আর জাহাজে না। হলদে জাহাজটায় বসবাস করতে করতে আমার মনে ন্যাবা ধরে যাচ্ছে। তা সেবার টুরে বছর দেড়েক লেগে গেল। বউ মাঝে মধ্যে অভাব দুঃখের কথা জানিয়ে টাকা—পয়সার জন্য লিখত। আমি গা করতাম না। মেয়েছেলেদের অভাব কে কবে মেটাতে পেরেছে বলো! দেশ—দু'বছর বাদে ফিরে বাসায় ঢুকতেই মনে হল, এ বাসাটা যেন কেমন কেমন! ঠিক আগেকার মতো ঘর—গেরস্থালির গন্ধ যেন পাচ্ছি না! বউ কেমন চোর—চোখে চাইছে, হঠাৎ হঠাৎ কথার মধ্যে ঝাঁঝ দিচ্ছে। বিছানায় শুয়ে কেমন যেন অন্য পুরুষের গায়ের গন্ধ পেলাম। তারপর পাড়ায় ঘুরে এ—মুখ সে—মুখ থেকে যা খবর পেলাম তাতে আমি তাজ্জব। আমার বউটা ভাড়াটে

মেয়েমানুষ হয়ে গেছে। জাহাজিদের এন্টারটেন করে। ভীষণ রেগে যখন বউয়ের ওপর চোটপাট করে কৈফিয়ত চাইলাম সে উল্টে ঝাড়ল আমাকে, তা কত টাকা—পয়সা আর সোনাদানা দিয়ে গেছ আমাকে? আমার পেট চলে কী করে? খুব ঝগড়া হল দু'জনে, এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা। তারপর আমি বুঝতে পারলাম, ঝগড়া করে লাভ নেই। মেয়েমানুষটা সত্যিই বেশ্যা হয়ে গেছে। কোনও কোনও মেয়েমানুষের মধ্যে নষ্টামির বীজ থাকে। বুঝলে! তারপরও তার কাছে তিন—চারদিন ছিলাম আমি। সেও রাগ—টাগ ঝেড়ে ফেলে আমাকে খুব খাতির যত্ন করল, অন্য কোনও পুরুষ সে ক'দিন ঘেঁষতে দিল না। কিন্তু আমি আর তাকে ঘরে তোলার চেষ্টা করলাম না। বাঁধা মেয়েমানুষের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে লোকে, সে রকমই ট্রিট করলাম তাকে। সে আপত্তি করল না। তারপর তাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে দিয়ে ভেসে পড়লাম আবার। কিন্তু মুশকিল হল, দুই বউয়ের জন্য দু'রকম দুঃখ মাঝে মাঝে বুকের দু'ধারে খামচে ধরে, মাথায় ঝাঁইঝাঁই শব্দ হতে থাকে। আর কেবলই মনে হয়, আমিই একমাত্র জাহাজি, যার ফেরা নেই, কেবলমাত্র যাওয়া আছে। জাহাজ ভোঁ দিলে আমার বুড়ো হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে, মরে যাওয়ার কথা মনে হয়। অবসর সময়ে মদ খেয়ে ঝুম হয়ে থাকি, আর তখন জাহাজের আনাচে—কানাচে ভূত দেখি। এরকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন কলকাতায় জাহাজ ভিড়ল। আমি পাগলের মতো 'মা' বলে ডাক দিয়ে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে নামলাম, দৌড় দিলাম গ্যাংওয়ে ধরে। ডাঙায় পা দিয়েই খেয়াল হল, মা তো নেই। অমনি আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। কার কাছে যাব? আবার ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ে ধরে ফিরলাম জাহাজে। শূন্য জাহাজ, সব জাহাজি গেছে ফুর্তি লুটতে। আমি একা একা ভূতুড়ে জাহাজটার আনাচে—কানাচে গিয়ে দাঁড়াই আর কাঁদি। কাঁদি মরা মা—বাপের জন্য, দুই বউ আর না—হওয়া বাচ্চা—কাচ্চার জন্য, কাঁদি দেশের জন্য, কলকাতার জন্য। এইরকম অবস্থায় কয়েকদিন পর আর এক অভিজ্ঞ জাহাজি আমাকে ধরে নিয়ে গেল ওয়েসিস বার—এ। স্যু—র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মেয়েটা বাংলা বলত, ইংরিজিও বলত। শাড়ি পরত, চেহারাটা ছিল সাদামাটা বাঙালি মেয়ের মতো। ভারি ভালো লেগে গেল তাকে, চোখ জুড়িয়ে গেল। বার থেকে সে আমাকে নিয়ে গেল তার ঘরে। ঘরে যিশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি ছিল, কালীর পটও ছিল। বিছানা পরিষ্কার, মাটির কুঁজোয় জল, হাতপাখা, সবই ছিল তার। ভারি আমুদে মেয়ে, বলল, তুমি এখানেই থাকো। থাকলাম। এক রাত্রে খুব জ্যোৎস্না ফুটল আকাশে। রাত তখন অনেক। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আমাকে স্যু বের করে আনল। ট্যাক্সি করে নামলাম ভিক্টোরিয়ার ধার ঘেঁষে। চারদিকে শুনশান, নির্জন। চুপি চুপি দেয়াল পার হয়ে বাগানে ঢুকলাম দু'জনে। ঢুকেই দেখি পৃথিবী ছেড়ে আমরা এক গভীর মায়ার রাজ্যে চলে এসেছি। চারিদিকে মায়াবী ফুল, শিশিরের জল, জ্যোৎস্নার মোম, নরম জলের শব্দ, মাটির সুগন্ধ—ওরকম সুন্দর দৃশ্য জীবনে দেখিনি। সামান্য মদ ছিল দু'জনেরই পেটে, ঝুমঝুম মাতাল ছিলাম দু'জনেই। আমরা আনন্দে ঘাসে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। হঠাৎ স্যু লাফিয়ে উঠে বলল, দেখো দেখো, কীরকম বৃষ্টির মতো জ্যোৎস্না পড়ছে। আঁজলা ভরে তুলে নাও। বলে দু'হাত ভরে জ্যোৎস্না খেতে লাগল। মাঝে মাঝে আমার দিকে মুখ তুলে বলে, ইস দেখো, কীরকম হাত উপচে গড়িয়ে পড়ছে, আঁঠার মতো ঘন... কী মিষ্টি... কী স্বাদ...! দেখতে দেখতে আমি ঠিক তার মতো আঁজলা পেতে দিলাম শূন্য আকাশের তলায়। কী আশ্চর্য, অমনি টলটলে ঘন জ্যোৎস্নায় ভরে গেল আঁজলা, উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগল। চুমুক দিয়ে দেখি, কী স্বাদ! কী গন্ধ! যত খাই, পিপাসা বেড়ে যায়, ক্ষুধা বাড়ে, শরীর তেজি ঘোড়ার মতো ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। সেই জ্যোৎস্না দেখি, গড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের ওপর, মিশছে জলে, গাছ বেয়ে পড়ছে টুপটাপ। আমরা আঁজলা ভরে খেলাম, ঘাস থেকে চেটে নিলাম, জলে মুখ ডুবিয়ে খেলাম। জ্যোৎস্নায় স্নান করলাম দু'জনে। যতক্ষণ জ্যোৎস্না ছিল ততক্ষণ এক মুহূর্ত আমরা জ্যোৎস্না খাওয়া ছাড়িনি। সে এক অতি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তিন—চারদিন ছিলাম স্যু—র কাছে। সারা দিনটা রাত্রির অপেক্ষায় কাটত। সন্ধেবেলা দু'জনে হালকা মদ খেয়ে নেশা করে নিতাম। চোখে চোখে আমাদের গোপন বোঝাপড়া হত। রাত গভীর হলেই বেরোতাম জ্যোৎস্নায়। পার হতাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিচু দেওয়াল। শুরু হত জ্যোৎস্না খাওয়া। আহা!

জাহাজিটা চুপ করে অতীতের কথা ভাবে একটু। লম্বা রথম্যান সিগারেট গৌরের আঙুলে ছ্যাঁকা দিচ্ছে ছোট হয়ে। জাহাজিটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদভ্রান্তের মতো গৌরের দিকে চায়, বলে, এসব আড়াই—তিন বছর আগেকার কথা, সেই শেষবার কলকাতায় এসেছিলাম। তারপর কত জায়গায় গেছি, কতবার জ্যোৎস্না রাতে মাতাল হয়ে জ্যোৎস্না খাওয়ার চেষ্টা করেছি কত মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখেছি আঁজলায় কিছু নেই। ফাঁকা। বুঝেছি, স্যু ছাড়া আর কেউ পারে না জ্যোৎস্না খাওয়াতে। সারা পৃথিবীতে একমাত্র স্যু পারে। খুব ভাগ্যবান কেউ কেউ স্যু—র দেখা পায় তারা জ্যোৎস্নার স্বাদ জেনে যায়। আর কেউ জানে না।

জাহাজিটা রথম্যানের প্যাকেটটা গৌরের ডান হাতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করে। বলে, বার ওয়েসিস, স্যু, তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও।

গৌর একটু সময় নেয়। ব্যাপারটা তার এখনও হজম হয়নি।

জাহাজিটা মিনতি করে, দশটার পর স্যু থাকবে না, বার বন্ধ হয়ে যাবে, মেট। মেয়েমানুষের সঙ্গে পুরুষের যে ব্যাপার স্যু—র সঙ্গে আমার তা নয়। আমি আর—একবার সেই জ্যোৎস্না খাব। তেষ্টায় বুক জ্বলে যাচ্ছে। গত তিন বছর ধরে আমি কলকাতায় আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আজই জাহাজ ভিড়েছে। দুপুর গড়িয়ে নামার পারমিশান পেয়েছি। অন্য জাহাজিরা পাছে স্যু—র কথা জেনে যায় সেই ভয়ে আমি নেমেছি সবার পরে। এমনই কপাল, সব জাহাজি গাড়ি পেল, বাদে আমি। দু'ঘণ্টা ধরে একটা ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করেছি, একটাও থামেনি। সবশেষে তোমার ফাঁকা ট্যাক্সিটা দেখে উঠে বসে আছি, আমাকে পেলে যেয়ো না, সেই জ্যোৎস্না স্যু ছাড়া আর কেউ খাওয়াতে পারে না মেট। সে পৃথিবীর জিনিস না। সেই মায়াবী বাগান, জ্যোৎস্না, সেইসব ফুল, স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। কী নেশা তার। বয়স কমে যায়। চোখের জ্যোতি বাড়ে। শরীর ফুঁসে ওঠে। আর—একবার সেই জ্যোৎস্না খেতে পারলে আমি আর কোথাও যাব না। মেট, তাড়াতাড়ি করো, স্যুকে যদি অন্য কেউ নিয়ে নেয়।

ঠিক হয় তবে।—গৌর বিড়বিড় করে তার মিটারের ঢাকা খোলে, বন্ধ করে গেট। বিড়বিড় করে বলে, দুনিয়ার যত মাতাল আর পাগল গৌরার গাড়ির জন্য রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। চল বাবা ল্যান্ডু, জাহাজিটাকে খালাস দিই।

গৌর গাড়ি ছাড়ে। পিছনের সিটে ঝিম মেরে থাকে জাহাজিটা। আয় বাবা ধরমতলা, বার ওয়েসিস, জাহাজিটাকে ডেলিভারি দিই। গৌর বিড়বিড় করে। জ্যোৎস্না খাবে, মাইরি, জ্যোৎস্না খাবে! আই! গৌরের ব্যাপারটা হজম হয় না। সে আয়নায় দেখে, জাহাজিটা গম্ভীর স্থিরভাবে ঝুম মেরে আছে। আলোকিত এসপ্ল্যানেড গৌরের দিকে ছুটে আসতে থাকে।

বার ওয়েসিনের সামনে গাড়ি দাঁড় করায় গৌর। জ্যোৎস্না খাবে! মাইরি! গৌরের ধন্দ লেগে আছে এখনও। জাহাজিটা দরজা খোলার জন্য খুটখাট করে, পারে না। গৌর হাত বাড়িয়ে খুলে দেয়। জাহাজিটা নামে। একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, কিপ ইট মেট। বলে হাত তুলে বিদায় জানায়। একটু টলমলে পায়ে উজ্জ্বল শুঁড়িখানার দিকে চলে যেতে থাকে।

গৌর চেঁচিয়ে ডাকে, এই, চেঞ্জটা নিয়ে যাও।

জাহাজিটা শুনতেই পায় না।

ভারী অপমান লাগে গৌরের। বখশিশ—টখশিশ সে কখনও নেয় না, দরকার মতো মিটারের বেশি পয়সা নেয় নিজের ইচ্ছেমতো। টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটাকে কে দয়া করবে? কোন মালদার? বাপ বগলু তাকে স্বাধীন করে দিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে কার দয়া ভিক্ষা করেছে?

গৌর মিটার দেখল। দেড় টাকা। ফেরত—টাকা গুনে গেঁথে হাতে নিল সে। ফুটো পয়সার জাহাজিটার দয়া গৌর রিটার্ন দেবে।

সাবধানে গাড়িটা লক করে গৌর নামে। লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তারপর ধীরেসুস্থে ফুটপাথ পার হয়ে কাচের দরজা ঠেলে শুঁড়িখানাটায় ঢুকে পড়ে।

ভিতরে, শুঁড়িখানায় যেমন হয়, তেমনি নরম আলো—টালো, চেয়ার—টেবিল, কয়েকজন গম্ভীর মাতাল। লম্বা কাউন্টারের ওপাশে কাচের ঝিলিক, নানা রঙের বোতল চিকমিক করে। সেই কাউন্টারে কনুইয়ের ভর রেখে তিন—চারজন মেয়েছেলে।

গৌর দরজার কাছে তার শুখো পায়ের ওপর তেরছা হয়ে দাঁড়ায়। চারদিক দেখে। জাহাজিটাকে নিম—আলোয় ঠিক ঠাহর করতে পারে না। আরও দু'—এক পা এগোয় গৌর। দু'—একজন মুখ তুলে তার নেংচে—হাঁটা দেখে, একটা মেয়ে নিঃশব্দে হাসে, একজন বেয়ারা মাঝপথে থেমে তাকায়।

গৌর দেখতে পায় ছায়ার মতো জাহাজিটা সারা শুঁড়িখানা চক্কর দিয়ে দরজার দিকে আসছে।

গৌর হাত তুলে ডাকে, এই।

জাহাজিটা তার দিকে তাকায়, বিড়বিড় করে। এগিয়ে এসে গৌরের দু'কাঁধ দু'হাতে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, নেই। এখানে নেই। আচ্ছা দাঁড়াও।

বলে গৌরের হাত ধরে টানতে টানতে কাউন্টারের দিকে এগোতে থাকে।

কী হচ্ছে! ছেড়ে দাও।

জাহাজিটা কেবল চাপা গলায় বলে, কম অন। স্যুকে এই খানে না পেলে অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। কম অন।

কাউন্টারের স্যুট—পরা লোকটা মুখ তোলে। জাহাজিটা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চোস্ত জাহাজি ইংরিজিতে বলে, স্যু, শ্যামলা পাতলা চেহারা, মিষ্টি মুখ, চোখের পাতা ভারী ভারী, খুব ফুর্তিবাজ, তিন বছর আগে এইখানে তাকে দেখেছিলাম, খোঁজ দিতে পারো?

লোকটা চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে, না। ও নামে কাউকে চিনি না। তিন বছর লম্বা সময়, কত কী হয়ে যায়!

বলে লোকটা হাসে।

কাউন্টারে দাঁড়ানো মেয়েদের সবচেয়ে কাছের জন জাহাজিটার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় বাংলায় বলল, আমরা সবাই স্যু, কেউ কু নই গো!

বলে হেসে অন্য একটি ময়ের কাঁধে শরীর ছেড়ে দিল।

জাহাজিটা গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে তাকে দ্যাখে, তারপর হতাশ গলায় বলে, না, তোমরা নও। স্যু অনেক জাদু জানত। সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

শোন লতিকা!—বলে সেই মেয়েটি আবার আগের মেয়েটির কাঁধে হেসে গড়াল। দু'জনেই হাসতে থাকে। গৌরের কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। বগলুর পোলা গৌরা এ কোন গাড্ডায় এসে পড়েছে। জাহাজিটা ধরে আছে তার শুখো বাঁ—হাতখানা। কমজোরি হাতটা তার, ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নেওয়ার উপায় নেই, চেঁচামেচিও করা যাচ্ছে না।

জাহাজিটা ঠোঁট চেটে বলে, বড় তেষ্টা। চলো একটু বিয়ার খাই।

গৌর মাথা নাড়ে, আমি না। চেঞ্জটা ফেরত নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।

সেসব কথায় কানই দেয় না জাহাজি। বলে, তেমন কিছু না। একটু বিয়ার, এসো।

তার শুখো হাতখানা ধরে টেনে নেয় জাহাজি, এক টেবিলে পাশাপাশি বসে হাতখানা ধরে রাখে। ফিসফিস করে বলে, তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না মেট। কলকাতায় এক স্যু ছাড়া তোমাকেই আমি চিনি। তুমি ভালো লোক।

দুটো বাহারি কাচের জগ—এ বিয়ার আসে। আসে সেঁকা পাপড়, শসা আর পেঁয়াজের চাক। গৌর কিছু বুঝবার আগেই এসব ঘটে যায়। তখনও তার ডানহাতের মুঠোয় ফেরত পয়সা, বাঁ—হাতখানা জাহাজির কবজায়। ধন্দ ভাবটা গৌরের এখনও কাটেনি। মাথাটা ঝিমঝিম করে। সে একটু ভাববার চেষ্টা করে, এসব কী হচ্ছে! চোখ বন্ধ করে পুরো ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল গৌর, অমনি তার মাথার মধ্যে

একখানা মল—পরা পা ঝম করে তাকে সতর্ক করে দিল। অমনি চোখ খোলে গৌর। মাথা নেড়ে ভাবনা—চিন্তা তাড়াবার চেষ্টা করে।

মদ সে কখনও খায়নি, এমন নয়। খেয়েছে শখে শখে, নেশা করেনি। কিন্তু নেশা করলেই বা কী? এ দুনিয়ায় গৌরের আর ক্ষতির ভয় কী? যদি সে নিজে টিঁকে থাকে, আর থাকে তার ল্যান্ডমাস্টারখানা, তো এই জীবনটা পিছলে বেরিয়ে যাবে গৌর।

বুক জুড়ে তেষ্টা ছিল। হাতটা ছাড়ানো গেল না। মাথার মধ্যে মল—পরা পা আর—একবার ঝম করার জন্য ধীরে ধীরে উঠছে, টের পেল গৌর। এখনই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া দরকার। সে ঠান্ডা জগটা ঠোঁটে তোলে। তারপর আকণ্ঠ ডুব দেয় একটা। জাহাজিটা এক চুমুকে সবটা টেনে নেয়। তারপর মুখ তুলে বলে, বড্ড তেষ্টা। বেয়ারা!

বেয়ারা বিনীতভাবে টেবিলে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়।

আরও।

বেয়ারা জগ ভরে দিয়ে যায়।

মেয়েছেলেগুলো ঘুরঘুর করে চারপাশে। একটুক্ষণ। তারপরই ঝুপ করে মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়ে দু'জন। কাউন্টারে দাঁড়ানো সেই দু'জনই।

একটু খাওয়াও না গো! বড্ড চেষ্টা পেয়েছে!—যে মেয়েটা হেসেছিল সে বলে। তার চোখেমুখে সত্যিকারের তেষ্টা ফুটে আছে। কাছ থেকে এখন তার ভাঙা মুখ, মুখে ঘামে—ভাসা পাউডার, চোখের গাঢ় কাজল দেখা গেল। সিঁথির কাছে চুল পাতলা হয়ে প্রায় টাক দেখা যাচ্ছে।

তার সঙ্গিনী সেই লতিকা। একটু মোটাসোটা, কালো, পুরু ঠোঁট, বেশি বয়স। মুখখানা গোল, কপাল বেরিয়ে এসেছে ঝুলবারান্দার মতো। সে হাত বাড়িয়ে গৌরের জগটা ধরবার জন্য উদ্যত হয়েও ঠিক সাহস পায় না, হাতটা টেবিলের ওপর ওইভাবেই ফেলে রেখে বলে, নতুন পেগ না নাও, তোমাদের গেলাস থেকেই ঢেলে দাও একটু করে।

বলে সে টেবিলে উপুড় করে রাখা পাতলা গ্লাস উলটে বাড়িয়ে ধরে, দাও।

এইসব মেয়েছেলেদের বিস্তর দেখেছে গৌর। প্রায় একই রকম শ্রীহীন চেহারা, কেউ একটু রোগা, কেউ মোটা। মুখে প্রচুর পাউডার, লিপস্টিক, চোখে কাজল, পরনে ঝলমলে শাড়ি। তার ল্যান্ডমাস্টারে মাঝে মাঝে এরকম মেয়েরা খদ্দেরের পয়সায় ফুর্তি লোটে। টের পেলে তোলে না গৌর, ভুল করে তুললে আয়নায় বিস্তর নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখা যায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় হলে গৌর তাড়া দিত, কিন্তু বিয়ারের ঝাঁঝটা তার পেট থেকে মগজে রিনরিন করে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন ওজন নেওয়ার যন্ত্রে পয়সা ফেললে রিনরিন শব্দটা বহুদূর গভীরে গড়িয়ে যায়। গৌর তাই রাগ করে না। কেবল অবাক হয়ে বলে, এঁটো খাবে?

এঁটো আবার কী গো!—প্রথম মেয়েটা বড় চোখে চেয়ে হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, মুখের এঁটোকে এঁটো ধরলে আমরা তো পচে গেছি।

আমাদের সবকিছু এঁটো।

বড় অশ্লীল কথা। অঙ্গভঙ্গিও ভালো না। গৌরের বড়ো ঘেন্না করে। সে অর্ধেক জগ মোটা মেয়েটার গ্লাসে ঢেলে দেয়, বাকি অর্ধেক টেনে নেয় নিজে। তারপর শ্বাস ছেড়ে মেয়ে দুটোকে বলে, এবার ফোটো। যথেষ্ট হয়েছে।

জাহাজিটা জগ—এ লম্বা ডুব মেরে মুখ তোলে। মেয়েদুটোর দিকে তাকিয়ে মাতাল হাসি হাসে, বলে, আরও খাবে? খাও। বেয়ারা!

মেয়েদুটো আনন্দে, সুখে ভেসে যায়। বেয়ারা বিনীতভাবে দুটো জগ ভরে দিয়ে যায়।

এবার বলো।— জাহাজিটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

কী?—মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে।
স্যু—র কথা।
মেয়েদুটো রুমালে মুখ চেপে হাসে।
কেমন ছিল তোমার স্যু?—রোগা জন জিজ্ঞেস করে।
লম্বা। সোনালি চুল। নীল চোখ। খুব ফরসা।
যদিও মাথাটা একটু গুলিয়ে যাচ্ছে তবু গৌর বোঝে জাহাজিটা ঠিক কথা বলছে না। সে মুখ ফিরিয়ে বলে, এই, তুমি যে একটু আগে বললে, শ্যামলা রং, চোখের পাতা ভারী ভারী।
লম্বা রথম্যান ধরিয়ে জাহাজিটা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ভাববার চেষ্টা করে বলে, বলেছি?
নিশ্চয়ই।—গৌর ডানহাতে টেবিলে চাপড় মারে।
জাহাজিটা শ্বাস ছেড়ে বলে, তবে তাই।
মাতাল।—গৌর হাসে।
জাহাজিটা প্রশ্ন করে, চেনো?
মোটা মেয়েটা মাথা নাড়ে, না।
সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।
রোগা মেয়েটা তার লম্বা দাঁতগুলো বের করে গরগরে হাসি হাসে, জ্যোৎস্না আমরাও খাওয়াতে পারি। চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ, কত কী খাওয়াই আমরা।
জাহাজিটা স্থিরভাবে মেয়েটিকে লক্ষ করে, তারপর গম্ভীর গলায় বলে, পৃথিবীর সাত ঘাটের মেয়েমানুষ আমাকে ওই কথা বলেছে। কেউ পারেনি। তিন বছর ধরে আমার বুক তেষ্টায় কাঠ হয়ে আছে।
গৌরকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাহাজি।
চলো মেট, সময় নেই।
তারপর মেয়েদুটোর দিকে চেয়ে বলল, তোমরা খাও। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না, তার জন্যে দুঃখ কোরো না। সময় বড় মূল্যবান, নইলে আমি তোমাদের সঙ্গে আর একটু সময় কাটাতাম।
জাহাজিটা বিল মেটায়। গৌরের হাত ধরে বেরিয়ে আসে।
গৌর চারদিকে একটা রিমঝিম আনন্দকে টের পাচ্ছিল। ঠিক নেশা নয়। কিন্তু রাস্তা দোকান সিনেমাহল—এর আলোগুলো আরও রঙিন, মানুষেরা ভারী আনন্দিত। চরাচর জুড়ে ফুর্তির বাতাস বয়ে যাচ্ছে। জাহাজিটাকে মনে হচ্ছে বহুকালের পুরনো বন্ধু, মাঝখানে কেবল একশো বছর দেখা হয়নি।
দু'জন সৈন্যের মতো পায়ে পা মিলিয়ে তারা পাশাপাশি হেঁটে ল্যান্ডমাস্টারের কাছে আসে।
এবার কোথায়?
জাহাজিটা চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ে, স্যু যেখানে। খুঁজে বের করতে হবে। কাছাকাছি কোনও বার—এ সে আছে।
গৌরের এখনও যাকে নেশা বলে তা হয়নি ঠিক। গাড়িটা সে দিব্যি চালায়। জাহাজি তার বাঁ পাশে, মাঝখানে সিটের ওপর রথম্যানের প্যাকেটটা পড়ে আছে। সবই বুঝতে পারছে গৌর। না, নেশা হয়নি। গাড়িটা মাখনের মতো যাচ্ছে।
ব্যস মেট। একবার এ জায়গাটা—
জাহাজি হাত বাড়িয়ে গৌরের হাত চেপে ধরে।
গৌর গাড়ি থামায়। বাঁ পাশে আর—একটা বার। খুব বড় নয়, কিন্তু জায়গাটার বেশ ফুর্তিবাজ চেহারা। আলোয় আলোময়। দুঃখ—কষ্টের কথা ভুল পড়ে যায় মানুষের।
জাহাজি হাত ছাড়ে না।

নামো।

গৌর হাই তুলে বলে, আমি বরং বসে থাকি, তুমি খুঁজে এসো।

না, আমি একা খুঁজে পাব না। শহরটা বড় অচেনা লাগছে, নামো মেট।

গৌর নামে।

জায়গাটা ফুর্তিবাজ ঠিকই। ঢুকতেই আচমকা একটা মোলায়েম শীতভাব জড়িয়ে ধরে। গিজগিজ করছে লোকজন, কাউন্টারে বেয়ারাদের ভিড়। একধারে কাঠের পাটাতনে মাইক্রোফোনের মাউথপিস মুখের কাছে ধরে দরাজ গলায় গান গাইছে কালো চেহারার একটা লোক, বোঙ্গো বাজছে দমাদম। লোকটা দুলে দুলে ঘুরে ঘুরে গায় হিন্দি বিষাদসংগীত। তবু ফুর্তির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সুদিন এসে গেছে এইখানে। গান গাইছে টাবু। টাবু সিংগস! আঙুরের রস তার গলা ছুঁয়ে ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে মনের গেলাসে।

সিনেমার মতোই কাচ লাগানো একটা কাউন্টারের ওপাশে সাহেবি চেহারার দু'জন লোক ভারী ব্যস্ত। টাকা—পয়সা গুনে নিচ্ছে। জাহাজিটা কাচের ওপর টোকা দিতে দু'জন মুখ তোলে।

স্যু নামে একটি মেয়ে, গায়ের রং শ্যামলা, বাদামি চুল, নীল চোখ—

মাতাল। গৌর হাসে। বলে, অ্যাই, গায়ের রং শ্যামলা হলে চোখ নীল হয় কী করে? অ্যাঁ!

হয় না?—ভারী অবাক হয় জাহাজি। বলে, তবে কী রকম চোখ ছিল তার?

গৌর একটু ভাববার চেষ্টা করে। মাথা রিমঝিম করে তার। তবু বুদ্ধি খাটিয়ে সে বলে, কালো।

তো তাই।

জাহাজিটা আবার লোকদুটোর দিকে ঝুঁকে বলে, তার চোখ আর চুল কালো, খবর দিতে পারো? লোকদুটো গম্ভীর বিনীত মুখে শোনে। একজন নরম গলায় বলে, দুঃখিত। আমাদের এখানে নেই।

আমরা একটু ঘুরে দেখি জায়গাটা?

অফ কোর্স। বেয়ারা নিয়ে যাবে তোমাদের।

আধবুড়ো ভদ্র এক বেয়ারা তাদের নিয়ে যায়। টাবুর গান থেকে দূরে ছায়াচ্ছন্ন কোণের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলে, ড্রিংকস?

হুইস্কি।—বলে ক্লান্তিতে টেবিলে মাথা রাখে জাহাজি।

এই!

ডাক দেয় গৌর।

অনেকক্ষণ বাদে মাথা তোলে জাহাজি। চোখ রক্তজবা। গলায় টাবুর বিষাদসংগীতের বিষাদ এসে বাসা নিয়েছে। বলে, এখানে স্যু নেই। এসব তার জায়গা নয়। আরও নিরিবিলি জায়গায় তার থাকার কথা।

বোঙ্গোর শব্দ মৃদু গুঁড়ো হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। টাবু তার বিষাদসংগীতের করুণতম অংশে এসে গেছে। ঘুমপাড়ানির মতো মৃদু, অশ্রুরুদ্ধ তার গলা। যেন বা এই রাত আর ভোর হবে না। মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে পৃথিবী। টাবুর অনন্ত বিষাদ বুকে নিয়ে সরে যাবে মানুষ। লোকে তাই শেষ আনন্দটুকু গেলাস থেকে তুলে নিক।

গৌর নিল। জাহাজিও।

আমি জানি স্যু এখানে নেই। এখানে থাকলে তার গায়ের গন্ধ পেতাম।—জাহাজিটা ফিসফিসিয়ে বলে।

গৌরেরও তাই মনে হয়। তার চোখে কোনও মেয়েছেলে পড়ে না। তবু সে একবার চারদিক চেয়ে দেখে, না, নেই।

হঠাৎ উদ্দাম হয়ে ওঠে বোঙ্গোর শব্দ। দুলে ওঠে টাবু। আশা—নিরাশায় দোলে মানুষের মন।

চলো মেট।

গেলাস শেষ করে গৌর ওঠে। একটু দোলে তার শরীর। মাথা ফাঁকা লাগে। তবু বলে, চলো।

কোথাও না কোথাও আছেই।—জাহাজি আত্মবিশ্বাসে বলে।

গৌর তা বিশ্বাস করে। কলকাতার জ্ঞান তার নখে নখে। কোথায় যাবে জাহাজির মেয়েছেলে স্যু? গৌর ঠিক বের করবে।

যদিও একটু দুলছে কলকাতার রাস্তাঘাট, তবু গৌর, বগলুর ছাওয়াল, যার হাতে গাড়ি কোনওদিন ঘষাটাও খায়নি, ঠিক গাড়িটা বের করে আনল চৌরঙ্গির বড় রাস্তায়।

ওই যে দেখছ উঁচু মিনার, ওই যে—

এই বলে জাহাজি গৌরকে কনুইয়ে ঠেলা দিয়ে অদূরের মনুমেন্টটা দেখায়। গৌর দেখে।

জাহাজি গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে, এই মিনারটা আমি আমার মায়ের চিতার ওপর তুলেছিলাম। ভালো হয়নি?

মনুমেন্টটাকে আবার ভালো করে দেখে গৌর। দেখে—টেখে মাথা নেড়ে বলে, ভালো। দিব্যি উঁচু।

আই!

জাহাজি শ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়।

পার্ক স্ট্রিটকে কখনও কলকাতা বলে মনে হয় না গৌরের। বিয়ারের মাথায় হুইস্কি বসে আছে পেটে। এখন তাই আরও মনে হয় না। স্পষ্টই যেন লন্ডনের এক রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করায় গৌর।

জাহাজি বলে, লন্ডন হুবহু এরকম।

গৌর হাসে।

সামনেই একটা বিশাল রেস্তোরাঁর চওড়া মুখ, সে মুখে হাসি।

গেট—এর কাছে দু'জন সাহেবি পোশাক পরে দাঁড়ানো। তারা সিঁড়িতে পা দিতেই দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল আপনা থেকেই। ভারী অবাক হয় গৌর। এরকম জাদুই দরজা সে আর দেখেনি। দরজাটা পরখ করার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে, জাহাজিটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

কম অন। সময় নেই। এখনও আকাশে জ্যোৎস্না রয়েছে, দেখছ না?

গৌর আকাশ দেখার জন্য মুখ তুলল। তুলে দেখল, সুন্দর সিলিং, তাতে নরম রঙের ওপর মানুষের কত কারুকাজ, কাচে ঢাকা আলো। জ্যোৎস্নার মতোই। কিংবা ঠিক জ্যোৎস্নার মতো নয়। কিন্তু সুন্দর।

তারা কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটে। কী নরম! এরকম কার্পেটের ওপর হাঁটলে গৌরের শুখো পায়ে কোনও ব্যথা লাগে না। কার্পেটটা একবার ছুঁয়ে দেখার জন্য হাঁটু গেড়ে বসতে যাচ্ছিল গৌর। জাহাজি তাকে টেনে তুলল।

সময় নেই মেট।

ওঃ হ্যাঁ, ঠিক। গৌর বুঝতে পারে।

এমন সুন্দর জায়গা, তবু কেউ কোথাও তাদের পথ আটকায় না। বলে না ভিতরে যাওয়া বারণ। কেন বলে না? অ্যাঁ! গৌর বুঝতে পারে না। তার দাদা রাখোহরি যখন এসব জায়গায় আসত, গৌরই পুরনো ডজ গাড়িটায় নিয়ে আসত তাকে। স্যুট আর বো পরা বিলেতফেরত সুন্দর চেহারার রাখোহরি অনায়াসে ঢুকে যেত সব জায়গায়। পালকের ঝাড়নে ডজ গাড়িটার গা মুছতে মুছতে ভয়ের চোখে চেয়ে দেখত গৌর। তার ধারণা ছিল, হাফ—ফিনিশ গৌরার এসব জায়গায় অ্যাডমিশন নেই। সেই ধারণা নিয়েই সে এত বড়টা হল। অথচ আশ্চর্য! আশ্চর্য! সব দরজা খুলে যাচ্ছে আপনা থেকে, একটু নেংচে হাফ—ফিনিশ গৌরা, বগলুর ছাওয়াল, অর্থাৎ কিনা বগলাপতির তিন নম্বর, আজ যে সব জায়গায় চলে যেতে পারছে! কী হচ্ছে এসব। অ্যাঁ! এরকম আর দেখেনি গৌর। প্রজাপতি, রামধনু, সুন্দরীর চোখ, এইসব জিনিস দিয়ে যেন তৈরি হয়েছে এই দোকান। এখানে দেয়াল নেই, কড়িকাঠ নেই, দরজা জানালা নেই, কেবল আলো আর রং, গন্ধ আর সুন্দর শব্দ, একটু স্বপ্ন আর কল্পনার মিশেল। পৃথিবীরই, তবু ঠিক পৃথিবীতে নয়। একটু উঁচুতে যেন বা

বাতাসে ভর করে আছে জায়গাটা। বাতাসে ভর করে আছে? সত্যি? পরীক্ষা করে দেখার জন্য কয়েকটা লাফ দিল গৌর। দেখল দোলে কি না। হ্যাঁ, দোলে। একটু একটু।

জাহাজি তাকে টেনে বসায়, গভীর পালকের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে গৌর। টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে ডুবে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচায়।

কে যেন মুখের কাছে ভরা গেলাস রাখে। গৌর ঠোঁটে তোলে গেলাস। আনন্দে চোখের জল নেমে আসে।

একটা ভিতর প্রকোষ্ঠের দরজা নিঃশব্দে খোলে। উদ্দণ্ড ড্রামের শব্দ, সাপুড়ের বাঁশির শব্দ শোনা যায়। আবার দরজা বন্ধ হয়। শব্দটা ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো টিপটিপ করে বাজে।

জাহাজিটা হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ায়।

চলো মেট, শিগগির।

কোথায়?

ওইখানে। ভিতরে কোথাও নাচ হচ্ছে, একটা মেয়ে, স্যু হতে পারে।

গৌর ওঠে।

সত্যিই একটা রঙিন দরজা রয়েছে। সামনে সতর্ক পাহারা। তারা দরজার সামেন দাঁড়াতেই একটা হাত এগিয়ে আসে।

টিকিট?

জাহাজি হিপ পকেট থেকে টাকার গোছাটা টেনে বের করে। অফুরন্ত টাকা। দরজা খুলে যায়।

লোলা নাচছে স্পটলাইটে। আলো থেকে অন্ধকারে চলে যায় লোলা। আলোটা ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বের করে। লোলার বাদামি শরীরের চামড়া যেন তেল মাখা। চামড়ার তলায় তার খেয়ালি নরম মাংসের ঢেউ। কোমরে জাফরান রঙের পুঁতির ছোট্ট ঘাগরা, বুকে জাফরানি পুঁতির কাঁচুলি, মাথার চারদিকে ঘিরে আছে এক সবুজ সাপ, চুলের চূড়ার ওপর তার ফণা। আলো থেকে অন্ধকারে, আবার আলোয়, মায়াবী যাতায়াত করে লোলা। পৃথিবীর পুরুষকে ডাক দেয় তার পায়ের তলায়। নরমুণ্ড লুটিয়ে পড়ে পায়ে। লোলা অন্ধকারে, আবার আলোয়, আবার অন্ধকারে, তার জাদুকরী মুদ্রাগুলি ছিটিয়ে দেয়। আলো তাকে চঞ্চল হয়ে খোঁজে, খোঁজে অন্ধকার। চারদিকে অনেক মানুষ, কাউকে দেখা যায় না। কেবল অন্ধকারে সিগারেটের আগুন তীব্র হয়ে উঠে মিইয়ে যায়। শ্বাস পড়ে, শ্বাস ওঠে, কাউকে দেখা যায় না। চরম মুহূর্তের কাছে উঠে যায় ড্রামের অসহ্য আনন্দের শব্দ—লোলা—লোলা—লোলা।

হঠাৎ আলো নিভে যায়। গৌর টপ করে চোখ বুজে ফেলে। আজ পর্যন্ত সে কখনও ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখেনি।

অন্ধকারেই জাহাজি তার হাত চেপে ধরে, মেট, এ নয়।

নয়?

নাঃ।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে তারা বেরিয়ে আসে। পিছন ফিরে তাকায় না। কিন্তু তখন লোলা তার ঘাগরা ছেড়েছে, কাঁচুলি দিয়েছে ফেলে। অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে। পাগলের মতো আলো তাকে খুঁজছে। লোলা দু'হাত বাড়িয়ে আলোকে বলছে। এসো, এসো, এইখানে পৃথিবীর প্রিয়তমা লোলা।

তবু সে স্যু নয়। হতাশ জাহাজিকে সে খাওয়ায়নি অলৌকিক জ্যোৎস্না। দুটি দুঃখী লোক তাকে অবহেলা করে চলে গেল।

দুটি মানুষের কাছে ব্যর্থ লোলার নগ্ন শরীরে তখন লাল নীল সবুজ আলোগুলো পাগলের মতো এসে আঘাত করছে, মাঝে মাঝে এগিয়ে যাচ্ছে। আর তখন গৌরের ল্যান্ডমাস্টার পার্ক স্ট্রিট ছেড়ে উড়ে যেতে থাকে স্যু—র খোঁজে।

আই! গৌর টের পায়, গাড়িটা উড়ছে। উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে পার্ক স্ট্রিটের আলোর ধাঁধা। গৌর চোখ কচলে নেয়। মোড়ের ট্র্যাফিক—বাতি দেখতে পাচ্ছে না সে, দেখবার দরকারই বা কী! গাড়িটা উড়ছে যখন।

মেট। —জাহাজি মৃদুস্বরে বলে।

উম।

নেশাটা কেটে যাচ্ছে। কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়।

হবেও বা। গৌর জানে না। সে ঝুঁকে রাস্তাটা দেখে। ফাঁকা হয়ে এসেছে রাস্তা। চোরাগলির অন্ধকার মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। চলেছে মাতাল, ভিখিরি, মতলববাজ লোক, এসবের ওপরে ওই আকাশ। জ্যোৎস্না ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। ওই আকাশে থাকেন ফাদার ফ্রান্সিস। তাঁকে ঘিরে থাকে স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল সবুজ বল গড়িয়ে সারা দিনমান শিশুদের সঙ্গে খেলা করেন ফাদার। পৃথিবীর ওপরে যে আকাশটা আছে সেটা মানুষের বাবার ভাগ্যি। গৌর মাঝে মাঝে তাই চোখ তুলে আকাশখানা দেখে। ভারী খুশি হয়। গাড়িটা আর—একটু উঁচুতে উঠে যায়। ভালো লাগে গৌরের। সে মুখ ফিরিয়ে বলে, দেখ, কত উঁচুতে উঠেছি।

জাহাজিটা গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে চায়, তারপর বলে, আর একটু ওপরে ওঠো মেট। স্যু বোধহয় পৃথিবীতে নেই। এখানে বড় ধুলো ময়লা, নোংরা মানুষ। এ সব দেখে সে বোধহয় উঁচুতে উঠে গেছে।

মাতাল। গৌর আপনমনে হাসে। একটা লাল সিগন্যাল পেরিয়ে যায়। পুলিশ নেই। কেউ তাকে থামায় না।

জাহাজিটা এলিয়ে পড়েছে সিটে। বিড়বিড় করে বকছে, বাড়ি—বাড়ি খুঁজব। ভিখিরিদের মুখ দেখে দেখে ফিরব। প্রতিটি শুঁড়িখানায়, বেশ্যার ঘরে, দোকানে, অফিসে। কোথায় যাবে স্যু?

গৌর রাস্তাটা ভালো দেখতে পায় না। কুয়াশা হয়েছে নাকি? কিংবা স্বপ্ন দেখছে? সামনের রাস্তাটা জুড়ে পরি নামছে। শিশু—পরি সব। ন্যাংটো, ফরসা, সুন্দর। দুটো করে ছোটো ডানা। গাছে গাছে ফলের মতো জুল খাচ্ছে। রাস্তায় খেলা করছে। ব্রেক কষে গৌর। চোখ মুছে নেয়। হর্ন দেয়। চাপা পড়বে যে বাবারা সব! ওড়ো, উড়ে যাও।

তারপরই হাসে গৌর। চাপা দেবে কী? উড়ন্ত গাড়ি কাউকে চাপা দেয় না। গৌর আবার গাড়ি ছাড়ে। আকাশে ফাদার ফ্রান্সিস রয়েছেন। শিশুদের তিনি সরিয়ে নেবেন। ভয় নেই।

কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়, বুঝলে মেট? ভীষণ জল মেশায়।—বলে হেঁচকি তোলে জাহাজি।

গাড়িটা জোরে চালাও মেট। নইলে জমছে না। আমার নেশা কেটে যাচ্ছে।

পাগলা! জোরে চালালে ওদের গায়ে ধাক্কা লেগে যাবে।

কাদের?—জাহাজি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

ওই যে, পরিরা নেমেছে সব। বাচ্চা পরি, ভালো উড়তে শেখেনি এখনও।

জাহাজি ঝুঁকে রাস্তাঘাটে পরি দেখার চেষ্টা করে।

কোথায় পরি?

শালা মাতাল। দেখতে পাচ্ছে না। গৌর হাসে।

ওই তো। সব জায়গায় রয়েছে। গাছে ঝুল খাচ্ছে, রাস্তায় খেলছে, আকাশে উড়ছে, কোথায় নেই? ওই দেখো একজন আমার গাড়ির বনেটে বসল, ওই আবার উড়ে গেল। নীল চোখ, কী সুন্দর নীল চোখ!

জাহাজি শ্বাস ফেলে বলে, দেখতে পাচ্ছি না। কলকাতার শুঁড়িরা বড্ড জল মেশায় মদে।

কিন্তু পরিরা আছে ঠিক। সেন্ট অ্যান্টনিজে এরকম পরিদের ছবি ঘরে ঘরে ঝোলানো থাকত। সোনালি ডানা, লাল ঠোঁট, নীল চোখ...

জাহাজি বুক কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলে, নীল চোখ! নীল চোখ! স্যু—রও ছিল ওই নীল চোখ। ঠিক নীল নয়, একটু বাদামি। কিন্তু ওর গায়ের রং ছিল বড্ড কালো। যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিত, বুঝলে, যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিত তখন ওকে কিছুতেই খুঁজে পেতাম না। ওর ওই কালো রঙের জন্যই। স্যু—র বুকভরা দিল, একশো মজা। বাতি নিভিয়ে সে লুকোত, আর আমি দু'হাত বাজিয়ে তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে কখনও

দেয়ালে, কখনও ওয়ার্ডরোবে, কখনও খাটের বাজুতে ধাক্কা খেতাম। ও লুকোত খাটের তলায়, আলমারির ভিতরে কিংবা ছেড়ে রাখা পোশাকের নীচে। একশো মজা ছিল ওর। বড্ড কালো ছিল বলে—

কালো!—গৌর ভারী অবাক হয়, কালো কোথায়! তুমি যে বললে, ফরসা আর নীল চোখ!

বলেছি?

আলবাত!

তবে তাই।—জাহাজিটা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে, তবে তাই। কিন্তু তাহলে অন্ধকার ঘরে ওকে খুঁজে পেতাম না কেন?

গৌর হাসে, দূর। অন্ধকার ঘরে কালোই কী, ফরসাই কী? সব সমান। সোজাসুজি একটা নিয়োন সাইন ছিল। কী যেন সাইনটা! আঃ হাঃ, কী যেন? ঠিক মনে পড়ছে না, কী যেন?

লিপটন? লুফটাহানসা? গুড ইয়ার? ক্যাপস্টান?

নাঃ। ওসব নয়। কলকাতার শুঁড়িরা—

জাহাজি হেঁচকি খেল।

যেতে দাও।—গৌর বলে।

জাহাজিটা মাথা নাড়ে, না না। যেতে দেব কেন? সেই নিয়োন সাইনটা ছিল খুব ইমপর্ট্যান্ট। খুব। দাঁড়াও মনে করি।

জাহাজি মুখে আঙুল পুরে ভাবে। শিস দেয় মাঝে মাঝে। ওদিকে রাস্তায় পরিরা আরও নামছে। কলকাতা জুড়ে কেবলই পরি নেমে আসছে। দু'—তিনজন গাড়ির জানালা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। কাচ তোলা বলে পারছে না। আহা! গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের জানালার কাচ নামায়। বোসো বাবারা। বসে থাকো। আমি তোমাদের পুরো কলকাতা দেখিয়ে দেব।

ইয়াঃ! সেই নিয়োন সাইনে লেখা ছিল—ইউ ওয়ান্ট লায়লাজ ব্রেড। তুমি চাও লায়লার রুটি। প্রথমে জ্বলত 'তুমি', তারপর 'চাও', তারপর 'লায়লার', সবশেষে 'রুটি', চারটে শব্দ। 'তুমি' জ্বললে ঘরটায় স্বচ্ছ আলো আসত—সবুজ আলো। দ্বিতীয়টা ছিল 'চাও', সেটা জ্বললে আরও একটু সবুজ আলো আসত। তারপর 'লায়লার' থেকে রুটি পর্যন্ত চমৎকার আলো হত ঘরে। সবুজ আলোয় ভরে যেত ঘর। মনে হত মাঠঘাট, সবুজ ঘাস—এই সবের মধ্যে রয়েছি। আবার হঠাৎ দপ করে নিভে যেত আলো, কী অন্ধকার এখন। ঘুটঘুট্টি। হঠাৎ আবার জ্বলে উঠত—'তুমি', তারপর 'চাও', তারপর—

জাহাজিটা হেঁচকি তোলে।

পিচনের জানালা গলে তিনটে পরি ঢোকে। গৌর আড়চোখে আয়নায় দেখে নেয়। ন্যাংটাপুটো, সাদা। মোটা মোটা থোরা, নধর হাত, নাদা পেট। সোনালি ডানাগুলো পাতলা ফিনফিনে, যেন বা মাকড়সার জালে তৈরি পাখাগুলো থিরথির করে কাঁপে।

ই—ফ।—জাহাজি আবার হেঁচকি গেলে।

চোপ!—ধমক মারে গৌর, হেঁচকি তুলো না। পরিরা ভয় পাবে।

জাহাজি অবাক হয়ে বলে, কারা বললে?

পরিরা।

কোথায়?

পিছনের সিটে বসে আছে। তিনজন। এখন হেঁচকি তুলো না।

জাহাজি মুখ ফিরিয়ে দেখে। তারপর বলে, কোথায় কী?

আছে। তাকিয়ো না।

জাহাজি গম্ভীর হয়ে বলে, আসলে কলকাতার শুঁড়িরা—

বলে ঠোঁট চাটে জাহাজি। গৌর গাড়িখানা ফাঁকা রাস্তায় ঘোরাতে থাকে। ড্যাশবোর্ডে তেলের কাঁটা নেমে যাচ্ছে। গৌর তা লক্ষ্য করে না। সে কেবল চরাচর জুড়ে পরিদের কাণ্ড দেখে।

জাহাজিটা বলে, আমরা জানালায় বসে সেই নিয়োন সাইনটা দেখতাম।

কোন নিয়োন সাইন?

সেই যে, তুমি চাও লায়লার রুটি। সবুজ রঙের নিয়োন সাইন। ঘরটা সবুজ আলোয় চমকাত। আমি স্যুকে জিজ্ঞেস করতাম, স্যু, লায়লা কে? স্যুও আমাকে জিজ্ঞেস করত, লায়লা কে? আমরা কেউ বলতে পারতাম না। অথচ নিয়োন সাইনটা সন্ধে রাত্রি থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সবুজ আলো দিয়ে একই কথা বলত, তুমি চাও... তুমি চাও... তুমি চাও... লায়লার রুটি। আমি স্যুকে জিজ্ঞেস করতাম, স্যু, তুমি লায়লার রুটি চাও? সে বলত, চাই। ফের সে আমাকেও ওই কথা জিজ্ঞেস করত, আমিও চাই কি না, আমি বলতাম, চাই। কিন্তু মেট, খুঁজে দেখেছি, সেই রুটি পাওয়া যায় না।

পাওয়া যায় না?

না।

সে কী। তাহলে নিয়োন সাইনটা ছিল কী করতে?

জাহাজিটা একটু ভেবে বলে, অবিশ্যি দিনের বেলা তো কখনও লায়লার রুটির খোঁজ করিনি। দিনের বেলা মনেই থাকত না। রাত্রি বেশি হলে যখন নিয়োন সাইনটা নজরে পড়ত, তখন আমরা খুঁজে বেরোতাম। পাওয়া যেত না। মেট, সেই থেকে লায়লার রুটির জন্য আমি অস্থির হয়ে আছি। এখনও মাঝে মাঝে মাঝ—রাতে ঘুমে আমি স্বপ্ন দেখি, নিয়োন সাইন জ্বলে জ্বলে উঠছে, তুমি চাও... তুমি চাও... তুমি চাও... ভয় পেয়ে উঠে বসি, আর তখন বাদবাকিটা মনে পড়ে, লায়লার রুটি...লায়লার রুটি... লায়লার রুটি...

মাতাল। গৌর হাসে।

জাহাজিটা ঠোঁট চাটে। একটা রথম্যান ধরাবার চেষ্টা করে। দেশলাই জ্বালতেই গৌর ধমকায়, আলো জ্বেলো না।

কেন?

পরিরা পালাবে।

আঃ! জাহাজি হতাশভাবে সিগারেট ফেলে দেয়। তারপর বলে, লায়লার রুটি। সবুজ আলো, স্যু, জ্যোৎস্না—মেট, এসব কোথায় গেল? কলকাতা একদম শুকিয়ে গেছে যে! কিছু নেই!

গাড়িটা আপনা থেকেই ঘুরেফিরে চলে যাচ্ছিল। গৌর দিক ঠিক করতে পারে না। আসলে গাড়ি যখন মাটির ওপর দিয়ে যায় তখন রাস্তাঘাট ঠিকই চিনতে পারে গৌর, গৌরা, বগলাপতির ব্যাটা। তখন তার সব ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে। কিন্তু এখন, এই পরিদের রাজ্যে চলে এলে, মাঝরাতে দিক নির্ণয় করা ভারী মুশকিল। গাড়ি তখন নিজের থেকেই চলে। গৌর কেবল নিমিত্তমাত্র।

চাঁদ ঢলে পড়েছে। আকাশের একদিকটা কালিবর্ণ, বেশ্যার চোখের কাজলের মতো, সেই কালিবর্ণে ফ্যাকাসে শসার মতো চাঁদ ঢলে পড়ে যাচ্ছে। গৌর এই মর্মান্তিক দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

জাহাজি হঠাৎ আঁতকে উঠে বলে, এটা কোন জায়গা! অ্যাঁ! কোন জায়গা! থামো মেট।

গৌর থামে।

একটা পুরনো প্রকাণ্ড বাড়ি বটগাছের মতো দাঁড়িয়ে। অন্ধকার। রাস্তাটা নিঝঝুম। চারদিকে সুনসান নির্জনতা। রাস্তায় সারি সারি গাছ। গাছের আড়ালে আড়ালে রাস্তায় টিমটিমে আলো। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়লে আলোগুলো দোল খেয়ে যেতে থাকে। গৌর রাস্তাটা ঠিকঠাক চিনতে পারে না। গম্ভীর গলায় বলে, কী জানি!

জাহাজিটা মুখ তুলে বাড়িটা দেখে।

মেট।

উম।
এই বাড়িটা আমার চেনা।
গৌরও বাড়িটা দেখে। কলকাতার প্রথম বয়সে তৈরি বাড়ি। পলেস্তারা খসে পড়ছে। বোধহয় কর্পোরেশনের নোটিশ পেয়েছে। ভেঙে ফেলা হবে। তাই সবাই ছেড়ে গেছে বাড়ি। একা অন্ধকার বাড়িটা আয়ুর শেষে ক'টা দিন নির্জনে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে।
গৌর হাই তোলে।
জাহাজি হঠাৎ গৌরের হাত চেপে ধরে বলে, বাড়িটা আমি চিনি মেট। এখানে আমি এসেছি।
কার কাছে?
জাহাজি ফিসফিস করে বলে, স্যু—র কাছে।
গৌর চমকে বলে, এই বাড়িটাই?
তারা নামে। আজে জাহাজি, পিছনে গৌর।
বাড়ির দরজাটা হাঁ হাঁ করছে খোলা। একটা পাল্লা বাতাসে নড়ে চামচিকের মতো শব্দ করছে। আরশোলার নাদির গন্ধ পাওয়া যায়। আর বহু পুরনো এক বদ্ধ বাতাসের ঘ্রাণ।
জাহাজি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে একটু তাকিয়ে থাকে। তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, এইটাই। সেটারও দরজা এরকম চামচিকের মতো শব্দ করত।
জাহাজি শ্বাস ছাড়ে। বলে, মেট, চলো। দেখা যাক।
দু'জনে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। সিঁড়ি যতই ওপরে উঠেছে ততই আরও অন্ধকার, পিছল পিছল, ধাপ তত উঁচু উঁচু। ক্রমান্বয়ে চুন—বালি খসে পড়ার একটা ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ হতে থাকে। মুখে গায়ে ঝাপটা মেরে উড়ে যায় চামচিকে। টিকটিকি ডাকে।
ক'তলায়?—গৌর জিজ্ঞেস করে।
দশ তলায়। আমার মনে আছে।
গৌর অবাক হয়ে বলে, কিন্তু এ বাড়িটা তো মোটে চার—পাঁচ তলা।
ঠিক বলছ?
ঠিক। এ কলকাতার পুরনো বাড়ি, চুন—সুরকির গাঁথুনি, এর ওপর দশ তলা হয় না।
তাহলে!——বলে জাহাজিটা নাক চুলকোতে চুলকোতে ভাবে। বলে, তাহলে ক'তলায়। ঠিক মনে পড়ছে না তো!
চারদিকে নিস্তব্ধতা। ঝিঁঝিঁ হঠাৎ ডেকে উঠে আরও নিস্তব্ধ করে দিতে থাকে। চুনবালি খসছে তো খসছেই। ঝিরঝির ঝুরঝুর। বাইরে পরিরা নামছে এখন। কিন্তু এখানে, বাড়িটার ভিতরে কেবল হাজার বছরের অন্ধকার। হাজার বছরের জমে থাকা ধুলোর গন্ধ।
দু'জনে আবার সিঁড়ি ভাঙে। পলেস্তারা খসে, চুনবালি পড়ে সিঁড়িতে পুরু আস্তরণ। পায়ে লেগে ঢেলা গড়িয়ে পড়ে। ইঁদুরের নরম পা তাদের পায়ের পাতা ছুঁয়ে দৌড়ে যায়। মুখে গায়ে লেগে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে যাচ্ছে। সারা বাড়ি জুড়ে সেই মিহিন পতনের শব্দ। ঝিরঝির ঝুরঝুর। আপনা থেকেই বাড়িটা অবিরল ক্ষয়ে যাচ্ছে। দরজা জানলা হাঁ—হাঁ করছে খোলা। বেশির ভাগেরই পাল্লা নেই। দু'এক জায়গায় বাঁশের ঠেকনা দাঁড় করানো আছে। জাহাজিটা ভালুকের মতো ঘরে দোরে ঢুকে দেখে। চারদিক খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো মুখ তুলে বাতাস শোঁকে।
কোনও ঘরেই নেই খাট পালং, টেবিল চেয়ার, আলমারি। কিছু নেই। দু'—একটা কৌটো—বাউটো পায়ে লেগে শব্দ করে গড়িয়ে যায়। একটা শিশি পড়ে ভেঙে গেল।
মেট!
উম।

এই বাড়িটাই। এইখানে স্যু থাকত। এইসব ঘর আমার চেনা।

আবার তারা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে। ওপরে আবর্জনা বেশি। ইঁটের স্তূপ পড়ে আছে। ইঁদুর চামচিকে আরশোলা ঝিঁঝি অবিরল নানারকম শব্দ করতে থাকে। তারা এ ঘর থেকে ও ঘরে যায়। ঘরের পর ঘর দেখতে থাকে। এক—একবার এক—একটা জানালা দিয়ে ঝুঁকে দেখে জাহাজি। মাথা নেড়ে বলে, এ ঘর নয়। এখান থেকে লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন দেখা যায় না তো! অন্য ঘরে চলো মেট। যে ঘর থেকে সবুজ নিয়োন সাইনে দেখা যাবে, তুমি চাও লায়লার রুটি, সেইটাই স্যু—র ঘর। প্রথমে জ্বলবে 'তুমি', তারপর 'চাও', তারপর 'লায়লার', সবশেষে 'রুটি'।

অন্ধকার ঘরে, প্যাসেজে, বারান্দায়, প্যানট্রিতে তারা বার বার হোঁচট খায়। ডেব্রিসের ওপর হাঁটু ভেঙে যায়। আরও বাঁশের ঠেকনা, ডেব্রিস, ইটের স্তূপ তারা চারদিকে টের পায়। বার বার দেশলাই জ্বালে জাহাজি। চারদিকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির জরা ম্লান ছবির মতো জেগে উঠে মিলিয়ে যায়। পোড়া কাঠি ছুঁড়ে ফেলে জাহাজি মাথা নাড়ে, না, এ ঘরটা নয়। কিন্তু এই বাড়িতেই ঘরটা আছে মেট। অনেকটা এইসব ঘরের মতোই। স্যু তো কালো ছিল, ভীষণ কালো। বাতি নিভিয়ে যখনই সে লুকোত তখন অন্ধকারে তাকে কোথাও খুঁজে পেতাম না। বাইরে তখন বার বার জ্বলে উঠত, তুমি চাও... তুমি চাও... তুমি চাও... লায়লার... লায়লার... রুটি। সবুজ আলোয় ঝলসে ঝলসে উঠত ঘর, কিন্তু সেই আলোতে ঠিক গায়ের রং মিলিয়ে লুকিয়ে থাকত সে। কিন্তু তার গায়ে একটা সুগন্ধ ছিল। সেই গন্ধটা ঘর ভরে থাকত। আমি সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে চারধারে খুঁজতাম। ধরি ধরি করেও, কাছাকাছি গিয়েও ধরতে পারতাম না। পালিয়ে যেত। তখন আবার পাগলের মতো খুঁজতাম। বাইরে তখন সবুজ আলো দপদপিয়ে উঠত, তুমি চাও... তুমি চাও... তুমি চাও... এইরকম—ঠিক এইরকম ঘরে সেইসব দারুণ ঘটনা ঘটত।

প্রকাণ্ড পাঁজর—কাঁপানো শ্বাস ছাড়ে জাহাজি। বলে, বুঝলে মেট, বড্ড কালো ছিল স্যু, কিন্তু মধুরঙের চুল ছিল তার। খয়েরি চোখ—

খয়েরি?—অবাক হয় গৌর।

খয়েরি নয়?

দূর! বাদামি তো।

তবে তাই।—জাহাজি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়।

আর ফরসা রং।

ঠিক আছে।

আর কালো চুল।

আই।—জাহাজি বলে। বলেই শ্বাস ছাড়ে। দেশলাইয়ের কাঠি ধরায়। সেটা নিভে যেতে হতাশভাবে আবার মাথা নাড়ে।

আবার পুরনো পিছল অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙে তারা। টের পায়, সেই অন্ধকারে এক আলাদা জগৎ রয়েছে। সে জগৎ মানুষের নয়। চামচিকে, আরশোলা, ইঁদুর, ঝিঁঝির। রয়েছে তাদের ভয়, খেলা, আত্মীয়তা। তারা নড়ে চড়ে, দৌড়ায়, ওড়ে, ডাকে। একটি বহু পুরনো বাতাস বাড়িটার ভিতরে এখনও রয়ে গেছে। তাতে একশো—দুশো—বছর আগেকার মানুষের শ্বাস মিশে আছে। অবিরল বাড়িটার বিন্দু বিন্দু গুঁড়ো গুঁড়ো পতনের মিহিন শব্দ হয়। ঝিরঝির ঝুরঝুর। ক্ষয়, অবিরল ক্ষয়।

অন্ধকারে জাহাজি হঠাৎ লাফ দিয়ে দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে যায়।

কর্কশ চাপা গলায় বলে, মেট, এইখানে একটা বন্ধ দরজা।

দরজা?

দরজা। দুটো পাল্লা বন্ধ।

অন্ধকারে গৌর কিছুই দেখে না। উঠে আসে। জাহাজি দেশলাই জ্বালতেই দেখা যায়, দুই মানুষ সমান উঁচু এক বিশাল, নিরেট, বিবর্ণ দরজা বন্ধ হয়ে আছে। জাহাজি হাতড়ে দরজাটা দেখে বলে, মেট, ভিতর থেকে বন্ধ।

এইটাই কি স্যু—র ঘর?

মনে হচ্ছে।

জাহাজি সাবধানে দরজায় টোকা দিয়ে বলে, কে আছ?

সাড়া নেই।

কে আছ?

সাড়া নেই।

জাহাজি ক্রমে ক্রমে জোরে, আরও জোরে কড়া নাড়তে থাকে।

কে আছ? কে আছ? কে আছ?

প্রকাণ্ড পুরনো বাড়িটা তার স্বর শুষে নিয়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কেবল চামচিকের ডানা নড়ে। টিকটিকি হঠাৎ ডেকে ওঠে। অলক্ষে চুনবালি খসে পড়ার শব্দ হয়। ক্ষয়ের শব্দ। পতনের।

জাহাজি দরজায় কান পেতে ভিতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে শোনে। দেয়ালে হেলান দিয়ে গৌরহরি একটা রথম্যান ধরায়। ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। চোখের সামনে রঙিন ডানাওয়ালা পরিরা ভেসে ওঠে। গৌর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলতে থাকে।

মেট।

উম।

ঘরের ভিতরে শ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছে।

অ্যাঁ।

কেউ আছে। শোনো।

গৌর কান পাতে। বহুকালের পুরনো কাঠের দরজার গন্ধ পায় গৌর। ভারী কাঠের, পুরু পাল্লার দরজা। গৌর কোনও শব্দ পায় না। সে কান পেতে কেবল অবিরল বাড়িটার ক্ষয়ের শব্দ পায়। চামচিকের ডানা বাতাস কাটে। টিকটিকি ডাকে। আরশোলা ফর ফর করে উড়ে যায়।

কোথায় শব্দ?

মন দিয়ে শোনো। খুব লম্বা টানা শ্বাস। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠে ভেঙে যাচ্ছে। বুকের একটা ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। বড় কষ্টের শ্বাস। শুনতে পাচ্ছ না?

না।

জাহাজি আবার কান পেতে শোনে। তারপর অন্ধকারে তার অস্পষ্ট মুখকানা গৌরের মুখের আছে এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বলে, মেট, এই ঘরে কেউ মারা যাচ্ছে।

অ্যাঁ।

এই শব্দ আমি চিনি।

গৌরের নেশা ধাক্কা খায়। টলমল করে মাথা। সে হাত বাড়িয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, কী বলছ?

এখানে কেউ মারা যাচ্ছে। নিরিবিলি, নির্জন এইখানে একা একা একজন মারা যাচ্ছে। খুব কষ্টের শ্বাস। বুকের শব্দ। মরবার আগে ঠিক এইরকম শ্বাস ওঠে। উঠতে উঠতে ভেঙে ভেঙে যায়।

তাহলে?—গৌর তার রথম্যানে টান দেয়। তারপর কাশে।

চুপ!—জাহাজি ধমক দিয়ে চাপা গলায় বলে, ডিসটার্ব কোরো না।

কাকে?

যে মরছে, তাকে। সারাজীবন কত দুঃখকষ্ট মানুষের, কত খোঁজা, কত না—পাওয়া। বোধহয় অনেক শোকতাপ পেয়েছে। আহা! এতদিনে একটু সময় পেয়েছে মরার। একা একা, অন্ধকারে, নির্জনে আরামে মরছে এখন। ডিসটার্ব কোরো না। অতিথি এসেছে বুঝতে পারলেও তার পক্ষে উঠে এসে দরজা খোলা ভারী বিশ্রী ব্যাপার। মরার সময়টায় কাউকে বিরক্ত করা ঠিক না।

তারা চুপ করে শোনার চেষ্টা করে। গৌর কেবল বাইরে বাতাসে শুকনো পাতা গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ পায়। আর পোকা—মাকড়, পাখিদের শব্দ। আর ক্ষয়ের শব্দ।

জাহাজি দেশলাই জ্বালে। সেই ম্লান আলোয় তার মুখখানা বড় বিবর্ণ দেখে গৌর। জাহাজি ফিসফিস করে বলে, এই ঘরের জানালা থেকেই দেখা যাবে, 'তুমি চাও লায়লার রুটি'। এই ঘরেই স্যু রয়েছে মেট।

গৌরের শিরদাঁড়া বেয়ে সাপ নেমে যায়। গায়ের রোমকূপ শিউরে ওঠে। শীত করে তার।

সে স্খলিত গলায় বলে, স্যু?

স্যু।

জাহাজি আবার দেশলাই জ্বালে। আগুনটা জ্বলে উঠতেই জাহাজির দিশেহারা মুখ দেখতে পায় গৌর। কাঠিটা কাঁপতে কাঁপতে জ্বলে। আস্তে আস্তে কালো হয়ে কুঁকড়ে আসতে থাকে। আগুন সরে এসে জাহাজির আঙুল ছোঁয়। দিশেহারা মুখখানা আবার অন্ধকার গ্রাস করে নেয়। কোনওখানে আলো নেই। তবু গৌর মনশ্চক্ষে দেখে একটা সবুজ আলো দপ করে জ্বলে উঠল। তাতে লেখা—তুমি চাও...

প্রকাণ্ড ভারী দরজায় হেলান দিয়ে জাহাজি দাঁড়িয়ে। গৌর হাত বাড়িয়ে তার কাঁধটা ধরে।

কিন্তু সেই নিয়োন সাইনটা কোথায়? সেটা তো দেখা যাবে!

জাহাজি শ্বাস ছেড়ে বলে, কোথাও নেই। কেবল ওই ঘর থেকে দেখা যায়।

মাতাল। গৌর হাসে। বলে, চলো তো দেখি।

অন্ধকারে তারা দু'জন হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়ায়। পাশের ঘরগুলো অন্য সব ঘরের মতোই ফাঁকা, চুন সুরকির স্তূপ পড়ে আছে। বাঁশের ঠেকনা রুজু রুজু দাঁড়িয়ে। তার ভিতর দিয়ে পথ করে তারা এ জানালায় ও জানালায় উঁকি মেরে দেখে। গাছের ডাল, ল্যাম্পপোস্ট, ঘুমন্ত বাড়ি, নিঝঝুম রাস্তা দেখা যায়। কোথাও নেই 'তুমি চাও লায়লার রুটি'—র সেই সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন। নেই, তবু গৌরের মনে হতে থাকে, আছে। কোথাও না কোথাও আছে। বাস্তবিক, বাজারে লায়লার রুটি নামে কোনও রুটি পাওয়া যায় কি না সে জানে না। ওরকম নিয়োন সাইনও তার চোখে পড়েনি। তবু মনে হয়, আছে। সে দেখেছে। বোধহয় স্বপ্নে। ঠিক ওই রকম একের পর এক সবুজ আলোর বান—তুমি...চাও...লায়লার...রুটি। ওই কথা ক'টি যেন পৃথিবীর বাইরের কোনও জগৎ থেকে ভেসে আসে। লোভ দেখায়। স্বপ্নে জাগরণে কেবলই তার অলীক নিমন্ত্রণ। মানুষের ভিতরে কানায় কানায় উথাল—পাথাল ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে লায়লার রুটি। মানুষ দু'হাত বাড়িয়ে চায়, তখন কোথায় মিলিয়ে যায় সবুজ অলৌকিক নিয়োন সাইন।

কষ্টেসৃষ্টে তারা আরও এক তলা ওঠে। সিঁড়ি কোথাও কোথাও ভাঙা, রেলিং ভেঙে পড়েছে, অন্ধকার। তবু তারা ওঠে। নিয়োন সাইনটা খোঁজার জন্য। আছে, কোথাও আছে ঠিক। কিন্তু উঠতে কষ্ট হয় খুব। আবর্জনার স্তূপ জমে আছে। কড়ি বরগা পড়ে আছে চারদিকে। আলটপকা বেরিয়ে থাকা লোহার শিক গায়ে খোঁচা মারে। বাঁশের ঠেকনোতে তারা ধাক্কা খায়।

ওপরে হাঁ হাঁ দরজার সব ঘর। আবর্জনা প্রচুর। পা দিতেই ধুলো ওড়ে। পা হড়কায়। ধুলোয় কোথাও বা পা ডুবে যায়। কিন্তু এখানে অন্ধকার তেমন জমাট নয়। ফিকে। একটা অপার্থিব হলদে আলোর আভা চারদিকে, ভারী অবাক হয় তারা। হলুদ আলোয় নানারকম ছায়া পড়েছে। তারা আবর্জনার স্তূপ পার হয়ে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। জানালায় জানালায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন খোঁজে, পায় না। হলুদ আলোয় নিজেদের মুখ দেখে তারা।

গৌর হঠাৎ মুখ তুলে ভারী চমকে যায়। কী সুন্দর ছাদ! কী প্রকাণ্ড! তাতে চুমকি বসানো। একটা হলুদ আলোর ডুম জ্বলছে একধারে। কারা যেন ডুমটাকে ভারী অদ্ভুতভাবে ফিট করেছে দেয়ালে। বড় ভালো লাগে গৌরের। আরে বাঃ! দিব্যি ঘর। জাহাজিও হাঁ করে ছাদটাকে অনেকক্ষণ দেখে।

কয়েক পলক সময় লাগে ব্যাপারটা বুঝতে।

কী সুন্দর সিলিং!—গৌর বলে।

উম।

ডুম জ্বলছে!

জাহাজি শ্বাস ফেলে বলে, ওটা সিলিং নয় মেট।

তবে?

জাহাজি বিষণ্ণ গলায় বলে, ওটা আকাশ। ওর ওপর আর কোনও তলা নেই।

গৌর তখন বুঝতে পারে। ঠিক। মাথার ওপর ওটা আকাশই বটে। ছাদটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। চারদিকে কড়ি বরগা শোয়ানো। বাড়িটা এখানেই শেষ।

চাঁদের আলোয় তারা ছাদহীন ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে। আকাশের একধারে বেশ্যার চোখের মতো কালি ঢালা গাঢ় কালোর মধ্যে বিবর্ণ মণির চোখ ওই চাঁদ। শেষে জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে। সোনার গুঁড়োর মতো চারদিকে জ্যোৎস্নার ধুলো ওড়ে। পরিদের আবার দেখতে পায় গৌর। ফিনফিনে শিফনের পাখায় উড়ে যাচ্ছে। তাদের ছায়া পড়ে না। জ্যোৎস্নাময় শরীর। 'ওড়ো বাবারা, ওড়ো'—সে বিড়বিড় করে বলে।

জাহাজি তার হাত ধরে, মেট, একমাত্র স্যু—র ঘর থেকেই দেখা যায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন। আর কোথাও ওই বিজ্ঞাপন নেই। কিন্তু স্যু—র ঘরে তো ঢোকা যাবে না। এখন, মরে যাওয়ার সুন্দর সময়ে সে কিছুতেই এসে দরজা খুলবে না। টু—নাইট শি উইল এন্টারটেন ওনলি ওয়ান গেস্ট। ডেথ।

বাড়িটা খুবই উঁচু। গাঁই গাঁই গঙ্গার হাওয়ায় দমকা ধুলোবালি উড়ে আসে। চোখ কির কির করে, মাথার চুলে আটকে থাকে। হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বগলুর পোলা গৌরা, অর্থাৎ কিনা বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরির দম আটকে আসতে থাকে। 'ডেথ' কথাটাই বাতাস হয়ে নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে ফুসফুস বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফাটিয়ে দিতে চায়। কষ্ট হয় গৌরের। চাঁদের নীচে হঠাৎ মেঘ ডেকে ওঠে। বিদ্যুৎ চমকায়।

তারা বেভুল ঘুরতে ঘুরতে সিঁড়ির দরজায় আসে। তারপর অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকে। বন্ধ দরজার সামনে তারা একটু দাঁড়ায়। স্বপনের ঘর। দরজা খুললেই একটা অন্য জগতে চলে যাওয়া যেত। যেখানে রয়েছে স্যু, জাহাজিকে যে একদিন অলৌকিক জ্যোৎস্না খাইয়েছিল। আর রয়েছে সবুজ আলোর অপার্থিব বিজ্ঞাপন, তুমি চাও লায়লার রুটি। পৃথিবীর আর কোনও ঘরের জানলা থেকে যা দেখা যাবে না। ঘরের মধ্যে স্যু—র গায়ের সুগন্ধ। সেই সুগন্ধের রেশ ধরে এসেছে এক হিম বাতাস। ভাঙা দীর্ঘ কয়েকটি শ্বাস শেষবারের মতো টানছে স্যু, অন্ধকারে একা।

জাহাজি দরজায় একটুক্ষণ কান পাতে। তারপর শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে, বিরক্ত করা ঠিক হবে না। চলো মেট।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে তারা নামতে থাকে। অন্ধকার ধুলোর গন্ধ। চামচিকে, ঝিঁঝি, ইঁদুর, আরশোলার শব্দ। আর সব শব্দের আড়ালে অবিরল এক মিহিন পতনের শব্দ শোনে গৌর। ক্ষয়ের শব্দ। ঝিরঝির ঝুরঝুর।

ফাঁকা কপাটহীন জানালা দরজা দিয়ে এক ঠান্ডা ঝোড়ো বাতাস হুড় দৌড় করে ঢোকে। ধুলো উড়তে থাকে। দুইজন দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

বাইরে এসে তারা দেখতে পায়, জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি পড়ছে। কী উল্লাস বৃষ্টির! চারদিকে জলে মাটিতে প্রবল ভালোবাসার চিৎকার ওঠে। জুড়িয়ে যাচ্ছে ভাপ। বৃষ্টি ভেদ করে ক্ষয়া চাঁদের আলো মেঘের ফাঁক দিয়ে

এসে পড়েছে। চরাচর জুড়ে দৌড়চ্ছে বৃষ্টির পা। অপার্থিব শিশু—পরিরা ধুয়ে মুছে গেছে। মেঘ ডাকে। পুরনো বাড়ির ভিত কেঁপে ওঠে। গুরগুর করে বাড়িটার বুক। অন্ধকারে তার অবিরল ক্ষয় চলেছে। মেঘের ডাকে তার আলগা পলেস্তারাগুলো খসে পড়ে। মৃত্যুভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে সে।

তারা দু'জন দরজায় দাঁড়িয়ে সেই জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি দেখে। তারপর জাহাজি হাত বাড়িয়ে গৌরের শুখো হাতখানা ধরে আত্মীয়ের মতো বলে, চলো মেট।

গৌড় ঘাড় নাড়ে।

ল্যান্ডমাস্টারটা গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ভিজছে। লোকে যেমন গৃহপালিতের গায়ে হাত রাখে তেমনি আদরে গৌর ল্যান্ডমাস্টারের বনেটে একটা চাপড় দিয়ে বলে, চল বাবা ল্যান্ডু।

গভীর বৃষ্টির অভ্যন্তরে চলে যেতে থাকে তারা। রাস্তা কিছুই চেনা যায় না। পুরনো কলকাতা ধুয়ে গলে গেছে। তার বদলে মাঝরাতের বৃষ্টির ঝরোখা ভেদ করে এক অপরূপ কল্পনার শহর ফুটে ওঠে উইন্ডস্ক্রিনে। চাঁদের হলুদ আলো, টিমটিমে ল্যাম্পপোস্ট, গাছের ছায়া, রাস্তার জল থেকে বিচ্ছুরিত আলো, বৃষ্টির ফোঁটায় আলোর বিন্দুর দ্রুত সরে যাওয়া। ঝিলমিলে অস্পষ্ট এক শহরের ভিতর দিয়ে জল ঠেলে চলে গৌরের ল্যান্ডমাস্টার, ওয়াইপারের কাঁটা দুটো পাগলের মতো নড়ে। তবু জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টির তীব্র ফোঁটাগুলো গভীর আবেগে এসে ফাটে কাচের ওপর। গৌর চোখে তেমন দেখে না। দু'জনের ভেজা শরীরে বাতাস লাগে। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। গাড়ির কাচ তোলা, বদ্ধ বাতাসে তাদের শ্বাসের ভাপ জমতে থাকে কাচের গায়ে।

গৌরের গাড়ি বড় আনন্দে অচেনা শহরটাকে ফাঁকা রাস্তায় চক্কর মেরে ফিরতে থাকে। কিন্তু ক্রমে শহরের বাড়িঘর ফুরিয়ে যেতে থাকে। গাড়িটা একটা ফাঁকা জায়গায় চলে আসে। সামনে বিপুল বিস্তৃত অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ছোট্ট ছোট্ট ফুটোর মতো কয়েকটা আলো। বৃষ্টির তীব্র শব্দ উইন্ডস্ক্রিন ফাটিয়ে দেয়। গৌর হাত দিয়ে কাচ মুছে ভালো করে সামনেটা দেখে। ঠিক বুঝতে পারে না, এটা কোন জায়গা। মনে হয়, একটা বিশাল মাঠ সামনে।

ল্যান্ডমাস্টার ঘড় ঘড় করে। ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানার মতো শব্দ হয়। তারপর কাশির শব্দ করে ল্যান্ডমাস্টার। গৌর একটু ঝুঁকে সামনে হঠাৎ দেখতে পায়, বিশাল সাদা একটা বাড়ি। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। তবু বাড়িটা আবছায়ায় ঠিকই দেখতে পায় গৌর। বাড়ির চারদিকে বিরাট বাগান।

ল্যান্ডমাস্টারটার সব শব্দ হঠাৎ থেমে যায়। নিঃশব্দে গাড়িটা গড়ায় খানিক।

শালা!—গৌর বলে।

কী?—জাহাজি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

শালার ল্যান্ডমাস্টারের তেল মরেছে।

জাহাজি উত্তর দেয় না। উইন্ডস্ক্রিনের ঝাপসা ভেদ করে প্রবল বৃষ্টির চিকের ভিতর দিয়ে সে সেই প্রকাণ্ড বাগান আর অস্পষ্ট বাড়িটা দেখছে।

মেট, ওই বাড়িটা আমার চেনা। আর ওই বাগান।

আমারও চেনা—চেনা লাগছে। কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না।

জাহাজি মুখ ফিরিয়ে বলে, ওই তো সেই বাগান যেখানে স্যু আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

অ্যাঁ!

জাহাজি মাথা নেড়ে বলে, ওই সেই ভিক্টোরিয়ার বাগান। চারদিকে অন্ধকার, তবু দেখো ওই বাগানে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনও পড়ে আছে।

গৌর প্রাণপণে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই জ্যোৎস্না দেখতে পায় না। বলে, কোথায় জ্যোৎস্না?

জাহাজি গম্ভীর গলায় বলে, আছে মেট। আমার জন্য এখনও একটু জ্যোৎস্না রয়েছে। সবাই সবকিছু দেখতে পায় না।

জাহাজি হাতড়ে দরজার হাতল খোঁজে।
কোথায় যাবে?—গৌর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।
জাহাজি বিড়বিড় করে বলে, ওই বাগানে আর একবার আমি যাব।
পাগল! যা বৃষ্টি!
জাহাজি মাথা দুলিয়ে বলে, জাহাজ ছেড়ে গেলে আর হয়তো ফেরা হবে না। পৃথিবী বড় বিশাল। হারিয়ে যাব। আর এই বাগান, এই জ্যোৎস্নায় আসা হবে না মেট। আমাকে নামিয়ে দাও।
গৌর হাত বাড়িয়ে লক খুলে দেয়। বড় মায়া হয় তার। আহা, দুঃখী জাহাজি যদি ওই বৃষ্টির ফাঁকা বাগানে কিছু পেয়ে যায় তো যাক।
দরজা খুলতে খুলতে জাহাজি বিড়বিড় করে বলে, স্যু....জ্যোৎস্না....সবুজ আলো...লায়লার রুটি.....
বলতে বলতে নেমে যায় জাহাজি। মুহূর্তে বৃষ্টির ঝরোখা ঢেকে নেয় তাকে। অন্ধকার ডাকে। বিদ্যুতের চমক, বাতাস, প্রকাণ্ড বাগানের বিস্তার ছোট্ট একা মানুষটাকে গ্রাস করে নেয়।
হুড় হাওয়া দেয়। উড়ে আসে তীব্র বৃষ্টির ফোঁটা। সব ওলট—পালট করে দিয়ে যাচ্ছে। পাল্টে দিচ্ছে শহর। বদলে দিচ্ছে মানুষের মন। চেনা চারদিকে অচেনা জগতের ছবি ফুটিয়ে তুলছে। গৌর অস্পষ্ট চোখে এইসব দেখে। বিদ্যুৎ চমকায়। গৌর আবছায়া ভেদ করে ঘুমের আঁষ—জড়ানো চোখে, জাহাজি বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে উঠে দেয়াল ডিঙিয়ে বাগানের ভিতরে নেমে গেল।
চারটে দরজাই ভালো করে লক করে গৌর। হাই তোলে। পরিদের আর দেখা যাচ্ছে না। গৌর সামনের সিটে তার দুটো রুখো—শুখো হাত—পা গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ে।
তারপর বগলুর তিন নম্বর, হাফ—ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট গৌর বড় আরামে ঘুমোতে থাকে।

দুই

পৃথিবীটা আবার বড় ম্লান, রংচটা, ধুলোটে লাগে গৌরের। যখন চড়চড়ে রোদ দেয়, ঘামে আঠা—আঠা করে শরীরে, তখন কলকাতার এধারের সোয়ারি ওধারে করতে করতে গৌরের মাঝে মাঝে লায়লার রুটির কথা মনে পড়ে। সেই সবুজ ঘর, স্যু, জ্যোৎস্না, সেই জাহাজি। কিন্তু কিছুই সত্য বলে মনে হয় না। বগলুর তিন নম্বরের ওইটাই মুশকিল। ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাডমিকশ্চার। কোনটা ড্রিম, কোনটা রিয়্যালিটি তা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে।

হাওড়া স্টেশনের গাড্ডায় ঢুকলে পুলিশের বিশ পয়সা। পুলিশ হাতে নেয় না। ছোকরা আছে। ছোকরারা দাপটে পুলিশের বাবা। কাট মারার চেষ্টা করলে এক চোখ ছোট করে, আঙুল তুলে নম্বর ধরে ডাকে। বিশ পয়সার দশ পুলিশের, দশ ছোকরাদের। বে—লাইনে সোয়ারি নিলে একটাকা। হাওড়া স্টেশনের গাড্ডায় কখনও আসতে চায় না গৌর, ব্রিজ পার হওয়া বড় ঝামেলা। তার ওপর সোয়ারির লাইন, পুলিশ, ছোকরা, তারপর সবার বাবা জ্যাম। তবু আজ এসে যেতে হল। দুপুরে কালীঘাটের গলিতে পাঞ্জাবি হোটেলে খেয়েছে, শেষপাত টক দই। খেয়ে ঝিমোচ্ছিল গৌর। পাশেই একটা লটারির গাড়ি মেলাই চিল্লাচ্ছিল। ওদের মাইক্রোফোনটা ঘ্যার—ঘ্যারে। ইউ—পি লটারির শেষ তিনদিন নিয়ে বিস্তর কান্নাকাটি করল। সেই সময়ে ভাতঘুমে একটা ভালো স্বপ্ন দেখে উঠে গৌরের মনে হল, পৃথিবী জায়গাটা ভালোই। সে তখন দরজা খুলে নেমে গিয়ে লটারির গাড়িটার কাছ থেকে একটা টিকিট কেনে। হরিয়ানা এবার পনেরো লাখ দিচ্ছে। গাড়িতে বসে নিরিবিলিতে অনেকক্ষণ টিকিটের ছবি দেখেছিল গৌর, অর্থাৎ কিনা গৌরহরি, বগলাপতির তিন নম্বর। সেকেন্ড প্রাইজ মোটে এক লাখ। গৌর ঠোঁট বেঁকায়। পেলে ওই পনেরো লাখ। পনেরো লাখে জাহাজ কেনা যায়। সেই তুলনায় এক লাখ বড়ই গরিবিয়ানা।
সেই লটারির ছবি দেখার সময়েই একজোড়া বুড়োবুড়ি হামলে এসে পড়ল, ও বাবা, কোনও গাড়িই যে ইস্টিশনে যাচ্ছে না! আর দেরি হলে যে আমরা কাটোয়ার গাড়ি ধরতে পারব না।

হাওড়া যাবে না গাড়ি।

বুড়িটাই উথলে ওঠে, ও বাবা, কলকাতা তো তোমাদেরই শহর। আমরা মফস্‌সলের লোক। রাস্তাটা পার করে দাও বাবা, তোমাদের ভালো হবে।

আড়চোখে গৌর দেখল, সঙ্গে নাতি, বুড়ো, আর বিস্তর পোঁটলা—পুঁটলি। দশ—বারো বছরের নাতিটার হাতে একটা নতুন বালতি, আর তোলা উনুন। বুড়োর এক হাতে পেটা লোহার কড়াই, অন্য হাতে ডালের কাঁটা, খুন্তি, কুয়োর বালতি তোলার হুক। বুড়ির হাতে কয়েকটা পট, জাঁতা, নতুন বেডকভারের পুঁটলি থেকে উঁকি দিচ্ছে গঙ্গাজলের বোতল। এই বয়সে নতুন সংসার পাতার কথা নয়। তাহলে বোধহয় কালীঘাটের জিনিস কিনে নিয়ে পাঁচজনকে দেখানো হবে। গৌর আবার টিকিট দেখে।

ও বাবা, আমরা পয়সা দেব। ফাঁকি যাবে না।

ট্যাক্সির কী দরকার! বাসে চলে যান।

উঠতে দিচ্ছে না যে! যা ভিড়! বাবা গো, নিয়ে চল।

গাড্ডা। গৌর শ্বাস ফেলে দরজা খুলে দেয়। তিনজন ভারী খুশি হয়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়ি ছাড়তে বুড়ি হাত বাড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায় সিঁদুরমাখা প্যাঁড়া প্রসাদ দিয়েছে, জবাফুল, আর একটা কমলালেবু। সেসব এখনও গৌরের সিটে পড়ে রয়েছে। কাটোয়ার গাড়ি পেয়ে গেছে ওরা।

বে—লাইনে গাড়ি ঢোকায় গৌর। একটা টাকার মামলা। বেরিয়ে এসে আড়মোড়া ভেঙে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে। ফরসা চাদরের মতো ধবধবে রোদ পড়ে আছে। ঘড়িতে মোটে একটা। বে—লাইনে আরও কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে একটা গৌরের চেনা। গৌর একটু এগোতেই মলিনকে দেখতে পায়। সিটে দুই পা তোলা, ঠোঁটে ভেজা সিগারেট, হাতে বই, মিলন বসে আছে। কোনওদিকে খেয়াল নেই।

গৌর বলে, মামু!

মলিন মুখ তুলে হাসে, কী বে ত্রিভঙ্গমুরারী, কী খবর?

খবর নেই। তোমার খবর বলো।

মলিন উদাস গলায় বলে, তোমার সাউথে গ্যারেজ, আরামে আছো।

আরাম কীসের?

মলিন হাসে, বেশ্যা আর ব্যাপারিদের গা আর বগলের গন্ধ শুঁকতে হয় না আমার মতো। এই মাত্তর একবোঝা বিড়ির পাতা খালাস দিলাম। তোমার গাড়িতে যারা ওঠে তারা আতরের গন্ধ রেখে যায়।

গৌর হাসে, এখনও সোনাগাছিতে কমলার বাবু ধরে দিচ্ছ নাকি?

মলিন উদাস গলায় বলে, দিই। গাড়ির যেমন সোয়ারি দরকার তেমনি ওদেরও। নর্থের গলিঘুঁজিতে ঘুরলে না তো, তাই তোমার চুল পাকেনি। তা সাউথে বৃষ্টিবাদলা কেমন? আর মেয়েমানুষ?

গৌর বলে, কী যে বলো!

মলিনের মুখের আটক কোনওকালে নেই। ওর ট্যাক্সিখানা গৌরের মতো হরবখত যেমন—তেমন পাবলিককে তোলে না। বেছে বেছে তোলে। দু'হাতে পুলিশকে পয়সা দেয় মলিন, আবার দু'হাতে লোটে। বলতে গেলে, সারা দিনমান গাড়িখানা গ্যারেজেই থাকে, বেরোয় বিকেলের পর। জায়গা বেছে দাঁড়ায় বড় হোটেলের তলায়, মাতালদের পৌঁছে দেয়। শনিবারে বাঁধা রেসের ময়দান। সেখানে শেয়ারের পান্টদের তোলে। মাসে তিরিশদিন পুলিশ তার লাইসেন্স কেড়ে নেয়। তিরিশদিন ফেরত দেয়। হাড়কাটার মতিয়া কখনও—কখনও মলিনের গাড়িখানা ভাড়া নেয় সারা বিকেলের জন্য। ময়দানের কাছাকাছি নির্জনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মলিন নেমে গিয়ে ঘাসে শুয়ে থাকে। মলিনের গাড়ি তখন মতিয়ার ঘর হয়ে যায়। বাবু আর মতিয়া থাকে কেবল। আর থাকে গঙ্গার হাওয়া। থাকে জ্বালা—যন্ত্রণা। টাকা ওড়ে।

মতিয়া বড় সুন্দর। এত সুন্দর গৌর কদাচিৎ দেখেছে। থোপা থোপা লালচে চুল, নরম মুখ, রোগাটে শরীর, আর কী গম্ভীর চোখ! তাকে একবার পৌঁছে দিয়েছিল গৌর। সেদিন মলিনের গাড়ি ছিল খারাপ।

গৌরের বুক খুব কেঁপেছিল। মতিয়া কিন্তু একবারও দেখেনি কে গাড়ি চালাচ্ছে। একটা রুখো—শুখো হাত—পাওয়ালা দুঃখী লোক গৌর, বগলুর ছাওয়াল, সময়মতো পোলিও আর টাইফয়েড না ধরলে যে বিলেত চলে যেত, হয়তো বিয়ে করত মেম। এতদিনে কত কী হয়ে যেত গৌর! মতিয়া সেই গৌরকে দেখেইনি। ট্যাক্সিওয়ালা ভেবে ভ্রুক্ষেপও না করে নেমে গেল হাড়কাটা গলির ভিতরে এক বাড়ির সামনে। চাকর এসে টাকা দিয়ে গেল। মতিয়ার সঙ্গে পাবলিকের কারবার নেই, গৌর জানে। মতিয়া দরজায় দাঁড়ায় না, ডাকে না, ইশারা করে না। তার ঘরে টেলিফোন আছে, সাদা শিশুকাঠের খাট আছে, ড্রেসিং টেবিল আছে, রেফ্রিজারেটারও। যেমন বাছাই তার জিনিসপত্র, তেমনই বাছাই তার পুরুষেরা। আজও গৌরের গাড়ির গদি শুঁকলে বোধহয় মতিয়ার সেই দুর্লভ গন্ধটুকু পাওয়া যাবে।

মতিয়ার কথা ভাবতে গিয়ে একটু অন্যমনস্কতা এসে গিয়েছিল গৌরের। মলিন ডেকে বলে, তোমার ফাতনা নড়ছে গৌর, দেখো।

একটা লম্বা লোক কোলে একটা ফ্যাতফ্যাতে বাচ্চা, সঙ্গে ফরসা বউ। তারা গৌরের গাড়ির হাতলে লক করা বলে দরজা খুলতে পারেনি, নইলে উঠে বসত। ভুখখা পার্টি, বালী কি রিষড়ে থেকে এসেছে। সিনেমায় যাবে হয়তো, কিংবা যাদবপুর কি বেহালায় আত্মীয়বাড়ি। মাসে এক—দুই দিন বউ নিয়ে বেরোয়, তখন ট্যাক্সি চড়ে।

গৌর এগোয় না। দূর থেকেই হেঁকে বলে, গাড়ি যাবে না দাদা।

লোকটা একভিড় মানুষের মধ্যে ট্যাক্সিওয়ালাকেই খুঁজছিল। এখন গৌরকে দেখে মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, কেন?

গাড়ি খারাপ আছে। ইঞ্জিন গরম।

লোকটা কপালের ঘাম হাত দিয়ে কাঁচিয়ে ফেলে। বউটার মুখের পাউডার ঘামে গলে যাচ্ছে।

লোকটা একবার মুখ তুলে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে গৌরকে ধমকাবে না কাকুতি মিনতি করবে তা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলে, বড় বিপদ ভাই। সোয়া একটা বেজে গেছে, দুটোয় পৌঁছতেই হবে।

লাইনে দাঁড়িয়ে যান না, পেয়ে যাবেন।

লোকটা শুকনো গলায় বলে, লাইনে দাঁড়লে পঁচিশজনের পিছনে পড়ে যাব। অন্তত আধঘণ্টা। বড্ড বিপদ।

বিপদ! কার না বিপদ! কলকাতা—সুদ্ধু মানুষ রাস্তায় দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে সারা দিনমান 'বিপদ, বিপদ' বলে চেঁচাচ্ছে। গৌরের গাড়ি কি দমকল না অ্যাম্বুলেন্স? তবু তো গৌর দাঁড়ায়, মলিন হলে? যেদিন, যেখানে তার গাড়ি যাচ্ছে, একমাত্র সেদিকের বা সেখানের সোয়ারি ছাড়া তুলবেই না। পুলিশ ডাকো, তম্বি করো, মলিন উত্তর দেবে না। পুলিশ লাইসেন্স কেড়ে নিলে শান্তভাবে দিয়ে দেবে। জানে, লাইসেন্স তার পোষা পাখির মতো। লোক—দেখানোর জন্য উড়ে যায়, আবার চোরাপথে ফিরে আসে। কার কী বিপদ তা নিয়ে মলিন মাথা ঘামায় না, রেসের বইটি খুলে ক্লাসে ফার্স্ট—হওয়া ছাত্রের মতো মনোযোগ দিয়ে বইখানায় ডুবে যাবে। আর তখন ভুখখা পার্টিদের পিঁজরাপোলে বৃথা টক্কর মেরে গৌরের ল্যান্ডমাস্টারের আয়ুক্ষয় হয়। মতিয়ার গায়ের গন্ধটুকু লোকের গায়ের ঘষায় ঘষায় উঠে যাচ্ছে ক্রমে।

পারবে না গৌর। দূর থেকেই খেঁকিয়ে বলে, বলছি তো গাড়ি খারাপ আছে।

লোকটা নিরীহ, ভিতু ধরনের, বউটাও তাই। গৌরের ধমক খেয়ে এ ওর দিকে চায়। লোকটার গলা বেয়ে দারুণ ঘাম নামছে। বাচ্চাটা তার ছোট্ট মাথা তুলে চারদিকে চায়। রোদে লাল হয়ে গেছে মুখ।

গৌর মুখ ফিরিয়ে নেয়।

লোকটা দু'পা এগিয়ে এসে বলে, ওই গাড়ি কি যাবে?

মলিন মাথা নাড়ে, না দাদা, আমার বিয়ের পার্টি আছে।

লোকটা চারদিকে চায়। বাস লোক গাদাই হয়ে আছে। চারদিকে মেলার ভিড়। লোক যে কোথা থেকে আসে। কোথায় যায়!

কোনও দরকার ছিল না তবু মলিন জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

পি জি হাসপাতালে। মেয়েটির পোলিও ভ্যাকসিনের ডেট আজ। সেকেন্ড ডোজ। দুটোয় বন্ধ হয়ে যায়। সময়মতো ভ্যাকসিনটা না পড়লে কী হয় না হয়।

মলিন মোলায়েম গলায় বলে, বাসে চলে যান না। এখনও পৌনে একঘণ্টা সময় আছে, পৌঁছে যাবেন।

পোলিওর কথা শুনে গৌর থমকে গিয়েছিল। পোলিও! আই বাপ! ওই জিনিস না হলে কবে কলকাতা থেকে পাখি হয়ে যেত গৌর! প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়াত বিদেশের বাগানে। পোলিও না হলে গৌরের চারখানা পুরো হাত—পা, আর আত্মবিশ্বাস থাকত। হত মেম—বউ। বিলেতেই শিকড় চারিয়ে দিত সে। তার শিশুকালে দুনিয়ার নেমকহারাম মানুষেরা কেউ পোলিওর ভ্যাকসিন বের করেনি।

ঘড়িটা দেখে গৌর। মূল্যবান আরও পাঁচটা মিনিট কেটে গেছে। ব্রিজের শেষ মাথায়, বড়বাজারের গায়ে একটু জ্যাম আছে বটে। তবে ধীরে ধীরে চলছে গাড়ি। চল্লিশ মিনিট সময় আছে। পৌঁছে দিতে পারবে।

সে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়, উঠুন।

লোকটা বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, উঠব?

বলছি তো।

তারা ওঠে। গঙ্গা পেরোতে বউটা ভারী খুশি গলায় বলে, কী সুন্দর গঙ্গার হাওয়া গো, কাচটা আর একটু নামিয়ে দাও না।

শালারা এতদিনে পোলিওর ভ্যাকসিন বের করেছে। গৌর একটা সিঙ্গাপুরি কলা—বোঝাই লরির পেছনে প্যাঁপোর—পোঁ হর্ন মারে। কলার পাহাড়ের ওপর বসে দুটো কুলি অনিচ্ছেয় একটার পর একটা কলা খেয়ে যায়। গাড়িটা নড়ে না। হারামির বাচ্চা! গাল দেয় গৌর। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

এতদিনে পোলিওর ভ্যাকসিন বেরিয়েছে! তা এতদিন কী করছিল মানুষ? হোয়াট বিজনেস? গৌর ভারী বিরক্ত হয়। রুখো—শুখো দুটো হাত—পায়ের জন্য তার আবার দুঃখ হতে থাকে। একবার মুখ ফিরিয়ে বাচ্চাটাকে দেখে। টুলটুলে একটুখানি মুখ, ড্যাবা চোখে চারদিক দেখছে, মুখে আঙুল। থোপা থোপা চুল উড়ছে, নড়ছে হাওয়ায়। ভারী মায়া হয় গৌরের। বেঁচে থাকো। সব ক'টা হাত—পা নিয়ে, আস্ত মানুষ থাকো। পৃথিবীর অন্ধকার থেকে রোগ—ভোগ হাত বাড়ায়। সাবধান।

কলার গাড়িটা থেকে একটা কলার খোসা উড়ে এসে বনেটের ওপর পড়ে পিছলে যায়। গৌর একবার মাথাটা বের করে। কুলিটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্য সময় হলে গৌর অন্তত 'শুয়োরের বাচ্চা' বলতই। এখন বলল না। ইচ্ছে করল না, মুখটা আবার ঢুকিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে গৌর।

জ্যামটা আস্তে আস্তে নড়ে। হাত—পা শিরশির করে গৌরের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বড্ড বেশি দেরি।

কুড়ি মিনিট লাগল ব্র্যাবোর্ন রোডের মোড়ে পৌঁছোতে। তারপর ঝড়ের মতো গাড়ি ছাড়ে গৌর। টেম্পো, ঠেলা, লরি মুহুর্মুহু কাটিয়ে যায়। গাড়ি টাল খায়, পিছনের সোয়ারি ওর গায়ে ঢলে পড়ে। গৌর সেসব খেয়াল করে না। গতির উত্তেজনায় বউটা বাচ্চার ভ্যাকসিনের কথা ভুলে গিয়ে বরের হাত চেপে ধরে ভয়—পাওয়া হাসি হেসে বলে, মাগো, কী জোর গাড়ি যাচ্ছে দেখো।

লোকটা কাঠ—কাঠ হাসে। শক্ত হয়ে বসে থাকে।

গৌর এক ঝটকায় ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট পেরোয়। তারপর ময়দানের ভিতর দিয়ে উড়িয়ে দেয় গাড়ি। উড়োজাহাজের মতো গোঁ গোঁ শব্দ করে গাড়ি। ইঞ্জিন ধোঁয়ায়। গৌর দাঁতে দাঁতে চেপে রাখে। জোরে গাড়ি ছাড়লে রাস্তাঘাট আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ময়দানে বড় খেলা আছে। বোধহয় মোহনবাগান আর মহামেডান। লোকজন রাস্তা পার হচ্ছে ময়দানমুখো। গৌর ভ্রুক্ষেপ করে না। গাড়িটা মানুষজনের ওপর ছুঁড়ে মারে যেন। সটাসট সরে যায়। গৌর হাসে।

গাড়ি ওড়ে। উড়তে থাকে। পিছনের সোয়ারিরা নিশ্চুপ হয়ে গেছে। বিভোর হয়ে গেছে। ময়দানের হাওয়া বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পোলিও! পোলিও! গৌর বিড়বিড় করে। গাড়িখানা বাঁকে ঘুরতে

থাকে। একটুও গতি কমায় না গৌর! চালিয়ে দেয়।

ঘড়িতে তখনও দশ মিনিট বাকি, গৌর গাড়িখানা পি জি—র আউটডোরে ভিড়িয়ে দেয়। পয়সা দেওয়ার সময়ে ওরা স্বামী স্ত্রী অবাক চোখে গৌরকে দেখে কিছুক্ষণ। রুখো—শুখো হাত—পা—ওলা দুঃখী চেহারার লোকটা অত জোর গাড়ি চালাতে পারে! সম্ভবত তারা বহুকাল গৌরের গাড়িতে চড়ার রোমহর্ষক গল্প করবে মানুষের কাছে।

একা গাড়ি আর গৌর রাস্তায় পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে থাকে। চারটে বাজলে দাশ কেবিন। দক্ষিণের সোয়ারি পেলে ভালো। নইলে মিটার রইল ঢাকা, বনেট তোলা রইল। ফোটো পাবলিক। গাড়ি দক্ষিণ—মুখো দাঁড় করিয়ে গৌর ঝিমোয়। পাঁইয়ার হোটেলের দই ভাতের আমেজ ফিরে আসতে থাকে।

কিন্তু গৌরের জীবনে শান্তি নেই। মল—পরা একখানা পায়ের শব্দ ঝম করে বেজে ওঠে। মাইরি! এ কী! গৌর একটু চমকায়। খুব বেশি চিন্তা—ভাবনা করলে তবে মাগিটা তার বেহদ্দ নাচ শুরু করে বটে মাথার ভিতরে। তারপর নানা কায়দায় নানান তালে নাচে। গৌরের জীবন খাট্টা করে ছেড়ে দেয়। পাগল—পাগল লাগে। কিন্তু এখন তো কোনও চিন্তা করেনি গৌর। না রাখোহরির কথা, না তার বাপ বগলুর কথা, তবে? গৌর আধখানা চোখ খোলে। পশ্চিমের রোদ কানকি মেরে চোখে আঙুল ঢোকায়। ঝলসানো হিজিবিজি দেখে সে। আবার চোখ বোজে। ঝমাঝম মলের শব্দ হয় আবার। গৌর আধা—জাগা অবস্থায় বড় করে শ্বাস ফেলে। মাগিটা কেন যে নাচে, নেচে তার কী বেহদ্দ সুখ, গৌর তা আজও বুঝল না। টাইফয়েডেরও ওষুধ বেরিয়ে গেছে। সে আমলে টাইফয়েড হয় পুরো মানুষ নিত, নয়তো নিত হাত—পা—চোখ কিংবা ওরকম কিছু। গৌরের মাথা নিয়েছিল. সেই থেকে মাথায় বেহদ্দ মাগিটা ঢুকে বসে আছে। বেরোবার নাম নেই। টাইফয়েডটা যদি তার হাত—পা নিতে চাইত তবে অনায়াসে পোলিওয় শুকিয়ে যাওয়া ফালতু হাত—পা নিতে চাইত তবে অনায়াসে পোলিওয় শুকিয়ে যাওয়া ফালতু হাত—পা দেখিয়ে দিত গৌর, বলত, এই দুটো নাও, কাজে লাগে না তেমন, পড়ে আছে।

গৌর চোখ খোলার চেষ্টা করে। অমনি আবার ঝমঝম পায়ের শব্দ বাজে। বাজতে থাকে। কিছুই করার থাকে না গৌরের। হাসপাতালের বাড়ির হাত দুয়েক ওপরে সূর্য। আউটডোরের বাইরে একটা কল থেকে ফালতু জল পড়ে যাচ্ছে। কিলবিল করে মা—বাপ আর আয়ার সঙ্গে ঘুরছে রঙিন বাচ্চারা। খুব ভিড়। পোলিওর ভ্যাকসিন দেওয়া শেষ হয়ে এল। একটা বাচ্চা মা'র হাত থেকে ছুটে ওই কলের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সবই ঠিকঠাক দেখতে পায় গৌর। কোনওখানে গোলমাল নেই। তবু আবার ঝমঝম শব্দ হয়। চকিতে গৌর ঘাড় ঘোরায়।

চোখে ঘুমের আঁষ জড়ানো। পিছনে কাচে ধুলো পড়েছে। গৌর অস্পষ্ট দেখতে পায়, পিছনের কাচের ওপাশ থেকে একটা দেহাতি মেয়ের মুখ জ্বলজ্বল করে তাকে দেখছে। তার পরনে বাহারি হলুদ শাড়ি, গায়ে রুপোর গয়না, নাকে বেসর। চোখে কাজল টেনেছে গভীর করে, চোখ দু'খানা তাই বোধহয় অত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে গৌরের অস্বচ্ছ চোখে, ধুলোটে কাচের ওপারে মেয়েটাকে স্বপ্নের মতোই মনে হয়। মেয়েটা কাচের ওপর একখানা হাত পেতে রাখল। গৌর সেই হাতে মেহেদির নকশা দেখে।

কী চাই?—গৌর জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটা এক—পা দু'—পা এগোয়। মলের শব্দ হয় ঝমঝম।

গাড়ি জায়েগি?

কঁহা?

পারক সারকাস।

গৌরের সন্দেহ হয়।

কিরায়া কৌন দেগা?

মেয়েটা হাত তুলে দাঁতে আঙুল কামড়াল, তারপর মুখ ফিরিয়ে ফুটপাথের দিকটা দেখিয়ে বলল, উও।

ভঙ্গিটা বড় ভালো লাগে গৌরের। গৌর মুখ বাড়িয়ে দেখে, ফুটপাথে দেয়ালে ঢলে বসে আছে এক বুড়ি, তার সামনে রুপোর মোটা বালা—পরা হাত, বাসন্তী রঙের পাগড়ি মাথায় এক সুন্দর দেহাতি লোক বসে বুড়ির মুখে লোটা থেকে জল নিয়ে ঝাপটা দিচ্ছে।

কী হয়েছে?

বড্ডি গরম ছে, দাঁতি লাগি।

ও তোমার কে হয়?

মেয়েটা উদাস মুখ করে বলে, শাস।

আর ওই লোকটা?

তেমনই উদাস মুখে মেয়েটা বলে, আদমি।

মেয়েটার মনে যেন সুখ নেই। গায়ে হলুদ শাড়ি, চোখে কাজল, হাতে মেহেদির রং, তবু তার কোথায় যেন রংহীনতা ফুটে আছে। তার সুডৌল হাতে উল্কির ছাপ, কাচের চুড়ি, রুপোর গয়না, তবু হাত দু'খানা বড় উদ্দেশ্যহীন। কপালে টিকলি পরেছে সে, লম্বা চুল বেণীতে বাঁধা, তবু সব সাজের ভিতর থেকে দেহাতের গমের খেতে গোধূলির নির্জন উদাসীন বৈরাগ্য ফুটে আছে।

গৌর জিজ্ঞেস করে, এখানে মরতে কী করছিলে?

মেয়েলি হিন্দিতে মেয়েটি বলে, খেতে ফসল হয় না। মাটি মরে গেছে। আমাদের খেতিও ছিল ছোট। আদমিটা বাজি দেখাতে জানত। আমি নাচতাম। দেহাতে ওসবের পয়সা কেউ দেয় না। তাই আমরা শহরে চলে আসি। বাজি দেখাই। আমার আদমি লাঠি ঘোরায়, চারটে ছোরা শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নেয়, লোহার গোলার খেলা দেখায়, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরায়, হেঁটমাথা হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচায়, কত কী করে!

আর তুমি?

মেয়েটি একটু হাসে, আমি নাচি। ঘাগরা দুলিয়ে, বেণী দুলিয়ে, ঝমঝম করে। লোকে পয়সা দেয়।

এই বলে মেয়েটা কৌতূহলে গৌরকে দেখে। কী দেখে তা গৌর, অর্থাৎ বগলুর তিন নম্বর, জানে। টাইফয়েডের খাজনা দিতে শুকিয়ে যাওয়া হাতখানা, আর পা, আর চোয়াড়ে মুখ।

ভারী বিরক্ত হয় গৌর। মার শালা গৌরার কপালখানায় তিন লাথি। গৌরার যে আর দেখাবার কিছু নেই মাইরি!

পাখির স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, আমাদের নেবে না?

গাড্ডা। গৌরের ল্যান্ডমাস্টারে এখন এক দাঁতি—লাগা বুড়ি উঠবে। গৌরের সুখ নেই, তবু সে মাথা নেড়ে বলে, নেব, নিয়ে এসো।

কত নেবে?

মিটারে যা ওঠে। —বলে গৌর হাসে, তারপর চোখ ছোট করে বলে, আর একদিন তোমার নাচ দেখিয়ে দিয়ো।

মেয়েটা একপলক গৌরকে দেখে, তারপরই আবার দেহাতি উদাসীনতা মেখে নেয় মুখে। বলে, কত লোক তো দেখে! তুমিও কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে নিয়ো।

বালা—পরা সুন্দর পুরুষটা মুখ ফিরিয়ে রাগের গলায় কী একটা নাম ধরে মেয়েটাকে ডাকে। গৌর নামটা ঠিক বুঝতে পারে না। মেয়েটা ঝুঁকে বলে, একটু দাঁড়াও, আমাদের পোঁটলা—পুঁটলি তুলতে হবে কিন্তু।

গৌর মাথা নেড়ে সিগারেট ধরায়।

বিস্তর পোঁটলা—পুঁটলি, লাঠি, কাটারি ওঠে ল্যান্ডমাস্টারের লাগেজ বুটে। ততক্ষণে মেয়েটার নাকের নীচে নিটোল ঘামের ফোঁটা জমে ওঠে। পুরু পুরু দুটি ঠোঁট ভিজে যায় জিভের লালায়। সুন্দর পুরুষটির মুখে

জবজবে ঘাম, পাগড়ি শিথিল। তারা খুব অস্বস্তির সঙ্গে পিছনের সিটে বসে থাকে কাঠ হয়ে। মাঝখানে এলিয়ে আছে বুড়ি। তার চোখ বোজা।

দৃশ্যটা দেখে আয়না একটু ঘুরিয়ে দেয় গৌর। মেয়েটার মুখ ভেসে ওঠে। গভীর কাজলের ভিতর থেকে দু'খানা চোখের উদাসীনতা দেখা যায়। আর ভয়। ক্ষুধা। ফিফটি পারসেন্ট গৌরা মেয়েটার মুখে চোখ রেখে ল্যান্ডমাস্টার চালু করে।

খুব শিগগির পৌঁছে যাওয়ার কথা। গৌর গাড়িও ছাড়ে জোরে। কিন্তু পৌঁছোয় না। ময়দানের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অকারণ চক্কর দিতে থাকে। এ রাস্তা করে ভবানীপুরের দিকে চলে আসে। অলিগলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দেয়।

লোকটা নড়েচড়ে বসে। মেয়েটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, কোথায় যাচ্ছ? এ তো অন্য রাস্তা।

গৌর গম্ভীর গলায় বলে, সব রাস্তায় গাড়ি যায় না। ঘুরে যেতে হবে।

তুমি ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের।

গৌর উদাস গলায় বলে, সন্দেহ হলে নেবে যাও।

পুরুষটা মেয়েটাকে ধমক দিয়ে বলে, চোপ। কলকাতার তুই কী জানিস?

মেয়েটা চোখের বিদ্যুৎ পলকে তার পুরুষকে স্পর্শ করে বলে, আমি জানি, ও ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে।

নিক। কত নেবে? রাস্তা ঠিক পেয়ে যাব।

মেয়েটা দমে না। হাত বাড়িয়ে গৌরের শার্ট খামচে ধরে বলে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

গৌর বিনীত স্বরে বলে, পেছন থেকে ছোরা বসিয়ে দাও না। কিংবা মারো লাঠি। পুলিশও ডাকতে পারো।

মেয়েটা জামা ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকে। আয়নায় গৌর দেখে, কী সুন্দর সাদা দাঁত! এমন ঝকঝকে সরল দাঁত সে কারও দেখেনি।

দেহাতি লোকটা দার্শনিক। ঠিক জানে তাদের বেশিদূরে নিয়ে যেতে পারবে না। কলকাতার ঘুণচক্করে ঘুরে খানিক মিটার ওঠাবে মাত্র। দেহাতি বোকাসোকা লোক, ঝগড়া করে পারবে না। মিটার যা ওঠে তা দিয়ে দেবে। রুখো—শুখো হাত—পা—ওলা আর মাথায় এক বেহদ্দ মাগির পাগলা নাচ নিয়ে গৌর কোনও শালার কিছুই আর কেড়ে নিতে পারে না। এইসব ভাবে গৌর আর গাড়িটাকে বেমক্কা ঘোরায়। যে রাস্তায় যায়, ঘুরেফিরে আবার সেই রাস্তায় আসে। কী যে সঠিক সে চায় তা বুঝতে পারে না।

আরে বাঃ! এতক্ষণ মেয়েটা আয়নাটা লক্ষ করেনি। এখন করেছে। গৌর চোখ তুলেই মেয়েটার চোখ দেখতে পায় একপলক। মেয়েটা স্থিরদৃষ্টিতে আয়নার দিকে চেয়ে আছে। চোখে প্রথমে ভয়, তারপর কৌতূহল দেখা দেয়। গৌর চেয়ে থাকে। ল্যান্ডমাস্টার টাল খায়। কিন্তু বহুকালের পোষা গাড়ি বলে বে—জায়গায় টক্কর খায় না। গৌর সামলে নেয়। আবার আয়নার চোখ চলে যায়। মেয়েটা চেয়ে আছে। চোখ পড়তেই রহস্যময় হাসে। ঘোমটা তুলে আধখানা মুখ ঢাকে মেয়েটা, ঢাকে সেই দিকটা যে দিকে তার শাশুড়ি আর স্বামী রয়েছে। তারপর হঠাৎ চোখ ছোট করে জিব বের করে গৌরকে ভেঙিয়ে দেয়। আরে বাঃ! খুব শিখেছে তো!

লোকটা গৌরের যথেচ্ছাচারে বাধা দেয় না। কেবল একবার বিরক্ত হয়ে ভিতু গলায় বলে, একটু আস্তে চলো না ভাই। আমার বুড়ি মা'র শরীর ভালো না, জোরে চললে বুড়িমার কষ্ট হবে।

গৌর একটু স্পিড কমায়, আবার বাড়ায়। ক্যাঁ—চা করে ব্রেক কষে। ঘাড়ের যে জায়গাটায় মেয়েটা শার্টের কলার চেপে ধরেছিল সে জায়গাটা একটু শিরশির করে। ল্যান্ডমাস্টারটা জলের মতো বয়ে যায়। তাতে অনেক মুখের ছায়া পড়ে, আঙুলে কেউ বা জলে ছবি এঁকে যায়। কিছুই থাকে না। ক্ষণস্থায়ী একটি দেহাতি মেয়ের মুখ গৌর তার আয়নায় কতক্ষণ বা ধরে রাখতে পারে!

ল্যান্ডমাস্টার গাঁই গাঁই করে ঘোরে। জলের মতো বয়ে যায়। মেয়েটা যে কোণে বসে আছে, সেই কোণে একটু হেলে আধবোজা চোখে বসে ছিল মতিয়া। বহুদিন হয়ে গেল, তবু গৌরের হুবহু মনে আছে, দুর্লভ

আতরের গন্ধে ভরে গিয়েছিল ল্যান্ডমাস্টার, সবুজ কাচের মতো স্বচ্ছ ওড়নার সোনালি চুমকির পিছনে তার মুখ। চকমকে চুমকি জ্বলে জ্বলে উঠেছিল বার বার। ওড়না উড়ছিল হাওয়ায়। সিল্কের লাল শাড়ি, ব্লাউজ পরে লাল রঙের সুন্দর মতিয়া আধশোয়া হয়ে পড়েছিল। সেইদিনই ল্যান্ডমাস্টারের দশ পারসেন্ট আয়ু বেড়ে যায়।

কিন্তু কিছুই থাকে না। সেই আতরের সুগন্ধ লোকের গায়ে লেগে লেগে মুছে গেছে। ঘাসপাতার সুবাস—ওলা এই মেয়েটির সতেজ শরীর, একটু ঘামে—ভেজা গায়ের বোঁটকা গন্ধ ল্যান্ডমাস্টারের গদির গায়ে কতক্ষণ লেগে থাকবে! ট্যাক্সি আসলে এক বহমান নদী। স্রোতে ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়।

গৌর শ্বাস ফেলে গাড়ি আনে সহজ রাস্তায়। পার্ক সার্কাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, মিটারে দেড় টাকার মতো বেশি উঠে গেছে, মৌতাতের সময়টা এগিয়ে আসছে ক্রমে।

চোখে ঘুমের আঁষ জড়িয়ে আসে। কোন শূন্য থেকে লাল নীল হলুদ বল নেমে আসে পৃথিবীতে। চরাচর জুড়ে রঙিন বলগুলো ওড়ে কেবল। ঢাকার কামান নিঃশব্দে গোলা ছোঁড়ে শূন্যে। মুহুর্মুহু দাগতে থাকে গোলা। গৌরের আয়নায় মেয়েটা ঘোমটায় আধোঢাকা মুখে আবার জিব ভেঙায়। তার খাঁদা নাকের নীচে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছে। দেহাতি শরীরের কাঁচা গন্ধ, তার সঙ্গে রোদ—মাটির সুবাস, গাছপালার ক্লোরোফিল সব ল্যান্ডমাস্টারের ভিতরকার চৌকানা বাতাসকে টইটম্বুর করে দেয়। গৌর শ্বাস টানে। তবু সোয়ারি খালাস দিতে হবে বগলুর তিন নম্বরকে। তারপর দাশ কেবিন। গৌরের সঙ্গে দু'খানা রুখো—শুখো হাত—পায়ের মতোই সেঁটে গেছে ল্যান্ডমাস্টার। সেঁটে গেছে দাশ কেবিন। সেঁটে গেছে কলকাতার রাস্তাঘাট। মিউনিসিপ্যালিটির ম্যাপ। মিটারের পরিবর্তনশীল সংখ্যা আর মিটার ঘোরানোর টুংটাং। মৌতাতের সময়ে ঢাকার কামান কোন দূর থেকে ঠিক রঙিন বল ছুঁড়ে মারে আকাশে। রাস্তার ওপর দিকে উঠে যায়। কলকাতার মাঝখানে কারা যেন জলময় শহর বানিয়ে রেখে যায়। গাভীর ডাক শোনে গৌর। মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ হঠাৎ ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে কদমতলার বাঁশের বাঁশিটি আড় করে ধরে পা দুটো ক্রশ করে কৃষ্ণের কায়দায় দাঁড়ায়। এ সব জিনিসই সেঁটে গেছে গৌরের সঙ্গে। এর কোনও পরিবর্তন নেই।

গৌর শেকসপিয়ার সরণি পেয়ে যায়। লোকজন ভুসভাস উড়ে যাচ্ছে। ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি জোরে ছাড়ে গৌর। পিছনে বুড়িটা ককিয়ে ওঠে। অস্ফুট ভয়ের শব্দ করে পুরুষটা। মেয়েটা মুখ ভেঙাতে গিয়ে হঠাৎ টের পায় বাতাসে ঘোমটা উড়ে গেছে, স্বামী চেয়ে আছে তার দিকে। লজ্জায় জিব কাটে সে। বাতাস তার বাণীতে বাঁধা চুল লুট করে এনে কপালে ঝাপটা মারে। গৌরের গাড়ি গতির যন্ত্রণায় গোঙায়। টায়ার রাস্তায় গভীর বসে যায় লাঙলের মতো। গাড়ির জোর টানে ল্যান্ডমাস্টারের গভীর গদির মধ্যে দেহাতিরা সেঁধিয়ে যেতে থাকে, ডুবে যেতে থাকে।

কোথায় যেন! আঃ, পার্ক সার্কাস। গৌরের মনে পড়ে। আবার ভুলে যায় গৌর। আবার মনে পড়ে। রাস্তাগুলো ঠিকঠাক চেনা লাগে না। আয়নায় দেহাতি মেয়েটার সুন্দর সরল মুখখানা ঝাপসা হয়ে যায়। একটা সবুজ নিয়োন সাইন দপদপিয়ে ওঠে। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারে না গৌর। তারপর দেখে, সবুজ নিয়োন সাইন দপ করে জ্বলে উঠে বলে, তুমি... তুমি... চাও... চাও... লায়লার... লায়লার... রুটি...। আবার সব মুছে যায়। মেয়েটির মুখ দেখতে পায় গৌর। চোখে গমখেতের ধূসর বৈরাগ্য, অবহেলা, আবার কৌতুকও। আবার মুখ মুছে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পায় গৌর, ল্যান্ডমাস্টারের সামনে পার্ক স্ট্রিট, পিছনে এক দূর সমুদ্রের ছবি আয়নায় ফুটে উঠেছে। গভীর বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে একটা হলদে জাহাজের মাস্তুল দেখা যায়। জল দোলে, মাস্তুল দোলে, মানুষের বুক দুলে দুলে ওঠে। গৌর আর গৌর থাকে না। তার ল্যান্ডমাস্টারও নিজেকে ভুলে যায়। গাড়ি জমি ছেড়ে হঠাৎ সমুদ্রে লাফ দেয়। তুলে দেয় মাস্তুল। গৌর হর্ন টেপে। অবিকল জাহাজের ভোঁ—ও—ও—ও শব্দ বেজে ওঠে। ল্যান্ডমাস্টার জাহাজ হয়ে চলতে থাকে। সমুদ্র পাড়ি দেয়। দূরে এবং বিদেশি বন্দরে আঙুরের লতায় ছায়ায় থোপা থোপা সবুজ ফল ঝুলে আছে। ঝিরঝিরে নদী বয়ে যাচ্ছে। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজঘাটায়। উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়েছে বলে সমুদ্রের প্রবল বাতাসে চুল উড়ছে তার, উড়ছে ঘাগরা। পিছনে টিলার উপরে ছোট্ট বাসা। বাসা ঘিরে বাগান। কত ফুল ফুটে আছে। জাহাজ হওয়া

ল্যান্ডমাস্টার থেকে সব দেখা যায়। জাহাজ মেয়েটির দিকে, বন্দরের দিকে এগোয় ধীরে ধীরে। ভোঁ দেয়। মেয়েটা একখানা হাত তোলে। কী আনন্দিত হাতখানা, সেই হাতে কী নিয়ন্ত্রণ! গৌর স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওই হচ্ছে তার মেয়েমানুষ। ওই টিলার ওপরকার রঙিন সুন্দর বাগান—ঘেরা বাড়িটা তার ডেরা। বহুকাল সমুদ্রযাত্রার শেষে সে ফিরে আসছে।

গৌরের মাথার ভিতরে কোথায় সবুজ আলোটা জ্বলে জ্বলে ওঠে, তুমি চাও... তুমি চাও... তুমি চাও। কী যে চায় গৌর তা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। আয়নায় একখানা উল্কিপরা হাত ঝলক দিয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে যায়। ল্যান্ডমাস্টার, জাহাজ বিপুল জলরাশি ভেদ করে চলতে থাকে, দুলতে থাকে। আয়নায় বিচিত্র বিচিত্র সব ছায়া পড়ে। নিসর্গ ভেসে ওঠে। আঙুরফলের গা বেয়ে টসটসে রস ঝরে পড়ে। মাতাল মৌমাছিদের অনন্ত পিপাসার শব্দ হয়। টিলার ওপর ছোট্ট বাড়ি, রঙিন ফুল, জাহাজঘাটায় একা একটি বাতিঘরের মতো মেয়ে, এই সবই কি গৌর চায়? লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন তেমন স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। শুধু বলে, তুমি চাও... তুমি চাও... তুমি চাও...

আই! আলবত গৌর চায়। গৌর চায় মেলা কিছু। কত কী যে চায় গৌর তার ঠিক—ঠিকানা নেই। এক—একদিন তার মৌতাত জমে উঠলে ল্যান্ডমাস্টারের মুখ ঘুরিয়ে কলকাতার জাঙ্গাল ভেঙে চলে যেতে ইচ্ছে করে। কোথায় যাবে ঠিক জানে না গৌর। তবে হয়তো যাবে, কোনও ডুবজল নদীর ধারে, গাছের ছায়ায় বসে স্বচ্ছ জলের নীচে মাছেদের খেলা দেখবে। দেখবে গমের খেতের পাড়ে সূর্যাস্ত। সমুদ্রের ভিতর থেকে দেখবে দূর বিদেশি বন্দরে দাঁড়িয়ে তার মেয়েমানুষের হাতছানি। টিলার ওপর রঙিন ফুলে—ঘেরা বাড়ি।

কিন্তু না। মাথা নাড়ে গৌর। যাওয়া যাবে না কখনও। তার সঙ্গে সেঁটে গেছে ল্যান্ডমাস্টার, ল্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে সেঁটে গেছে কলকাতা, সঙ্গে সেঁটে গেছে বগলুর তিন নম্বরের কপাল।

আই বাপ! আর একটু হলে ট্রামের পিছনে ল্যান্ডমাস্টারটাকে ভিড়িয়ে দিচ্ছিলে বাবা! গৌর বিড়বিড় করে। এক ঝটকায় ট্রামটাকে পার হয়ে যায়। পিছন থেকে দেহাতি লোকটা চেঁচায়, রোখকে রোখকে, বাঁয়া তরফ।

গৌর থামে।

দেহাতিরা একে একে নেমে রাস্তায় দাঁড়ায়। লোকটা এগিয়ে এসে বলে, কিতনা?

গৌর কষ্টে মিটারটা দেখার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণের চেষ্টায় দেখতে পায় মিটারে পঞ্চাশ টাকা উঠছে। যখনই মৌতাতের সময়ে এরকম অদ্ভুত সব সংখ্যা দেখে গৌর তখনই মনে মনে সংখ্যাটাকে দশ দিয়ে ভাগ করে নেয়। হিসেব ঠিকঠাক মিলে যায়।

পাঁচ টাকা।

লোকটা টাকা দেয়। সভয়ে একটুক্ষণ গৌরকে দেখে। দেখে, এই রুখো—শুখো হাত—পায়ের লোকটা কেমন স্থলের গাড়ি জলে ভাসায়। আবার জলের জাহাজ আকাশে ওড়ায়। লোকটাকে দেখে রাখে দেহাতি। দেশে ফিরে গল্প করবে।

দেহাতির কাঁধে একটা ভাগলপুরি চাদর। সেই চাদরের ওপর দিয়ে গৌর এক ঝলক মেয়েটাকে দেখে নেয়। গৌরের গাড়িতে চড়ার ক্ষণকালের উত্তেজনার শেষে মেয়েটি আবার উদাস হয়ে গেছে। কলকাতার কঠিন রাস্তায় এই দারুণ রোদে নাচতে নাচতে তার পায়ে ফোস্কা পড়েছে হয়তো, কত কাল সে গেঁহুর খেতি দেখে না, পোড়া পাতার সুঘ্রাণ নেয় না বুকের বাতাস ভরে। কত কাল নিজের আনন্দে নাচেনি সে! গৌর চোখ ফিরিয়ে নেয়। গাড়ি ছাড়ে। দাশ কেবিন।

গৌরের পিছনের সিটে একটা রঙিন টিপ পড়ে থাকে। বাতাসে মেয়েটার কপাল থেকে খসে পড়েছিল। আবার কোনও সোয়ারির গায়ে সেঁটে একদিন উঠে যাবে টিপটা। গৌর টেরও পাবে না।

তিন

দালানকোঠাই করতে চেয়েছিলেন বগলাপতি। কিন্তু জবরদখল জমিতে ছাদ দেওয়া বারণ। তাই ছাদটা হয়নি। পাকা ভিতের ওপর দেয়াল উঠেছে। ওপরে টিন। ঘর দু'খানা। রাখোহরির পরিবারের সঙ্গে যখন

এখানে প্রথম এসেছিল গৌর তখন বাড়িটা জমজম করত। ওরা চলে যেতে আবার সব নেতিয়ে পড়েছে। যাওয়ার সময় আলমারি, বাক্স, চেয়ার, টেবিল সবই নিয়ে গেল রাখোহরি, ভাঙাচোরা দু'—একটা আসবাব, কম দামের তক্তপোশ, ছেঁড়া বই—কাগজ, সংসারে জমে ওঠা আবর্জনা আর গৌরহরিকে ফেলে রেখে গেল। সেই থেকে গৌর ভাবে, বাড়িটা তার নিজের হয়ে গেছে বুঝি। বগলাপতির সবই দখল করে নিয়েছে রাখোহরি। এই হাফ—ফিনিশ বাড়িটার ওপর দাবি—দাওয়া বোধহয় ছেড়েই দেবে। দলিল—দস্তাবেজ নেড়েচেড়ে দেখেছে গৌর, একে ওকে তাকে দেখিয়েছে। না, বাড়িটা পেলে পাবে তাদের তিন ভাই। কিন্তু গৌরের আশা, অত পেয়ে রাখোহরি বোধহয় আর এটা চাইবে না। কিন্তু কেবলই একটা আশা—নিরাশার ভিতরে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না। রাখোহরি কী চাইবে আর চাইবে না। যদি চায় তো কী করবে গৌর? যদি সামনে এসে দাঁড়ায় সুন্দর রাখোহরি, যদি লড়ে, যদি চায় তো দিয়েই দিতে হবে।

একটা ঘর ফাঁকা পড়ে থাকে। সেখানে পুরনো ব্যাটারি, পুরনো টায়ার, গাড়ি সারানোর কিছু যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে। অন্য ঘরটায় একখানা তক্তপোশ, দু'খানা সস্তা বেতের চেয়ার দু—একটা ট্রাঙ্ক, বাক্স, একটা ফ্যান, দু—একটা থালা—বাসন। ব্যস, আর কিছু নেই। ঘর দু'খানা ঘিরে কাঠা চারেক জমি। উত্তরদিকে খানিকটা নন্দীরা সীমানা—দেয়াল দেওয়ার সময়ে দখল করে নিয়েছে। রাখোহরি থাকলে পারত না। নন্দীবাড়ির মেয়েটা সকালে বা বিকেলের দিকে গৌর বাড়ি থাকলে এক—একদিন কুঁচো নিমকি দিয়ে চা দিয়ে গেছে। ডাঁটো শরীরের মেয়ে, দু'বার তাকাতে ইচ্ছে হয়। তার ওপর চা নিমকি! এসব গৌরের সামনে রেখে নন্দীরা তার নাকের ডগাতেই হাতখানেক ভিতরে দেয়ালের জন্য ধরল, গৌরকে ডেকে দেখাল, দেখ তো, ঠিক আছে? গৌর নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। দেয়াল উঠে গেল। গৌরের লজ্জায় কিছু বলা হল না। তা যাক গে এক হাত জমি। গিয়েও যা আছে তা গৌরের পক্ষে অনেক। সামনের দিকে শখ করে বাগান করেছিলেন বগলাপতি। এখন বাগান হেজে—মজে আগাছার জঙ্গল। একটু উঠোন মতো জায়গায় প্রকাণ্ড জামরুল গাছ ছায়া দেয়। মাঝে মাঝে গাছটা জামরুলে ছেয়ে যায়। গাছের গায়ে কাঠপিঁপড়ের বাসা। সেইসব পিঁপড়েদের তুচ্ছ করে কচিকষ্টি জামরুল পাড়ে বাচ্চা ছেলেরা। ডাল ভাঙে, পাতা ছড়ায়। গৌর কিছু বলে না। বাগানের বেড়াটা ভেঙে গেছে কবে। গৌর সারায়নি। গোরু ঢুকে আগাছা খায় মটমট করে। পিছনের দিকে ঘর থেকে দূরে সেপটিক ট্যাঙ্কওলা পায়খানা আর বাথরুম, টিউবওয়েল ফিট করেছিলেন বগলাপতি। সে সবই রংচটা, পিছল, ভাঙা হয়ে পড়ে আছে। বাথরুমে যেতে বুক—সমান জঙ্গল। কচুপাতা, বিছুটি বন, ভাট আর ভাং গাছে ছেয়ে আছে। তার পিছনে বারোয়ারি পুকুর। অনেক রাতে পুতুরের জলে মাছ ঘাই দেয়, ব্যাং লফিয়ে পড়ে। দেশ—গাঁয়ের শব্দের মতো সব শব্দ ওঠে। পুকুরের আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে। মশার ঝাঁক পিন পিন করে। বাগানের একধারে গৌরের গ্যারেজ। সেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় ল্যান্ডমাস্টার। গৃহস্থ যেমন মাঝরাতে গোয়ালঘরে শব্দ পেলে কুপি জ্বালিয়ে দেখে আসে, ঠিক সেই রকম গ্যারেজে খুটখুট শব্দ পেলে গৌর টর্চ জ্বালিয়ে বেরোয়। ল্যান্ডমাস্টারখানা দেখে আসে। বগলাপতির দেওয়া সেকেন্ডহ্যান্ড ল্যান্ডুটা ছাড়া তার আর আছেটা কী?

ক'দিন পর পর বৃষ্টি গেছে খুব। কলকাতার রাস্তা—ঘাটে এখনও হাঁটুভর জল জমে আছে। গৌর তাই আজ সকালে গাড়ি বের করেনি। মেঘ কাটছে, রোদ উঠছে একটুখানি। উঠোনের মাঝখানে মাটি শুকিয়ে সাদা হচ্ছে ক্রমে। জামরুল গাছে এবার ফুল আসেনি। খুব পিঁপড়ে বাইছে। নন্দীদের পাঁচটা হাঁস পুকুর থেকে উঠে এসে গৌরের উঠোনে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়ায়। এ ওর ঝুঁটি ধরে পিঠে চাপে। একটা মাদি হাঁস খেলতে খেলতে সামলাতে না পেরে তলতলে একটা ডিম পেড়ে ফেলে মাটিতে, একটা হাঁস সেটা কপকপ করে খেয়ে নেয়। জামরুল গাছের ছায়ায় একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে বসেছে গৌর। কলকাতার একখানা স্ট্রিট ডাইরেক্টরিই গৌরের প্রিয় বই। অবসর পেলেই সেটা নিয়ে বসে। আজও বসেছে। কলকাতার সঙ্গে জানপয়ছান এখনও তার শেষ হয়নি। কবে হবে তা বলাও যায় না।

কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারে না সে। রাস্তার নাম মুখস্থ করতে করতে অন্য মনে চেয়ে থাকে। হাই তুলে বইখানা কোলে ফেলে রেখে তার বাড়িখানা দেখতে থাকে।

কতটুকুই বা জমি! কীই বা ভালো ঘরখানা! তবু বগলাপতির বড় সাধের বাড়িখানা। দেশের লোকদের সঙ্গে মিলেজুলে একদিন এইখানে থাকবেন, এরকম ইচ্ছে ছিল তাঁর। ওদিকে বড়লোকদের পাড়ায় তিনতলাখানা ছাড়তেও কষ্ট হত তাঁর। তাই এই বাড়িটা করে এক গরিব জ্ঞাতিকে বসিয়েছিলেন। কড়ার ছিল, যতদিন না বগলাপতির দরকার হয় ততদিন বিনা ভাড়ায় থাকবে। জ্ঞাতি কাকা হরিরাম সেই থেকে বসলেন বাড়িটায়। পুরুত মানুষ, খুব নিরীহ। তার পাঁচ ছেলেমেয়ে, বউ, বিধবা বোন নিয়ে বিরাট সংসার। কষ্টে চলত। বড় ছেলে নিতাই ছিল ব্যাঙ্কের পিয়োন। কী ভাগ্যে তার বউটা হল সুন্দরী। সেই বউই অবশেষে ভাগ্য ফিরিয়ে দিল তার। বিকেলের দিকে সাজগোজ করে বেরোত, একটু বেশি রাতে ফিরে আসত আবার। ঘরের বউয়ের মতোই চলাফেরা, শ্বশুর—শাশুড়ির সামনে ঘোমটা, সব বজায় রেখে চলত সে। বিয়ের আগেকার এক ছোকরা প্রেমিক ছিল তার। সে এখনও মুখের বড়শি ছাড়াতে পারেনি। চলে আসত রবিবারে রবিবারে। হাতে মাছ, মিষ্টি দইয়ের হাঁড়ি, বউটি তাকেও খুশি রাখত। চা খাওয়াত, ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করত মাঝে মাঝে। সব বজায় রেখে বউটি নিতাইয়ের অবস্থা ফেরাতে লাগল আস্তে আস্তে। টেরিলিন—টেরিকটন পরতে লাগল নিতাই, সিগারেটের ব্র্যান্ড পালটে ফেলল। কিন্তু পাড়ায় তখন তার বউয়ের নামে টিটিক্কার। কত লোক যে তাকে দামি গাড়িতে চড়ে অচেনা পুরুষের সঙ্গে যেতে দেখেছে, কত লোক লক্ষ করেছে রাতে ফেরার সময়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত তাকে গাড়ি এসে পৌঁছে দেয়। তখন নিতাইয়ের বউয়ের পা টলমল করে, খোঁপায় ফুল গোঁজা থাকে। নিতাই সেসব শুনে ভারী বিরক্ত হয়ে বলত, রিফিউজিদের সঙ্গে থাকা যায় না। পাড়ার উঠতি মেয়েরা পাছে ওই বউয়ের খপ্পরে পরে যায় সেই ভয়ে প্রতিবেশীরা মাঝে—মধ্যে চড়াও হলে নিতাই ঘর থেকে হেঁকে বলত, কেন তোমাকে সন্দেহ করে বলো তো! তুমি সত্যিই কিছু করো—টরো না তো? বউ কেঁদে বলত, ওমা! তাই কি পারি! নিতাই বলত, আমার গা ছুঁয়ে বলো যে তুমি ওসব করো না! বউ তখন নিতাইয়ের গা ছুঁয়ে বলত যে সে ওসব করে না। তখন নিতাই বলত, তাহলে তোমার ভয় কী? সকলের মুখের ওপর বলে দাও সেই কথা। এ সব ঘটলে ক'দিন নিতাইয়ের বউ বেরোত না। তারপর আবার একদিন সাজগোজ করত, বেরোত, ফিরত রাত নিশুতির সময়ে। আবার তার বিয়ের আগের ছোকরা প্রেমিক রোববার দই, মিষ্টি নিয়ে আসত। বগলাপতি কানাঘুষো শুনে ডেকে পাঠালেন, এ সব কী শুনছি হরিরাম? হরিরাম ভারী তৃপ্তির হাসি হেসে বলতেন, ওরকম বউ হয় না। লক্ষ্মীমন্ত যাকে বলে। অবস্থার উন্নতি দেখলে কবে না পাঁচজন পাঁচ কথা বলেছে! ওই বউ আসার পর থেকেই আমাদের উন্নতি। বিষয়ী লোক বগলাপতি উন্নতির কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠতেন, তোমার ছেলেরা কোন লাটসাহেবি পেয়েছে যে রাতারাতি উন্নতি হয়ে গেল? ওসব বোলো না। টাকাপয়সা কোন গলিঘুঁজিতে ঘুরে বেড়ায় তা আমি জানি। আমার বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না। হরিরাম ম্লান মুখে চলে গেলেন বটে, কিন্তু তারপরই গোলমাল শুরু করে নিতাই আর হরিরামের আরও দুই ছেলে মাধু আর সেতু। মাধু সতুর চেহারা বিশাল, স্কুলের এইট ক্লাসে আটকে পড়েছে, চুরি—চামারি দিয়ে বাল্যজীবন শুরু করে জোয়ান বয়সে বেশ ডাকাবুকো হয়ে উঠেছে। বাড়ির বউয়ের মান—ইজ্জত রক্ষার জন্য তারাও দাঁড়িয়ে গেল। তাদের সবচেয়ে বড় স্বার্থ ছিল অবশ্য এই সাড়ে কাঠা জমিওলা বাড়িটা। জমি বগলাপতির বাপের নয়, জবরদখল। যে দখল করে তার। দখলের অনেক পরে সরকার নামে নামে মঞ্জুর করেছে জমি। হরিরামের ছেলেরা বলে বেড়াতে লাগল, এই জমি বাড়িতে বগলাপতি কখনও থাকেননি, সুতরাং জমি তাঁর নয়। জবরদখল জমিতে বসবাস না করলে স্বত্ব জন্মায় না। তারাই এতকাল যখন বসবাস করেছে তখন জমি তাদেরই। এইসব বলে তারা পাড়ার লোককেও ভজাতে লাগল। বগলাপতি জ্ঞাতিভাই হরিরামকে ঠিক তুলে দিতে চাননি। চাইলে তুলতে পারতেন। তার বদলে তিনি হরিরামকে অন্য জায়গায় জমি দেখে দিয়ে বললেন, বাড়িটা ছেড়ে দাও। হরিরাম ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন, ছেলেরা ছাড়ল না। মাধু আর সতু তখন পাড়ার মস্তান। নিতাইয়ের পকেটে বিস্তর

নম্বরি নোট। তার আদুরি বউ বাড়িতে পাকা বাথরুম তুলে ট্যাপের জলে অনেকক্ষণ গন্ধ সাবান দিকে স্নান করে। কাউকে গ্রাহ্য করার নেই। পাড়ার ক্লাবে মোটা চাঁদা দেওয়া আছে। রাতে না ফিরলেও কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলে না। কয়েকটা নারকোল গাছ ছিল বাড়িতে, ফি বছর শ'খানেক নারকোল বগলাপতির বাড়িতে পৌঁছে দিত হরিরাম। গোটা কুড়ি সুপুরি গাছ থেকে প্রায় পনেরো বিশ সের সুপুরি আসত। হঠাৎ সেসব দেওয়া তারা বন্ধ করে দিল। বগলাপতির চাকর পৌষপার্বণের আগে নারকোল আনতে গিয়ে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। হরিরাম এসে একদিন হাতে পৈতে জড়িয়ে কেঁদে পড়লেন, দাদা, আপনার জমিতে আমি পরগাছা। উঠতে চাই, কিন্তু ছেলেরা দিচ্ছে না। আপনি আমার দোষ নেবেন না। বগলাপতি শ্বাস ফেললেন। মানুষটা বিষয়ী বটে কিন্তু হৃদয়হীন ছিলেন না। ভেবেচিন্তে বললেন, আমি যদিও রিফিউজি, কিন্তু জবরদখলের জমি আমার দরকার নেই। তুমিও অভাবী লোক, সময়মতো জমি নাওনি, এখন আর যাবে কোথায়? ওখানেই থেকে যাও। কিন্তু একটা শর্ত। আমার একটা ন্যাংলা—নুলো ছেলে আছে, গৌরা। ওর যদি কোনও চুলোয় যাওয়ার না থাকে তো তোমরা ওকে একখানা ঘর ছেড়ে দিয়ো। হরিরাম উত্তর দিলেন না। জামার হাতায় চোখ মুছে বললেন, দাদা, আমরা মা—বাপ হয়েও ওই বাড়ির কোন কোণে পড়ে আছি, তো তোমার গৌরা! আমাদের দেশের বাড়িতে এ কোণে ও কোণে বেড়ালের মতো পড়ে থেকে কত জ্ঞাতি মানুষ হয়ে গেল, কত কর্মনাশা বুড়ো হয়ে দাবা তাস পাশা খেলে খেলে জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে মরল, কেউ ফিরেও দেখেনি। কিন্তু আমার ছেলেরা তো একান্নবর্তী পরিবার দেখেনি। বড়বউমা যদি আজই বলে তার বুড়ো শ্বশুর—শাশুড়িকে আলাদা করে দিতে তো নিতাই তাই দেবে। ওরা রক্তের সম্পর্ক চেনেই না। জ্ঞাতি তো দূরের কথা। কুকুর বেড়ালটা যে এঁটো—কাঁটা খায় তাও ওদের গায়ে লাগে।

বাড়িটা ওইভাবে একরকম হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। বগলাপতি আর উকিল—মোক্তার করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, না—হর—এর জমির জন্য লড়াই করে খামোকা রক্ত জল হবে। কোর্ট তাঁকে ডিক্রি দিলেও উচ্ছেদ করতে পারবেন না। রিফিউজিদের জমির মায়া বড় বেশি। কলোনি থেকে এতকাল বসবাসের পর কেউ উচ্ছেদ হচ্ছে জানলে সবাই রুখে দাঁড়াবে, দাঙ্গা লেগে যাবে। তিনি তা করেননি। উপরন্তু তিনি পুরনো আমলের লোক বলে জ্ঞাতির সম্পর্ক মানতেন। হরিরাম উচ্ছেদ হবে, এটা ভাবতে তাঁর ভালো লাগত না বোধহয়।

কিন্তু সেই সময় ডাকাতের মতো এসে পড়ল রাখোহরি। বিষয়—সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার সময়ে সে হিসেবে নানারকম ফাঁক—ফোঁকর দেখতে পাচ্ছিল। তাই নিয়ে বাপ—ব্যাটায় বখেরা লেগে যায়। বগলাপতির পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তিনি হাত কচলে টাকা করেছেন। কাউকে চটাতেন না। তিনি ক্ষয়ক্ষতি হাসিমুখে সামলাতেন। আবার ধৈর্য ধরে সেই ক্ষয়পূরণও করতেন। মানুষকে খাতির করা ছিল তাঁর স্বভাব। যার কাছ থেকে কাজ আদায় হওয়ার সম্ভাবনাও নেই তাকেও তিনি হাতে রাখতেন। জীবন বড় অনিশ্চিত। কখন কী হয় বলা যায় না। তাঁর সেই পদ্ধতি কার্যকরীও হত। ফুড করপোরেশনের নগণ্য একজন কেরানিকে তার বউয়ের টিবির সময়ে খুব সাহায্য করেছিলেন বগলাপতি। সাহায্য না করলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দেখা গেল পাঁচ—সাত বছরের মধ্যেই কী সব পরীক্ষা দিয়ে সেই কেরানি ডেপুটি সেক্রেটারি হয়ে গেল। বগলাপতিকে সে মনে রেখেছিল। বগলাপতির এই সহজ দার্শনিকতা রাখোহরি কখনও বুঝত না। বগলাপতি যে সরকারি অফিসের পিয়োন বা আর্দালির বাড়ির কুশল নেন, দুটো মিষ্টি কথা বলেন, মাঝে—মধ্যে একটা দুটো টাকা হাতে ধরিয়ে দেন, এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাব বলেই ভেবে নিল রাখোহরি। সে তাই বুড়ো বয়সের বগলাপতিকে আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগল। যাদবপুরের জমি, ওটা বিক্রিও করা যাবে না, আমরা থাকবও না। হরিরাম আছে, থাক। কিন্তু রাখোহরি ছাড়ল না। সে বলল, জমির জন্য বলছি না। সাড়ে চার কাঠা জমি দিয়ে আমাদের হবেটা কী? কিন্তু ওরা যে আপনাকে অপমান করে, জমির ফসল দেয় না, আমাদের জমিতে আছে বলে যে ওদের কৃতজ্ঞতা নেই, তার জন্য কিছু করা দরকার। বগলাপতি শঙ্কিত হয়ে বললেন, ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না রাখু। গুন্ডা—বদমাইশদের সঙ্গে লেগে ইজ্জত যাবে। রাখোহরি ফুঁসে উঠে

বলে, আপনার ওইরকম ছেড়ে—দাও ছেড়ে—দাও ভাব আমার বরাবর খারাপ লাগে। হরিকাকা থাকুন ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁর ছেলেরা মাথা নিচু করে থাকবে না কেন? আমি ওদের মাথাটা নুইয়ে ছেড়ে দিতে চাই। বগলাপতি তখন জিজ্ঞেস করলেন, কী করবি তুই? কী করতে চাস? রাখোহরি বলল, মামলা করব। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। জবরদখলের জমি, বিক্রিবাটার স্বত্ব নেই, বসতও করবে না কেউ, ওই নীরেস চার কাঠার মামলায় টাকা খাওয়ানোর মতো অপচয় হয় না। মামলা—মোকদ্দমা বগলাপতি বরাবর এড়িয়ে গেছেন। যেখানে কিছু ছেড়ে দিলে হয়, সেখানে বারবর বগলাপতি কিছু ছেড়েছেন। মামলা করেননি।

কিন্তু রাখোহরি দাপের লোক। বগলাপতির সেকেলে পদ্ধতি সে মুহুর্মুহু বাতিল করে দিচ্ছিল। কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল, মামলায় ডিক্রি পেলেও উদ্বাস্তু কলোনি থেকে কাউকে বিধিমতো উচ্ছেদ করাও শক্ত ব্যাপার। কোর্টের পেয়াদা কিংবা পুলিশ গিয়েও সুবিধে করতে পারবে না। তাই সে অন্য কায়দা নিল।

সে সময়ে মাঝে মাঝেই ডজ গাড়িটায় রাখোহরিকে নিয়ে বেরোত গৌর। দু'—চার জায়গায় কী সব খোঁজখবর নিয়ে রাখোহরি একদিন ডজ গাড়িটা যাদবপুরের সেন্ট্রাল রোডে বিকেলের দিকে দাঁড় করাল। সিগারেট ধরিয়ে গৌরকে বলল, তুই ঘুরে—টুরে আয়, আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করব। নেংচে নেংচে গৌর একটু দূরে গিয়ে পুকুরপাড়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। সে সময়ে দূর থেকে দেখতে পেল, ভারী সুন্দর একখানা মেয়ে এসে উঠল তাদের গাড়িতে। পুরনো আমলের গাড়ি, এখনকার মতো বড় বড় কাচ লাগানো নয়। ভিতরটা একটু অন্ধকার, জানালা দরজা ছোট ছোট। সেই অন্ধকারে কী যে হচ্ছিল তা বুঝতে পারল না গৌর। একটু পরেই অবশ্য গৌরকে ডেকে গাড়ি ছাড়তে বলল রাখোহরি। মেয়েটা তখন নেমে গেছে। কিন্তু আবার ক'দিন পর সেন্ট্রাল রোডে ডজ গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করল রাখোহরি। মেয়েটা আবার এল। কাছ থেকে গৌর চিনতে পারল, নিতাইয়ের বউ। পালে—পার্বণের তাদের বাড়ি অনেকবার গেছে। সেদিন আর নিতাইয়ের বউ নেমে গেল না, ময়দানে ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ হাওয়া খেল রাখোহরির সঙ্গে। কত হাসি গল্প, ঠাট্টা—ঠিসি, গায়ে গায়ে ঢলে পড়া! বড় লজ্জা করছিল গৌরের। কথার মাঝখানে একবার রাখোহরি তার পাসপোর্ট বের করে নিতাইয়ের বউকে দেখিয়ে বলল, দেখো, এখনও তাজা পাসপোর্ট। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি আবার বিলেতে চলে যেতে পারি। যদি বিয়ে করি তো বউয়েরও ভিসা পেয়ে যাব। তখন গৌর অল্পবুদ্ধিতেও বুঝতে পারল, বিস্তর মেম—ঘাঁটা রাখোহরি নিতাইয়ের হাফ—গেরস্ত বউয়ের জন্য একটুও নয়, অন্য কারণে লেজে খেলাচ্ছে বউটাকে। রাখোহরিরও ফোর—সাইট ছিল। বুঝেছিল, এ মেয়েকে কেবল টাকা বা ভয় দেখালে কিছু হবে না। এমন কিছু দেখাতে হবে যা নতুন, যার মধ্যে চমক আছে। পাসপোর্ট ভিসা আর বিলেতের গল্পে সেই কাজটা হয়ে গেল। বিলেতের গল্প শুনতে শুনতে ভারী নেতিয়ে পড়ত নিতাইয়ের বউ, শ্বাস ফেলতে ভুলে যেত। রাখোহরি গল্প বলতেও জানত। গোল্ডার্স গ্রিনের শীতের রোদ, ট্রাফলগার স্কোয়ারের পায়রা, হাইড পার্কের সবুজ ঘাস, বিখ্যাত কান্ট্রিসাইডের টিলা, শৌখিন জঙ্গলে শিকার, গলফ লিঙ্কে ছুটির দুপুর, উইক এন্ডে সমুদ্রের ধারের একশো মজা, সব জীবন্ত হয়ে উঠত। ছুটিছাটায় প্যারিস, মোমবাতির আলোয় ডিনার আর নাচ। সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ি হ্রদের ধারে চেরি আর আপেলের খেত, ইটালির জলপাইরঙের মানুষ দেখে বেড়ানো। কলকাতার দ—য়ে পড়ে থাকা নিতাইয়ের বউয়ের বুকের ভিতরে ঝড় তুলে দিল রাখোহরি। আর সামনের সিটে বসে গাড়ি চালাতে চালাতে গৌর ওই সব গল্প শুনতে শুনতে কলকাতার কথা ভুলে গিয়ে উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে কেবল বিদেশি রাস্তার দৃশ্য দেখত।

রাখোহরির কয়েকটা পোষা ভূত আছে। সেই ভূতগুলোকে সে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিত। নিতাইয়ের বউটা কয়েকদিনের মধ্যেই ভূতে পাওয়া মানুষ হয়ে গেল। রাখোহরি গৌরকে কোনওদিন পুরো মানুষ বলে ভাবেনি। তাই তার সামনেই ভূত ঢোকানোর খেলা খেলত। একদিন ময়দানের ধার ঘেঁষে গাড়ি যাচ্ছে, বসন্তকাল, হাওয়া—টাওয়াও ভালোই দিচ্ছিল, দু'—চারবার কোকিলও ডাকল নিয়মমতো, সে সময়ে

গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ, সে শুনতে পেল, রাখোহরি নিতাইয়ের বউকে বলছে, চলো বিয়েটা সেরে ফেলি।

সে কী? তা কী করে হবে?—বউটা বলে অবাক হয়ে।

রাখোহরি হাসে, আইনে আটকায় জানি। কিন্তু এখন ডাইভোর্স করতে গেলে অনেক ঝামেলা। আর তার দরকারই বা কী ? আমরা যদি বিলেতে পালিয়ে যাই নিতাইয়ের সাধ্য নেই অত দূরের পাল্লায় কিছু করে। কিন্তু পালিয়ে যেতে হলেও পাসপোর্ট ভিসা তো চাই। তাতে ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা দরকার। তাই বলছিলাম। একটা রেজিস্ট্রি করে আমি তোমাকে বউ বলে পরিচয় দিয়ে পাসপোর্ট ভিসার দরখাস্ত দাখিল করি। বউয়ের জন্য ভিসা পেতে বড়জোর দিন কুড়ি লাগে, তারপর—

বউটা শ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে তখন। ডজ গাড়ির আয়নায় গৌর দেখে, নিতাইয়ের বউয়ের ঠোঁক কাঁপছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা। তারপর আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ল বউটা। মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল, কবে?

সাড়ে চার কাঠা জমির জন্য বিস্তর ভূতের খেলা দেখাল রাখোহরি। সেই থেকেই গৌর জানে রাখোহরির মতো লড়াকু হয় না। ভাবলে আজও গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়।

পাসপোর্ট ভিসা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর একদিন সকালে নিতাই এসে রাখোহরিকে ধরল, দাদা, এ কী শুনছি?

কী শুনছ?

সে বড় পাপকথা! এ সব করবেন না, ভালো হবে না। আমি পুলিশে খবর দেব।

দাও।—উদাসভাবে হাই তুলে রাখোহরি বলে।

এ সব করবেন না।—আবার বলে নিতাই। কিন্তু তার গলার স্বর এক পর্দা নেমে গেছে তখন। সুন্দর চেহারার রাখোহরির মুখে সর্বদা যে নিষ্ঠুরতা এবং আত্মবিশ্বাস ফুটে থাকত তার সামনে অনেকেই দাঁড়াতে পারত না। নিতাই জানত, বউ গেলে সে আটকাতে পারবে না। অথচ তার দুধেল গাই। তারই ওপর খেয়ে—পরে আছে তারা, টেরিলিন—টেরিকটন পরছে, সিগারেটের ব্র্যান্ড পালটেছে। বউয়ের কাজকর্মে পাছে বাধা হয় সেই ভয়ে বাচ্চা—কাচ্চা হতে দেয়নি। এখনও কেমন আঁট গড়নের লম্বা ছিপছিপে মেয়েটি রয়ে গেছে বউ। পুরুষদের বাতাসে ভাসিয়ে রাখে। কিন্তু হঠাৎ এ কী? এমনটা তো কখনও ভাবেনি নিতাই!

রাখোহরি কঠিন মুখ করে বলল, কী আর খারাপ কাজটা করছি! একটা মেয়েকে নষ্ট করছ তোমরা। আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। তাকে সত্যিকারের ঘরসংসার দেব।

ও সব ব্লাফ। আপনি ওকে নিয়ে গিয়ে বাজারে ছেড়ে দেবেন। আমি জানি।

জানো যদি তো ওকে সেটা বুঝিয়ে দাও না কেন?

কিন্তু নিতাই যে তা অনেক বুঝিয়েছে, এবং বউ বুঝতে চায়নি, তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। হঠাৎ হম্বিতম্বি ছেড়ে নিতাই রাখোহরির পা চেপে ধরল, দাদা, দয়া করুন।

রাখোহরি তখন তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল।

ক'দিন পর জমির মামলা দায়ের হলে নিতাই রাখোহরির পক্ষে সাক্ষী দেয়। পাড়ার লোকদেরও সে—ই বোঝায়। উচ্ছেদের নোটিশ পড়ার আগেই তারা বাড়ি ছেড়ে কসবার দিকে উঠে গেল। একটা শ্বাস ছেড়ে আর—একটু বুড়ো হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বাড়ির প্লাস্টার ফেলে নতুন সিমেন্ট লাগিয়ে রং করে নিল। তারপরই বিয়ে করে রাখোহরি অন্য কাজে মন দেয়। বাড়িটা ভাড়া দেয় এক বুড়ো ব্যাচেলারকে।

এই সেই বাড়ি। দু'খানা টিনের ঘর, সাড়ে চার কাঠা জমি। তেমন কিছু না। তবু গৌর মনে মনে আজও বাহবা দেয় রাখোহরিকে। বগলুর ফোর সাইট ছিল, রাখোহরির পোষা ভূতগুলোই যেন তাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে বালিগঞ্জের বাড়ি একদিন মর্টগেজ যাবে! তাই আগে থেকেই খালাস করে রেখেছিল এই বাড়িখানা। বুড়ো ব্যাচেলার ভাড়াটে বসিয়েছিল, যাতে তুলে দিতে কষ্ট না হয়। বাড়িখানা কাজে লেগেছিল

বটে। আবার কাজ ফুরালে রাখোহরি উঠে গেছে বালিগঞ্জে। জঙ্গলে, লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে একা পড়ে আছে গৌর! মাঝে মাঝে সে ভাবে, বোধহয় বাড়িখানা তারই হয়ে গেল, রাখোহরি স্বত্ব ছেড়েই দিল বোধহয়। কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হয় না। রাখোহরির পোষা ভূতগুলোর কথা মনে পড়তেই আজও রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায় গায়ে। কোন কায়দায় যে রাখোহরি কাকে উচ্ছেদ করবে বলা যায় না। এইসব ভেবে গৌরের কেবলই মনে হয়, এই দুনিয়াতে একটা জীবন সে পরের ঘরে বাস করে যাচ্ছে। কোথাও তার নিজের ঘর নেই। পাখিদের মতো মানুষের পালক নেই যে উড়ে গেলেও দু'—একটা পালক পড়ে থাকবে। কিন্তু গৌরের মনে হয়, পালক নয়, কিন্তু পালকের মতোই হালকা মিহি নরম কী যেন সব পড়ে আছে বাড়িটাতে। হাওয়া দিলে সেগুলো উড়ে উড়ে বেড়ায়। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু গৌর ঠিক টের পায়। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে এক—একদিন দেখে, জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে বিছানা ভাসিয়ে দিচ্ছে। সেই জ্যোৎস্নার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে হঠাৎ দেখতে পায়, হালকা কুয়াশার মতো কী যেন ভেসে আছে। ঘুরছে ফিরছে উঠছে নেমে আসছে। এ সব কী তা সঠিক জানে না গৌর, তবে তার মনে হয়, এ সব হচ্ছে মানুষের অদৃশ্য পালক। যেখানে কিছুদিন বাস করে মানুষ, সেইখানে তার কথার স্বর বাতাসে থেকে যায়, থাকে কামনা—বাসনার ছাপ, ইচ্ছে—অনিচ্ছে থেকে যায়। সেসবই হালকা মিহিন পালকের মতো ঘোরে ফেরে, বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ইট কাঠ মেঝের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য গাছের মতো শিকড় দিয়ে আঁকড়ে থাকে। তাড়ানো যায় না। হরিরাম কাকা, নিতাই, তার বউ, মাধু, সতু, সেই বুড়ো ব্যাচেলার ভদ্রলোক, রাখোহরির ছেলে বউ, সকলেরই পালক পড়ে আছে। সেইসব পালক গৌরের শ্বাসের সঙ্গে বুকে ঢুকে যায়, চোখে আঁষের মতো জড়ায়। প্রজাপতির মতো কাঁধে বা মাথায় বসে ডানা কাঁপায়।

দুনিয়াভর ভূতের খেলা চলেছে। সবাই দেখে না। গৌর দেখে। এই যে এখন দিনদুপুরে জামরুল গাছের ছায়ায় চেয়ার টেনে বসে আছে গৌর, তার চারদিকে অফুরান রোদ, এর ভিতরেও সেইসব পালকেরা উড়ে উড়ে ঘুরছে। দেখা যায় না, কিন্তু টের পাওয়া যায়। হালকা, মিহি। জ্যোৎস্নার মতো, সুখের স্বপ্নের মতো পলকা জিনিস দিয়ে তৈরি। চারদিকে এইসব মানুষের পালক উড়ছে, টের পায় গৌর। তার হাই ওঠে। কেবলই মনে হয়, পৃথিবীতে তার নিজের বলতে কিছু নেই আর। বগলাপতি যা রেখে গিয়েছিলেন তার কিছু নিল রাখোহরি, আর যা আছে তা ভূতের কব্জায়। আরও আছে রাখোহরির ভূত। কখন যে সে কাকে উচ্ছেদ করে তার কিছু ঠিক নেই।

বেলা ন'টায় চড়া রোদ উঠে গেছে। পিঁপড়ের সারি নেমে আসছে গাছ বেয়ে। সকালটা বড় সুন্দর। গৌর গুনগুন করে একটা ইংরিজি প্রার্থনা সংগীত গাইতে থাকে। ফাদার ইভান্স গাইতেন প্রার্থনার গান। সেন্ট অ্যান্টনিজের প্রকাণ্ড হলঘরে পিয়ানোর ঢাকনার ছায়ায় ফাদার ইভান্সের মগ্ন মুখখানা চোখে পড়ে। বুড়ো মানুষ, বড় নরম মুখখানা তাঁর। ধর্মসংগীত ছিল তাঁর প্রাণ। জিশুর ক্রুশবহনের দিনে তিনি বিষাদসংগীত গাইতে গাইতে কাঁদতেন। জিশুর পুনরুত্থানের দিন তাঁর গলায় রৌদ্র ঝিলমিল করত। হুল্লোড়বাজ অত ছেলের মধ্যে কোন ছেলেটার মুখে আনন্দ নেই, মনে নেই সুখ, তা ঠিক খুঁজে বের করতে পারতেন ফাদার ইভান্স। ভিড় ঠেলে পথ করে আসতেন তার কাছে, কাঁধে হাত রাখতেন, গল্প বলতেন। টাইফয়েডের ঘোরলাগা অবস্থায় কতদিন গৌর দেখেছে শিয়রের কাছে বুড়ো—সুড়ো সান্তাক্লসের মতো ফাদার ইভান্স বসে আছেন। বাদামি দাড়ির ভিতরে হাসি, ঘন ভ্রূ—র নীচে স্বচ্ছ জলের মতো চোখ। সেই জলের নীচে কৌতুক খেলা করে মাছের মতো। বাগানের গোলাপ—কাঁটায় সুন্দর একটা জামা একবার ছিঁড়ে ফেলেছিল গৌর। তার কান্না দেখে ফাদার ইভান্স, 'অ্যাও, কাঁডে টো মেয়েরা। টুমি মেয়ে নাকি?' বলে তার জামা খুলে নিপুণ হাতে রিপু করে দিয়েছিলেন। তারপরও বহুকাল জামাটা পরেছে গৌর।

খুব বুড়ো হয়েছিলেন ফাদার ইভান্স। তাই একদিন মারা গেলেন। অল্প অল্প বৃষ্টি ছিল সেদিন। ছায়াচ্ছন্ন দিন। ইভান্সের দেহ বহন করে আনল বাহক বন্ধুরা। কালো পোশাক, গম্ভীর মুখ সকলের। শব—বহনকারী গাড়ির পিছনে সেন্ট অ্যান্টনিজের ছাত্রদের বিরাট সারি। নিঃশব্দে তারা ধীরগতি গাড়ির পিছনে পিছনে

হাঁটছিল। তাদের সঙ্গে হাঁটছিলেন ফাদারেরা। সাহেবরা কাঁদে না। গৌরের পাশেই ছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস। সে অনেকবার মুখ তুলে ফাদারের মুখখানা দেখল, গম্ভীর মুখ, কিন্তু কান্নার চিহ্ন নেই। কাঁদতে কাঁদতে গৌরের বুকে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ছিট ছিট বৃষ্টির জল ধুয়ে দিচ্ছিল তার মুখ। ফাদার ফ্রান্সিস তার হাত ধরে রাখলেন। কবরখানায় যখন ফাদারের দেহ রাখা হল গর্তে, ঝুরঝুরে মাটি চাপা পড়তে লাগল কফিনে, তখনও ফাদারেরা কেউ কাঁদে না। সাহেবরা কাঁদে না, গৌরের মনে হয়েছিল। যখন গর্তটা প্রায় ভরাট হয়ে এসেছে, ছাত্ররা এগিয়ে গিয়ে মুঠো মুঠো মাটি দিচ্ছে কবরে, তখন গৌর হঠাৎ দেখে, একটা ভয়—পাওয়া ছোট্ট ব্যাং লাফিয়ে পড়েছে কবরে। বেরোবার পথ পাচ্ছে না। চারদিকে ভিড়। মাটির চাপ এসে পড়ছে তার ওপরে, সে প্রাণপণে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করছে, সরে যাচ্ছে এদিক ওদিক, কিন্তু তবু চতুর্দিক থেকে মাটির ঢেলা এসে পড়ছে। ব্যাংটা প্রায় চাপা পড়ে—পড়ে। সেই সময় গৌর দেখল, ফাদার ফ্রান্সিস হাঁটু গেড়ে বসলেন কবরের ধারে, দু'হাত বাড়িয়ে ব্যাংটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দীর্ঘকায় ফাদারের শরীরটা নুয়ে আছে ফাদার ইভান্সের কবরের ওপর, চারদিক থেকে মাটির চাপড়া এসে পড়ছে তাঁর বাড়ানো দুই হাতে, মেঘের ঘন ছায়ায় ফাদার ফ্রান্সিসের মায়াময় মুখখানা কী গভীর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল! আজও গৌরের মনের মধ্যে ওই ছবিটা রয়ে গেছে, ফাদার ফ্রান্সিস কুঁজো হয়ে কবরের ভিতরে একটা বিপন্ন ব্যাংকে তুলে আনার চেষ্টা করছেন গভীর মমতায়। সেই সময়ে নতমুখ ফাদারের চোখ থেকে অবিরল জল ঝরে পড়ছিল। তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাতের তেলোয় ছোট একটা তুচ্ছ ব্যাং প্রাণভয়ে বসে আছে। গৌর দেখেছে।

ফাদার ইভান্সের শেখানো ধর্মসংগীত গুনগুন করে গাইতে গাইতে গৌর ওঠে। কতকাল ধরে মানুষ কত পালক ফেলে গেছে পৃথিবীতে। শিমুল তুলোর মতো ওড়াউড়ি করে সব পালকেরা। গৌর আপনমনে হাসে। ধর্মসংগীত গায়।

উকো দিয়ে গভীর মনোযোগে একটা পিস্টন রিং ঘষছিল গৌর। এখনও তার ঠোঁটে ধর্মসংগীত। সেই সময়ে নন্দীদের বাড়ির মেয়েটা এক কাপ চা নিয়ে এল। সঙ্গে দু'খানা বিস্কুট।

কী খবর? —গৌর আলগাভাবে জিজ্ঞাসা করে। মেয়েটার গড়ন বেশ। বয়সকালের লকলকে ভাব শরীরে ফুটে আছে। পিছল চামড়া। তেমন সুন্দর কিছু নয়। তবু চোখের দীর্ঘ পাতায় একটা শীতলতা আছে। তাকিয়ে থাকলে জিরোতে ইচ্ছে করে।

চা দিয়েই মেয়েটা চলে গেল না। বলল, গৌরদা, আজ বেরোবেন না?

বেরোব।

কখন?

এই তো। বেরোলেই হয়।

আমি আর মা কালীঘাটে যাব। নিয়ে যাবেন?

চায়ে চুমুক দিয়ে গৌর মনে মনে একটু হাসে। বলে, কালীঘাটে গিয়ে কী হবে?

মেয়েটা বলে, মা পুজো দেবে। মানত আছে।

ও। আচ্ছা, নিয়ে যাব।

মেয়েটা ঘুরে ঘুরে ঘরখানা দেখে। তারপর হঠাৎ গৌরের দিকে ফিরে বলে, জিজ্ঞেস করলেন না কীসের মানত?

কীসের?

মেয়েটা আঁচল তুলে মুখে চাপা দিয়ে হাসে। তারপর আঁচল সরিয়ে মুখখানা থমথমে করে বলে, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তো, তাই।

ও। তা কোথায় ঠিক হল?

মেয়েটা থমথমে মুখেই বলে, সব কি বলতে আছে?

কেন, বলতে নেই কেন?

ভাংচি দেন যদি!

ভাংচি দেব? কেন?

অনেকে তো দেয়।

গৌর ঠিক বুঝতে পারে না। ফাদার ইভান্সের ধর্মসংগীতের মধ্যে ডুবে ছিল সে, দুনিয়াময় মানুষের ফেলে যাওয়া পালক দেখছিল। সেই ডুবজল থেকে মুখ তুলে হঠাৎ পৃথিবীর ওপরকার সব কথাবার্তা, সম্পর্ক কিংবা ঘটনা বুঝতে তার একটু কষ্ট হয়। মেয়েটার মুখচোখে রহস্য ফুটে আছে। চোখে সজল বিদ্যুৎ, ঠোঁটে টেপা নিষ্ঠুর হাসি। মেয়েটা হঠাৎ পালটে গেল যেন এইমাত্র। গৌর তা লক্ষ করে। কথাটা ঠাট্টা ভেবে সে একটু হাসে। বলে, ভাংচি দেব না।

এই মেয়েটাকে দিয়ে চা আর কুঁচো নিমকি পাঠিয়ে গৌরের এক হাত জমি এনক্রোচ করেছিল নন্দীরা। গৌরের সেই কথা মনে পড়তে একটু হাসল। মেয়েটা কি তা জানত? ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো মেয়েটা জানত, হয়তো জানত না। এই জমির জন্য লড়াকু রাখোহরি কত কী করেছিল, আর গৌর কুঁচো নিমকি চিবিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা বয়সকালের মেয়ের দিকে কয়েক পলক তাকানোর সুযোগ পেয়ে সেই দুর্লভ জমির এক হাত ছেড়ে দিয়েছে। এক হাত বাই চল্লিশ হাত, কত হয়? একটু ভাববার চেষ্টা করল গৌর। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। সতেজ গাছের মতো ডালপালা সমেত মেয়েটা। গৌরের, ফিফটি পার্সেন্ট হাফ—ফিনিশ, বগলুর তিন নম্বরের, ল্যান্ডমাস্টারে চড়েই হয়তো একদিন এর বর আসবে।

মেয়েটা কী যেন বলবে—বলবে করে। বলে না। পিস্টন রিংটা হাতে ধরে থেকেই গৌর চেয়ে থাকে।

মেয়েটা একটু দম ধরে থেকে হঠাৎ চোখ বুজে বলে, আপনি আমার বিয়েতে ভাংচি দিলে আমি খুশি হতাম।

অ্যাঁ! —গৌর ভারী অবাক হয়।

কিন্তু মেয়েটা দাঁড়ায় না। কথাটা বলেই বাতাসে ভেসে তর তর করে চলে যায়।

যেখানে মেয়েটা দাঁড়িয়ে ছিল সেই শূন্য জায়গাটায় অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না কথাটা। কিন্তু বুঝবার চেষ্টা করে খুব। পিস্টন রং আর উকোটা রেখে দেয় গৌর। জানালার ওপর একটা নিমডাল ঝুঁকে পড়েছে। নতুন বর্ষায় পাতা এসেছে তার। সতেজ পাতা। তাতে রোদ পড়ে সবুজ আলো দিচ্ছে চারধারে। পোকামাকড়ের আনন্দের শব্দ ওঠে চারদিকে। একটা কেন্নো জানালার শিক বাইছে। গৌর জানালার দাঁড়িয়ে এইসব দেখে আর দেখে। সতেজ নিমগাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে ওই দূরের মেঘহীন আকাশ দেখা যায়। ওইখানে ফাদার ফ্রান্সিস থাকেন, আর ফাদার ইভান্স। স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল বল। চারদিকে ওড়াউড়ি করে মানুষের ফেলে যাওয়া পালক। গৌর চেয়ে থাকে। মেয়েটার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করে।

হাতের তেলকালি ঝাড়নে মুছে গৌর তার শোওয়ার ঘরে আসে। পেরেকে ঝোলানো হাত—আয়নাটা পেড়ে নেয়। মুখ দেখে। চোয়াড়ে একখানা মুখ। রুখো—শুখো দু'খানা হাত—পা। স্থাবর অস্থাবর কিছুই নেই গৌরহরির। যা আছে সবই ভূতের কব্জায়। রাখোহরি চোয়ালে থাপ্পড় মেরে কেড়ে নিতে চায় যদি, গৌর ঠেকাতে পারবে না। ভূতের খেলায় রাখোহরি বড় ওস্তাদ। মাথাটা এক বেহদ্দ নাচুনে মাগির নাটমঞ্চ। গৌর নিজের মুখের দিকে চেয়ে থাকে আয়নায়। তবু সে বিয়েতে ভাংচি দিলে মেয়েটা খুশি হয়! আরে বাঃ। এর অর্থ কী? মানে কী?

জানালা দিয়ে মেঘভাঙা রোদ এসে পড়েছে। চারদিক আলোয় আলোময়। এমন দিনে কিছুই অস্বচ্ছ থাকে না। গৌর ভাবে, এমন সুন্দর দিন বহুকাল দেখেনি সে। কিন্তু কী বলল মেয়েটা? গৌর ভাংচি দিলেই খুশি হয়? না কি যে কেউ ভাংচি দিলেই খুশি হয়? কোন কথাটার ওপর জোর দিল মেয়েটা, 'আপনি' না 'ভাংচি'? ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে। কিন্তু ভাবে। চারদিক থেকে মেঘভাঙা রোদ এসে তাকে ঘিরে ধরে। চড়াই

পাখিরা উড়ে আসে ঘরে। আসে এক—আধটা মৌমাছি, ফড়িং। পিঁপড়েরা দেয়ালে বায়, কেন্নো আসে, সবুজ পোকা একটা জানালার শিক বেয়ে ওঠে। ভেজা জঙ্গলে রোদ পড়ে একটা বুনো মিষ্টি গন্ধ ছড়াতে থাকে।

বেলা সোয়া দশটা নাগাদ গৌর বুঝতে পারে, মেয়েটা তাকে ভালোবাসে। কী করে বাসল, কবে বাসল তা ভেবে দেখতে আরও সময় লাগবে। কত সময় তা ঠিক জানে না গৌর। হয়তো একটা জীবনের সময় লেগে যাবে। তা লাগুক। একটা লম্বা জীবন এখনও পড়ে আছে গৌরের। সেই একা নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য কিছু কিছু সুন্দর প্রবলেম থেকে যাক। গৌর অবরে—সবরে বসে ভাববে।

দরজায় চাবি দিয়ে গৌর বেরোয়। গাড়ি বের করে হর্ন দিতে থাকে। হর্নটা আজ অন্যরকমের আওয়াজ ছাড়ে। ভোরবেলার অস্বচ্ছ আলো দেখে আনন্দে বিস্ময়ে মুরগি যেমন ডাকে।

চার

বিয়ের দিন দমদম থেকে বর আনল গৌরহরি। বউবাজার থেকে ফুলের মালায় সাজিয়ে নিয়েছিল গাড়ি। সেই ফুলের গন্ধে গাড়ির ভিতরকার চৌকো বাতাসটা টই—টম্বুর হয়ে রইল। বেশ লাগছিল গৌরের।

সন্ধে লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। আসরে উঁকি মেরে গৌর একবার মেয়েটাকে দেখে নিল। চন্দনে, সিঁথিমৌরে, গয়নায়, বেনারসিতে, ফুলে মেয়েটাকে চেনাই যায় না। মাইকে সানাই বাজছিল বুক খালি করে দিয়ে।

শেষ ব্যাচে খেয়ে গৌরকে বারকয়েক ট্রিপ দিতে হল আত্মীয়—স্বজনদের যে যার ডেরায় পৌঁছে দিতে। দু'খিলি পান গ্লাভস চেম্বারে রেখে দিয়েছিল। শেষ ট্রিপটা মেরে ফেরার পথে লেকে জলের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরাল গৌর। জলে আলো ভাঙছে। নানারকম আলো। জোর বাতাসে জলের গন্ধ আসে। শব্দ আসে। ফুলের মালাগুলি বাতাসে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুকোবার আগে শেষ তীব্র সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাড়ির ভিতরে সেই গন্ধ ভার হয়ে থাকে গৌরের বুকে। এক—একটা ঝিমুনি চমকে আবার জেগে যায়।

কী বলেছিল মেয়েটা? কী যেন! আপনি আমার বিয়ের ভাংচি দিলে খুশি হতাম। আরে বাঃ! গৌর ঘুম—ঘুম চোখে ভাবে। কথা ক'টা নেশারু ওম এনে দেয় চারধারে। এমন স্বার্থহীন ভালোবাসার কথা তাকে কেউ কখনও বলেনি। মেয়েটার যে বর জুটছিল না এমন নয়। চা আর কুঁচো নিমকি দিয়ে এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমিও তারা পেয়ে গেছে। তবে আর ওই কথা বলার কী স্বার্থ ছিল তার? না কি ঠাট্টা করেছিল? তাও নয়, গৌর একা একা মাথা নাড়ে। কথাটা কুঁচো নিমকি আর চা—কে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমির স্বার্থত্যাগও তার কাছে লাগে না। বিয়ের চিত্রিত পিঁড়ির দিকে এক পা বাড়িয়েও কীরকম দীর্ঘশ্বাস তার! সে তো কখনও কিছু বলেনি গৌরকে আগে। বললেও লাভ ছিল না অবিশ্যি। হাফ—ফিনিশ গৌরের মূর্তিখানা পুরো গড়া হয়নি যে। তার অর্ধেক দুনিয়া ভূতের কব্জায়, বাকি অর্ধেক সে এক দুলদুলে মিহিন বোঁটার দুলছে। কখন ছিঁড়ে পড়ে কে জানে! মেয়েটা সবই জানত। তবু ওই কথাটা বলে চিরকালের মতো চলে গেল।

চলে গেল বলে অবশ্য গৌরের কোনও ক্ষতি নেই। মেয়েটার জন্য তার দুঃখ হয় না। বরং যতবার সেই কথাটা মনে হয় ততবার আনন্দে গৌরের গা কেমন করে। ওই কথাটুকুর মধ্যেই রয়ে গেল গৌরের মুখে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মালা, মাথায় টোপর। গৌরের আর কী চাই! জীবনে এরকম অনেক রহস্য থেকে যায়, যার সমাধান মানুষ চায় না। ওরকম দু'—একটা রহস্য থেকে যাক। বাংলাদেশে ঝড়তি—পড়তি মেয়ের অভাব নেই। গৌরের আছে চালু ল্যান্ডমাস্টার, সাড়ে চার কাঠা জমি, এখনও দু'খানা ভালো হাত—পা রয়েছে তার। এর জোরে গলা বাড়ালে কেউ কেউ এখনও মালা দেয়। কিন্তু অমন স্বার্থহীন কথা কেউ শোনাতে পারে না।

এক গভীর আত্মপ্রসাদে, আনন্দে তার মনের আনাচে—কানাচে আলো এসে পড়ে। বাতাস বয়। দুটো রুখো—শুখো হাত—পা, মাথায় নাচের শব্দ, হাফ—ফিনিশ গৌর তার ভূতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারের সিটে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে লেকের বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে নানারকম সুন্দর স্বপ্ন দেখে সে।

পরদিন আবার কলকাতার সোয়ারি এধার ওধার করতে বেরোয় গৌর।

কলকাতার সোয়ারিরা 'ট্যাক্সি—ট্যাক্সি' বলে ডাকে। গৌরের গাড়ি থামে। মিটার ঘোরে। সোয়ারি খালাস হয় আবার। তখন গৌর মাঝে মাঝে আয়নাটা মেপে—জুখে ঘুরিয়ে রাখে। পিছনের ফাঁকা সিটখানা দেখা যায়। সেই সিটে মাঝে মাঝে নন্দীদের মেয়েটাকে বসে থাকতে দেখে গৌর। তার কল্পনার মেয়েটা আরও সুন্দর হয়। ক্রমে ক্রমে আরও সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে। চোখে চোখ পড়ে। কেউ চোখ সারায় না। গৌর বিড়বিড় করে বলে, আরও সুন্দর হও, আরও আরও সুন্দর। মেয়েটা সুন্দর হতে থাকে। তার বাদামি চামড়ায় দুর্লভ গোলাপি রং ফুটে ওঠে, চোখের তারা হয়ে যায় আকাশি নীল, চুলে ভোরের আলোর সোনালি আভা এসে লাগে, ঠোঁট তরমুজের মতো লাল। আবার তার চেহারা পাল্টে ফেলে গৌর। গায়ের চামড়া বাদামি, চুলে মধুর মতো রং, চোখ সমুদ্রের মতো সবুজ....

ডেডবটিটা মাঝে মাঝে মচ করে নড়ে ওঠে। গৌর ধমক দিয়ে বলে, চোপ! নো ইন্টারফিয়ারেন্স ইন লাভ....নো ইন্টারফিয়ারেন্স.....বলতে বলতে গৌর হাসে। তার মনে হয়, লম্বা সুতো ছেড়ে যেমন উলের বল গড়িয়ে যায় তেমনই নন্দীদের মেয়েটার সেই কথাটা গড়িয়ে আসছে। আসছে তো আসছেই। যতদূর যাবে গৌরহরি, বগলুর ব্যাটা, ততদূর যাবে। সেই সুতোর একপ্রান্তে বসে মেয়েটা বুনে যাচ্ছে একখানা সোয়েটার। সেই সোয়েটারের ডিজাইনের পরতে পরতে গৌরহরির নাম লেখা হয়ে যাচ্ছে।

সোয়ারিরা মুখ বাড়ায় জানালায়।

কোথায় যাবেন? —গৌরহরি জিজ্ঞেস করে।

সোয়ারিরা কত নাম বলে! টেরিটিবাজার, হাটখোলা, মুর্গিহাটা, হাওড়া। সেইসব নাম লোহার পাতের মতো গৌরের চারধারে একখানা শক্ত জাল বুনতে থাকে। ছেলেবেলায় সার্কাসে গৌর মৃত্যুকূপের যে খেলা দেখেছিল, তাতেও ছিল ওইরকম মজবুত একখানা জাল। ভিতরে দু'খানা মোটর—সাইকেল গোঁ গোঁ করে ঘুরত ফিরত, ল্যান্ডমাস্টার তেমনই কলকাতার চারধারে জালে আটকে ঘোরে ফেরে। বাইরে যায় না।

বিকেলের দিকে মৌতাত জমে ওঠে ঠিক। সেইসময়ে কলকাতার রাস্তাঘাট মুছে গিয়ে কে যেন খাল নদী নালা কেটে রেখে যায়। কোথা থেকে জলধারা এসে কুল—কুল করে বইতে থাকে। স্টিমলঞ্চ যায় আসে। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে টালমাটাল জল—পুলুস ট্রাফিক সামলায়। ঢাকার কামান দূর থেকে রঙিন গোলা ছুঁড়ে মারে। তখন ফাদার ফ্রান্সিস তার স্বপ্নশিশুদের নিয়ে মাটির কাছাকাঠি চলে আসেন। গৌরহরির দিকে ছুঁড়ে দেন সেই বল, ফ্যাস...ফ্যাস দি বল, গৌর....। গৌর হাত বাড়ায়। ধরতে পারে না। ফাদার হেসে কুটিপাটি হন। মাঝে মাঝে গাভীর ডাক শোনে সে। ট্রাফিক পুলিশ কৃষ্ণের মতো দাঁড়ায়, হাতে আড়বাঁশি, পা দু'খানা ক্রশ করা! সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে আটক গাড়িগুলো কখন গাভী হয়ে ডাকতে থাকে।

সন্ধে হয়ে আসে। কলকাতার অন্ধকারে নিয়োন সাইন দপদপিয়ে জ্বলে ওঠে। ভারী অবাক হয়ে গৌর দেখে সেইসব নিয়োন সাইনে নন্দীদের মেয়েটার সেই কথা ক'টা জ্বলে জ্বলে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার হাওয়া দেয়। সেই বাতাসে ফিসফিস ভেসে আসে সেই কথা। কলকাতার রাস্তায় একা বকুলগাছ যখন অন্ধকারে তার বকুল ঝরায় তখন সেই পতনশীল বকুলের শব্দে গন্ধে সেই কথা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সময় বয়ে যায়। অনেক সময় বয়ে যায়। তবু সেই উলের বল গড়িয়েই আসে। দীর্ঘ সুতো পড়ে থাকে। যতদূর যায় গৌর, ততদূর গড়ায় উলের বল। যতদূর যাবে গৌর, ততদূর গড়াবে। সুতো দীর্ঘ থাকবে। ফুরোবে না।

বর্ষাকাল আর খুব দূরে নয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। ওয়াইপার প্রাণপণে ঘোরে উইন্ডস্ক্রিনে! বৃষ্টির ঝরোখা দিয়ে এক ভিন্ন শহরের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। গৌরের শ্বাসের ভাপ বন্ধ কাচের গায়ে লেগে মুছে যায়। বৃষ্টি থামলে চারদিকে অপরূপ জলছবি। জলে ছায়া আর রোদ ভাঙে। গাছে গাছে ঝালর ঝোলে।

মুর অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে দুপুরবেলা গাড়ি থামিয়ে গৌর দেখে, রাস্তার ধারে ভিড়। ঢোলকের শব্দ হচ্ছে, আর মলের শব্দ। গৌর হাই তুলে গ্লাভস চেম্বার থেকে পুরনো লটারির টিকিটটা বের করে নম্বর দেখে। মেলেনি, তবু টিকিটটা ছেঁড়েনি সে, রেখে দিয়েছে। কতকিছু রেখে দেয় মানুষ। টিকিটটা মমতাভরে আবার জায়গায় রেখে সে হাই তোলে। ঘুম পাচ্ছে। আঙুল মটকায় সে। পেট্রলের গন্ধ জমে আছে গাড়ির ভিতরে। ঘোলা বাতাসে শ্বাস নিতে বাইরে আসে গৌর। তারপর পায়ে পায়ে ভিড়টার দিকে এগোয়।

খুনখুনে এক বুড়ি ঢোলক বাজাচ্ছে। দুলে দুলে। চমৎকার হাতের কারুকাজ তার। একবারও ভুলভাল টোকা পড়ে না। গমকে গমকে ঢোলকের শব্দ ছিটিয়ে দেয় বুড়ো লোল হাতে। ভিড়ের মাঝখানে একটু ফাঁকা চত্বর। সেইখানে বাসন্তী রঙের ঘাঘরা দুলিয়ে গোলাপি রুমাল হাতে একটা মেয়ে নাচছে। তার চোখে কাজল, কপালে টিকলি, নাকে বেসর। দেহাতের গমখেতের উদাসীনতা তার মুখে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই মুখে মেঘ করে। বিদ্যুৎ চমকায়। পায়ের বোল ফুটিয়ে মেয়েটা ঘুরে যায়, ঘুরে—ঘুরে যায়। হেলে দোলে কাঁপে। চোখের পাতা নাচায়। তার একটু ভোঁতা নাকের নীচে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। উত্তোলিত বাহুর নীচে বগলের জামা জুড়ে স্বেদচিহ্ন। দুই সবল পায়ে ফিনফিনে শরীর সে কোন অদৃশ্য লেত্তিতে জড়িয়ে ছেড়ে দেয়। মাতালের মতো ঘোরে। তার পুরুষ সেই সুন্দর দেহাতি যুবা মাঝে মাঝে চরকিবাজি লাফ দিয়ে উঠে মেয়েটার সঙ্গে দু'চক্কর নাচে। চারদিকে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে সে চোখের ইশারা করে। ভিড় জমলে সে তার বাজির ছোরা বের করবে, দেখাবে লাঠির খেলা, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরানো, হেঁটমুণ্ড হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচাবে। মেয়েটা তখন ক্লান্ত মুখে জনে—জনের কাছে যাবে মাঙতে।

গৌর দাঁড়িয়েই থাকে। শুখো পায়ের ওপর শরীরটা বেঁকে থাকে তার। রুখো হাতখানা পকেটে ঢোকানো। পুরুষটা তার বাজি শুরু করে। তিনখানা চারখানা পাঁচখানা ছোরা একে একে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। লোফে, ছুঁড়ে দেয়। ছোরাগুলো রোদে ঝিলিক খেয়ে ওঠা নামা করে শূন্যে। মেয়েটা ঝম করে এক পা ফেলে, আবার ঝম করে অন্য পা। জনে—জনের কাছে ঘুরতে থাকে।

ক্রমে এগিয়ে আসে মেয়েটা। ভিড়ের মধ্যে গৌরের দিকেও হাত বাড়ায়। প্রত্যাশার চোখে তাকায় গৌরের মুখে। চিনতে পারে না। গৌর তো ভিড়ের একজন, চিনবে কী করে?

গৌর তার রুখো হাতখানা বের করে আনে, সেই হাতে একটা সিকি মেয়েটার চোখের সামনে তুলে ধরে। তারপর কোষবদ্ধ হাতে সিকিটা ফেলে দেয়। মেয়েটা হাতখানা দেখে। হাত থেকে চোখ সরে আসে মুখে। ঘোলা জল কেটে যায়। চিনি—চিনি করে মেয়েটা চিনতে পারে গৌরকে। একটু হাসে। আশপাশের লোকজন একমনে বাজি দেখে। লোকটা তখন আশ্চর্য নিপুণতায় দুই হাতে চারটে কাঠিতে চারটে পিরিচ বন বন করে ঘোরায়। গৌর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, কী খবর?

মেয়েটা আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বলে, ভালো। কাল আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি।

কেন?

এখন চাষবাসের সময়। ফসল উঠে গেলে আবার শীতের শেষে আসব।

আমি তোমার নাচ দেখে নিয়েছি।

কত লোক রোজ তার নাচ দেখে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় খঞ্জনার মতো ক্লান্তিহীন, লজ্জাহীন, ইচ্ছাশূন্য কত নাচ নেচেছে সে। তবু গৌরের কথায় লজ্জা পেয়ে সে রাঙা মুখ একটু নত করে।

তারপর বলে, আবার যখন আসব তখন আবার দেখো। তুমি বড় ভালো লোক।

গৌর চুপ করে থাকে।

মেয়েটা মুখ তোলে। সেই মুখে পড়ন্ত রোদ তার ঝলক তোলে। আনন্দিত মুখখানা। মেয়েটা তীব্র সুখের শ্বাসের সঙ্গে বলে, কাল, কাল আমরা দেশে যাচ্ছি।

কী আছে দেশে?

কিছু নেই তেমন। গঁহু আর ধানের খেত, জল, মাটি, আর কী? শীতের শেষে আবার আমরা আসব। তুমি বড় ভালো লোক।

গৌর হাসে। মেয়েটা হাসে।

মলের ঝম শব্দ হয়। মেয়েটা আর এক পা এগোয়। অপরিচিত পুরুষেরা সামনে হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই হাতে মেহেদির নকশা, উল্কি, প্রত্যাশা।

কাল ওরা দেহাত যাবে।

গৌর ফিরে এসে তার ল্যান্ডমাস্টারের বসে।

স্থলের গাড়ি জলে ভাসায় গৌর। জলের গাড়ি আকাশে ওড়ায়। তার সেই আশ্চর্য জাদুর খেলা কেউ লক্ষ করে কি না কে জানে! জলে স্থলে অন্তরিক্ষে অবাধ ঘোরে ল্যান্ডমাস্টার। কখনও কখনও তার পিছনে কাচ দিয়ে দেখা যায় সমুদ্র, জাহাজের নিঃশব্দ মাস্তুল। দূর জাহাজঘাটায় একটা টিলার ওপর ছোট্ট বাড়ি। বন্দরে একটা উঁচু জায়গায় নন্দীদের মেয়েটা একখানা হাত তুলে রাখে। গৌর এইসব দেখে।

ফিসফাস করে গঙ্গার বাতাস বয়ে যায়। মাঝে মাঝে কলকাতা জুড়ে জ্যোৎস্না ওঠে। বটের আঠার মতো জ্যোৎস্না। সেই আলোর নদী বয়ে যায়, গাছপালার ডালপালা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে! সুস্বাদ সুঘ্রাণ সেই জ্যোৎস্নায় মাঝে মাঝে গৌর একটা পুরনো প্রকাণ্ড বাড়িকে মনে মনে খোঁজে। সেই বাড়িটা ভাঙা হয়ে গেছে নাকি! কোথাও গৌর সেটাকে আর খুঁজে পায় না। জানালা দরজার পাল্লা নেই, হাঁ—হাঁ বাতাসে ফাঁকা বাড়িটায় কেবলই ক্ষয় আর পতনের ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ ওঠে। মিহিন পতনের শব্দ। একটা বন্ধ দরজার ওপাশে টানা দীর্ঘ কষ্টের শ্বাস টানে কেউ। কোথায় অলক্ষে জ্বলে সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...লায়লার রুটি! কোথাও পাওয়া যায় না সেই রুটি। গৌর খুঁজে দেখেছে। কিন্তু আছে স্যু—র ঘরে। সেখানে সবুজ আলো এসে পড়ে। তখন ঘরখানায় মাঠঘাটের ছবি ফুটে ওঠে।

বৃষ্টি আসে। বৃষ্টির ঝরোখা ঠেলে চলে ল্যান্ডমাস্টার। উইন্ডস্ক্রিনে বিদেশি শহরের ছবি।

সর্বত্রই ওড়ে মানুষের ফেলে—যাওয়া পালক। উড়ে আসে ল্যান্ডমাস্টারের ভিতরে। গৌরের মাথার চারধারে ঘুরে বেড়ায়, শ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতরে চলে যায়। কাঁধে বসে, মাথায় বসে প্রজাপতির মতো ডানা কাঁপায়।

মলিনের লাইসেন্স কেড়ে নেয় পুলিশ। আবার ফেরত দেয়। নির্বিকার মলিন গৌরের গাড়ির সামনে এসপ্ল্যানেডে গাড়ি ভিড়িয়ে হাই তোলে।

মামু, কী খবর?—গৌর জিজ্ঞেস করে।

মলিন আড়মোড়া ভেঙে বলে, ত্রিভঙ্গ, তোমার গাড়িটা যে রং জ্বলে, চটা উঠে ভারতবর্ষের ম্যাপ হয়ে গেল। মাডগার্ডের লোহা মড়মুড়ে হয়ে এসেছে। এবার গাড়িটা মল্লিকবাজারে ছেড়ে দাও।

গৌর শ্বাস ফেলে তার ল্যান্ডমাস্টারের দিকে চেয়ে থাকে। কিছুই পৃথিবীতে অজর অমর নয়। গাড়িটা ক্ষয়ে যাচ্ছে ঠিকই। বাবা ল্যান্ডু, আমরা দু'জনেই কি উচ্ছন্নে চলেছি।

বিবেকানন্দ ব্রিজ থেকে গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে একদিন গৌর নেমে আসছিল। সকাল দশটা। বালি চৈতলপাড়ার সোয়ারি ছিল, খালাস দিয়ে এসেছে।

দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের সামনের চত্বরে গাড়ি নেমে এলে একজন মেয়েমানুষ হাত তুলল। গৌর গাড়ি থামায়।
কোথায় যাবেন?
কলেজ স্ট্রিট যাব বাবা, নিয়ে যাবে?
পথেই পড়বে। গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলতে খুলতে একঝলক মেয়েমানুষটাকে দেখে। পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি, ঘাড়ে আঁচল। কপালে প্রসাদি সিঁদুর দগদগ করছে। উপোসি মুখখানার শুষ্কতা ভেদ করে পবিত্রতা ফুটে আছে। চোখ দু'খানায় ঘোরলাগা সম্মোহিত ভাব। সঙ্গে দাসী, তাদের হাতে ফুল বেলপাতা, সন্দেশের বাক্স, পট, গঙ্গাজলের মেটে কলসি।
গৌর গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু মুখখানা চেনা—চেনা লাগে তার। ওই সুন্দর মুখ, কপালে ওড়া চুলের গুছি, গভীর চোখ সে আগেও দেখেছে। তেমন বেশি বয়স নয়, কিন্তু গরদের শাড়ি, সিঁদুর, উপবাস, সব মিলিয়ে একটা কেমন গম্ভীর পবিত্রতার ভাব মেয়েমানুষটাকে বয়স্কা করে রেখেছে। মনে পড়ি—পড়ি করেও পড়ে না গৌরের।
কপাল থেকে চুলের গুছি সরানোর জন্য হাত তোলে মেয়েমানুষটা। কী সুন্দর আঙুল। লম্বা, নিটোল, হলুদ রঙের আঙুল, মুক্তোরঙের পরিষ্কার নখ। চুলের গুছি সরাতে গিয়ে আঙুলগুলি, যেন বা পিয়ানোর রিডে, সুন্দর আলগোছে নড়ে। আর তখন একটা আংটির হিরে হঠাৎ ঝিকিয়ে ওঠে।
সেই হিরের ঝলকই গৌরের অন্ধকার মাথায় তীব্র আলো ফেলে। মনে পড়ে। হাড়কাটা গলির মতিয়া। এক পলক ঘাড় ঘোরায় গৌর। আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। মতিয়া! মতিয়াই তো! কিন্তু পাউডার লিপস্টিক নেই, নখে পালিশ নেই। সব রং ধুয়ে ফেলেছে সে। দুর্লভ আতরের গন্ধটুকু পাওয়া যায় না। গরদের শাড়ি থেকে মৃদু ন্যাপথলিনের গন্ধ আসে। আর ফুল বেলপাতার গন্ধ। এ কীরকম মতিয়া? আর একবার মতিয়ার কাছাকাছি যাবে, যে বাতাসে শ্বাস ফেলে মতিয়া সেই বাতাসে শ্বাস টেনে নেবে, এরকম একটা ইচ্ছে ছিল গৌরের। আজ এত কাছে বসে আছে সে, গঙ্গাস্নানের পর, উপবাসের পর, রং ধুয়ে—ফেলা মতিয়া, তবু একটুও রোমাঞ্চ হয় না গৌরের। গৌর আয়নার দিকে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে। মতিয়ার সুন্দর আঙুল শ্বেতপদ্মের মতো কপালে নড়ে, হিরেটা ঝিকোয়।
সম্মোহিত মুখে মতিয়া হঠাৎ একটু ঝুঁকে গৌরকে জিজ্ঞেস করে, বাবা, তুমি ওই মন্দিরে কখনও গেছ?
না।
একবার যেয়ো। বড় ভালো লাগবে।
আচ্ছা।
ওখানে স্নান করলে শরীর বড় ঠান্ডা হয়। রামকৃষ্ণদেবের পায়ের ধুলো এখনও ছড়িয়ে আছে ওখানে। গড়াগড়ি দিলে সেই ধুলো শরীরে উঠে আসে। মানুষের কত জন্ম ধন্য হয়ে যায়। একবার যেয়ো বাবা।
চোখের জল গড়িয়ে নামে মতিয়ার। দুর্লভ ফোঁটাগুলি পড়ে। সেই অশ্রুর চিহ্ন গৌরের ল্যান্ডমাস্টার ধরে রাখে ঠিক। এ সব মানুষের পালক। মানুষ চলে যায়, তার চিহ্নগুলি পড়ে থাকে।
গৌরকে রাস্তা চেনাতে হয় না। সে নিজে থেকেই কলেজ স্ট্রিট ছেড়ে বাঁয়ের গলিতে ঢোকে। নির্ভুলভাবে মতিয়ার বাড়ির সদরে গাড়ি দাঁড় করায়।
ভ্রূ দুটো ওপরে তুলে মতিয়া জিজ্ঞেস করে, তুমি বাবা, আমার বাড়ি চিনলে কী করে?
গৌর একটু হাসে।
মতিয়া লাজুক গলায় বলে, তাহলে আমাকে তুমি চেনো!
গৌর উত্তর দেয় না।
মতিয়া শ্বাস ফেলে বলে, আমি বড় পাপী বাবা। বড় পাপী।
মতিয়া পয়সা দেয়। গৌর নেয়।
আসি বাবা। তুমি বড় ভালো লোক।—মতিয়া বলে।

গৌর চুপ করে ফেরত—পয়সা গুনে দেয়।

মতিয়া জানালায় ঝুঁকে ফিসফিস করে বলে, আমাকে মনে রেখো না বাবা।

কিন্তু তবু গৌরের সবই মনে থেকে যায়! স্থলের গাড়ি জলে ভাসায় গৌর, জলের গাড়ি শূন্যে ওড়ায়। ওড়ে পালক, থাকে আতরের সুগন্ধ, একটা টিকলির নকশা। কলকাতার নিয়োন সাইনগুলিতে কত পুরনো দিনের কথা ফুটে ওঠে! গৌর ভুলবে কী করে?

পাঁচ

অনেক রাতে নাইট শো ভাঙার একটু আগে গাড়িখানা দক্ষিণমুখো করে দাঁড়িয়ে ছিল গৌরহরি। শো ভাঙলে যদি গ্যারেজের দিকের সোয়ারি পায়। আসলে এখন অনেক রাতে একা একা গাড়িখানা চালিয়ে নির্জন ঘুমন্ত গ্যারেজটায় যাওয়ার সময়ে প্রায়ই গা ছমছম করে গৌরের। ওই ডেডবডিটা ম্যাক্সিমাম নড়াচড়া করতে থাকে। ও শালাকে ঢিট করার একমাত্র উপায় গাড়িতে সোয়ারি তোলা। তুললেই শালা চুপ। আর নড়াচড়া নেই। তাই অপেক্ষো করছে গৌর। তার রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। পাইস হোটেলে সে খেয়ে নেয়। একটা মিঠে পান খেয়েছে। তারপর রুখো—শুখো দু'খানা হাত—পা—ওলা দুঃখী গৌরহরি আরামে বসেছে স্টিয়ারিঙের পিছনে হেলান দিয়ে। অপেক্ষা করছে। বহু ট্যাক্সি ওইরকম দাঁড়িয়ে। শেষ ট্রিপ যদি পায়। গৌরহরির পয়সার লালচ নেই। গৌরা যেমন কারও সার্ভেন্ট না, তেমনি না পয়সারও স্লেভ! কেবল এক—আধজন সঙ্গী খোঁজে। নিশুত রাতে একটা ল্যান্ডমাস্টারে একা বসে থাকতে তার কেমন একটু লাগে ঠিকই। যখন শালা ডেডবডিটা সবসময়েই রয়েছে সঙ্গে, একটু সাবধান থাকা ভালো। বাঁ দিকে একটা অন্ধকার গলি। সেই গলি দিয়ে একটা তেরো—চৌদ্দ বছরের হাফপ্যান্ট পরা ছেলে মুখ বাড়াল। চারদিক চেয়ে দেখছে। মুখখানা শুকনো। কেমন একটা অস্থির ভাব। পায়ে পায়ে সে গৌরের ট্যাক্সিটার কাছে আসছে। কিন্তু গৌর কারও সার্ভেন্ট নয়। আসুক যে কেউ। গ্যারেজের দিকের সোয়ারি না হলে নেবে না। গৌরহরি অর্থাৎ বগলুর ছাওয়াল গৌরা মনে মনে নিজেকে শক্ত করে রাখে। ছেলেটা ম্লান মুখে কাছে আসে।

ট্যাক্সি যাবে?

কোনদিকে?

ছেলেটা ইতস্তত করে বলে, সাউথে।

আমার গ্যারেজ যাদবপুরে। ওদিকে হয় তো যেতে পারি।

ছেলেটা শ্বাস ফেলে মাথা নাড়াল, ওদিকেই।

তবে উঠে পড়ো। —গৌরহরি সরে গিয়ে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মিটার ডাউন করে।

ছেলেটা নরম গলায় বলে, ওই গলির মধ্যে একটু যেতে হবে। মেয়েছেলে রয়েছে।

ঝামেলা! তবু তো সোয়ারি। নাইট শো ভাঙতে এখনও প্রায় আধঘণ্টা দেরি। তার আগেই যদি চলে যাওয়া মন্দ কী?

গলিতে গাড়ি ঢুকবে তো? ঘষা—ফষা লাগে যদি?

লাগবে না। গলি চওড়া।

সাবধানে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে গলিতে ঢোকে গৌরহরি। ছেলেটা পিছনের সিট থেকে সামনে ঝুঁকে বলে, আর একটু এগিয়ে।

কতদূর?

এই সামনেই, কয়েকটা বাড়ি পর।

বিরক্ত গৌরহরি ঘুমন্ত, অন্ধকার গলিটার মধ্যে হেডলাইট জ্বেলে এগোয়। বলে, গাড়ি ঘোরাব কী করে? ওদিকে বেরোবার রাস্তা আছে?

আছে। কোনও অসুবিধে নেই। আমরা তো আছি।

গৌরহরি এগোয়। পাকা হাত তার। আঁকা—বাঁকা গলির মধ্যে ঘুরে ফিরে তার গাড়ি যায়।

আর কতদূরে?

আর একটু। বাঁ হাতে আর একটা গলি পড়বে, সেখানে।

ইস! বড় ঝামেলায় ফেললে।

এখন গৌরবাবুর বেড—টাইম নয় ঠিক। তবে মাঝে মাঝে হাই উঠছে। কেন গৌরবাবু নিজের ইচ্ছেমতো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে না? বিশেষত সে যখন কারও চাকর নয়। কার ধার ধারে সে?

গাড়ি আর খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতের গলিটা পায়।

ওরেব্বাস! এ যে যম অন্ধকার। গলিটাও সরু।

গাড়ি যায়।

যায় যাক। আমি যাব না। এখানে দাঁড়াচ্ছি, তোমার লোকজন ডেকে আনো। এইটুকু সবাই হেঁটে আসতে পারে।

এইটুকু নয়। গলিটা অনেক লম্বা। একদম ও—প্রান্তে যেতে হবে। তাছাড়া সঙ্গে খুচরো কিছু মালপত্র আছে। চলুন না, মিটারের বেশি দেব।

গৌরহরিকে পয়সা দেখাচ্ছে! অ্যাঁ! পয়সা দেখাচ্ছে বগলুর পোলা গৌরাকে! বগলাপতির আমলে পুরনো ডজ গাড়িটার ছোট আয়নায় গৌরহরি কি বিস্তর নম্বরি নোটের ছবি দেখেনি!

বেশি দিলেই কী! আমি যাব না।

ছেলেটা হঠাৎ অসহায় ভাবটা ঝেড়ে ফেলে হাসল, বেশ আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল।

যাবেন না মানে! যাবেন, যাবেন। না গেলে কি চলে?

না গেলে কী করবে?

ছেলেটা, বাচ্চা মিষ্টি চেহারার ছেলেটা হঠাৎ ডান হাত বাড়িয়ে গৌরের ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল, চল শালা, ফের মুখ খুলেছিস কি ভোঁতা করে দেব। ঢোক গলিতে!

গৌরহরি কোনওকালে মারপিট করেনি, মার খায়ওনি কখনও। বগলাপতি ক্বচিৎ কখনও চড়টা চাপড়টা দিয়েছেন, তার বেশি কিছু নয়। ঘাড়ে ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ গৌরের বড় অপমান লাগল। সে কিনা গৌরহরি, টিকাটুলির বগুলার পোলা গৌরা, তার কিনা ঘাড়ে হাত! গৌর তার ভালো হাতখানা বাড়িয়ে ছেলেটার হাত চেপে ধরল, খুব সাহস যে খোকা! অ্যাঁ! শালা মারব এমন থাপ্পড়!

ছেলেটা অনায়াসে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ট্যাক্সির দুই জানালায় দু'জন ছায়ার মতো উটকো লোক এসে দাঁড়াল। তারা শুধু ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, হুজ্জত করছে নাকি রে?

একটু একটু।

বাইরে থেকে একজন হাত বাড়িয়ে গৌরের কলার চেপে ধরে গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, জান নিয়ে ফিরতে পারবে না, বুঝলে? গাড়ি জ্বালিয়ে দেব তোমাকে সুদ্ধ।

জ্বালিয়ে দেবে! মানে! জ্বালিয়ে দেবে ল্যান্ডমাস্টারখানা! বগলাপতি অর্থাৎ কিনা বাপ বগলুর দেওয়া একমাত্র নিজস্ব জিনিসখানা তার! এত আদরের গাড়িখানা, যেটা কখনও তার প্রাইভেট কখনও বা পাবলিক! গৌরের আপাদমস্তক চমকে যায়। চেয়ে থাকে।

যাবে কি না?

দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, বদর—বদর, যাব বই কী! রাস্তা দেখাও বাবাসকল। গৌরা যাবে। যদিও বগলুর পোলা গৌরা কারও চাকর না, তবু ল্যান্ডমাস্টারখানা গৌরের আর থাকে কী! অ্যাঁ। থাকে কী? থাকে শুধু দুটো রুখো—শুখো হাত পা আর মগজের ঝমঝম শব্দ!

গৌর একটু দম নিয়ে বলে, যাব।

গাড়ি ঘোরান। বাঁ দিকে।

গৌর গাড়ি ঘোরায়।

সেই দুটো লোক তার গাড়ির মধ্যে এসে বসেছে এখন। তাদের একজন তার বাঁ পাশে। তারা খুব চুপচাপ। কথা বলে না একটাও।

আর কতটা পথ?—গৌর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

চালাও। আমরা বলব।

গলিটা অনেক লম্বা। লোকজন বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ ধারে একটা জানালা দরজাহীন পাঁচিল চলেছে। ডান হাতে কয়েকটা ছুটকো—ছাটকা বাড়ি। এসব পার হল গৌরহরি। ল্যান্ডমাস্টারখানা শব্দ না করে যাচ্ছে। পুরনো আমলের ইঞ্জিন, তার ওপর যত্নে থাকে গৌরের কাছে।

ক্রমে ডানদিকের বাড়িঘর শেষ হয়ে গেল। একটা মাঠ। তাতে হেডলাইটের আভায় অনেক আগাছা দেখল গৌর। বাঁ দিকে একটা কারখানার মতো। সেটা অন্ধকার, নিশ্চুপ। কথা না বলে গৌর এগোল। আবার বাড়িঘর শুরু হচ্ছে। ছুটকো—ছাটকা। বাঁ দিকের লোকটা হাত বাড়িয়ে গৌরের হাতে চাপ দিল, চাপা গলায় বলল, এইখানে। বাতি নিভিয়ে দাও।

গৌর বাতি নেভাল। লোকগুলো কেউ নামল না। বসে রইল।

বড় ভয় করে গৌরের। বগলুর ছেলে গৌরাকে এ কোথায় নিয়ে এল অচেনা লোকেরা? ব্যাপারখানা কী! তার গাড়ির ডেডবডিটা নাছোড় বটে। কিন্তু কখনও তেমন কোনও বিপদে ফেলেনি তাকে। মাঝে মাঝে নড়েচড়ে। লেগে থাকে এই পর্যন্ত! তা ছাড়া ডেডবডিটার আর কোনও নিন্দে কেউ করতে পারবে না! এদের চেয়ে সেই ডেডবডিটা অনেক ভালো! তাকে নিয়েই তো এতকাল ল্যান্ডমাস্টারখানা দাবড়ে বেড়াচ্ছে বগলুর ছাওয়াল।

আরও তিনজন লোক অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তার মানে ছ'জন। গৌর বে—আইন দেখেও চুপ করে থাকে। লক্ষ করে যে তিনজন আসছে তাদের মধ্যে মাঝখানের জন নিজের ইচ্ছেয় বা শক্তিতে আসছে না। তাকে আনা হচ্ছে ধরে ধরে। বাঁ দিকের ছোট্ট জমিটুকু পার হয়ে তারা গাড়ির কাছে চলে এল। বাচ্চা ছেলেটা নেমে দাঁড়াল। নিঃশব্দে তিনজন উঠল পিছনের সিটে। আবছা মনে হল গৌরহরির, মাঝখানের লোকটার হাত বাঁধা। মুখে ন্যাকড়ার দলা ভরা আছে। লোকটা অস্পষ্ট একটু শব্দ করল। দু'ধারের দু'জন সিগারেট ধরাল। কথা বলল না। বাচ্চা ছেলেটা আর পিছনের সিটে আগে যারা উঠেছিল তারা নেমে গেল।

গৌরহরির বাঁ পাশের লোকটা বলল, চালাও। সোজা গিয়ে প্রথম ডান হাতে যে রাস্তা পাবে সেইটে ধরো। হেডলাইট জ্বেলো না, জ্যোৎস্না আছে।

তাই সই। গৌর গাড়ি ছাড়ে। কোথায় চলেছে বগলুর বাচ্চা কে জানে! ডান হাতের রাস্তাটা চওড়াই। আলো আছে। লোকজনও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ যেন চেনা কলকাতার কোনও রাস্তাই নয়। এ রাস্তা গৌরহরি তার বাপের, বগলাপতির আমলেও দেখেনি।

কোনদিকে যাব?

চলো সোজা। আমরা বলে দেব।

পিছনের সিটে ডেডবডিটা নেই বটে এখন, কিন্তু যা আছে তা জ্যান্ত বডি। হাত—পা বাঁধা লোকটা একটু পরেই ডেডবডি হয়ে যেতে পারে।

গৌর গাড়ি চালাতে থাকে। যেমন সে চালায় মন—প্রাণ দিয়ে তেমনই চালাচ্ছিল। তার হাত পা মগজ ধীরে ধীরে অধিকার করে নিচ্ছিল ল্যান্ডমাস্টারটার যন্ত্রপাতি।

আস্তে। —বাঁ দিকের লোকটা বলে।

গাড়ি ধারে করে গৌর।

লোকটা পিছনের দিকে তাকায়। কী একটা ইঙ্গিত করে।

গৌর দেখে, রাস্তাটা বড় অন্ধকার। কোনওখানে আলো নেই। জ্যোৎস্নাও দেখতে পায় না গৌর। বোধহয় আকাশে মেঘ আছে, কিংবা লোকটা মিথ্যে বলল।

গাড়িটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। বাঁ দিকের লোকটা পিছন ফিরে কী দেখছে। গৌরের ঘাড় ঘোরাতে সাহস হয় না।

হঠাৎ কোঁক করে হেঁচকি তোলার মতো একটা আওয়াজ হয়। মাঝখানের লোকটাই শব্দ করল। অনিচ্ছাতেও উইন্ডস্ক্রিনের ওপর ছোট্ট আয়নাটায় চোখ গেল গৌরহরির। আবছায় তেমন কিছু বোঝা যায় না। তবু মনে হয়, ডানপাশের লোকটা একটা ছোরার হাতল মাঝখানের লোকটার পেট থেকে টেনে বার করল। সঙ্গে সঙ্গে একটু কী যেন ছিটকে এসে লাগল গৌরের বাঁ কানের পিঠে। শুখো হাতটা অবশ হয়ে আসছিল, কোনওক্রমে টাল সামলে নিল গৌরহরি।

বাঁ দিকের লোকটা তার হাত ছুঁয়ে বলল, ব্যস, আর না! গাড়ি থামাও।

খুব ম্লান জ্যোৎস্না ফুটেছে। অচেনা রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়েছে গৌরহরি। এ জায়গা সে চেনে না। কোনওকালে আসেনি।

তিনজন লোক তিনটে দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল। একজন জানালায় ঝুঁকে বলল, একটা বডি রইল। যেখানে হয় ফেলে দিয়ো। পুলিশে যদি যাও, আমরা নম্বর টুকে রেখেছি।

বডি!—গৌরহরির চোখ কপালে ওঠে। সত্যিই একটা বডি অবশেষে সামিল ল্যান্ডমাস্টারটায়! বগলুর দেওয়া গাড়িটাতে! ভয় না, ভারী অবাক হয় গৌর।

কী হে, শুনতে পাচ্ছ, যা বললাম?

গৌর মাথা নাড়ে।

যাও। লাইট না জ্বেলে যাও। এগিয়ে গড়িয়াহাটা রোড পাবে।

গৌর মাথা নাড়ে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। গড়িয়াহাটা রোডটা যে আসলে কোথায় তা তার মাথায় ঢোকেই না। সে মাথা নেড়ে গাড়িটা ছাড়ে।

তারপর বগলাপতির ছাওয়াল গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা, তার অদ্ভুত সোয়ারিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। রাস্তাঘাট সে আর চিনতে পারে না। তার মাথার মধ্যে মল—পরা দুটি পা ঝমঝম শব্দ করে। সে শব্দে কেমন তালগোল পাকাতে থাকে রাস্তাগুলি। যেন তাকে ধরেছে কানাওলা। একই রাস্তায় তার গাড়ি ঘুরছে আর ঘুরছে।

কী করেছি আমি! অ্যাঁ! কী করেছি আমি! কী পাপ? কোন অপরাধ? কী করেছে হে বগলুর ছাওয়াল, যার জন্য তার ল্যান্ডমাস্টারে ডেডবডি? তাকে কেন ধরেছে কানাওয়ালায়? কোন অপরাধ হে বগলুর ছাওয়ালের, যার জন্য তার দুটো হাত—পা শুখো। মগজে ওই বেহদ্দ নাচের শব্দ? এইসব কাকে জিজ্ঞেস করব আমি? কে জবাব দেবে?

পিছনের সিটে ডেডবডিটা নড়ছে আর নড়ছে। একবার পিছন ফিরে তাকায় গৌর। দেখে, বডিটা ধীরে ধীরে কাত হয়ে জানালায় মাথা আটকে থেমে আছে। পেটে একটা হাঁ। রক্ত জমে গেছে। কে হে বাপু তুমি? কোত্থেকে এলে বগলুর ছাওয়ালের ল্যান্ডমাস্টারে! উড়ে এসে জুড়ে বসলে, কে হে তুমি?

গৌরহরির হাতে গাড়ি এই প্রথম টাল খাচ্ছে। নড়েচড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে হাত সিধে রাখে গৌর। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ল্যান্ডমাস্টারে জীবন কাটে গৌরহরির, অর্থাৎ কিনা বগলুর ছাওয়ালের। তবু আজ তার গাড়ি এ কোন কলকাতা দিয়ে যাচ্ছে! মাইরি, এ সব গাছপালা, রাস্তা, আলো এসব যে গৌরবাবু কখনও দেখেনি। সোয়ারি যেমন বলে তেমনি চলে গৌর, কিন্তু আজকের সোয়ারি যে শালা কথাও বলে না! কেন শালা ভয় দেখাও গৌরবাবুকে! কোন অন্যায় করেছে গৌরা? হ্যাঁ, সত্যি বটে, মাঝে মাঝে সে সোয়ারি

কাট মারে। কতবার কত বিপদে পড়া লোককে সে তুলে নেয়নি। মেডিক্যাল কলেজের সামনে এক নতুন পোয়াতি কোলে বাচ্চা নিয়ে রোগা শরীরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল, অনেকদিন আগেকার কথা, গৌর তাকে কাট মেরে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর একবার দুটো কচি মেয়ে আর বউ নিয়ে একটা মফসসলি হাবা লোক গাড়িতে উঠেছিল। মাঝপথে যখন গৌর বুঝতে পারল এরা হাওড়া স্টেশনে যাবে, হাওড়ায় যাওয়া মানে বিচ্ছিরি জ্যাম আর পুলিশের আওতায় যাওয়া, তখনই সে গাড়ির চাকায় হাওয়া নেই বলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে লোক দেখানো জ্যাক লাগিয়েছিল গাড়িতে। সেই বোকা লোকটা মাঝপথে কচি মেয়ে আর বউকে নিয়ে কী ভীষণ বিপদে পড়েছিল। এরকম আরও অপরাধ আছে তার। অনেক। কিন্তু কেউ কি গৌরের ল্যান্ডমাস্টারের জন্য ঠেকে ছিল? যে যার গন্তব্যে পৌঁছয়নি কি শেষ পর্যন্ত? পৌঁছেছে, গৌর জানে। তবে আর কী! তবে কেন গৌরের ল্যান্ডমাস্টারে ডেডবডি? বগলুর ছাওয়ালকে কেন ধরেছে কানাওলা?

ডেডবডিটা নড়ে আর নড়ে। রাস্তার টালে গাড়ি লাফায়, আর লটপটে মাথাটা জানালায় ঠুকে যায়। চমকে ওঠে গৌর। কে হে বাপু তুমি? অ্যাঁ! উটকো উঠে বসে আছো! কে হে—?

নিঃশব্দ একরকম কথা আছে, সবাই শুনতে পায় না। গৌর শুনল।

ডেডবডিটা নিঃশব্দে বলল, আমি একজন, তুমি চিনবে না হে গৌরবাবু। কোটি কোটি মানুষের ক'জনকে তুমি চেনো? তবে আমি, বুঝলে, আমি এই সংসারের ভালো চেয়েছিলুম। ওইটুকুই আমার পরিচয়। তা দেখো গৌরবাবু, সংসারের ভালোমন্দয় হাত দিলেই বিপদ। দিলেই তোমার ভালোমন্দেও হাত পড়বে। তবু এই খেলার বড় মায়া। একবার শুরু করলে আর সহজে ছাড়া যায় না। শেষ পর্যন্ত যেতে হয়। আমিও শেষ পর্যন্ত গেছি। এই দেখো না, আমার পেটটা কেমন হাঁ হয়ে আছে! কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ নেই গো, বেশ আরামই লাগছে। সব ভালোমন্দ শেষ করেছি আমি। তোমার ল্যান্ডমাস্টারের চমৎকার গদিতে শুয়েছি আরামে, আর উঠব না হে। দিব্যি লাগছে। বলতে কী গৌরবাবু, গাড়ি চালানোর হাত তোমার ভালোই। দুলুনি লাগছে, ঘুম আসছে, বাইরে জ্যোৎস্না, মোলায়েম বাতাস বইছে, এর মধ্যে অনন্ত ঘুম ছাড়া বেশি সুখ আর কীসে! চালাও গৌরবাবু, চালাও, থেমো না। আমরা দু'জনে চলো, এই ল্যান্ডমাস্টারে সংসার ছেড়ে যাই, চলো হে বগলুর পোলা!

তা গৌর তার উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে সত্যিই সংসারের বাইরের দৃশ্য দেখতে পায়। ঢাকার সেই কামান অবিরাম লাল নীল হলুদ গোলা ছুঁড়ছে। সেই গোলাগুলো ভাসতে ভাসতে চলেছে ফাদার ফ্রান্সিসের পিছু পিছু। ফাদার হেসে কুটিপাটি, ডেকে বলছে, হেই গৌরঅরি, ফ্যাস, ফ্যাস দি বল!

গাছের পাতায় পাতায় ডালে কুয়াশায় সাদা ফুল দোলে, দোলে চাঁদের মতো উজ্জ্বল ফল। রাস্তা হঠাৎ এঁকে—বেঁকে আকাশমুখো উঠতে থাকে। গৌরহরির ল্যান্ডমাস্টার রাস্তার তোয়াক্কা না করে হঠাৎ শূন্যে উঠে উড়তে থাকে। ভেসে ভেসে চলে।

অনন্ত যাত্রায় একটা ডেডবডি সহ গৌরের ল্যান্ডমাস্টার চলে যায়। যেতে থাকে। তার মিটারের টাকা—পয়সার অঙ্ক মুছে যায়। সেখানে পর পর ফুটে উঠতে থাকে, ভালাবাসা...পরিপূর্ণতা...ঈশ্বর...